# পশুপক্ষী পালন

# বৃহৎ
# পশুপক্ষী পালন ও চিকিৎসা

[ গরু, ছাগল, মোষ, কুকুর, অশ্ব, শূকর, মোরগ-মুরগী, হাঁস, ময়না,
টিয়া ইত্যাদি পক্ষী এবং মৌমাছি ও মাশরুম সহ ]

[ অ্যালোপ্যাথিক, কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক মতে
পশুপক্ষীর চিকিৎসা ব্যবস্থাদি ]

ডাঃ এইচ কে নিয়োগী

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল) ]
কলকাতা-৭০০ ০০১

# ভূমিকা

বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর পশুপালন করলে বর্তমান অর্থনৈতিক যুগে ও অন্নসমস্যার দিনে প্রতি মাসেই একটা মোটা অঙ্কের টাকা লাভ করা যায়। পশুদের মধ্যে সব থেকে মূল্যবান গরু ও মোষ। কয়েকটা গরু এবং মোষ একটু ভালভাবে লালন-পালন করলে একটা মাঝারি পরিবারের সংসারে কোন অভাব থাকে না। তবে পশুপালন শহরের থেকে গ্রামে বেশি লাভজনক হয়। কারণ গ্রাম্য অঞ্চলে পশু-পালনে ওদের খাবারের জন্য খরচটা অনেক কম হয়। পল্লী অঞ্চলে কৃষিকার্যের প্রধান সহায়ক গো-মহিষ। গো-মহিষাদির দুগ্ধ দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন ও শক্তি সংরক্ষণ হয়, তাছাড়া দুগ্ধজাত নানা পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য মানবজীবনের অপরিহার্য পদার্থ। গো-মহিষাদির মলমূত্র জমির প্রধান ও উৎকৃষ্ট সাররূপেও ব্যবহার করা হয়।

ছাগল, মেষ, শূকর চাষও বর্তমানে একটি মুখ্যতম আয়ের ব্যবসা। অল্পদিনেই এদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়। সেজন্য সামান্য অর্থ ব্যয়ে ছাগ, মেষ, শূকর চাষ করা সকলের পক্ষে বিহিত। বর্তমান বাজারে মাংসের প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে, মাংসের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কারণে প্রতি গৃহস্থ যদি ২।৪টি করে এই সকল জীব চাষ করেন তাহলে এই অর্থ সঙ্কটের দিনে গৃহস্থ পরিবারের আর্থিক সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হবে আশা করা যায়।

অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি প্রাণীর দ্বারা মানবের কম উপকার হয় না। মৃত হস্তীর অস্থি, দন্ত, চর্মাদি বহু মূল্যবান সামগ্রী।

এই সকল মহোপকারী জীব পোষণ দ্বারা মানবের যেমন নানাবিধ সমস্যার সমাধান হবে, তেমনি এই সকল জীবের রক্ষণা-বেক্ষণের দিকেও প্রত্যেক গৃহস্থকেই সচেষ্ট ও যত্নবান হতে হবে। আজকাল বিভিন্ন রকম পাখী ও পায়রা পুষেও তার থেকে যথেষ্ট আয় করা যায়।

এই সকল জীবজন্তুর সেবা-যত্ন, আহার-বাসস্থান রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে চিত্র সহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রাণীর রোগের লক্ষণ, ওষুধ নিরূপণ, পথ্য ব্যবস্থা ও শুশ্রূষার বিষয় বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে।

এখন এই বইখানি দ্বারা যদি গৃহস্থগণ পশু-পক্ষী পালনে ও সংরক্ষণে উপকৃত হন, তবেই শ্রম সার্থক।

গ্রন্থকার

# সূচীপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|

সূচীপত্র সমাপ্ত

# গরু

## গো-জাতির প্রয়োজনীয়তা

সভ্যতার আদিমযুগ হতে গো-জাতি মানুষের কাছে অপরিহার্য বলে গণ্য হয়েছে। গরু বা বিশেষ করে গাভীকে প্রাচীনকালে এক বিশেষ সম্পদ আখ্যা দেওয়া হোত।

গৃহস্থের এই অত্যাবশ্যকীয় জীবটি কেবল যে হিন্দুদের কাছেই পূজিত, তাহা নহে, প্রাচীন মিশরেও গরু সমান শ্রদ্ধার আসন পেয়েছে। বলা বাহুল্য পৃথিবীর সমস্ত দেশই গরুকে কমবেশী আদর যত্ন করে। এবিষয়ে হিন্দুরাই গো-জাতি র প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল। হিন্দুদের এমন কোনও শুভকর্ম নেই, যাতে গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, ঘি, দধি প্রভৃতির আবশ্যক না হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাচীনকালেও গরু যেমন আবশ্যকীয় ছিল, আধুনিক যুগেও ঠিক তেমনি রয়েছে। পূর্বে যজ্ঞাদি, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে গো দান করা হোত। আমাদের দেশে গাই গরুকে ভগবতী জ্ঞানে পূজা করা হোত। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যক্তিদের মতো আমরা গবাদি পশুর যত্ন নিই না। তাই গবাদি পশুকে যথাযথভাবে যত্ন না নেওয়ার ফলে—গবাদি পশুপালন ও পোষণের দ্বারা আমরা লাভজনক অবস্থায় পৌঁছতে পারি না।

গবাদি পশু শুধু অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই নয়—স্বাস্থ্য রক্ষাব প্রয়োজনেও পালন ও পোষণ দরকার। দুগ্ধের মধ্যে যথেষ্ট প্রোটিন রয়েছে। তাছাড়া দুগ্ধজাত খাদ্যাদি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। আজকাল নানা রকমের রাসায়নিক সারের প্রচলন হয়েছে—তবুও গ্রামাঞ্চলে গোবর-সার এখনও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

তাছাড়া গবাদি পশুর চামড়া, হাড়, শিং এবং খুর দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যে সকল দেশ চামড়া রপ্তানি করে ভারতের স্থান সেই সকল রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা কম নয়—-কিন্তু সাধারণ যত্নের অভাবে—পাশ্চাত্য দেশীয় গাইয়ের তুলনায় আমাদের দেশের গাই অনেক দুধ কম দেয়, এবং আমাদের দেশে গরুর আয়ুও অপেক্ষাকৃত কম। আমাদের দেশে বলদ গরু অপেক্ষাকৃত কম বলশালী হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ এখনো অশিক্ষিত তথা কুসংস্কারযুক্ত হওয়ায় আমাদের দেশের গবাদি পশুর সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া হয় না। ফলে আমাদের দেশের গো সম্পদকে আমরা যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারি না।

এতদ্ব্যতীত গো-দেহে গোরোচনা নামক একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য পদার্থ জন্মে। ইহা খুবই মূল্যবান এবং এর দ্বারা প্রস্তুত ওষুধও অত্যন্ত মহার্ঘ। গোমূত্র সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে লেখা আছে যে ইহা চক্ষুরোগ, মূত্রকোষ রোগ, গুল্ম, বস্তিশূল, বাত, শ্বাস, কৃমি, শোথ, যক্ষ্মা, কণ্ডু, উদরাময়, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্লীহা, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। এইজন্যই গরুকে বলা হয়েছে গোধন।

ভারতের গবাদি পশুগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা—

(১) গরু ও (২) মহিষ বা মোষ।

গবাদি পশুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব তাদের দুগ্ধ ও কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন হয়ে থাকে। বলদ গরু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কৃষির কাজে লাগানো হয়—অর্থাৎ হাল চাষের কাজে লাগানো হয়ে থাকে। তাছাড়াও বলদ গরুকে মাঠের কাজে, গাড়ী টানার কাজে লাগানো হয়ে থাকে। যদিও কৃষিকাজে বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রচলন হয়েছে; তবুও সেই সকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখনও বিশেষ সীমিত। ব্যাপকভাবে হালচাষের জন্য এখনও বলদ গরুকেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

তাছাড়াও আমাদের কৃষিকার্যের যে ধরন—তাতে গ্রামের লোককে বছরের সব সময়ই কৃষিকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় না। অতএব গো-সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে অবসর সময়ে গ্রামের কৃষকগণ তাদের অর্থনৈতিক মানদণ্ডকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পাবেন।

দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি নিরামিষহারীগণের খাদ্য-তালিকায় একমাত্র 'animal proteins'— যে প্রোটিন আমাদের শরীর গঠনে অত্যন্ত প্রয়োজন। দেহের বল বৃদ্ধিতে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখতে, স্মৃতিশক্তি বাড়াতে গরুর দুধের মত আর কিছুই নেই। আর সেই দুগ্ধ হতে সে সুস্বাদু, উপাদেয় ও বলবর্ধক খাদ্য প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ অন্য কোন দ্রব্য হতে হয় না। এমন কি, গোময় দ্বারা প্রস্তুত ঘুঁটের ছাই পর্যন্ত নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

তাছাড়া বলদ গরু চালিত ঘানি বা কুটির শিল্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট্‌ সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে রয়েছে—বছরে কোটি কোটি টাকা সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট থেকে আয় হয়। এবং কৃষিকার্যে যে বলদ গরু কাজ কবে তার মূল্যায়ন করতে হলে—শ্রমমূল্য হিসাবে বেশ কয়েক কোটি টাকা দাঁড়ায়।

## গরুর শরীরের বিভিন্ন অংশ

গো-পালন, পোষণ তথা চিকিৎসা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গরুর শরীরের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান তথা পরিচয় লাভ করা একান্ত দরকার।
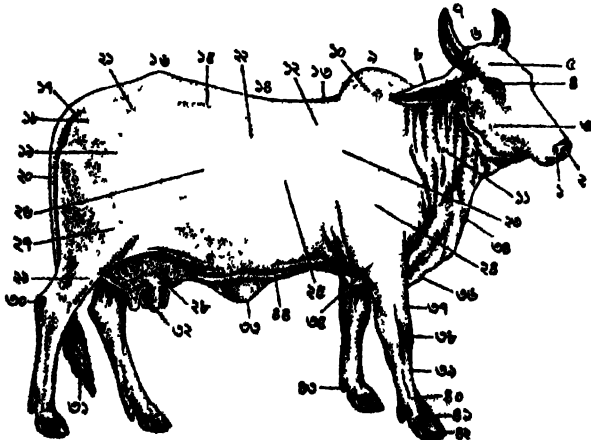
গাভীব শরীবের বিভিন্ন অংশ

১। নাসারন্ধ্র (Nostril)

২। নিবারক মুখবন্ধনী বা থুতনী (Muzzle)

৩। চোয়াল (Jaw)
৪। চোখ (Eye)
৫। কপাল (Forehead)
৬। মস্তকের উপরিভাগ (Poll)
৭। শিং (Horn)
৮। কান (Ear)
৯। কুঁজ বা কুঁদ (Hump)
১০। স্কন্ধের উপরিভাগ (Withers)
১১। ঘাড় (Neck)
১২। গলস্থলী (Crops)
১৩। মেরুদণ্ড (Chine)
১৪। পিঠ (Back)
১৫। কোমর (Loin)
১৬। ক্রুপ (Croup)
১৭। লেজের গোড়া (Tail head)
১৮। বেষ্টক হাড় (Pin bone)
১৯। পাছা (Buttock)
২০। লেজ (Tail)
২১। কোমরের নিম্নভাগ (Hip)
২২। পিপা সদৃশ পবিমাণ (Barrel)
২৩। বুক (Chest)
২৪। কাঁধ (Shoulder)
২৫। পাঁজরাযুক্ত ঘের (Ribs)
২৬। পেটের পশ্চাতের পার্শ্ব (Flank)
২৭। উরু (Thigh)
২৮। দুগ্ধের বাঁট (Udders)
২৯। স্টিফল্ (Stifle)
৩০। পশ্চাতের পায়ের জোড় বা সন্ধি (Hock)
৩১। লেজের চুলের অংশ বা প্রান্তভাগ (Switch)
৩২। স্তনের বোঁটা (Teat)
৩৩। নাভির অংশ (Navel)
৩৪। গল-কম্বল (Dewlap)

৩৫। কনুই-সন্ধি (Point of elbow)
৩৬। বক্ষঃস্থল (Brisket)
৩৭। সম্মুখের পা (Foreleg)
৩৮। হাঁটু (Knee)
৩৯। ক্যানন (Cannon)
৪০। ক্ষুরের উপরকার লোমগুচ্ছ (Fetlock)
৪১। হাঁটুর পেছনের পায়ের উপরিভাগ (Pastern)
৪২। ক্ষুর (Hoof)
৪৩। ক্ষুরাংশের মধ্যবর্তী অংশ (Dew claws)
৪৪। স্তনবাহী নালী (Mammary veins)

যতই ভালো জাতের গরু হোক না কেন—নির্বাচনের সময় তার দৈহিক চেহারার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। অতএব দৈহিক চেহারার অঙ্গগত প্রতিটি খুঁটিনাটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক। অন্যান্য জাতের গরু নির্বাচনের ব্যাপারেও দৈহিক চেহারার উপর মোটামুটি গুরুত্ব আরোপের জন্যেই বলা হয়ঃ "আগে দর্শনধারী, পরে গুণ বিচারি।"

## বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় গরু

ভারতে সর্বমোট ২৬টি জাতের গরু পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। এই ২৬টি জাতের গরুকে আবার মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে; যথা—

**(১) কার্যশীল শ্রেণীর গরু (২) গো-শালা শ্রেণীর গরু (৩) বিবিধ উদ্দেশ্যপূরক গরু।**

১। **কার্যশীল শ্রেণীর গরু ঃ** অমৃতমহল শ্রেণীর গরু, নাগর শ্রেণীর গরু, হালিকর শ্রেণীর গরু, বাছৌর শ্রেণীর গরু, বারগুর শ্রেণীর গরু, ডাঙ্গু শ্রেণীর গরু, কঙ্গায়াম শ্রেণীর গরু, কেনকঠা বা কেমভৈর্য শ্রেণীর গরু, খেড়ীগড় শ্রেণীর গরু, খিলাড়ী শ্রেণীর গরু, মালবী শ্রেণীর গরু, নিমারী শ্রেণীর গরু, পনওয়ার শ্রেণীর গরু, শিরি শ্রেণীর গরু।

২। **গো-শালা শ্রেণীর গরু ঃ** পীর শ্রেণীর গরু, শহীওয়াল বা মন্টোগোমারী শ্রেণীর গরু, সিন্ধী শ্রেণীর গরু, দেওনী শ্রেণীর গরু।

৩। **বিভিন্ন উদ্দেশ্যপূরক গরু ঃ** হরিয়ানা জাতের গরু, ওঙ্গল বা নে[illegible] গরু, কংকারেজ জাতের গরু, গাওলালা জাতের গরু, কৃ[illegible] মেওয়াতী বা কোশী জাতের গরু, রাঠ জাতের গরু, থারপা[illegible]জাতের গরু।

উপরোক্ত এই ২৬টি জাতের গরুর সম্বন্ধে সংক্ষেপে [illegible] আলোচনা করা হলো।

# ১। কার্যশীল শ্রেণীর গরু
# (Draft Breeds)

এই ধরনের গরুর কাজকর্মের প্রয়োজনেই বিশেষ কদর। এই শ্রেণীর ষাঁড় বা বলদ অত্যন্ত কার্যক্ষম। কিন্তু এই শ্রেণীর গাভী দুধ দেয় কম। এই শ্রেণীর গরুর বিশেষত্ব এই যে—এদের দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত সামঞ্জস্য যুক্ত। এই ধরনের গরুর গলকম্বল ও চামড়া শিথিল নয়—শরীরের সঙ্গে **দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত।**

## (ক) অমৃতমহল (Amritmahal) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরু **মহীশূর** রাজ্যেই বিশেষ দৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর গরু যেমন তেজস্বী, তেমন কর্মক্ষম এবং এদের সহ্য শক্তিও অপরিসীম। এই শ্রেণীর ষাঁড় বা বলদ গরু—গাড়ী টানার পক্ষে অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন। কিন্তু এই শ্রেণীর গাভী দুধ কম দেয়।
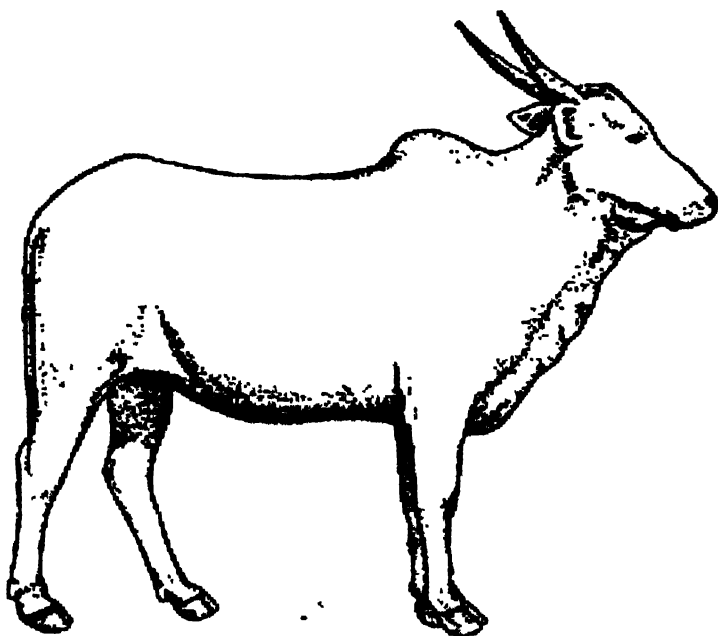
অমৃতমহল শ্রেণীর গাভী

এদের মাথা সরু ধরনের হ'লেও সুগঠিত। এদের চোখ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। এদের পা মধ্যম-দীর্ঘ এবং শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্য যুক্ত। এদের পায়ের ক্ষুর অত্যন্ত কঠিন, কালো এবং স্বল্প ব্যবধান যুক্ত। এদের দুধের বাঁট ক্ষুদ্র ধরনের এবং

অপেক্ষাকৃত শক্ত। এই ধরনের গরুর শরীর লম্বা হয়, নাভির অংশ শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই শ্রেণীর গরু সচরাচর **শ্বেতবর্ণের** এবং কখনও কখনও **ধূসর বর্ণযুক্ত** (Gray) পরিদৃষ্ট হয়।

## (খ) নাগর (Nagar) শ্রেণীর গরু

নাগর শ্রেণীর গরু **কার্যশীল** (Draft Breeds) গরুর পর্যায়ভুক্ত। রাজস্থানের নাগর এবং যোধপুর জেলাতেই এই শ্রেণীর গরু বিশেষ দৃষ্ট হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর

নাগব শ্রেণীব গাভী
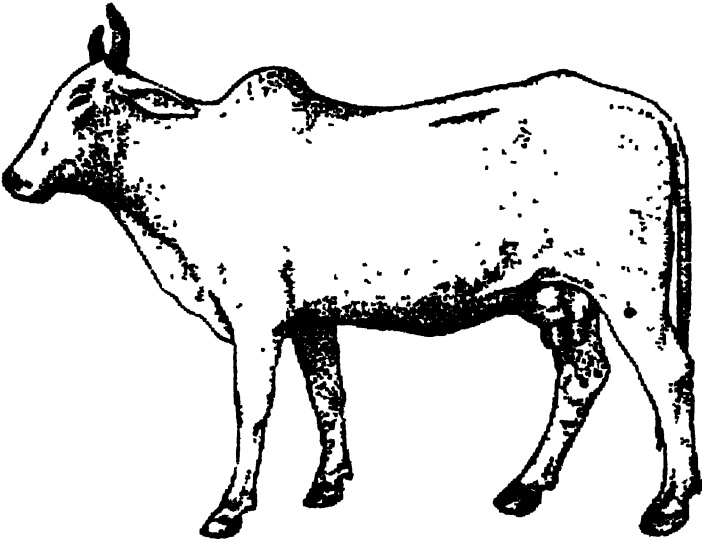
বলদ গরু (বা ষাঁড়) অত্যন্ত শক্তিশালী, কর্মঠ এবং **হাল চাষের** ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ (গভীর বালুকাময় জমিতেও হাল চাষে এরা দক্ষ হয়ে থাকে)।

কিন্তু এই শ্রেণীর গাভী ষাঁড় বা বলদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আকারে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে এবং দুধও **কম** দেয়।

এই শ্রেণীর গরুর বিশেষত্ব এই যে এদের মাথা আকারে ছোট, কপাল সমতল, শিংদ্বয় পুষ্ট এবং ওপর দিকে ভিতরে বা বাইরের দিকে **বাঁকযুক্ত** হয়ে থাকে, এদের শরীর লম্বা ধরনের এবং সুগঠিত, পাগুলো শক্তিশালী, গলকম্বল দৃঢ়, সংবদ্ধ লেজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হয়ে থাকে।

## (গ) হালিকর (Hallikar) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরু মহীশূর রাজ্যে হাসান ও তুমকুর এলাকায় বেশী দৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর গরু **দক্ষিণ ভারতীয়** গরুদের মধ্যে বিশেষ খ্যাত। এই শ্রেণীর বলদ গরু **মাঠের** কাজে এবং **পরিবহনের** কাজে বিশেষ উপযুক্ত।

হালিকর শ্রেণীর গাভী অন্যান্য কার্যশীল শ্রেণীর (Draft Breeds) গাভীদের মতই কম দুধ দেয়।
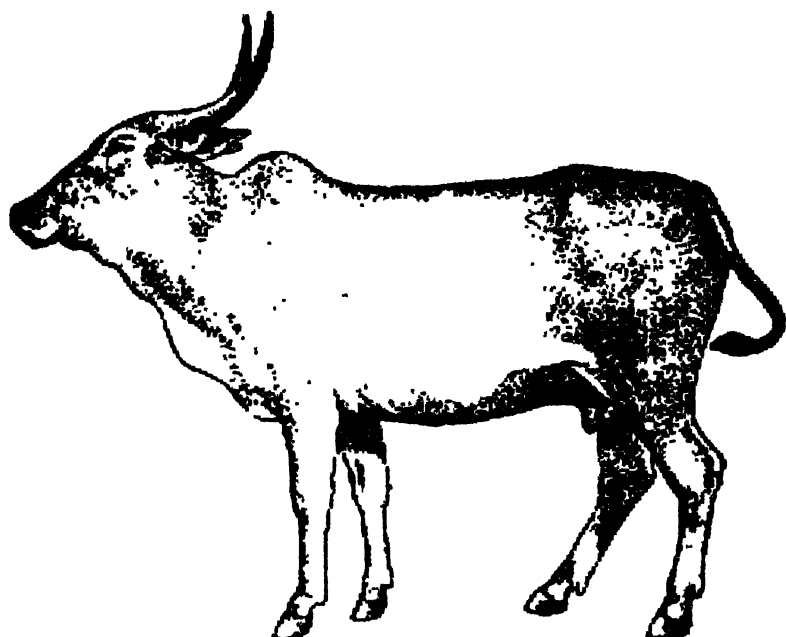
হালিকর শ্রেণীর গাভী

এই শ্রেণীর গরুর বিশেষত্ব এই যে—এদের মাথার আকৃতি লম্বা ধরনের কিন্তু কপাল স্ফীত হয়ে থাকে, মধ্যভাগ উন্নত। শিংদ্বয় প্রায় পাশাপাশি সংবদ্ধ— পশ্চাৎ ভাগে সুন্দরভাবে বাঁকাযুক্ত এবং শিংয়ের অগ্রভ গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। শরীর লম্বাটে, পাগুলো লম্বা ধরনের। লেজটি সরু এবং পাতলা। এই ধরনের গরু সচরাচর কালো বা ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে, কালো বা ধূসর বর্ণের চামড়ার ওপর মাঝে মাঝে সাদা ছোপ পরিদৃষ্ট হয়।

## (ঘ) বাছৌর (Bachaur) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরু কার্যশীল শ্রেণীর গরুর পর্যায়ভুক্ত। এই ধরনের মধ্যমাকৃতি সম্পন্ন কার্যশীল গরু বিহারের সীতামারী জেলায় বিশেষ ভাবে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। এরা স্বল্প খাদ্য বা খাদ্যাভাবজনিত সঙ্কটের মধ্য দিয়েও বেঁচে থাকে। এই শ্রেণীর বলদ গরু বিশেষ কার্যক্ষম হয়ে থাকে, এবং এই শ্রেণীর গাভীরা কম দুধ দেয়। খাওয়ার ব্যাপারে এই শ্রেণীর গরুর তেমন বাছ-বিচার নেই। এদের চেনার সহজ উপায় হলো এদের গলকম্বলটি পেণ্ডুলামের মতো দোদুল্যমান।

এই শ্রেণীর গরুর বিশেষত্ব এই যে—এই শ্রেণীর গরুর মাথা মধ্যমাকৃতিযুক্ত এবং ভারী ধরনের, এদের কপাল অত্যন্ত প্রশস্ত, কান-দ্বয় লম্বা এবং ঝুলে পড়ে,

বাছৌব শ্রেণীব গাভী (প্রশস্ত কপালটি লক্ষ্য করুন)

শিং দুটি মোটা ধরনের ভিতবের বা বাইরের দিকে ঈষৎ বাঁকযুক্ত, পাগুলো সুগঠিত এবং শক্তিশালী এবং ভাবী ধরনেব। ক্ষুদ্র ধবনেব লেজ—শেয প্রান্তটি ঘন কালো। এই শ্রেণীর গরু সচরাচর ধূসর বর্ণের হযে থাকে।

## (ঙ) বারগুর (Bargur) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরুও কার্যশীল (Draft Breeds) গরুব পর্যাযভুক্ত। তামিলনাডু রাজ্যের অন্তর্গত কোয়াম্বাটুর জেলায় বারগুর নামক পার্বত্য অঞ্চলেব গরুগুলিব চেহারা অনেকাংশে হালিকর শ্রেণীর গরুর ন্যায। এবা ক্ষুদ্রকায়, সুন্দব এবং অত্যন্ত তেজস্বী। এদের শিক্ষা দেওয়া (Train) বা ট্রেইন্ড্ করা বিশেষ কষ্টকর।

এরা দ্রুতগতির জন্য বিখ্যাত এবং অত্যন্ত সহ্যশক্তি সম্পন্ন।

**বারগুর শ্রেণীর গরুর বিশেষত্ব ঃ** এই শ্রেণীর গরুর মাথা লম্বা ধবনের হযে থাকে এবং কপাল ঈষৎ উন্নত হয়; চোখ দু'টি অত্যন্ত উজ্জ্বল, লম্বা এবং তীক্ষ্ণ ধরনের শিং। এদেব পাগুলো ক্ষুদ্রাকৃতি, ক্ষুর অত্যন্ত কঠিন। লেজ ক্ষুদ্র এবং পাতলা ধরনের। এই শ্রেণীর গরুর রং সচরাচর লাল, সাদা অথবা ফিকে ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে।

## (চ) ডাঙ্গী (Dangi) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরুও কার্যশীল (Draft Breeds) গরুর পর্যায়ভুক্ত। এই শ্রেণীর গরুকে পূর্বতন বরোদা এবং দঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত আহমেদনগর জেলার আকোলা

ডাঙ্গী শ্রেণীব গাভী
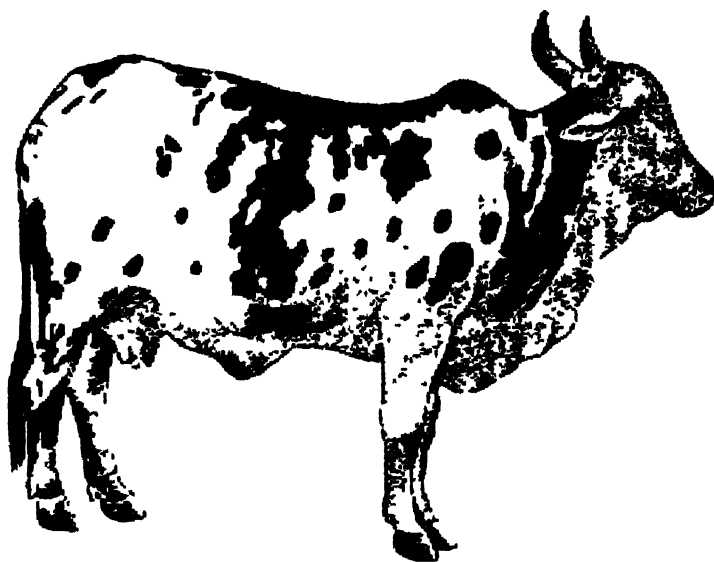
অঞ্চলে, নাসির ঘাট ও থানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং কোলাবা জেলাব গরু বলা হয়। এই ধবনেব গরু অত্যন্ত **কষ্টসহিষ্ণু**। যে সকল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়—সেই সকল অঞ্চলে কাজকর্মাদির জন্য এই শ্রেণীব গরু উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর বলদ গরু **ধান চাষের** পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এই শ্রেণীর গাভী অন্যান্য কার্যশীল গরুর ন্যায় **দুধ কম** দেয়।

[কার্যশীল শ্রেণীর গাভী মাত্রেই কম দুধ দিয়ে থাকে।]

**এই ধরনের গরুর বিশেষত্ব ঃ** এই শ্রেণীব গরুর মাথা **ক্ষুদ্র ধরনের** কিন্তু কপাল **স্ফীত** হয়ে থাকে, মুখ লম্বাটে। ক্ষুদ্র এবং ভারী ধরনের শিং; শরীর লম্বা ধরনের—কিন্তু সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ মজবুত ও সুগঠিত, ঈষৎ স্থূল। এই শ্রেণীর গরুর রং **লাল**, তামাটে বা সাদা-কালো মিশ্রিত হয়ে থাকে।

## (ছ) কঙ্গায়াম (Kangyam) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরুও কার্যশীল গরুর শ্রেণীভুক্ত। তামিলনাড়ু রাজ্যের কোয়াম্বাটুর জেলায় এই শ্রেণীর গরুর উৎপত্তিস্থল। এই শ্রেণীর বলদ গরু **অত্যন্ত শক্তিশালী** এবং চাষ-আবাদের কাজের জন্য বিশেষ উপযুক্ত বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীর গাভী স্বল্প দুধ দিয়ে থাকে।

এই শ্রেণীর গরুর মাথা ক্ষুদ্রাকৃতি এবং কপাল প্রশস্ত হয়ে থাকে। শিং বাইরের দিকে বাঁকযুক্ত হয়ে অনেকটা অর্ধ বৃত্তাকার সদৃশ মনে হয়। এদের Barrel-টি অপেক্ষাকৃত লম্বা হয়ে থাকে।
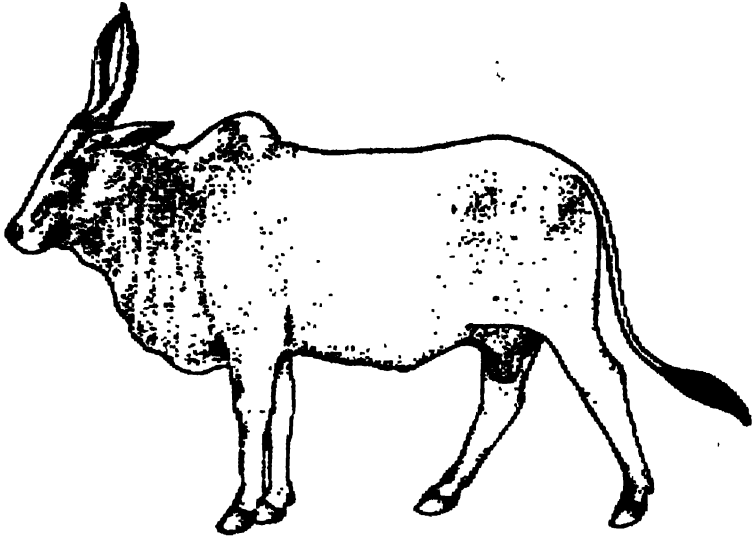
কঙ্গায়াম শ্রেণীর গাভী

পাগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি। সচরাচর এই শ্রেণীর গরুর লেজ লম্বা হয়।

এই শ্রেণীর গাভীর দুগ্ধস্থলী (Udders) মধ্যমাকৃতি হয়ে থাকে, বাঁটসমূহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ধরনের হয়ে থাকে।

এই শ্রেণীর গরুর রং সচরাচর সাদা বা ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে, হাঁটু এবং হাঁটুর উপরিভাগ কালো বর্ণের হয়।

জন্ম সময়ে এই শ্রেণীর গাভীর বাছুরের বর্ণ লাল হয়, পরে প্রায় চার মাস বয়ঃক্রমকালে লাল বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে সাদা রং প্রকাশ পায়।

## (জ) কেনকঠা বা কেমভৈর্য (Kenkatta) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরুও কার্যশীল গরুর (Draft Breeds) শ্রেণীভুক্ত। উত্তরপ্রদেশের কোন নদীর নিকটবর্তী তথা বুন্দেলখণ্ড এবং বান্দা অঞ্চলের গরু হিসাবে এই শ্রেণীর গরু পরিচিত।

পূর্বতন বিন্ধ্য প্রদেশের পানা, বিজয়গড় এবং চরকারী জেলাতেও এই শ্রেণীর গরু পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর বলদ গরু হাল্কা ধরনের কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হাল্কা ধরনের চাষের কাজ এবং স্বল্প ভারযুক্ত গাড়ী টানার কাজে এই শ্রেণীর বলদ গরু সচরাচর ব্যবহার হয়ে থাকে।

এই ধরনের গরুর প্রধান বিশেষত্ব—ক্ষুদ্রাকৃতিযুক্ত মাথা, প্রশস্ত কপাল, তীক্ষ্ণ শিং, সুগঠিত এবং ক্ষুদ্রকায় শরীর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিশেষ মজবুত। লেজটি
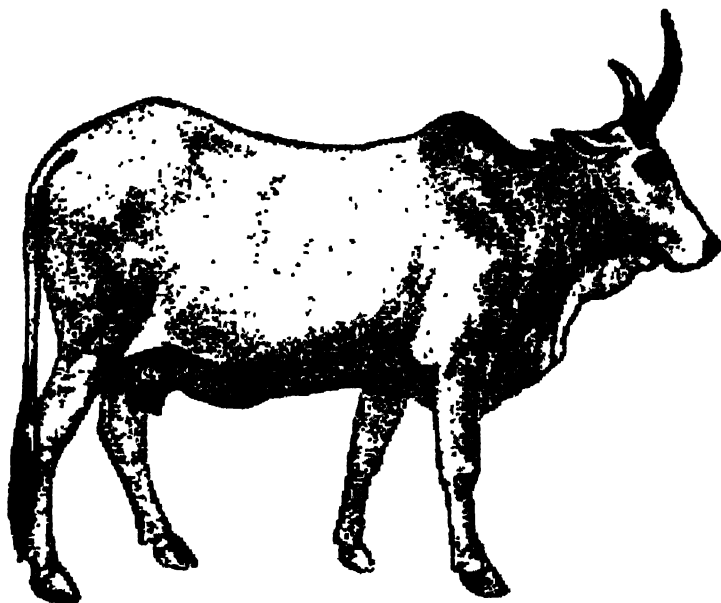
কেনকঠা বা কেমভৈর্য শ্রেণীব গাভী

অপেক্ষাকৃত লম্বা। অর্থাৎ শরীরটি লম্বা ধরনের না হ'লেও—এই শ্রেণীর গরুর লেজ অপেক্ষাকৃত লম্বা হয়ে থাকে।

এই শ্রেণীব গরু সচরাচর গাঢ় ধূসর বর্ণযুক্ত হয়ে থাকে।

## (ঝ) খেড়ীগড় (Kherigarh) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরুও কার্যশীল শ্রেণীর (Draft Breeds) গরুর পর্যায়ভুক্ত। উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরী জেলার গরু হিসাবে এই শ্রেণীর গরু পরিচিত। হাল্কা ধরনের কাজের জন্য এই শ্রেণীর বলদ গরু বিশেষ উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর গাভীও স্বল্প দুগ্ধবতী হয় অর্থাৎ কম দুধ দেয়।

**এই শ্রেণীর গরুর বিশেষত্ব ঃ** এদের মাথা মধ্যমাকৃতি, পাতলা এবং অত্যন্ত দীর্ঘ শিং, শরীরটি স্থূল ধরনের, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষাকৃত সরু, লেজটি লম্বা এবং পাতলা। এই শ্রেণীর গরুর রং সচরাচর সাদা হয়ে থাকে।

## (ঞ) খিলাড়ী (Khilari) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরু কার্যশীল শ্রেণীর গরুর পর্যায়ভুক্ত।

এই শ্রেণীর গরু মুম্বাই অর্থাৎ মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুর, সাঁতারা জেলা তথা সাতপুরা উপত্যকার গরু হিসাবে বিশেষ পরিচিত।
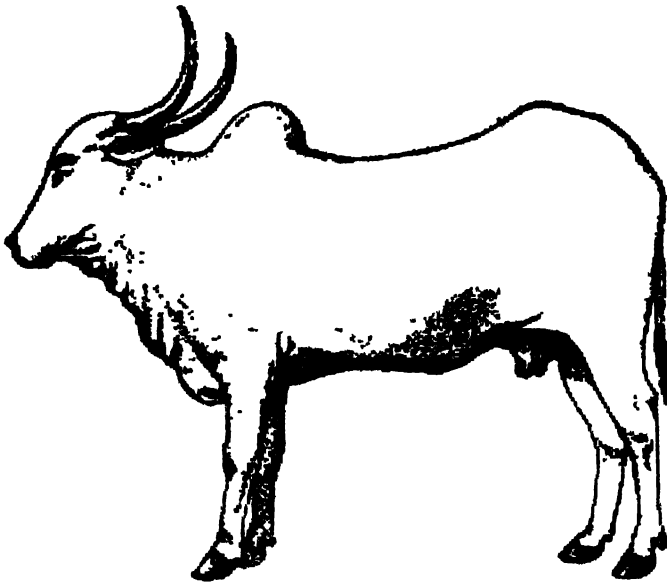
ক্ষুদ্র দুধেব বাঁটযুক্ত খিলাড়ী শ্রেণীব গাভী

এই শ্রেণীর গরুর আকৃতি অনেকাংশে অমৃতমহল শ্রেণীর গরুর ন্যায়—তবে এরা আকারে অপেক্ষাকৃত বড় এবং এদের কাঁধও স্থূল ধরনের হয়ে থাকে।

এই শ্রেণীর বলদ গরু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে এবং চাষের কাজেও বিশেষ দক্ষ।

কিন্তু খিলাড়ী শ্রেণীর গাভী ও অন্যান্য কার্যশীল শ্রেণীর গাভীব ন্যায় কম দুধ দিয়ে থাকে। এই শ্রেণীর গরুর মাথা বেশ সুপুষ্ট এবং কপালের মধ্য ভাগ বিশেষ উন্নত। শিংগুলো বেশ লম্বা ধরনের, এবং অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ। শরীরের গঠন লম্বা ধরনের এবং পাগুলো বিশেষ শক্তিশালী। কুঁদটা (Hump) ক্ষুদ্রাকার যুক্ত এবং লেজটি সরু বা পাতলা। দুগ্ধস্থলী এবং দুধের বাঁট ক্ষুদ্রাকায়। এই শ্রেণীর গরু সচরাচর ধূসর বর্ণযুক্ত সাদা বর্ণের হয়ে থাকে। খিলারী শ্রেণীর গরুর Barrel অপেক্ষাকৃত লম্বা হয় এবং পাগুলো মজবুত হয়ে থাকে।

## (ট) মালবী (Malvi) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরুও কার্যশীল গরুর শ্রেণীভুক্ত। মধ্যমাকৃতি যুক্ত এই ধরনের গরু পূর্বতন গোয়ালিয়র রাজ্যের অর্থাৎ বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের মালব উপত্যকার গরু হিসাবে পরিচিত।

মধ্য ভারতের ইন্দোর, ভূপাল এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলেও এই শ্রেণীর গরু অধিক সংখ্যায় পরিদৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর বলদ গরু কৃষ্ণ বর্ণ যুক্ত।
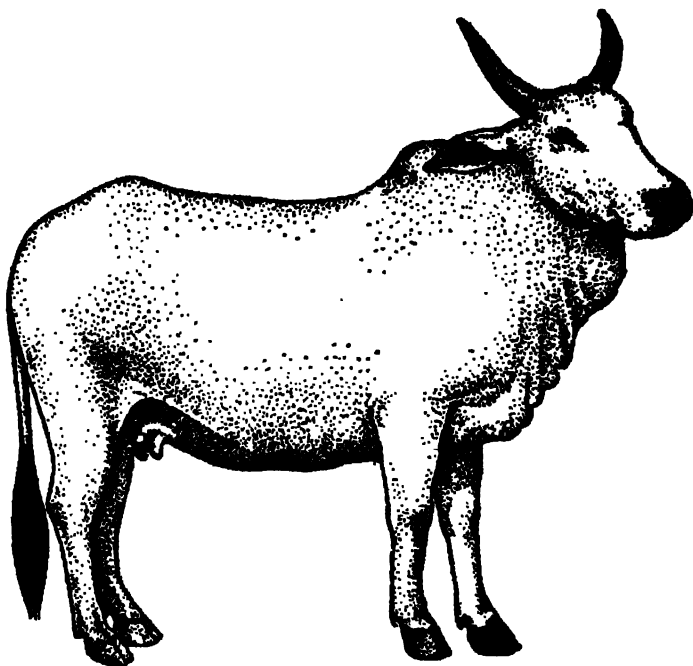
মালবী শ্রেণীর গাভী

মালবী শ্রেণীর গাভীও অন্যান্য কার্যশীল শ্রেণীর গরুর ন্যায় কম দুধ দেয়।

মালবী শ্রেণীর গরুর চেহারার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এদের মাথা ছোট, মুখের অগ্রভাগ ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট (Dished Fsces), শিংদ্বয় বাইরের দিকে এবং উর্ধ্বদিকে বাঁকানো, শরীর অপেক্ষাকৃত স্থূল হলেও সুগঠিত, পাগুলো ছোট ছোট হ'লেও বেশ মজবুত, লেজ এত লম্বা মনে হবে যেন পেছনের পায়ের ক্ষুরের কাছে পৌঁচেছে। এই শ্রেণীর গরুর রং ধূসর কিন্তু ঘাড়, কাঁধ এবং কুঁদ সচরাচর কালো বর্ণ যুক্ত দৃষ্ট হয়।

## (ঠ) নিমারী (Nimari) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরুও কার্যশীল গরুর শ্রেণীভুক্ত। নর্মদা নদীর উপত্যকার গরু হিসাবে এই শ্রেণীর গরু পরিচিত।

এই শ্রেণীর বলদ গরু গাড়ী টানার ব্যাপারে বা কৃষি কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত কর্মঠ। এই শ্রেণীর বলদ কঠোর পরিশ্রমী হিসাবে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই শ্রেণীর গাভী অন্যান্য কার্যশীল শ্রেণীর গাভীর ন্যায় কম দুধ দিয়ে থাকে।

এই শ্রেণীর গরুর মাথা লম্বা ধরনের হয়ে থাকে, কপাল স্ফীত, শিংটি মধ্যমাকার লম্বা উপরদিকে বাইরের দিকে এবং শেষ প্রান্তটি পশ্চাৎদিকে বাঁকানো।
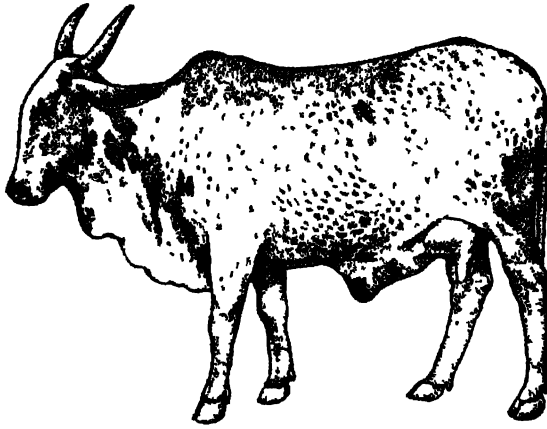
নিমাবী শ্রেণীর গাভী

এদেব শরীর লম্বাটে হ'লেও বিশেষ পবিপুষ্ট, গলকম্বল পেণ্ডুলামেব মতো দোদুল্যমান, এদের পাগুলো বেশ ছোট। এই শ্রেণীর গরুব বং মূলতঃ লাল হ'লেও শরীবের বিভিন্ন অংশে সাদা রংয়েব ছোপ ছড়িয়ে আছে—এরূপ দৃষ্ট হয়।

## (ড) পনওয়ার (Ponwar) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরুও কার্যশীল শ্রেণীব (Draft Breeds) পর্যায়ভুক্ত। উত্তর প্রদেশের পিল্‌বিট, লখিমপুর এবং খেবী জেলার গরু হিসাবে এই শ্রেণীর গরু বিশেষ পবিচিত।
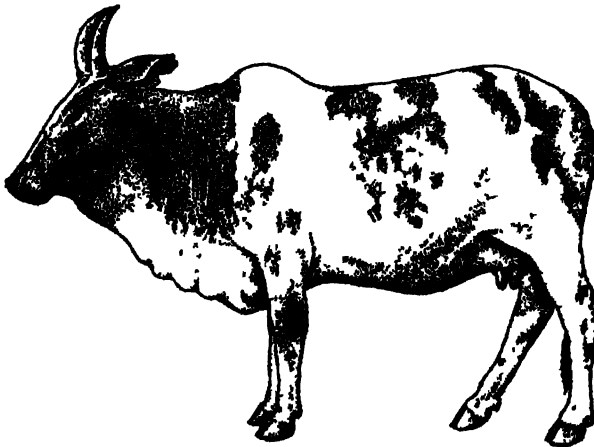
পনওয়ার শ্রেণীর গাভী

এই শ্রেণীর বলদ গরু কৃষিকাজ এবং গাড়ী টানার কাজে বিশেষ কর্মঠ। কিন্তু এই শ্রেণীর গাভী অন্যান্য কার্যশীল শ্রেণীর গাভীর ন্যায় কম দুধ দিয়ে থাকে।

এই শ্রেণীর গরুর মাথা অপেক্ষাকৃত মোটা (Coarse), মুখের দিকটা সরু, শিং লম্বা এবং তীক্ষ্ণ পশ্চাদ্ভাগের দিকে বাঁকানো, লম্বা এবং পুষ্ট শরীর, গলকম্বল দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ অর্থাৎ শিথিল নয়, পাগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, লেজ লম্বা। এই শ্রেণীর গরু সচরাচর সাদা-কালো বর্ণের হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর গাভীর Udders-টি সে রকম পুষ্ট নয়। এবং বাঁট (Teats)-গুলোও ক্ষুদ্র ধরনের।

## (ঢ) শিরি (Siri) শ্রেণীর গরু

এই শ্রেণীর গরুও কার্যশীল শ্রেণীর গরুর পর্যায়ভুক্ত। দার্জিলিং, সিকিম এবং ভূটানের পার্বত্য অঞ্চলের গরু হিসাবে এই শ্রেণীর গরু বিশেষ পরিচিত। অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টিপাত থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য এই শ্রেণীর গরুর চামড়া এবং চামড়ার উপরকার লোম ঘন এবং পুরু হয়ে থাকে।

এই শ্রেণীর বলদ গরু পার্বত্য-পথে গাড়ী টানার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর গরু সচরাচর সমতল এলাকায় বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

এই শ্রেণীর গরুর চেহারার বৈশিষ্ট্য ঃ এদের মাথা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কপাল সমতল (Flat), শিং তীক্ষ্ণ এবং উর্ধ্বভাগটি সামনের দিকে সামান্য নোয়ানো। এদের শরীর লম্বা হ'লেও পুষ্ট এবং মজবুত, পাগুলো ছোট বটে তবে বেশ শক্তিশালী, এদের লেজ ছোট। এই শ্রেণীর গরুর গায়ের রং সচরাচর সাদা-কালো বা সাদা-লাল হয়ে থাকে।

# ২। গো-শালা শ্রেণীর গরু
# (Dairy Breeds)
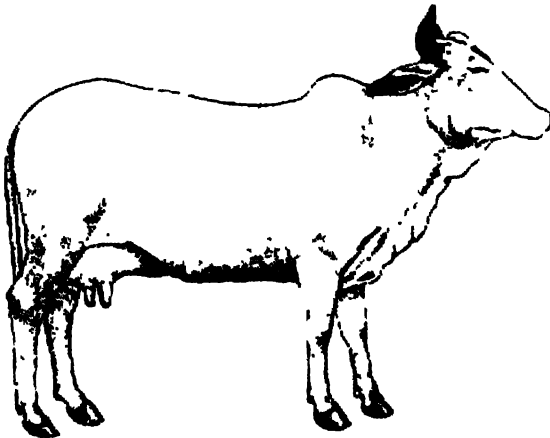
একটি পুরস্কার প্রাপ্ত গো-শালা শ্রেণীর গাভী

এই শ্রেণীর গাভী অত্যন্ত বেশী দুধ দিয়ে থাকে, কিন্তু এই শ্রেণীর বলদ গরু কার্যকর শ্রেণীর গরুর (Draft Breeds) ন্যায় তেমন কাজকর্ম করতে সক্ষম হয় না।

এই শ্রেণীর গরুর **গল-কম্বলটি** (Dew-lap) **অত্যন্ত ভারী**। এদের **চর্মাবরণটিও** (Sheaths) অত্যন্ত ভারী হলেও শিথিল বা থলথলে প্রকৃতি যুক্ত। এই শ্রেণীর গরুদের মধ্যে **গীর, শহীওয়াল** ও **সিন্ধী** শ্রেণীর গাভী ও ষাঁড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## (ক) গীর (Gir) শ্রেণীর গরু

মধ্যমাকৃতি সম্পন্ন এই গো-শালা শ্রেণীর গরু **জুনাগড়** এবং **কাথিয়াবাড়ের** গীর অরণ্যের গরু হিসাবে প্রসিদ্ধ। পশ্চিম রাজপুতানা, বরোদা এবং মহারাষ্ট্রের উত্তর অংশেও এই শ্রেণীর গরু পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর গাভী অনেক **বেশী দুধ** দিয়ে থাকে। **স্তন্যদান কালে (Lactation Period)** এই শ্রেণীর গাভী ৩০০ **দিনের** মধ্যে অন্তত ৯০০ **কিলোগ্রাম** দুধ দিয়ে থাকে। এই শ্রেণীর উত্তম গাভী **(Well-breed herds)** স্তন্য প্রদানকালে—কমপক্ষে ১,৬০০ **কিলোগ্রাম** দুধ দেয়।
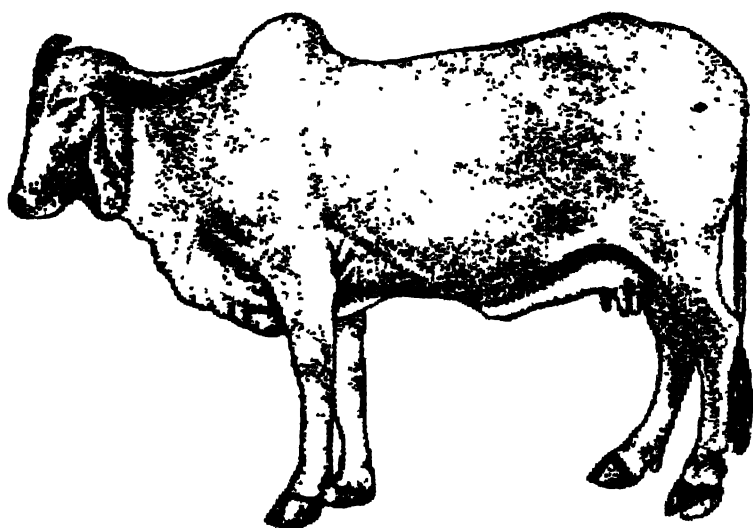
গীর শ্রেণীর গাভী

**এই শ্রেণীর গরুর চেহারার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ** এদের মস্তকভাগ পুষ্ট এবং **বিশেষ স্ফীত**। কিন্তু তুলনামূলকভাবে মুখটি সরু। লম্বা এবং ভারী ধরনের কান—দেখতে অনেকটা **কোঁকড়ানো পাতার মতো** এবং অগ্রভাগটি বিশেষভাবে **খাঁজ কাটা**। মধ্যমাকৃতি যুক্ত ভারী ধরনের শিং—পেছনদিকে **বিশেষ** বাঁকানো। এদের Barrel-টি লম্বা, গভীর এবং বিশেষ গোলাকার। পাগুলো শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত এবং **Squarely Placed**। সুস্থাপিত সাধারণ স্তনের বোঁটাযুক্ত দুটির বাঁট। গীর শ্রেণীর গরুর গায়ের রঙের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য রয়েছে—সচরাচর এই শ্রেণীর গরু **লাল**, লাল-কালো, লাল-সাদা অথবা **সাদা-লাল** ছোপযুক্ত হয়ে থাকে।

## (খ) শহীওয়াল বা মন্টোগোমারী শ্রেণীর গরু

শহীওয়াল শ্রেণীর গরুও গো-শালা শ্রেণীর (Dairy Breeds) গরু। মধ্যমাকৃতি যুক্ত এই শ্রেণীর গরু বিশেষ মাংসল হয়ে থাকে। পাকিস্তানের মধ্য এবং দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে মন্টোগোমারী জেলার গরু হিসাবে—এই শ্রেণীর গরু বিশেষ পরিচিত।
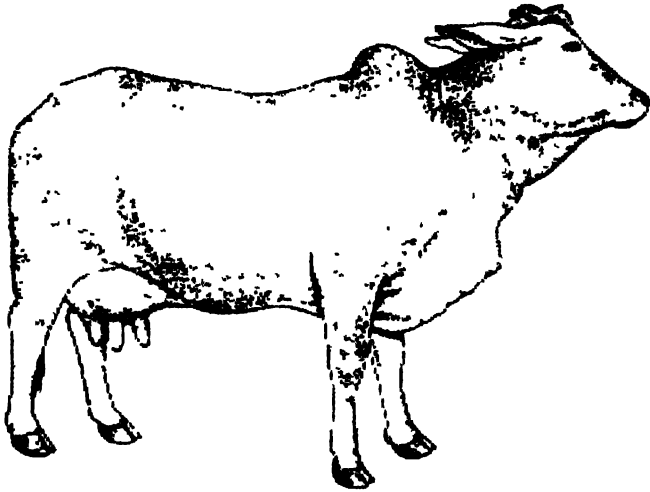
শহীওয়াল শ্রেণীর গাভী

তত্রস্থ রাভী (Ravi) নদীর অববাহিকা অঞ্চলেই—এই শ্রেণীর গরু বিশেষ দৃষ্ট হয়। পাঞ্জাব রাজ্যের বড় বড় শহরেও এই শ্রেণীর গরু বিশেষ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং দিল্লী অঞ্চলেও এই শ্রেণীর গরুর পালন, পোষণ তথা প্রজনন ব্যবস্থা রয়েছে। জলীয় আবহাওয়ার জন্য ভারতের সকল রাজ্যে এই শ্রেণীর গরু পালন ও পোষণের পক্ষে উপযুক্ত নয়। শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত স্থানই এই শ্রেণীর গরুর পালন তথা পোষণের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। এই শ্রেণীর বলদ গরু কাজকর্মের ব্যাপারে (গাড়ী টানা বা চাষের কাজে) তেমন দক্ষ নয়—বরং অলস ধরনের। কিন্তু এই শ্রেণীর গাভী বেশী দুধ দিয়ে থাকে।

এই শ্রেণীর গ্রাম্য সাধারণ গাভী স্তন্য প্রদানকালে ৩০০ দিনে গড়ে ১,২৫০ কিলোগ্রাম দুধ প্রদান করে। এই শ্রেণীর গাভীকে যদি উত্তমভাবে পালন-পোষণ করা যায়—তবে এই শ্রেণীর উন্নত ধরনের গাভী স্তন্য দানকালে গড়ে ২,৭০০ থেকে ৩,২০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ প্রদান করে থাকে। এই শ্রেণীর গাভীর স্তন্য প্রদানকালীন সর্বোচ্চ রেকর্ড ৪,৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত রয়েছে।

**এই শ্রেণীর গরুর চেহারার বিশেষ বৈশিষ্ট্য:** এই শ্রেণীর গরুর মাথা লম্বা ধরনের, কিন্তু কপালটি মধ্যমাকৃতি যুক্ত। এদের শিং ছোট এবং ভারী, পাশাপাশি সমান্তরাল অবস্থায় বিদ্যমান। এদের Barrelটি অনেকাংশে গোঁজের মতো

আকৃতিবিশিষ্ট। **নাভির কাছের** গাত্রচর্ম বিশেষভাবে শিথিল। পাগুলো ছোট ছোট। পিঠটি লম্বা ধরনের—কাঁধের উপরিভাগ এবং কোমরের উপরিভাগ বিশেষ উন্নত। দুধের বাঁটটি **বিশেষ পুষ্ট**, সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে, দুধের বোঁটাগুলো উত্তম আকৃতিযুক্ত। এই শ্রেণীর গরুর গায়ের চামড়া সচরাচর **ঘন লাল** বা **ফিকে লাল** বর্ণের হয়ে থাকে। কোন কোন গরুর গায়ে **সাদা ছোপ ছোপ** দাগও থাকে।

## (গ) সিন্ধী শ্রেণীর গরু (লাল সিন্ধী)

বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর গরু ও গো-শালা (Dairy Breeds) শ্রেণীর গরুর অন্তর্ভুক্ত।

এই শ্রেণীর গরুও মূলতঃ **পাকিস্তানে** সঞ্জাত। **করাচী** এবং করাচীর উত্তর-পশ্চিমে তথা **বেলুচিস্তানের** গরু হিসাবে—এই শ্রেণীর গরুর প্রথম পরিচিতি। **সিন্ধু উপত্যকা** অঞ্চলে এই শ্রেণীর গরু অধিক সংখ্যায় পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। মহীশূর, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, উড়িষ্যা এবং পাঞ্জাবেও এই শ্রেণীর গরুর পালন, পোষণ
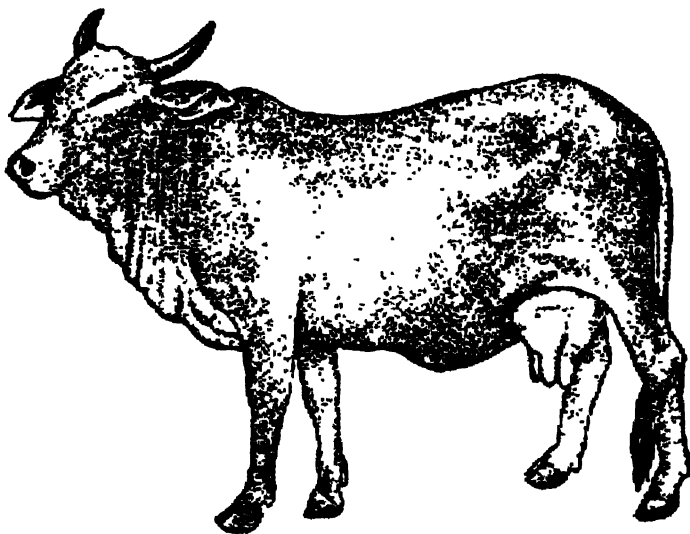
সিন্ধী শ্রেণীর গাভী (এদের বাঁটগুলো লক্ষ্য করুন)

তথা প্রজনন ব্যবস্থা রয়েছে। এই শ্রেণীর বলদ গরু অপেক্ষাকৃত **ক্ষুদ্র-আকৃতি যুক্ত**—এবং হাল্কা ধরনের কাজের উপযোগী। এই শ্রেণীর গাভীও **বেশী পরিমাণে** দুধ দিয়ে থাকে। এই শ্রেণীর গ্রাম্য সাধারণ গাভী স্তন্যদানকালে ৩০০ দিনে গড়ে **১,১০০** কিলোগ্রাম দুধ দিয়ে থাকে। আর এই শ্রেণীর উন্নত বা বিশেষভাবে পালিত গাভী গড়ে **১,৮০০ কিলোগ্রাম** দুধ দিয়ে থাকে। এই শ্রেণীর একটি উন্নত ধরনের গাভী স্তন্য দানকালে (Lactation period) **৫,৪০০ কিলোগ্রাম** দুধ দিয়েছে—এরূপ রেকর্ড রয়েছে।

**এই শ্রেণীর গরুর চেহারার বৈশিষ্ট্য ঃ** এই শ্রেণীর গরুর মাথাটি প্রমাণ সাইজের, কপালটি প্রশস্ত। শিং ছোট এবং ভারী, মাথার উপরিভাগে সামনের দিকে অথবা বাইরের দিকে বাঁক যুক্ত, শিংয়ের অগ্রভাগটি ভোঁতা ধরনের।

Barrelটি লম্বা, গভীর এবং অনেকাংশে গোঁজের মতো (Wedgeshaped)। পাগুলো ছোট ছোট, কিন্তু লেজটি লম্বা। দুধের বাঁটটি সাধারণ, বোঁটাসমূহ মধ্যমাকৃতি। এই শ্রেণীর গরুর গায়ের রং সচরাচর লাল বর্ণের হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে লাল রংয়ের ওপর সাদা ছোপ ছোপ দাগ পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

## (ঘ) দেওনী (Deoni) শ্রেণীর গরু

দেওনী শ্রেণীর গরুও গো-শালা শ্রেণীর গরুর পর্যায়ভুক্ত। এই শ্রেণীর গরু মূলতঃ অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে সঞ্জাত। এই ধরনের গরু অনেকাংশে গীর শ্রেণীর গরুর চেহারার সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত। এই শ্রেণীর গাভী সাধারণতঃ মধ্যমাকৃতির হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর গাভী স্তন্যদানকালে ৩০০ দিনে
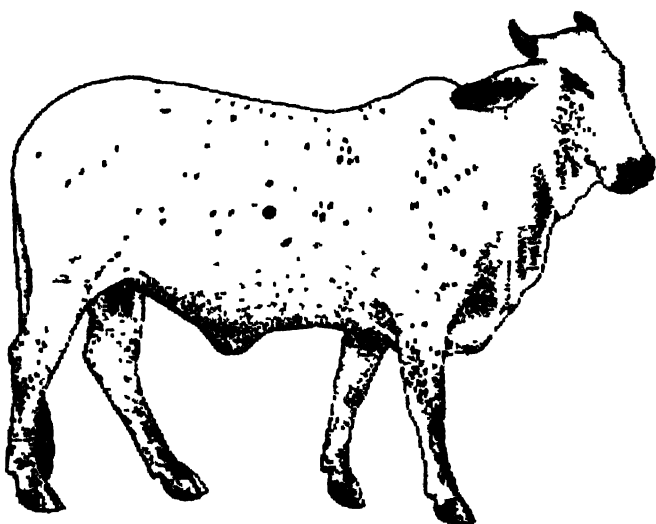
দেওনী শ্রেণীর গাভী

গড়ে ৭০০ কিলোগ্রাম দুধ দিয়ে থাকে। বিশেষভাবে পালিত এই শ্রেণীর গরু স্তন্যদানকালে (Lactation Period) ১,০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত গড়ে দুধ দিয়ে থাকে।

**এই শ্রেণীর গরুর চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ** এই শ্রেণীর গরুর মাথা মধ্যম আকারের, কপালের অংশ কিছুটা উন্নত বা পুষ্ট। কানদ্বয় মধ্যমাকৃতি যুক্ত এবং ভারী। শিং বেশ ভারী ধরনের বাইরের দিকে অথবা পেছনের দিকে বাঁক-যুক্ত। Barrel-টি অনেকাংশে গোঁজের মতো।

এই শ্রেণীর গরুর গায়ের রং নানা বর্ণের হতে পারে। সচরাচর এই শ্রেণীর গরু **সাদা-কালো** হয়ে থাকে। এবং এই শ্রেণীর সাদা-কালো বর্ণের গরুই **উত্তম** বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে এই শ্রেণীর গরুর গায়ের রং লাল-সাদাও হ'তে পারে। তবে সাধারণতঃ সাদা অংশের মধ্যে মধ্যে কালো কালো ছোপও যুক্ত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে পায়ের দিকের অংশে এই বিন্যাস বেশ স্পষ্ট হয়ে থাকে।

## ৩। বিবিধ উদ্দেশ্য-পূরক গরু

### গো-শালা তথা কার্যকর শ্রেণীর গরু

### (Dual Purpose Breeds of Cattle )

এই শ্রেণীর গরুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে—এই শ্রেণীর গরু গো-শালা তথা চাষের কাজে বা গাড়ী টানার কাজেও সম-উপযোগী। এই শ্রেণীর গাভী যেমন **বেশী পরিমাণে** দুধ দেয়, তেমনি এই শ্রেণীর বলদ **চাষের কাজে, গাড়ী টানার কাজে** বা অন্যান্য কাজের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয়ে থাকে। হরিয়ানা, জঙ্গল তথা কংকরেজ শ্রেণীর গরু এই শ্রেণীর।

### (ক) হরিয়ানা জাতের গরু

হরিয়ানা জাতের গরু **দ্বিবিধ কাজের** উপযুক্ত গরু হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মূলতঃ এই শ্রেণীর গরু **হরিয়ানার** রোটক, কর্ণাল, হিসার, ওরগাঁও প্রভৃতি
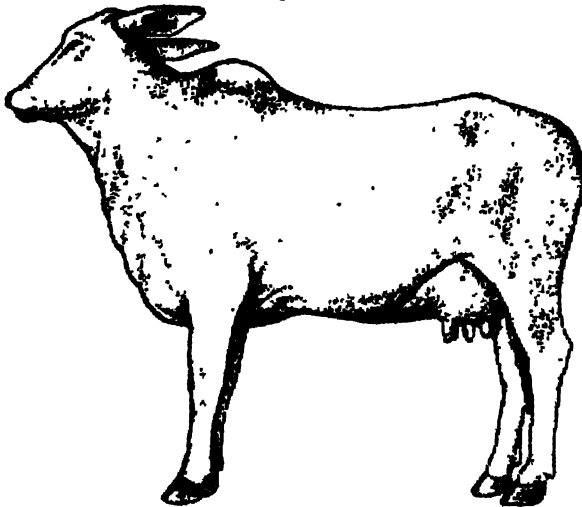
হরিয়ানা জাতের গাভী। (পুষ্ট দুধের বাঁট লক্ষ্য করুন)

অঞ্চল, তথা দিল্লী ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের সঞ্জাত গরু হিসাবে বিশেষ পরিচিত। এই শ্রেণীর বলদ **চাষের** কাজে তথা দ্রুত গাড়ী টানার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া এই শ্রেণীর গাভীও **বেশী পরিমাণে** দুধ দিয়ে থাকে।

**এই শ্রেণীর গরুর প্রধান শারীরিক বৈশিষ্ট্য**ঃ এই শ্রেণীর গরুর মাথা **ক্ষুদ্রাকৃতি**, মুখাংশটি সরু এবং লম্বা। শিংদ্বয় **ক্ষুদ্র** এবং অনেকাংশে **আড়াআড়িভাবে** যুক্ত, উপরের দিকে বাঁকযুক্ত। আর বলদ গরুর ক্ষেত্রে শিংদ্বয় উপরের দিকে বা ভিতরের দিকে বাঁকযুক্ত এবং **লম্বা** হয়ে থাকে। Barrel-টি লম্বা এবং সুগঠিত। পাগুলো শক্ত-সামর্থ্য এবং লম্বা। লেজ **ছোট** এবং **পাতলা** ধরনের।

এই শ্রেণীর গাভীর দুধের বাঁটগুলো **অত্যন্ত পরিপুষ্ট**, এবং বোঁটাগুলো বেশ স্পষ্ট এবং সুন্দর। এই শ্রেণীর গরুর গায়ের রং **সাদা** অথবা **ধূসর** বর্ণের হয়ে থাকে।

## (খ) ওঙ্গল (Ongole) বা নেলোর জাতের গরু

এই শ্রেণীর গরুও **উভয়বিধ** উদ্দেশ্য (Dual Purpose Breeds) হিসাবে বিশেষ উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

**অন্ধ্রপ্রদেশের** নেলোর এবং **গুন্টুর** জেলার গরু হিসাবে এই জাতের গরু বিশেষ পবিচিত। কৃষ্ণা এবং গোদাবরী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেও এই শ্রেণীর গরু বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। এই জাতের বলদ শক্তিশালী হয়। চাষের **কঠিন** কাজে এবং ভারী মালপত্র পরিবহনের কাজে বিশেষ উপযুক্ত বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে দ্রুতগতিতে কার্য সম্পাদন বা দ্রুত গতিতে গাড়ী টানাব ব্যাপারে—এই জাতের বলদ তেমন দক্ষ নয়। এই জাতের গাভী **প্রচুর** পরিমাণে দুধ দিয়ে থাকে।

**এই জাতের গরুর চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য**ঃ এই জাতের গরুর মাথাটি **মধ্যমাকৃতি** যুক্ত, কপালটি বিশেষ প্রশস্ত। শিংদ্বয় ছোট হ'লেও **মোটা**; বাইরের দিকে অথবা ভিতরের দিকে বাঁকযুক্ত। Barrel-টি **লম্বা** এবং গভীর। পাগুলো বেশ শক্তিশালী। লেজটি লম্বা এবং ক্রমশঃ **সরু ধরনের** (Tapering)। এই জাতের গরুর শিং সচরাচর **শিথিল ধরনের** হয়ে থাকে।

এই ধরনের গরুর দুধের বাঁটটি **মধ্যমাকৃতি যুক্ত** এবং দুধের বোঁটাসমূহ সু-সমঞ্জস। এই জাতের গরুর গায়ের রং সাদা বা **ধূসর** অথবা **সাদা-কালো অথবা ঘাড় অথবা কুঁদটি ঘন ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে**। বাছুরদের রং সাদা অথবা তামাটে ছোপযুক্ত সাদা দেখা যায়—তবে **ছ'মাস** পরে গায়ের রং সম্পূর্ণ সাদা হয়ে যায়।

## (গ) কংকারেজ জাতের গরু

বলা বাহুল্য এই জাতের গরুকেই Dual Purpose Breeds (গো-শালা তথা কার্যকর) আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই জাতের গরু যেমন পরিপুষ্ট—এদের শরীরও তেমন ভারী ধরনের। এই জাতের গরু বিশেষ শক্তিশালীও বটে। সম্ভবতঃ ভারতীয় গরুদের মধ্যে এই জাতের গরুই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। **কচ্ছের রণ** অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বে এবং পূর্বে দেশা'থেকে পূর্বতন রাধনপুর রাজ্যের পশ্চিমে এই জাতের গরু সঞ্জাত। এই জাতের বলদ যেমন কর্মঠ, তেমন শক্তিশালী, চাষের কাজে তথা দ্রুত পরিবহনের কাজে (গাড়ী টানা) বিশেষ উপযোগী।

এই জাতের গাভীও প্রচুর পরিমাণে দুধ দিয়ে থাকে।

**এই জাতের গরুর প্রধান শারীরিক বৈশিষ্ট্য :** এই জাতের গরুর মুখটি সরু ধরনের, কপালটি চওড়া, কিছুটা ডিশের আকার বিশিষ্ট; চোখগুলো বেশ বড় বড়
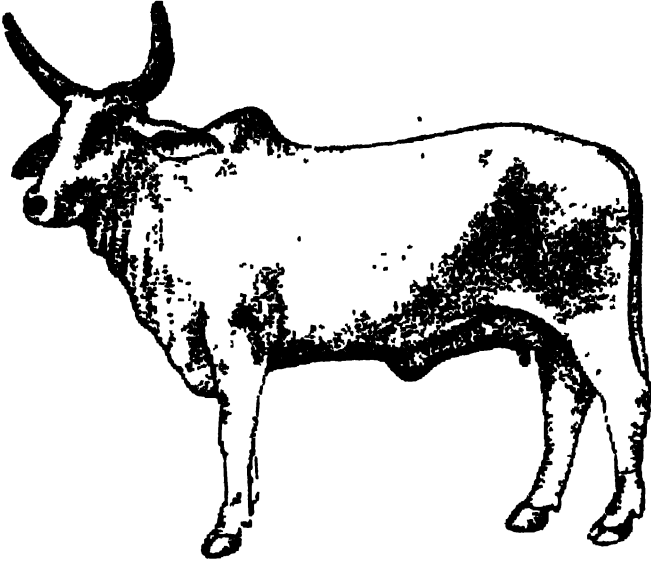
কংকাবেজ শ্রেণীব গাভী

এবং চোখের পাতার ওপরে ভাঁজ যুক্ত। ভারী ধরনেব সুসমঞ্জস শিংদ্বয—বাইবেব দিকে, ঊর্ধ্ব দিকে এবং ভিতর দিকে বাঁকযুক্ত শিংযেব প্রান্ত ভাগটি তীক্ষ্ণ এবং

কংকাবেজ জাতেব গাভীব মস্তকভাগ

পশ্চাৎ দিকে কিছুটা বাঁকযুক্ত। Bauel-টি লম্বা, গভীব এবং সুগঠিত। লম্বা এবং সোজা ধরনের পা, পায়ের ক্ষুর অত্যন্ত শক্ত। দুধের বাঁট মধ্যমাকৃতি এবং সু-গঠিত।

এই জাতের গরুর গায়ের রং সচরাচর রূপালী ধূসর বা লৌহ-ধূসর হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর স্ত্রী-জাতীয় গরু পুরুষ গরু অপেক্ষা পাতলা ধরনের হয়ে থাকে। লেজটি এত লম্বা, যেন পেছনের পায়ের ক্ষুর পর্যন্ত পৌঁছোয়। বাছুরদের মাথার উপরিভাগ বা শিংয়ের গোড়ার চার পাশটা লাল বর্ণের হয়ে থাকে—কিন্তু ছ'মাস বয়ঃক্রম কালে ঐ লালচে রং বিদূরিত হয়ে যায়।

## (ঘ) গাওলায়ো (Gaolao) জাতের গরু

এই জাতের গরু দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পূরক গরুর (Dual Purpose Breeds) পর্যায়ভুক্ত। মূলতঃ এই জাতের গরু মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা এবং চিন্দোয়ারা জেলায় সঞ্জাত।

**এই জাতের গরুর প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ** এই জাতের গরুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এদের মুখ লম্বা এবং সরু ধরনের। শিংদ্বয় মোটা, কানদ্বয় ছোট ছোট। এরা সাধারণতঃ লম্বা হয়ে থাকে এবং সরু দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ক্ষুদ্র এবং পুষ্ট। গাত্র-আবরক চর্ম মধ্যম ধরনের—শরীরের সঙ্গে বিশেষভাবে সংবদ্ধও নয়, আবার তেমন শিথিলও নয়। লেজ ছোট। এই জাতের গাভীর রং সচরাচর সাদা হয়ে থাকে। আর পুরুষ গরুর ঘাড় এবং কুঁদ (Hump) ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে।

## (ঙ) কৃষ্ণা উপত্যকার গরু

এই জাতের গরুও দ্বিবিধ উদ্দশ্য পূরক (Dual Purpose Breeds)। এই জাতের গরু পূর্বতন হায়দ্রাবাদ রাজ্যে, পূর্বতন বোম্বাই রাজ্যের দক্ষিণাংশে এবং বিশেষ করে কৃষ্ণা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে সঞ্জাত। শোলাপুর, মিরাজ, সংগলী, বেলগাঁও, সাঁতারা এবং ধরওয়ার জেলাতে এই জাতের গরু অধিক-সংখ্যক পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। কৃষ্ণমৃত্তিকা (Black Cotton Soil) অঞ্চলে কাজকর্মের জন্য এই জাতের বলদ গরু বিশেষ উপযুক্ত বা মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই জাতের গাভীও প্রচুর পরিমাণে দুধ দিয়ে থাকে।

**এই জাতের গরুর শরীরের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ** এই জাতের গরুর মাথা ছোট, কপাল আকারে ছোট হ'লেও চওড়া; ছোট এবং স্থূল ধরনের শিং উপরের দিকে এবং বাইবের দিকে বাঁকযুক্ত। Barrelটি বেশ পুষ্ট এবং গভীর। পাগুলো ছোট ছোট হ'লেও মাংসল এবং বলিষ্ঠ ধরনের। লেজ বেশ লম্বা—পিছনের পায়ের ক্ষুরের উপরিভাগে গিয়ে প্রায় স্পর্শ করে।

এই জাতের গরুর গায়ের রং সচরাচর ধূসর সাদা বর্ণের হয়ে থাকে। এই জাতের পুং-শ্রেণীর গরুদের সম্মুখভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগ কালচে বা কালো বর্ণের হয়ে থাকে।

## (চ) মেওয়াতী বা কোশী জাতের গরু

বলা বাহুল্য, এই জাতের গরুও দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পূরক (Dual Purpose Breeds)। পূর্বতন ভরতপুর এবং আলওয়ার রাজ্য এবং মথুরার কোশী অঞ্চলের

গরু হিসাবে এই জাতের গরু বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই জাতের বলদ গরু আকারে ছোট হ'লেও চাষের কাজে তথা গাড়ী টানার কাজে **বিশেষ** উপযুক্ত।
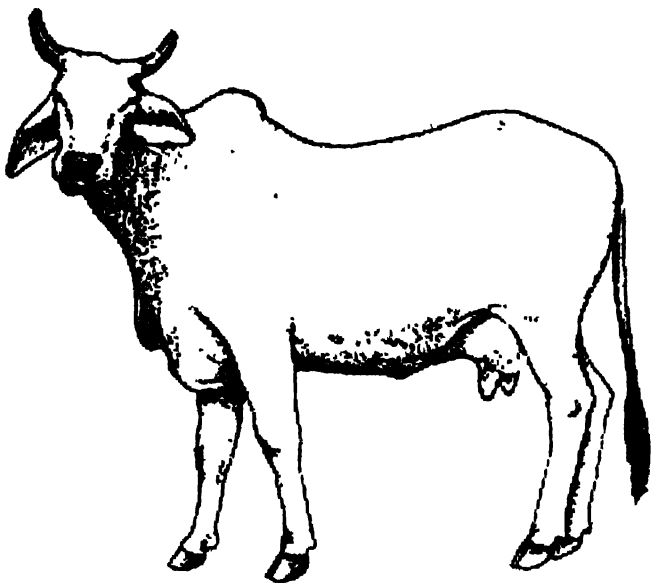
মেওয়াতী বা কোশী শ্রেণীর গাভী

এই জাতের গাভীরাও **প্রচুর পরিমাণে** দুধ দিয়ে থাকে।

**এই জাতের গরুর চেহারার বৈশিষ্ট্য ঃ** এই জাতের গরুর মাথা **মধ্যমাকৃতিযুক্ত,** কপালটি **স্ফীত ধরনের.** শিং মোটা বাইরের দিকে, উপরের দিকে, ভিতরের দিকে এবং পিছনের দিকে বাঁক যুক্ত।

Barrel-টি লম্বা, পুষ্ট এবং গভীর ধরনের। পাগুলো সুন্দর এবং ছোট আকারের। দুধের বোঁটা **মধ্যমাকারের;** লেজ **বেশ লম্বা।** সচরাচর এই জাতের গরু সাদা বর্ণের হয়ে থাকে—তবে মাথা, ঘাড়, কাঁধ **কালো** হ'তে পারে।

## (ছ) রাঠ (Ratth) জাতের গরু

এই জাতের গরুও দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পূরক অর্থাৎ গো-শালা তথা কার্যকর শ্রেণীর গরুর পর্যায়ভুক্ত। **রাজস্থানের** অন্তর্গত আলোয়ারের উত্তরে এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গরু হিসাবে এই শ্রেণীর গরু বিশেষ পরিচিত। এই জাতের গরু তেমন **বড় নয়,** এবং পালন ও পোষণের ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে কম। এই জাতের বলদ গরুর দেহ সুগঠিত এবং বলদ গরুগুলো অত্যন্ত কর্মঠ হয়ে থাকে।

এই জাতের গাভীরাও **প্রচুর পরিমাণে** দুধ দিয়ে থাকে।

**এই জাতের গরুর শারীরিক বৈশিষ্ট্য ঃ** এই জাতের গরুর কপাল **সমতল ধরনের (Flat)**। ছোট আকারের শিং, শিংয়ের শেষ প্রান্তটি অর্থাৎ অগ্রভাগ ভিতরের

দিকে বাঁকযুক্ত। প্রমাণ আকারের লম্বাটে ধরনের শরীর—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ছোট ধরনের হ'লেও বেশ বলিষ্ঠ।
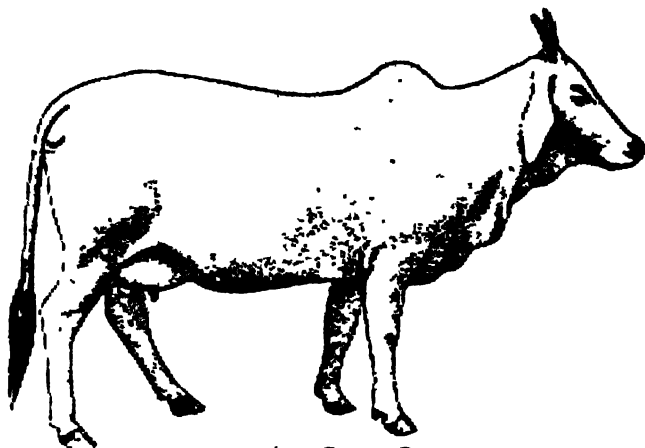
রাঠ শ্রেণীব গাভী

নাভির অংশটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং শরীরের সঙ্গে বিশেষভাবে সংবদ্ধ। লেজ বেশ লম্বা। এদের গায়ের রং সচরাচর সাদা অথবা ধূসর হয়ে থাকে।

## (জ) থারপার কার (Tharpar Kar) জাতের গরু

এই জাতের গরু মধ্যমাকৃতি এবং দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পূরক (Dual Purpose Breeds)। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় মরুভূমি অঞ্চল তথা শুষ্ক থারপার কার অঞ্চলের গরু হিসাবে বিশেষ পরিচিত।
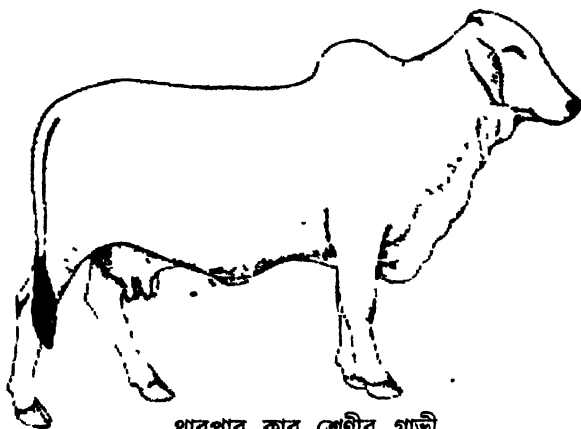
থারপার কার শ্রেণীর গাভী

বর্তমানে এই জাতের গরু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে যোধপুর, এবং জয়সলমীর অঞ্চলে লালিত-পালিত হচ্ছে।

এই জাতের গাভী **প্রচুর পরিমাণে** দুধ দিয়ে থাকে।

এই জাতের বলদ চাষের কাজে অথবা গাড়ী টানার কাজে **বিশেষ উপযুক্ত** বিবেচিত হয়ে থাকে।

**এই জাতের গরুর চেহারার বৈশিষ্ট্য ঃ** এই জাতের গরুব মাথাটি **মধ্যমাকারের** হ'লেও—**কপাল বেশ চওড়া** ধরনের। শিংদ্বয় সুগঠিত এবং গোড়া থেকেই বাইরের দিকে **বাঁকযুক্ত**। শিংদ্বয় মাঝারি ধরনেব, গোড়াব দিকে বেশ মোটা, এবং **অগ্রভাগটি ভোঁতা (Blunt)** ধবনেব। পাগুলো ছোট ছোট। লেজটি লম্বা হলেও **সরু** এবং **পাতলা**। দুধের বাঁট **বেশ** বড়, বোঁটাগুলো (Teats) বেশ পবিপুষ্ট। এই জাতের গরুর গায়ের রং সচরাচব **সাদা** বা **ধূসর** বর্ণেব হয়ে থাকে।

## ভারতে প্রতিপালিত বিভিন্ন শ্রেণীর বিদেশী গরু

ভারতে মোট ছ'রকম বিদেশী গরু প্রতিপালিত হয়। সেগুলি হল—**(১) জার্সি জাতের গরু (২) আয়ারসায়ার জাতের গরু (৩) হলস্টিন-ফ্রিশিয়ান জাতের গরু (৪) ব্রাউন সুইশ জাতের গরু (৫) জারমান-ফ্রেকভিচ জাতের গরু (৬) গার্নসে জাতের গরু।**

### (১) জার্সি (Jersey) জাতের গরু

ইংলিশ চ্যানেলেব **জার্সি দ্বীপের** গরু হিসাবে এই জাতেব গরু সমগ্র বিশ্বে পবিচিত। জার্সি জাতেব গরুব রং বৈচিত্র্যপূর্ণ—**ফিকে লাল** থেকে **কালো** বর্ণেব
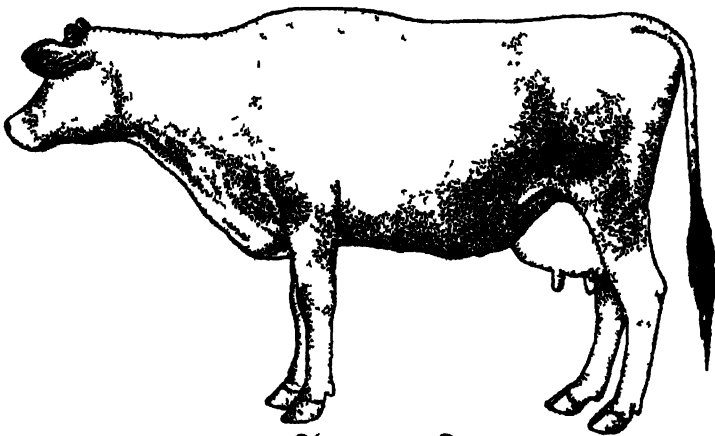
জার্সি জাতেব গাভী

এবং সারা গায়ে **সাদা** ছোপ ছোপ দাগযুক্ত। মুখ আববক পর্দা বা থুতনী সচবাচব **কালো** বর্ণের হয়ে থাকে এবং গোলাকৃতি শিং সদৃশ হয়ে থাকে।

এই জাতের গাভীর সর্বোচ্চ দুগ্ধ দানের রেকর্ড বছরে গড়ে **১১,৩৮১ কিলোগ্রাম**। এই জাতের গরু ভারতীয় গাভীর তুলনায় প্রায় **আড়াই গুণ** বেশী দুধ দিয়েছে—এমনতর বহু রেকর্ড রয়েছে।

এ বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিল তা নিচে তুলে দেওয়া হল—

| বর্ণসঙ্করতার পরিমাণ (Degree of Crossing) | স্তন্যদান কালের সংখ্যা (No. of Lactations) | দুগ্ধ প্রদানের গড় (কিলোগ্রাম) |
|---|---|---|
| সিন্ধী জাতের বংশধর গাভী | ২২৫ | ১,৩৮৮ |
| ১/২ জার্সী— ১/২ সিন্ধী | ১২৮ | ২,০৪৮ |
| ১/৪ জার্সী— ৩/৪ সিন্ধী | ১৪৮ | ১,৭৬৩ |

## (২) আয়ারসায়ার (Ayreshire) জাতের গরু

এই জাতের গরুর মূল জন্মস্থান স্কটল্যাণ্ডে। এই জাতের গরুর গায়ের রং সাদার ওপর লাল ছোপ দাগ অথবা লালের ওপর সাদা সাদা ছোপ ছোপ দাগযুক্ত
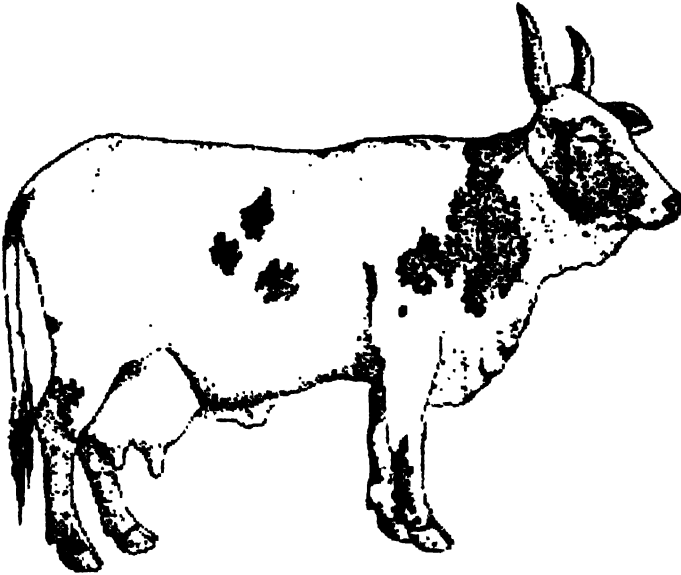
আধা আয়ারসায়ার আধা শহীওয়াল মিলনের ফলে সঞ্জাত গাভী

হয়ে থাকে। আয়ারসায়ার বংশজাত গাভী ডেয়ারীর পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত বিবেচিত হয়ে থাকে। এই জাতের গরু অত্যন্ত কর্মঠ—অনেক সময় এদের আয়ত্তে আনা কষ্টসাধ্য মনে হতে পারে।

## (৩) হলস্টিন-ফ্রিশিয়ান (Holstein-Friesian) জাতের গরু

হলস্টিন জাতের গরুর মূল জন্মস্থান হল্যাণ্ডে। হল্যাণ্ডে এই জাতের গরুকে ফ্রিশিয়ান আখ্যা দেওয়া হয়। এই জাতের গাভী প্রচুর পরিমাণে দুধ দিয়ে থাকে। হলস্টিন জাতের গরু সাদা-কালো হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সাদা গাত্রবর্ণের

ওপর সামান্য কালো ছোপ ছোপ্ (Spots) পরিলক্ষিত হ'তে পারে, অথবা কালো গায়ের রংয়ের সামান্য সাদা ছোপ্ ছোপ্ দাগ পরিলক্ষিত হ'তে পারে। কিন্তু লেজাগ্রের চুলের বর্ণ সর্বদা সাদাই হয়ে থাকে।

হলস্টিন জাতেব যাঁড

এই জাতীয় গরুকে দিনে তিনবার দোহন করা চলে, গড়ে ৩৬৫ দিনে ১৯,২৬২ কিলোগ্রাম দুধ দিয়েছে এরূপ রেকর্ড রয়েছে। এবং ঐ দুধ থেকে ৫৬০ কিলোগ্রাম মাখন উৎপন্ন হয়েছে।

## (৪) ব্রাউন সুইশ (Brown Swiss) জাতের গরু

এই জাতের গরু সুইজারল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। এই জাতের গরুর গায়ের রং মৃগশিশুর গায়ের রং সদৃশ (Light Fawn) থেকে শুরু করে কালো বর্ণেরও হ'তে পারে। এই জাতের গরুর নাক, লেজের অগ্রভাগ চুল এবং শিংদ্বয়ের অগ্রভাগের রং কালো হয়ে থাকে। এই জাতের গরু যেমন নানা কাজের উপযুক্ত এই জাতের গাভীও আবার প্রভূত পরিমাণে দুধ দিয়ে থাকে। তবে এদের শরীর গো-শালা শ্রেণীর অন্যান্য গরুর ন্যায় তেমন সুগঠিত নয়—কিন্তু এই জাতের গরু অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায় সহজেই বশে আনা যায়।

## (৫) জারমান-ফ্লেক্ভিচ (German–Fleckviech) জাতের গরু

এই জাতের গরু অধুনা পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতে আমদানী করা হয়েছে। এই জাতের গরু এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। ফ্লেক্ভিচ জাতের গরুর মূল জন্মস্থান হচ্ছে জার্মানীর দক্ষিণ তথা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে।

এই জাতের গরু পার্বত্য অঞ্চলে লালন-পালনের জন্য বিশেষ উপযুক্ত।

এই জাতের বলদ গরু যেমন পার্বত্য অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কাজের উপযুক্ত, তেমনি এই জাতের গাভীও প্রচুর পরিমাণে দুধ দিয়ে থাকে। ভারতে

আমদানীকৃত ফ্রেক্ভিচ ষাঁড়ের ঔরসজাত গাভী স্তন্যদানকালে (Lactation Period) **৩৬৫ দিনে** গড়ে ৪,০০০ **কিলোগ্রাম** দুধ দিয়েছে।

## (৬) গার্নসে (Gurnesy) জাতের গরু

এই জাতের গরুর মূল জন্মস্থান **ফরাসী দেশের** উপকূলবর্তী অঞ্চলের নিকটস্থ গার্নসে নামক দ্বীপে।

এই জাতের গরুর বর্ণ **ফিকে ফন্** (মৃগশিশুর বর্ণ) থেকে শুরু করে **লাল রংয়েরও** হতে পারে। মুখ, পা, লেজাগ্রভাগের চুল সচরাচর **সাদা** ছোপ দাগযুক্ত হয়ে থাকে। এই জাতের গরুর পাছার উপরিস্থিত অংশটি অন্যান্য বিদেশী গরুর তুলনায় কিছু অংশে **অসমতল** এবং কোমরটি অপেক্ষাকৃত **দুর্বল** হয়ে থাকে। এই জাতের গাভীর দুধের বাঁট জার্সি জাতের গাভীর **দুধের বাঁটের** মতো সামঞ্জস্যযুক্ত নয়। এই জাতের গাভীর মাথাটি **ডবল-ডিশের** আকৃতি বিশিষ্ট হ'লে—মুখভাগ জার্সী জাতের গাভীর মুখের চেয়ে **লম্বা**।

এই জাতের গাভী নার্ভাস ধরনের নয়—অথচ **শান্ত প্রকৃতি** বিশিষ্ট এই জাতের গাভী সদা সতর্ক। এদের সহজেই বাগ মানানো যায়। এই জাতের গাভীর দুধের বর্ণ **সোনালী**।

দুগ্ধ প্রদানের রেকর্ড— গড়ে **৩৬৫ দিনে** (দিনে **তিনবার** দোহন করে) **১২,৯৫৪ কিলোগ্রাম** দুধ পাওয়া গেছে।

## গো-শালার জন্য উপযুক্ত লাভজনক গরুর নির্বাচন

দুগ্ধের জন্য যাঁরা গাভী পালন ও পোষণ করেন—তাঁদের পক্ষে এক কেজি বা দু' কেজি দুধ দেয় এমন গাভী পালন করা অর্থনৈতিক দিক থেকে তেমন লাভজনক নয়। তাঁদের উত্তম জাতের গরু পালন করাই সঙ্গত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক।

### কোন্ গাভী বেশী দুধ দেবে?

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর এবিষয়টি **একান্তভাবে** নির্ভরশীল।

(ক) গাভীর জাত
(খ) গাভীর বংশধারা
(গ) দুগ্ধ প্রদানের রেকর্ড
(ঘ) গাভীর চেহারা
(ঙ) উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা

**(ক) গাভীর জাতঃ** ডেয়ারীর জন্য গো-শালা শ্রেণীর গাভী অথবা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধক গাভী পালন করা সঙ্গত। যাঁরা শুধুমাত্র ছোট পরিবারের দুধের যোগানের জন্য গাভী প্রতিপালন করেন অথবা দুধ বাইরে বিক্রী করতে চান না

অথবা অর্থনৈতিক দিক থেকে সঙ্গত—তাঁরা কার্যশীল শ্রেণীর গাভীও প্রলিপালন করতে পারেন। কারণ উত্তম জাতের গাভী লাভজনক হলেও প্রতিপালন করা ব্যয় সাপেক্ষ এবং বিশেষ যত্নেরও প্রয়োজন। কারণ উত্তম জাতের গাভীকে বাড়ীতে বা গো-শালায় রাখতে হবে। মাঠে চরতে দেওয়া বাঞ্জনীয় নয়। অতএব কে কোন্ জাতের গাভী পুষতে পারবেন—সেটা নির্ভর করে তাঁর আর্থিক সঙ্গতির উপর।

প্রত্যেক জাতের গরুর মধ্যেই উন্নত ধরনের ও মন্দ ধরনের গরু বিদ্যমান। অতএব ডেয়ারীর জন্য গাভী নির্বাচন অথবা প্রজনন ব্যবস্থার জন্য গাভী তথা ষাঁড় নির্বাচন সম্পর্কে নানা বিষয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

তাছাড়া উত্তম জাতের গরু বা গাভী হলেই চলবে না। সুষ্ঠ পরিচালন ব্যবস্থা তথা সেবা যত্নের জন্য উপযুক্ত লোক থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

**(খ) গাভীর বংশধারণ ঃ** উত্তম জাতের গাভী বা গরু হলেই চলবে না, ডেয়ারীর জন্য গাভী নির্বাচনের ব্যাপারে উত্তম বংশধারাও প্রয়োজন। কিন্তু বংশধারার রেকর্ড সকল ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। খুব কম ক্ষেত্রেই বংশধারার রেকর্ড পাওয়া সম্ভব।

যে সকল ক্ষেত্রে বংশধারার রেকর্ড পাওয়া সম্ভব নয়— সে সকল ক্ষেত্রে গাভীর চেহারা এবং কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করতে হবে। গাভীটি কতদুধ দিচ্ছে তাও দেখতে হবে।

**(গ) দুগ্ধ প্রদানের রেকর্ড ঃ** গাভীর এবং তার পূর্ববর্তী বংশধরগণের দুগ্ধ প্রদানের রেকর্ড অবশ্যই পর্যালোচনা করা সঙ্গত। গবেষণা করে দেখা গেছে—গীর, শহীওয়াল, সিন্ধী, দেওনী, গাওলায়ো, থারপার কার, হরিয়ানা, কংকারেজ, কঙ্গায়াম, ওঙ্গল প্রভৃতি জাতের গরুর প্রজননের মাধ্যমে উত্তম জাতের দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া সম্ভব।

**(ঘ) গাভীর চেহারা ঃ** গাভীর বাহ্যিক চেহারার ওপর দুগ্ধ প্রদানের ক্ষমতা অঙ্গাঙ্গীভাবে নির্ভরশীল। যে সকল গাভীর জাত বা বংশতালিকা জানা সম্ভব নয়—সে ক্ষেত্রে বাহ্যিক চেহারার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে পর্যালোচনা একান্ত আবশ্যাক। কারণ ঐ বাহ্যিক চেহারা দেখে তার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়বে।

**(ঙ) উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ঃ** গাভীর জন্য উপযুক্ত খাদ্য তথা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য। উপযুক্ত খাদ্য, বাসস্থান এবং যত্নের অভাবে উত্তম জাতের গাভীও অনেক ক্ষেত্রে তেমন দুধ দিতে সমর্থ হয় না।

## ১। চেহারার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

● গাভীটি দেখতে ভালো হওয়া প্রয়োজন। সুস্থ ও সবল হওয়া প্রয়োজন। দেহটি সামঞ্জস্য যুক্ত বা সুগঠিত হওয়া প্রয়োজন।

● হাঁটা-চলা সুন্দর ও সাবলীল হওয়া প্রয়োজন।

● জাত সম্বন্ধে মোটামুটি জানতে হলে—গাভীর গায়ের রং, আকার এবং শিংয়ের ধরন বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে।

**গাভীর মস্তক ঃ** মস্তকটি লম্বায় মধ্যম, সুগঠিত, মুখবন্ধনী বড় এবং চওড়া, নাসারন্ধ্রটি যুক্ত এবং বড়, চোয়ালটি শক্ত, উজ্জ্বল ও বড় বড় চোখ, দু' চোখের মাঝখানে কপালের অংশটি চওড়া বা সমগ্র কপালটি ডিসের মতো হওয়া বাঞ্ছনীয়, নাকের উপরিভাগ যতদূর সম্ভব সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কান দুটি মধ্যমাকৃতি তথা সতর্কভাবে আন্দোলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**স্কন্ধ ঃ** স্কন্ধের উপরিভাগ তথা বুকের সঙ্গে সামঞ্জস্য যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**পিঠ ঃ** সুগঠিত এবং মেরুদণ্ডটির সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**কোমর ঃ** চওড়া, পুষ্ট তথা প্রায় সমতল ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুগঠিত মস্তক, চওড়া থুতনী, তথা উন্মুক্ত

**নিতম্ব বা পাছা ঃ** লম্বা, চওড়া এবং কোমরের উপরিভাগ থেকে লেজের গোড়ার অংশ পর্যন্ত স্থানটি একটি সরল রেখা সদৃশ তথা সমতল ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**উরুসন্ধিঃ** চওড়া হবে, পিঠের সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থিত ও অতিরিক্ত টিসু বিবর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**আবেষ্টক হাড়ঃ** প্রশস্ত, ব্যবধান যুক্ত এবং উরু থেকে কিছুটা নিম্নে তথা সুগঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**লেজের গোড়া ঃ** আবেষ্টক হাড়ের কিছুটা ওপরে এবং আবেষ্টক হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে সু-সংস্থাপিত থাকা আবশ্যক।

**লেজ ঃ** লম্বা এবং গোড়া থেকে ক্রমশ সরু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**পা ঃ** পাগুলো ব্যবধানযুক্ত, সুগঠিত, বলশালী এবং বিশেষভাবে সামনের পা দুটি যতদূর সম্ভব সোজা ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**পায়ের পাতা ঃ** ছোট ধরনের এবং বিশেষভাবে গোলাকার তথা গোড়ালীটি গভীর পুষ্ট এবং পায়ের তলা সমতল হওয়া আবশ্যক।

## ২। ডেয়ারীর জন্য নির্বাচিত গাভীর বিষয়সমূহ

● সুস্থদেহ তথা স্তন্যদান কালেব বিচারসহ অন্য সময়ে অতিবিক্ত টিসু বা পেশী থেকে মুক্ত কি না।

● ঘাড লম্বা পাতলা কাঁধ এবং গলকম্বলেব সঙ্গে সামঞ্জস্য যুক্ত হওযা বাঞ্ছনীয। গলা ও গলকম্বল সুগঠিত হওযা বাঞ্ছনীয।

উত্তম দুধেব বাঁট তথা দুই উরুব ব্যবধান লক্ষণীয

দুধেব বাঁটটি দেখুন— সম্মুখভাগে প্রবর্ধিত

● কুঁদের নিম্নাংশ সুদৃশ্য গোঁজ সদৃশ এবং কাঁধের উপরাংশ অপেক্ষা কিছু উন্নত হওয়া আবশ্যক।

● পাঁজরার হাঁড়সমূহ বিশেষ ব্যবধানযুক্ত, সমতল ধরনের তথা লম্বা হওয়া আবশ্যক।

● কোমবের নিচ থেকে স্তনেব বাঁটের উপরের অংশ গভীর আর্চের মতো তথা সুগঠিত হওয়া আবশ্যক।

## ৩। শারীরিক ধারণ ক্ষমতা

● গাভীটি বৃহদাকাব যুক্ত, সতেজ, বলশালী তথা উত্তম পরিপাক যন্ত্র যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

● **ব্যারেল ঃ** গভীর, উত্তম, পাঁজরার হাড়সমূহ ব্যবধানযুক্ত এবং নিম্নাংশটি ক্রমশঃ প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক।

● **উরুদ্বয় ঃ** পার্শ্ব থেকে সমতল, কিন্তু পিছন থেকে দেখলে দুটি উরু বিশেষ ব্যবধানযুক্ত—অর্থাৎ দুধের বাঁটের অবস্থিতির জন্য দুই উরুর ব্যবধান বেশি হওয়া আবশ্যক।

● **গায়ের চামড়া ঃ** গাভীর গায়ের চামড়া মধ্যম ধরনের পুরু, শিথিল, আঁশযুক্ত তথা সূক্ষ্ম ও সুন্দর রোমযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## ৪। দুগ্ধ ধারণ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে গাভীর শারীরিক অবস্থা

● দুধের বাঁটটি বড় এবং সর্বতোভাবে উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

● দুধের বাঁটটি লম্বা, চওড়া এবং গভীর ও পুষ্ট হওয়া আবশ্যক।

● দুধের বাঁটের উপরকার আবরণী নরম, তথা ইলাস্টিকের মতো হওয়া বাঞ্ছনীয়।

● দুধের বোঁটা সামঞ্জস্যযুক্ত, প্রয়োজনীয লম্বা, নলের মতো আকার যুক্ত, সম্পূর্ণ সোজা থাকা বাঞ্ছনীয়।

স্তন্যবাহী শিরা বা শিরাসমূহ লম্বা, বাঁকানো ধরনের, স্পষ্ট দুধের বাঁটের ওপর অনেক শিরা-উপশিরা থাকা আবশ্যক।

## ডেয়ারী ফার্মের জন্য ষাঁড় নির্বাচন

বেশি দুধের জন্য যেমন গাভীর জাত, বংশ, দেহের গঠন ইত্যাদি ভালভাবে দেখে নিতে হয় তেমনি ডেয়ারী ফার্মের জন্য ষাঁড় নির্বাচন করবার আগে জাত, বংশধারা, চেহারার বৈশিষ্ট্য, শারীরিক ক্ষমতা ইত্যাদি জেনে নেওয়া দরকার। অবশ্য বর্তমানে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা চালু হবার ফলে বহু ডেয়ারী ফার্মে আলাদাভাবে (কেবল প্রজননের জন্য) ষাঁড় পালন করা হয় না বললেই চলে। তবে গ্রাম অঞ্চলে বহু গৃহস্থ পরিবারে যাঁরা গো-পালন করে থাকেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা খুব একটা পছন্দ করেন না। জাত ও বংশধারা বজায় রাখার জন্য গো-শালায় তাঁরা ষাঁড়-পালন করেন। গো-শালায় গাভীর প্রজননের জন্য যেমন চাহিদা মেটে তেমনি গ্রামের অন্যান্য গো-পালকরাও গাভী প্রজননের জন্য এ ষাঁড়কে কাজে লাগান।

ডেয়ারী ফার্ম অথবা গৃহস্থ বাড়ীতে গো-শালার জন্য প্রজননের ক্ষেত্রে চাহিদা মেটাতে যে ষাঁড় পালন করা হবে তার চেহারার মধ্যে একটা পৌরুষ ভাব রয়েছে। মাথাটা লম্বা ধরনের হবে। চোখ হবে তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল। পিঠের মেরুদণ্ড রেখাটি হবে যথাসম্ভব সরল ও সোজা। দেখতে বেঁটে ও সরু পা যুক্ত ষাঁড় কোন মতেই প্রজননের কাজে লাগানো উচিত নয়।

কুঁদটি স্পষ্ট এবং উরুদ্বয় বলিষ্ঠ হওয়া দরকার। লম্বাটে ষাঁড় এবং পাছার অংশ সমতল হবে। গায়ের চামড়া কোমল, সরস এবং শিথিল হওয়া দরকার। জননেন্দ্রিয়টি বড় এবং অণ্ডকোষটি আকারে স্বাভাবিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গৃহস্থ বাড়ী অথবা ডেয়ারী ফার্ম এই দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি জায়গায় প্রজননের জন্য ষাঁড় পালন করা হোক না কেন প্রতিদিন লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ষাঁড় স্থূলকায় না হয়ে পড়ে। সামনের পা-দুটির মধ্যে বিশেষ ব্যবধান থাকবে। 'নার্ভাস' ধরনের ও ভীরু প্রকৃতির ষাঁড় প্রজননের জন্য সর্বদা বর্জন করা দরকার।

## গরুর খাদ্য
## (Food Requirement of Stock)

যেসব জিনিস হলে দেহেব ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন, কর্মক্ষমতা সৃষ্টি এবং শৈশব ও বাল্যে দেহের বৃদ্ধি হয়, তার নাম খাদ্য।

### খাদ্যের উপাদান

সকল খাদ্যদ্রব্যের সব রকম গুণ থাকে না। কোন খাদ্যে ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি হয়, আবার কোন খাদ্যে কর্মশক্তি জন্মায়। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন গুণের উপাদান থাকার জন্য এইরকম হয়। খাদ্যের উপাদানগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—

**(১) প্রোটিন (Protein) বা আমিষ জাতীয় খাদ্য ঃ** মাংসপেশী গঠন ও দেহের ক্ষয়পূরণ করে দুধের ছানা, মাছ ও মাংস এই জাতীয় খাদ্য। তা ছাড়া ডাইল, খইল প্রভৃতির মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে।

**(২) কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates) বা শ্বেতসার জাতীয় উপাদান ঃ** দেহের কাজ করবার শক্তি জন্মায়। চাল, গম, ভুট্টা, গুড় প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্য।

**(৩) ফ্যাট (Fat) বা চর্বিজাতীয় খাদ্য ঃ** এটিরও কাজ কর্মক্ষমতা উৎপাদন। তেল, ঘি ও চর্বি এই জাতীয় খাদ্য।

**(৪) লবণ জাতীয় খাদ্য (Salts)**—আমরা যে লবণ খাই, তার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড (Sodium Cloride)। রক্ত ও পাচক রস প্রভৃতির মধ্যে লবণ আছে; এজন্য খাদ্যের মধ্যে লবণ থাকা দরকার। ক্যালসিয়াম (Calcium) লবণ দরকার হাড় ও দাঁত গঠনের জন্য। লৌহঘটিত লবণ দেহে রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।

**(৫) ভিটামিন (Vitamins) বা খাদ্যপ্রাণ ঃ** খাদ্যের মধ্যে এমন কয়েকটি উপাদান থাকে, যার অভাবে স্বাস্থ্যহানি হয়। এই উপাদানের নাম ভিটামিন।

**প্রধান ভিটামিন ছয়টি—**

**(ক) ভিটামিন-এ ঃ** দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি দান করে। ঘাসে ক্যারোটিন্ (carotene) আছে। এই ক্যারোটিন হতে দেহের মধ্যে ভিটামিন-এ উৎপন্ন হয়। কডলিভার ও হাঙ্গরের লিভারের তেলে (shark liver

oil) এই ভিটামিন খুব বেশি থাকে। খাদ্যে এই ভিটামিনের অভাব হলে বাছুরের দেহের বৃদ্ধি ভাল হয় না, চোখ দিয়ে জল পড়ে এবং রাতকানা রোগ হতে পারে।

**(খ) ভিটামিন-বি ঃ** নার্ভ ও হৃদ্‌পিণ্ডকে সবল করে। চালের ক্ষুদ, অঙ্কুরিত ছোলা প্রভৃতির মধ্যে এই ভিটামিন বেশি পাওয়া যায়। গরুর প্রথম পাকস্থলীর (rumen) মধ্যে জীবাণুর সাহায্যে ভুক্তখাদ্য হতে ভিটামিন-বি উৎপন্ন হয়। এজন্য গরুকে ভিটামিন-বি খেতে না দিলেও চলে। বাছুরের জন্মের পর তখনি প্রথম পাকস্থলী কাজ করে না; কিন্তু গাভীর গাঁজলা দুধে প্রচুর ভিটামিন-বি থাকায়, তাই দুধ হতেই বাছুর এই ভিটামিন পায়।

**(গ) ভিটামিন-সি ঃ** দেহের রক্ত ভাল রাখে। কাঁচা ঘাস পাতায় এই ভিটামিন থাকে।

**(ঘ) ভিটামিন-ডিঃ** দেহাস্থি শক্ত করে। গায়ে রৌদ্র লাগলে আপনা হতে চামড়ার মধ্যে ভিটামিন-ডি তৈরি হয়। এই ভিটামিনের অভাবে রিকেট বা অস্থিবিকৃতি রোগ হয়। এই রোগে বাছুরের গাঁইট ফোলে ও পা বেঁকে যায়। এদেশে গরুগুলো সাধারণতঃ দিনের বেলায় ছাড়া থাকায় রিকেট খুব কমই হয়। রৌদ্রে শুকনো ঘাসেও ভিটামিন-ডি থাকে। কড্‌লিভার ও হাঙ্গরের লিভারের তেলে ভিটামিন-এ ও ডি দুটিই থাকে। অনেকে বাছুরকে নিয়মিতভাবে অল্প পরিমাণে কডলিভার অয়েল খেতে দেন।

**(ঙ) ভিটামিন-ই ঃ** সন্তান উৎপাদন শক্তির জন্য প্রয়োজন। এই ভিটামিনের অভাবে বন্ধ্যাত্ব হয়। বাছুরের খাদ্যে ভিটামিন-ই না থাকলে পেশী রোগ হয় এবং বাছুর চলতে গেলে পিছনের পা দুটি আড়াআড়ি হয়ে যায় ও দাঁড়াতে পারে না।

**(৬) জল ঃ** দেহের বেশির ভাগই জল। জল খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে এবং দেহের দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। গাভী যে দুধ দেয় তার শতকরা ৮৭ ভাগ জল; এজন্য প্রত্যেক ১ কেজি দুধের জন্য গাভীকে দিনে ৪ কেজি জল পান করতে দেওয়া দরকার।

## সহজপ্রাপ্য পশুখাদ্য
## (Feeds Available on Farms and their Usefulness)

গৃহপালিত পশুর খাদ্য নির্বাচনকালে দেখতে হবে যে, কোন খাদ্য সহজে পাওয়া যায় ও দামে কম। যে জায়গায় যেসব শস্যের চাষ বেশি হয়, সেখানে সেগুলি যতদূর সম্ভব পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

### সরস খাদ্য
### (Green Roughages)

**ঘাস ঃ** পশ্চিমবঙ্গে বর্ষাকালে মাঠে প্রচুর থাকে।

**দূর্বাঘাস ঃ** পুষ্টিকর ও দুধ বাড়ায়।

**নেপিয়ার ঘাস ঃ** গরু বেশ পছন্দ করে। পশ্চিমবঙ্গে নেপিয়ার ঘাসের চাষ ভাল হয়। নেপিয়ার ডাঁটা শক্ত বলে কচি থাকতে কেটে গরুকে খাওয়ানো উচিত। এক বিঘা জমিতে নেপিয়ারের চাষ করলে চারটি গরুর সারা বছর চলে যায়।

গিনি ঘাসও এদেশে ভাল হয়। এই ঘাস একটু মোটা। মোটা ডাঁটা বাদ দিয়ে গিনি ঘাস খেতে দেওয়া উচিত।

সকল রকম ঘাসে ক্যারোটিন থাকে। এই ক্যারোটিন হতে দেহে ভিটামিন-এ তৈরি হয়। বর্ষায় ভেজা বা বানের জলে ডোবা ঘাস খেতে দেওয়া উচিত নয়। এই রকম ঘাস খেলে গরুর পেট ফাঁপতে পারে। কিছু খড় খাইয়ে তার পর মাঠে চরতে দিলে গরু বেশি পরিমাণে ভেজা ঘাস খেতে পারবে না এবং গরুর পেট ফাঁপবার সম্ভাবনা কম হবে।

যেখানে ভুট্টার চাষ হয়, ভুট্টা গাছ গরুকে খেতে দেওয়া যায়। ভুট্টা বার মাসই জন্মান যেতে পারে; এবং তিন মাসের মধ্যেই ফসল দেয়। এজন্য পশুখাদ্য হিসেবে বছরে যদি ৩/৪ বার বীজ বপন করা যায়, তা হলে সারা বছর গরু মহিষের জন্য কাঁচা ডাঁটা পাওয়া যেতে পারে।

অনেক জায়গায় গরুকে জোয়ার গাছ খেতে দেওয়া হয়। কিন্তু কচি জোয়ার গাছ ও পাতায় হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড বিষ থাকায় গরু মারা যেতে পারে। এজন্য কচি জোয়ার গাছ খাওয়ান উচিত নয়।

## নীরস খাদ্য
## (Dry Roughages)

গরু মহিষের খাদ্যের মধ্যে নীরস শুষ্ক খাদ্যেরও প্রয়োজন আছে, কারণ উদর পূর্ণ না হলে এদের প্রথম পাকস্থলী (Rumen) কাজ করে না। গরু ও মহিষের পাকস্থলীর সংখ্যা ৪টি। প্রথম পাকস্থলীতে কোন পাচক রস থাকে না; কিন্তু এর ভিতরে এমন কতকগুলি জীবাণু থাকে, যারা ছিবড়া খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

**খড় ঃ** খড় গরু মহিষের প্রধান খাদ্য। ধানের খড়কে বিচালি বলে। বিচালি আঁটি বেঁধে রাখা হয়। প্রায় ১ ইঞ্চি পরিমাণ করে কেটে নিয়ে বিচালি খেতে দেওয়া হয়। বিচালি কাটা কলের (Chaff Cutter) সাহায্যে বিচালি খুব ছোট ছোট করে কাটা যায়। পল্লীগ্রামে বঁটি বা লম্বা ডাঁশা দিয়ে বিচালি কাটা হয়।

বিচালি ছিবড়া জাতীয় খাদ্য। এর মধ্যে সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান থাকে খুব বেশি, কিন্তু প্রোটিন নাই বললেই হয়। গরুর দেহের ওজন অনুসারে প্রতি ১০ পাউণ্ড ওজনের জন্য দেড় পাউণ্ড হিসেবে খড় যথেষ্ট। একটি প্রমাণ আকারের গরু সাধারণতঃ দিনে ৫/৬ কেজি খড় খায়। শুকনো বিচালি জল দিয়ে সামান্য ভিজিয়ে খেতে দেওয়া উচিত।

ধানের খড়ের দোষ এই যে, এতে ক্ষার জাতীয় পটাশ অক্সালেটের (Potassium oxalate) পরিমাণ বেশি। অক্সালেটের জন্য খাদ্যের ক্যালসিয়াম পরিপাকেও ব্যাঘাত হয়।

খড় যদি ২৪ ঘণ্টা কাল জলে ভিজিয়ে রাখা হয়, তবে পটাশ ও অক্সালেট জলে গলে যায়; তখন এ জল ফেলে দিলে খড়ের দোষ দূর হয়। খড়কে আরও একবার পরিষ্কার জলে ধুয়ে তারপর গরুকে খেতে দেওয়া উচিত। যে জলে খড় ভিজান হয়, সেই জল ফেলে দিতে হবে।

## ঘনীভূত সারবান খাদ্য
## (Concentrates)

গরু ও মহিষের সারবান খাদ্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) খৈল, (২) শস্য এবং (৩) ফসলের উপজাত।

**(১) খৈল (Oil Cake) ঃ** তৈলের বীজ পিষে তেল বের করে নেওয়াব পর যা অবশিষ্ট থাকে, তাকে বলা হয় খৈল। খৈল গুঁড়ো করে ৮ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখার পর অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে সেই ভিজে খৈল মিশিয়ে রেখে দিতে হয়।

খৈল রেখে দিলে খারাপ হয়ে যায়; এজন্য প্রয়োজন মত ক্রয় করা সুবিধাজনক। পোকা ধবা বা অম্লভাবাপন্ন খৈল ব্যবহার করা উচিত নয়। সাধারণতঃ বাদাম, তিসি, সরিষা ও নারিকেল খৈল গরুকে খেতে দেওয়া হয়।

**বাদাম খৈল ঃ** সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর; এতে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ। বাদাম খইল গরুর মুখরোচক। দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকেও দেওয়া যায়।

**তিসির খৈল ঃ** দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরের পক্ষে উপযোগী। এতে প্রোটিনের পরিমাণ বাদাম খৈল অপেক্ষা কম, এজন্য একটু বেশি পরিমাণে দিতে হয়। এই খৈল খেতে দিলে দুধে ফ্যাটের পরিমাণ বাড়ে এবং মাখন নরম হয়।

**নারিকেল খৈল ঃ** নারিকেলের খৈলও পুষ্টিকর। কিন্তু এতে প্রোটিনের পরিমাণ অন্যান্য খৈলের অপেক্ষা কম। নারিকেলের খইল গরু প্রায়ই খেতে চায় না; অল্প পরিমাণে দিয়ে অভ্যাস করান দরকার। গরমের দিনে এই খৈল অনেক সময় অম্ল হয়ে যায়।

**সরিষার খৈল ঃ** পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি ব্যবহার হয়। সরিষার খইলে ঝাঁজ গন্ধ থাকে। এই খৈল উত্তেজক; এজন্য গর্ভবতী গাভী ও অল্প বয়স্ক বাছুরকে দেওয়া হয় না। শীতকালে বাদাম বা তিসির খইলের সঙ্গে সামান্য সরিষার খইল মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দিনে ১ কেজির বেশি এই খইল খেতে দেওয়া উচিত নয়।

সরিষার খইলের একটি অসুবিধা এই যে, জলের সঙ্গে মাখলে খড়ের ক্ষার পটাশ অংশ বেশি পরিমাণে বের হয়ে পরিপাকে ব্যাঘাত হয়। খড় আগে জলে ভিজিয়ে রেখে ফেলে দিয়ে তারপর জাবের জন্য ব্যবহার করলে ঐ দোষ থাকে না।

**শস্য ঃ** ধান, গম প্রভৃতি শস্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য এবং এইগুলিতে মোট পুষ্টিকর উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

**(ক) ডাল ঃ** ছোলা ভিজিয়ে নরম করে গরুকে খেতে দেওয়া হয়। ছোলার মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগ থাকে। ছোলার প্রায় সবটাই হজম হয়ে যায়।

বাজারের ছোলার চুনিতে প্রায়ই খোসার ভাগ বেশি থাকে। আস্ত ছোলা ভিজিয়ে জাবের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ান যায়।

খোসা সমেত মুগ চূর্ণ করে মুগকুটা তৈরি করে গাভীকে খেতে দিবে। ইহা খুব পুষ্টিকর খাদ্য। মাসকলাইয়ে দুধ বৃদ্ধি হয় বলে একটা ধারণা আছে। কলাই ভেজে জলে ভিজিয়ে তারপর গরুকে খেতে দেওয়া উচিত।

**(খ)** শ্বেতসার প্রধান খাদ্যের মধ্যে যব ও যই সাধারণতঃ গরম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এগুলির মধ্যে সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান শতকরা ৭০ ভাগের বেশি এবং সুপাচ্য প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৬ থেকে ৭ ভাগ থাকে। ভুট্টা বা চুনারের দানা গুঁড়ো করে খইল, চুনি ও ভূসির সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। বেশি ভুট্টা খেলে দেহে চর্বি জমে।

শস্য মানুষের খাদ্য। গৃহপালিত পশুকে শস্যের ভাগ দিলে মানুষের খাদ্যে ঘাটতি পড়তে পার। এজন্য যতদূর সম্ভব গো-মহিষকে এমন খাদ্য দেওয়া উচিত, যাতে মানুষের খাদ্যাভাবের কারণ না হয়।

**(গ) তিসি (linseed) ঃ** বীজের সবটাই সুপাচ্য ও পুষ্টিকর উপাদানে পূর্ণ; প্রোটিনের ভাগও শতকরা ১৪ ভাগ। এজন্য বাছুরের পক্ষে তিসি উৎকৃষ্ট খাদ্য। তিসি শুষ্ক অবস্থায় খেতে দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু জলে ভিজিয়ে দিতে হলে আগে সিদ্ধ করে নেওয়া দরকার।

## শস্যের উপাজাত

**(১) ধানের কুঁড়ো (Rice Polish) ও ক্ষুদ (Rice Bran) ঃ** ধান ভাঙ্গার সময় ধানের ওপরের খোসাগুলি পৃথক হয়ে যায়। ধানের খোসাকে তুষ বলে। তুষে কোন পুষ্টিকর উপাদান থাকে না; এজন্য এগুলি গরু মহিষকে খেতে দেওয়া উচিত নয়। বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে কুঁড়ো গরুর প্রধান খাদ্য।

ধানের কুঁড়োতে কিছু ক্ষুদ থেকে যায়। এজন্য কুঁড়োর কিছু পুষ্টিকারিতা আছে। ক্ষুদ বেশি পুষ্টিকর। চালের ভ্রূণের সঞ্চিত খাবার এই অংশে থাকে। পল্লী অঞ্চলে কৃষকেরা গাভীকে ক্ষুদ সিদ্ধ খেতে দেয়। ক্ষুদের সঙ্গে খইল ও ভাতের ফেন মিশিয়ে গরুকে খাওয়ান উচিত। ফেন সহজপাচ্য খাদ্য। এই ফেনের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে খাওয়ালে অধিকতর উপকার পাওয়া যায়।

**(২) ডালের চুনি ঃ** চুনি অর্থে ডালের গুঁড়ো (চূর্ণ)। সাধারণতঃ ছোলা, অড়হর ও মুগ চুনি ব্যবহার করা হয়।

**(৩) ভুসি (Husk) ঃ** শস্যের খোসাকে বলে ভুসি।

গমের ভুসিতে প্রোটিন শতকরা ৭·৮, ভিটামিন-বি ও ই এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকে। ইহা সহজে হজম হয় এবং গরুর মুখরোচক খাদ্য। বাজারে যে ভুসি বিক্রয় হয়, তার সবটাই গমের খোসা, সুতরাং পুষ্টিহীন। জাঁতা বা ছোট চাকি কলে ভাঙ্গা সরু ভুসি গরুর জন্য ব্যবহার্য। গর্ভবতী গাভী ও বাছুরের পক্ষে ভুসি ভাল খাদ্য।

**(৪) গুড়ঃ** গুড় চিনির উপজাত খাদ্য। গুড়ে সুপাচ্য পুষ্টিকর অংশ খুব বেশি থাকে এবং সহজে হজম হয়ে যায়। এছাড়া গুড়ে ক্যালসিয়াম ও লৌহ আছে। গাভী যখন দুধ দেয়, তখন অনেকে গুড় খাওয়ায়। গরু গুড় খুব পছন্দ করে। প্রসবের পর গাভীকে গুড় ও গমের ভুসির মিশ্রণ খাওয়ান হয়।

দেড় কেজি গমের ভুসি ও আধ কেজি গুড় গরম জলে গুলে ঈষদুষ্ণ থাকতে গরুকে খেতে দেওয়া হয়। গুড় ও বেসন জলে গুলে সরবত খাওয়ান যায়। যদি ভাতের ফেন পাওয়া যায়, তবে ফেনের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে খেতে দেওয়া যায়।

### লবণজাতীয় খাদ্য

সাধারণ খাদ্যে লবণ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না; এজন্য পোস্টাই খাদ্যসহ শতকরা ১ ভাগ লবণ মিশিয়ে দেওয়া দরকার। একটি পূর্ণবয়স্ক গরুকে দিনে অন্তত ৬ চামচ (৬ ড্রাম) খাদ্য লবণ (Sodium Cloride) দিতে হবে। গরু যখন দুধ দেয়, তখন প্রতি ৩ কেজি দুধের জন্য ১ চামচ লবণ বাড়তি দেওয়া উচিত।

## গবাদি পশুর খাদ্য খাওয়াবার নিয়ম

গবাদি পশুদের দেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি সাধন, দৈনন্দিন কাজ করবার শক্তির জোগান, দেহের ক্ষয় পূরণ ও ক্ষয় নিবারণ, দুধের উৎপাদন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া দরকার। দৈনন্দিন গবাদি পশুর পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা এবং যোগান দেওয়া খাদ্যের পুষ্টিমূল্য ইত্যাদির ওপর একটা ভাল ধারণা থাকলে গবাদি পশুদের পালন করার কাজ সহজ হয়। পশু খাদ্যের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে, জল, শর্করা জাতীয় উপাদান, স্নেহজাতীয় উপাদান, আমিষ জাতীয় উপাদান, খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণ। গবাদি পশুদের দেহের ভেতর শতকরা হিসেবে ৭০ থেকে ৯০ ভাগ জল থাকে। এই জল খাদ্য পরিপাকে এবং দেহের দূষিত পদার্থ বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে। এছাড়াও দেহের পুষ্টিসাধন, দেহ বৃদ্ধি ও শরীর গঠনে এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে জল অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কারণ গবাদি পশুর দুধের প্রায় ৮৭ শতাংশ জলীয় অংশ। শর্করা জাতীয় উপাদান দেহের তাপ উৎপাদন করে এবং যেটা বাড়তি থাকে তা শরীরে স্নেহ জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়। স্নেহ জাতীয় উপাদান শরীরে তাপ উৎপাদন করে এবং সেটা শর্করার থেকে আড়াই গুণ বেশি শক্তি যোগান দিতে সমর্থ হয়। আমিষ জাতীয় উপাদান দেহের পুষ্টি বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। খাদ্যপ্রাণ এমনই কতকগুলো প্রয়োজনীয় উপাদান যার অভাব ঘটলে শরীরে রোগ এবং অসুস্থতা দেখা দেয়। খাদ্যপ্রাণ নানাভাবে রোগ প্রতিরোধ করে ও নানা ধরনের পুষ্টি বৃদ্ধি এবং শরীর গঠনে সাহায্য করে। যেমন খাদ্যপ্রাণ 'এ'-রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, রাতকানা ও চর্মরোগ প্রতিরোধ এবং দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। খাদ্যপ্রাণ 'বি'-

এর অভাবে বদহজম হয়। এমন কি পলিনিউরাইটিস রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। খাদ্যপ্রাণ 'সি'-এর অভাবে রক্ত তারল্য ও দাঁতের রোগ দেখা দিতে পারে। খাদ্যপ্রাণ 'ডি'-এর অভাব ঘটলে হাড়ের পুষ্টি হয় না ও রিকেট রোগে গরু বা মোষ আক্রান্ত হয়। খাদ্যপ্রাণ 'ই'—শরীর এটি ঠিক মতো না পেলে গাভী বন্ধ্যা হয় ও পেশীর রোগ হবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং খাদ্যপ্রাণ খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। খনিজ পদার্থ পরিপাক ক্রিয়ার জন্য, রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে রস ক্ষরণ এবং অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়ার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

গবাদি পশুর খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ করলে (ক) পেট ভরাবার জন্য খাদ্য, (খ) সারবান খাদ্য, মোট এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই খাদ্যের আবার দুটি ভাগ রয়েছে। (ক) নীরস খাদ্য, (খ) সরস খাদ্য। প্রথমটি অর্থাৎ আমরা নীরস খাদ্য বলতে ধানের, গমের খড় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শুকনো ঘাসকে বুঝি। ঘাসের মধ্যে পড়ে বরবটি, বারসীম, লুসার্ণ, ওটস্ ইত্যাদি। এছাড়া ভারতের কোন কোন রাজ্যে যব, মিলেট ও ভুট্টা গাছের শুকনো ডাল-পালা ও পাতাকে ঘাস হিসেবে গরু-মোষকে খেতে দেয়। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য ভুট্টা ও গেমা ঘাস সামান্য পরিমাণ জমিতে চাষ করে সেটা শুকিয়ে ঘাস হিসেবে পশুদের খেতে দেওয়া হয়।

গবাদি পশুর পেট ভর্তি না হলে প্রথম পাকস্থলী মোটেই কাজ করে না। কারণ ওদের প্রথম পাকস্থলীতে কোন পাচক রস থাকে না। তবে এমন কতকগুলো জীবাণু থাকে যারা ছিবড়ে জাতীয় খাদ্যকে কেবলমাত্র হজম করতে সাহায্য করে। শুকনো খড়ের মধ্যে আমিষ জাতীয় কোন উপাদান থাকে না। তবে কিছু পরিমাণে সুপাচ্য পুষ্টির উপাদান আছে। সেই কারণে পেটটি ভরিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোন উপকার শুকনো ধান অথবা গমের খড়ের মধ্যে নেই। ধানের খড়েতে ক্ষার জাতীয় পটাশ ও অক্সালেটের পরিমাণ বেশি থাকে। অক্সালেটের অধিকাংশই গবাদি পশুর প্রথম পাকস্থলীতে পচে যায়। এ ছাড়াও পটাশ ও অক্সালেটের জন্য খাদ্যের ক্যালসিয়াম পরিপাকেও ব্যাঘাত ঘটায়। তবে খড়কে যদি জলে কিছু সময় ধরে ভিজিয়ে রাখা যায় তাহলে পটাশ ও অক্সালেট জলে গুলে খড় থেকে বের হয়ে যায়। সুতরাং গবাদি পশুদের খড় খাওয়াবার আগে তিন থেকে চার ঘণ্টা ঠাণ্ডা পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর আবার একবার পরিষ্কার জলে ধুয়ে ওদের খেতে দিলে পটাশ ও অক্সালেট জনিত দোষ থাকে না।

সরস খাদ্য বলতে আমরা কাঁচা ঘাসকে বুঝে থাকি। কাঁচা ঘাসকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) সাধারণ ঘাস যা গবাদি পশুরা মাঠে চরে খায়। (খ) শাক-সবজির পাতা এবং লতা ও গুল্ম শ্রেণীর গাছপালা। (গ) সাইলেজ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা খাদ্য। (ঘ) শিম্ব জাতীয় ও বিভিন্ন শ্রেণীর চাষ যোগ্য ঘাস। এর মধ্যে পড়ে নেপিয়ার ঘাস, প্যারা ঘাস, লুসার্ণ ঘাস, জোয়ার, ভুট্টা, গেমা, টিওসিনটি, গাই-মুগ, বারসীম, বিশাল-সীম, মটর শুঁটি, বরবটি, ওটস্ প্রভৃতি। এসব গবাদি পশুর খুবই পুষ্টিকর খাদ্য এবং ওদের শরীর রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

শাক-সবজি বলতে কাঁটা নোটে, গাজর গাছ, বাঁধাকপি, ফুলকপির পাতা, লাল আলুর গাছ, লাউ এবং কুমড়ো শাকের বড় পাতা ইত্যাদি। সাইলেজ ঘাসকেও কাঁচা ঘাস অর্থাৎ সরস খাদ্য বলতে পারা যায়। এ ব্যাপারে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য সাইলেজ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র কাঁচা ঘাস ও শিম্ব জাতীয় ঘাসকে সাইলেজ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়।

গবাদি পশুর ঘনীভূত খাদ্য বলতে বিভিন্ন খাদ্য শস্যের বীজ, শস্য দানা ও খোলকে বোঝায়। খোলের মধ্যে সরষে এবং তিসির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এই দুটি খোলের পুষ্টিমূল্য খুব বেশি। আর শস্য দানা বলতে অড়হর, মুগ, বিউলি, ছোলা, ওটস্, বার্লী, ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেকে আবার গবাদি পশুদের বাদাম খোল, তিলের খোল খেতে দেন। শস্যদানার মধ্যে আছে শতকরা হিসেবে ৬ থেকে ৮ ভাগ আমিষ উপাদান ও প্রায় ৭০ ভাগ সুপাচ্য অংশ। এবার আলোচনা করা হচ্ছে দানা জাতীয় খাদ্য শস্যে কি পরিমাণে আমিষ উপাদান ও সুপাচ্য অংশ রয়েছে।

**ভুট্টা** ঃ এতে আছে ৭·৪ ভাগ সুপাচ্য আমিষ উপাদান এবং ৮৪·৯ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান।

**জোয়ার** ঃ এতে রয়েছে ৬·৫৭ ভাগ সুপাচ্য আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৭২·৬ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান।

**গম** ঃ এর দানাতে পাওয়া যায় ৫·৬৭ ভাগ সুপাচ্য আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৮৩·০ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান।

**ছোলা** ঃ এতে থাকে ১২ ভাগ সুপাচ্য আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৭৪·৬ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান।

**ডাল** ঃ এর দানাতে পাওয়া যায় ৮ ভাগ আমিষ জাতীয় উপাদান। অন্যান্য ডালে এর থেকেও বেশি পরিমাণে আমিষ জাতীয় উপাদান থাকে।

**খইল** ঃ এর মধ্যে থকে ১৯·৪০ ভাগ আমিষ জাতীয় উপাদান আর সুপাচ্য অংশ থাকে শতকরা হিসাবে ৬৪·৮০ ভাগ।

**সরষে খইল** ঃ এই খাদ্যশস্যে পাওয়া যায় ২৭·৬১ ভাগ সুপাচ্য আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৭৪·২ ভাগ থাকে সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান।

**তিসির খইল** ঃ এর মধ্যে থাকে ২৩·২৭ ভাগ আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৬০·৬ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান।

**চীনা বাদামের খইল** ঃ গো-খাদ্য হিসাবে এর মধ্যে পাওয়া যায় ৪১·৭৫ ভাগ আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৭১·০ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান।

**তিল খইল** ঃ এর মধ্যে রয়েছে ৩৮·৩৪ ভাগ সুপাচ্য আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৭৮·২ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান।

শস্যের উপজাত উপাদান বা অংশ যেমন ধানের কুঁড়ো ও খুঁদ, বিভিন্ন ডালের চুনি অর্থাৎ ওপরের খোসা, ছোলার খোসা, গমের ভুসি, গুড় ইত্যাদিকে বোঝায়।

চালের কুঁড়োতে স্নেহ ও আমিষ জাতীয় উপাদান কম থাকলেও খনিজ পদার্থ বেশি থাকে। বিভিন্ন ডালের চুনিতে আছে শতকরা হিসেবে প্রায় ৮ ভাগ সুপাচ্য আমিষ উপাদান। মুগ ডালের চুনিতে পাওয়া যায় শতকরা হিসাবে ১১·৫ ভাগ সুপাচ্য আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৬০ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। ছোলার চুনির মধ্যে রয়েছে শতকরা ১০ ভাগ সুপাচ্য আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৫৫·২ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। অড়হর ডালের চুনিতে পাওয়া যায় শতকরা ৮·০ ভাগ সুপাচ্য আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৬৫ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। গমের ভুসির মধ্যে থাকে শতকরা হিসেবে ৭·৫১ ভাগ সুপাচ্য আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৬৩·৪ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। চালের কুঁড়োর মধ্যে পাওয়া যায় শতকরা হিসেবে ৮·১৮ ভাগ সুপাচ্য আমিষ জাতীয় উপাদান এবং ৮৮·৫ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। গমের ভুসিতে থাকে শর্করা, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ফসফেট এবং সামান্য পরিমাণে লবণ। গুড়ের মধ্যে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম ও লোহা ছাড়াও বেশি পরিমাণে শর্করা ও সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। খনিজ পদার্থ বলতে খনিজ লবণ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি বোঝায়। সুষম খাদ্যের সংমিশ্রণে শতকরা ২ ভাগ খনিজ পদার্থ দেওয়া যেতে পারে। তবে গবাদি পঁশুরা যদি কাঁচা ঘাস খায় তবে ক্যালসিয়াম খাদ্যের সঙ্গে আলাদাভাবে না দিলেও চলে। কারণ কাঁচা ঘাসে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। কাঁচা ঘাস না খাওয়ালে সুষম নির্দিষ্ট ২ শতাংশ খনিজ পদার্থের মধ্যে কিছুটা পরিমাণে চা-খড়ি মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সুষম খাদ্য বলতে আমরা বুঝি উপযুক্ত পবিমাণে এবং আনুপাতিক হারে পুষ্টিকর উপাদান যুক্ত খাদ্য। শরীর গঠন এবং দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই ধরনের খাদ্য গবাদি পশুদের একান্ত প্রয়োজন। দৈনন্দিন পশুদের চাহিদা যোগানের হিসেব রাখাকেই খাদ্যনীতি বলা হয়ে থাকে। কোন শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে, কতটা পরিমাণে সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে এবং তার মধ্যে কতটা পরিপাক হয়ে গবাদি পশুর কাজে লাগবে সেটা জানতে পারলে ওদের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুত করা সহজ এবং সম্ভব হয়।

দৈনন্দিন গবাদি পশুদের চাহিদায় প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদির উৎপাদন ক্ষমতা এবং নিত্য ওদের শরীর খাদ্যের কতটা অংশ পরিপাক করতে সক্ষম সেটার সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান থাকা দরকার। এর সঙ্গে পশুখাদ্যের পুষ্টিকর অনুপাত জানা থাকলে সুষম খাদ্য প্রস্তুত করা আরও সহজ হয়।

## পশু খাদ্যের গুণাগুণের অনুপাত হিসেব করার সহজ উপায়

$$\text{পুষ্টিকর অনুপাত} = \frac{\text{কার্বোহাইড্রেট} + (\text{ফ্যাট} + ২·২৫)}{\text{প্রোটিন}}$$

পশুখাদ্যের শুষ্ক পদার্থেরও শতকরা পরিমাণ জানা থাকা দরকার। যেমন বারসীম, লুসার্ণ ঘাসে থাকে শতকরা হিসাবে ২০ ভাগ শুষ্ক পদার্থ। জোয়ার, ভুট্টা

ইত্যাদিতে থাকে ২৫ ভাগ শুষ্ক পদার্থ, শস্য দানাতে এবং খোল ইত্যাদিতে পাওয়া যায় ৯০ ভাগ শুষ্ক পদার্থ।
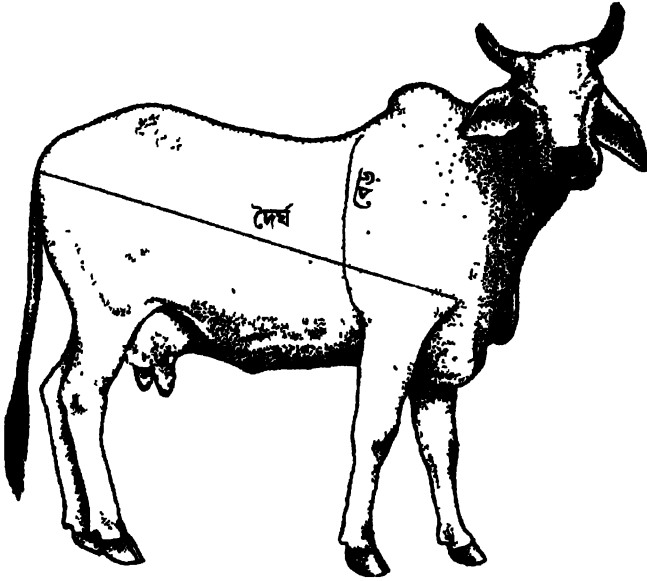
গাভীর ওজন নির্ণয় পদ্ধতি

গবাদি পশুর দৈনন্দিন খাদ্য নির্ধারণ করার সময় গবাদি পশুর দেহের ওজন জানা অত্যন্ত জরুরী। দুগ্ধবতী গাভী হলে কতটা পরিমাণে রোজ দুধ দেয় সেটাও জানা দরকার। গবাদি পশুদের শরীরের ওজন জানার জন্য তাদের কোন কাঁটা দাঁড়িতে ওজন করার প্রয়োজন হয় না। এব্যাপারে একটা সহজ সূত্র রয়েছে।

(বুকের ছাতির ব্যাস)$^2$ × লম্বা (হিপ বোন থেকে পিন বোন পর্যন্ত ইঞ্চি মাপে। অর্থাৎ কোমরের বেব কবা হাড় থেকে ঘাড়ের শেষ হাড় পর্যন্ত) এই গুণফলকে ৩০০ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগ ফল পাওয়া যাবে সেটাই গবাদি পশুর দেহের ওজন। এই হিসেবটা পাউণ্ড হিসাবে ধরতে হবে।

প্রতি ১০০ পাউণ্ড শরীরের ওজনের জন্য পেট ভরানো খাদ্য দেওয়া যেতে পারে ৬ পাউণ্ড। পেট ভর্‌ানোর জন্য খাদ্য হিসাবে সরস ও নীরস খাদ্যের আনুপাতিক হারটা ৩ : ১ হবে। অর্থাৎ ৬ পাউণ্ডের মধ্যে ৩ পাউণ্ড যদি কাঁচা ঘাস দেওয়া হয় তবে ১ পাউণ্ড শুকনো খড় দিলেই চলবে। একটি গরু অথবা মোষ যার শরীরের ওজন ৫০০ পাউণ্ড তার পেট ভরানোর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হবে ৫ × ৬ = ৩০ পাউণ্ড। এই ৩০ পাউণ্ড খাদ্যের মধ্যে অর্ধেকটা অর্থাৎ ১৫ পাউণ্ড যদি কাঁচা ঘাস দেওয়া হয় তবে বাকি ১৫ পাউণ্ডের জন্য শুকনো খড়ের প্রয়োজন হবে ১৫ ÷ ৩ = ৫ পাউণ্ড। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গবাদি পশুর দেহের স্বাভাবিক ওজন অনুসারে প্রতিদিন নীরস খাদ্য বা শুকনো খড় খাবে ৫ থেকে ৬ কেজি পরিমাণ

এককভাবে। অথবা ১৫ থেকে ১৮ কিলো কাঁচা ঘাস এককভাবে, অথবা ৩ : ১ অনুপাত হারে সাড়ে সাত কিলো কাঁচা ঘাস, আড়াই কিলো শুকনো খড় অথবা ৯ কিলো শুকনো কাঁচা ঘাস, ৩ কিলো শুকনো খড়। কাঁচা ঘাসের পরিমাণ বাড়ালে খড়ের অনুপাত অবশ্যই কমে যাবে। ঠিক একইভাবে খড়ের পরিমাণ বাড়ালে কাঁচা ঘাসের অনুপাত কমবে।

এছাড়াও গবাদি পশুকে চারণ ভূমিতে চরতে দেওয়া উচিত। গবাদি পশুর গর্ভাবস্থায় কাঁচা ঘাসের পরিমাণ বাড়ানো দরকার কারণ সন্তান উৎপাদনের জন্য তখন শরীরে বেশি পরিমাণে প্রোটিনের দরকার হয়। আবার সন্তান প্রসব করার পরেও দেহের ক্ষতিপূরণ, পুষ্টি সাধনের জন্য ও দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য কাঁচা ঘাস বেশি পরিমাণে দেওয়া দরকার। বাছুরকেও দুধ ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কচিঘাস খাওয়াতে অভ্যাস করানো দরকার। বাছুরের বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলেই সম্পূর্ণ তরুণ ও যৌবন বয়সে শস্যদানার সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে যদি পেট ভরানো খাদ্যের জন্য একক সরস খাদ্য হিসেবে কাঁচা ঘাস খেতে দেওয়া যায় তবে পরবর্তীকালে খুবই সুফল পাওয়া যায়। শরীরের বাড় দ্রুত হয়। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মায় এবং সঠিক সময়ে সেই বাছুর গর্ভধারণ করতে পারে। সুতরাং কাঁচা ঘাসের প্রয়োজনীয়তা ও উৎপাদন অবশ্য এবং বিশেষ কর্তব্য বলা যেতে পারে।

সুষম খাদ্য প্রস্তুত করবার ব্যবহারিক জ্ঞান মোটামুটিভাবেও গ্রামের গো-পালক ও চাষী ভাইদের জানা থাকে, তবে বাজারে তৈরি সুষম খাদ্য চড়া দাম দিয়ে কেনার হাত থেকে কিছুটা রেহাই মেলে। ফলে গবাদি পশু পালনের খরচ কিছুটা কম হয়। কারণ কৃষি ও কৃষি উপজাত দ্রব্য তার নিজস্ব ক্ষেতেই উৎপন্ন হচ্ছে। যদি তা না হয় তবে সবই উপাদান গ্রামে পাওয়া যায়। শহরে কিনতে গেলে দাম একটু বেশিই পড়বে এবং আনার জন্য একটা খরচ হবে। কাজেই বিষয়টা জানা থাকলে নিজেই তৈরি করে নিতে পারা যায়। গবাদি পশুর খাদ্যের মধ্যে চালের কুঁড়ো, গমের ভুসি, বিভিন্ন ডালের ভুসি, ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে অথবা চাল কল, জাঁতা কল প্রভৃতি জায়গা থেকে কম দামে এবং খুব সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব। সুষম খাদ্যে শস্যের ব্যবহার এবং কোন জাতের বা শ্রেণীর শস্য কখন; কিভাবে এবং কতটা অংশ মেশাতে হয়, সেটা জানা থাকলে নিজের জমিতে দুটি ফসলের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে যে কোন একটি ফসল চাষ করে তার উৎপাদন করে নিতে পারা যায়।

## সুষম খাদ্য তৈরি করার সহজ পদ্ধতি

সংমিশ্রিত উপাদানে শতকরা কতভাগ প্রোটিনযুক্ত আছে সে বিষয়ে জানা এবং তার আনুপাতিক সংযুক্তিও জেনে রাখতে হবে। যে সব গাভী দুধ দেয় না অথবা যে বলদ কাজ করে না তেমন গবাদি পশুর গোখাদ্যে শতকরা হিসেবে মাত্র ১২ ভাগ প্রোটিন থাকলেই যথেষ্ট বলে ধরা হয়। সে সমস্ত উন্নত জাতের গাভী বংশগত কারণে ন্যূনতম পরিমাণে দুধ দেয়—জার্সি গরু ৩ থেকে ৪ লিটার,

হলস্টেইন গরু ৫ থেকে ৬ লিটার, দেশি হরিয়ানা গরু ২ থেকে ৩ লিটার, এই সব জাতের গাভীকে সারা দিনের মধ্যে (দুধ যখন দেবে) ১২ থেকে ১৪ ভাগ প্রোটিনযুক্ত সুষমখাদ্য দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অধিক দুধ উৎপাদন অবস্থায় ঐ সমস্ত গবাদি পশুকে শতকরা হিসেবে ১৬ থেকে ১৮ ভাগ প্রোটিনযুক্ত সুষম খাদ্য দেওয়া দরকার। শতকরা ২০ থেকে ২২ ভাগ প্রোটিনযুক্ত সুষম খাদ্য বিশেষ উৎপাদনক্ষম গবাদি পশুকে দেওয়া হয় কারণ অধিক উৎপাদন ক্ষমতা ও পাশাপাশি দৈহিক মান বজায় রাখার জন্য এটা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বাজারে গবাদি পশু খাদ্যের জন্য যে সমস্ত শস্যদানা পাওয়া যায় এবং উৎপন্ন কৃষি উপজাত দ্রব্য সহজলভ্য কয়েকটি পশু খাদ্যের সুপাচ্য আমিষ উপাদানের শতকরা হিসেবে নিম্নে দেওয়া হলো।

| শস্য দানার নাম | শতকরা হিসেবে আমিষ উপাদান |
|---|---|
| ভুট্টা | ৭·৪ ভাগ |
| জোয়ার | ৬·৫৭ ” |
| বাজরা | ৪·৫৭ ” |
| ওটস্ | ৮·০৭ ” |
| গম | ৫·৬৭ ” |
| ছোলা | ১২·০ ” |
| অড়হর | ১২·৯২ ” |
| কলাই | ১৮·০ ” |
| তিসি | ১৪·০ ” |
| মুগ | ১২·৬ ” |

| কৃষি উপজাত দ্রব্যের নাম | শতকরা হিসেবে আমিষ উপাদান |
|---|---|
| ছোলার চুনি | ১০·৫ ভাগ |
| অড়হর চুনি | ৮ ০ ” |
| মুগ চুনি | ১১·০ ” |
| চালের খুদ | ৮·১৮ ” |
| গমের ভুসি | ৭·৮৫ ” |
| চালের কুঁড়ো | ৮·১৮ ” |
| তিসির খইল | ২৩·২৭ ” |
| তিলের খইল | ৩৮·৩৪ ” |
| চীনা বাদামের খইল | ৪০·৭৫ ” |

গবাদি পশুদের সুষম খাদ্য তৈরি করতে হলে শস্যদানা এবং কৃষি উপজাত দ্রব্যের মধ্যে যে কোন তিনটি উপাদান অবশ্যই থাকা দরকার। এদের সংমিশ্রণে শতকরা হিসবে ১২ থেকে ১৮ ভাগ সুপাচ্য আমিষ উপাদান যুক্ত সুষম খাদ্য গবাদি পশুর জন্য তৈরি করা যাবে। খোল কোন ক্রমেই শতকরা ৩৩ ভাগের বেশি দেওয়া

চলবে না। আর খনিজ পদার্থ হিসাবে সাধারণ লবণ যাতে শতকরা ২ ভাগ থাকে সেটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। বাড়ন্ত গবাদি পশুর সুষম খাদ্যে অ্যামোনিয়াম লবণ ও ক্যালসিয়াম (চা-খড়ি) মেশানো চলে। এছাড়াও সুষম খাদ্যে গুড় মেশানো হয়। অবশ্য গুড়েতে কোন সুপাচ্য আমিষ উপাদান নেই তবে অন্যান্য খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে। সুষম খাদ্য তৈরি করবার সময় মনে রাখতে হবে, যে সমস্ত উপাদানের দামটা কম এবং বাজারে সহজেই পাওয়া যায় সেই সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে তা পরিমাণ অনুসারে সংমিশ্রণে সুষম খাদ্য তৈরি করতে তেমন কোন সমস্যার ব্যাপার হয় না।

ধরা যাক কোন চাষীর জমিতে (তিনি যদি গো-পালক হন) ভুট্টা চাষ করা হয়েছে। মিশ্র চাষ বা পয়রা চাষ হিসেবে ছোলাও বপন করা হয়েছে একই জমিতে। চৈত্র মাসে বোনা তিলের খইলটা চাষীর কাছে কৃষি উপজাত দ্রব্য। এরপর চালের কুঁড়ো বাজারে সব সময় সহজেই পাওয়া যায়। কাজেই এদের সংমিশ্রণে যদি কোন সুষম খাদ্য গবাদি পশুদের জন্য নিজের বাড়িতে তৈরি করা হয় তাহলে বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দেবে না। তাছাড়া খরচও যথেষ্ট কম হবে। তবে কোনটা কি পরিমাণে মেশাতে হবে এবং সেটার মধ্যে কি হারে সুপাচ্য আমিষ উপাদান থাকছে সে বিষয়ে অবশ্যই কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। এখানে তিনটি সারণি দেওয়া হচ্ছে। সারণিগুলো দেখে নিজের প্রয়োজন মতো সুষম খাদ্য খুব সহজেই তৈরি করা যাবে।

সারণি—১

| ক্রমিক সংখ্যা | উপাদানের নাম | কতটা পরিমাণ মেশানো হচ্ছে | শতকরা হিসেবে সুপাচ্য আমিষ উপাদান | মিশ্রিত খাদ্যে সুপাচ্য আমিষ উপাদানের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১। | ভুট্টা | ৪৫ কেজি | ৭·৪ | ৩·৪ |
| ২। | ছোলার চুনি | ১৫ কেজি | ১০·৫ | ১·৫ |
| ৩। | তিলের খোল | ২০ কেজি | ৩৮·৩৪ | ৭·৬ |
| ৪। | চালের কুঁড়ো | ২০ কেজি | ৮·১৮ | ১·৬ |
| | | ১০০ কেজি | | ১৪·১ |

**সহজ হিসেব ঃ** ১০০ কেজি ভুট্টায় ৭·৪ সুপাচ্য আমিষ উপাদান আছে। ১ কেজিতে কতটা পরিমাণ আছে? আর ৪৫ কেজি ভুট্টাতে কতটা পরিমাণ আমিষ উপাদান পাওয়া যাবে?

ঐকিক নিয়মে অঙ্কটি করে এবার দেখানো হচ্ছে।

১০০ কেজি ভুট্টাতে সুপাচ্য আমিষ উপাদান ৭·৪ কেজি

১ ,, ,, ,, ,, ,, $\frac{৭·৪}{১০০}$

৪৫ ,, ,, ,, ,, ,, $\frac{৭·৪ \times ৪৫}{১০০}$

= ৩·৪ কেজি

এই পদ্ধতি অনুসারে মিশ্রিত প্রতিটি উপাদানের পরিমাণের আনুপাতিক সুপাচ্য আমিষ উপাদানের হিসাব বের করে নিলে গবাদি পশুদের সুষম খাদ্য প্রস্তুত করা খুবই সহজ হয়। কাজেই ১ নম্বর সারণিতে গো-খাদ্যের সংমিশ্রণ করে সুপাচ্য আমিষ উপাদান শতকরা হিসেবে পাওয়া গেছে ১৪·১ ভাগ।

গো-পালকদের সুবিধের জন্য আরও ২টি সারণি দেওয়া হচ্ছে। তাতে বিভিন্ন ধরনের শস্য দানা এবং শস্যজাত অর্থাৎ কৃষিজাত উপাদান থাকছে। প্রয়োজন অনুসারে সামান্য পরিবর্তন করে নিজেই বাড়িতে তৈরি করা সম্ভব হবে। পরিবর্তন বলতে উপাদান এবং তার ওজন। কারণ সব গো-পালকের গবাদি পশুর সংখ্যা তো সমান নয়। কাজেই এটা সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। তাছাড়া আর্থিক দিকটাও গো-পালককে প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে।

সারণি—২

| ক্রমিক সংখ্যা | উপাদানের নাম | উপাদানের পরিমাণ | শতকরা হিসেবে সুপাচ্য আমিষ উপাদান | মিশ্রিত সুষম খাদ্যে সুপাচ্য আমিষ উপাদান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১। | জোয়ার | ৩০ কেজি | ৬·৫৭ | ১·৯৭ |
| ২। | গমের ভুসি | ৪০ কেজি | ৭·৮৫ | ৩·১৪ |
| ৩। | চীনা বাদামের খোল | ৩০ কেজি | ৪১·৭৫ | ১২·৫০ |
| | | ১০০ কেজি | | ১৭·৬১ |

ঠিক আগের নিয়মে ২ নম্বর সরণীতে দানাশস্য ও কৃষিজাত উপাদানের সংমিশ্রণে ১৭.৬১ ভাগ সুপাচ্য আমিষ উপাদান রয়েছে।

সারণি—৩

| ক্রমিক সংখ্যা | উপাদানের নাম | উপাদানের পরিমাণ | শতকরা হিসেবে সুপাচ্য আমিষ উপাদান | মিশ্রিত সুষম খাদ্যে আমিষ উপাদান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১। | ওটস্ | ৩০ কেজি | ৮·০৭ | ২·৪ |
| ২। | গম | ২৫ " | ৫·৬৭ | ১·৪ |
| ৩। | কলাই | ২০ " | ১৮·০ | ৩·৬ |
| ৪। | তিসির খোল | ২৫ " | ২৩·২৭ | ৫·৮ |
| | | ১০০ কেজি | | ১৩·২ |

৩ নম্বর সারণিতে দানাশস্য ও কৃষিজাত উপাদানের সংমিশ্রণে ১৩·২ ভাগ সুপাচ্য আমিষ উপাদান রয়েছে।

প্রতিটি সারণিতে যে সমস্ত উপাদান রয়েছে এর সঙ্গে ২ কেজি পরিমাণ সাধারণ অর্থাৎ খাবার লবণ এবং চা-খড়ি মেশাতে হবে। যদি আর্থিক সুবিধা থাকে তবে ২ থেকে ৩ কেজি গুড় মেশাতে পারা যাবে।

## গরু ও মোষের বাছুরের খাবার

গরু অথবা মোষ বাচ্চা প্রসব করার পর ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত মায়ের গাঁজলা দুধ পেট ভরে খাবে। অনেকে আবার ২১ দিন পর্যন্ত বাছুরকে মায়ের দুধ খেতে দেয়। এটা মোটেই ঠিক নয়! কারণ দীর্ঘদিন ধরে বাছুর গাঁজলা দুধ খেলে পেট খারাপ সহ অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। যাই হোক দশ দিনের পর সামান্য পরিমাণে খাবার তার মুখের সামনে ধরা দরকার। খাবারের মধ্যে থাকবে কচি ঘাস ও সামান্য সুষম খাদ্য। বাছুর প্রথমটায় খেতে চাইবে না। ওদের মুখে জোর করে অল্প পরিমাণে খাবার গুঁজে দিতে হবে। বাছুরের বয়স ২১ দিন হলে তখন সকাল ও বিকেল মোট ২ বার দুধ খাবে। বাকি প্রয়োজনীয় খাবার মিলবে পেট ভরে কচি ঘাস, সামান্য ধানের খড় এবং ১০০ গ্রাম করে সুষম খাদ্য। তবে পরিমাণ মতো জল যাতে বাছুর খায় সেদিকে গো-পালককে অবশ্য নজর দিতে হবে। এরপর প্রতি ১৫ দিন অন্তর ৫০ গ্রাম পরিমাণ খাদ্য (সুষম খাবার) বাড়িয়ে যেতে হবে। এইভাবে খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে বাছুরের বয়স তিন মাস হলে তখন ৫০০ গ্রাম পরিমাণ সুষম খাদ্য দেওয়া দরকার। বাছুর ৪ মাসের হলে তখন বাছুরকে গাভীর দুধ না খাওয়ালেও চলবে। তখন সুষম খাদ্যের পরিমাণ অবশ্যই বাড়াতে হবে। এরপর সুষম খাদ্যের পরিমাণ বাড়বে প্রতি দু'মাস অন্তর। বাছুর গর্ভবতী না হওয়া পর্যন্ত আড়াই কেজি হারে সুষম খাদ্য দৈনিক খেতে দেওয়া দরকার। এর সঙ্গে পেট ভরা সবুজ কাঁচা ঘাস, ধানের খড় ও জল খাওয়াতে হয়।

## গরু ও মহিষ বাছুরের সুষম খাদ্য

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| পাকা ভুট্টা দানা গুঁড়ো অথবা গমের দানা | ৫০ ভাগ |
| তিল খোল অথবা বাদাম খোল অথবা তিসি খোল | ৩০ ভাগ |
| গমের ভুসি | ১২ ভাগ |
| চিটে গুড় | ৫ ভাগ |
| খনিজ লবণ | ২ ভাগ |
| খাবার লবণ | ১ ভাগ |
| | ১০০ ভাগ |

পরিমাণের জায়গায় ভাগ লেখা আছে। এটা কেজি হিসেবে ধবতে পারা যায়। প্রয়োজনে বাড়াতেও পারা যাবে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি উপাদানকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করা দবকার। যেমন ভুট্টা দানা ৫০ আছে, একে ১০ দিয়ে গুণ করলে বাকি সব উপাদানকে ১০ দিয়ে গুণ করা দরকার।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রাকৃতিক কারণে সুবজ ঘাস প্রয়োজন মতো গরু অথবা মোষের বাচ্চাকে খেতে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে সুষম খাদ্যের সঙ্গে ২০ গ্রাম ভিটামিন-'এ' এবং ভিটামিন-'ডি' মেশাতে হবে।

### বাছুর পরিচর্যা (এক নজরে)

গরু অথবা মহিষের বাছুর জন্মাবাব পর তার নাভিতে টিনচার আয়োডিন অথবা ৫ শতাংশ মারকিউরিক্রোম তুলির সাহায্যে লাগাতে হবে। হাতের কাছে এসব না থাকলে কাঁচা হলুদকে ভালভাবে বেটে নাভিতে রোজ দু'বার করে লাগানো দরকার। এইভাবে মোট তিন দিন লাগানো উচিত।

গবাদি পশুরা প্রসব করার পর ফুল পড়তে তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগে। কিছু ক্ষেত্রে আবার এক ঘণ্টার মধ্যে ফুল পড়ে যায়। ফুল পড়া মাত্র তাতে চুণের গুঁড়ো ছিটিয়ে মাটিতে এক হাত গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে। এরপর গোয়াল ঘর ব্লিচিং পাউডার, চুনের গুঁড়ো অথবা ফিনাইল জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া দরকার।

বাছুরের বয়স একমাস হলে তখন একবার এবং দু'মাস ও তিন মাস বয়স হলে সেই সময় আরও একবার করে কৃমিনাশক ওষুধ অবশ্যই খাওয়াতে হবে। এইভাবে প্রতিটি গরু অথবা মহিষের বাছুরকে ক্রিমিনাশক ওষুধ মোট তিন বার খাওয়ানো দরকার।

সংকর জাতের বকনা বাছুরকে দু'বছরের আগে গর্ভবতী হতে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য এই জাতের বকনা দেড় বছর হলেই গর্ভধারণের জন্য উত্তেজিত হয়। কম বয়সে গর্ভধারণ করলে সন্তান দুর্বল হয়, গাভীর স্বাস্থ্য খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে। তাছাড়া উপযুক্ত খাদ্য এবং আদর্শ পরিচর্যা করলেও দুধের পরিমাণ বাড়ে না। আর দুধের পরিমাণ ঠিক মতো না বাড়লে গো-পালকের সবটাই লোকসান।

দেশি অথবা সংকর জাতের গরু অথবা মহিষের বাছুরকে বলদে পরিণত করতে হলে ৫ থেকে ৬ মাস বয়সের মধ্যে কাজটি করে ফেলা ভাল। বেশি বয়সে করলে বলদের স্বাস্থ্য তেমন গঠিত হয় না এবং কিছু ক্ষেত্রে বাছুরের মৃত্যুর আশংকা থাকে।

# কম খরচে প্রোটিন সমৃদ্ধ গোখাদ্য

## ইউরিয়া মেশানো খড় তৈরি

গবাদি পশুদের বিশেষ করে দুগ্ধবতী গরু ও মোষকে প্রতিদিন শুকনো ধানের অথবা গমের খড় খাওয়ানো ঠিক নয়। এর কারণ শুকনো খড়ের গায়ে লেগে থাকা ধুলো ও বালিতে নানা ধরনের রোগ পোকার অসংখ্য জীবাণু ছাড়াও বিভিন্ন কীটনাশক রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ খড়ের মাধ্যমে গবাদি পশুর শরীরে প্রবেশ করে রকমারি বিপত্তি ডেকে আনতে পারে। দেখা গেছে যে, ভিজে খড়ের তুলনায় শুকনো খড়ে অক্সালেট বেশি পরিমাণে থাকে। এই অক্সালেট প্রাণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এছাড়া নাইট্রোজেন তথা প্রোটিন, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ এবং শক্তি বা এনার্জি শুকনো খড়েতে খুবই কম পরিমাণে থাকে। এই সব কারণে বর্তমানে শুকনো খড়ের সঙ্গে ইউরিয়া মেশানো জলে ভিজিয়ে তারপর কিছুদিন রেখে জারিত করে তারপর গবাদি পশুকে খাওয়ানোর রেওয়াজ শুরু হয়েছে। ইউরিয়াজারিত খড়ের গুণগত মান সাধারণ শুকনো খড়ের তুলনায় অনেক বেশি হয়। ফলে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এছাড়া ইউরিয়াজারিত খড় উচ্চ প্রোটিন গুণসম্পন্ন হওয়ায় অল্পতেই তাদের খাদ্যের চাহিদা মেটে। এতে খাদ্য বাবদ গো-পালকের খরচ অবশ্যই কিছুটা কমে। তাছাড়া খাবারের অপচয়ও কম হয়। সব থেকে বড় লাভ দুধের উৎপাদন বাড়ে। আর দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি মানে গো-পালকের সামগ্রিকভাবে খরচ অনেক কমে। সুতরাং গো-পালকরা কম খরচে গবাদি প্রাণীদের প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের যোগানের জন্য ইউরিয়াজারিত খড়ের ওপর নিশ্চিতভাবে নির্ভর করতে পারেন।

ইউরিয়া মূলত প্রোটিন খাদ্যের পরিপূরক হিসেবে গবাদি পশুদের খাওয়ানো হয়। কেন্দ্রীয় দুগ্ধ গবেষণা সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী গবাদি প্রাণীদের মোট দানা জাতীয় খাদ্যের ২ থেকে ৩ শতাংশ এবং শুকনো খাবারের ২ শতাংশ ইউরিয়া খাওয়ানো যেতে পারে। এতে ইউরিয়ার বিষক্রিয়াজনিত কোন সমস্যা দেখা দেবে না। তবে বেশি মাত্রায় ইউরিয়া গবাদি পশুদের খাওয়ালে ওদের রক্তে অ্যামোনিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এই বর্ধিত অ্যামোনিয়া বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড যেমন পাইরুভিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, গ্লুটারিক অ্যাসিড প্রভৃতির সঙ্গে বিক্রিয়া করে শারীরবৃত্তীয় নানা কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটাবে। বিশেষ করে টি সি এ সাইকেল বা ক্রেবস চক্র বন্ধ হওয়ায় প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন বন্ধ হবে। ফলে ইউরিয়ার বিষক্রিয়াজনিত আক্রান্ত পশু অচিরেই মারা যাবে। সেই নির্দিষ্ট মাত্রার অর্থাৎ সুপারিশের চেয়ে বেশি পরিমাণে ইউরিয়া খড়ের সাথে দানা জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে গবাদি পশুদের খাওয়ানো যাবে না। এই সব কারণে কতটা পরিমাণে শুকনো খড়ের সঙ্গে কি হারে ইউরিয়া মিশ্রিত জল প্রয়োগে করা হবে এবং কোন পদ্ধতিতে ও কতটা পরিমাণে একটি গবাদি পশুকে খাওয়ানো চলবে সে বিষয়ে সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও প্রাণী বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রে বহু বছর ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে।

দীর্ঘ পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ১০০ কেজি শুকনো খড়ের সঙ্গে ২ থেকে ৪ কেজি পরিমাণ ইউরিয়া এবং ৬০ থেকে ১০০ মিলিলিটার জল ছাড়াও ২ থেকে ৩ কেজি বিভিন্ন খনিজ পদার্থ এবং ২ কেজি খাবার লবণ মিশিয়ে ভালভাবে নেড়ে তারপর যদি ঐ খড়কে পলিথিন ব্যাগে তিন দিন ভরে রেখে দেওয়া যায় তাহলে ঐ ইউরিয়া৺ রিত খড়ের খাদ্যগুণ শুকনো খড়ের থেকে অনেক বেশি হয়। প্যাকেটে ভরার তিনদিন পর প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক গবাদি প্রাণীকে গড়ে ৫ থেকে ৮ কেজি পরিমাণে ঐ খড় খাও৷ 'লে তার স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে। অনেকে এই খড় বস্তার মধ্যে ভরে রেখে দেন এবং প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ করে খরা ও বন্যার সময় অল্প পরিমাণে প্রতিদিন গবাদি পশুদের খেতে দেন। প্রথম দিকে ঐ খড় পশুরা খেতে না চাইলে অন্য খাদ্য যেমন খোল, ভুসি ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে অল্প অল্প করে খাবার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। বহু ে গা-পালক আবার পাকা গর্ত, কাঠের বাক্স অথবা টিনের মধ্যে ভরে রেখে ার ওপর পলিথিন চাদর ঢাকা দিয়ে মাস খানেক রেখে দেন। তবে এসবের থেকে খড়, জল ইউরিয়া, লবণ, ঝোলা গুড় ইত্যাদি মিশিয়ে পলিথিন প্যাকেটে তিন দিন রেখে তারপর গবাদি পশুদের সেই খড় খাওয়ানো সব থেকে ভাল।

উল্লেখ্য, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু ধানের খড়ই সব থেকে বেশি এবং সহজে পাওয়া যায় আর দামও কম পড়ে। সেই কারণে ধানের খড়ই ব্যবহার করা সব থেকে ভাল। বাজারে যে ইউরিয়া সার জমিতে দেবার জন্য বিক্রি হয় সেই ইউরিয়াকে খড়ের সঙ্গে মেশাতে হবে।

**শুকনো ও ইউরিয়াজারিত ধানের খড়ের বিভিন্ন খাদ্যগুণের শতকরা হিসেব**

| উপাদান | ডি এস আই | ক্রুডপ্রোটিন | ডি সি পি | টি ডি এন |
|---|---|---|---|---|
| শুকনো ধানের খড় | ১·৫-১·৮ | ৩.৫ | - | ৪০-৪২ |
| ইউরিয়াজারিত ধানের খড় | ২·০-২·২ | ৮·০ | ৪·০ | ৫০-৫২ |
| এই তালিকা পাওয়া গেছে চিন্নাস্বামী ও নটরাজন ১৯৯৩, এস এ ডি সি এম পি ইউনিয়ন লিমিটেড, তামিলনাড়ু। | | | | |

আবৃত অর্থাৎ কোটেড ইউরিয়া খড়ে মেশানো চলবে না। তবে গো-পালকদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে বেশি পরিমাণে যেন খড়ে ইউরিয়া মেশানো না হয়। বেশি ইউরিয়াতে গরু-মোষের শরীরে বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু অনিবার্য। প্রথমে গরু ছটফট করবে এবং মুখ দিয়ে প্রচুর লালা ঝরবে। পেট ফুলে যাবে ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেবে। এমন কি খিচুনিও হতে পারে। এইভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে দু-দিনের মধ্যে মরে যাবে।

সাধারণভাবে দেখা গেছে ইউরিয়াজারিত খড় খেলে গবাদি পশুর•গোবর সামান্য পাতলা হয়। এ ছাড়াও গোবরের রংটা একটু গাঢ় ও আঠালো হবে। গবাদি পশুর রোজ জল পানের চাহিদা যেমন বাড়বে তেমনি বাড়বে জলের পরিমাণ। এসব উপসর্গ তেমন কোন খারাপ বা ক্ষতিকারক নয়। তবে গরু মোষ যাতে তাদের চাহিদা মতো জল পান করতে পারে তার জন্য গো-শালায় পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে কোন অতিরিক্ত সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয় পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আরও খবরাখবর পেতে হলে যোগাযোগ করুন এন ডি আর আই এ ১২, কল্যাণী-৭৪১২৩৫, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

## গরু মহিষের দুধ বাড়াবার উপায়

পশ্চিম বাংলার গো-পালকদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে, গবাদি পশুদের বাঁটে দুধ নেই। দুধ মেলে তাদের মুখে। অর্থাৎ ভালভাবে খেতে দিলেই বেশি পরিমাণে দুধ পাওয়া যাবে। গবাদি পশু সব সময়েই খেতে ভালবাসে। সেই কারণে ওদের খড়, খইল, ভুসি, চুনি ইত্যাদি পেট ভরে দিলেই গরু বেশি দুধ দিতে শুরু করবে। ব্যাপারটা কিছুটা পরিমাণে সত্য হলেও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। দুধের পরিমাণ হয়তো বাড়বে, কিন্তু খাওয়াতে যে খরচ হবে তার অর্ধেক দামও উঠবে না। ফলে গো-পালক লোকসানের মধ্যে পড়ে যাবে। কাজেই গবাদি পশুদের যেমন সুষম খাদ্য দেওয়া হয় সে সবই দিতে হবে। এর সঙ্গে আলাদাভাবে কেবল মাত্র দুধ বাড়াবার জন্য কয়েকটি বিশেষ খাদ্যের তালিকা দেওয়া হলো।

এদের মধ্যে যে কোন একটি খাদ্য গবাদি পশুদের খাওয়ালে দুধের পরিমাণ সর্বোচ্চ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

১। কেবল মাত্র মুসুর ডাল ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম সিদ্ধ করে খাওয়ালে দুধ বাড়বে।

২। সিদ্ধ মাষকলাই, ভাত এবং মাড় অথবা নালী গুড় এই ক'টি ৫০০ গ্রাম পরিমাণ এবং ১২ গ্রাম পিপুল গুঁড়ো, খাবার লবণ ৬০ গ্রাম এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

৩। বাঁশ পাতা ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম জলে সিদ্ধ করে তাতে ৩০ গ্রাম জোয়ান ও ২০০ গ্রাম ঝোলা গুড় মিশিয়ে খাওয়ালে দুধ বাড়বেই।

৪। কাঁটানটে গাছ ছোট ছোট করে কেটে চালের ক্ষুদের সঙ্গে সিদ্ধ করে তাতে প্রয়োজন মতো খাবার লবণ মিশিয়ে গবাদি পশুদের দিনে একবার করে খেতে দিতে হবে।

৫। আখেব পাতা ও গাছ ছোট আকারের টুকরো করে কেটে গরু মহিষকে খাওযালে দুধের পবিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায়।

৬। প্রসবের পব এক সপ্তাহ বাদে আধভাঙা মাষকলাই ৫০০ গ্রাম, খুদ একই পরিমাণ, লবণ ৬০ গ্রাম, কাঁচা হলুদ ৩০ গ্রাম, পিপুল গুঁড়ো ৬০ গ্রাম, কালো জিরে ৩০ গ্রাম জলে একসঙ্গে সিদ্ধ করে তারপর ২৫০ গ্রাম ঝোলা গুড় মিশিয়ে সামান্য গরম অবস্থায় রোজ বিকেলের পর খাওয়াতে হবে। এর তিন থেকে চার দিন পর দুধের পরিমাণ বাড়তে শুরু করবে। এই খাদ্য বজায় রাখলে যতদিন গরু দুধ দেবে (গর্ভবতী হলেও) পরিমাণ খুব একটা কমবে না।

৭। খেঁসারির ডাল অথবা ভুসিব সঙ্গে চালতা অথবা তেঁতুল সিদ্ধ করে খাওযালে দুধ বাড়বে। পরিমাণটা হবে ডাল ৫০০ গ্রাম এবং চালতা ২টি। অপর দিকে তেঁতুল দিলে ৪ থেকে ৫টি দিলেই যথেষ্ট হবে।

৮। বাঁধাকপির পাতা, ফুলকপির পাতা ও গাজর পাতা গবাদি পশুদের অত্যন্ত দুধ বৃদ্ধি করে। এছাড়াও শালগম, মুলো এবং পেঁপের পাতা খাওয়ালে গরু-মহিষের দুধ বাড়ে।

৯। পলাশ ও শিমূল ফুল এক কেজি পরিমাণ একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে পারলে দুধ বাড়বেই। পাকা বেলের খোলা ফেলে দিয়ে অথবা কাঁচা বেল সিদ্ধ করে খাওয়ালেও দুধের পরিমাণ বেড়ে যায়।

১০। আলুর পাতাও গবাদি পশুর দুধ বৃদ্ধিকারক। এছাড়াও বীচিকলা, চালের খুদ এক সঙ্গে সিদ্ধ করে খাওয়ালে দুধের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

১১। দুগ্ধবতী গরু অথবা মহিষের দুধ হঠাৎ কমে গেলে অথবা একেবারে বন্ধ হলে কাঁচা পেঁপে ও পেঁপের পাতাকে একসঙ্গে বেটে চিনির গাদ অথবা ঝোলা গুড়ের সঙ্গে খাওয়ালে গাভী আগের মতো নিশ্চয় দুধ দিতে শুরু করবে।

১২। রোজ দশ লিটার জলে এক মুঠো খাবার লবণ এবং ৫০০ গ্রাম মাত গুড় গুলে খাওয়ালে গাভীর দুধ দেবার পরিমাণ বেড়ে যায়।

১৩। দুগ্ধবতী গরু অথবা মহিষকে ১ কেজি ২৫০ গ্রাম ভেলি গুড়, চার লিটার সিদ্ধ করা বার্লি জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিলে পুনরায় প্রসব করার এক মাস আগে পর্যন্ত দুধ দেবার শক্তি বজায় রাখতে পারে।

১৪। আম, কাঁঠাল ও আতার পাতা অথবা এই সব ফলের খোসা গবাদি পশুর দুধ বাড়তে সাহায্য করে।

১৫। শণ, ফুল ও পাতা অথবা মহুয়া ফুল মুটকা কচি ঘাসের সঙ্গে বা জল দিয়ে সিদ্ধ করে গবাদি পশুদের খেতে দিলে দুধ নিশ্চয় বাড়বে। তবে এর সঙ্গে ঝোলা গুড় ২৫০ গ্রাম পরিমাণ মেশানো দরকার।

১৬। পয়সা দিয়ে কোন উপাদান (কৃষিজাত অথবা শস্যজাত) কেনার মতো আর্থিক ক্ষমতা গো-পালকের না থাকলে গুলঞ্চ ছোট আকারে কেটে অথবা বাবলার শুঁটি ও থোড় গবাদি পশুদের খাওয়ালে দুধ বেশি পাওয়া যাবে।

## প্রজনন পদ্ধতি

ষাঁড় নির্বাচন করার পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রজনন পদ্ধতি। গো-পালকদের এ বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। গাভী ও ষাঁড়ের শরীরের ভেতরে বিভিন্ন প্রজনন যন্ত্রাংশ সম্পর্কে আলোচনা করবার আগে গাভীর গর্ভধারণের উপযুক্ত সময় সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

**গর্ভধারণ ঃ** সাধারণভাবে গাভী যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন তার দেহের মধ্যে প্রজনন ক্রিয়া শুরু হয়। সচরাচর একুশ দিন অন্তর গাভীদের উত্তেজিত হতে দেখা যায়। তবে এই সময়ের কিছুটা হের-ফের হতে পাবে। ইংবেজিতে এই সময়কে বলে ''হিট-পীরিয়ড্''। উত্তেজিত অবস্থায ৬ থেকে ২০ ঘণ্টাব মধ্যে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ব নিঃসৃত হয়। এরপর ঐ নিঃসৃত ডিম্ব থেকে যখন যে কোন একটি পুং বীর্যের সংস্পর্শে আসে, তখন ঐ ডিম্বটি উর্বর বা বীজায়িত হয়ে ওঠে। এর ফলে গাভী গর্ভবতী হয়। বিজ্ঞানীবা দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা করে দেখেছেন, গাভীর সঙ্গে ষাঁড়ের যৌন মিলনের পর ৪ থেকে ৯ ঘণ্টার মধ্যে শুক্রকীট বা পুং-বীজ গাভীর ডিম্ববাহী নলের ভেতরে ডিম্বের সংস্পর্শে এসে থাকে। এইখানেই গাভীর নিঃসৃত ডিম্ব পুং-বীজের সংস্পর্শে এসে বীজায়িত হয়।

**মিলনের পর প্রজনন ক্রিয়া ঃ** প্রজনন ক্রিয়ার নতুন রূপ হলো ভ্রূণ সঞ্চার। অর্থাৎ মিলনের পর গাভীর গর্ভে নব সৃষ্টি অর্থাৎ ভ্রূণ সঞ্চার হয়ে থাকে। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন, ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত ডিম্বের মধ্যে ঐ গাভীর বংশগত উপাদান বিদ্যমান থাকে। তেমনি পুং বীজের মধ্যে থাকে ষাঁড়ের বংশগত উপাদান। নবজাতক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তথা বংশগত ধারার সংযোগে গাভীও ষাঁড়ের সমান অংশ প্রাপ্ত হয়। এই সংযোগের কাজটি চলতে থাকে গাভীর দেহের ভেতরে। গর্ভের ভ্রূণ অবস্থা থেকে বাছুর প্রসব হওয়া পর্যন্ত বংশগত ধারার কাজ চলে।

**ভ্রূণের বৃদ্ধি ঃ** ডিম্ববাহী নলের ভেতরে ডিম্ব বীজায়িত (পুং বীজের সংস্পর্শে আসা) হবার পর জরায়ুর গায়ে সেঁটে বা আটকে থাকে। এরপর শুরু হয় তিনটি ঝিল্লির কাজ। এই তিনটি ঝিল্লির মধ্যে একটি ভ্রূণকে ঘিরে রাখে। এ ছাড়াও কয়েকটি রক্তবাহী শিরার সহযোগে গর্ভফুলের মাধ্যমে মাতা ও ভ্রূণের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে থাকে। বাকি দুটি ঝিল্লীর মধ্যে একটি তার থেকে নির্গত রসের সাহায্যে ভ্রূণকে রক্ষা করে। সর্বশেষ অর্থাৎ তৃতীয় ঝিল্লীটি ভ্রূণের মূত্রাদি ধারণ করে।

**গর্ভফুল ঃ** একটু আগেই গর্ভফুলের কথা বলা হয়েছে। এটি অন্য কিছু নয়, গাভী ও ভ্রূণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে থাকে। গর্ভফুলের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় খাদ্য ভ্রূণদেহে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গাভীর গর্ভে ভ্রূণ থাকা অবস্থায় তাকে বড় করতে এবং বাঁচিয়ে রাখতে গর্ভফুলের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

**নাভি-নাড়ী ঃ** ভ্রূণ দেহে রক্ত চলাচল যাতে ঠিক মতো হতে পারে তার জন্য নাভি নাড়ীর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া নাভি-নাড়ী গর্ভফুল ও ভ্রূণেব মধ্যে সংযোগ সাধনের কাজ করে থাকে।

## ষাঁড় ও গাভীর প্রজনন যন্ত্র

ষাঁড়ের প্রজনন যন্ত্রেব উল্লেখযোগ্য অংশ হলো প্রজনন দণ্ড বা লিঙ্গ এবং শুক্রবাহী নালী। এছাড়া রয়েছে অণ্ডকোষ, শুক্রকোষ, মূত্রনালী, কাউপার গ্রন্থি ও প্রস্টেট গ্রন্থি। শেষের দুটি গ্রন্থি অর্থাৎ কাউপার গ্রন্থি ও প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত
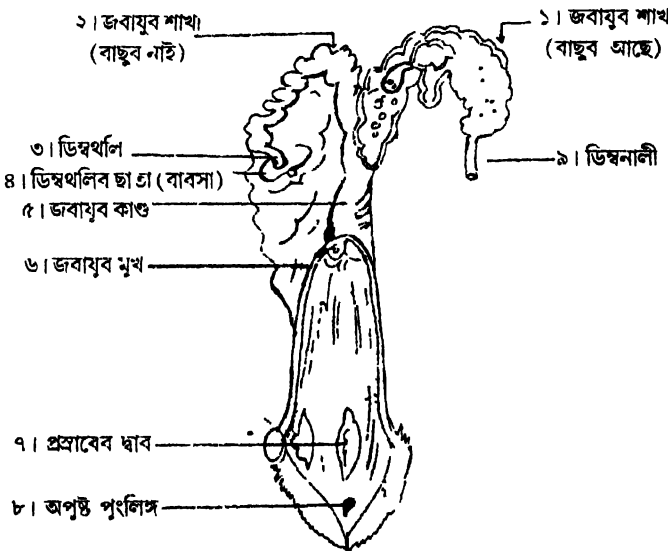
গাভীর প্রজনন যন্ত্র

আঠালো রস পুংবীজ বা শুক্রকীট আসতে সাহায্য করে। এরপর ষাঁড় উত্তেজিত হলে প্রজনন দণ্ড বা লিঙ্গের মাধ্যমে পুংবীজ গাভীর যোনিতে সঞ্চারিত হয়।

গাভীর প্রজনন যন্ত্রাদির সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি জটিল। তবে প্রধান কয়েকটি এখানে উল্লেখ কর হচ্ছে।

**ডিম্বাশয় ঃ** গাভীর প্রজনন যন্ত্রের মধ্যে দুটি ডিম্বাশয় থাকে। ছবিটি ভালভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে। এই ডিম্বাশয়ের কাজ হচ্ছে ডিম্ব উৎপাদন করা। যখন ডিমগুলি সম্পূর্ণভাবে পুষ্ট হয়ে ওঠে তখন ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ববাহী নলেতে ডিম্বগুলি সঞ্চারিত হয়। গাভী যখন গরম অর্থাৎ উত্তেজিত হয় সেই সময় অথবা তার কিছুটা সময় পরে ডিম্ববাহী নলে ডিম্ব সঞ্চারণ হয়ে থাকে।

**ডিম্ববাহী নালী ঃ** আগেই বলা হয়েছে, এখানে পুষ্ট ডিম্বের সঞ্চারণ ঘটে। তারপর ষাঁড়ের বীজের সংস্পর্শে নলের ওপর দিকে সঞ্চারিত ডিম্ব উর্বর হয়। ডিম্ববাহী নালীর আরও দুটি কাজ রয়েছে। এই নালী ডিম্বাশয় ও জরায়ুর মধ্যে সংযোগ সাধনের কাজও করে থাকে।

**জরায়ু ঃ** ডিম্ববাহী নল থেকে উর্বর ডিম্ব জরায়ুতে আসে। এরপর ঐ ডিম্ব জরায়ুগাত্রে সেঁটে যায় এবং প্রবর্ধিত হতে থাকে। ছবিটি ভালভাবে দেখলে বোঝা যাবে জরায়ুর সঙ্গে ডিম্ববাহী নালীর সংযোগ রয়েছে।

**ভাল্‌ভা ঃ** যোনিনালী তথা মূত্রনালীর বাইরের মুখটিকে বলা হয় ভালভা। যোনিমুখ মূত্রনালী তথা যোনিনালীর বাইরের দিকে গাভীর সমগ্র জরায়ু যোনিনালীর (যোনির) অংশ বিশেষ।

## দ্বিজাতীয় সংকর

পশুদের প্রজননের ক্ষেত্রে দ্বিজাতীয় সংকর জাত অর্থাৎ যাকে ইংরেজিতে "হাইব্রিড" বলে সে বিষয়ে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। হাইব্রিড বা দ্বি-জাতীয় সংকর এর অর্থ হলো একটি জন্তুর মধ্যে যে-কোন একটি বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে প্রকাশ পায় এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি অবদমিতরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। যেমন কোন শৃঙ্গহীন ষাঁড়ের সঙ্গে যদি শৃঙ্গযুক্ত গাভীর মিলন ঘটানো যায় তবে প্রথম জাত সংকর জাতের গরুটি শৃঙ্গহীন হলেও শৃঙ্গের বৈশিষ্ট্য অবদমিত রূপে প্রকাশ পেতে পারে। আবার ঐ বর্ণসংকর গাভীর জাতের ষাঁড়ের সঙ্গে যদি কোন বর্ণসংকর জাতের গাভীর মিলন ঘটানো যায় তবে নবজাতক বাছুরের মধ্যে শতকরা ২৫টি শৃঙ্গযুক্ত হতে পারে। অপরদিকে কালো রঙের ষাঁড়ের সঙ্গে যদি সাদা রঙের গাভীর মিলন ঘটানো যায় তবে বাছুর কালো রঙের হবে কিন্তু মুখের অংশ সাদা থাকবে। অনুরূপ বংশধারার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও বংশধরদের মধ্যে কখনও প্রবলভাবে আবার কোন ক্ষেত্রে অবদমিতভাবে প্রকাশ পেতে পারে।

## দ্বিজাতীয় সংকরের বৈশিষ্ট্য

দ্বিজাতীয় সংকর জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য কেবল চেহারার মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। সকল দিক থেকে এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মতো। এব্যাপারে মূল সূত্র হলো,

মিলনের ক্ষেত্রে ষাঁড় ও গাভী দুটোই ভাল জাতের এবং সেইসঙ্গে আলাদা শ্রেণীভুক্ত হওয়া দরকার। এইভাবে মিলন ঘটানো হলে বাছুরের স্বাস্থ্য অত্যন্ত সুগঠিত হয়। বলদেরও কর্মে দক্ষতা বাড়ে। গাভীর যেমন স্বাস্থ্য ভালো হয়, তেমনি দুধ দেবার ক্ষমতা অনেক বেশি হয়। কেবল গরুদের ক্ষেত্রে নয়, প্রায় অধিকাংশ গৃহপালিত পশু এবং গাছ-পালার ক্ষেত্রেও ভাল ফল পাওয়া গেছে।

## একই শ্রেণীর মধ্যে গবাদি পশুর মিলন

যদি একই শ্রেণীর গবাদি পশুদের মধ্যে প্রজনন বা মিলন ঘটানো হয় সেক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি মেনে চলা দরকার। ঐ দুটি পদ্ধতির মধ্যে একটি হচ্ছে ক্রমোন্নতি বা ইংরেজিতে বলা হয় আপগ্রেডিং। এক্ষেত্রে একই জাতের ষাঁড় ও গাভীর মধ্যে মিলন ঘটানো হয়। অপরটি হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রজনন। এই পদ্ধতি অনুসারে গাভী ও ষাঁড় কোন ভাবেই বর্ণ সংকর হবে না। একই জাতের উন্নত ধরনের পশুর প্রজনন করতে হবে। একে ইংরেজিতে বলা হয় "পিওর ব্রিডিং"। তবে প্রজননের ক্ষেত্রে যে দুটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হলো উভয় ক্ষেত্রেই ষাঁড় ও গাভী নির্বাচনের আগে সব কিছু সতর্কতার সঙ্গে বিচাব কবে দেখা দরকার। অর্থাৎ পশুর স্বাস্থ্য, সতেজতা, দুধের পরিমাণ ও শারীরিক পুষ্টি ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা করে দেখা হয়ে থাকে। এদের মিলনের ফলে যে বাছুর জন্মায় তার মধ্যে মা-বাবার বংশধারার গুণাবলী প্রায় পুরোপুরি বজায় থাকে।

## নিকট সম্পর্কযুক্ত মিলন

ইংরেজিতে এই ধরনের মিলনকে বলা হয় "ইনব্রিডিং"। দুটি পশুর মধ্যে পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্কযুক্ত যেমন বাবা—মেয়ে, মা—ছেলে, ভাই-বোনের মধ্যে মিলন ঘটানো হয়। এই ধরনের প্রজননের উদ্দেশ্য হলো, গরুর বৈশিষ্ট্য বাছুরের মধ্যে যাতে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ ঘটে।

## পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মিলন

ইংরেজিতে এই ধরনের প্রজননের নাম "লাইন ব্রিডিং"। এক্ষেত্রে একই জাতীয় দুটি পশুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে তবে ইনব্রিডিং মিলনে যেমন নিকট সম্পর্ক থাকে সেরকম সম্পর্ক থাকবে না। যেমন কাকা-ভাইঝি, মামা-ভাগনী, দাদু-নাতনীর মধ্যে মিলন ঘটানো হয়। এই ধরনের প্রজননের উদ্দেশ্য হলো, গরুর বংশধারার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাছুরের মধ্যে যাতে বজায় থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গবাদি পশুদের প্রজননের ক্ষেত্রে বংশধারার রেকর্ড, জাত, দুধ দেবার ক্ষমতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি দেখে নেওয়া দরকার। আমাদের রাজ্যে গ্রাম-বাংলায় গো-পালকরা এ সমস্ত ব্যাপারে মোটেই সতর্ক থাকেন না। সেই কারণে বাংলার গবাদি পশুদের স্বাস্থ্য যেমন দুর্বল তেমনি দুধ দেবার ক্ষমতাও খুব কম।

## কৃত্রিম প্রজনন

গাভীর গর্ভধারণের উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ তার দেহের ভেতরে যখন প্রজনন ক্রিয়া সূচিত হয় এবং উত্তেজিত হয়ে উঠলে ষাঁড়ের সঙ্গে মিলন ব্যতীত কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের কাজটি করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে ষাঁড়ের বীর্য বা শুক্র যন্ত্রের মাধ্যমে গাভীর যোনি পথের সাহায্যে জরায়ুতে নিক্ষেপ করে সন্তান উৎপাদন করানো হয়। এই ধরনের প্রজননের মূল তথ্য হলো, উদ্ভিদ জগতে মিলনের ক্ষেত্রে যেমন দৈহিক সংযোগ থাকে না অর্থাৎ পুরুষ ফুলের রেণু বাতাস অথবা কীট-পতঙ্গের মাধ্যমে স্ত্রী-ফুলের গর্ভকোষে প্রবেশ করে ফল উৎপাদন করে, এক্ষেত্রেও অনেকটা একই পদ্ধতি বলা চলে। বাতাস অথবা কীট-পতঙ্গের পরিবর্তে ষাঁড়ের বীর্য সিরিঞ্জের মাধ্যমে গাভীর জরায়ুতে নিক্ষেপের পর যে কোন একটি সতেজ শুক্রকীট গর্ভ উৎপাদন করে। কাজেই এই প্রণালীকে কৃত্রিম প্রজনন না বলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রজনন বললেই সব থেকে ভাল হয়। সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রায় অধিকাংশ গ্রামে সরকারি উদ্যোগে গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গ্রামের গো-পালকরা অনেকেই ঐ সব কেন্দ্র থেকে বর্তমানে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছেন।

## কৃত্রিম তথা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রজননের সুবিধা

এই ধরনের প্রজননে সুবিধে অনেক বেশি। কাবণ আমাদের দেশে ভাল জাতের ষাঁড়ের অভাব আজও মেটাতে পারিনি। এর ফলে গো-পালকরা অনেকটা বাধ্য হয়েই দুর্বল এবং প্রজননের পক্ষে অযোগ্য ষাঁড় ব্যবহার করে থাকেন। সরকার পরিচালিত গবাদি পশু প্রজনন কেন্দ্রে প্রজননের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট নির্বাচিত ষাঁড় পালন করা হয়। এছাড়াও প্রজননের জন্য ব্যবহৃত বীর্য প্রত্যেক বার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয়।

যদি কৃত্রিম প্রজনন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালানো যায় তবে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ব্যবস্থায় প্রজনন অপেক্ষা গর্ভধারণের সংখ্যা কৃত্রিম প্রজনন-ব্যবস্থায় বহুগুণ বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকে। বহুবার পরীক্ষা করে দেখা গেছে এতে সফলতা বেশি।

এছাড়াও বিজ্ঞানীরা আরও পরীক্ষা করে দেখেছেন, একটি ষাঁড়কে দিয়ে সারা বছরে প্রায় ৮০ বারের মতো প্রজননের কাজে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে একটি ষাঁড়ের একবার নিঃসৃত বীর্য থেকে প্রায় ২০টি গাভীকে প্রজনন করানো যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই ধরনের পদ্ধতিতে একটি ষাঁড়ের মাধ্যমে কমপক্ষে এক হাজার গাভীর গর্ভোৎপাদন করানো যায়।

এই প্রসঙ্গে গো-পালকদের একটি কথা অবশ্যই জেনে রাখা দরকার, একটি ষাঁড় প্রজননের উপযুক্ত হলে তার কার্যক্ষমতা বজায় থাকে চার বছর পর্যন্ত। সুতরাং ঐ চার বছরের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে মাত্র চার শত গাভীর প্রয়োজন

মিটতে পারে। অপরদিকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে চার হাজার বা তার থেকে কিছু বেশি গাভীকে প্রজনন করানো যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, অল্প সংখ্যক ষাঁড় হলেই ভাল বাছুর উৎপাদনের সমস্যা বা অভাব মেটানো সম্ভব হচ্ছে।

## কৃত্রিম প্রজননে সুনিশ্চিত ফল

স্বাভাবিক প্রজনন-ব্যবস্থার মাধ্যমে গাভীর যেমন গর্ভোৎপাদন হয়ে থাকে তেমনি কৃত্রিম বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেও গাভীর গর্ভ সঞ্চার ও সন্তান উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রজননের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধাও রয়েছে। অবশ্য গো-পালকরা একটু সতর্ক হলে তেমন অসুবিধা নাও দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে মূল কথা হলো, গাভীর প্রকৃত উত্তেজিত সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম রয়েছে। সেগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করে এবং পরবর্তীকালে সেই মতো ব্যবস্থা করলে সব বিষয়েই সুফল লাভ করা যায়।

**যেসব পদ্ধতি মেনে চলা দরকার ঃ** (১) যে কোন জাতের বা শ্রেণীর গাভী হোক না কেন তার শরীরের ভিতরে প্রজনন যন্ত্রপাতির স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে দু'মাসের মতো সময় লেগে যায়। এই সময়ের পর কিছু ক্ষেত্রে গাভীর শরীরে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। একে বলে গাভীর প্রথম উত্তেজক অবস্থা। যদিও এই সময় গাভীর সঙ্গে ষাঁড়ের স্বাভাবিক মিলন অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন করালে গর্ভ উৎপাদন হয় কিন্তু এটা করা কোন মতেই ঠিক নয়। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পর্যায়ে গাভী উত্তেজিত হলে তখন যদি মিলন (কৃত্রিম অথবা স্বাভাবিক) ঘটানো হয় তাহলে গর্ভ উৎপাদন সম্পর্কে কোন রকম আশঙ্কা থাকে না। এই প্রসঙ্গে গো-পালকদের আরও একটি কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার, প্রসবের ২ মাস বা ৬০ দিন পর গাভী প্রথম উত্তেজিত হলে দ্বিতীয়বার উত্তেজনার সঞ্চার হয় ২১ দিন পর। তৃতীয় পর্যায়ে সময়ের ব্যবধান থাকে একই।

(২) সাধারণভাবে দেখা গেছে, গাভীর উত্তেজনার কাল বা সময় শেষ হবার প্রায় ১৪ ঘণ্টা পর ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ববাহী নলেতে ডিম্ব সঞ্চালিত হতে থাকে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে আরও দেখেছেন, গাভীর উত্তেজনার সময় শেষ হবার ৬ ঘণ্টার মধ্যে ডিম্ব নিঃসরণের কাজ শুরু হয় না। কাজেই এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাভীর ডিম্ববাহী নলে ১৪ ঘণ্টার পর ডিম্ব নিঃসরণ হবে। সুতরাং সরকার পরিচালিত গো প্রজনন কেন্দ্রে গিয়ে জানানো দরকার প্রথম কখন পালিত গাভীর মধ্যে উত্তেজক অবস্থার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। প্রজননের কাজ শেষ হলে কিভাবে কাজ করা হলো (কৃত্রিম অথবা স্বাভাবিকভাবে মিলন), ষাঁড়ের বংশধারা, মিলনের তারিখ ও সময় লিখে রাখা দরকার। এর উদ্দেশ্য হলো, বাছুরের বংশধারা যেমন সঠিকভাবে বলা যাবে তেমনি গাভীর প্রসবের দিন হিসেব করে বার করতে কোন রকম অসুবিধা হবে না।

(৩) প্রজনন কেন্দ্রে প্রজননের কাজ শেষ হলে গাভী দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই কারণে তার কিছু সময় বিশ্রামের প্রয়োজন। স্বাভাবিক অথবা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রজননের পর খুব কম করে চার ঘণ্টা কোন রকম পরিশ্রমের কাজ করা চলবে না। এমন কি গো-পালকের বাড়ি যদি প্রজনন কেন্দ্র থেকে ১ কিলোমিটার দূরেও হয় তাহলেও গাভীকে হাঁটিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কারণ দেখা গেছে, মিলনের পর বিশ্রাম না নিয়ে (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) কোন রকম পরিশ্রমের কাজ করানো হলে গাভীর গর্ভ সঞ্চারে অনিশ্চয়তা থাকে।

(৪) যদি কোন কারণে গো-পালক গাভীর উত্তেজনা কাল ঠিকভাবে ধরতে বা বুঝতে না পারেন তবে দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাভীকে অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করানো দরকার। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ষাঁড়ের বীর্য গাভীর যোনিতে সঞ্চালিত করবার পর কিছুক্ষণ বাদেই যোনি পথের মাধ্যমে বাইরে বার হয়ে আসে। এক্ষেত্রেও গাভীকে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

(৫) স্বাভাবিক অথবা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রজননের পর যদি গাভীর কোন রকম অসুবিধা না থাকে তবে ১২ সপ্তাহ বা তিন মাস পব চিকিৎসক দ্বারা পশুকে একবার পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া দরকার।

(৬) আগেই বলা হয়েছে প্রজননের তারিখ গো-পালকরা অবশ্যই লিখে রাখবেন। এতে গাভীর প্রসবের সময় সহজেই বুঝতে পাবা যায়। গাভীর গর্ভ সঞ্চার থেকে প্রসব করা পর্যন্ত সময়কে গর্ভধারণ কাল বলা হয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে এবং বিশেষ কয়েকটি কারণে গাভীর গর্ভধারণের সময় কিছুটা কম বা বেশি হলেও গড়ে সময় লাগে ২৮০ দিন। অপরদিকে মহিষের ক্ষেত্রে গর্ভধারণের গড় সময় হলো ৩১০ দিন।

## কৃত্রিম প্রজননের জন্য বীজ সংগ্রহ

কৃত্রিম প্রজননের জন্য ষাঁড়ের বীজ বা বীর্য আগে থাকতে সংগ্রহ করে রাখা হয়। এই কাজের জন্য প্রয়োজন ১৬ ইঞ্চি লম্বা বিশেষভাবে নির্মিত (কৃত্রিম যোনিদ্বার) একটি নল। এই বীজ সংগ্রহের নলটির চারপাশে গরম জল রাখবার জন্য আধারের ব্যবস্থা থাকে। বীজ সংগ্রহ করবার ঠিক আগে ঐ আধারে গরম জল ভর্তি করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলে, যাতে নলের উষ্ণতা গাভীর যোনিদ্বারের অনুরূপ হয়। নলের দুটি মুখের মধ্যে একদিক খোলা অবস্থায় থাকে এবং অপরদিকটিতে থাকে বীজ সংগ্রহের থলি। ব্যবহারের আগে নলের ভিতরে বিশুদ্ধ তেল অথবা মুখে মাখবার ভেসলিন মাখিয়ে নিতে হয়।

সংযোগের সময় বীজ-সংগ্রহ নলের খোলা মুখের মধ্যে ষাঁড়ের পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। উত্তেজিত ষাঁড়ের পুরুষাঙ্গ থেকে ঐ নলের মধ্যে বীর্য পড়ে। সাধারণতঃ দেখা গেছে, এই পদ্ধতিতে একটি ষাঁড়ের কাছ থেকে একবারে ৩ থেকে ৫ মি.লি. বীর্য পাওয়া যায়।

**বীর্য পরীক্ষা ঃ** ষাঁড়ের কাছ থেকে বীর্য সংগ্রহ করবার পর তা প্রতিক্ষেত্রেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া দরকার। ভাল ও সবল ষাঁড়ের বীর্যের মধ্যে শুক্রকীটগুলিব আকাব অনেকটা ব্যাঙাচির মতো দেখায়। মাথার সঙ্গে জোড়া একটা লেজ সমেত কিছু পোকা (শুক্রকীটগুলি) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দেখা যাবে ছুটাছুটি করছে।

**বীর্যকে ব্যবহারের উপযোগী করা ঃ** বিশেষ ধরনের নলেতে ষাঁড়ের কাছ থেকে একবার সংগ্রহ করা বীর্যে কোটি কোটি শুক্রকীট থাকে। গাভীর গর্ভসঞ্চারের জন্য একটি মাত্র শুক্রকীটের প্রয়োজন হয়। কাজেই সংগৃহীত বীর্যকে যদি কিছুটা পাতলা করে নেওয়া হয তাহলেও প্রজনন ক্ষমতা ঠিক থাকে। সুতরাং বীর্যকে পাতলা কবে পরিমাণ বাড়ালে অধিক সংখ্যক গাভীকে প্রজনন করানো যায়। সাধারণতঃ বীজকে ১০ থেকে ১৫ গুণ পাতলা কবা হযে থাকে। এই কাজটি করা হয় ডিমের কুসুম বা হলদে অংশ সোডিয়াম সাইট্রেট গোলা জলের সঙ্গে মিশিয়ে পরে ঐ মিশ্রণের ৯ ভাগ নিয়ে তার সঙ্গে ১ ভাগ ষাঁড়েব বীজ মিশিযে দিতে হয়।

**বীজ সংরক্ষণ ঃ** বীর্য সংগ্রহ করবার পর এক ঘণ্টার মধ্যে সবটুকু যদি প্রজননের কাজে লাগানো যায় তবে কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু তার বেশি সময ধরে রেখে দিতে হলে ঐ বীর্যকে ভালভাবে এবং বৈজ্ঞানিক উপাযে সংরক্ষণ করা দবকার। সেক্ষেত্রে বীজকে বেফ্রিজাবেটর বা থার্মস ফ্লাস্কে রাখা হয়ে থাকে। এইভাবে বাখলে ঠাণ্ডায় বীজ তিন থেকে চাব দিন পর্যন্ত ভাল থাকে। তবে এক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা দবকাব। কারণ ববফপূর্ণ থার্মস ফ্লাস্কের ভিতব বীজপূর্ণ টেস্ট-টিউব বাখলে হঠাৎ অতিবিক্ত ঠাণ্ডা লেগে বীজ নষ্ট হতে পারে। সেই কাবণে বীজপূর্ণ টেস্ট-টিউবেব চাবপাশে তুলো জড়িয়ে অপর একটি বড় কাচের টিউবেব মধ্যে বেখে তারপর ফ্লাস্কের মধ্যে বাখা চলে।

## কৃত্রিম প্রজননে বীজ প্রয়োগের সরঞ্জাম

সরকাবি পশু চিকিৎসক কেন্দ্রের চিকিৎসক কৃত্রিম বীজ প্রযোগের ক্ষেত্রে নিজে সব কিছু করলেও গো-পালকদেব সরঞ্জামগুলির নাম জানা থাকলে সুবিধে হয়। সেই কারণে সবঞ্জামগুলির নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

(ক) স্পেকুলাম, এটি প্রায় ১৬ ইঞ্চি লম্বা। এর হাতলটি টিপলে ফলা দুটি ফাঁক হয়ে যায়।

(খ) কাচের তৈবি সিরিঞ্জ। এই যন্ত্রটিকে আমবা বাংলায় পিচকারী বলে থাকি।

(গ) বীজ প্রযোগের এবোনাইট নজল। এই নজল এবোনাইটের তৈরি একটি শক্ত নল বিশেষ। ছোট রবারের নলের সঙ্গে সিরিঞ্জের মুখে লাগানো থাকে।

এই তিনটি প্রধান যন্ত্র ছাড়াও প্রয়োজন হয় ফ্লাস্ক, গ্লিসারিন, বিশুদ্ধ জল এবং কার্বলিক সাবান।

## গর্ভবতী গাভীর যত্ন

গাভী গর্ভবতী হলে সাত মাস পর্যন্ত দুধ দোহন করা যেতে পারে। এর পরেও যদি দুধ দোহন করা হয় তাহলে গর্ভস্থ ভ্রূণের পুষ্টিব ব্যাঘাত হতে পারে। কাজেই

গর্ভবতী গাভীর সাত মাসের পর দুধ দোহন করা উচিত নয়। পূর্ণ গর্ভবতী গাভীকে সাবধানে রাখা দরকার। এই সময় কুকুর সহ অন্যান্য জন্তু তাড়া করলে অথবা অবাঞ্ছিত ষাঁড়ের সংযোগ ক্ষতি হতে পারে। কড়া জোলাপ ব্যবহার করলে গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে। যদি এ সময় গাভীর কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয় তাহলে কিছুটা পরিমাণে কাঁচা তিসির তেল খাওয়ালে উপকার হয়।

**প্রসবের বিভিন্ন স্তর ঃ পূর্ব লক্ষণ**—প্রসবের কয়েক দিন অথবা কয়েক ঘণ্টা আগে পূর্ব লক্ষণ দেখা দিতে পারে। পালান ভরে ওঠে এবং আঠালো জলের মতো স্রাব বের হয়। প্রসবদ্বারে রস নিঃসরণ সহ পেট ঝুলে পড়ে। গাভী উত্তেজিত হয় এবং ডাকে।

**জরায়ুর মুখের ছিদ্রপথ প্রসারিত ঃ** এর ফলে গাভীর প্রসব বেদনা শুরু হয়। গাভী ছটফট করে। একবার শুয়ে পড়ে, আবার উঠে দাঁড়ায়। এই সময় বেদনা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আসে। যখন ব্যথা জোরে আসে, তখন পেট টেনে ধরে এবং কোঁথ দেয়। আবার ব্যথা থেমে গেলে গাভী শান্ত হয়ে যায়।

**বাছুর প্রসব ঃ** পানমুচি (জলের থলি) সমেত বাছুর জরায়ু থেকে বের হয়ে এসে প্রসবদ্বারের দিকে এগিয়ে আসে। বাছুরের মাথার চাপে প্রসবপথ প্রসারিত হয়। শেষে পানমুচি ফেটে গিয়ে জলীয় পদার্থে প্রসব পথ ধুয়ে যায় এবং পিচ্ছিল হয়। স্বাভাবিক প্রসব হলে বাছুরের সমানের দুটি পা প্রসারিত এবং মাথা ঐ দুটি পায়ের ওপর সরল রেখায় থাকে। সেই কারণে প্রথমে বাছুরের সামনের দুটি পায়ের খুর এবং তার পিছনে ও উপরে মুখ প্রসবদ্বারে দেখা যায়। মাথা ও কাঁধ বের হবার পর বাকি অংশ সহজেই বের হয়ে আসে।

**গর্ভফুল পড়া ঃ** প্রসব করার পর গাভীর জরায়ু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সঙ্কুচিত হয়। এই সময়ের মধ্যেই জরায়ু থেকে ফুল আলাদা হয়ে যায়। সাধারণভাবে দেখা গেছে, দুটি কাজে সময় লাগে প্রায় তিন ঘণ্টা। কিছু ক্ষেত্রে গাভীর ফুল পড়তে এর থেকেও কিছুটা বেশি সময় লাগে। তবে এতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। যদি দেখা যায়, প্রসবের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুল পড়েনি তাহলে পশু চিকিৎসককে অবশ্যই খবর দিতে হবে।

**প্রসবকালে গাভীর যত্ন ঃ** প্রসব বেদনা শুরু হলেই গাভীকে আলাদা ভাবে রাখা দরকার। অচেনা লোক অথবা বাড়িতে গোলমাল হলে গাভী ভয় পেতে পারে। যেখানে গাভীকে রাখা হবে সেখানে পুরু করে খড় বিছিয়ে দেওয়া দরকার আর কিছু কচি ঘাস মুখের কাছে রাখতে হবে। যাতে গাভী প্রয়োজন বুঝলে এবং তার ইচ্ছে ও রুচি মতো খেতে পারে।

প্রসব নিজের থেকে হবার পর এবং গর্ভফুল পড়ে গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলতে হবে। কারণ গাভী অনেক সময় গর্ভফুল খেয়ে ফেলে। সুতরাং এ ব্যাপারে আগে থাকতে সাবধান হওয়া দরকার। এরপর সামান্য গরম জলে পরিমাণ মতো ডেটল মিশিয়ে সেই জলে প্রসবদ্বার ভাল করে ধুয়ে মুছে দিতে হবে।

প্রসব করার পর গাভী পনের মিনিট থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যেই উঠে দাঁড়ায়। শীতকালে এবং রাতের দিকে গাভী প্রসব করলে প্রসবদ্বার ধুয়ে দেবার পরে গাভীর গায়ে লম্বা চট চাপা দেওয়া ভাল। এরপর ঈষদুষ্ণ জলে গমের ভুসি, গুড় এবং সামান্য লবণ মিশিয়ে গাভীকে খেতে দেওয়া দরকার।

## প্রসবের সময় নিরূপণ

গাভী সাধারণভাবে গর্ভসঞ্চারের দিন থেকে ২৮২ দিন পরে বাছুর প্রসব করে।

| ষাঁড়ের সঙ্গে সংযোগের তারিখ | বাছুর প্রসবের তারিখ | ষাঁড়ের সঙ্গে সংযোগের তারিখ | বাছুর প্রসবের তারিখ |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারি —১ | অক্টোবর —১১ | এপ্রিল —১ | জানুয়ারি —৯ |
| ,, —১১ | ,, —২১ | ,, —১১ | ,, —১৯ |
| ,, —২১ | ,, —৩১ | ,, —২১ | ,, —২৯ |
| ,, —৩১ | নভেম্বর —১০ | | |
| | | মে —১ | ফেব্রুয়ারি —৮ |
| ফেব্রুয়ারি —১০ | নভেম্বর —২০ | ,, —১১ | ,, —১৮ |
| ,, —২০ | ,, —৩০ | ,, —২১ | ,, —২৮ |
| | | ,, —৩১ | মার্চ —১০ |
| মার্চ —২ | ডিসেম্বর —১০ | জুন —১০ | মার্চ —২০ |
| ,, —১২ | ,, —২০ | ,, —২০ | ,, —৩০ |
| ,, —২২ | ,, —৩০ | ,, —৩০ | এপ্রিল —৯ |
| জুলাই —১০ | এপিল —১[illegible] | নভেম্বর —৭ | আগস্ট —১৭ |
| ,, —২০ | ,, —২৯ | ,, —১৭ | ,, —২৭ |
| ,, —৩০ | মে —৯ | ,, —২৭ | সেপ্টেম্বর —৬ |
| আগস্ট —৯ | মে —১৯ | ডিসেম্বর —৭ | সেপ্টেম্বর —১৬ |
| ,, —১৯ | ,, —২৯ | ,, —১৭ | ,, —২৬ |
| ,, —২৯ | জুন —৮ | ,, —২৭ | অক্টোবর —৬ |
| সেপ্টেম্বর —৮ | জুন —১৮ | | |
| ,, —১৮ | ,, —২৮ | | |
| ,, —২৮ | জুলাই —৮ | | |
| অক্টোবর —৮ | জুলাই —১৮ | | |
| ,, —১৮ | ,, —২৮ | | |
| ,, —২৮ | আগস্ট —৭ | | |

## প্রসবের পূর্বে গাভীর পরিচর্যা

প্রসবকালের কিছুদিন আগে গাভীকে প্রসবের উপযুক্ত একটি অপক্ষোকৃত বড় ঘরে (এবং প্রসবের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ঃ Well Bedded Calving Stall) রাখতে হবে। অনেক সময় প্রসবের পূর্বে অতিরিক্ত দুগ্ধবতী গাভীর দুধের বাঁটটি এত ফুলে ওঠে যে—দুগ্ধ দোহন অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রসবের পূর্বে কোন কারণবশতঃ দুগ্ধ দোহন করা নিষিদ্ধ। কিন্তু কেবলমাত্র অত্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে (Extreme Cases) এই অবস্থায় কেহ কেহ দুগ্ধ দোহন করে থাকেন।

প্রসবের পূর্বে গাভীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করাতে হবে। শীতকালে এই পানীয় জল ঈষদুষ্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রসবকালীন শ্লেষ্মা তথা স্রাবাদি অবিলম্বে পরিষ্কার করা দরকার—কারণ গাভী তার Instinct বশতঃ সেগুলো খেয়ে ফেলতে পারে। প্রসবের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেও যদি গর্ভফুল ও শ্লেষ্মা-স্রাবাদি নিঃসরিত না হয়—তবে অভিজ্ঞ পশু-চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

প্রসবের পরে গাভী দুগ্ধ-জ্বর অথবা কিটোসিসে (Ketosis) ভুগছে কিনা—সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

যদি দুগ্ধ-জ্বর বা কিটোসিসের লক্ষণ দেখা যায়—অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যখন গাভীটি খেতে চাইবে তখন তাকে নির্দিষ্ট আহার্য প্রদান করতে হবে। বাছুরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মায়ের কাছে ছেড়ে দিতে হবে। বাছুব সবটুকু দুধ টানতে পারে না—অতএব পরবর্তী পর্যায়ে নিয়মিত দুগ্ধ দোহন করা আবশ্যক।

**উত্তেজনার কাল (Heat Periods) ঃ** যদিও গাভী বা বক্‌না বাছুরদের উত্তেজনা কাল সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে তবে সচরাচর গাভীর ক্ষেত্রে ২১ দিন অন্তর অন্তর উত্তেজনা কাল সূচিত হয়ে থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রে ১৭ দিন থেকে ২৬ দিন অন্তর অন্তর উত্তেজনা কাল সূচিত হয়। এই উত্তেজনা কাল ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে; তবে গাভীর উত্তেজনা কাল সচরাচর ১৮ ঘণ্টা এবং বক্‌না বাছুরের ক্ষেত্রে ১৫ ঘণ্টা সময় পর্যন্ত এই উত্তেজনা বিদ্যমান থাকে। কৃত্রিম তথা স্বাভাবিক প্রজনন ব্যবস্থায় উত্তেজনার মধ্যবর্তী সময়ে অথবা শেষে সংযোগ সাধন বাঞ্ছনীয়।

প্রজননের দু'প্রকার ব্যবস্থা রয়েছে (১) স্বাভাবিক আর (২) কৃত্রিম। প্রজনন সংক্রান্ত পর্যায়ে এই দুই প্রকার ব্যবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে।

স্বাভাবিক প্রজনন ব্যবস্থায় ষাঁড়ের সঙ্গে গাভীর বা বক্‌না বাছুরের সংযোগ সাধন করিয়ে দেওয়া হয়—বিশেষ করে যে সকল অঞ্চলে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা নেই।

কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার সুবিধা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রজনন ব্যবস্থার (Natural Breeding) কতকগুলি বিশেষ সুবিধা উল্লেখ করা হোল ঃ

(ক) এই ব্যবস্থার দ্বারা গাভীর বা বক্না বাছুরের উত্তেজনা কাল সহজেই নিরূপণ করা যায়;

(খ) কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার রক্তধারা (Blood Line) নিরূপণ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু স্বাভাবিক প্রজনন ব্যবস্থায় রক্তধারা (Blood Line) নিরূপণ করা সম্ভব।

(গ) উত্তেজনা কালে ষাঁড়ের সঙ্গে একাধিক বার মিলন ঘটানো সম্ভব, যে সকল গাভীর যোনি থেকে পুংবীজ বাইরে বেরিয়ে আসে—সেই সকল গাভীর ক্ষেত্রে একাধিক বার বা বারবার মিলন প্রশস্ত বিবেচিত হয়ে থাকে।

## গো-শালা বা বাড়িতে প্রতিপালিত গাভীর আবাস-স্থল

গোয়ালঘরটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত করা সঙ্গত। বাড়ির গোয়ালঘরটিও আলো-হাওয়া যুক্ত তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া বিধেয়। গো-শালায় যেহেতু অনেক সংখ্যক গরু থাকে—সেই হেতু আবাসস্থলটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হওয়া সঙ্গত এবং যাতে গোয়ালঘরটি সহজেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা যায়—তৈরি করার সময়ে সে বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত। প্রত্যেকটি গাভীর জন্য কমপক্ষে ৬ বর্গ মিটার স্থান আবশ্যক। মহিষের জন্য কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ বর্গমিটার স্থান আবশ্যক।

প্রত্যেক গাভীর জন্য পৃথক পৃথক স্টল (Stall) আবশ্যক। প্রত্যেক স্টলের সামনে খাওয়ার জায়গা বা গামলা (Feeding Frough) অথবা ঢাকনা হীন লম্বা খাবার পাত্র থাকা আবশ্যক। আর পিছনের দিকে থাকবে নালা (Drain)। যেক্ষেত্রে গো-শালায় অধিক সংখ্যক গাভী বা গরু রাখা হয় সেক্ষেত্রে গাভী বা গরুদের দু'টি লাইন করে রাখা যেতে পারে। মুখ একদিকে, পশ্চাদ্ভাগ একদিকে। গোয়ালঘরে আলো হাওয়া থাকা প্রয়োজন। অতি ঠাণ্ডায় বা অতি গরমে গাভীর দুধের বাঁট ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে এবং দুধের বাঁট সংক্রান্ত কোন রাগ সূচিত হতে পারে।
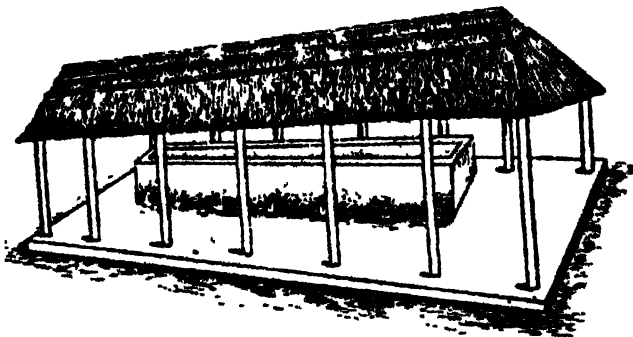
গ্রামাঞ্চলের গো-শালায় গাভীদের লম্বা ধরনের খাদ্য খাবার জায়গা

গোয়ালঘরের মেঝেটি Concrete হবে বটে—তবে যেন পিচ্ছিল ধরনের (Slippery) না হয়—সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। মেঝেটা পিচ্ছিল ধরনের না

হ'লেও—এমন হওয়া উচিত, যা সহজেই পরিষ্কার করা চলে। সচরাচর পাশাপাশি ইট বসিয়ে—ইটের ফাঁকগুলো সিমেন্ট বালি দিয়ে ভরাট করা হয়ে থাকে। এর ফলে মেঝে পিচ্ছিল ধরনের হবে না—অথচ পরিষ্কার করা সম্ভব হবে।

'Ventilation'-এর পদ্ধতি in lets এবং outlets যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে গবাদি পশুর ঘর আলো হাওয়া যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শীতপ্রধান তথা শুষ্ক মরুভূমি তুল্য অঞ্চলে Ventilation-এর মাধ্যমে বাইরের আলো-হাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক।

## ষাঁড়

প্রজননের জন্য গো-শালায় যে ষাঁড় রাখা হয়, তার জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বাসস্থানটি ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৩ মিটার প্রশস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গরম ও শীতল আবহাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য ঘরটি ঝাপ যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাছাড়া প্রজননের জন্য নিযুক্ত ষাঁড়টিকে মাঝে মাঝে ব্যায়াম করানো উচিত। Bull-shed-এর সংলগ্ন প্রাচীর ঘেরা একটি মাঠ আবশ্যক। মাঠটি কমপক্ষে ২০ মিটার চওড়া এবং ৪০ মিটার লম্বা হওয়া আবশ্যক। মাঠের মাঝে দু'একটি খালি ড্রাম রাখা যেতে পারে যাতে ঐ ড্রামটি নিয়ে ষাঁড়টি মাঝে মাঝেই খেলা করতে পারে।

তাছাড়া ষাঁড়ের আবাসটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত যার পাশ দিয়ে অনবরত গাভীদের যাতায়াত রয়েছে। ষাঁড়টি তাহ'লে ব্যায়ামের প্রতি ঝুকবে—তাছাড়া গাভীরা পাশ দিয়ে যাতায়াত করলে, এবং মাঝে মাঝে ষাঁড়ের কাছে এলে—ষাঁড়টির স্বাভাবিক হিংস্রতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

দুই-তিন বছর বয়স হ'লেই ষাঁড় সচরাচর প্রজননের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ষাঁড়টি Full-grown (উপযুক্ত বয়সপ্রাপ্ত হচ্ছে অর্থাৎ আড়াই বছরের না হচ্ছে) ততক্ষণ পর্যন্ত ষাঁড়টি যতই হৃষ্টপুষ্ট হোক—ষাঁড়টির প্রজনন ব্যাপারটা সীমিত রাখতে হবে। পূর্ণ বয়স্ক একটি ষাঁড়কে সপ্তাহে চারবাব প্রজননের কার্যে নিয়োগ করা যায়। তবে দু'সপ্তাহ ধরে এভাবে প্রজননের জন্য নিয়োগ করার পর ষাঁড়কে অন্তর্বর্তী এক সপ্তাহ কাল প্রজনন কাজে নিয়োগ করা সঙ্গত হবে না।

যদি সমগ্র বছর ধরে প্রজননের কার্য বিক্ষিপ্তভাবে করা হয়—তবে ৫০।৬০টি গাভী বা বক্না বাছুরের (Heifer) জন্য একটি ষাঁড়ই ব্যবহার করা চলতে পারে। সচরাচর ৩০টি গাভীর জন্য একটি ষাঁড়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। যদি দু' থেকে তিন মাসের ভিতর গো-শালার অধিক সংখ্যক গাভীর বা বক্না বাছুরের প্রজননের জন্য নিয়োগ করা হয়—কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে প্রতি ৩০টি গাভী (বা বক্না বাছুরের জন্য) একটি করে ষাঁড় প্রয়োজন নতুবা প্রতি ৫০।৬০টি গাভীর জন্য একটি ষাঁড়ই যথেষ্ট।

## বাছুর পালন

**নবজাত বাছুরের পরিচর্যা ঃ** পৃথিবী আলো দেখার পর নবজাত বাছুর সাধারণতঃ এক ঘণ্টার মধ্যে গাভীর দুধ খেতে শুরু করে। কুড়ি দিন পর্যন্ত গাভীর

দুধকে গাজলা দুধ বলা হয়। এই দুধ হলো সারক। গাঁজলা দুধ বাছুর খাওয়া শুরু করলে পেটের মধ্যে জমে থাকা ময়লা বের হয়ে গিয়ে পেট পরিষ্কার হয়ে যায়। কাজেই ঐ কয়েক দিনের দুধ মানুষের পক্ষে খাওয়া ক্ষতিকর।

অবশ্য তার আগে অর্থাৎ বাছুর প্রসবের পর তার নাক ও মুখ থেকে শ্লেষ্মা জাতীয় চট্‌চটে আঠা এবং অন্যান্য পদার্থ পরিষ্কার করে দিতে হবে। পরিষ্কার করে দেবার পর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাছুর ঠিকমতো শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছে না। এই রকম ক্ষেত্রে বাছুরের পিছনের দুটি পা ধরে ওপর দিকে তুলে ধরে মাথাটি নিচুর দিকে রাখতে হবে। এভাবে কয়েকবার ওপর-নিচ করলে বাছুরের শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য আপনা থেকেই শুরু হয়ে যাবে। এই পদ্ধতিতে যদি ঠিকমতো কাজ না হয় তাহলে বুকে গরম ন্যাকড়ার সেঁক অথবা বুক হাত দিয়ে মালিশ করলে বাছুরের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

বাছুর যখন ঠিকমতো শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সক্ষম হবে তখন তার নাভিদেশে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক জীবাণু মুক্ত করা দরকার। দেহ থেকে ২·৫ সেন্টিমিটার দূরে বাছুরের নাভিবজ্জুটি (নাড়ী) বেঁধে দিতে হবে। এরপর নাভিবন্ধনীর ঠিক এক সেন্টিমিটার নিচে নাড়ী কেটে ফেলা দরকার। রোগ-জীবাণুর হাত থেকে ঐ জায়গাটি সুরক্ষিত করার জন্য কাটা জায়গায় অর্থাৎ নাভিতে জল মেশানো ডেটল অথবা আইওডিন লাগানো উচিত।

প্রসবের পর গাভী যদি বাছুরের গা চেটে পরিষ্কার করে না দেয় তবে সে ক্ষেত্রে গো-পালককে শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে বাছুরের গা মুছে দিতে হবে। শীতকালে বিশেষ করে রাতের দিকে গাভী প্রসব করলে এই কাজটি তাড়াতাড়ি করা দরকার। তবে গাভী নিজের থেকে বাছুরের গা চেটে পরিষ্কার করে দিলে গো-পালককে এসব কিছু করবার প্রয়োজন হয় না।

পরবর্তী পর্যায়ের কাজ হলো প্রসবস্থল অর্থাৎ গোয়াল ঘর সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা। ডেটল মেশানো জল দিয়ে গাভীর দুধের বাঁটগুলো ভাল ভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে দেওয়া দরকার। এর কারণ হলো প্রথম দুধ খাবার সময় বাছুরের মুখ দিয়ে কোন রকম রোগ-জীবাণু পেটের মধ্যে যাতে প্রবেশ না করে।

বাছুর যদি স্বাভাবিক এবং সুস্থ হয় তবে ত্রিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ পান করতে শুরু করবে। যদি দেখা যায় বাছুরের পক্ষে উঠে দাঁড়িয়ে দুধ পান করা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে এ ব্যাপারে বাছুরকে সাহায্য করা দরকার। সেক্ষেত্রে মানব শিশুকে যেভাবে ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ানো হয় গাভীর বাঁট থেকে দুধ দোহন করে বাছুরকেও ঝিনুকের সাহায্যে দুধ খাওয়াতে হবে।

গাভীর দুধ পান করবার দু'ঘণ্টা বাদে বাছুরের পায়খানা হওয়া দরকার। কারণ জন্মের আগে থাকতে তার পরিপাক যন্ত্রের মধ্যে যে ময়লা জমে রয়েছে তার পরিষ্কার হওয়াই এর প্রধান উদ্দেশ্য। যদি বাছুরের পায়খানা না হয় তাহলে এক চামচ খাবার সোডা সামান্য গরম জলে মিশিয়ে বাছুরকে খাওয়াতে হবে। এরপর দেখা যাবে আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাছুরের পেটের মধ্যে জমে থাকা মল সব বেরিয়ে গেছে।

বাছুরের থাকবার জায়গায় যাতে আলো এবং ভালভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে সেদিকে নজর রাখা দরকার। এছাড়াও স্থানটি পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি অনেকগুলো বাছুর থাকে তাদের আলাদাভাবে রাখলে ভাল হয়। প্রতিবার দুধ দোহনের পর বাছুরদের গাভীর কাছ থেকে দূরে রাখতে হয়। এর উদ্দেশ্য হলো দুধ দোহনের পরেই যদি বাছুরকে কাছে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে উভয়ে উভয়কে চাটতে থাকবে। ফলে গাভী এবং বাছুর উভয়ের পেটে গায়ের লোম চলে যেতে পারে।

## বাছুরদের শৃঙ্গহীন করা

শিং গরু-বাছুরদের দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তবে বিভিন্ন কারণে অনেকেই বাছুরকে শৃঙ্গহীন করার পক্ষপাতী। কিন্তু এই কাজটি কোন গো-পালকের করা উচিত নয়। কারণ বড় হলে ওদের শরীর দুর্বল হয় এবং আত্মরক্ষা করতে পারে না।

## বাছুরের স্বাভাবিক খাদ্য দুধ

নবজাত বাছুরের স্বাভাবিক খাদ্য দুধ। জন্মের পর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত শুষ্ক খাদ্য পরিপাকের ক্ষমতা বাছুরের থাকে না। এজন্য প্রথম তিন সপ্তাহ বাছুরকে কেবলমাত্র মাই দুধ খেতে দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ গাভীর একটি বাঁটের দুধ বাছুরকে দেওয়া হয়।

যদি দুধের অসুবিধা হয়, তা হলে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত দুধ দিয়ে তারপর মাটাতোলা গুঁড়ো দুধ (dried skim milk) দেওয়া যেতে পারে। ১ পাউণ্ড গুঁড়ো দুধের সঙ্গে ৯ পাউণ্ড জল মিশাতে হয়। এই দুধ অল্প গরম করে খাওয়াতে হবে।

প্রসবের পর কোন কারণে গাভীর মৃত্যু হলে, নবজাত বাছুর গাঁজলা দুধ হতে বঞ্চিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে গাঁজলা দুধের পরিবর্তে এই মিশ্রণটি বাছুরকে প্রথম ৩/৪ দিন খাওয়ান যেতে পারে।

| | |
|---|---|
| দুধ | ৫০০ গ্রাম |
| ডিম | ১টি |
| রেড়ির তৈল | অর্ধ চামচ |
| জল | ৫০০ গ্রাম |

প্রথমে একটি ডিমকে জলে মিশিয়ে ফেটিয়ে নিতে হবে; তারপর দুধ ও রেড়ির তেল যোগ করতে হবে। এই ডিম ও রেড়ির তেল মিশ্রিত দুধ ঈষদুষ্ণ করে বাছুরকে খাওয়াতে হবে।

## ৬ মাস থেকে ১২ মাস বয়সের বাছুরের খাদ্য

শৈশবে দেহের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের খুব প্রয়োজন। বাছুরের পোস্টাই খাদ্যে সাধারণতঃ শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ খইল এবং অবশিষ্ট অংশ শ্বেতসার প্রধান খাদ্য থাকে।

এখানে বাছুরের উপযোগী খাদ্য-তালিকার একটি নমুনা প্রদত্ত হলো। এই মিশ্রণের সঙ্গে আছে গমের ভুসি অর্ধেক এবং ভুট্টাচূর্ণ ও বাদাম খইল প্রত্যেকটি সিকি ভাগ হিসেবে।

| | | সুপাচ্য প্রোটিন খাদ্য | মোট পুষ্টিকর উপাদান |
|---|---|---|---|
| গমের ভুসি | ৫০% | ৩·৯ | ৩১·৭ |
| ভুট্টা চূর্ণ | ২৫% | ১·৮ | ২১·২ |
| বাদাম খইল | ২৫% | ১০·৪ | ১৭·৭ |
| ১০০ পাউণ্ডে আছে | | ১৬·১ | ৭০·৬ পাউণ্ড |
| সুতরাং ১ পাউণ্ডে | | ০·১৬ | ০·৭ পাউণ্ড |

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাছুরের পোস্টাই খাদ্য ও বিচালির পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়ে দিতে হবে।

১২ সপ্তাহ অর্থাৎ তিন মাস বয়স হতে বাছুর প্রায়ই দিনে ২ পাউণ্ড পোস্টাই খাদ্য খেতে পারে। প্রতি ১০০ পাউণ্ড শারীরিক ওজনের জন্য দেড় পাউণ্ড হিসেবে পোস্টাই খাদ্য বাছুরকে দিলে বেশ ভাল হয়। কিন্তু দিনে দুই পাউণ্ডের বেশি পোস্টাই খাদ্য বাছুরকে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

পোস্টাই খাদ্য মিশ্রিত জাবের সঙ্গে দৈনিক ১ আউন্স হিসেবে লবণ দিবে। তা ছাড়া ১ বছর বয়স পর্যন্ত বিশোধিত হাড়চূর্ণ ১ আউন্স মাত্রায় প্রত্যহ খাওয়ান উচিত।

## সাইলেজ প্রথায় ঘাস সংরক্ষণ

পশু খাদ্য ঘাস উৎপাদনের মতো সেই ঘাসকে সংরক্ষণ করা পশুপালকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় মধ্যবর্তী বা অন্তবর্তীকালীন দুই অর্থকরী ফসলের মাঝখানের সময়ে ঘাস চাষের জন্য গো-পালকদের প্রচুর আগ্রহ থাকলেও বেশি জমিতে তাঁরা ঘাস চাষ করেন না। পরবর্তী ফসলের জন্য চাষ করা পর্যন্ত তাঁদের পালিত গরু-বাছুর যতটা ঘাস খাবে সেই পরিমাণের বেশি তাঁরা ঘাস চাষ করতে চান না। কারণ ঘাস চাষের জন্য আলাদা একটা খরচ রয়েছে। প্রয়োজনের অধিক ফলনকে ঐ অল্প সময়ে তার সীমিত সংখ্যক গবাদি পশুকে খাওয়াবার পরেও উদ্বৃত্ত ঘাস ব্যবহার করতে না পেরে অপচয় হয় অথবা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কাজেই যে সমস্ত গো-পালকরা তাঁদের গরু-বাছুরকে বেশি দিন ধরে ঘাস খাওয়াতে আগ্রহী এবং বেশি পরিমাণে ঘাস উৎপাদনেও সক্ষম তাঁদের জন্য ঘাস সংরক্ষণ প্রণালী সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নেওয়া ও শিখে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বেশি ঘাস উৎপন্ন হয়। আর গরমের সময় যে সব ঘাস জন্মায় তার সবটাই সাইলেজ প্রথায় সংরক্ষণ করার পক্ষে খুবই উপযোগী। শীতকালীন ঘাসও সাইলেজ প্রথায় সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু এই সময় প্রচুর ঘাস পাওয়া সমস্যা থাকে। তাছাড়া শীতের ঘাস সাইলেজ

করার পক্ষে খুব একটা উপযুক্ত বলে ধরা হয় না। কারণ ঘাস বেশ শক্ত হয়ে যায়। সেই কারণে শীতের ঘাস রোদে শুকিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই ধরনের শুকিয়ে রাখা ঘাসকে 'হে' বা খড় বলে।

সাইলেজ সাধারণভাবে লম্বা পাতা যুক্ত ঘাস—যেমন ভুট্টা, জোয়ার, টিউসিনটি, নেপিয়ার ইত্যাদি ঘাসে ভাল হয়। আর শীতকালীন ঘাসের ক্ষেত্রে ওটস্ সাইলেজের পক্ষে কিছুটা উপযুক্ত। এককভাবে গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর ঘাস বরবটি বা ক্যাসুলাম জাতীয় ঘাস দিয়ে অথবা শীতকালীন বারসীম বা লুসার্ণ জাতীয় ঘাসে সাইলেজ হয় না। কারণ এই সব ঘাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় পদার্থ থাকে এবং কার্বোহাইড্রেটও যে পরিমাণ থাকে সেটা না থাকারই মতো। অথচ এই দুটি বিষয়ই সাইলেজ তৈরি হবার পরিপন্থী। তবুও বরবটি ঘাসকে ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি ঘাসের সঙ্গে মিশিয়ে সাইলেজ তৈরি করা যায়। অপরদিকে বারসীম ঘাসকেও ওট্স-এর সঙ্গে মিশিয়ে সাইলেজ তৈরি করা সম্ভব হয়। জোয়ার. ভুট্টা ইত্যাদি ঘাস, বরবটির কাছ থেকে বেশি পরিমাণে জলীয় পদার্থ টেনে নেয়, তার পরিবর্তে ওদের উদ্বৃত্ত কার্বোহাইড্রেটও বরবটিকে দেয়। ওটস্ এবং বারসীমের ক্ষেত্রে একই ফলাফল দেখতে পাওয়া যায়। তবে কেবলমাত্র বরবটি অথবা বারসীম ঘাসে যে সাইলেজ করা যায় না সেটা অবশ্য ঠিক কথা নয়। অবশ্যই করা চলে। কিন্তু সঠিক ভাবে সাইলেজ করা একটু বেশি খরচের ব্যাপার হয়ে যায়। যেমন ১ : ৫ অনুপাতে খড় কুঁচিয়ে তাতে ঘাস মিশিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া ৪০ কেজি চিটে গুড় এক মেট্রিক টন ঘাসেতে লেগে যাবে।

ভুট্টা সাইলেজ করার উপযোগী ঘাস। কারণ এর মধ্যে শর্করার ভাগটা বেশি থাকে। এর ফলে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কাজ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। এছাড়াও বাড়ে ল্যাকটিক অ্যাসিডের কাজ। এই দুয়ের কাজ বৃদ্ধির ফলে বিউট্রিক অ্যাসিড ঘাসের মধ্যে থাকে না। ভুট্টা ঘাসের সাইলেজের মান আরও উন্নত করা যায় যদি শিম্বজাতীয় ঘাস, যেমন বরবটি, লুসার্ণ ইত্যাদি ঘাস এর সঙ্গে মিশিয়ে সাইলেজ করা হয়। সাইলেজ করার জন্য ভুট্টা গাছ সব চাইতে উপযোগী হয় যখন ভুট্টার ফল একটু শক্ত হয়ে আসে। অর্থাৎ ফল ৫০ ভাগ শক্ত হবে এবং গাছে ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ (শতকরা হিসেবে) জলীয় পদার্থ থাকবে।

জোয়ার ঘাসের সাইলেজ ভুট্টা ঘাসের থেকেও উচ্চমানের হয়। জোয়ার ঘাসকে যখন কাঁচা অবস্থায় গবাদি পশুদের খাওয়ানো হয় তখন তার মধ্যে যে সমস্ত পুষ্টিগুণ বজায় থাকে তাকে সাইলেজ করার পরেও খাদ্যমান তেমন কিছু কমে না। খরার কবলে বাড়তে না পারা তরুণ গাছে যে গ্লুকোসায়ানেডের ভাগটা বেশি থাকে তা সাইলেজ তৈরির সময় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া প্রুসিক অ্যাসিড জনিত বিষক্রিয়ার কোন আশঙ্কা থাকে না। অল্প বয়সের গাছের (তরুণ গাছ) চাইতে উপযুক্ত বাড়ন্ত গাছের সাইলেজ আরও ভাল হয়। কারণ তরুণ গাছের সাইলেজে অ্যাসিডের ভাগটা একটু বেশি হয়। অবশ্য ভুট্টা বা অন্যান্য

গাছের সাইলেজ প্রস্তুত করবার সময়টা একটু বেশি লাগে। কারণ জোয়ার ঘাসের প্রোটিন তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণে থাকায় সাইলেজ পচনশীলতায় সাহায্যকারী ব্যাকটেরিয়া তেমন দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে না। সেই কারণে জোয়ার ঘাসে সাইলেজ তৈরি করবার সময় সামান্য পরিমাণে ইউরিয়া সার ছড়িয়ে দিলে পচনশীলতার কাজটা দ্রুত হয়। এতে ক্যারোটিন এবং অন্যান্য খাদ্যমান বেড়ে যায়। ফলে গবাদি পশুদের পক্ষে সাইলেজ খাদ্য হিসেবে খুবই সুস্বাদু লাগে। ওরা তৃপ্তি করে খাদ্য গ্রহণ করে এবং শরীরের পক্ষেও পুষ্টিকর খাদ্য হয়।

## সাইলেজ কি এবং তৈরি করার পদ্ধতি

গো-খাদ্যের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের ঘাসকে ছোট ছোট করে কেটে বায়ু চলাচল করতে পারে না এমন গর্ত অথবা চৌবাচ্চায় খুব চাপ দিয়ে অর্থাৎ ঠেসে তার মধ্যে রেখে দিলে ঐ ঘাসে পচনশীলতা শুরু হয়। এই রকম অবস্থায় তখন ঘাসের মধ্যে কয়েক ধরনের অ্যাসিড তৈরি হতে থাকে। ঐ সব অ্যাসিডের মধ্যে রয়েছে—ল্যাকটিক, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, বিউট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ সব অ্যাসিড বায়ু চলাচলহীন অবস্থায় সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। ল্যাকটিক অ্যাসিডের প্রভাব বেশি হলে সাইলেজের গুণমান ভাল হয়। অপর দিকে বিউট্রিক অ্যাসিডের প্রভাব বেশি হলে সাইলেজের গুণমান ভাল হয় না। তাহলে দেখতে হবে কোন ঘাস কি রকম অবস্থায় সাইলেজ করার পক্ষে উপযোগী হবে। শুধু তাই নয়, সাইলেজ করবার সময় কখন গুড় জল ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে ল্যাকটিক অ্যাসিডের প্রভাব থাকবে এবং বিউট্রিক অ্যাসিডের প্রভাব থাকবে না সেটাও জানা দরকার। ঘাস হিসেবে জোয়ার, ভুট্টা, ওটস্ এই সব ঘাসে যখন ফুল আসবার সময় হবে বা ফল ধরে অথবা ফলের দানাতে সামান্য নোখ দিয়ে খুঁটলে দুধের মতো সাদা পদার্থ বের হতে থাকে তখনই ঘাসকে মাঠ থেকে কেটে সাইলেজ করার পক্ষে উপযুক্ত সময়। গুড়-জল এবং ইউরিয়া কখন ছিটিয়ে দিতে হবে সে ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

সাইলেজ তৈরি করবার জন্য কয়েক রকম ভাবে গর্ত অথবা চৌবাচ্চা তৈরি করা যায়। তবে ট্রেন্স পদ্ধতিতে ঘাসকে সংরক্ষণ করা সব থেকে সুবিধা বেশি হয়। কোথায় এই গর্ত বা ট্রেন্স খোঁড়া হবে তার জন্য উপযুক্ত জায়গা প্রথমে নির্বাচন করা দরকার। নির্বাচিত জায়গা অবশ্যই উঁচু হবে। সেই সঙ্গে দেখতে হবে ট্রেন্স-এর চারপাশে হঠাৎ বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হলে যাতে বৃষ্টির জল না জমে এবং গর্তে প্রবেশ করার কোন সুযোগ না পায়। এর পর দেখতে হবে যাতে মাটির নিচের জলের স্তর খুব কম করে চার মিটারের নিচে থাকে। হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলাগুলোতে মাটির নিচে জলের স্তর প্রায় আড়াই ফুট থেকে তিন ফুটের মধ্যে থাকে। ঠিক সেই কারণেই ট্রেন্স পদ্ধতিতে আমাদের পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন জেলায় সাইলেজ করা ভাল। কারণ এই পদ্ধতিতে সাইলেজ করতে হলে

নিচের দিকে গভীরতার খুব একটা বেশি প্রয়োজন হয় না। এক মিটার বা তার থেকে সামান্য কম গভীর গর্ত হলেও কাজ চলে যায়। ফলে মাটির নিচের জলের স্তর সাইলেজ তৈরি করার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। এছাড়াও ট্রেন্স সাইলোর গভীরতা কম থাকায় খাড়াভাবে কেটে সাইলেজ তোলার খুবই সুবিধাজনক। তাছাড়া এতে অপচয়ও কম হয়।
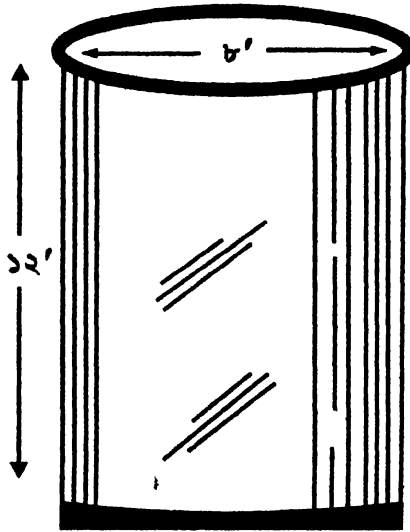
পিট সাইলো

গর্ত করে যদি সাইলেজ তৈরি করতে হয় তবে ৮ ফুট ব্যাসযুক্ত ও ১২ ফুট গভীর করে গর্ত খুঁড়তে হবে। এই গর্তে যে পরিমাণ সাইলেজ তৈরি হবে তাতে ৪টি গরু অথবা মোষ মাথা পিছু ২০ কেজি করে তিন মাস ধরে খেতে পারবে। এই পরিমাপে গর্ত করে সেটা ভরাট করতে ঘাস লাগবে প্রায় ১০ মেট্রিক টন। আর এর জন্য আবাদযোগ্য জমির প্রয়োজন হবে প্রায় আড়াই থেকে তিন বিঘা। অবশ্য জমি উপযুক্ত ভাবে পরিচর্যা করা দরকার।

আগে আলোচনা করা হয়েছে কোন শ্রেণীর ঘাসে সাইলেজ তৈরি করা যায় এবং ক্ষেত থেকে কোন সময়ে কাটা প্রয়োজন। ঘাস কেটে একদিন ক্ষেতেই ফেলে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে দেখতে হবে কাটা ঘাস যেন চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ভালভাবে রোদ পায়। রোদে রাখার উদ্দেশ্য হলো যাতে ঘাসে বাষ্পমোচন ঘটে এবং যাতে বেশ খানিকটা জলীয় অংশ বের হয়ে যায়। কারণ এই ধরনের ঘাসে সাইলেজের উৎকর্ষতা ভাল হয়। এরপর ঘাসকে যন্ত্রচালিত চপ কাটারে কেটে নিতে হবে। যদি যন্ত্র কেনার অসুবিধে থাকে তবে চপারে হাতেও কেটে নেওয়া যায়। এবার কাটা ঘাসকে গর্তে ফেলতে হবে। গর্তে ফেলার আগে একেবারে

তলাতে পুরু করে শুকনো খড় বিছিয়ে দিতে হবে। প্রথমে একটা পাতলা পলিথিন শিট বিছিয়ে তার ওপর দু'ইঞ্চি খড় বিছিয়ে দিলে আর নিচের জল সাইলেজের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কাটা ঘাস গর্তে ফেলতে শুরু করলে গর্তের দেওয়ালেও লম্বা করে খড় ধরাতে হবে। এইভাবে গর্তের দু'ফুট পর্যন্ত কাটা ঘাসে ভরাট করে লোক গর্তে নেমে পা দিয়ে ভালভাবে চার পাশে চাপ দিতে থাকবে। এই কাজটি করার উদ্দেশ্য হলো ভিতরের বাতাস যাতে থাকতে না পারে আর কাটা ঘাস যাতে বেশ চাপ হয়ে বসে যায়। পা দিয়ে ঘাস মাড়িয়ে দেবার কাজ শেষ হলেই গুড় গোলা জল ঘাসের ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে। আবার কাটা ঘাসে গর্তের ২ ফুট পর্যন্ত ভরাট করে পা দিয়ে আগের মতো মাড়িয়ে দিতে হবে এবং গর্তের দেওয়ালে পুরু করে শুকনো খড়ও ধরানো দরকার। হাওয়া ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলে পুনরায় গুড় গোলা জল ছিটিয়ে খালি গর্ত ভরাট করে ফেলতে হবে। কাটা ঘাস পা দিয়ে মাড়াবার সময় মনে রাখা দরকার ঘাসের ফাঁকে বাতাস যেন না থাকে। গর্ত সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয়ে গেলে তার ওপর আরও কিছু কাটা ঘাস রেখে খুব কম করে এক মিটার উঁচু করতে হবে। অর্থাৎ গর্তের ওপর একটা ঢিপি তৈরি করতে হবে। এরপর হাতের সাহায্যে চাপ দিয়ে যতটা সম্ভব হাওয়া বের করে দিয়ে পলিথিন অথবা প্লাসটিকের পাতলা চাদর দিয়ে ঢিপিকে ঢাকা দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। শেষে কাদা মাটি আগাগোড়া পুরু করে লেপে দেওয়া দরকার। তবে এসব করে ভালভাবে দেখতে হবে যাতে ভিতরে হাওয়া অথবা জল ঢুকতে না পারে।

কয়েকদিন যাবার পর দেখা যাবে ঘাস বসতে শুরু করেছে, তাছাড়া লেপা মাটিতে ছোট বড় ফাটলও দে া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফাটল আবার কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। এইভাবে বেশ কয়েকবার ফাটল বন্ধ করার প্রয়োজন হয়। মোট ৮০ থেকে ৯০ দিনেং মধ্যে সাইলেজ তৈরি হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট দিন পার হবার পর গর্তেব মুখ খুলে ওপর থেকে চাপা দেওয়া ঘাস সরিয়ে ফেলে সাইলেজ করা ঘাসকে টুকরো করে কেটে (যতটা প্রয়োজন সেই মতো কাটতে হবে) গবাদি পশুদের খাওয়াতে পারা যাবে।

**ট্রেঞ্চ সাইলো ঃ** এই ধরনের সাইলো ইঁট ও সিমেন্ট দিয়ে পাকা করে তৈরি করে নিতে পারলেই ভাল হয়। দৈনিক ২৮ কেজি করে প্রতিটি গবাদি পশুর জন্য বরাদ্দ হিসেবে মোট ৫টি গরুকে ১০০ দিন ধরে খাওয়াবার জন্য এমন ট্রেঞ্চের মাপ হবে লম্বায় ৭·৫০ মিটার। তলায় চওড়া থাকবে ৩·৪০ মিটার। ট্রেঞ্চের ওপর মুখের চওড়া রাখতে হবে ৪·২০ মিটার। আর গর্তের গভীরতা থাকবে ০·৭৫ মিটার। এই মাপের সাইলো ভরাট করতে ঘাস লাগবে প্রায় ২৩ মেট্রিক টন।

ভুট্টা অথবা জোয়ার ঘাস দিয়ে সাইলেজ করতে হলে মোট ৬ বিঘা জমিতে ঘাস চাষ করতে হবে। অবশ্য জমি যাতে সারবান এবং চাষের উপযুক্ত হয় সেটা আগে থাকতে দেখা দরকার। চাষের জমি থেকে ঘাস কাটা, তাকে রোদে শুকিয়ে নেওয়া, এরপর ছোট ছোট করে কাটা এবং ট্রেঞ্চে ভরাট করা সবই পিট সাইলোতে

যেভাবে করা হয়েছে এক্ষেত্রেও ঠিক একই পদ্ধতিতে করা দরকার। এমন কি পায়ের চাপ দিয়ে ভিতর থেকে হাওয়া বের করে দেওয়া সব কিছু একই নিয়মে করতে হবে।
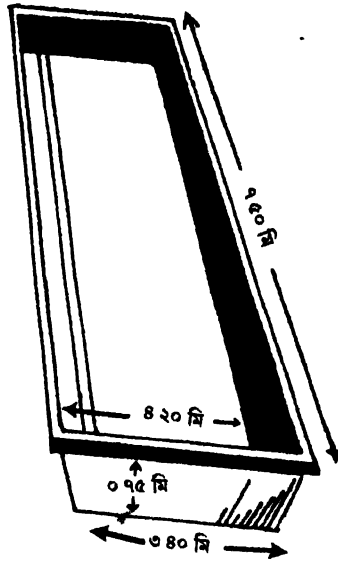
ট্রেঞ্চ সাইলো

**সাইলেজ খাওয়াবার পদ্ধতি ঃ** সব বয়সের গরু, বাছুর এবং মোষকে সাইলেজ খাওয়াতে পারা যাবে। যে গরু ঘাস খেত ৩৫ কেজির কাছাকাছি তাকে সাইলেজ দেওয়া হবে ২৫ কেজি। যে গরু ঘাস খেত ২৫ থেকে ৩০ কেজি তার ক্ষেত্রে সাইলেজ বরাদ্দ করতে হবে ২০ কেজি। আরও কম বয়সের পশু যার ঘাস খাবার দৈনিক পরিমাণ ছিল ২০ কেজি তাকে সাইলেজ দিতে হবে ১৪ কেজি।

তবে কোন ক্ষেত্রেই সাইলেজ একক খাদ্য হিসেবে গবাদি পশুদের খাওয়াতে নেই। সাইলেজ দেবার নিয়ম হলো, ২ ভাগ সাইলেজ, ১ ভাগ খড় ও ২ ভাগ কাঁচা ঘাস অথবা ভুসি দিতে হবে। কাজেই যে গরু সারা দিনে ঘাস খায় ২০ কেজি তাকে সাইলেজ দিতে হবে ৭ কেজি, ২ কেজি খড় বা ভুসি ও ৫ কেজি পরিমাণ কাঁচা ঘাস। সব কিছু এক সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে তবেই গবাদি পশুদের খেতে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে দুধ দেওয়া গাভীকে দুধ দোহন করার পর তবেই সাইলেজ খাওয়াতে হয়। অর্থাৎ দুধ দোহনের আগে কোন মতেই সাইলেজ গাভীকে খাওয়ানো চলবে না।

**উচ্চমানের সাইলেজ তৈরি করতে পালনীয় নিয়ম ঃ** যে কোন ঘাসের সাইলেজ তৈরি করা হোক না কেন তার মান যাতে উৎকৃষ্ট হয় তার জন্য কিছু নিয়ম অবশ্যই পালন করা দরকার। যে সব সাইলো কাঁচা অর্থাৎ দেওয়াল পাকা করা হয়নি

সেক্ষেত্রে দেওয়াল এবং গর্তের একেবারে তলায় পলিথিনের পাতলা চাদর বিছিয়ে পুরু করে (২ ইঞ্চি হলে ভাল হয়) খড় বিছিয়ে দিতে হবে। একই কাজ করতে হবে দেওয়ালের গায়ে। একাজে ধানের খড় সব থেকে ভাল। অভাবে গমের খড় ব্যবহার করতে পারা যায়। খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে কাটা ঘাসের মাটির সঙ্গে কোন রকম সংযোগ না ঘটে।

ঘাস কেটে ক্ষেতের মধ্যে একদিন রেখে শুকিয়ে নিতে হয়। এতে ঘাসের মধ্যে জলীয় অংশ কমে যায়। তারপর দেড় থেকে দু' ইঞ্চি সাইজ করে ঘাস কাটা দরকার। এভাবে কাটলে ঘাসকে চাপ দিয়ে গর্তের মধ্যে রাখা সম্ভব হয় এবং বাতাসও ভিতরে বেশি পরিমাণে থাকতে পারে না।

ঘাস সাইলোর মধ্যে সমান স্তর অনুসারে সাজতে হবে। পা দিয়ে চাপ দেবার সময় সমস্ত দিক সমানভাবে দেওয়া দরকার। কারণ চাপ দেবার ওপর নির্ভর করে বাতাস কতটা পরিমাণে ভিতরে থেকে গেল। বাতাস বেশি পরিমাণে থাকলেই সাইলেজের মান খারাপ হয়ে যাবে। সাইলো ঘাস দিয়ে ভর্তি করবার সময় যতটা কম সময় নেওয়া যায় সে বিষয়ে অতি অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

সাইলো এমনভাবে ভর্তি করতে হবে যাতে তার ওপর দিকটা বসে যাবার পরেও জমি থেকে এক হাত পরিমাণ ওপরে থাকে। তবে সাইলোর মধ্যে কাটা ঘাসকে যতই চাপ দিয়ে ভরা হউক না কেন কিছু দিন যাবার পর আস্তে আস্তে নিচের দিকে বসে যাবেই। তবে কতটা বসে যাবে সেটা নির্ভব করে কতটা বাতাসহীন করে সাইলো ভরাট করা হয়েছে এবং কোন শ্রেণীর ঘাস সাইলোর মধ্যে রাখা হয়েছে তার ওপর। যেমন শুঁটি জাতীয় ঘাস একটু বেশি বসে যাবে। অপর দিকে জোয়ার, ভুট্টা ও বাজরা জাতীয় ঘাস তুলনামূলক ভাবে কম বসবে। এরপর উঁচু ঢিপিকে এমনভাবে কাদা মাটির প্রলেপ দিতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই ভিতরে বাইরের জল এবং বাতাস ঢুকতে না পারে।

সাইলেজের মান আরও উৎকৃষ্ট করবার জন্য কিছু কিছু কাটা শস্য দানাও ছড়িয়ে দিতে পারা যায়। এর সঙ্গে কিছু খড় ভাল করে কুঁচিয়ে স্তরে স্তরে দিলে আরও ভাল হয়। ভিতরের ঘাস যাতে ভালভাবে গাঁজানোর পরিবেশ বা সুযোগ পায় তার জন্য প্রতিটি স্তরে কিছু পরিমাণে গুড় জলের ছিটে দেওয়া খুবই জরুরী। গুড় জলের পরিমাণটা হবে প্রতি কুইন্টাল ঘাসের জন্য . লিটার গুড় মেশানো দরকার।

মনে রাখতে হবে, উপযুক্ত সময়ে ঘাস কাটার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে উচ্চমানের সাইলেজ পাওয়া। যে কোন ঘাসে ফুল আসার সময় থেকে ফল ধরার আগে পর্যন্ত ঘাসকে কেটে নেওয়া সব থেকে ভাল সময়। এই সময়ের মধ্যে সবুজ ঘাসে শতকরা হিসেবে ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ খাদ্য মূল্য সংরক্ষিত হয়।

সাধারণভাবে তিন মাস অর্থাৎ ৯০ দিনের মধ্যে সাইলেজ তৈরি হয়ে যায়। একসঙ্গে সাইলেজ না খুলে ভাগে ভাগে অল্প পরিমাণে তুলতে হবে। যে স্থানটি থেকে সাইলেজ তোলা হবে সেই স্থানের ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত তোলা দরকার। একটি বাড়ন্ত গাভী থেকে দুগ্ধবতী গাভী পর্যন্ত প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ কেজি সাইলেজ খাবে।

## ঘাসকে শুকনো প্রথায় সংরক্ষণ

খড় বলতে আজও আমরা ধানের খড়কে বুঝি। ধানকে ঝাড়াই করে নেবার পর গাছের যে অংশ বাকি থাকে (কাণ্ড ও পাতা) সেটাই আমাদের মতে ধানের খড় নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে শস্যদানা চাষে ধানই প্রধান ও ব্যাপক। গ্রামকেন্দ্রিক পশুপালনের ক্ষেত্রে ধানের খড়কে গবাদি পশুর পেট ভরানো খাদ্য হিসেবে চিরাচরিত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কারণ এখানে ধানের খড় সহজে পাওয়া যায় এবং অন্যান্য গো-খাদ্যের তুলনায় দামটা অনেক কম পড়ে। অবশ্য শস্যদানা যেমন গম, বার্লি, ওটস্ ইত্যাদি পাকলে ঝাড়াই-মাড়াই করে নেবার পর গাছের শুকনো কাণ্ড ও পাতাকে খড় বলা হয়। বিকল্প খাদ্য হিসেবে এবং পেট ভরাবার জন্য গ্রাম বাংলায় গবাদি পশুদের চারণভূমিতে চরতে দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে বর্ষা এবং বর্ষার পরে আমাদের রাজ্যে মাঠে-ঘাটে এবং পতিত জমিতে ঘাস, লতা এবং গুল্মজাতীয় গাছ-পালা জন্মায়। চারণভূমি হিসেবে পরিকল্পনা অনুসারে ঘাস জন্মানো এবং তার পরিচর্যা যদিও তেমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজও দেখা যায় না তবুও ধান কেটে নেবার পর জমিতে রসের পরিমাণ অনুসারে কলাই বপনের রেওয়াজ আগেও ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে।

ধানের খড় গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে খুবই নিম্নমানের। এতে পুষ্টিমূল্য নেই বললেই চলে। প্রোটিনের ভাগ মাত্র ০·৯ শতাংশ। ক্যালসিয়াম রয়েছে শতকরা ০·২৭ ভাগ। ফসফরাসের অংশ মাত্র ০·১৬ শতাংশ। ধানের খড়েতে শক্ত ছিবড়ের ভাগ খুবই বেশি। শতকরা হিসেবে ৩৩·৫ ভাগ। ক্ষার জাতীয় অক্সালেটের ভাগ শতকরা হিসেবে ১৪·৫ পরিমাণ থাকায় ধানের খড় পশুখাদ্য হিসেবে খুবই নিম্নমানের। এই সব কারণে ধানের খড় একক খাদ্য হিসেবে গবাদি পশুদের খাওয়াতে নেই। যদি ধানের খড়ের সঙ্গে কিছুটা পরিমাণে সবুজ ঘাস মিশিয়ে ওদের খেতে দেওয়া যায় তবে খাদ্যের মান একটি পর্যায়ভুক্ত হয়। কাজেই ধানের খড়ের সঙ্গে ভুট্টা ঘাস, জোয়ার ঘাস, ওটস্ ঘাস ইত্যাদি মিশিয়ে গবাদি পশুদের খাওয়ানো একান্ত প্রয়োজন। যদি শিম্বী জাতীয় ঘাস যেমন বরবটি, মটর, বারসীম ইত্যাদি ধানের খড়ের সঙ্গে গবাদি পশুদের দেওয়া হয় তাহলে খাদ্য মূল্যমান আরও বেড়ে যায়। যদি সব সময় টাটকা ঘাস না পাওয়া যায় তবে ধানের খড়ের মতো ঐ সমস্ত ঘাসকে শুকিয়ে রেখে তারপর খড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিলে খাদ্য মূল্যমান অনেকটা বজায় থাকে।

পূর্ব ভারতে অসমে ধানের ফসল কেটে নেবার পর জমিতে রসের পরিমাণ অনুসারে ধইঞ্চা বুনে দেবার রেওয়াজ রয়েছে। এখানে ধান কেটে নিয়ে প্রায় দেড় থেকে দু'মাস জমিতে গাদা করে রেখে দেওয়া হয়। এরপর ধান ঝাড়াই-মাড়াই এর কাজ চলে। এই দু'মাস সময়ের মধ্যে ধইঞ্চা গাছ বেশ বড় হয়ে ওঠে। এরপর ধইঞ্চা কেটে শুকিয়ে নেওয়া হয়। আর ধানের খড় গাদা করে রাখার সময় স্তরে-স্তরে ঐ শুকনো ধইঞ্চা চাষীরা সাজিয়ে রাখে। এই প্রথায় ধানের খড়ের খাদ্য মূল্যমান অনেকটা বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। কারণ ধইঞ্চা শিম্বী জাতীয় ঘাস এবং

এর মধ্যে প্রোটিন সহ অন্যান্য খাদ্যমূল্য বেশি রয়েছে। কেবলমাত্র ধইঞ্চা নয়, প্রায় সব ধরনের শস্য জাতীয় ঘাস যেমন ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, ওটস্ ইত্যাদি এবং শুঁটি জাতীয় ঘাস যেমন বরবটি, মটর, বারসীম, লুসার্নি সব শ্রেণীর ঘাসকে শুকনো করে রেখে দেওয়া সম্ভব। এই সব শুকনো ঘাস ধানের খড়ের সঙ্গে মিশিয়ে পশুদের খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায় এবং তাদের পেট ভরানো খাদ্যে পুষ্টিমান বজায় থাকে।

এককভাবে শুকনো ঘাস গবাদি পশুদের খাওয়ানো আরও পুষ্টিকর। শস্য জাতীয় ঘাস শুকনো খড় করে রাখার প্রয়োজন হয় তাহলে বীজ বপন করবার সময় নির্দিষ্ট জমিতে প্রয়োজনীয় বীজের থেকে দেড় থেকে দু'গুণ হারে বেশি বীজ ছিটিয়ে বোনা দরকার। এইভাবে বীজ বপনের ফলে চারা খুব ঘন হয়ে বের হয়। মাটির মধ্যে মিশে থাকা উদ্ভিদের খাদ্য ভাগাভাগির ফলে প্রত্যেকটি চারা সমান হারে বাড়তে শুরু করে এবং কাণ্ডও বেশি মোটা না হয়ে কিছুটা সরু হয়। কাণ্ডতে আঁশ হবার আগেই ফসল কেটে নেওয়া দরকার। সাধারণভাবে প্রথম দিন ভোর থেকে ফসল কাটা শুরু করে ঐদিন দুপুর থেকে প্রখর রোদে কাটা ফসলকে ফেলে রাখা দরকার। যেভাবে ধানের গোড়া থেকে কাটা হয় ঠিক সেইভাবে ঘাস কেটে লম্বাভাবে ক্ষেতের মধ্যে শুইয়ে রাখতে হবে। ঐদিন বিকেলে অথবা পরের দিন ঘাস ক্ষেত থেকে তুলে এনে নির্দিষ্ট জায়গায় আবার ছড়িয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

যে কোন ঘাস শুকিয়ে রাখাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রখর রোদের মধ্যে ঘাসকে শুকোতে না দেওয়াই ভাল। এতে ঘাসের খাদ্যপ্রাণ অনেকটা রোদে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং হাওয়া-বাতাস চলাচল করে এমন ছায়াযুক্ত স্থানে এবং রোদের ঝাঁজটা লাগে এমন স্থানে কাটা ঘাসকে শুকিয়ে নিতে হবে। এই সময় এক থেকে দু'ঘণ্টা অন্তর ঘাসকে উল্টে-পাল্টে দেওয়া দরকার। এতে ঘাস শুকিয়ে খড় হতে কিছুটা বেশি সময় লাগলেও গো-খাদ্য হিসেবে এর গুণগত মান খুবই উৎকৃষ্ট হবে। প্রথম দিন ঘাস কাটার পর যদি মাঠে ছড়ানো থাকে তাতেই রোদের তাপে খানিকটা পুষ্টিমূল্য (ক্যারোটিন) কমে গেলেও ঘাসের মধ্যে জলীয় অংশের বেশ কিছুটা পরিমাণ শুকিয়ে যায়। পরে যখন হাওয়াতে শুকিয়ে নেওয়া হবে তখন জলটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে এবং পুষ্টিমূল্য সবটাই বজায় থাকবে।

শিম্ব অর্থাৎ শুঁটি জাতীয় ঘাস শুষ্ক করা আরও শক্ত ব্যাপার। কারণ বিশেষ সতর্ক হয়ে কাজটি করতে না পারলে ঘাসের সমস্ত পাতা কাণ্ড থেকে খসে পড়ে। অথচ শুঁটি জাতীয় ঘাসেতে ৫ ভাগের ৪ ভাগ থাকে পুষ্টিমূল্য বা খাদ্যপ্রাণ। শিম্ব জাতীয় ঘাসকে কখন ক্ষেত থেকে কাটলে তার খাদ্যপ্রাণ বেশি পরিমাণে বজায় থাকে সেটা অবশ্যই জানা দরকার। যেমন বারসীমের ক্ষেত্রে ফুল আসার মুখে অথবা সবে মাত্র ফুল ফুটতে শুরু করেছে এমন অবস্থায় কেটে শুকনো করলে বেশি পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ অবশ্যই বজায় রাখা সম্ভব হয়। কাজেই এই রকম অবস্থায় বারসীম ঘাস কেটে তাকে শুকিয়ে নেওয়া দরকার।

অপর দিকে লুসার্ন ঘাসের ক্ষেত্রে তিন থেকে চার বার ঘাস কাটা হয়। তৃতীয় অথবা চতুর্থ বার কাটিং সংগ্রহ করার সময় সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে নিতে পারলে খাদ্যমান বেশি বজায় রাখা সম্ভব হয়।

বারসীম এবং লুসার্ন জাতীয় ঘাসকে প্রথম অথবা দ্বিতীয় কাটিং থেকে শুকিয়ে নেবার জন্য ক্ষেত থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে আসা উচিত নয়। কারণ ঐ সময় ঘাসের মধ্যে জলীয় ভাগটা বেশি থাকে এবং শুকিয়ে নেবার সময় স্বাভাবিক কারণে পাতা ঝরে পড়ে। শিম্ব জাতীয় ঘাসকে শুকিয়ে নেবার সময় বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে তাদের উল্টে-পাল্টে দিতে হয়। হাওয়া যুক্ত এবং ছায়াতে শুকিয়ে নিতে পারলে পাতা খসে পড়ার ভাগটা কিছুটা কমাতে পারা যায়। আবহাওয়া হঠাৎ পরিবর্তনের কারণে এবং কোন অবস্থাতেই যাতে শিম্ব জাতীয় ঘাস জল না পায়। কারণ এই ঘাস কাটার পর যদি কোন কারণে বৃষ্টির জলে ভিজে যায় তবে ঘাস পচে যাবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ঘাসের পাতা কাণ্ডের আগেই শুকিয়ে যায়। সেই কারণে পাতাকে রক্ষা করার জন্য খুব বেশি নাড়াচাড়া এবং তাড়াহুড়ো করে উল্টে-পাল্টে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। শস্য এবং শিম্ব জাতীয় ঘাস যদি একই সঙ্গে কেটে ছায়াতে শুকিয়ে নিতে পারা যায় তবে পাতা কম নষ্ট হয়। এর কারণ হলো, শস্য জাতীয় ঘাস শিম্ব গোত্রের ঘাসকে বেশি হাওয়া পেতে এবং জল শুকিয়ে নিতে সাহায্য করে। শুকিয়ে নেবার কাজটি যদি খুবই সুষ্ঠুভাবে করা যায় তাহলে শস্য জাতীয় কাঁচা ঘাসের খাদ্যপ্রাণ থেকে শতকরা হিসেবে মাত্র ১০ থেকে ১৫ ভাগ ঘাটতি হয়। অপর দিকে শিম্ব জাতীয় ঘাসের ক্ষেত্রে কাঁচা অবস্থায় শুকিয়ে নেবার সময় খাদ্যপ্রাণের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা হিসেবে মাত্র ২০ থেকে ৩০ ভাগ। ঘাসকে শুকিয়ে নেবার জন্য দিনের তাপমাত্রা সূর্যালোক ও আবহাওয়া অর্থাৎ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বিশেষভাবে প্রভাবশীল। বৃষ্টি অথবা মেঘলা আবহাওয়া ঘাসকে শুকিয়ে নেবার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। এই কাজটি করার জন্য সময়কে সংক্ষেপ করতে পারলে ঘাসের পুষ্টিমান ও ঘাটতি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

ঘাস ঠিকভাবে শুকিয়ে গেলে ধানের খড়ের গাদা যেভাবে রাখা হয় ঠিক সেই নিয়মেই রাখা দরকার। অবশ্য গাদা দিয়ে রাখবার আগে ভালভাবে নজর করে দেখতে হবে যে ঘাসের কোন অংশেই জলীয় অংশ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি না থাকে। কারণ জলীয় অংশ বেশি থাকলেই ঘাসের মধ্যে ছত্রাক জন্মাবে এবং জলীয় অংশ কোথাও আরও একটু বেশি থাকলে সেই অংশ পচতে শুরু হবে এবং বাকি শুকনো ঘাসের কাণ্ডকে আরও একটু নষ্ট করে দেবে। কাজেই শুকনো ঘাস গাদা দিয়ে রাখার আগে একটু ভালভাবে দেখে তবে গাদা দিতে হবে। পর পর এবং পর্যায়ক্রমে শুকনো ঘাসকে একই গাদায় রাখা যায় যদি ঘাসের শ্রেণী এক হয়। শিম্ব জাতীয় ঘাসকে শুকিয়ে এককভাবে গাদা করে রাখার অসুবিধে রয়েছে। সেই কারণে শিম্বজাতীয় ঘাসকে বাণ্ডিল করে গাদা করা উচিত।

যেখানে প্রচুর হাওয়া-বাতাস চলাচল করে তেমন জায়গা শুকনো ঘাসকে গাদা করে রাখার জন্য নির্বাচন করা দরকার। চারদিক খোলা সেডের বদলে যদি কোন ঘরে শুকনো ঘাসকে গাদা দিয়ে রাখার প্রয়োজন হয় তাহলে সেই ঘরে প্রচুর বাতাস ঢুকছে কিনা সেটা আগে থাকতে দেখে রাখতে হবে। শুকনো ঘাসের মান বিচার করার জন্য কয়েকটি বিষয় অবশ্য মনে রাখা দরকার; যেমন— (ক) ঘাস সঠিক সময়ে ক্ষেত থেকে কাটা হয়েছে, (খ) শুকনো ঘাস কোথাও পচতে শুরু করেনি, (গ) ঘাস সঠিক পদ্ধতিতে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। পাতা বেশি পরিমাণে কাণ্ড থেকে খসে পড়েনি এবং পাতার রংটা সবুজ আছে। তবে রং ফিকে হয়ে যাবে। (ঘ) কাণ্ড গরম আছে এবং তাতে আঁশের পরিমাণও কম থাকবে। (ঙ) শুকনো ঘাসে কোন আগাছা অথবা খড়-কুটো নেই। (চ) ভাল করে শুকিয়ে নেওয়া ঘাসে একটা সোঁদা গন্ধ থাকে। তার কারণ হলো, শর্করা এবং অন্যান্য খাদ্যপ্রাণ এই ধরনের ঘাসে বজায় থাকে।

শুকনো ঘাসের মান নিম্নগামী কারণ শুকিয়ে নেবার সময় (ক) পাতা খসে যাওয়া, (খ) পচতে শুরু করা, (গ) সূর্যের প্রখর রোদে বেশি দিন ধরে পড়ে থাকা, (ঘ) বৃষ্টির জলে ভিজে যাওয়া এবং বৃষ্টির জল চোয়ানো ইত্যাদি।

## আদর্শ গো-শালা

গরুর স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে যে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, গো-শালা তার প্রকৃতই প্রমাণ। কথায় বলে ঘর তো নয়, যেন গোয়াল ঘর। এমন নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন ঘরে গরুকে রাখা হয়, যেখানে স্বাস্থ্য ভাল থাকা দূরের কথা, সুস্থ গরুও অসুস্থ হয়ে যায়। সুতরাং গো-শালা নিয়মিত ভাবে নির্মাণ করতে হবে।

গোয়াল ঘর নির্মাণকালে এই কয়টি বিষয়ের ওপর বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখতে হবে—

(১) আলো ও বায়ু চলাচল, (২) গরুর স্বাচ্ছন্দ এবং (৩) পরিচ্ছন্নতা।

যেখানে গোয়াল ঘর তৈরি করা হবে, সেই জমি উঁচু হওয়া আবশ্যক যাতে বর্ষাকালে জল জমতে না পারে। গোয়ালের চারদিক খোলা হলে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয়।

গোয়ালের জন্য চালা ঘর সুবিধাজনক এবং কম খরচে হয়। কাঠের বা লোহার অ্যাঙ্গেলের খুঁটির ওপর করগেট টিনের চালা করা যেতে পারে।

গরুর সংখ্যা যদি কম হয় এবং এক সারিতে রাখা চলে, তবে একচালা গোয়ালঘর যথেষ্ট। গোয়ালে দুই সারি করে গরু রাখতে হলে গোয়ালঘর বেশি চওড়া এবং দোচালা করা সুবিধাজনক।

চালের ঢাল অন্তত ৩ ফুট হওয়া উচিত। চালের শেষ প্রান্তগুলি এক হাত বের হয়ে থাকলে ভাল হয়, কারণ তাহলে ঘরের ভিতর জলের ছাঁট যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

ঘরের মেঝে পাকা হওয়া দরকার। মেঝে ইঁট দিয়ে গেঁথে জোড়ের মুখগুলি সিমেন্ট দিয়ে জুড়লে ভাল হয়। ইঁটের মেঝের অসুবিধা এই যে, ইঁটগুলি শীঘ্র ক্ষয় হয় এবং পরিষ্কার রাখা কঠিন। বিলাতী মাটির মেঝের অসুবিধা এই যে, গরুর পা পিছলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কংক্রিটের মেঝে হলে সর্বাপেক্ষা ভাল। গোয়াল ঘরের মেঝে নর্দমার দিকে ঢালু রেখে নির্মাণ করতে হবে। চোনা ও জল যেন সহজে গড়িয়ে নর্দমায় যেতে পারে। প্রতি ৬ ফুটে দেড় ইঞ্চি ঢালু যথেষ্ট।

গোয়াল ঘর কত বড় হবে, তাহা নির্ভর করবে গরুর সংখ্যার ওপর। একটি গরুর জন্য ৫½ ফুট এবং মোষের জন্য ৬ ফুট লম্বা জায়গা রাখতে হবে। প্রত্যেক গরুর জন্য ৬ ফুট চওড়া জায়গার আবশ্যক। যতগুলি গরু থাকবে, সেই অনুপাতে এই হিসেবে গোয়াল ঘরের মাপ পাওয়া যাবে।

জাবের জন্য ইঁটের গাঁথনির পাকা চৌবাচ্চা সুবিধাজনক। গরুগুলির যেদিকে মুখ থাকবে, সেইদিকে লম্বা জাবের চৌবাচ্চা রাখতে হবে। চৌবাচ্চার ভিতর দিক সিমেন্টের হলে সহজে পরিষ্কার রাখা যায়। চৌবাচ্চার চওড়া কমপক্ষে ২½ ফুট হলেই চলবে।

চৌবাচ্চার উচ্চতা এমন হওয়া দরকার যেন গরু শুয়েও জাব খেতে পারে। এজন্য জাবের চৌবাচ্চার সামনের দিক ৬ ইঞ্চি এবং পিছন দিক ২ ফুট উচু করলে ভাল হয়। চৌবাচ্চার ভিতর মধ্যে মধ্যে পার্টিশন দিয়ে প্রত্যেক গরুর জন্য অংশ পৃথক রাখা উচিত। চৌবাচ্চার প্রত্যেক অংশের তলায় জল নিকাশের জন্য একটি ছিদ্র রাখা দরকার।

সাধারণতঃ বড় গোয়াল ঘরে দুই সারি গরু রাখা হয়। দুই পাশে গরু এবং মাঝখানে চলার পথ থাকে। প্রত্যেক সারির গরুর পিছন দিক থাকবে মাঝখানের চলার পথের দিকে। তাহলে দুগ্ধ দহনে সুবিধা হবে। মাঝখানের পথটি অন্তত ৪½ ফুট চওড়া হলে ভাল হয়।

এই পথের দুইধারে নালা থাকবে। নালা ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি গভীর এবং ৮ ইঞ্চি চওড়া হবে। গোয়াল ঘরের মেঝে এমনভাবে ঢালু করতে হবে, যেন প্রত্যেক সারির গরুগুলির চোনা সেই দিকের নালায় এসে পড়ে। দুই ধারের নালা সমেত মাঝখানের চলার পথ ৬ ফুট হবে।

## গোয়ালের নর্দমা

গোয়ালের চোনা ও জল নিকাশের জন্য পাকা নর্দমা থাকা দরকার। গোয়ালের কাছে ধোয়ানি জল ও চোনা সংগ্রহের জন্য একটি চোনার চৌবাচ্চা তৈরি করা সুবিধাজনক। নর্দমার সমস্ত চোনা ও জল যেন ঐ চৌবাচ্চার মধ্যে গিয়ে পড়ে। পরে মধ্যে মধ্যে ঐ চোনা বালতি করে তুলে চাষের ক্ষেতে সার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যদি বাছুরের সংখ্যা বেশি হয়, তাহলে বাছুরগুলিকে পৃথক ঘরে রাখা উচিত। প্রত্যেক বাছুরের জন্য দরকার ৫ ফুট লম্বা এবং ৩ ফুট চওড়া জায়গা।

## গরুর যত্ন ও পরিচর্যা

গরুর যত্ন ও সেবা এবং পুষ্টিকর খাদ্যের উপর গাভীর দুধ ও বলদের কর্মক্ষমতা নির্ভর করে। এজন্য গরুর যাতে ঠিকমত যত্ন হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

## গোয়াল ঘরের পরিচ্ছন্নতা

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গোয়ালঘর ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত আবশ্যক। গোয়ালের ভিতর গোবর ও চোনা যাতে জমে না থাকে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। গোয়ালের মেঝে ও নর্দমা প্রত্যেক দিন ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

গরুর গোবর গোয়াল ঘর হতে একটু দূরে জমা করা উচিত। ঘরের কাছে গোবর জমলে গোয়ালে মাছির উপদ্রব হবে। গোবর গাছের একটি উৎকৃষ্ট সার। গোবর যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত।

## গরুর দেহের পরিচ্ছন্নতা

গরুকে নিয়মিত পরিষ্কার জলে স্নান করান উচিত। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন স্নান করালে ভাল হয়। শীত ও বর্ষাকালে ২/৩ দিন অন্তর স্নান করান যেতে পারে। ঋতু, আবহাওয়া ও গরুর শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে স্নান করাতে হবে। স্নানের পর গরুর গা শুষ্ক কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া উচিত।

## ব্যায়াম

গরুকে রাতদিন গোয়াল ঘরে বেঁধে রাখলে স্বাস্থ্যহানি হয়। এজন্য প্রতিদিন অন্তত ৩/৪ ঘণ্টা মাঠে চরতে দিতে পারলে ভাল হয়। সকালের রৌদ্র স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। সকালে দুধ দোহনের পর কয়েক ঘণ্টা গরুকে বাইরে বেঁধে রাখলেও উপকার হয়।

## বিছানা

ইঁটের মেঝের উপর শুলে গাভীর পালানে আঘাত লাগতে পারে। দুগ্ধবতী গাভীদের শয়নের জন্য বিচালি দেওয়া দরকার। শীতকালে মেঝে ঠাণ্ডা হয়ে উঠে; এজন্য শীতকালের রাত্রে গরুর-শয়নের জন্য গোয়াল ঘরে শুষ্ক বিচালি বা ঘাস বিছিয়ে দেওয়া উচিত।

## আহার

গরু যাতে নিয়মিতভাবে প্রত্যহ ঠিক সময়ে খেতে পায়, সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার। গরু তার জাবের ডাবায় প্রয়োজন মত জাব যেন পায়। প্রত্যেকদিন এক সময়ে ভোরবেলায় ও বৈকালে জাব খেতে দেওয়া উচিত।

যেখানে যেসব পশুখাদ্য সহজ-প্রাপ্য ও সুলভ, সেখানে সেগুলি ব্যবহার করা লাভজনক। চুনি, ভুসি, কুঁড়ো, খইল প্রভৃতি পরিমাণ মত পোস্টাই তৈরি করতে হবে। গরুকে যে খাদ্য প্রতিদিন দেওয়া হয়, হঠাৎ তা পরিবর্তন করা উচিত নয়। কোন নতুন খাদ্য দিতে হলে প্রথমে অল্প পরিমাণে আরম্ভ করে তারপর ক্রমে ক্রমে বর্ধিত করাই যুক্তিসঙ্গত।

## পানীয় জল

দেহরক্ষার জন্য জলের প্রয়োজন। পরিষ্কার পানীয় জল গরুকে খেতে দেওয়া উচিত। দূষিত অপরিষ্কার পুকুর বা কুয়ার জল গরুকে দেওয়া উচিত নয়। পরিষ্কার পুকুর, গভীর কুয়া এবং টিউবওয়েলের জল নিরাপদ।

গাভী যতদিন দুধ দেয়, তার দেহে জলের প্রয়োজন থাকে বেশি। দুধের শতকরা ৮৭ ভাগই জল এবং গাভী যে জল পান করে, দুধের জলীয়াংশ আসে তা হতে। প্রতি কেজি দুধের জন্য গাভীকে ৪ কেজি জল পান করতে দিতে হয়।

## বলদ করা (Castraction)

ষাঁড়ের অণ্ডকোষের ভিতরে দুইটি অণ্ডগ্রন্থি আছে। প্রত্যেক অণ্ডগ্রন্থি দড়ির মত আকারের শুক্ররজ্জু (spermatic cord) দ্বারা ঝোলানো থাকে। অণ্ডগ্রন্থি হতে একটি শুক্রবাহী নল বের হয়ে ঐ স্পার্মাটিক কর্ডের মধ্য দিয়ে গিয়ে মূত্রনালীতে শেষ হয়েছে।

যৌবনের পূর্বে অণ্ডগ্রন্থি যদি কেটে বাদ দেওয়া যায়, তা হলে পুরুষত্বের বিকাশ হয় না এবং সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ষাঁড়গুলি উদ্ধত ও রাগী হয়ে থাকে; পুরুষত্ববিহীন বলদ শান্ত, ধীর ও কষ্টসহিষ্ণু হয়।

অণ্ডগ্রন্থি কেটে বাদ না দিয়েও, কেবলমাত্র শুক্রবাহী নল নষ্ট করে শুক্র নিঃসরণের পথ বন্ধ করে দিলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের গোজাতির অবনতির একটি প্রধান কারণ প্রজননের জন্য নিকৃষ্ট ষাঁড়ের (scrub bulls) ব্যবহার। নিকৃষ্ট ষাঁড়ের সংযোগে নিকৃষ্ট দুর্বল ক্ষীণজীবী গরুর পাল জন্মায়। সুস্থ নির্বাচিত দেশী গাভীগুলিকে কেবলমাত্র উন্নত জাতের ষাঁড়ের সঙ্গে সংযোগ করালে দেশে উন্নত গোবংশ উৎপন্ন হবে।

সাধারণতঃ ৩ থেকে ৫ মাস বয়সের ষাঁড়কে বলদ করা সুবিধাজনক।

# মহিষ বা মোষ

## মোষ পালনের গোড়ার কথা

গরু ও মোষ পালনের ও পোষণের পদ্ধতি একই ধরনের। এদের খাদ্য ব্যবস্থাও একই ধরনের। পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে ভারতই একটি অন্যতম দেশ—যেখানে গৃহপালিত জন্তু হিসেবে অধিক সংখ্যক মোষ প্রতিপালন করা হয়ে থাকে। চীন, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশেও অধিক সংখ্যক মোষ প্রতিপালন করা হয়ে থাকে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন সচরাচর মোষ দেখা যায়—ইউরোপে তেমন সচরাচর মোষ দেখা যায় না। আমেরিকায় যে মোষ দেখা যায়—তাদের মোষ আখ্যা না দিয়ে বাইসন (Bison) আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। অবশ্য আমেরিকার প্রথম অভিযাত্রীগণ ঐ দেশীয় বাইসনকে মোষই আখ্যা দিয়েছিলেন।

মোষ বুনো অবস্থায় ঘাস ভর্তি জোলো জঙ্গলের কাছেই চড়ে বেড়াত। কিন্তু গৃহপালিত মোষ এবং বুনো মোষের আকৃতি-প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। গৃহপালিত মোষের শরীরের আকৃতি ও শিং বুনো মোষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ধরনেব।

মোষের শিংয়ের মধ্যেই তার আকৃতিগত বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মোষের শিং সমতল ধরনের হয়ে থাকে। আর মোষের পিঠে কুঁদের (Hump) জায়গায় সঙ্কীর্ণ উচ্চস্থান বা Ridge রয়েছে।

## বিভিন্ন জাতের ভারতীয় মোষ

মহিষকে চলিত ভাষায় মোষ বলা হয়ে থাকে। ভারতে প্রায় ছয় প্রকার সুনির্দিষ্ট (Well-defined) জাতের মোষ রয়েছে। মোষ ভাবতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই ছয় প্রকার সুনির্দিষ্ট জাতের মোষ ছাড়াও আঞ্চলিক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যুক্ত কিছু কিছু অন্য শ্রেণীর মোষও রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উত্তর প্রদেশের ভাদাওড়ী (Bhadawari), ওড়িশার পারলেকমণ্ডী (Parlakmandi) এবং নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলের টোডা শ্রেণীর মোষ উল্লেখ করা যায়।

## ছয়টি প্রধান জাতের মোষ

### [১] জাফরবাদী (Jaffarbadi)

এই জাতের মোষের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য কাথিয়াবাড়ের গীর অরণ্যের জাফরবাদের কাছাকাছি অঞ্চলের মোষদের মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান।

*এই জাতের স্ত্রী মোষ পর্যাপ্ত পবিমাণে দুধ দিয়ে থাকে। এই জাতেব স্ত্রী মোষ প্রত্যহ গড়ে ১৫ থেকে ১৮ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে এবং এই দুধে প্রচুব* পরিমাণে স্নেহজাতীয় উপাদান অর্থাৎ প্রচুব পবিমাণে Butter-fat বিদ্যমান।

জাফববাদী জাতেব মোষ (পুং) মাথাব বৈশিষ্ট্য

**চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ** এই জাতের মোষেব চেহারাব প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদেব মাথা ভারী, কপাল স্পষ্ট এবং উন্নত, শিং চওড়া এবং সমতল ধবনেব—ঘাড়েব দু'পাশে নোয়ানো; শিংয়ের অগ্রভাগটি বাঁক যুক্ত। শবীবটা গোজাকৃতি (Wedge-shaped) স্ত্রী-জাতীয় মোষেব দুধেব বাঁটগুলি বড় এবং অত্যন্ত পুষ্ট।
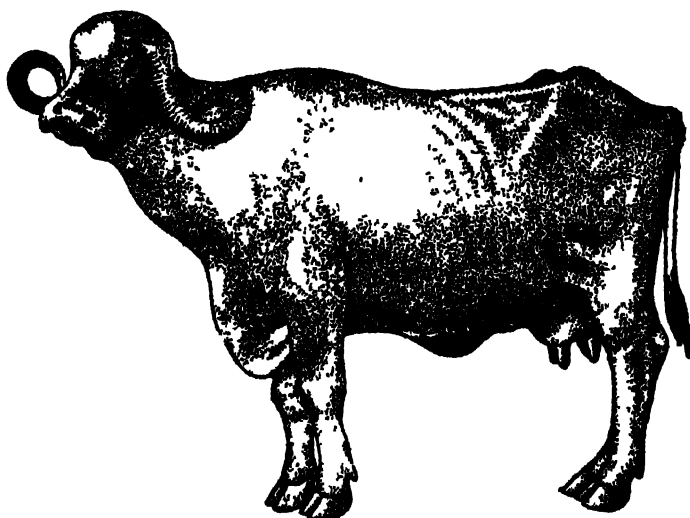
জাফববাদী জাতের দুগ্ধবতী (স্ত্রী-জাতীয়) মোষ

এই জাতেব স্ত্রী-মোষ প্রচুর পরিমাণে দুধ দিয়ে থাকে। এদের রং সচরাচব কালো হয়ে থাকে—কোন কোনটিব মুখে এবং পাযে সাদা ছোপ ছোপ দাগ থাকতে দেখা যায়।

## [২] সুরতী জাতের মোষ (Surti)

এই জাতের মোষের আদি বাসস্থান হচ্ছে গুজরাটের ছারোত্তর অঞ্চলে তথা কৈরা এবং বরোদা জেলাসমূহে। এই জাতের মোষের মধ্যে উত্তম জাতের মোষ আনন্দ, নাদিয়াদ, বারসাদ এবং পেটলাদ অঞ্চলে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। এইজাতের স্ত্রী মোষের প্রতিপালনে ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয়। কিন্তু দুধ পাওয়া যায় প্রচুর। এই দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে এই অঞ্চল থেকে বোম্বে-শহরে আনা হয়ে থাকে।

এই জাতের স্ত্রী মোষ স্তন্যদানকালে গড়ে ১,৫৫০ থেকে ১,৭০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। এই জাতের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর স্ত্রী-মোষ স্তন্য প্রদানকালে গড়ে ২,২০০ থেকে ২,৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে।

**চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ** এই জাতের মোষের চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— এদের গড়ন যেমন লম্বা, তেমন চওড়া; কপাল স্ফীত; সমতল ধরনের কাস্তে সদৃশ শিং; গোজাকৃতি Barrel এবং মধ্যমাকৃতি যুক্ত পা; লম্বা এবং পাতলা লেজ।

এই জাতের মোষের গায়ের রং কালো অথবা তামাটে হতে পারে; এদের গায়ে খুব অল্প লোম থাকে। এই জাতের উন্নত শ্রেণীর মোষের চোয়ালে এবং বক্ষঃস্থলে (Brisket) সাদা দাগ পবিলক্ষিত হয়ে থাকে।

## [৩] মুরহা জাতের মোষ (Murrah)

এই জাতের মোষের আদি বাসস্থান পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দিল্লী রাজ্যে। এই জাতের উন্নত শ্রেণীর মোষ রোটক, হিসার, ঝিন্দ্, নাভা এবং পাতিয়ালা জেলায়
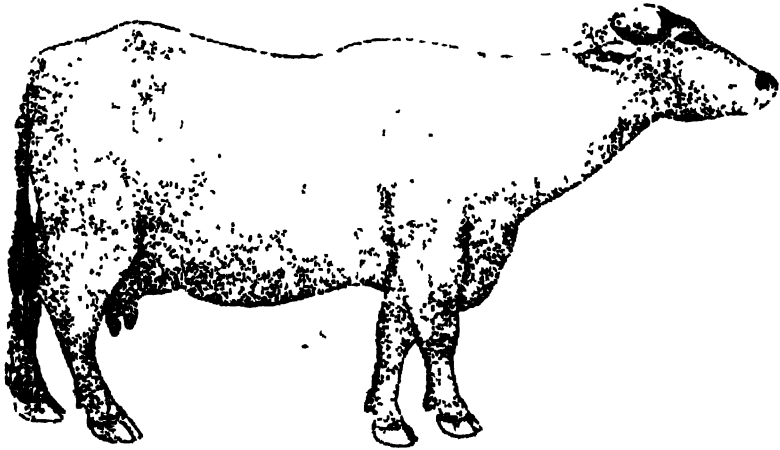
মুরহা জাতের স্ত্রী-মোষ

পাওয়া যায়। এই জাতের মোষের (স্ত্রী) দুগ্ধ ও ঘি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে এই জাতের মোষ ছড়িয়ে রয়েছে। এই জাতের স্ত্রী-মোষ স্তনাদান কালে গড়ে ১,৪০০ থেকে ১,৮০০

কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে এবং ঐ দুধে শতকরা সাত ভাগ থাকে স্নেহজাতীয় উপাদান (Butter-fat)।

এই জাতের উন্নত শ্রেণীব স্ত্রী-মোষ প্রত্যহ ২২ কিলোগ্রাম থেকে ২৭ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দিয়েছে—এরূপ রেকর্ড রয়েছে।

মুবহা জাতেব স্ত্রী-মোষেব পশ্চাদ্ভাগ
(পুষ্ট দুধেব বাঁট এবং সুদৃশ্য দুধেব বোঁটাসমূহ লক্ষণীয)।

এই জাতেব মোষের চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এদের মাথা সুগঠিত তথা ক্ষুদ্র ধবনের (Small and Clean Head) ; কপাল ঈষৎ উন্নত বা স্পষ্ট; শিং ছোট, সমতল এবং পশ্চাদ্ভাগে বাঁক যুক্ত বা কোকড়ানো ধরনের এবং ভিতব দিকে বাঁক যুক্ত। শবীর অর্থাৎ Barrel-টি বড় এবং গভীর, অনেকাংশে গোজাকৃতি (Wedged-shaped) বিশিষ্ট। এদের দুধেব বাঁটগুলি স্পষ্ট এবং বিশেষভাবে পরিপুষ্ট, স্তনের বোঁটাগুলোও সুদৃশ্য।

এই জাতের মোষের গায়ের রং কালো, কিন্তু লেজের লোমগুচ্ছের অগ্রভাগটি সচরাচর সাদা বর্ণের হয়ে থাকে।

## [৪] মেহসনা জাতের মোষ (Mehsana)

এই জাতের মোষের আদি বাসস্থান বরোদা এবং তৎ নিকটবর্তী অঞ্চলে। এই জাতের মোষের আকৃতি মধ্যম হ'লেও—দুধ এবং ঘি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই জাতের মোষ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই প্রজননের

উপযুক্ত হয়ে ওঠে, এবং এদের প্রজননও হয়ে থাকে নিয়মিত। ফলে এরা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দুধ দিয়ে থাকে।

**এই জাতের মোষের চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ** এই জাতের মোষের চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে—এদের মাথা ভারী, লম্বা; শিং দুটি বড় এবং শিথিল ধরনের বাঁক যুক্ত (Loose curl) ; শরীর অর্থাৎ Barrel-টি লম্বা ধরনের এবং গোজাকৃতি; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি হাল্‌কা ধরনের কিন্তু দুধের বাঁটগুলি অত্যন্ত পরিপুষ্ট হয়ে থাকে।

এদের গায়েব বং কালো—কিন্তু মুখ, পা ও লেজের অগ্রভাগের লোমগুচ্ছ সচরাচর সাদা বর্ণেব হয়ে থাকে।

## [৫] নাগপুরী (ইল্লিকপুরী) জাতের মোষ

এই জাতের মোষেব আদি বাসস্থান মধ্যভারত এবং দক্ষিণ ভারতে। এই জাতেব পুং জাতীয় মোষেব অধিক সংখ্যককে চাষের কাজে বা গাড়ি টানার কাজে (Draft purposes) লাগানো হয়ে থাকে। এই জাতের মোষ সচরাচর শ্লথ গতিতে
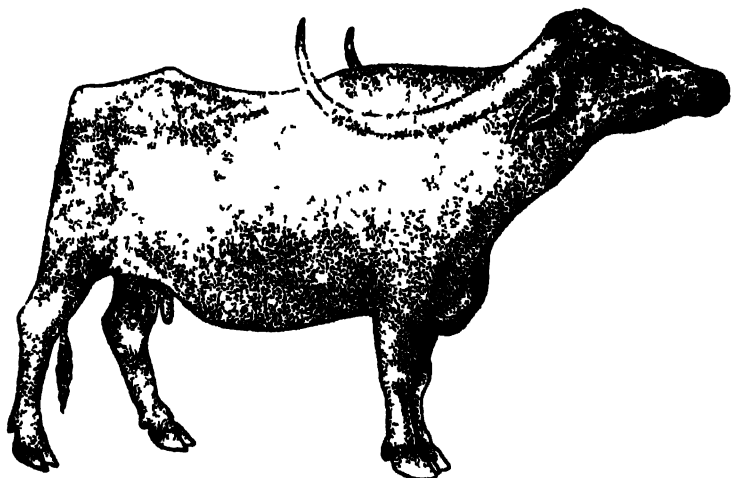
নাগপুবী দুগ্ধবতী জাতেব মোষ

(Slow moving) চলাচল কবে থাকে। এই জাতের স্ত্রী-মোষেবা পর্যাপ্ত পবিমাণে দুধ দিযে থাকে। প্রত্যহ এরা ৫ থেকে ৮ কিলোগ্রাম দুধ দিয়ে থাকে।

**এই জাতের মোষের চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ** এই জাতের মোষের চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে—এদের মাথা লম্বা, কপাল চওড়া; শিং দুটি লম্বা, বাঁকানো এবং কাঁধের দু'পাশে পশ্চাদ্ভাগে প্রলম্বিত; Barrel-টি লম্বা এবং গভীর; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি হাল্‌কা ধরনেব, কিন্তু লেজটি লম্বা হলেও লেজের অগ্রভাগে তুলনামূলকভাবে পাতলা ধরনের লোমগুচ্ছ হযে থাকে।

এদের গায়ের বং কালো, কিন্তু সচবাচর মুখে, পায়ে এবং লেজের অগ্রভাগে সাদা ছোপ ছোপ দাগ পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

## [৬] নিলি (Nili) জাতের মোষ

এই জাতের মোষের আদি বাসস্থান পাকিস্তানের মন্টোগোমারী জেলায় এবং পশ্চিম পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলায়। সুলতেজ নদীর জলের বর্ণ অনুযায়ী এই জাতের মোষের নাম 'নিলি' হয়েছে।
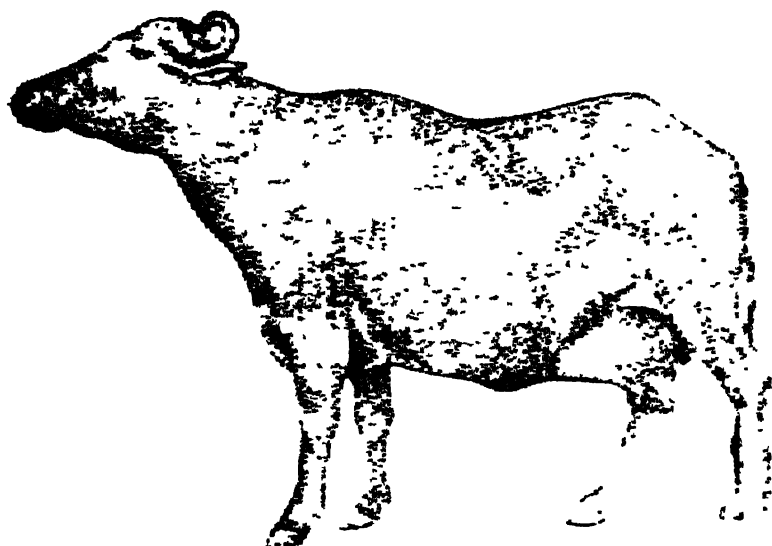
নিলি জাতেব মোষ

এই জাতের পুরুষ মোষের সাহায্যে ভারী ধরনের কাজগুলি (চাষের কাজ, গাড়ি টানার কাজ, সেচের কাজ ইত্যাদি) করা হয়ে থাকে এবং এসব কাজের জন্য কৃষক ও মজুরশ্রেণী একান্তভাবেই এর উপর নির্ভরশীল। এককথায় তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়ও বলা যেতে পারে।

এই জাতের স্ত্রী-মোষেরা পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ দিয়ে থাকে। স্তন্যদান কালে এই জাতের স্ত্রী-মোষেরা ২৫০ দিনে গড়ে ১,৬০০ কিলোগ্রাম দুধ দিয়ে থাকে।

**চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য :** এই জাতের মোষের চেহারাব প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এদের গড়ন যেমন লম্বা তেমন চওড়া। শিং দুটি বিশেষ বড় নয় এবং শিং-এর অগ্রভাগ বাঁকযুক্ত; Barrel-টি গোজাকৃতি।

এই জাতের মোষের গায়ের রং কালো হয়ে থাকে, কিন্তু মুখে, কপালে, থুতনীতে, পায়ে, লেজের অগ্রভাগে লোমগুচ্ছে সাদা ছোপ্ ছোপ্ দাগ পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

# গরু-মোষের রোগ-ব্যাধি ও প্রতিরোধ সহ চিকিৎসা

## ব্যাধি কাকে বলে

গবাদি পশুরা যখন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে না, মাঠে চরা তো দূরের কথা কেবল শুয়ে বসে থাকে। স্বাভাবিক মলত্যাগ করে না অথবা অস্বাভাবিক মল-মূত্র ত্যাগ করতে থাকে এবং স্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা যায় না সেটাই তাদের শরীরে ব্যাধির অর্থাৎ অসুখের প্রাথমিক চিহ্ন। প্রত্যেকটি রোগের আলাদা এবং নির্দিষ্ট কারণ থাকে। তাই কি জন্য রোগ হয়েছে তা ভেবে দেখে এবং গবাদি পশুর আচরণ মিলিয়ে ওষুধ প্রয়োগ কবতে হবে। এর সঙ্গে রোগের কারণ ধরতে পারলে তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করলে আব রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকবে না।

## চিকিৎসা ব্যবস্থা কাকে বলে

গবাদি পশুর অসুখ-বিসুখ করলে তাকে ওষুধ প্রযোগ করে ঠিক মতো পরিচর্যা এবং পথ্য দিয়ে রোগ থেকে মুক্ত করাকে চিকিৎসা ব্যবস্থা বলে।

## রোগ প্রতিরোধ প্রয়োজন কেন

রোগে আক্রান্ত গবাদি পশুকে ওষুধ প্রযোগ করে ভাল করার পবিবর্তে তাকে বোগ-ব্যাধির আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করাই হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা। যেমন—
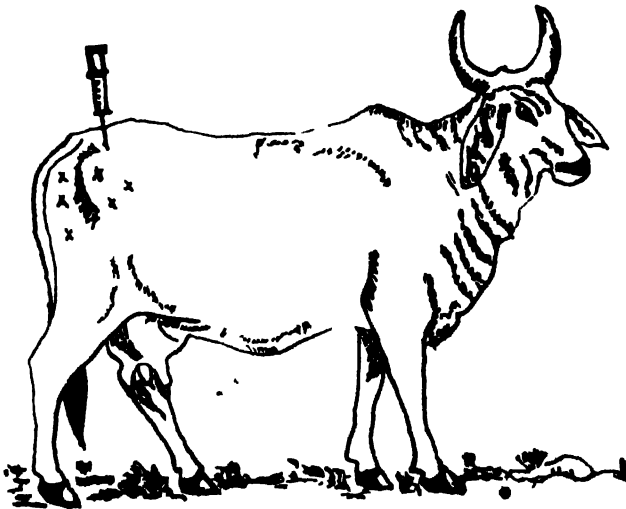
ছোঁয়াচে বোগের হাত থেকে রক্ষীর আগাম ব্যবস্থা

কোন অঞ্চলে বিশেস একটি ছোঁযাচে রোগের প্রকোপ দেখা দিলে তার বিরুদ্ধে আগাম ব্যবস্থা নিলে গো-পালকের গবাদি পশুরা রোগের আক্রমণের হাত থেকে হয়তো রেহাই পেতে পারে।

## প্রতিষেধক ব্যবস্থা কাকে বলা হয়

গবাদি পশুদের কোন ওষুধ খাইয়ে অথবা ইনজেকশন প্রয়োগ করে আগাম যে সমস্ত রোগ প্রতিরোধ করা যায় সেটাই প্রতিষেধক ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে পশু-চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে অবশ্যই করা দরকার।

## গো-বসন্ত অথবা রিণ্ডারপেস্ট

এটা ভাইরাস-ঘটিত এবং খুবই ছোঁয়াচে রোগ। একবার কোন অঞ্চলে শুরু হলে বিভিন্ন অঞ্চলে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র ৬ থেকে ৭ দিন রোগ যন্ত্রণা ভোগ কবে গরু অথবা মোষ মারা যায়।
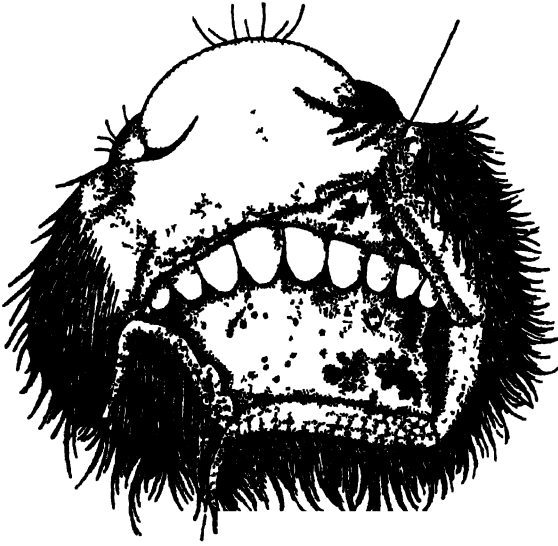
গো-বসন্ত বা বিণ্ডাবপেস্ট বোগে আক্রান্ত

**লক্ষণ ঃ** প্রবল জ্বর, খাওয়া এবং জাবব কাটা বন্ধ। পাতলা দুর্গন্ধ পায়খানা। রক্তও থাকতে পারে। উভয় চোখের কোলে পিঁচুটি। লোম খাড়া থাকে। গুটি কোন সময় বের হয় আবার কোন সময চামড়ার ভিতবে থাকে। শিবদাঁড়া বেঁকে যায। মুখের ভিতর, কান লাল বর্ণ হয়। শুকনো কাশিও থাকতে পারে। গরু বা মোষের ওঠার ক্ষমতা থাকে না।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

টেট্রাসাইক্লিন (৫ গ্রাম ওজনের ট্যাবলেট) পূর্ণ বয়স্ক পশুর জন্য দিনে ২ বার গুড়ের সঙ্গে মাখিয়ে দিতে হবে। ওষুধের মাত্রা হবে ২টি করে ট্যাবলেট একসঙ্গে।

বাছুরের ক্ষেত্রে ৬ মাসের নিচে আধ খানা কবে দিনে ২ বাব এবং এর বেশি বয়স হলে ১ খানা ট্যাবলেট দিনে দু'বাব।

এছাড়াও আরও দু'টি ট্যাবলেট রয়েছে। সালফা ডিমিডিন এবং কোট্রাইম্যাকসাজল (উভয় ট্যাবলেটের ওজন থাকে ৫ গ্রাম করে) আগেরটির মতো পরিমাণ এবং নিয়ম করে খাওয়াতে হবে।

গরু অথবা মোষ একেবারে খেতে না পারলে তখন একই ওষুধ ইনজেকশন করে ওদের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। ইনজেকশনের পরিমাণটা হবে টেট্রাসাইক্লিন গরু অথবা মোষকে ১ থেকে ২ মিলিলিটার প্রতিটি পশুর শরীরের ওজন ২৫ কেজি হলে পর পর ৫ দিন দিতে হবে।

সালফা ডিমিডিন (৩৩·৩৩ শতাংশ) বাছুরের ওজন অনুসারে ১০ থেকে ১৫ মিলিলিটার পর পর ৫ দিন। পূর্ণবয়স্ক গরুর ক্ষেত্রে ১০০ থেকে ৩০০ মিলিলিটার পর্যন্ত।

যদি পূর্ণবয়স্ক গরু অথবা মোষ এবং বাছুর পাতলা পায়খানা করে তবে সেটা বন্ধ করবার জন্য বড় গবাদি পশুর ক্ষেত্রে এন্ট্রোগোয়াইডিন ১০ থেকে ১৫টি ট্যাবলেট দিনে তিনবার করে সামান্য গুড়ের সঙ্গে মেখে খাওয়াতে হবে। বাছুরের ক্ষেত্রে ৭টি করে ট্যাবলেট দিনে তিনবার তিন দিন খাওয়ানো দরকার।

**পথ্য ঃ** পথ্য হিসেবে ঠাণ্ডা অবস্থায় ভাতের মাড় লবণ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। খুদ ও কলাই ভালভালে সিদ্ধ করে ঠাণ্ডা হলে ৩০ গ্রাম খাবার লবণ মিশিয়ে খেতে দেওয়া দরকার। কচি কাটা ঘাসও খাবার হিসেবে দেওয়া যাবে। আঁশযুক্ত শক্ত খাবার রোগ ভাল না হওয়া পর্যন্ত দেওয়া চলে না।

**প্রতিকার ও প্রতিরোধ ঃ** নতুন গরু অথবা মোষ অন্য স্থান থেকে আনলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টিকা দেবার ব্যবস্থা নিতে হবে। গোয়াল ঘর চুনের গুঁড়ো অথবা ফিনাইল জল দিয়ে দিনে একবার ধুয়ে দেওয়া দরকার। সরকারি প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। এছাড়া বাজারে টিসু কালচার রিণ্ডারপেস্ট ভ্যাকসিন ১ মিলিলিটার করে পাওয়া যায়। প্রতিটি গবাদি পশুকে এমন কি তিন মাসের বেশি বয়স হলে এমন বাছুরকে বছরে একবার প্রতিষেধক হিসেবে টিকাটি দেওয়া দরকার।

## কবিরাজি চিকিৎসা

শিমুল গাছের বীজ গো-বসন্তের একটি মহৌষধ। এই ওষুধ কিন্তু মোটেই বিষাক্ত নয়। তবে বসন্তের গুটি পেকে যাবার আগে ব্যবহার করতে হয়। আর গুটি পেকে গেলে যদি খাওয়ানো হয় তবে তার কোন ফলই হয় না। বীজ খাওয়াতে হবে সামান্য গুড়ের সঙ্গে। প্রথম দিনে প্রথম বার ২৫টি, দ্বিতীয়বার ১৮টি, তৃতীয়বার ১০টি খাওয়াতে হবে তিন থেকে চার ঘণ্টা অন্তর। দ্বিতীয় দিনে প্রথমবার ১৫টি, দ্বিতীয় বার ১০টি। এবার ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে। তৃতীয় দিনে মাত্র একবার ১০টি বীজ খাওয়ানো দরকার। এটা বসন্ত রোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ওষুধ।

দ্বিতীয় ওষুধ হিসেবে গবাদি পশুকে হেলেঞ্চা শাক খেতে দিলে সেটা ওষুধ এবং পথ্য উভয় কাজই করে।

বসন্ত রোগে আক্রান্ত গরু এবং মোষ যদি পাতলা পায়খানা করে তবে সেটা বন্ধ করার জন্য খড়িমাটি গুঁড়ো ২৮ গ্রাম, খয়ের ২৮ গ্রাম, শুঁঠ গুঁড়ো ১ গ্রাম, আফিম ১ গ্রাম ও দেশি মদ ৬০ মিলি লিটার একসঙ্গে মিশিয়ে ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাওয়াতে হবে। এতে পেট ধরে যাবে। অন্য ওষুধ, যেমন চলছে তেমনি চলবে।

## তিন দিনের জ্বর অথবা আড়াইয়া

গ্রামের লোকেরা গরু এবং মোষের এই রোগটিকে আড়াইয়া বললেও জ্বর প্রায় তিন দিন ধরে থাকে। ভাইরাস-ঘটিত রোগ এবং ছোঁয়াচে। কোন একটি এলাকায় গবাদি পশুর এই রোগ দেখা দিলে খুব তাডাতাড়ি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তবে তিন দিনের জ্বর অথবা আড়াইয়া রোগে গরু অথবা মোষ খুব কমই মারা যায়।

**লক্ষণ ঃ** পশুদের শরীরে প্রবল জ্বর উঠে যায়। জাবর কাটে না, খাবারও রুচি চলে যায়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পেশিতে টান ধরে। ফলে ওদের চলাফেরা কবতে অসুবিধে হয়। যদি একবার কোথাও বসে পড়ে তবে উঠতে চায় না। কারণ শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে।

### অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

গরু এবং মোষ পূর্ণ বয়সের হলে পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন এবং ঘাড়ের ব্যথা সারাবার জন্য প্যারাসিটামল (৫ থেকে ১০ মিলি) এদের মধ্যে যে কোন একটি ইনজেকশন করলে খুব তাড়াতাড়ি ভাল ফল পাওয়া যায়। বাছুরেব ক্ষেত্রে (৩ থেকে ৫ মিলি) পরিমাণ ইনজেকশন করলে ভাল ফল হয়।

### কবিরাজী চিকিৎসা

(ক) বেলপাতা ১০০ গ্রাম, আদা ৫০ গ্রাম ও ক্ষেতপাপড়া ১০০ গ্রাম পরিমাণ নিয়ে ৪০০ মিলিলিটার জলে সিদ্ধ করে ১০০ মিলি লিটার থাকতে সেটা আঁচ থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা হলে গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। দ্বিতীয় দিনেই গরু অথবা মোষের জ্বর ছেড়ে যাবে।

(খ) লবণ (খাবার) ১০ গ্রাম এবং শুঁঠ গুঁড়ো ১২ গ্রাম ভাতের মাড়ের সঙ্গে খেতে দিলে ওদের শরীরে দুর্বলতা দূর হবে।

(গ) রাই সরষের শেকড় ১০০ গ্রাম শিলে বেটে তার সঙ্গে ২ গ্রাম পরিমাণ গোল মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে দু'বার খাওয়ালে জ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

(ঘ) আয়াপানের শেকড় ১২ গ্রাম এবং তার সঙ্গে কালোজিরে ২৫ গ্রাম সামান্য জলের সঙ্গে বেটে গরু-মোষকে খাওয়ালে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায়। দিনের মধ্যে দু'বার প্রথম দিন খাওয়াতে হবে। দ্বিতীয় দিন সকালের দিকে একবার মাত্র খাওয়ালে জ্বর আর থাকবে না।

(ঙ) বাবলা পাতা ১০০ গ্রাম, শুঁঠ ১২ গ্রাম, রক্ত চন্দন ১০ গ্রাম এবং ক্ষেতপাপড়া একসঙ্গে সিদ্ধ করে গবাদি পশুদের খাওয়ালে সহজে জ্বর ছেড়ে যায়।

তিন দিনের জ্বরে অথবা আড়াইয়া রোগে যদি গবাদি পশুর প্রস্রাব হলুদ বর্ণ হয় তবে জল বেশি পরিমাণে খাওয়াতে হবে। যদি জল খেতে না চায় তবে ভাতের মাড়ে পরিমাণ মতো লবণ মিশিয়ে সামান্য গরম অবস্থায় খাওয়ানো দরকার।

রোগে আক্রান্ত পশুর পেট যদি পরিষ্কার না থাকে তবে সর্বপ্রথম কাজ হলো পেটটি পরিষ্কার করার জন্য জোলাপ দেওয়া দরকার।

## উদরাময় অথবা ডায়রিয়া

অপরিষ্কার এবং জীবাণুযুক্ত জলপান করলে অথবা পচা খাদ্যদ্রব্য খেলে এই রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে। গরু এবং মোষের বাছুরদের মধ্যে রোগের আক্রমণের সংখ্যা বেশি। তবে পূর্ণ বয়স্ক গবাদি পশুদেরও এই রোগ হবার আশঙ্কা থাকে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই ধবনেব ভাইরাসের আক্রমণে গবাদি পশুরা আক্রান্ত হচ্ছে। তখন এই রোগকে বলা হয় 'ভাইরাস ডায়বিয়া'।

**লক্ষণ ঃ** প্রথমে গবাদি পশুর দেহের উত্তাপ বাড়ে। তারপর বারবার জলের মতো পাতলা পায়খানা হতে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে পেট কামড়ানি অথবা পেটে যন্ত্রণা হয়। শেষে মলের সঙ্গে রক্তের ছিটাও দেখা দিতে পারে। গাভী গর্ভবতী হলে বার বার মল ত্যাগের ফলে বাচ্চা নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। ক্ষুধার কোন ইচ্ছে থাকে না। জাবর কাটাও বন্ধ হয়। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমে প্রায় অর্ধেক হয়।

### অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

পূর্ণ বয়স্ক গবাদি পশুদের সালফাডিমিডিন (৫ গ্রাম) অথবা কোট্রাইম্যাক্সাজল এক থেকে দু'টি ট্যাবলেট (বারে বারে খুব বেশি মল ত্যাগ করলে অবস্থা বুঝে) সারা দিনে দু'বার আর বাছুরদের ক্ষেত্রে অর্ধেক ট্যাবলেট দিনে দু'বার খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

**পথ্য ঃ** এই ধরনেব রোগে গবাদি পশুদের শরীব থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বের হয়ে যায়। কাজেই পূর্ণ বয়স্ক পশুর ক্ষেত্রে ১০ লিটার জলে ১০০ গ্রাম গুড়, ২০ গ্রাম খাবার লবণ এবং ২ গ্রাম খাবার সোডা মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। ওরা খেতে না চাইলেও বোতলে ভরে কষের ফাঁক দিয়ে জোর করে মুখের ভেতর ঢেলে দেওয়া দরকার। এছাড়াও খুদকে ভালভাবে সিদ্ধ করে পরিমাণ মতো খাবার লবণ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। খুব কচি ঘাস সামান্য ছোট করে কেটে অল্প গমের ভুসি মেখে খাবার হিসেবে দেওয়া চলে।

জলটা খাওয়ানো খুবই জরুরী। কারণ ওদের শরীর থেকে মলের সঙ্গে যে পরিমাণ জল বের হয়ে যায় তার কিছুটা পূরণ না করলে দেহ অবশ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাছাড়া লবণের ঘাটতি দেহের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কাজেই এই

দুয়ের অভাব বা ঘাটতি অবশ্যই পূরণ করা দরকার। এটা পথ্য, খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ বলা চলে।

**প্রতিকার ও প্রতিরোধ ঃ** গোয়ালে কোন গরুর বা মোষের এই রোগ দেখা দিলে তাকে প্রথমেই গোয়াল থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এরপর খাবার জলে ব্লিচিং পাউডার অথবা ফটকিরি মিশিয়ে বিশুদ্ধ করার পর গবাদি পশুদের জলপান করতে দিতে হবে।

## কবিরাজী চিকিৎসা

(ক) গেরিমাটি ১৫ গ্রাম এবং ৭৫ মিলিলিটার হুঁকোর জল এক সঙ্গে মিশিয়ে দিনে একবার খাওয়াতে হবে। বাছুরদের ক্ষেত্রে পরিমাণ হবে অর্ধেকটা।

(খ) চিড়ের কুঁড়ো ও চাঁপা কলা ভালভাবে চটকে খাওয়ালে বিশেষ উপকার হয়।

(গ) বাঁশপাতা অথবা চালতার পাতা খাওয়ালে পাতলা মল বন্ধ হয়।

## রক্ত আমাশয়

এই রোগটি পেটের অসুখ থেকে অথবা আমাশয়ের জীবাণু জলের অথবা খাদ্যের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলে হয়। বাছুর সহ পূর্ণবয়স্ক গবাদি পশুদেরও এই রোগ হতে পারে। আন্ত্রিক ঝিল্লির প্রদাহ থেকে এই রোগের সৃষ্টি। বাছুরদের ক্ষেত্রে মলের সঙ্গে কেবল রক্ত বের হতেও পারে। রোগের প্রথমেই চিকিৎসা না করলে গরু, মহিষ এবং বাছুরের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** রোগের প্রথম দিকে গবাদি পশুর গায়ে জ্বর নাও হতে পাবে। তবে কয়েকদিন যাবার পর এবং কোন রকম চিকিৎসা না হলে জ্বর হতে পারে। পাতলা মল ও তার সঙ্গে রক্ত এবং আম মেশানো থাকে। চোখ মুখের চামড়া হলুদবর্ণ এবং রক্তশূন্য হয়ে যায়। কিছু খেতে চায় না। শরীর ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

গরু অথবা মোষের বাছুরের মলের সঙ্গে যদি আম না থাকে তার পরিবর্তে কেবল রক্ত বের হতে থাকে তা হলে সালফাডিমিডিন (৫ গ্রাম ওজনের) ট্যাবলেট আধখানা করে দিনে ২ বার খাওয়াতে হবে। বয়স্ক পশুদের ক্ষেত্রে একই ওষুধ সম পরিমাণ ওজনের ২টি করে বড়ি দিনে দু'বার দিতে হবে।

এতেও যদি ভাল কাজ না হয় তবে ফুরাজলিডন ট্যাবলেট অথবা কোট্রাইম্যাকসাজল ইনজেকশান (দেড় মিলি করে) পর পর তিন দিন দিতে হবে। এই ওষুধ এবং পরিমাণ কেবলমাত্র বাছুরের (গরু অথবা মোষের) জন্য।

বাছুরকে দুধ (গাভীর) খেতে দেওয়া বন্ধ করলে চলবে না। যদি দেখা যায় বাছুরের মল আগের তুলনায় বেশ ঘন হয়েছে তখন একটা বড় গ্লাসে খাবার জল ভরে তাতে ১ চামচ গুড়, আধ চামচ খাবার লবণ ও সিকি চামচ খাবার সোডা মিশিয়ে সেটা ভালভাবে জলেতে গুলে এক থেকে দু'ঘন্টা অন্তর খাওয়াতে হবে।

**পথ্য :** বয়স্ক গবাদি পশুর ক্ষেত্রে পথ্য হিসেবে কচি ঘাস ছোট ছোট করে কেটে সামান্য বার্লির জল মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। এছাড়া ভাতের মাড় ঠাণ্ডা করে তাতে সামান্য লবণ মিশিয়ে খাওয়ানো চলবে। এছাড়াও চিঁড়ে অথবা চালের খুদ ভালভাবে সিদ্ধ করে খেতে দেওয়া যেতে পারে।

## কবিরাজী চিকিৎসা

(ক) কালো তিল ১৬০ গ্রাম বেটে ৬০ গ্রাম গুড়ের সঙ্গে খাওয়ালে উপকার হয়।

(খ) কাঁটা নটের মূল ১০ গ্রাম ভাল করে বেটে ১০০ গ্রাম গুড়ের সঙ্গে খাওয়ালে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

(গ) ধুতরার বীজ গুঁড়ো ৩ গ্রাম, কর্পূর ৬ গ্রাম, দেশি মদ ৫০০ মিলিমিটার ভাতের ঠাণ্ডা মাড়ের সঙ্গে খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(ঘ) বাছুরের ক্ষেত্রে কাঁটা নটের ডগা, গুলঞ্চ, রক্ত কম্বলের মূল, নিম গাছের ছাল প্রত্যেকটি ১২ গ্রাম করে এক সঙ্গে বেটে খাওয়ালে উপকার হবেই।

(ঙ) চিঁড়ের অথবা চালের কুঁড়োর সঙ্গে রক্ত কম্বলের গেঁড় বেটে খাওয়ালে বাছুরের রক্ত পায়খানা বন্ধ হয়।

# পেটফাঁপা

এটা কোন ছোঁয়াচে রোগ নয়। বর্ষার সময় বেশি পরিমাণে নতুন ঘাস খেলে অথবা খড় পেট ভরে খেয়ে ফেললে গরু অথবা মোষের পেট ফাঁপে। কিছু ক্ষেত্রে বিয়ে বাড়ির বাসি খাবার, শালপাতা এবং কলাপাতা পেট ভরে খেলেও পেট ফেঁপে ওঠে।

**লক্ষণ :** গবাদি পশু এমন অবস্থায় কিছুই খেতে চায় না। জাবর কাটাও বন্ধ করে দেয়। মলত্যাগ করলেও মলের পরিমাণ খুবই কমে যায়। ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

জেলুসিল অথবা ডাইজিন ট্যাবলেট ২০টি এবং দুটো (৫ গ্রাম ওজনের) টেট্রাসাইক্লিন বড়ি একটা বোতলে অর্ধেকটা জল ভরে তার মধ্যে দু'রকম ট্যাবলেট মিহি করে গুঁড়িয়ে বোতলের জলে ভালভাবে গুলিয়ে সবটা একসঙ্গে খাইয়ে দিতে হবে। যদি দেখা যায় গরু অথবা মোষ সম্পূর্ণ ভাল হয়নি তবে বিকেলে আরও একবার ঐ ওষুধ এবং একই পরিমাণে একই পদ্ধতিতে খাইয়ে দিতে হবে।

## কবিরাজী চিকিৎসা

(ক) জোয়ান ১০ গ্রাম, গোলমরিচ ২ গ্রাম, শুঁঠ ১২ গ্রাম এবং বিট লবণ ১০ গ্রাম, এদের সবকটিকে ভালভাবে গুঁড়ো করে এক বোতল জলে গুলে একটু একটু করে খাইয়ে দিলে উপকার হবে।

(খ) ওপরের ওষুধে যদি পেটের ফাঁপা না কমে এবং মলত্যাগ না করে তবে লবণ (খাবার) ৩৫০ গ্রাম, মুসব্বর ১৫ গ্রাম, শুঁঠ গুঁড়ো ১৫ গ্রাম ও চিটে গুড় ২৫০ গ্রাম, একসঙ্গে মিশিয়ে সামান্য গরম অবস্থায় ১ লিটার জলে ভালভাবে গুলে খাওয়ালে এক থেকে ২ ঘণ্টার মধ্যে গবাদি পশু মলত্যাগ করবে ও পেট ফাঁপা কমবে।

## ক্রিমিরোগ

সাধারণভাবে মানুষের পেটের মধ্যে যে তিন শ্রেণীর ক্রিমি হয় গরু ও মোষের ক্ষেত্রেও ঐ তিন শ্রেণীর কৃমি দেখতে পাওয়া যায়। (ক) ছোট সাদা ক্রিমি। এরা পায়খানার দ্বারের খুব কাছেই থাকে। (খ) গোল কেঁচো ক্রিমি এবং (গ) ফিতা ক্রিমি।

শেষের দুটি শ্রেণী পেটের ভিতর থাকে। এছাড়াও গবাদি পশুর আরও এক শ্রেণীর ক্রিমি হয়। এদের খালি চোখে প্রায় দেখা যায় না। চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় ওদের নাম 'এককোষী' কৃমি। পশুদের রক্তের মধ্যে মিশে থাকে। তবে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় গবাদি পশুর খাবার নালীতেও এই শ্রেণীর ক্রিমি রয়েছে।

**লক্ষণ ঃ** আগে যে (ক), (খ) ও (গ) এই তিন শ্রেণীর কৃমির কথা বলা হলো তাদের সম্পর্কে বলার আগে একেবারে শেষেরটি অর্থাৎ 'এককোষী' ক্রিমির লক্ষণ সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথম দিকে জ্বর খুব সামান্য হয়। পরে শরীরের উত্তাপ বেশ বাড়ে। ১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। গাভীরা দুধ দিতে চায় না। প্রস্রাব কম এবং রংটা হলুদ হয়। পায়খানার পরিমাণও কমে এবং বারে বারে মলত্যাগ করে। বলদরা কাজ করতে পারে না। অনেক সময় চলতে চলতে বসে পড়ে। রোগ বেশি দিনের পুরানো হলে গবাদি পশুদের মৃত্যু ঘটে।

### অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

দেশি গাই গরু এবং বলদকে বেরেনিল ইনজেকশান ৩ গ্রাম পরিমাণ, বড় সংকর জাতের গরুকে ৪ গ্রাম এবং মোষের ক্ষেত্রে ৫ গ্রাম ইনজেকশান দেওয়া দরকার। এর সঙ্গে ক্লোরফেনারসিন ম্যালিয়েট ১০ মিলি ইনজেকশান দিলে ভাল হয়। যদি দেখা যায় গবাদি পশুর শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে তাহলে ৫০ গ্রাম লবণ ও ১০০ গ্রাম গুড় ২০০ মিলি লিটার জলে গুলে একটি বোতলে ভরে গবাদি পশুদের খাওয়াতে হবে। বাছুরের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি দেহের ওজনের ইনজেকশান লাগবে ৩·৫ মিলিগ্রাম।

গরু-মোষ রোগ মুক্ত হলে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের মিশ্রণ ওদের খাওয়ানো দরকার। স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য কিছুটা বেশি পরিমাণে খইল-ভুসি ও কচি ঘাস খেতে দেওয়া উচিত। অসুস্থ অবস্থায় গবাদি পশুরা কিছু খেতে না চাইলে ভাতের মাড় সামান্য লবণ মিশিয়ে খেতে দিতে পারা যায়।

## গোল ক্রিমি

গরু এবং মোষের গোল ক্রিমি প্রায়ই হয়। ওদের মলের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোটা সাদা সুতোর মতো ক্রিমি বের হয়। কিছু ক্ষেত্রে মৃত এবং কয়েক সময় ওরা বাইরে এসেও বেঁচে থাকে। বাছুর এবং বয়স্ক গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও একইভাবে ক্রিমি বের হয়।

**লক্ষণ ঃ** ঠিক মতো খেতে দিলেও শরীর রোগা হতে থাকে। পেটটা বড় হয়। গায়ের লোম উঠে যায়. গাভীর দুধ দেবার পরিমাণ কমে। স্বাভাবিক মলত্যাগ করলেও মাঝে মাঝে পাতলা পায়খানা হয়। বলদও দুর্বল হয়ে পড়ে, গাড়ি টানা অথবা জমিতে লাঙ্গল দেবার সময় ঠিক মতো কাজ করতে পারে না।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

বাছুরদের ক্ষেত্রে খুব ছোট থেকেই এর ব্যবস্থা নিতে হবে। ওদের জন্মের পর একমাস পার হলেই পাইপারজিন হেক্সাহাইড্রেট পাউডার ৫ গ্রাম একবার খাওয়াতে হবে। এটি না পেলে মেবেন্ডাজল ১ গ্রাম ওজনের ট্যাবলেট একটি খাওয়ানো দরকার। বাছুরের বয়স ৬ থেকে ৮ মাস হলে ২টি ট্যাবলেট (প্রতিটি ১ গ্রাম ওজনের) একসঙ্গে খাওয়াতে হবে। বড় গরু অথবা মোষের ক্ষেত্রে (এক গ্রাম ওজনের ট্যাবলেট) ৪টি ট্যাবলেট এবং সংকর জাতের গরু হলে ৬টি পর্যন্ত ট্যাবলেট খাওয়াতে পারা যায়।

**প্রতিকার ও প্রতিরোধ ঃ** গরু অথবা মোষের বাছুর জন্মাবার পর এক মাস বাদেই একবার, দু'মাস বয়স হলে আরও একবার এবং প্রতি ৬ মাস অন্তর একবার করে কোন ক্রিমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো উচিত।

## কবিরাজী চিকিৎসা

(ক) পলাশ ফুলের বীজ ২০টি খইলের সঙ্গে বেটে রোজ একবার করে তিন দিন খাওয়ালে ক্রিমি মরে যায়।

(খ) খাবার লবণ ১০ গ্রাম এবং হীরাকস ২ গ্রাম ভালভাবে গুঁড়ো করে কলাপাতায় মুড়ে গবাদি পশুকে খাওয়ালে ক্রিমি মরে মলের সঙ্গে বাইরে চলে আসে।

(গ) হুঁকোর জল ৫০ থেকে ৬০ মিলিলিটার এবং ২০টি কাগজী লেবুর পাতা বাটা এক সঙ্গে মিশিয়ে দিনে একবার করে তিন দিন পর পর খাওয়ানো দরকার।

(ঘ) এ ব্যাপারে ঝিঙের বীজও খুব উপকারী। মোট ১২টি বীজ খোলের সঙ্গে বেটে ২ থেকে ৩ দিন খাওয়ালে কৃমি নষ্ট হয়।

## ফিতা ক্রিমি

লক্ষণ সব আগের মতো। তবে এক্ষেত্রে গবাদি পশু ভাল থাকে। আবার মাঝে মাঝে পাতলা পায়খানা সহ মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যায় ও হাত-পা ছুঁড়তে থাকে।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

নিক্রো সামাইউ এবং ডাইক্লোরোকেন উভয় ওষুধের মধ্যে যে কোন একটি ভাল কাজ দেয়।

## তড়কা

রোগটি খুবই ছোঁয়াচে। গবাদি পশুর থেকে মানুষও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে। এক ধরনের জীবাণু থেকে তড়কা রোগ গরু ও মোষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষার সময় বানের পর এই রোগের জীবাণু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খুব সহজেই চলে আসে। ঘাসেব মধ্যে বাসা বাঁধে। গবাদি পশু সেই ঘাস খেয়ে তারা তড়কা রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগে আক্রান্ত মৃত পশুকে মাঠে ফেলে দিলে তার থেকে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। সারা বর্ষাকাল এবং শরৎকালের শেষ পর্যন্ত এই রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

**লক্ষণ ঃ** গরু এবং মোষ প্রবল জ্বরের সঙ্গে সব কিছু খাওয়া বন্ধ করে দেয়। মাত্র দু'দিন এইভাবে চলার পর হঠাৎ মাটিতে পড়ে গিয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে মারা যায়। কিছু ক্ষেত্রে দেহের কোন স্থান ফুলে ওঠে। বিশেষ করে কাঁধ, গলা অথবা পেটের কোন জায়গায় গোল হয়ে ফুলে উঠতে পারে। কোনো জায়গায় বেদনা হয়। রোগের আক্রমণ প্রবল হলে মাত্র একদিনেই গরু অথবা মোষ মারা যায়। মৃত পশুর নাক, মুখ, মল ও প্রস্রাব দ্বার দিয়ে রক্ত বের হতে দেখা যায়। পেটটাও খুব ফুলে ওঠে।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

পশুদের শরীরে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই চিকিৎসা শুরু না করলে ওদের বাঁচানো খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। রোগ ধরতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বাছুরদের ক্ষেত্রে ১০ লাখ পেনিসিলিন অথবা ৫০০ মিলিগ্রাম এম্‌পিসিলিন ইনজেকশান প্রয়োগ করা দরকার।

বড় গবাদি পশুদের ক্ষেত্রে ২০ লাখ পেনিসিলিন অথবা ২ গ্রাম এম্‌পিসিলিন বা ২০ মিলি অক্‌সি-টেট্রাসাইক্লিন ইনজেকশান দিতে হবে। তবে পশুচিকিৎসক হাতের কাছে থাকলে তাঁর পরামর্শ সর্বপ্রথম নেওয়া দরকার।

**প্রতিকার ও প্রতিরোধ ঃ** তড়কা রোগের ক্ষেত্রে আগাম প্রতিরোধ সব থেকে কার্যকর ব্যবস্থা বলতে পারা যায়। কারণ রোগটি যখন ধরা পড়ে তখন চিকিৎসার বাইরে চলে যায়। কারণ ওষুধ প্রয়োগ করেও কোন ফল হয় না। সরকারি প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনা মূল্যে এই রোগের টিকা পাওয়া যায়। প্রতি বছর বর্ষার আগে সব বয়সের গরু, বাছুর এবং মোষকে টিকা দেওয়া দরকার। যদি বন্যা হয় তবে অবশ্যই টিকা দিতে হবে।

প্রতিকার হিসেবে মৃত পশুকে ভাগাড়ে না ফেলে গ্রামের বাইরে মাটি খুঁড়ে চারদিকে ভালভাবে চুনের গুঁড়ো ছড়িয়ে পুঁতে দিতে হবে। মৃত পশুর চামড়া কোন

মতেই ছাড়ানো চলবে না। কারণ যে চামড়া ছাড়াবে তারও এই রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকবে। তড়কা রোগে কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হলে শরীরে দগদগে ঘা হবে। জ্বরও হতে পারে। গোয়াল ঘর থেকে মৃত পশুকে সরিয়ে নিয়ে গেলে ১০ লিটার জলে ২০ গ্রাম পটাশ পারমাঙ্গানেট গুলে ভালভাবে ঐ জলে ঘর ধুতে হবে।

## কবিরাজী চিকিৎসা

একই বক্তব্য কবিরাজী চিকিৎসকদের। পশুদের চিকিৎসা করার সময় পাওয়া যায় না। তবে রোগের প্রথম মুখে ৫০০ মিলিলিটার তিসির তেল ও ২৮ মিলিলিটার তার্পিন তেল একত্রে খাওয়ালে কিছু ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়।

## বাদলা অথবা ব্ল্যাক লেগ

গবাদি পশুদের এটি প্রধান সংক্রামক রোগ। এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া এই রোগের প্রধান কারণ। গরুর বাছুর অথবা মোষের বাচ্চাদের ছয় মাস বয়স থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়। তবে বয়স্ক গরু অথবা মোষও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বর্ষার শুরু থেকেই এ রোগ দেখা দেয় এবং চলে শরৎকাল পর্যন্ত।
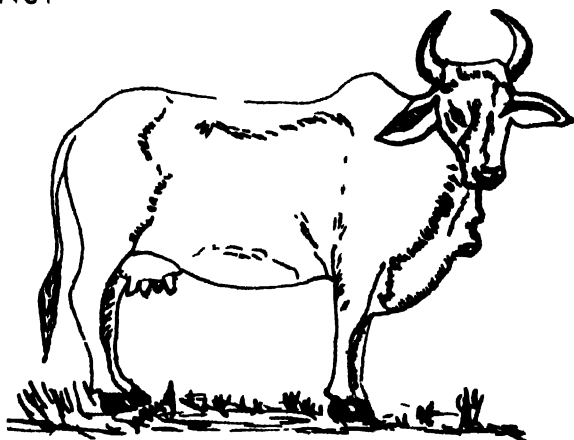
বাদলা বা ব্ল্যাক-লেগ রোগে আক্রান্ত গাভী

**লক্ষণ ঃ** গরু অথবা মোষ এই রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে খাওয়া ও জাবর কাটা বন্ধ করে দেয়। জ্বরও শুরু হয়। পশুর শরীরে যে সমস্ত অংশে বেশি পরিমাণে মাংস থাকে সেখানে ফুলে ওঠে। পাছা, কাঁধ, পিঠ, কুঁচকি, গলা এমন কি জিহ্বা পর্যন্ত ফুলে যায়। এভাবে বিভিন্ন অঙ্গ ফুলে উঠলে গবাদি পশু খোঁড়াতে শুরু করে। ফোলা অংশ টিপলে মনে হয় ভিতরে একটা বিজবিজ শব্দ হতে থাকে। মনে হয় ফোলা জায়গাটা বাতাসে ভরা। ফুলো এক থেকে দুটি অথবা বেশ কয়েকটি ফোলা ওদের দেহে দেখা দিতে পারে। এই রোগে আক্রান্ত পশু মাত্র ১ দিন বেঁচে থাকে।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

রোগ ধরতে পারা মাত্রই ফোলা অংশের বিভিন্ন জায়গায় ২০ লাখ পেনিসিলিন ইনজেকশান দিতে হবে। এইভাবে ইনজেকশান চলবে দিনে দু'বার। এর সঙ্গে ফেনেরামিন ম্যালিয়েট (২২·৭৫ মিলিগ্রাম) অথবা প্রোমেথাজিন হাইড্রোক্লোরাইড (৫ শতাংশ) ইনজেকশান রোগের প্রকোপ অনুসারে (৫ থেকে ১০ মিলি) দিলে কিছুটা উপকার হয়।

তবে বাদলা রোগ সম্পর্কে গো-পালকদের মনে রাখতে হবে, চিকিৎসার সামান্য সময় দেরি হলে গবাদি পশুদের বাঁচানো খুবই শক্ত ব্যাপার। খুবই কম সংখ্যক গরু অথবা মোষ এই রোগেব হাত থেকে পুনরায় জীবন ফিরে পায়। সেই কারণে বলা হয় ওষুধ প্রয়োগ করেও গবাদি পশুদের বাঁচানো যায় না।

**প্রতিরোধ ও প্রতিকার ঃ** কোন এলাকায় এই রোগ শুরু হলে গবাদি পশুদের মাঠে ছাড়া উচিত নয়। রোগে আক্রান্ত পশুকে সব সময় আলাদা জাযগায় রেখে চিকিৎসা করতে হবে। মৃত পশুকে ভাগাড়ে না ফেলে ৫ থেকে ৬ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে চুন ছড়িয়ে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এমন কি মৃত গরু অথবা মোষের চামড়া পর্যন্ত ছাড়াতে দেওয়া উচিত নয়।

সরকারি পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে এই রোগের টিকা বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। গরুর বাছুর অথবা মোষের বাচ্চাকে পাঁচ মাস বয়স হলেই টিকা দিয়ে বাখলে বাদলা রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

যদি কোন কারণে সবকারি হাসপাতালে ওষুধ না থাকে তবে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। নাম এই এস. বি. কিউ, কম্বাইণ্ড কিনতে পাওয়া যায়। গোয়ালের প্রত্যেকটি গরু বাছুরকে বর্ষা শুরু হবার আগে ৪ মিলি গলার চামড়ার নিচে ইনজেকশান দিতে হবে।

## কবিরাজী চিকিৎসা

রোগটি এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে গো-পালক সহজে বুঝতে পারে না তার পালিত পশুর প্রকৃতপক্ষে কি হয়েছে। যখন লক্ষণ মিলিযে চিকিৎসা শুরু হয় তখন রোগের শেষ পর্যায়। কাজেই ওষুধ প্রয়োগ করেও কোন ভাল ফল মেলে না।

ফুলে যাওয়া অংশটা ছুরি দিয়ে কেটে তাতে তার্পিন তেল লাগালে কিছু ক্ষেত্রে গবাদি পশুরা কিছুটা আরাম পায়।

## সর্দিগর্মী

গরমের সময় হঠাৎ প্রখর রোদে দীর্ঘ সময় থাকার পর হঠাৎ পুকুর অথবা নদীতে স্নান করালে সর্দিগর্মী হয়। এছাড়াও মাঠে একটানা পরিশ্রমের পর বিশ্রাম না করে ঠাণ্ডা জল পান করলে গরু অথবা মোষের সর্দিগর্মী হতে পারে। পরিশ্রম করতে করতে বৃষ্টির জলে ভিজে গেলে এই রোগ হবার আশঙ্কা থাকে। আবার গরম স্থান থেকে হঠাৎ কোন শীতল স্থানে গেলে সর্দিগর্মী হয়ে থাকে।

**লক্ষণ ঃ** সর্দিগর্মীতে আক্রান্ত পশু হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে। আবার সংজ্ঞাহীন না হলেও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ধুঁকতে থাকে। কিছু খেতে চায় না। জাবর কাটা বন্ধ করে দেয়। শরীরে সামান্য জ্বরও হয়। নাক, মুখ দিয়ে সর্দি গড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে কাশিও হতে থাকে।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

এমোনকার্ব ও এমোনক্লোর প্রতিটি ৩০ গ্রাম পরিমাণ নিয়ে সেটা দু'ভাগ করার পর সারা দিনে দু'বার গুড়ের সঙ্গে গবাদি পশুকে খাওয়াতে হবে। এর সঙ্গে প্রোকেন পেনিসিলিন অথবা টেট্রাসাইক্লিন ইনজেকশান দেওয়া দরকার। যদি দেখা যায় গরু অথবা মোষ বেশি ধুঁকছে তবে ক্লোরকেনেরামিন ম্যালিয়েট অথবা প্রোমেথাজিন হাইড্রোক্লোবাইড ইনজেকশান দিলে ভাল হয়।

যদি দেখা যায় ওষুধ এবং ইনজেকশান দিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার। কারণ সর্দিগর্মীতে পশুদেব মাথায় অত্যধিক বক্ত সঞ্চালিত হয়ে মাথার বিভিন্ন শিরাতে চাপ পড়ে। ফলে শিরা ছিঁড়ে গিয়ে মাথার ভিতরে রক্ত ক্ষরণ বেশি হলে পশু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যেতে পারে।

এই রোগে আক্রান্ত হবার পব যদি গবাদি পশুর জ্বরের পরিবর্তে দেহ ঠাণ্ডা হতে থাকে তবে সেটাও খুব খারাপ লক্ষণ। এই রকম অবস্থায় পশু খুব বেশি সময় ধবে বাঁচে না। কাজেই পশু চিকিৎসকের পরামর্শ খুবই জরুরী।

**পথ্য ঃ** গবাদি পশুর যদি দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা থাকে এবং জ্বর থাকলে সামান্য গরম ভাতেব মাড় লবণ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। বিকেলে চালের খুদ সিদ্ধ পশু নিজের রুচি অনুসারে খাবে। ঠিক মতো চিকিৎসা হলে গবাদি পশু দু'দিনেই ভাল হয়ে যায়। কাজেই তৃতীয় দিন থেকে মাঠে ঘাস খাবে এবং বাড়িতে নিত্য খাদ্য হিসেবে যেমন জাব খায় সেইভাবেই খেতে দিতে হবে।

**প্রতিরোধ ঃ** গরম অথবা শীতকালে যে কোন মরশুমে রোদে থাকার পর কিছু সময় ছায়াতে রেখে তারপর জল খাওয়ানো অথবা স্নান করানো উচিত। গাড়ি টেনে অথবা লাঙ্গল দিয়ে এবং বহুদূর হাঁটিয়ে এনেই জল খাওয়ানো অথবা স্নান করিয়ে দেওয়া এই দুয়ের মধ্যে কোনটাই করা উচিত নয়।

## কবিরাজী চিকিৎসা

ধনে ১২ গ্রাম, তিসি ৫ গ্রাম, ইসবগুল ৫০ গ্রাম, সোঁদাল পাতা ৫০ গ্রাম এবং বিট লবণ ১২ গ্রাম এক সঙ্গে বেটে সেটা ভাতের মণ্ডের ঢেলার ভিতর ভরে আক্রান্ত পশুকে খাওয়াতে হবে। দিনে দু'বার মাত্র ২ দিন এই ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার।

## পুড়ে যাওয়া ঘা

গোয়াল ঘরে আগুন লেগে গরু অথবা মোষের শরীর পুড়ে যেতে পারে।

এছাড়াও গরম জল অথবা অপর কিছু গরম জিনিসের স্পর্শ লেগে ওদের দেহের কোন অংশ পুড়ে যেতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** পোড়া জায়গায় লাল অথবা কালো রং হতে পারে। প্রথম দিকে চামড়া কুঁচকে যায়। শেষে মাংস থেকে উঠে আসে। দগদগে ঘা হয় এবং রস কাটতে থাকে। প্রথম দিকে জ্বালা ও যন্ত্রণা থাকায় গবাদি পশুরা উত্তেজিত হয়। অবশ্য দু-তিন দিন পর যন্ত্রণা থাকে না।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

পুড়ে যাবার ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়লে ঐ জায়গাটা আধ ঘণ্টা ধরে ঠাণ্ডা জল দিয়ে পটি দিতে হবে। যদি সুবিধে থাকে তবে পুকুর অথবা নদীর জলে একই সময় ধরে পোড়া স্থানটি ডুবিয়ে রাখা দরকার। এতে কোন ফোস্কা পড়বে না অথবা ঘা হবে না। এবার ৫ শতাংশ তরল মারকিউরিক্রোম ওষুধ তুলির সাহায্যে পোড়া জায়গায় দু'বার লাগাতে হবে। এর পরিবর্তে জেনসন ভাওলেট ওষুধটিও তুলির সাহায্যে লাগানো যেতে পারে। দ্বিতীয় ওষুধটি দিনে একবার করে লাগানো দরকার। এছাড়াও রাতে একবার সোরিন অথবা হিমাক্স যে কোন একটি মলম পোড়া স্থানে লাগালে ঘা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

পোড়ার স্থান যদি অনেকটা জায়গা জুড়ে হয় এবং ঘা থেকে বেশি পবিমাণে রস গড়ালে এভিল অথবা ফেন্নারগান ইনজেকশান দিলে ভাল হয়। পশুর অবস্থা বুঝে পেনিসিলিন অথবা টেট্রাসাইক্লিন ইনজেকশান দেওয়া দরকার। অবশ্য কোন ভাল পশু চিকিৎসকের সুপরামর্শ গ্রহণ করা দরকার।

**পথ্য ঃ** গবাদি পশু যদি মাঠে ঘাস খেতে ও গোয়ালে জাব খেতে পারে তা হলে বিশেষ কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু দেহের বেশি অংশ পুড়ে গেলে প্রথম দু-তিন দিন ২ লিটার জলে ৫০ গ্রাম খাবার লবণ এবং ১০০ গ্রাম গুড় গুলে ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়ানো দরকার। এছাড়া লবণ দিয়ে ভাতের মাড় এবং নরম কবে চালের খুদ সিদ্ধ খেতে দেওয়া যেতে পারে। খড় এবং কচি ঘাস ছোট ছোট করে কেটে ভুসি মেখে প্রথম তিন চাব-দিন খাওয়ানো দবকার।

## কবিরাজী চিকিৎসা

(ক) পুড়ে যাওয়া মাত্র যে কোন জাতের কলা গাছের পচা এঁটে তুলে এনে সেটা ভালভাবে বেটে পোড়া জায়গায় লাগালে জ্বালা ও যন্ত্রণা কমে।

(খ) নারকেল তেল ২০ মিলিলিটার এবং সমপরিমাণ চুনের পরিষ্কার জল একসঙ্গে মিশিয়ে পোড়া জায়গায় পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো অথবা তুলোতে ভিজিয়ে সেটা পোড়া জায়গায় বসিয়ে বেঁধে দেওয়া দরকার।

(গ) যদি দেখা যায় পোড়া জায়গায় ঘা থেকে পুঁজ ও রক্ত বের হচ্ছে তাহলে নিমপাতা সিদ্ধ জল (সামান্য গরম) দিয়ে ঘা ভালভাবে ধুতে হবে। তারপর ৬০ মিলিলিটার নারকেল তেলে ৪ কোয়া রসুনকে ভেজে সেই তেল তুলির সাহায্যে ঘা-

এর মধ্যে দিনে দু'বার লাগিয়ে দেওয়া দরকার। রসুন তেল যেকোন বিষাক্ত ঘা-ফোঁড়া ভাল করতে একটি অব্যর্থ কবিরাজী ওষুধ বলা যেতে পারে। এই তেল প্রয়োগের সময় সামান্য গরম করা দরকার।

## কাউর ঘা

গরু অথবা মোষের পিঠে, কাঁধে অথবা পায়ে (যে জায়গাটা কড়া পড়েছে) এক ধরনের ঘা হয়। এটা এক ধরনের কৃমি রোগ বলা যেতে পারে। মাছি, কাক একটি পশুর থেকে অপর পশুর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

**লক্ষণ ঃ** প্রথমে ছোট আকারে ঘা হয়। সেখানকার চামড়া কুঁচকে যায় ও রংটা কালো হয়। লোম মোটেই থাকে না। গবাদি পশু ঘা চাটতে শুরু করে। কারণ জায়গাটা চুলকায়। জিভ দিয়ে চাটার সুযোগ না থাকলে দেওয়ালে অথবা গাছের
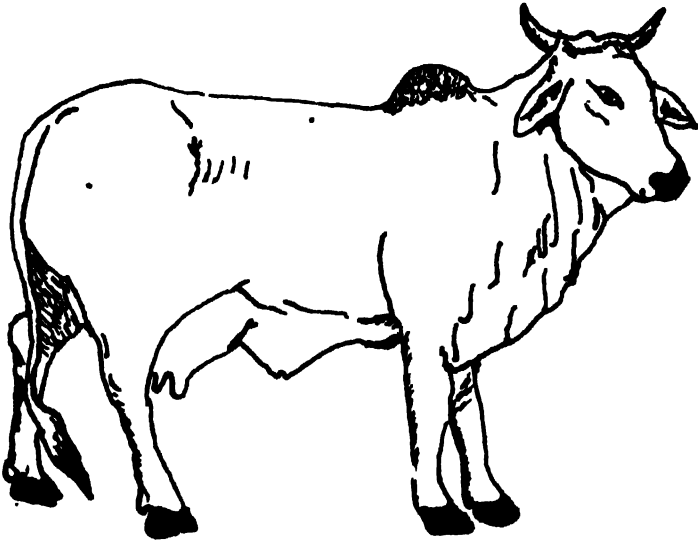
কাউর ঘা

কাণ্ডে ঘা-এর জায়গা ঘষতে থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে কোন চিকিৎসা না করলে ঘা বেড়ে যায়। রস গড়াতে থাকে। ছোট ছোট পোকাও ঘায়ের মধ্যে দেখা যায়। আবার কাকে ঠুকরে একদিকে ঘা-কে যেমন বাড়িয়ে তোলে তেমনি অপর দিকে রক্ত বের হতে থাকে।

## অ্যালোপাথিক চিকিৎসা

৫০ মিলিলিটার জলে (জলটা সহ্য কর্‌যার মতো গরম হবে) ২ গ্রাম পরিমাণ তুঁতে গুলে নারকেল ছোবড়ার সাহায্যে রগড়ে ধুতে হবে। তারপর কেনবেনডাজল অথবা লিভামিজল অথবা টেট্রাজিল ১০ গ্রাম পাউডার ও ২০ গ্রাম বোরিক

অ্যাসিড পাউডার ৫০ মিলিলিটার নারকেল তেল ও ১০ মিলিলিটার তারপিন তেলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে ঘায়ের মধ্যে লাগাতে হবে।

যদি দেখা যায় কাউর ঘায়ের জায়গায় বিভিন্ন অংশে সামান্য গর্ত হয়েছে এবং তার মধ্যে পোকা দেখা যাচ্ছে তাহলে বয়স্ক গরু এবং মোষের ক্ষেত্রে ১০ লাখ পেনিসিলিন ইনজেকশান দেওয়া দরকার।

**পথ্য ঃ** বলদ এবং ষাঁড়ের এই ঘা বেশি দেখা যায়। তবে গাভীরও এই ঘা হতে পারে। দুগ্ধবতী গাভীর এই ঘা হলে খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করা দরকার। কারণ এদের দুধ শিশু সহ রোগী এবং সুস্থ মানুষ পান করে। দুধের পরিমাণ না কমলেও এবং গাভী ও বলদ অসুস্থ না হলেও তাদের স্বাভাবিক খাদ্য দেওয়া দরকার। তবে বলদের ক্ষেত্রে ঘা বড় হলে এবং পোকা জন্ম নিলে ওদের পক্ষে বিশেষ করে কাঁধে কাউর ঘা হলে গাড়ি টানা এবং ক্ষেতে জমি চাষ কবার ক্ষেত্রে অসুবিধে দেখা দিতে পারে।

## কবিরাজী চিকিৎসা

(ক) মতিহার তামাক পাতা ৫৮ গ্রাম ঠাণ্ডা জলে সারা রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। জলের পরিমাণ হবে ১৫০ মিলিলিটার। পরের দিন সেই জলকে তামাক পাতা বাদ দিয়ে (পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে) আগুনে ফোটাতে হবে। যখন ঘন হবে তখন আঁচ থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা হলে ৩০ মিলিলিটার সরষের তেল মিশিয়ে রাতে একবার করে ঘায়ে লাগাতে হবে।

(খ) আতা গাছের কচি পাতা ৩০ গ্রাম এবং কলিচুন ১০ গ্রাম এক সঙ্গে বেটে ক্ষত স্থানে লাগালে পোকা মরে যাবে।

(গ) মতিহার তামাক পাতা ১৫টি আগুনে সেঁকে সেটার রং কালো হবার পব গুঁড়ো করে তাতে ৩০ গ্রাম মুদ্রাশঙ্খ (এটা খুবই বিষাক্ত। কাজেই সাবধানে ব্যবহার করতে হবে), কর্পূর ৩ গ্রাম একসঙ্গে হুঁকোর জলে মিশিয়ে এবং শেষে খাঁটি সরষের তেল দিয়ে মলম তৈরি করে ৭ দিন লাগালে (এক বার করে) ঘা ভাল হবে।

## পালান ফোলা অথবা টুনকো

গরু অথবা মোষের পালানের সব ক'টি বাঁট ফুলে যায়। দুধ জমলে পালান যেমন সব সময় পালান ফোলা থাকে এবং ভারি বলে মনে হয়। রোগটা খুবই ছোঁয়াচে। এক বিশেষ ধরনের জীবাণু এই রোগ সৃষ্টি করে। ঠাণ্ডা অথবা অজ্ঞাতেও এ রোগ হতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** গাভী অথবা মোষ পালানে অথবা বাঁটে হাত দিতে দেয় না। লাথি মারে। এমন কি বাছুরকে পর্যন্ত বাঁটে মুখ দিতে গেলে গুঁতিয়ে দেয়। শক্ত বাঁট দিয়ে ছানাকাটা দুধ অথবা রক্ত বের হতে থাকে। জ্বর হয়। পালানে ব্যথা এতটা বেশি হয় যে গাভী কিছু খেতে চায় না। চোখ দিয়ে কষ্টে জল গড়িয়ে পড়ে।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

এই রোগের খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করা দরকার। কারণ বেশি দেরি করলে বাঁট খারাপ হয়ে যেতে পারে এবং চিরদিনের জন্য গাভীর অথবা মোষের দুধ দেওয়া বন্ধ হবার আশঙ্কা থাকে।
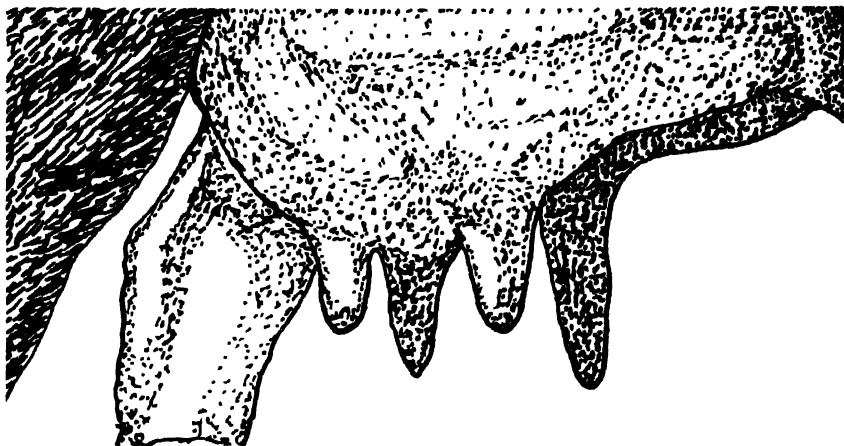
পালান ফোলা বা টুনকো রোগ

দেশি গাভীর ক্ষেত্রে স্ট্রেপটোপেনিসিলিন ২ গ্রাম অথবা টেট্রাসাইক্লিন ২০ মিলি পরিমাণ পরপর ৫ দিন দিতে হবে। এর সঙ্গে বাঁটে লাগাবার মলম অবশ্যই দেওয়া দরকার। এই দুটি ওষুধ ছাড়াও এম্‌পিসিসিনিনেও ভাল উপকার পাওয়া যায়।

পালান এবং বাঁট যদি খুব বেশি ফুলে থাকে তবে দিনের মধ্যে দু'বার ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে লবণ জল মেশানো গরম সেঁক দিতে হবে। যদি বাঁট থেকে রক্ত বের হতে থাকে তবে সেঁক দেওয়া চলবে না। ফোলা কমাতে প্রোমেথাজিন হাইড্রোক্লোরাইড অথবা ক্লোরফেনারামিন ম্যালিয়েট ১০ মিলি ইনজেকশান দিলে গাভী অথবা মোষ খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায়। বাড়িতে প্রাথমিকভাবে এসব ওষুধ প্রয়োগ করে যদি গাভী ভাল হয় এবং সুস্থ হতে থাকে তবে ভাল কথা তা নাহলে অতি অবশ্যই পশু চিকিৎসকের সুপরামর্শ নিতে হবে। কারণ এ রোগে গাভী অথবা মোষের দুধ চিরকালের জন্য বন্ধ হবার আশঙ্কা থাকে।

## কবিরাজী চিকিৎসা

(ক) প্রথমেই গাভী অথবা মোষকে একবার মৃদু জোলাপ দেওয়া দরকার। এর পর ১২ গ্রাম সোরা জলে ভিজিয়ে সেটা খাইয়ে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

(খ) আকন্দ পাতায় ঘি মাখিয়ে (গাওয়া ঘি) আগুনে গরম করে পালান ও বাঁটে সেঁক দিলে গাভী আরাম বোধ করে।

(গ) ডাকাতে লতার পাতা ১০ গ্রাম এবং আদা ৮ গ্রাম একসঙ্গে বেটে পালানে এবং বাঁটে প্রলেপ দিলে এক দিনের মধ্যে ফোলা কমে যায়।

(ঘ) নিমপাতা ২০ গ্রাম এবং ধুতুরা গাছের পাতা সমপরিমাণ নিয়ে শিলে সামান্য জল দিয়ে বেটে একটি পাত্রে রেখে সেটা সহ্য করার মতো গরম করতে হবে। এরপর গরম অবস্থায় পালানে ও বাঁটে মোটা করে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয় এবং ফোলা ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে কমে যায়।

**পথ্য ঃ** ভাতের গরম মাড়, বাঁশপাতা, গুলঞ্চ, কণ্টিকারীর গাছ ও ক্ষেতপাপড়ার গাছ গবাদি পশুদের খেতে দিতে পারা যায়।

## এঁষো অথবা খুরিয়া

এঁষো বা খুরিয়া ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ এবং ভাইরাস-ঘটিত। কাছাকাছি কোথাও এই রোগ গবাদি পশুদের মধ্যে দেখা দিলে এর বিস্তার দ্রুত হয়। গ্রামাঞ্চলে কোথাও একে আঁষোয়া রোগও বলা হয়। বাছুরের এঁষো হলে বাঁচানো খুবই শক্ত। বয়স্ক গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ভালভাবে এবং সময়ে চিকিৎসা করলেও পশু খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে বয়স্ক সংকর জাতের গরুকে সময়ে চিকিৎসা না করলে তারও মরে যাবার আশঙ্কা থাকে।
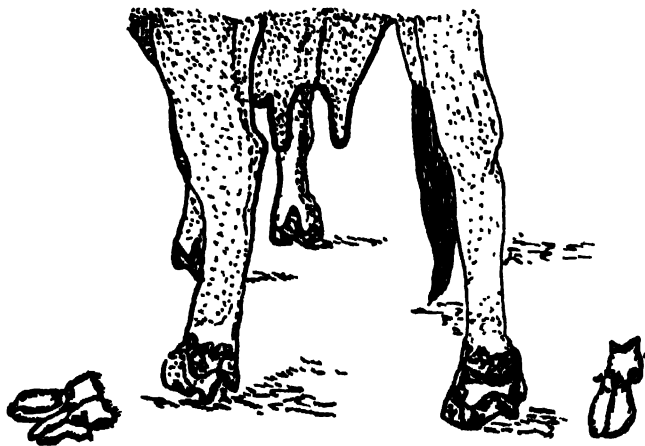
এঁষো বা খুরিয়া রোগ

**লক্ষণ ঃ** প্রথমে পায়ের ওপরে খুরে লাল দগদগে ঘা হয়। পশু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না। জ্বরও হয়। দ্বিতীয় দিন থেকে ভালভাবে খেতে পারে না। জিভে ও মাড়িতে ঘা ছড়িয়ে পড়ে। মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

পূর্ণ বয়স্ক গরু অথবা মোষকে ২০ থেকে ৪০ লাখ পেনিসিলিন অথবা ২ গ্রাম স্ট্রেপটোমাইসিন সহ ২ লাখ পেনিসিলিন অথবা ২ গ্রাম এম্পিসিলিন ৫ দিন ধরে

দেওয়া দরকার। এই তিনটি ওষুধ ছাড়াও কেবল মাত্র টেট্রাসাইক্লিন দেওয়া যেতে পারে।

বাছুরদের ক্ষেত্রে (ওদের দেহের ওজন অনুপাতে) রোগ শুরু হওয়া মাত্র ৫ থেকে ১০ লাখ পেনিসিলিন অথবা ৫০০ থেকে ১০০০ মিলিগ্রাম এম্‌পিসিলিন ইনজেকশান দিতে পারা যায়। ওদের ক্ষেত্রেও পরপর ৫ দিন ধরে ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার।

রোজ দু'বার সামান্য গরম জলে (যাতে গরু বা মোষ সহ্য করতে পারে) পটাশ পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে পিচকারীর সাহায্যে খুরের দু'ফাঁকে এবং মুখে ঐ জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। জলের পরিমাণটা হবে ১ লিটার এবং পটাশ পারম্যাঙ্গানেট গুঁড়ো গুলতে হবে ১ গ্রাম পরিমাণ। এরপর ৩ শতাংশ শক্তি বিশিষ্ট মারকিউরিক্রোম মুখে ভালভাবে লাগিয়ে দেওয়া দরকার। পায়ে কোন ঘায়ের মলম সামান্য লাগিয়ে তারপিন তেল শেষে তুলির সাহায্যে দিতে হবে। ঘা সম্পূর্ণ সারা না পর্যন্ত এইভাবে পরিচর্যা করা দরকার।

**পথ্য ঃ** নরম ঘাস ছোট করে ওদের খেতে দিতে হবে। দিনে একবার খুদ ভালভাবে সিদ্ধ করে খাওয়ানো চলবে। দিনের মধ্যে দু'বার ঝোলা গুড় এবং তাতে পরিমাণ মতো খাবার লবণ মিশিয়ে অবশ্যই খেতে দিতে হবে।

**প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা ঃ** এই রোগে আক্রান্ত গরুকে মাঠে মোটেই ছাড়া উচিত নয়। অসুস্থ গরুকে গোয়ালঘর থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখতে হবে।

সরকারি প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কম দামে এঁষো রোগের টিকা কিনতে পাওয়া যায়। এক মাস বয়সের বাছুর থেকে সব বয়সের গবাদি পশুকে ১০ মিলি পরিমাণ চামড়ার নিচে ইনজেকশান দেওয়ার নিয়ম। তবে প্রথমে ১টি, এর আড়াই মাস বাদে আরও একটি বুস্টার ও প্রতি ৬ মাস অন্তর একটি করে টিকা দেওয়া দরকার।

বাজারে কুট অ্যান্ড সাউথ ভ্যাকসিন কিনতে পাওয়া যায়। তবে খামারে এই রোগের আক্রমণ শুরু হলে তখন গরু মোষকে টিকা না দেওয়াই ভাল।

## কবিরাজী চিকিৎসা

কর্পূর ১ গ্রাম, তার্পিন তেল ১০ মিলিলিটার একটি পাত্রে মিশিয়ে পায়ের ঘায়ে দিনে দু'বার দিতে হবে।

দ্বিতীয় চিকিৎসা হলো— তিল ফুল, সৈন্ধব লবণ, গোমূত্র ও সরষের তেল একসঙ্গে মিশিয়ে ঘায়ে প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

# মোষের কয়েকটি রোগ ও তার চিকিৎসা

গরু এবং মোষের অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই ধরনের রোগ হয়ে থাকে। চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ওষুধ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোন রকম পার্থক্য হয় না। তবে মোষের ক্ষেত্রে কয়েকটি এমন ধরনের রোগের আক্রমণ ঘটে যা গরুর হয় না। মোষের ঐ সমস্ত বিশেষ কয়েকটি রোগ এবং তার অ্যালোপ্যাথিক ও কবিরাজী চিকিৎসার ওষুধ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

## নাসা রোগ

এটা এক ধরনের ক্রিমি এবং রক্তের শিরার মধ্যে থাকে। গরুর থেকে মোষের নাসারোগ বেশি দেখা দেয়। গ্রাম বাংলায় এই রোগটিকে সোমরা রোগ বলে। পুকুরেব জলে বেশি সময় ধরে থাকলে এবং জলা জমির ঘাস খেলে এই রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। কারণ এই রোগের জীবাণু পুকুর অথবা ডোবার ঘাসে থাকে। সেই ঘাস খেলে অথবা জল পান করলে ক্রিমি সহজে মোষের পেটে চলে যায়।

**লক্ষণ ঃ** মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। মোষ তখন ঘন ঘন জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। দু'চার দিন কাটার পর নিঃশ্বাস নেওয়া মোষের পক্ষে খুবই কষ্টকর ব্যাপার হয়। দীর্ঘ দিন এভাবে বিনা চিকিৎসায় মোষকে রেখে দিলে শেষে নাক দিযে পুঁজ গড়িয়ে আসে। এই রোগের আক্রমণে মোষ মারা যায় না, তবে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। দুধ দেওয়া অবস্থায় মোষের এই রোগের আক্রমণ ঘটলে দুধের পরিমাণটা অনেকটা কমে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে অর্থাৎ রোগ সম্পূর্ণভাবে সেরে গেলেও দুধ দেবার ক্ষমতা মোষের কমতে থাকে।

### অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

রোগ দেখা দিলেই অ্যান্টিমনি পটাসিয়াম টারটারেট ইনজেকশান দিতে হবে। মোষের গর্ভে যদি সাত-আট মাসের বাচ্চা থাকে তবে এই ইনজেকশান দেওয়া উচিত নয়। ওষুধ প্রয়োগের আগে এই রোগে আক্রান্ত মোষকে খুব কম করে এক ঘণ্টা শীতল ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

এছাড়াও ২০ মিলিলিটার জলে ২ গ্রাম তুঁতে গুলে সেই জল একটু তুলোতে ভিজিয়ে দিনে ২ বার মোষের নাকে দিলে কিছুটা উপকার হয়। তবে বেশ কিছু দিন নিয়মিত এটি প্রয়োগ করা দরকার।

### কবিরাজী চিকিৎসা

(ক) কেশুত পাতার রস ৫০ মিলিমিটার, ঘোড়ার মূত্র সমপরিমাণ, মেটে সিঁদুর ৬ গ্রাম, এক সঙ্গে মিশিয়ে একটা কাচের শিশিতে রেখে ভালভাবে মুখটি ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এই অবস্থায় তিন দিন রাখার পর একটি তুলির সাহায্যে শিশিটি ভালভাবে নেড়ে নাকের ঘায়ের মধ্যে দিনে একবার করে লাগাতে হবে।

(খ) মেটে সিঁদুর ১০ গ্রাম এবং ২০ মিলিলিটার শামুকের জল একসঙ্গে মেখে মোষের নাকে ঘায়ের মধ্যে দিন কতক লাগালে উপকার হয়।

## পাতা কৃমি

গবাদি পশুদের যত রকমের রোগ রয়েছে তার মধ্যে পাতা কৃমি সব থেকে ক্ষতিকারক। গরুর থেকে মোষের পাতা কৃমির আক্রমণ খুব বেশি হয়। এই রোগে বর্ষার পর থেকে শীতের আগে অবধি আক্রমণের আশঙ্কা বেশি থাকে। জলা জায়গায় বেশি সময় ধরে থাকলে ও সেখানকার ঘাস খেলে এই রোগ হয়। মোষরা সহজেই এর সহজ শিকার হয়ে থাকে। কারণ মোষের শরীরে পিত্তের ভাগ বেশি থাকায় তারা জলা জায়গায় বেশি সময় ধরে থাকতে পছন্দ করে।

**লক্ষণ ঃ** পশুর শরীর শুকিয়ে যেতে থাকে। খাদ্যদ্রব্য হজম করতে পারে না। মলের আঁট ভাব থাকে না। খড় সহ শক্ত ঘাসের ছিবড়ে মলের সঙ্গে বেবিয়ে আসে। মলের সঙ্গে রক্তের ছিটও থাকতে পাবে। গলাব নিচে জল জমে বেশ ফুলে ওঠে। মোষের দুধের পরিমাণ কমে অর্ধেক হয়। সারা শরীরের লোম সর্বদা খাড়া হয়ে থাকে। চামড়াব রুক্ষতা বাড়ে। পেটও ফেঁপে থাকে। ধীবে ধীরে খাওয়া কমিয়ে দেয়।

### অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

এই রোগের সব থেকে ভাল ওষুধ হলো অক্সিক্লোজানাইড। এছাড়াও হেক্সাক্লোরোফেন অথবা কার্বন টেট্রাক্লোরাইডও ভাল কাজ দেয়। ওষুধের পরিমাণটা হবে মোষের ক্ষেত্রে তার শরীবের প্রতি কেজি ওজনের জন্য ২২০ মিলিগ্রাম (হেক্সাক্লোরোফেন)। স্বাস্থ্য খারাপ হলে ওষুধের পরিমাণটা অবশ্যই কমাতে হবে। বাকি দুটি ওষুধ খাওয়াতে হবে লেবেলে যে ভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে সেইভাবে। বর্তমানে এই রোগের আরও একটি ভাল ওষুধ বের হয়েছে। অ্যাভলোথেন—প্রত্যেক মোষের জন্য (পূর্ণ বয়স্ক) ৩০ থেকে ৪০ গ্রাম। এটা খাওয়াতে হবে ভাতের মাড়ের সঙ্গে।

**পথ্য ঃ** জলা জমি ছাড়া পতিত জমির কচি ঘাস মোষকে খেতে দিতে হবে। চিকিৎসা চলার সময় সুষম খাদ্যের পরিমাণ কিছুটা কমানো দরকার। কারণ হজম শক্তি পূর্ণ মাত্রায় ফিরে আসতে কিছু দিন সময় লাগে।

### কবিরাজী চিকিৎসা

(ক) হুঁকোর জল ৫০০ মিলিলিটার, লবণ (খাবার) ৬০ গ্রাম এবং কাগজীলেবুর পাতা ৩০ গ্রাম ভাল করে বেটে তার রসটা হুঁকো-লবণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে একবার খাওয়াতে হবে। এইভাবে নিয়ম মতো ৭দিন খাওয়ালে রোগের উপশম হবেই।

(খ) হীরাকস গুঁড়ো ১ গ্রাম এবং লবণ ৫ গ্রাম দুটি এক সঙ্গে মিশিয়ে এটা ২০ মিলিলিটার জলে গুলে নিতে হবে। পর পর সাতদিন খাওয়ালে মোষ রোগ মুক্ত হবে।

## মোষের গর্ভস্রাব

মোষের গর্ভে বাচ্চার মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই গর্ভমোচন হওয়াকেই গর্ভস্রাব বলা হয়। মোষ সাধারণতঃ ৫ থেকে ৮ মাসের মধ্যে গর্ভপাত করে। এটা মোষের ক্ষেত্রে খুবই সংক্রামক ব্যাধি। সাধারণভাবে পুরুষ মোষের থেকে এক ধরনের জীবাণু এই বিপত্তি ঘটায়। এসব ছাড়াও আরও কিছু কারণ থাকে। গর্ভাবস্থায় পুরুষ মোষের সংযোগ, আঘাত পাওয়া, উঁচু জায়গা থেকে লাফ দেওয়া, বসন্ত রোগের আক্রমণ এবং খুব দ্রুত দৌড়-ঝাপ করলে অসময়ে গর্ভপাত হতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** হঠাৎ গর্ভবতী মোষ চুপচাপ ও নিশ্চেষ্ট হয়ে শুয়ে পড়ে। ঘাস খাওয়া অথবা জাবর কাটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। হলুদ রং-এর পিচ্ছিল পদার্থ প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে বের হয়। শ্বাস ঘন হয়। মুখ দিয়ে কাতর শব্দ বের হতে থাকে। শেঁষে মৃত অথবা জীবিত এবং অপুষ্ট সন্তান প্রসব করে।

### অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

যদি পুরুষ মোষের মাধ্যমে জীবাণু ঘটিত রোগে গর্ভপাত হয় তবে চিকিৎসা করতে খরচ খুবই বেশি পড়ে। যদি গর্ভপাত হয় তবে খুব কম করে তিন মাস যাতে গর্ভধারণ না করে সে দিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। তবু চিকিৎসা করাতে হলে গর্ভপাত হলেই জরায়ুতে ফুরাজলিডিন বড় বড়ি অথবা টেট্রাসাইক্লিন ট্যাবলেট, ২০ মিলি করে টেট্রাসাইক্লিন ইনজেকশান কম করে ২০ দিন দেওয়া দরকার। এছাড়াও জেনেটামাইসিনও দেওয়া যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসকের মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

### কবিরাজী চিকিৎসা

(ক) রক্ত চন্দনের বীজ ১৫ গ্রাম ভালভাবে গুঁড়ো করে জলের সঙ্গে খাওয়ালে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(খ) সৈন্ধব লবণ ৪২০ গ্রাম, সোরা গুঁড়ো ৪৫ গ্রাম, ২৫টি গোলমরিচ চূর্ণ, শুঁঠ চূর্ণ ১৫০ গ্রাম, পুরানো গুড় ১৮০ গ্রাম এবং গন্ধক গুঁড়ো ৮ গ্রাম সব একসঙ্গে মিশিয়ে ভাতের মাড়ে গুলে খাওয়ালে গর্ভপাত না হবার সম্ভাবনা বেশি। তবে গর্ভবতী মোষকে শুইয়ে রাখতে হবে।

## মোষের দুধ জ্বর

মোষ বাচ্চা দেবার পর অনেক সময় এই রোগ দেখা যায়। সাধারণতঃ যারা বেশি দুধ দেয় তাদের এই রোগটি দেখা দেয়। বাচ্চা প্রসব করার পর তিন থেকে

চার দিন অথবা তার পরেও এই রোগ দেখা দিতে পারে। তবে প্রসবের পরেই অর্থাৎ তিন-চার দিনের মাথায় হলে জ্বর কম হয়। পরে হলে জ্বর বেশি হয়ে থাকে। মোষেরা গাভীর থেকে বেশি পরিমাণে দুধ দেয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম পাচ্ছে না। ফলে রোগটি মোষের ক্ষেত্রে বেশি হয়।
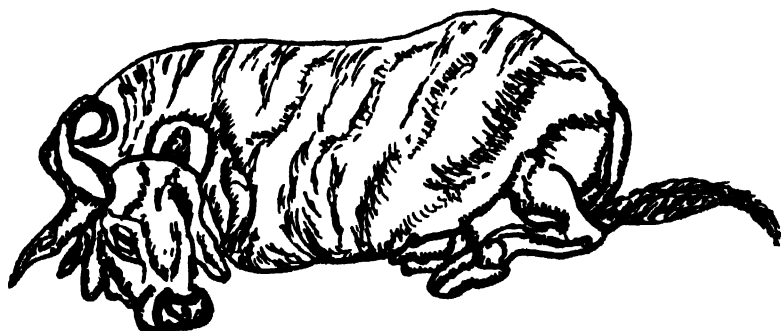
মোষেব দুধ জ্বব

**লক্ষণ ঃ** প্রথমে জ্বর বেশি হয়। দিন দু-তিন বাদে জ্বর কমে যায়। তখন মোষের শরীর টলমল করতে থাকে। তখন ভালভাবে দাঁড়াতে পারে না। সব সময় শুয়ে থাকতে চায় অথবা মাথাটা ঘুরিয়ে পেটের ওপর রাখে। পাযখানা এবং প্রস্রাব কমে যায। মোষের শরীরে একটানা কষ্ট হতে থাকে।

## অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

রোগ দেখা দিলেই ট্রিমসিনিলোন এসিটোনাইট (ভেটালগ) ইনজেকশান ২ মিলি দিতে হবে। এর সঙ্গে ২৫ শতাংশ গ্লুকোজ ও ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ২০০ থেকে ৩০০ মিলি চামড়ার ঠিক নিচে দেওয়া দরকার।

**প্রতিকার ও প্রতিরোধ ঃ** মোষের পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে টাট্কা ঘাস খাওয়ানো দরকার। প্রসব করার আগে (একমাস থেকে দেড় মাস) ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন বড়ি রোজ একটি করে খাওয়ালে ভাল হয়।

# গরু ও মোষের বিভিন্ন ধরনের ফুসকুড়ি সংক্রান্ত রোগ (Cystic Ovaries)

ডিম্বথলির যে জায়গা থেকে পরে ডিম্বাণু বেরিয়ে আসবে সেটা প্রথমদিকে থাকে গায় তরল পদার্থে ভর্তি। এর ডাক্তারি নাম গ্রাফিয়ান ফুসকুড়ি (Graffian Follicle)। উপযুক্ত সময়ে এই ডিম্বাণু (Ovum) ডিম্বনালীতে (Fallopian Tube) নেমে আসে। সেখানে গ্রাফিয়ান ফুসকুড়ি না ফেটে যেমন আছে তেমনি থাকে।

**এর কারণ কি ?**

কারণ হিসেবে বলা যায়, নালীহীন গ্রন্থির রসের (Hormone) গোলমাল। পিটুইটারী (নালীহীন) গ্রন্থির রসের অভাব ঘটলে ডিম্বথলিতে ফুসকুড়ি থেকে যায়। তখন দেখা দেয় বিপত্তি। এক্ষেত্রে চিকিৎসা না করিয়ে উপায় থাকে না।

চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে গরু-মোষ গরম হয় ২১ দিন অন্তর। আর বকনা বা বাছুর গরম হয় ১৫/১৬ দিন অন্তর। কিন্তু ডিম্বথলিতে ফুসকুড়ি থেকে গেলে এ নিয়ম খাটে না।

কিন্তু ফুসকুড়ি আছে কি না তা জানা যাবে কি করে?

জানার উপায় আছে। খুব সহজ পদ্ধতিতেই তা জানা যায়।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আবরণী (Mucous membrane) সব সময় ভিজে থাকবে। অনেক সময় আবার রক্তশূন্যও হয়ে থাকে। এখন পরীক্ষা করা দরকার ফুসকুড়ি আছে কি না। মলদ্বারে হাত ঢুকিয়ে ডিম্বথলি পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে ডান দিকের ডিম্বথলি, বাঁ দিকের ডিম্বথলি অথবা উভয় দিকের ডিম্বথলিতে ফুসকুড়ি আছে কি না।

এই ফুসকুড়ি (Follicles) তিন ধরনের হতে পারে। যেমন—

(১) ডিম্বাণুর ফুসকুড়ি (Follicular Cyst)

(২) লুটিয়াল ফুসকুড়ি (Lutcal Cyst)

(৩) চিরস্থায়ী ফুসকুড়ি (Persistant Corpus Lutcum)

ফুসকুড়ির অস্তিত্ব আঙুল দ্বারা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে। এখন আঙুল দিয়ে ভালো করে জেনে নিতে হবে ঐ ফুসকুড়ির সংখ্যা এক না একাধিক। যদি ফুসকুড়ি থাকে তাহলে জরায়ু শক্ত হয়ে যাবে। এটিও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। মোট কথা, পরীক্ষার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

যদি ফুসকুড়ি থাকার জন্য গরু-মোষ বা তাদের বাচ্চা সব সময় গরম থাকে, তাহলে লক্ষ্য করলে কিছু শারীরিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাবে। সেই পরিবর্তনগুলি হলো —

(১) লোম হবে উস্কোখুস্কো।

(২) চামড়া গায়ের সঙ্গে এঁটে থাকবে।

(৩) পা চারটে একটু লম্বাটে মনে হবে।

(৪) পাছার মাংসপেশী বসে যাবে।

(৫) ঘাড় হবে কিছু লম্বা আর মোটা।

এটাও একটা রোগ। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই রোগটিকে বলা হয় নিম্ফোম্যানিয়াক (Nymphomaniac)।

এইসব লক্ষণ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। নতুবা গরু-মোষ শয্যাশায়ী হয়ে পরে মারা যেতে পারে।

ডিম্বথলি পরীক্ষা করাব সময় মলদ্বারে হাত ঢুকিয়ে যদি দেখা যায় শুকনো এবং ফুসকুড়ির আকার ছোট, তাহলেও বিপদ থেকে যায়। এক্ষেত্রে গরু-মোষের যে-সব অসুবিধা দেখা দেয় তা হলো—

(১) হাঁটাচলায় কষ্ট বোধ করে।

(২) অপর পশুর ঘাড়ে চড়তে চেষ্টা করে।

(৩) লাফালাফির ফলে নিজের হাড়গোড়ও ভাঙতে পারে।

এটাও একটা রোগ। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ রোগকে বলা হয় অ্যাড্রিনাল ভিরুলিজ্‌ম্ (Adrenal Virulism)।

### রোগের চিকিৎসা

(১) বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ফুসকুড়ি উৎপাটন করে ফেলুন। একদিনে সম্ভব না হলে কয়েকদিন চেষ্টা করুন।

(২) জরায়ুমুখে একদিন অন্তর লাগিয়ে দিন—Lugal's Iodine।

(৩) ইনজেকশান দেওয়া যায়—Follatin (Squib) [২৫০০-৫০০০]—শরীরে I.U (I.V) [৮০০০-১০,০০০] - পাছার মাংসপেশীতে।

Shup Pituitory Extract [৬৫ মিগ্রা] - শিবায়।

## সাদা বকনার রোগ
## (White Heifer Disease)

এ রোগটি আসলে যৌনাঙ্গের অপরিণতি। ভ্রূণ অবস্থা থেকেই এমন হয়ে থাকে। যৌনাঙ্গের সামনের অংশ অর্থাৎ জরায়ু ও শাখা পরিপুষ্ট হয় না। অনেক সময় সতীচ্ছদ (Hymen)-ও থেকে যেতে দেখা যায়।

প্রথম অবস্থায় অবশ্য রোগটা ধরা পড়ে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন বকনা গরম হয়, তখনই প্রথম নজরে আসে ব্যাপারটা। দেখা যায় পুংলিঙ্গ যৌনাঙ্গে প্রবেশ করছে না।

**কেন এমন হচ্ছে?**

কারণ অনুসন্ধান চললো। শেষে মলদ্বারে হাত ঢুকিয়ে জানা গেল কারণটা।

রোগটাকে যদিও শল্য-চিকিৎসায় সারানো যায়, তথাপি বলা যায়, যে রোগটা খুবই খারাপ। কেননা, এ রোগ বংশানুক্রমিক। পরপর এ রোগ চলতেই থাকবে। এমন রোগগ্রস্ত বকনা না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

# গরু-মোষের ব্রুসেলা রোগ
## (Brucellosis)

এক প্রকার জীবাণু দ্বারা এ রোগ সংক্রামিত হয়। জীবাণুটির নাম ব্রুসেলা অ্যাবর্টাস (Brucella Abortus)। এ রোগ হলে গরু-মোষের গর্ভপাত ঘটে থাকে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এই জীবাণুগুলিকে বাঁচতে ও বংশবিস্তার করতে সাহায্য করে থাকে। আমাদের দেশে (পশ্চিমবঙ্গে) এ রোগটার প্রকোপ বেশি। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও এ রোগটা হতে দেখা যায়।

ব্রুসেলা জীবাণুর আকার গোল ও লম্বাটে। রোগটা আবিষ্কার করেন Bang সাহেব। তাই একে ব্যাঙ-রোগও বলা হয়ে থাকে।

এ রোগ হলে কি কি ক্ষতি হতে পারে তা জানা দরকার। তাহলে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা যেতে পারে। যে সব ক্ষতি হয় তা হল এই —

(১) দুধের পরিমাণ কমে যেতে পারে।

(২) গর্ভপাতের কারণে বাঁজা (sterile) হতে পারে।

(৩) বাছুর মরে যেতে পারে।

(৪) অন্য কোনো রোগ দেখা দিতে পারে।

এখন সতর্ক থাকতে হবে রোগটা যাতে না ছড়ায়। এ রোগ শুধু গরু-মোষ নয়, মানুষের মধ্যেও ছড়াতে পারে। ব্রুসেল্লা রোগের জীবাণু নানাভাবে এক দেহ থেকে অন্য দেহে প্রবেশ করে থাকে। রোগটি আসলে সংক্রামক পর্যায়ভুক্ত। তাই সকলেরই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত যাতে জীবাণু অন্য দেহে প্রবেশ করতে না পারে।

**অন্য দেহে প্রবেশ করে কিভাবে?**

ব্রুসেলার জীবাণু অন্য দেহে প্রবেশ করে জল ও খাদ্যের মাধ্যমে। কিন্তু শুধু যে এভাবেই রোগটা ছড়ায়, তা নয়; অন্যভাবেও ছড়াতে পারে। যেমন—

(১) গর্ভপাতের পরে বাচ্চার মরা দেহে জীবাণু থাকে।

(২) গর্ভিণীর রস ও ফুলে জীবাণু থাকে।

(৩) ষাঁড়ের অণ্ডকোষে জীবাণু থাকে।

বাচ্চার মরদেহের ও গর্ভিণীর রস বা ফুলের জীবাণু ধ্বংস করে ফেলা তেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, কিন্তু ষাঁড়ের অণ্ডকোষে যদি জীবাণু থাকে, তাহলে তা ধ্বংস করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। গাভীর বেলায় স্পষ্ট জানা যায়—গর্ভপাত ঘটে থাকে বলে, কিন্তু ষাঁড়ের বেলায় তা জানাই যায় না। ফলে প্রজননের মাধ্যমে রোগের জীবাণু অন্য দেহে চলে যায় এবং ব্রুসেলা রোগ এভাবে বিস্তার লাভ করে।

**আক্রান্ত স্থল ঃ**

ব্রুসেলা রোগের জীবাণু বাসা বাঁধে শরীরের অত্যধিক নরম জায়গায়। সেখানে জীবাণুরা উপযুক্ত খাদ্য পায় ও পুষ্টিলাভ করে। এরা বাসা বাঁধে—

(১) জরায়ু।
(২) পালান।
(৩) পালানের উপরের লসিকাগ্রন্থি।
(৪) ষাঁড়ের অণ্ডকোষদ্বয়।
(৫) ষাঁড়ের লিঙ্গ।

এ রোগ হলে অসময়ে গর্ভপাত যেমন হয়, তেমনি অবার ফুলও পড়তে চায় না—সেটা আটকে থাকে ভিতরে। ফুলটাকে বের করে দিতে হয়। ঐ ফুলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ব্রুসেলার জীবাণু থাকে।

**সতর্কতা ঃ**

যে-কোন রোগ সম্বন্ধেই পালনকারীকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। কেননা, রোগটা যদি থেকে যায়, পরে তা ব্যাপকভাবে ক্ষতি করতে পারে। ব্রুসেলার জীবাণুও তাই। এক্ষেত্রে Agglutination Test করিয়ে নেওয়া উচিত। এই Test দ্বারা জানা যায় রোগ আছে কিনা। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা সারানোর চেষ্টা করা উচিত। নতুন গরু বা মোষ খামারে বা বাড়িতে আনলে অবশ্যই পরীক্ষা করানো দরকার।

**রোগ কিভাবে সারানো যায় ঃ**

যথাসময়ে চিকিৎসা করালে সব রোগই ভালো হতে পারে। এখানে 'যথাসময়ে' বলতে এই বলতে চাইছি যে রোগটা যেন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে না যায়। ব্যাপকভাবে সংক্রামিত হবার পূর্বে রোগটা যদি ধরা পড়ে, তাহলে চিকিৎসায় এ রোগ সেরে যায়। তখন গরু-মহিষের যে বাচ্চা হবে, সেগুলিও নীরোগ হবে ও সুস্থ-দেহ লাভ করবে।

এ রোগেব শ্রেষ্ঠ ওষুধ হচ্ছে STRAIN-19 টিকা। এই টিকা ব্রুসেলা রোগের জীবাণুদের ধ্বংস করে ফেলে। যদিও টিকাটি বাচ্ছা গরু-মোষদের দেওয়া হয়ে থাকে, তথাপি পূর্ণবয়স্ক গরু-মোষদেরও এটি দেওয়া চলে। গাভীদের এই টিকা দিলে সুফল আশা করা যেতে পারে। তবে টিকা দেবাব পর বেশ কিছুদিন ঐ গাভীর দুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। ষাঁড়দের টিকা দেবার প্রয়োজন হয় না, বিশেষ করে যে-সব ষাঁড় দ্বারা পাল-ধরানো হয়।

এই টিকা দেবার পদ্ধতি তিন রকম। যেমন—

(১) চামড়ার তলায়।
ওষুধের পরিমাপ -5 ml.
(২) লেজের অগ্রভাগে।
ওষুধের পরিমাপ -1 ml.
(৩) চামড়ার ভিতরের অংশে।
ওষুধের পরিমাপ - 2 ml.

# গরু-মোষের ভিব্‌রিও রোগ
# (Vibrionic Disease)

গরু-মোষের রোগের তালিকায় এ রোগটিরও সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রুসেলা রোগের মতো এর ফলেও গর্ভপাত ঘটে থাকে।

তবে ব্রুসেলা রোগের মতো এ রোগটা তত মারাত্মক নয়। যদিও গরু-মোষের গর্ভপাত ঘটায় অথবা বাচ্চার দেহে জীবাণু প্রবেশ করার ফলে নানারকম অসুবিধে দেখা দেয়, তবুও রোগটাকে ব্রুসেলার মতো ক্ষতিকর বলা যায় না। বাচ্চার দেহে জীবাণু পাওয়া গেলেই চিকিৎসায় রোগটাকে সারানো উচিত, নতুবা পূর্ণবয়সে গর্ভাবস্থায় এর ফলভোগ করতে হয়। তখন অকাল-প্রসবের ফলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়।

রোগটার নাম ভিব্‌রিও। এর জীবাণুর নাম ভিব্‌রিও ফিটাস। এই জীবাণুগুলো থাকে বাচ্চার পেটে। যদি প্রথম অবস্থায় না টের পাওয়া যায়, তাহলে ব্যাপকভাবে জীবাণুগুলি বেড়ে যায়। তখন তারা আড্ডা গেড়ে বসে জরায়ুতে ও ফুলে। পালানেও এরা আড্ডা গেড়ে বসে।

**রোগটা ছড়ায় কিভাবে?**

জীবাণুগুলো অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লেই রোগটাও ছড়িয়ে পড়ে। আর এই ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমগুলি হলো—

(১) খাদ্য।

(২) পানীয়।

(৩) যৌন সম্পর্ক।

খাদ্যের মাধ্যমে এক দেহ থেকে অন্য দেহে জীবাণু চলে যেতে পারে। পানীয় জল দ্বারা এরকম ঘটা অসম্ভব নয়। আবার যে ষাঁড় দ্বারা পাল-খাওয়ানো হচ্ছে, তার যৌনাঙ্গে এ রোগের জীবাণু বাসা বেঁধে থাকলে অনায়াসেই তা অপর দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

আগেই বলা হয়েছে, রোগটা ব্রুসেলার মত অতটা ক্ষতিকারক নয়। এ রোগ দ্বারাও গর্ভপাত ঘটে থাকে বটে, কিন্তু গাভীর স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে, নিয়মিত নির্মল বাতাস সেবন করতে পারে ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকে, তাহলে রোগটা আপনা-আপনিই সেরে যায়।

তাহলে বলা যায়, রোগটার প্রতিরোধ-ক্ষমতা গাভীর দেহে প্রাকৃতিক কারণেই জন্মে থাকে। এর জন্য কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য দুটোই ভালো হওয়া চাই।

# গরু-মোষের ট্রাইকোমোনাস রোগ
## (Trichomonasis Disease)

এ রোগটারও বিস্তার ঘটায় একপ্রকার জীবাণু। জীবাণুটির নাম ট্রাইকোমোনাস ফিটাস। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বা বিহারে এ রোগটার প্রকোপ দেখা যায়। এ রোগ হলে গর্ভপাত ঘটে। ষাঁড়ের এ রোগ থাকলে সেই ষাঁড় দ্বারা পাল-খাওয়ানো হলে গর্ভসঞ্চারই হয় না।

এই জীবাণুগুলি হলো এককোষী পরজীবী।

খালিচোখে জীবাণুগুলোকে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা এদের দেখা যায়।

যদিও জীবাণুগুলি এককোষী পরজীবী, তথাপি সব জীবাণু দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয় না।

এখন প্রশ্ন দেখা দেবে, কি ধরনের জীবাণু রোগসংক্রমণ ঘটায়।

উত্তরে বলা যায়, দু'ধরনের জীবাণু আছে। যথা—

(১) তিন শুঁড়-বিশিষ্ট,

(২) চার শুঁড়-বিশিষ্ট,

যে-সব জীবাণুর ৩টি শুড় থাকে, সেগুলিই রোগ ছড়ায়। আর যে-সব জীবাণুর ৪টি শুঁড় থাকে, তা নির্দোষ।

**এ রোগ হলে কি কি ক্ষতি হয় ঃ**

রোগটা যে সামান্য নয়, তাতে কি কি ক্ষতি হয জানলে ভালোরকম ধারণা জন্মাবে।

(১) ভালো গাভী, স্বাস্থ্যও ভালো, অথচ গাভীন হচ্ছে না।

(২) গাভীন হলেও অল্পদিনের মধ্যে গর্ভপাত ঘটে থাকে।

(৩) জরায়ুর প্রদাহ হয় বলে গাভী পা ছোঁড়ে ও বিরক্তি প্রকাশ করে।

(৪) প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে কালচে রঙের গাঢ় বস বের হয়। রসটি আঠালো ও চটচটে।

(৫) পাল-ধারণের কিছুদিন বাদে আবার গাভী গরম হয়। কিন্তু এবারেও পাল-খাইয়ে কোনো লাভ হয় না।

(৬) ভ্রূণের অপরিণত অবস্থায় গর্ভপাত ঘটে থাকে এবং গর্ভপাতের সঙ্গে ফুলও বেরিয়ে আসে।

(৭) গাভীর বেলায় প্রধান আক্রমণস্থল জরায়ু। ষাঁড়ের বেলায় লিঙ্গদেশ। লিঙ্গমুখ দিয়ে এক ধরনের রস বের হয়।

(৮) লিঙ্গে প্রদাহ হয়। ষাঁড় পা ছোঁড়ে, বিরক্ত হয়, পাল-খাওয়ানোর সময় সহজে গায়ে উঠতে চায় না।

**গরু-মোষের কোন্ কোন্ স্থানে যক্ষ্মা রোগ হয়?**

প্রত্যেক পালনকারীর জানা দরকার, তাঁদের গরু বা মোষের কোথায় কোথায় এ রোগ হতে পারে। তাঁদের এটি জানা দরকার এই কারণে যে সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর উপর তাঁরা নজর রাখতে পারবেন এবং সন্দেহজনক মনে হলে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে পারবেন। নতুবা, বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে পারে গরু বা মোষ।

**গাভীর আক্রান্ত স্থান বা যে-সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আক্রমণ ঘটতে পারে ঃ**

(১) ডিম্বনালী (Fallopian tube),

(২) ডিম্বথলি (Ovary),

(৩) জরায়ু।

**ষাঁড় বা বলদের যে-সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আক্রমণ ঘটতে পারে ঃ**

(১) অণ্ডকোষ,

(২) অণ্ডকোষ-নালী,

(৩) এপিডিডাইমিস,

(৪) সেমিন্যাল ভেসিক্‌ল্।

**সঙ্গমকালে কিভাবে জীবাণু প্রবেশ করে ঃ**

(১) গাভীর রোগ থাকলে জীবাণু সহজভাবে বলদের দেহে লিঙ্গমাধ্যমে প্রবেশ করে।

(২) বলদের রোগ থাকলে গাভীর দেহে জরায়ুপথ দিয়ে জীবাণু প্রবেশ করে।

রোগটা কি? সত্যই সেটা যক্ষ্মা, না অন্য কিছু তাও জানা দরকার। অবশ্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগী দেখেই বলে দিতে পারবেন রোগটা কি। কিন্তু আপনি তো চিকিৎসক নন;—আপনি পালনকারী মাত্র। তাই পালনকারী হিসাবে আপনার জানা দরকার রোগটা কি।

কতকগুলো লক্ষণ দেখে বোঝা যায় রোগটা যক্ষ্মা, না অন্য কিছু। তাই লক্ষণগুলো জেনে রাখা দরকার।

**রোগ আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ ঃ**

**গাভীর বেলায় ঃ**

(১) গরু বা মোষ বাঁজা হতে পারে;

(২) প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে সব সময় রস ঝরবে;

(৩) গরমের কোনো নিয়ম থাকবে না;

(৪) প্রস্রাবের দ্বার ফুলে উঠবে ও শক্ত হবে;

(৫) আক্রান্ত গরু বা মোষ নানাভাবে অস্বস্তি প্রকাশ করবে।

**ষাঁড়ের বেলায় ঃ**

(১) গুটি বের হতে পারে;

(২) অণ্ডকোষে প্রদাহ হতে পারে;

(৩) ব্যথা না হয়ে কেবল প্রদাহ হতে পারে।

**সত্য-সত্যই রোগটা যক্ষ্মা কি না ঃ**

কারণ ও লক্ষণ আপনি জানতে পেরেছেন। এবার আপনি কি করবেন? এখন আপনার কর্তব্য হলো আপনার রুগ্ণ গরু-মোষগুলোকে বাঁচানো। কিন্তু বাঁচাতে গিয়ে যেন আপনার উল্টো বিপদ না ঘটে। তাই আমার মতে, রোগটার বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য Test করিয়ে নেওয়া দরকার। যদি যক্ষ্মার জীবাণু পান, তাহলে বুঝবেন আপনার অনুমানই ঠিক। সঠিক চিকিৎসায় অল্প দিনেই সেরে যাবে।

**কিভাবে টেস্ট করবেন ঃ**

এ রোগ test করা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। নিজে না করে নিকটবর্তী পশু-চিকিৎসালয়ে অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে।

(১) যেখানে আক্রমণ ঘটেছে সেখানকার রস অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা করলে বুঝতে পারবেন।

(২) Tuberculin Test করেও বোঝা যেতে পারে।

আমার মতে, ভালো করে Test করে (দরকার হলে দুবার টেস্ট করুন) তবে চিকিৎসায় হাত দেবেন।

**যক্ষ্মা বিষয়ে সতর্কতা ঃ**

যখন বুঝতে পারবেন আপনার গরু-মোষের যক্ষ্মা রোগ হয়েছে, তখনই গরু মোষকে আলাদা করে রাখবেন ও তাদের যত্ন করবেন আলাদা ভাবে।

(১) ঐ গাভীর দুধ খাবেন না, কাউকে খেতে দেবেন না।

(২) গরুর মল-মূত্র ও খাদ্যের অবশিষ্টাংশ জীবাণু-নাশক ওষুধ মিশিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলবেন।

(৩) আক্রান্ত ষাঁড় দ্বারা পাল-খাওয়াবেন না।

(৪) সুস্থ গরু-মোষের কাছ থেকে এদের সব সময় দূরে রাখবেন।

(৫) চিকিৎসার পর রোগ ভালো হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ পশুদের সঙ্গে মিশতে দেবেন না; আলাদা রাখবেন আরও কিছু দিন।

(৬) Tuberculin Test অবশ্যই করাবেন।

(৭) গরু-মেষের বাসস্থানের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সেখানে যেন আলো ও বাতাস প্রবেশ করে।

(৮) বাসস্থানে মাঝে মাঝে জীবাণু-নাশক ওষুধ স্প্রে করে দেবেন।

**চিকিৎসা ঃ**

যক্ষ্মার চিকিৎসা সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে করাই উচিত, যাতে রোগটা অল্পদিনেই সেরে যেতে পারে। এই পুস্তকের অন্যত্র চিকিৎসা-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

# লেপ্টোস্পাইরা
# (Leptospirosis)

গাভীকে বন্ধ্যা করে বংশবিস্তারে বাধার সৃষ্টি করে ব্রুসেলা, ভিব্রিও, ট্রাইকোমোনাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ। এই শ্রেণীর রোগের তালিকায় আর একটি নাম যোগ করা চলে, তার নাম লেপ্টোস্পাইরা। এ রোগটাও গাভীকে বন্ধ্যা করে দেয়। উপরোক্ত রোগগুলির মতো এই রোগটিও গরু-মোষের খুব ক্ষতি করে থাকে।

লেপ্টোস্পাইরা পোমানা (Leptospira Pomana) নামক জীবাণু দ্বারা এই রোগ হয়। রোগটা কঠিন ও মারাত্মক।

**রোগের লক্ষণ :**

এখন দেখা যাক রোগটার লক্ষণ কি কি? রোগটাকে চিনতে না পারলে আপনি সাবধান হবেন কি করে? অথবা চিকিৎসাই বা করাবেন কি করে? যে-সব লক্ষণ বাইরে থেকে বোঝা যায়; সেগুলোর কথাই এখানে বলা হলো—

(১) গরু-মোষের গায়ের তাপ বেড়ে ওঠে;

(২) প্রস্রাবের রঙ হবে লাল;

(৩) রক্তশূন্যতা দেখা দেবে;

(৪) গরু-মোষ দুর্বলতা অনুভব করবে;

(৫) খাদ্যে তেমন রুচি থাকবে না;

(৬) শুয়ে থাকলে উঠতে চায় না, অর্থাৎ উঠতে তার যে খুব কষ্ট হয় তা বোঝা যায়।

(৭) গর্ভপাত ঘটে যে-কোনো সময়। তবে বেশির ভাগ দেখা যায় ৪ থেকে ৬ মাসের মধ্যে গর্ভপাত ঘটে।

এই সহজ পরীক্ষা দ্বারা বোঝা যায় রোগটা আসলে কি। কিন্তু তবুও সন্দেহ থেকে যায়।

অন্য রোগের ফলেও তো এমন হতে পারে?

হ্যাঁ; তা যে হতে পারে না, তা নয়। এর আগে এরকম কয়েকটি রোগের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে-সব রোগ হলে গরু-মোষের গর্ভপাত ঘটে থাকে। এ রোগটাও তো তার মধ্যে একটা হতে পারে।

তাহলে এক্ষেত্রে আর এক রকম পরীক্ষা করা যেতে পারে। সেগুলো এই—

(১) প্রস্রাব ধরে রেখে তা পরীক্ষা করা। 'অণুবীক্ষণে যদি রোগটার জীবাণু অর্থাৎ Leptospira Pomana দেখা যায়, তাহলে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই।

(২) জরায়ুর রসও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

(৩) রক্ত পরীক্ষা করে যদি হিমোগ্লোবিন কম পাওয়া যায় এবং রক্তটা স্বাভাবিক না হয়, তাহলেও বোঝা যায় রোগ সম্বন্ধে। অবশ্য জীবাণুও থাকা চাই এই সঙ্গে।

**চিকিৎসা ঃ**

এ রোগের চিকিৎসা মামুলি ধরনের না করাই ভালো। সরাসরি ইনজেকশান দিয়ে দেওয়াই ভালো। তাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

Oxysteclin Injection—10 ml.

পাছার মাংসপেশীতে পর পর তিন দিন।

## যৌনাঙ্গের প্রদাহ
## (Veneral Disease)

এ রোগটা হয়ে থাকে ভাইরাস (Virus)-ঘটিত কারণে। সঙ্গমকালে রোগটা সংক্রামিত হয়।

প্রদাহ্ অবশ্য অন্য কারণেও হতে পারে। আমাদের আলোচ্য বিষয় তা নয়। যখন প্রদাহ Veneral Disease পর্যায়ে পড়ে, তখনই তা সারানোর জন্য তৎপর হতে হয়।

**কি কি লক্ষণ দেখা যায় ঃ**

(১) পুরুষ বা স্ত্রীলিঙ্গে গুটি দেখা দেবে;
(২) গুটি দেখতে অনেকটা সাবুদানার মতো ;
(৩) গুটির রঙ সাদা বা লাল হতে পারে;
(৪) প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে হলদে রঙের স্রাব বের হবে,
(৫) প্রস্রাবের দ্বার ফুলে যাবে;
(৬) প্রস্রাবে কষ্ট বোধ হয়;
(৭) লেজ মাঝে মাঝে ওপরে তুলে কষ্ট প্রকাশ করে;
(৮) এই অবস্থায় পাল-খাওয়ালে কষ্ট পায় অত্যধিক; এমনকি রক্তও বের হয়;
(৯) খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেয়;
(১০) সব সময় ঝিমিয়ে থাকে।

**চিকিৎসা ঃ**

যখন দেখবেন, আপনার গরু-মোষের এ রোগ হয়েছে, তখন যত তাড়াতাড়ি পারেন রোগটাকে সারাবার চেষ্টা করুন। নিম্নে লিখিত ওষুধ দিয়ে ভেতরটা ভালো করে ধুইয়ে দিবেন।

Lugol's Solution—5 ml.
Dist. water—100 ml.

এভাবে পর পর তিন দিন ধোয়ালেই রোগ সেরে যাবে। যদি দেখেন তাতেও সারলো না, তাহলে আরও ২/১ বার ধোয়াবেন।

## এপিভ্যাগ রোগ
## (Epivag Disease)

এ রোগ আমাদের দেশের গরু-মোষের হতে দেখা যায় না। আমাদের দেশে যা হয়, তা ঐ রোগের কাছাকাছি একটা রোগ। তাই রোগটার বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, যাতে অনায়াসে সতর্ক হতে পারা যায় বা চিকিৎসা করা যায়।

রোগটার প্রকোপ দেখা যায় আফ্রিকা মহাদেশের কিছু অংশে। পুরো আফ্রিকায় গরু-মোষেদের মধ্যে এ রোগ হয় না। রোগটা আক্রমণ করে থাকে বলদের লিঙ্গে ও গাভীর যৌনাঙ্গে।

ভাইরাস দ্বারা রোগটি হয়ে থাকে।

পাল-খাওয়ানোর সময় রোগটা বিস্তারলাভের সুযোগ্য পায় তাই আগে থেকে সতর্ক থাকতে হবে যেন এই রোগে আক্রান্ত এ রকম কোনো বলদ বা গাভীকে পাল-খাওয়ানো না হয়।

রোগটা যে 'এপিভ্যাগ', তা কি করে বোঝা যাবে?

প্রশ্নটা অমূলক নয়। রোগ নির্ণয় করতে না পারলে সে-বিষয়ে সতর্ক হওয়া বা চিকিৎসা করার কোনো প্রশ্নই আসে না।

**এখন দেখা যাক রোগটা আক্রমণ করে বসলে কি কি লক্ষণ দেখা দেয় ঃ**

**গাভীর বেলায় ঃ**

(১) যোনিদ্বারের সামনের অংশ লাল হয়ে ওঠে।

(২) হলদে স্রাব হবে; স্রাবটা পাছায় লেগে থাকবে।

(৩) চটচটে স্রাব; কিছুটা দুর্গন্ধযুক্ত।

(৪) গর্ভপাত ঘটতে পারে; তবে তা হবে একেবারে শেষদিকে।

(৫) ডিম্বনালী, ডিম্বনালীর বারসা (ছাতা) ও জরায়ুর শাখা একত্রে জুড়ে যেতে পারে।

(৬) গরু-মোষ বাঁজা হয়ে পড়তে পারে।

(৭) গাভীর মধ্যে এক বেপরোয়া-ভাব লক্ষ্য করা যাবে।

**ষাঁড়ের বেলায় ঃ**

(১) অণ্ডকোষ ফুলে যেতে পারে।

(২) সেমিনাল ভেসিক্‌ল্ ফুলে উঠতে পারে।

(৩) এপিডিডাইমিস বড় ও শক্ত হয়ে উঠবে।

(৪) ষাঁড় খুব বদরাগী হয়ে উঠতে পারে।

উপরে যে-সব লক্ষণ বলা হলো, এগুলি দেখে রোগ সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। এ রোগের কোনো চিকিৎসার দরকার হয়না। ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে রোগটা আপনা থেকেই সেরে যায়। রোগ সেরে যায় বটে, কিন্তু পুনরাক্রমণের ভয় থাকে। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে যাতে আর আক্রমণ করতে না পারে, সেজন্য ২/৩ গ্রাম Antibiotic পাছার মাংসপেশীতে ইনজেকশন করে দেবেন। একটা ইনজেকশনেই কাজ হবে।

## ডিম্বকোষের কাজে ব্যাঘাত
## (Ovarian Disfunction)

আমরা গরু-মোষের বাঁজা হওয়া, গর্ভপাত ঘটা প্রভৃতির জন্য অনেক রোগ খুঁজে পেয়েছি। ঐসব রোগের কোনো একটি হলে গাভী বাঁজা হয়ে পড়ে, অথবা পেটে বাচ্চা আসে কিন্তু গর্ভপাত ঘটে তা নষ্ট হয়ে যায়।

এবার শুরু হোক কারণ অনুসন্ধান।

কিন্তু বাহ্যিক লক্ষণ দেখে বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করেও রোগটা যে কি তাই ধরা পড়লো না।

তাহলে কি গরু বা মোষের কোনো রোগ নেই?

অবশ্যই আছে, তবে সেটিকে রোগ বলা ঠিক হবে না। ডিম্বকোষের গোলমালেই বাচ্চা উৎপাদন কাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

যাকে বলে সরষের মধ্যে ভূত। রোগই নয়, —ডিম্বকোষটাই গোলমেলে।

কেন এমন হয় তার কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক পালনকারীর তা জেনে রাখা দরকার। এসব বিষয়ে ভালো করে না জানলে চিকিৎসাও ঠিকমত হবে না। কারণগুলি কি তা জেনে রাখুন—

(১) দেহের তাপমাত্রা কম বা বেশি হওয়া।

(২) বংশানুক্রমিক জন্মসূত্রতা।

(৩) আলো-বাতাসহীন বাসস্থান।

(৪) দীর্ঘদিনের কৃমি রোগ।

(৫) খাদ্যে ফসফরাস ও ভিটামিনের অভাব ঘটে।

এবার দেখা যাক, কি কি লক্ষণ দেখা দেয়। লক্ষণগুলি এই—

(১) গরু-মোষ অথবা বাচ্চা গরম হতেও পারে, না হতেও পারে।

(২) মলদ্বারে হাত ঢুকিয়ে দেখুন, ডিম্বথলি (Ovary) ছোট মনে হচ্ছে কি না। যদি মাত্র ১, ১$^{১}/_{২}$ সেমি. হয়, তাহলে বুঝতে হবে রোগের জন্য এত ছোট হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় আরও বড় হবে।

(৩) ডিম্বথলিটা নরম ও মসৃণ—না, শক্ত ও খসখসে। নরম ও মসৃণ হলে রোগ বলে জানবেন।

(৪) জরায়ুর আড়ষ্টতা আছে কি না লক্ষ্য করুন।

(৫) গরম হয়, পাল-খাওয়ানো হয়, কিন্তু গর্ভসঞ্চার হয় না।

(৬) আবার এমনও হতে পারে, গরু-মোষ বা বকনা গরমই হয় না।

**চিকিৎসা ঃ**

ডিম্বকোষের কাজে ব্যাঘাত ঘটলে তা চিকিৎসায় সেরে যেতে পারে। তবে এমন ক্ষেত্রে পাড়াগাঁয়ের হেতুড়ে চিকিৎসা বা অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা করানো উচিত নয়। আপনাকে চিকিৎসা করাতে হবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে—কারণ এটাই নির্ভরযোগ্য।

(১) যদি দেখেন ডিম্বথলি ঠিকই আছে অথচ গরু-মোষ বা বাচ্চা গরম হচ্ছে না, তখন কি করবেন? এক্ষেত্রে ইনজেকশান দিলেই কাজ ভালো হবে Prepalin Forte—2 ml. (Glaxo Co.) পাছার মাংসপেশীতে। এবার ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। যদি এর মধ্যে না ডাকে তাহলে আবার একবার উপরের ইনজেকশানটা দিয়ে দিন।

(২) মলদ্বার পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে, করপাস লুটিয়াম Ovary-তে বসে আছে তাহলে তা ভাঙতে হবে। না ভাঙা পর্যন্ত গরু-মোষ গরম হবে না। Lugol's Solution দ্বারা জরায়ুর মুখ ও ভিতরটা ঘেঁটে দিন। এভাবে ৩ দিন করুন। তাতেও যদি না ভাঙে, তাহলে আরও ২ দিন করুন। দেখবেন, ঠিক ভেঙে যাবে। করপাস লুটিয়াম ভাঙার পর পাছার মাংসপেশীতে একটা ইনজেকশান দিতে হবে।

Inj—Cryst 4(2/2·5 gm)

এবার আর গরম না হয়ে উপায় নেই।

(৩) ডিম্বথলিতে ডিম্বাণুজনিত ফুসকুড়ি। যদি এমন হয় সামান্য টেপাটেপি করলে প্রথম দিনেই উঠে যাবে। উঠে গিয়ে আবার ফুসকুড়ি বের হতে পারে। তখন Lugol's Solution দিয়ে Spray করে দিন। এভাবে তিন দিন করুন। তারপর অপেক্ষা করুন ১০/১৫ দিন। এবার গরু-মোষ গরম হবে ও ডাকবে। কিন্তু প্রথমবারের ডাকে পাল-খাওয়াবেন না। পরবর্তী ডাকের জন্য অপেক্ষা করুন। তবে মাঝে মাঝে Terramycin Injectible Solution পরিশুদ্ধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে জরায়ুর ভিতর ও বাহির ধুয়ে দেওয়া উচিত।

(৪) পালনকারীকে আর একটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতে পারে। মলদ্বার পরীক্ষা করা হলো, কিন্তু কোনো গোলমাল ধরা পড়লো না। পাল-খাওয়ানো হয়—কিন্তু পাল রাখে না। এর কারণ কি?

কারণ একটা কিছু আছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কারণের সন্ধানে না ছুটে রোগটা যাতে নিরাময় হয় তা আগে করুন।

25 ml. পরিশুদ্ধ জল 10 gm. Mastalon-u Powder (Pfizer).

একত্রে মিশিয়ে Cathetor-এর মাধ্যমে জরায়ুর মধ্যে দিয়ে দিন। গরু-মোষ গরম হবার ৬ ঘণ্টার মধ্যে একাজ করতে হবে। এর পর ১০ ঘণ্টা বাদে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করবেন। প্রজননের ৩০ মিনিট আগে একটা ইনজেকশান দিয়ে দেবেন গরু-মোষের পাছায়। পরে ৩ দিন অন্তর আরও দুটো এই ইনজেকশান দিয়ে দেবেন। তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন।

Inj.– Tonophospan (5 ml.) পরে ৩ দিন অন্তর আরও দুটো এই ইনজেকশান দিয়ে দেবেন। তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।

## ভ্রূণ থেকে মমি
## (Mummified)

এমন ধরনের ঘটনা যে কদাচিৎ ঘটে তা নয়। গরু-মোষের পেটের ভ্রূণটি রূপান্তরিত হয়ে পড়ে মমিতে। নরম 'টিসু'-গুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তারপর সেগুলি একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে একটা রবারের ছোট বলের মতো আকার নেয়। জিনিসটা খুব শক্তও নয়, আবার খুব নরমও নয়।

যদি এমন ঘটে এবং আপনি তা জানতে বা বুঝতে না পারেন, তাহলে ঐ গরু বা মোষের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। আপনি জানতে পারলে, পদার্থটা বের করে ফেলে দিতে পারতেন। কিন্তু জানতে না-পারার জন্য সেটিতে শুরু হয়ে যায় পচন। জরায়ুমুখ দিয়ে পচনশীল জীবাণুগুলি ভিতরে প্রবেশ করে পচনটাকে দ্রুত বাড়িয়ে দেয়, ফলে তৈরি হয় পুঁজ, রস প্রভৃতি।

**কেন মমি হয়?**

কারণ হিসাবে যা পাওয়া যায়, তা এই—

(১) জরায়ুতে কোনো কারণে রক্তক্ষরণ হলে,

(২) ভ্রূণের নাড়ী কোনো কারণে যদি ছিঁড়ে যায়,

(৩) ভ্রূণের দেহে রক্ত চলাচল বন্ধ হলে,

(৪) ভ্রূণের দেহে কোনো বিষাক্ত বীজাণু প্রবেশ করলে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ভ্রূণের মৃত্যু ঘটে, এবং তারপর থেকে একটু একটু করে সেটি পরিণত হয় মমিতে।

**পাড়াগাঁয়ে সাধারণতঃ যা ঘটে ঃ**

গরু-মোষ গরম হয়েছিল, সময়মতো পাল-খাওয়ানো হয়েছে, অতএব বাছুর হবেই।

কিন্তু কি ব্যাপার, সময় পেরিয়ে গেল, কিন্তু বাচ্চা হলো না তো!

তাছাড়া পেটে বাচ্চা থাকলে পেটটা তো বেশ বড় দেখাবে। তাও তো দেখা যাচ্ছে না। পালানও ছাড়ছে না।

এসব দেখেশুনে আপনার মাথা ঘুরতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন ডাক্তারের খোঁজে। ডাক্তার ডেকে আনলেন।

তিনি এসে গরু-মোষের পেট থেকে যে-বস্তুটি বের করে আনলেন, সেটি বাছুর নয়, একটি রবারের মতো পদার্থ। এটাই মমি।

**সতর্কতা ঃ**

গরু-মোষ পালন করতে হলে পালনকারীকে দৃষ্টি রাখতে হবে সবদিকে। যখন গরু-মোষ গরম হবার পর আপনি পাল-খাওয়ালেন বা কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার সাহায্য নিলেন, তখন থেকেই আপনার ঘাড়ে চাপলো আর একটি বাড়তি বোঝা। সে বোঝাটা হলো উক্ত গরু-মোষকে এমন যত্নে রাখা যাতে তারা কোনোভাবে দৈহিক আঘাত না পায়।

আঘাত পেলে ভ্রূণের ক্ষতির সম্ভাবনা ষোলো আনা। অথচ বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই।

(১) রক্তক্ষরণ হতে পারে,

(২) সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলি ছিঁড়ে যেতে পারে,

(৩) স্নায়ুর রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে,

(৪) ভ্রূণটি রক্ত ও রসের অভাবে শুকিয়ে যেতে পারে।

**চিকিৎসা ঃ**

ভ্রূণ যদি মরে গিয়ে মমিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে, তাহলে মলদ্বারে হাত ঢুকিয়ে আপনি তা বুঝতে পারবেন। একটা শক্ত পদার্থ আঙুলে ঠেকবে।

ঐ পদার্থটিই মমি?

হ্যাঁ—তাই।

এখন আপনি যদি আঙুলের সাহায্যে ওটিকে বের করে দিতে চেষ্টা করেন, তাহলে গরু-মোষের ক্ষতি হতে পারে। কেননা, ভ্রূণটি (এক্ষেত্রে মমি) গরু-মোষের দেহের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে যুক্ত। জোর করে তা ছিন্ন করতে গেলে উপকার না হয়ে অপকারই হবে। এ রকম অবস্থায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করাই উচিত কাজ হবে।

এবার কয়েকটি কাজ পর পর করতে হবে। কাজগুলি এই—

(১) মমিটাকে বের করার জন্য ইনজেকশান দিতে হবে।

Inj. Vetrosterol 3/4 ml.
(May & Baker Co.)

পাছার মাংসপেশীতে ইনজেকশান দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই 'মমি' বেরিয়ে পড়বে।

(২) জরায়ুর মুখে দুটি ট্যাবলেট ঢুকিয়ে দিন, —যতটা ঢোকানো সম্ভব।

Terramycin Vaginal tab.

(৩) গরু-মোষের পাছায় ইনজেকশান দিন। তিনদিনে ৩টি ইনজেকশান দিতে হবে।

Terramycin Injection (10 ml.)

গরু-মোষকে সুষম খাদ্য, টনিক, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন খাওয়ান।

(৫) এসবের পরে গরু-মোষ আবার গরম হলে, প্রথম বারেই পাল-খাওয়াবেন না;—পরের বারে খাওয়াবেন।

## শল্য চিকিৎসা
## (Surgical Operation)

নার্সিং হোম, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থানে নিত্য যে কতো রকমের শল্যচিকিৎসা করা হচ্ছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু সে-সব করা হচ্ছে কেবল মানুষের বেলায়। জন্তু-জানোয়ারদের ক্ষেত্রে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয় না।

অবশ্য একেবারেই যে উদ্যোগ নেওয়া হয় না, তা নয়। সেক্ষেত্রে লাভ-লোকসানের হিসাব কষে দেখা হয়। যদি দেখা যায়, যা খরচ হবে, লাভ সে অনুযায়ী হবে না, তাহলে কে আর এগুতে চাইবে ওকাজে?

তবে এমন কতকগুলো আকস্মিক বিপদ এসে পড়ে যখন পালনকারীর মন স্বভাবতই আঁকুপাঁকু করতে থাকে তার পশুটিকে রোগমুক্ত করার জন্য। এখানে পশু বলতে, কেবল গরু-মোষের কথা বলছি না—কুকুর-বিড়াল বা হাতি-ঘোড়াও হতে পারে।

**আকস্মিক বিপদ ঃ**

আকস্মিক বিপদ বলতে হঠাৎ যে বিপদ ঘটে থাকে। যেমন—

(১) গরু-মোষের পা ভাঙা,

(২) শিং ভাঙা,

(৩) হাড় সরে যাওয়া,

(৪) পেটে বাচ্চা আটকে যাওয়া,

(৫) মলদ্বার উল্টে যাওয়া,

(৬) হার্নিয়া।

এ ধরনের আরও অনেক প্রকার আকস্মিক বিপদের কথা বলা যেতে পারে।

যদি এদের মধ্যে এমন কিছু একটা ঘটে থাকে, তাহলে শল্য চিকিৎসার সাহায্য নিতে হবে। চিকিৎসাটা যদি সঙ্গে সঙ্গে করানো হয়, তাহলে অল্পদিনেই গরু-মোষ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে পারে।

**শল্য চিকিৎসা কি?**

শল্য চিকিৎসা হলো আশুরোগ নিরাময়ের জন্য এমন চিকিৎসা যার সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে রোগীকে নিরাময় করা চলে। এর জন্যে দরকার হয় কাটা-ছেঁড়ার কাজ। মূল উৎপত্তিস্থল থেকে চিকিৎসা শুরু করা হয়। ভাঙা হাড় বাতিল করা, টুকরো হাড়কে জুড়ে দেওয়া, মাংস থেকে ক্ষতস্থানকে কেটে বাদ দেওয়া প্রভৃতি শল্য চিকিৎসার অন্তর্গত। আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় এটি অত্যন্ত নির্ভরশীল প্রক্রিয়া। শল্য চিকিৎসায় রোগীকে (এক্ষেত্রে পশুকে) প্রথমে অজ্ঞান করে ফেলা হয়, তারপর শুরু করা হয় তার চিকিৎসা।

**শল্য চিকিৎসার আগে কি কি জানতে হবে ঃ**

যিনি শল্য চিকিৎসা (Operation) করবেন, তাঁকে এই কাজের আগে কয়েকটি বিষয়ে ভালো করে জেনে নিতে হয়। বিষয়গুলি এই—

(১) রোগীর (পশুর) অবস্থা,

(২) শল্য চিকিৎসার নির্দিষ্ট স্থান,

(৩) পশুকে আয়ত্তাধীন করা,

(৪) পশুটাকে কিভাবে Operation করলে সুবিধা হতে পারে,

(৫) নড়াচড়ায় যেন পশুর কোনো ক্ষতি না হয়,

(৬) যন্ত্রপাতি ঠিকমতো আছে কিনা দেখা,

(৭) যন্ত্রপাতি বীজাণুশূন্য করা,

(৮) উপযুক্ত সাহায্যকারী,

(৯) শল্য চিকিৎসার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র,

(১০) শল্য চিকিৎসার কাজটা যত কম সময়ে ও সুষ্ঠুভাবে করা যায় তা দেখা;

(১১) নিজের অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা দেখা,

(১২) শারীরবিদ্যায় যথেষ্ট জ্ঞান থাকাও দরকার;

(১৩) বীজাণুনাশক ওষুধ, গরম জল আগে থেকে যেন প্রস্তুত রাখা হয়;

(১৪) রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা ও অভিজ্ঞতা;

(১৫) পশুটিকে বিশ্রামের পব তাব জ্ঞান ফেরাবার আগে ভাবা দরকার তার কষ্ট হবে কিনা, কিংবা কতোটা কষ্ট হবে।

**শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ঃ**

শল্য চিকিৎসায় যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তা অতি উৎকৃষ্ট মানের। যন্ত্রগুলি শুধু যে ধারালোই হবে তা নয়—কাজেব সময় যেন কোনো ব্যাঘাত না ঘটায়। দেখতে হবে, যন্ত্রে যেন কোনোরকম মরিচা না থাকে।

এখন যন্ত্রপাতির নামগুলি বলা হচ্ছে—

(১) কাঁচি (Scissors),

(২) ছুরি (Scalpel),

(৩) চিমটা (Artery forceps),

(৪) সূঁচ (Suturing needles),

(৫) প্রদর্শক (Probel),

(৬) বিবর্ধক (Dialators),

(৭) পরিষ্কারক (Curator),

(৮) মুখ ফাঁক করার যন্ত্র (Mouth gag),

(৯) ল্যান্সেট (Lancet),

(১০) ট্রোকার ক্যানুলা (Trocar Canula),

(১১) রবারের নল (Probang),

(১২) স্পেকুলাম (Speculum),

(১৩) ইমাসকুলেটর (Emasculator)।

**শল্য চিকিৎসার পরবর্তী পর্যায়ের যন্ত্রপাতি ঃ**

শল্য চিকিৎসা হয়ে গেলেই কিন্তু কাজ শেষ হয় না। এরপর বাকি থাকে অনেক কাজ। ক্ষতটি যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এখন সে-ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য চাই—

(১) **গজ** (Gauze) ঃ ক্ষতস্থানের পক্ষে এই কাপড় খুবই আরামদায়ক। শুধু তাই নয়, এই কাপড় খুব তাড়াতাড়ি ঘায়ের রস শুকনো করে দিতে পারে। এতে মেশানো থাকে অ্যান্টিবায়োটিক, সালদা ওষুধ প্রভৃতি।

(২) **ব্যাণ্ডেজ** (Bandage) ঃ গজ, তুলো, ওষুধ প্রভৃতি দেওয়া হয় ক্ষতের ওপর। কিন্তু সেগুলি ঠিকমতো রাখা দরকার। আর তা ঠিকমতো রাখতে হলে সাহায্য নিতে হয় ব্যাণ্ডেজের। ওপরে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে খুব সাবধানে বেঁধে রাখতে হয়।

(৩) **শোষক পশম-তুলো** (Absorbent Cotton-Wool) ঃ এর কাজ ক্ষতের রক্ত শোষণ করা।

(৪) **লিউকোপ্লাস্টার (Leucoplaster)ঃ** এতে থাকে একপ্রকার আঠা। যার ফলে সেঁটে বসে থাকে। ক্ষতে বীজাণু যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য এই গজের সাহায্য নেওয়া হয়।

(৫) **লিন্ট (Lint)ঃ** এটিও শোষক তুলোর মতো। এতে বাঁধার ব্যবস্থা আছে।

**অবশকরণ পদ্ধতি (Anaesthesia) :**

গরু-মোষকে অবশ না করলে শল্যচিকিৎসা করা যায় না। পশুটি নড়লে এ-কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।

কিন্তু অবশ বলতে পশুটাকে পুরোপুরি অজ্ঞান করার দরকার নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে, আংশিক অবশ করলেই কাজ মিটে যেতে পারে।

যিনি চিকিৎসা করবেন তিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী স্থির করবেন, কি রকম অবশ করা দরকার—সম্পূর্ণ না আংশিক।

যদি সম্পূর্ণ অজ্ঞান করতে হয় তাহলে—

(১) ক্লোরোফরম দিতে পারেন। এর ঘ্রাণেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

(২) ইনজেকশান করতে পারেন।

Inj.-Chloral Hydrate (10%) 110/120 ml. জুগুলার শিরায় ইনজেকশান করতে হবে।

যদি আংশিক অবশ করতে হয় তাহলে—

(১) Lumber Vertebra এবং Sacral হাড়ের সংযোগস্থলে ইনজেকশান করতে হবে।

(a) Cocaine,
(b) Procaine,
(c) Novocaine,
(d) Novalgin (Hoescht),
যে-কোন একটি।

এর ফলে পিছনের অংশ সম্পূর্ণ অবশ হয়ে পড়বে। তখন আর শল্য চিকিৎসায় কোনো অসুবিধা থাকবে না।

**সেলাই (Stitching) :**

শল্য চিকিৎসার পর সেলাইটাও তারই অঙ্গ। সেলাই করা হয় নাইলন সুতো, রুপো বা ব্রোঞ্জের তার প্রভৃতি দিয়ে।

সেলাই করা হলে তবে শল্য চিকিৎসা শেষ হলো বলা যায়। এর পর বিশ্রামে রাখতে হবে পশুটিকে। তবে ক্ষতস্থান এমনভাবে বেঁধে রাখতে হবে যেন পশু নিজেই তার ক্ষতি করে না বসে।

## হাড় ভাঙা
## (Fracture)

পড়ে গিয়ে, গুঁতোগুঁতি করে অথবা কোনো আঘাতের ফলে গরু-মোষের হাড়

ভেঙে যেতে পারে। এই হাড় ভাঙা আংশিক ভাবে হতে পারে, আবার পূর্ণাঙ্গ ভাবেও হতে পারে।

**কিভাবে ভাঙতে পারে ঃ**

'হাড় ভাঙা' বলতে মোটামুটি এইসবকে বোঝায়। যেমন—

(১) হাড় ভেঙে কুঁচো কুঁচো হয়ে যাওয়া,

(২) হাড় ভেঙে দু'টুকরো হওয়া,

(৩) হাড় ঠিকই আছে, কেবল মাঝখানের খানিকটা চটে গেছে,

(৪) লম্বাদিকে বা আড়দিকে হাড় ফেটে যাওয়া।

**চিকিৎসা ঃ**

এসব ঘটলে শল্য চিকিৎসা ভিন্ন উপায় নেই। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগী (গরু-মোষ) দেখে ঠিক করবেন কি করা উচিত। আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির কল্যাণে সবকিছুই করা সম্ভবপর। তবে কোনো হাতুড়ে বদ্যি বা গাছ-গাছড়ার উপব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা উচিত হবে না। তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে।●

## জরায়ু উল্টানো
## (Prolapse of Cervix Vagina)

এটা একটা রোগ। এ রোগ হলে গরু-মোষ খুব কষ্ট পায় ও বিরক্তি বোধ করে।

যদি এ রোগ হয়, তাহলে গরু-মোষ যখন দাঁড়িয়ে থাকবে, তখন লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, জরায়ু বেরিয়ে পড়েছে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করানো উচিত।

**কেন এমন হয়?**

(১) দীর্ঘদিন ধরে পেটে অতিরিক্ত গ্যাস জমতে থাকলে,

(২) কোনো নোংরা জিনিস জরায়ুতে আটকে থাকলে,

(৩) পিছন দিকটা নিচু এমন স্থানে দীর্ঘদিন শুলে,

(৪) পেটের বাচ্চাকে বাইরে বের করার সময় চেষ্টায় ঘাটতি থাকলে,

(৫) জরায়ুতে আঘাত লাগলে।

**চিকিৎসা ঃ**

জরায়ু উল্টে গেলে যখনই ব্যাপারটা জানা যাবে, তখনই চিকিৎসায় হাত দেওয়া প্রয়োজন। বিলম্বে আনুষঙ্গিক কোনো ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়।

(১) Dettol দ্বারা জরায়ু, যোনিদ্বার ভালো করে ধুইয়ে দিন এবং তবুও কোনো নোংরা লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করে দিন।

(২) জরায়ু-সহ যোনিদ্বারকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করুন।

(৩) যদি কাজটা সহজ মনে না হয়, তাহলে কিছুক্ষণ বরফ দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। পরে যোনিদ্বার ঢোকাবার চেষ্টা করুন।

(৪) যদি দেখেন যোনিদ্বার ঢোকানো সত্ত্বেও বেরিয়ে আসছে, তাহলে Stitch করতে হবে। এমনভাবে স্টীচ্ দিন যেন সেটা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে অথচ প্রস্রাবের কোনো অসুবিধা না হয়।

(৫) 30 grms. Chloral hydras $\frac{1}{2}$ লিটার জলে গুলে খাইয়ে দিন।

(৬) একটা ইনজেকশানও দিতে পারেন।

Inj.—Novalgin 15ml. পাছার মাংসপেশীতে।

(৭) যদি রক্ত বের হয় এবং রক্তের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে আরও ইনজেকশান দিতে হবে।

Inj—Mifex (M&B)
Colborol (M&B)
Calcium boro gluconate.

তিনটি ইনজেকশানকে ৩ ভাগ করে প্রত্যেকটার এক ভাগ করে নিয়ে একত্রে ইনজেকশান দেবেন চামড়ায় বা শিরায়। ৩ দিন বাদে বাদে দিতে হবে।

(৮) প্রতিদিন ১টা করে ইনজেকশান দিন।

Terramycine বা Oxysteclın পর পর ৫ দিন। মাংসপেশীতে দিতে হবে।

(৯) ১০ দিনেব আগে সেলাই কাটবেন না।

(১০) সুযম খাদ্য খাওযাবেন।

## যোনিদ্বারে ঘা

গরু-মোষের যোনিদ্বারে ঘা হতে পারে। নানা কারণে ঘা হয়ে থাকে। যেমন—

(১) কোনো বিষাক্ত পদার্থ লেগে,

(২) ভারি ওষুধ খাওয়ানোর জন্য,

(৩) কেটে বা ছিঁড়ে গিয়ে,

(৪) আঘাত লাগার ফলে।

ঘায়ে যে সবসময় প্রদাহ থাকবেই তা নয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রদাহ হয়ে থাকে। জ্বালা করে, চুলকায়, তার ওপর মশা-মাছি বসেও নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি করে। ব্যথাও হতে পারে। রক্তপাত হতেও পারে, নাও হতে পারে।

ঘা হলে গরু-মোষ বিরক্ত হয়, প্রচণ্ড অসুবিধা ভোগ করে। পা ছোঁড়ে। অনবরত লেজ নাড়ে।

সামান্য ঘা থেকে পরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রথম থেকেই উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘা না সারালে ঐ ঘা শুধু যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করবে তা নয়;—ভিতরের অংশেও বিস্তারলাভ করতে পারে।

প্রথম প্রথম বুঝতে না পারলেও পরে বেশ বোঝা যাবে। তখন লক্ষণ মিলিয়ে দেখবেন—

(১) যোনিদ্বার ফুলে উঠবে।

(২) যোনিদ্বার শক্ত হবে।

(৩) যোনিদ্বারে প্রদাহ হবার জন্য গরু-মোষ ঘন ঘন লেজ আছড়াবে ও পা ছুঁড়বে।

(৪) ফুসকুড়ির মতো দেখা দেবে এক বা একাধিক।

(৫) ব্যথা থাকবে।

(৬) পুঁজ হতে পারে।

(৭) দুধ কমে যাবে।

(৮) সবশেষে দেখা দেবে ঘা।

(৯) ঘা ক্রমশঃ বড় হবে ও তা থেকে রস ঝরবে।

(১০) আরও পরে নালীঘায়ের সৃষ্টি হতে পারে।

উপরের লক্ষণগুলো আগে ভালো করে দেখে নিন তারপর হাত দিন চিকিৎসার কাজে।

**চিকিৎসা ঃ**

এই ঘায়ে পোকা থাকে। পোকাগুলি যে খুব সূক্ষ্ম তা নয়। পোকা বের করে দিন সর্বাগ্রে। কিন্তু পোকা বের করবেন কি করে?

(১) তারপিন তেল ১ চামচ ½ লিটার ঈষদুষ্ণ গরম জলে মিশিয়ে ঘায়ের ওপর ভালো করে ছিটিয়ে দিন। দ্বিতীয় দিনেও ঐভাবে ছিটিয়ে দেবেন। এবার দেখুন পোকাগুলি পালিয়েছে বা মরেছে কি না। যদি কিছু থাকে, তৃতীয় দিন আবার ঐভাবে তারপিন তেল ও জল দেবেন।

(২) যোনিদ্বারের ভিতরে ও চাবপাশে ছড়িয়ে দিন—Nebasulph Powder

(৩) ঘা যদি খুব বেড়ে গেছে মনে হয়, তাহলে ইনজেকশান দেবেন—
Terramycin (10 ml.)

পর পর ৩ দিন। পাছার মাংসপেশীতে।

এক্ষেত্রে Oxysteclin ইনজেকশানও দেওয়া যেতে পারে।

(৪) ঘায়ের জায়গাটায় সব সময় Powder (উপবে লিখিত) দিয়ে রাখবেন।

(৫) গরু-মোষকে কিছু টনিক খাওয়াতে হবে, কেননা পোকায় অনেকটা রক্ত খেয়ে ফেলায় শরীরটাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

(৬) সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে বেশি পরিমাণে।

(৭) শরীরে সূর্যরশ্মি (সকালের) যাতে বেশি পরিমাণে পড়ে তা দেখবেন।

(৮) খোলা জায়গায় অধিকক্ষণ রাখবেন।

(৯) গরম ও ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে স্নান করাবেন গরু-মোষকে।

(১০) ক্ষতস্থানে যেন কোনো আঘাত না লাগে।

## শিং খুলে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়া

গরু-মোষের শিং অনেক সময় ভেঙে যায় বা খুলে যায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা দরকার, শিংটা কিভাবে ভেঙেছে বা কিভাবে খুলে গেছে। যদি দেখা যায়, মাঝখান

থেকে ভেঙে গেছে এবং তার ফলে উপরের ঢাকনাটা খুলে পড়েছে, তাহলে যেমন চিকিৎসায় সারানো যায়, তেমনি সারানো যায় সম্পূর্ণ শিংটার অমন দশা ঘটলেও।

**ভাঙে কেন?**

শিং খুব শক্ত পদার্থে তৈরি। সুতরাং এটি খুব সহজে ভেঙে বা খুলে যাবার কথা নয়। তবুও এমন হয়। এরকম হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণে। কারণগুলি এই—

(১) আকস্মিক আঘাত লাগা,

(২) শিংয়ে শিংয়ে লড়াই করা,

(৩) কোনো কঠিন পদার্থে টুঁ মারা,

(৪) কোনো কঠিন আংটায় আটকে যাওয়া।

প্রধানতঃ উপরের কারণগুলির জন্যই শিংয়ের এমন দশা ঘটে থাকে। এরকম ঘটলে রক্তপাত হয়ে থাকে। তাই প্রথমেই রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। তারপর চেষ্টা করতে হবে শিংটা আবার কিভাবে গজিয়ে উঠতে পারে তার জন্য।

চিকিৎসায় এসব সেরে যায়, সুতরাং ভয় পাবার কিছু নেই।

**চিকিৎসা ঃ**

(১) Dettol-মিশ্রিত গরম জলে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিন।

(২) ক্ষতস্থানে Powder লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিন। ব্যাণ্ডেজের ওষুধ—

(a) Aureomycine Powder

(b) Sulphanılamide Powder

(3) Nebasulph Powder

যে-কোনো একটি Powder লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ কববেন।

## লেজে ঘা

গরু-মোষের লেজে ঘা হতে দেখা যায়। এই ঘা-টা দেখা দেয় একেবারে গোড়ার দিকে, যেখানে কোনো লোম থাকে না। এরকম হলে পশুটা নানাভাবে অস্বস্তি প্রকাশ করে থাকে। কখনো জ্বালা করে। কখনো সুড়সুড় করে। ব্যথাও থাকে না এমন নয়। পশুরা লেজ নাড়ে ঘন-ঘন। আবার টাটানি যদি বেশি হয়, তাহলে লেজ নাড়তেই চায় না।

লেজে ঘা হলে শত্রুদেরও উৎপাত বেড়ে যায়। গরু-মোষের এরকম শত্রু হলো—

(১) পাখি।

(২) মাছি।

ঘা-টাকে ঠুকরে ঠুকরে অস্থির করে তোলে পাখিরা। আর মাছিরা বসে পান করে ঘায়ের পচা রস।

লেজের গোড়ায় যে ঘা হয়েছে, তা আপনি নাও জানতে পারেন। লেজটা ঢাকা থাকে, সুতরাং জানবেন কি করে? কিন্তু তবুও আপনাকে জানতে হবে, কেননা সেটা আপনারই পালিত পশু। তার ভালো-মন্দের দায়দায়িত্ব তো আপনারই উপর। 'জানি না' বা 'দেখি নি' বললে চলবে কেন?

ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন—

(১) ঘন-ঘন লেজ নাড়ছে;

(২) লেজে পাখি বসছে;

(৩) মাছি উড়ছে সেখানটায় ঝাঁকে ঝাঁকে;

(৪) গরু-মোষ ছটফট করছে।

এবার বাহ্যিক লক্ষণ দেখেই বুঝতে পারবেন ওখানে কিছু একটা ঘটেছে। এবার লেজটা একটু সরিয়ে দেখুন, ঘা দেখতে পাবেন।

ঘা একটু একটু করে বাড়ে। সুতবাং দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। চিকিৎসার জন্য 'যোনিদ্বারে ঘা' অংশটি দেখুন।

## গরু-মোষের বহিঃপরজীবী

বহিঃপরজীবী গরু-মোষের মাবাত্মক রকমের শত্রু। এবা যে কী পরিমাণ ক্ষতি করে থাকে, তা যাঁরা গরু-মোষ পুষেছেন, তাঁবা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। এদের আক্রমণের ফলে গরু-মোষেব রোগবৃদ্ধি ঘটে এবং তার ফলে প্রাণীটির মৃত্যুও ঘটতে পারে।

**বহিঃপরজীবী কারা?**

যিনি পালনকারী তাঁব সর্বাগ্রে জানা দবকাব বহিঃপবজীবী কারা? বহিঃপরজীবী হলো — মশা, মাছি, উকুন, এঁটুলি। গরু-মোষেব এমন মাবাত্মক শত্রু আর নেই।

**বহিঃপরজীবী কি কি ক্ষতি করে?**

ঐ তো ছোটখাটো পোকা, ওরা অত বড় পশুটাব কি ক্ষতি করতে পারে? একটা ছোট্ট মাছি, বিরাট একটা মোষকে সে কাবু করবে কি কবে?

সাধারণভাবে তাই মনে হয বটে, কিন্তু বাস্তবেব সম্মুখীন হলে এ ধারণা তৎক্ষণাৎ বদলে যাবে। এখন এ ব্যাপারে একটু ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

মশা গরু-মোষের গায়ে বসে বক্ত খাবাব লোভে। লোমকূপের আড়ালে বসে চামড়ার মধ্যে হুল ফুটিয়ে রক্ত টেনে নিয়ে পেট ভরায। পেট ভরলেই উড়ে পালায়।

ঐ তো মশার চেহারা! সে আব কতোটুকু রক্ত খাবে? গরু-মোষের দেহে কি রক্ত কম আছে?

না, ক্ষতিটা সেদিক থেকে বিচার করলে হবে না। রক্ত কমে একটু, সেকথা ঠিক, কিন্তু তাতে এমন কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তবে পশুটা বিরক্ত হয় উৎপাতে এই যা। কিন্তু ঐ মশার শুঁড়ে যদি কোনো বিষাক্ত পদার্থ লেগে থাকে এবং সেটা যদি সুস্থ গরু-মোষের দেহে প্রবেশ করে, তাহলে কী ভয়ংকর পরিণতি ঘটতে পারে, সেকথা ভেবে দেখেছেন কি? প্রথমে শুরু হবে বিষের ক্রিয়া। তারপর ধীরে ধীরে পশুটা কঠিন বোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। পরজীবীরা এভাবেই ক্ষতি করে।

**বহিঃপরজীবীর হাত থেকে রক্ষা করার উপায় ঃ**

গরু-মোষকে এইসব বহিঃপরজীবীর হাত থেকে বাঁচাতে হলে পালনকারীকে

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন—

(১) গরু-মোষের দেহে যেন ময়লা না থাকে।

(২) ভিজে গা থাকলে পরজীবীরা বেশি করে আসে, তাই গা যেন সব সময় শুকনো থাকে।

(৩) গায়ে এমন পাউডার ছড়িয়ে দিন যেন তার গন্ধে বহিঃপরজীবীরা গায়ে বসতে না পারে।

(৪) যে ঘরটি তার বাসস্থান, সে-ঘরে প্রচুর আলো ও বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকা চাই।

(৫) ঘরটি হবে শুকনো ও বীজাণুমুক্ত।

(৬) খাদ্য বা পানীয় জলের জায়গাতেও যেন পরজীবীরা বাসা না বাধতে পারে তা দেখতে হবে।

(৭) মাঝে মাঝে জলে নিমপাতা ফেলে গরম করে সেই জল দিয়ে গরু-মোষের গা ধুইয়ে দিতে হবে।

(৮) শুধু বাসস্থান নয়, আশপাশটাও পরিষ্কার রাখতে হবে।

উপরোক্ত উপায়গুলি ঠিকমতো অবলম্বন করলে বহিঃপরজীবীর হাত থেকে অনেকটা রক্ষা করা যায় গরু-মোষকে।

## মাছি
## (Fly)

গোশালায় ঘুরে বেড়ায় যে-সব মাছি, তাদের ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শুধু গোশালায় নয়, মানুষের বাসস্থানেও এরা আড্ডা গাড়ে। এরা হলো—

(১) Musca Domestica,

(২) Musca Vicina,

(৩) Musca Nebulo

এরা সবাই অবশ্য চামড়া ফুটো করে রক্ত চুষতে পারে না, তবে নরম জায়গা পেলে ছেড়ে কথা কয় না। ঐভাবে রক্ত খেয়েই এরা বেঁচে থাকে।

ওরা বেঁচে থাকে আর মরার পথ প্রস্তুত করে দেয় আপনার জন্তুকে। বীজাণু ছড়িয়ে দেয় গায়ে রক্ত খেতে বসার সঙ্গে সঙ্গে।

অতএব ঐসব মাছি যাতে গরু-মোষের দেহে বসতে না পারে তার ব্যবস্থা করুন।

## স্টমক্সিস
## (Stomoxys)

এরাও এক ধরনের মাছি। দেখতে সাধারণ মাছির মতোই। তবে এরা আকারে সাধারণ মাছির চেয়ে কিছুটা ছোট। গোশালার আশেপাশে এরাই ঘুর-ঘুর করে বেশি। দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে আত্মগোপন করে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারপর গরু-মোষকে আক্রমণ করে ও রক্ত খায়।

অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় এরা গরু-মোষের গায়ে বসে রক্ত শোষণ করে বলে গরু-মোষকে ছন্নছাড়া দেখায়। অনেক সময় রক্তশূন্যতাও দেখা দেয়। এর ফলে দুধের পরিমাণটাও কমে যায়।

**তাড়াবার ব্যবস্থা ঃ**

(১) ঘরে ধোঁয়া দেবেন সন্ধ্যা হলেই।

(২) বীজাণুনাশক পাউডার ছড়িয়ে দেবেন সারা ঘরে, কিন্তু সাবধান, ঐ পাউডার যেন গরু-মোষের খাদ্যে না মেশে।

(৩) Bagon স্প্রে করতে পারেন।

(৪) ফ্লিটও ব্যবহার করতে পারেন।

## টেকাইনিডি
## (Tachinidae)

এরাও এক জাতের মাছি। এদের নামও আছে বিভিন্ন। যেমন—

(১) মাংস মাছি (Sacrophaga),

(২) পচা মাছি (Rotten),

(৩) নীল মাছি (Calliphoral),

(৪) সবুজ বোতল (Lucılıa).

এরা গরু-মোষের দেহে সর্বত্র বসে না। যে জায়গাটা বেশ নরম ও থলথলে, সে জায়গাতেই এরা বসে এবং বেশ আবাম করে রক্ত খায়।

ঘায়ের ওপর এইসব মাছি বসলে যথেষ্ট ক্ষতি হয। আবাব অনেক সময ঘায়ের ওপর ডিমও পাড়ে।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আপনার কি কি করণীয় তা এখন বলা হচ্ছে—

(১) কাপড় বা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঘা জড়িয়ে রাখুন।

(২) মাছি তাড়াবার জন্য বীজাণুনাশক Powder ব্যবহার করুন।

(৩) তারপিন তেল ও গরম জল একত্রে মিশিযে ঘা ধুইয়ে দিন।

(৪) মরা টিসুগুলি কাঁচি দিয়ে ছেটে ফেলে দিন।

(৫) ঘায়ের ওপর Powder লাগিয়ে রাখুন।

(a) Sulphanilamide Powder
(b) Mycoderm Powder
(c) Nebasulph Powder
(d) Aureomycin Powder

যে-কোন একটি।

## হিপোবস্‌কাইডি
## (Hippoboscidae)

এগুলিও এক জাতের মাছি। এদের দেখতে বেশ সুন্দর। গায়ের ওপরটা দেখতে রঙচঙে। দেখতে সুন্দর বটে, কিন্তু স্বভাবটা মোটেই ভালো নয়। সব সময়

গরু-মোষের গায়ে সেঁটে বসে থাকে আর রক্ত খায়। গরু-মোষ বিরক্ত হয় খুব। দুধও কমে যায় অনেক।

এদের না তাড়াতে পারলে খুবই ক্ষতির সম্ভাবনা। যদি ঘায়ের সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে সেখানে ডিম পেড়েও বসতে পারে। এরা যে কেবল নরম জায়গাই আক্রমণ করে তা নয়, শক্ত জায়গাতেও আক্রমণ করে।

গরু-মোষের গায়ে যদি আগে থেকে ঘা থাকে, তাহলে খুবই মারাত্মক ব্যাপার ঘটতে পারে।

মাছিগুলিকে তাড়াবার ব্যবস্থা করুন সবার আগে। তারপর চেষ্টা করুন যাতে ভবিষ্যতে আর তারা ফিরে আসতে না পারে।

তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে অন্যান্য মাছির মতোই। প্রয়োজনে ওষুধও ব্যবহার করতে হতে পারে।

## সাইফনান্টারা

এগুলিও এক জাতের মাছি। ডানাহীন পতঙ্গও বলা চলে এই শ্রেণীর প্রাণীকে।

রক্ত চুষে খেয়েই এরা বেঁচে থাকে। এবং এইভাবেই এরা বংশবিস্তার করে।

আর একটা সাংঘাতিক কাজ করে বেড়ায় এই শ্রেণীর পতঙ্গরা। এরা ফিতাকৃমির ডিম বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

এদের দেহ লম্বাটে ধরনের এবং দু'পাশ একটু চাপা।

## এ্যনাপ্লুরা

এরা হলো একজাতের উকুন।

গরু-মোষের দেহে লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় বেশ জাঁকিয়ে বাসা বেঁধে থাকে আর রক্ত চুষে খায়।

খুব অস্থির ও বিরক্ত হয় গরু-মোষ। তখন শক্ত দেওয়ালের গায়ে বা ঐ রকম কিছুতে গা ঘষে। কিন্তু তাতে উকুনগুলোর কোনো ক্ষতিই হয় না।

ওখানেই ডিম পাড়ে উকুনগুলো। ব্যাপকভাবে বংশবিস্তার করে। ফলে গরু-মোষের লোমের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। দুধ কমে আসে।

এদের তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে মাছিদের মতো। সম্পূর্ণভাবে তাড়ানো উচিত।

## গরু-মোষের বিষ খাওয়া

মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। বিষ সংগ্রহ করা তার পক্ষে কঠিন কাজ নয়। মানুষ বিষ খেতে পারে। কিন্তু গরু-মোষ?

হ্যাঁ,—গরু-মোষও বিষ খায়।

আবার এমনও হতে পারে, কেউ বিদ্বেষবশতঃ বিষ খাইয়ে দিল।

বিষ খাক বা কেউ খাওয়াক, সেটা আমাদের বক্তব্য-বিষয় নয়। বিষ খাওয়া নিয়েই আমরা আলোচনা করবো।

এখন দেখা যাক, কি কি ভাবে গরু-মোষ বিষ খেতে পারে—

(১) খাদ্যের সঙ্গে কোনোভাবে বিষ মিশে গেলে,

(২) বিষাক্ত গাছ-গাছালি খেলে,

(৩) খনিজ বিষ খাদ্যে মিশ্রণের ফলে,

(৪) চারাগাছে বিষ দেওয়া হয়েছে, এমন চারা খেলে।

এছাড়া আরও অনেকভাবে গরু-মোষ বিষ খেয়ে ফেলতে পাবে।

বিষ কিভাবে খেয়েছে কিংবা কতোটা খেয়েছে সে-সব বিষয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে কি করে ঐ বিপদ থেকে গরু-মোষকে বাঁচানো যায় তা সর্বাগ্রে বিবেচনা করা ও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

গরু-মোষকে বিষাক্ত সাপে কামড়ালেও বিষ হতে পারে। এ রকম তীব্র বিষে পশুটির কিছুক্ষণের মধ্যেই মাবা পড়াও অসম্ভব নয়।

**বিষ খেলে প্রথম করণীয় কি?**

গরু বা মোষ বিষ খেযে ফেললে প্রথমেই চেষ্টা কবতে হবে বিষটাকে তার পেট থেকে বের করে দেবার জন্যে। বিষ যদি বেরিয়ে যায়, তাহলে ভয় কমে যায অনেক। পশুটা যেটুকু জখম হবার হয়েছে, আব কিছু হবাব ভয় থাকে না।

(১) লবণ-মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ জল খাওয়ালে বমি হতে পারে।

(২) আঁশটে গন্ধযুক্ত জল বা মাছ-ধোঁওয়া জল খাওয়ালেও বমি হয়।

যে-ভাবে পারেন পেটের বিষ বের করে দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য। বিষ না বেব হওয়া পর্যন্তই বেশি ভয়।

**বিষ খাওয়ার শ্রেণী ঃ**

সব বিষ এক জাতের নয়। সব বিষ খাওযানোর বা খাওয়ার পদ্ধতিও এক নয়। তাই এখানে বিভিন্ন ধরনের বিষ খাওয়ার ব্যাখ্যা কবা হচ্ছে।

**১। গরু বা মোষকে বিষ খাওয়ানো ঃ** আপনার সঙ্গে কারো শত্রুতা আছে। সে সুযোগ খুঁজছে আপনার ক্ষতি করার। কিন্তু তেমন মনের মতো সুযোগ সে পাচ্ছে না। এই সময় তার মাথায় এলো আপনার পশুটিব ক্ষতি করার কথা। ঐ অবলা জীবটার প্রাণনাশের চেষ্টা করতে এমন পাষণ্ডও পৃথিবীতে বাস করে।

গরু বা মোষটা রোজ চরে বেড়ায় মাঠে। দুপুরের দিকে কেউ থাকে না কাছাকাছি। আততায়ী প্রস্তুত হয়। তারপর সুযোগ বুঝে, কোনো খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে পশুর মুখে ধরে। লোভনীয় খাদ্য পেয়ে গরুটিও খেয়ে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে।

সাধারণতঃ আর্সেনিক জাতীয় বিষ এভাবে খাওয়ায়। এই বিষ রুটি বা ছাতুর সঙ্গে অনায়াসে খাওয়ানো চলে।

খাওয়ানো ছাড়া আর একভাবে বিষ প্রয়োগ করা চলে। কোনো সুঁচালো মুখ লোহা বা কাঠের ডগায় বিষ মাখিয়ে যৌনাঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দিলেও অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে। ধারালো ছুরির ডগায় বিষ মাখিয়ে পাছার মাংসপেশীতে গেঁথে দেওয়া যেতে পারে।

শত্রু অবলীলায় কাজ সেরে চলে যায়। হতভাগ্য অবলা জীবটা বিষক্রিয়ায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে এক সময় মারা যায়। পালনকারী এসে দেখলো, তার গরু বা মোষটি ততক্ষণে শেষ হয়েছে বা হতে বসেছে।

২। **খনিজ বিষ খেয়ে ফেলা ঃ** সাধারণতঃ পাহাড় অঞ্চলে এমন ব্যাপার ঘটে থাকে। সেখানে খনিজ পদার্থে থাকে নানারকম বিষ। সেই বিষ মিশে যায় ঘাসে। গরু-মোষ ঐ ঘাস খেলেই দেখা দেয় বিপদ।

৩। **বিষাক্ত ঘাস খেয়ে ফেলা ঃ** ঘাস-পাতা গরু-মোষের খাদ্য বটে, কিন্তু ঐ ঘাসের সঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিষাক্ত ঘাস থাকতে পারে। গরু খাবার সময় কোনো বাছ-বিচার না করে দিব্যি খেয়ে চলে মনের আনন্দে। যা পাচ্ছে তাই চালান করে দিচ্ছে পেটে। আর সেই সঙ্গে নিজের অজান্তে সে বিষাক্ত ঘাসও খেয়ে ফেলছে। এতেই বিপদ। বিষ তাব ক্রিয়া শুরু করে দিতে দেরি করবে না।

৪। **মানুষের তৈরি বিষ খেয়ে ফেলা ঃ** মানুষ অনেক বিষ নানা কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি করে। যেমন—পোকা মারা বিষ, ইঁদুর মারা বিষ, আরশোলা মারা বিষ প্রভৃতি। গরু-মোষ অনেক সময় ঐসব বিষও খেয়ে ফেলে। এতেও বিপদ কম নয়।

## বিষটা কি জাতীয় তার পরীক্ষা ঃ

গরু বিষ খেয়ে মারা গেলে সে-বিষটা কোন্ জাতীয় তাব পরীক্ষা করা যেতে পারে। এই পরীক্ষা রাসায়নিক পদ্ধতিতেই সম্ভব। ঘরোয়াভাবে এসব পরীক্ষা করা যায় না। তবে কিছু কিছু ব্যাপাবে অনুমানের ওপর অনেক কিছু জানা যায়। যেমন—বিষাক্ত সাপে কামড়ালে মুখ দিয়ে লালা ঝবরে। যদি বোড়া সাপে কামড়ায় তাহলে রক্তবমি হবে।

## চিকিৎসা ঃ

গরু-মোষ বিষ খেয়ে ফেললে অনেক সময় বোঝা যায় সে যে-কোনো জাতীয় বিষ খেয়েছে। আবার অনেক সময় অনুমান করা হয় যে বিষ খেয়েছে, কিন্তু বিষটা কোন্ জাতীয় তা জানার উপায় থাকে না।

জানাই হোক আর অজানাই হোক, বিষ খেয়েছে এটুকু জানতে পারলেই চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

(১) Stomach Tube পাকস্থলীতে ঢুকিয়ে সেখানকার বিষাক্ত জল বের করে দিন।

(২) এক মগ ঠাণ্ডা জলে সামান্য কিছু টিংচার আয়োডিন মিশিয়ে খাইয়ে দিন।

(৩) অ্যাসিড জাতীয় বিষ হলে, চুনের জল, চকগুঁড়ো বা মিল্ক অব্ ম্যাগনেসিয়া খাইয়ে দেবেন।

(৪) ক্ষারজাতীয় বিষ হলে, লেবুর রস বা ভিনিগার। তাতে কাজ না হলে—
Tartaric Acid 10% চায়ের লিকারের সঙ্গে খাওয়াতে পারেন।

(৫) ফসফরাস জাতীয় বিষ হলে, এক মগ জলে কয়েকটা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানা ফেলে দিয়ে জলটাকে ভালো করে গুলে গরু-মোষকে খাইয়ে দিন।

(৬) যদি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে উত্তেজক দ্রব্য খাওয়াতে হবে। যেমন—অ্যালকোহল, মদ, তাড়ি প্রভৃতি।

(৭) Serious ধরনের অবস্থা হলে স্থানীয় পশু-হাসপাতালের সাহায্য নেবেন। যেখানে শুধু ইনজেকশান নয়, প্রয়োজনে Operation-এর ব্যবস্থাও হতে পারে।

## কয়েকটি মারাত্মক রোগ

গরু-মোষের বিভিন্ন রোগের বিষয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আরও কিছু রোগের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলি খুবই মারাত্মক।

এইসব মারাত্মক রোগকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারা যায়। যেমন—

(১) ক্যালসিয়াম-ঘটিত রোগ;

(২) ভিটামিন 'এ'-র অভাব-জনিত রোগ।

**(১) ক্যালসিয়াম-ঘটিত রোগ ঃ**

গরু-মোষের যদি ক্যালসিযাম-ঘটিত রোগ দেখা দেয়, তাহলে কয়েকটি বাহ্যিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হবে। যেমন—

(ক) গরু-মোষ শুকিয়ে যাবে।

(খ) দেহেব রঙ উজ্জ্বলতা হাবাবে।

(গ) হাড় বেঁকে যাবে।

(ঘ) দেহের শক্তি কমে যাবে।

(ঙ) খাদ্যে অরুচি দেখা দেবে।

(চ) সর্বদা বিরক্তি প্রকাশ করবে।

(ছ) হাড় ফুটো ফুটো হয়ে যেতে পারে।

(জ) হাড়ের একদিক সরু অন্যদিক মোটা, এমনও হতে পারে।

(ঝ) ষাঁড় প্রজননে অক্ষম হয়ে পড়বে।

(ঞ) গাভীর দুধের পরিমাণ অনেক কমে যাবে।

এছাড়া আরও কিছু অদ্ভুত লক্ষণ নজরে পড়বে—

(ক) পচা জন্তুর মাংস খাবে।

(খ) হাড়ের সন্ধিস্থলের যন্ত্রণা হওয়ায় সব সময় পা ছুঁড়বে।

আপনি যখনই জানতে পারবেন যে, আপনার গরু বা মোষের ক্যালসিয়াম ঘটিত রোগ দেখা দিয়েছে, তখনই চিকিৎসার কাজে লেগে পড়া উচিত। কেননা, রোগটাকে আর বিন্দুমাত্র বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

ক্যালসিয়াম পূরণ করে দিলে গরু-মোষ আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হবে। তাই আপনাকে ভেবে স্থির করতে হবে কিভাবে সমস্যাটির সমাধান করা যেতে পারে।

সমস্যা সমাধানের পথ আছে একাধিক। কোন্‌টি আপনার গরু বা মোষের পক্ষে প্রযোজ্য হবে, তা আপনাকেই ঠিক করে নিতে হবে।

**চিকিৎসা ঃ**

ক্যালসিয়ামঘটিত রোগের চিকিৎসা বাড়িতেই করা চলে। তবে রোগটা যদি মারাত্মক পর্যায়ে গিয়ে পৌছোয় তখন চিকিৎসালয় ছাড়া উপায় থাকে না।

নিজের পশুর চিকিৎসা নিজেই করুন এবং চিকিৎসায় কতো উন্নতি হচ্ছে বা আদৌ কোনো উন্নতি হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখুন—

(১) ফসফরাস খাদ্য বেশি করে খাওয়াতে হবে,

(২) দিনে দু'বার ভিটামিন খাওয়াবেন ১ গ্রাম করে—

(ক) Rovimix A.D.

(খ) Vitabland A.D.

যে কোনো একটি।

(৩) ইনজেকশান কবতে পারেন—

(ক) Mifex (M & B)

(খ) Calborol (M & B)

যে-কোন একটি। শিরা বা চামড়ায় ইনজেকশান করতে হবে।

**নজর রাখুন ঃ**

যেহেতু ওষুধ খাওযাচ্ছেন বা ইনজেকশান দিয়েছেন এবং ফসফরাস খেতে দিচ্ছেন, অতএব আর ভয়ের কোনো কারণ নেই। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়, এমনও হতে পারে, ঐ রোগের সঙ্গে গরু-মোষের দেহে লুকিয়ে আছে আরও দু'একটি রোগ। উপরের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে এগুলিরও চিকিৎসা করবেন, নতুবা রোগ সারবে না। মাঝখান থেকে হবে অর্থব্যয় আব সময়ের অপব্যয়।

**রোগ সারার পরে ঃ**

রোগ সেরে যাবার পরেও আপনার কিছু করণীয় আছে। সেগুলি অবশ্যই পালন করতে হবে—

১। পশুকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে কয়েকদিন।

২। শরীরে সকালের রোদ লাগাতে হবে।

৩। নির্মল বাতাস যেন পায়।

৪। সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৫। সুষম খাদ্যের মাত্রা বাড়াতে হবে।

**২। ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ ঃ**

মানুষের মতো গরু-মোষেরও ভিটামিন 'এ'-র অভাব হলে নানারকম রোগ হয়ে থাকে। কোনোভাবেই এ রোগগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। সাধারণভাবে মনে হতে পারে, আপনা-আপনিই ও রোগ সেরে যাবে। বাস্তবে কিন্তু তা হয় না। পরে একটি রোগকে কেন্দ্র করে অনেক রকম উপসর্গ দেখা দেয় তখন অবস্থা খুবই খারাপের দিকে এগিয়ে যায় দ্রুতগতিতে।

ভিটামিনের অভাব হলে সারা শরীরের যে-কোনো স্থানে অথবা পুরো শরীরটাতেই রোগ হতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র ভিটামিন 'এ'-র অভাব হলে নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থান আক্রান্ত হয়। সেই স্থানগুলি হলো—

১। খাদ্যনালী,

২। শ্বাসনালী,

৩। লালাগ্রন্থি,

৪। চোখের জলগ্রন্থি,

৫। প্রস্রাবনালী,

৬। যোনিদ্বার।

এসব স্থান ভিন্ন আরও কয়েকটি স্থান আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত স্থানগুলিই প্রধান আক্রান্ত স্থান রূপে দেখা দেয়।

আক্রান্ত স্থানের কার্যকরী শক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। পরে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় যে ঐ সকল স্থানে নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করলে খুব সহজেই রোগটা সেরে যেতে পারতো, দ্বিতীয় রোগটা ব্যাপক আকার ধারণ করার পরে তেমন সুবিধা আর থাকে না। সুতরাং রোগটাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা বা চিকিৎসার বিষয়ে অবহেলা করা আদৌ উচিত নয়।

**রোগে কি ক্ষতি হয় ঃ**

আগেই বলা হয়েছে ভিটামিন 'এ'-র অভাব হলে কয়েকটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গ আক্রান্ত হয়ে থাকে। ঐ স্থানগুলি এমন যে গরু-মোষের সারা শরীরের সঙ্গেই এদের সম্পর্ক সরাসরিভাবে সম্পর্কিত। ফলে, অল্প-বিস্তর সারা শরীরেই রোগটার প্রভাব পড়ে।

রোগটার ফলে যে-সব ক্ষতি হয় সেটাও কম মারাত্মক নয়। ক্ষতির কথাটা মাথায় রেখে চিকিৎসার আশু প্রয়োজন। আবার সে-চিকিৎসা যা-তা রকম হলে চলবে না, আধুনিক উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা হওয়া চাই—রোগটা যাতে তাড়াতাড়ি নির্মূল হয়।

এখন দেখা যাক কি কি ক্ষতি হয়—

১। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির দুর্বলতা প্রকট হয়।

২। রাতকানা হতে পারে।

৩। বাছুর প্রথমে ক্ষীণদৃষ্টি, পরে অন্ধ হয়ে পড়তে পারে।

৪। আক্রান্ত স্থলের স্নায়ুসমূহ শুকিয়ে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

৫। পাল ধরবে না অথবা পাল ধরলেও গর্ভপাত ঘটবে।

৬। ষাঁড় ধ্বজভঙ্গ হতে পারে।

৭। প্রস্রাবনালীতে পাথর জমে নালীর রসক্ষরণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

৮। ভিটামিন 'এ'-র অভাবে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসেও টান পড়তে পারে।

৯। সারা শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।

১০। অধিক দুগ্ধবতী গাভীও দুধ একেবারে বন্ধ করে দিতে পারে।

উপরে যে-সব ক্ষতির কথা বলা হলো, প্রতিটি ক্ষতিই রীতিমতো মারাত্মক। এইসব মারাত্মক রোগে গরু-মোষ আক্রান্ত হলে যিনি পালনকারী, তাঁর তখন মাথায় হাত দিয়ে বসা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। সুতরাং শুরুতেই রোগটা সারাবার চেষ্টা করবেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সাহায্য নেবেন।

**চিকিৎসা ঃ**

এখানে চিকিৎসা-পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। কেবল ওষুধ খাওয়ালে বা ইনজেকশান দিলেই হবে না; ভালো খাদ্যও খাওয়াতে হবে।

১। Prepalin Forte (Glaxo Co.) - 2 ml.

পাছার মাংসপেশীতে ইনজেকশান দেবেন। চারদিনে চারটি ইনজেনকশান। বাছুরকে দেবেন 1 ml পরিমাপের ইনজেকশান। এটাও চারদিনে চারটি।

অথবা—Arovit Inj. (Hochest Co.) - 2 ml.

২। ইনজেকশনের সঙ্গে খাওয়াবার ওষুধও দিতে হবে। Vitablend $AD_3$ - দিনে ১ গ্রাম করে।

অথবা—Rovimix Forte $AD_7$—এটাও দিনে ১ গ্রাম করে।

৩। Neumin Forte (Sarabhai Co.)—দিনে ২/৩ চামচ।

উপরের ওষুধগুলি প্রয়োগে ভিটামিন 'এ'-র অভাব পূরণ হবে। ফলে ঐ সংক্রান্ত রোগও দূরীভূত হবে। সুতরাং নিয়মিতভাবে ওষুধগুলি প্রয়োগ করবেন—যাতে রোগটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে না যায়।

**আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ঃ**

চিকিৎসা ছাড়াও কিছু আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এগুলোকেও চিকিৎসার অন্যতম অঙ্গ বলা যেতে পারে। শুধু ওষুধে রোগ সারলেও গরু-মোষ তার দেহের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবে না। সেজন্য প্রয়োজন চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সেবা-যত্নের। এখানে সেগুলির কথাই বলা হচ্ছে—

১। **খাদ্য ঃ** সুষম খাদ্য বেশি পরিমাণে খাওয়াতে হবে। কঠিন খাদ্যের পরিমাণ একটু কমিয়ে দিতে হবে।

২। **পানীয় ঃ** গরু-মোষ যে-জল পান করবে, সেই জলটায় জীবাণুনাশক ওষুধ মিশিয়ে দেবেন। দিনে অন্ততঃ একবার শরবত খাওয়াবার ব্যবস্থা করবেন। শরবতের সঙ্গে গুড় ব্যবহার করতে হবে।

৩। **হাওয়া-বাতাস ঃ** গরু-মোষের দেহে নির্মল হাওয়া-বাতাস বেশি প্রয়োজন। সারাদিনে সেটা যাতে বেশি করে পায় তার ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেকদিন কিছু সময় মাঠে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সব সময় বন্ধ করে রাখা ঠিক হবে না।

৪। **সূর্যের রশ্মি ঃ** যে-কোনো জীবের পক্ষেই এ জিনিসটা অত্যাবশ্যক। গরু-মোষের বেলাতেও তাই। সকালের সূর্যরশ্মি গরু-মোষের শরীরে অবশ্যই লাগানো উচিত। তবে দুপুরের চড়া রোদ ক্ষতিকর।

## চর্মরোগ
## (Skin Disease)

আমরা সাধারণভাবে বুঝি 'চর্মরোগ' মানে চামড়ার রোগ। যে-সব রোগ চামড়ার ওপরে হয় সেগুলিই চর্মরোগ। অতএব এর বিস্তৃতি ঘটে থাকে চামড়ার ওপরেই। ধারণাটা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। রোগটা চামড়ার একথা ঠিক, কিন্তু এর

বিস্তৃতি ঘটে থাকে অনেক ভিতরে পর্যন্ত। তাই রোগটা হলে বাহ্যিক ওষুধ প্রয়োগে সাময়িকভাবে সেরে গেলেও পুনঃপ্রকাশ ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং চর্মরোগের চিকিৎসা হেলাফেলা করে করা ঠিক নয়। ভিতরের বিস্তৃতিকে সমূলে বিনাশ করতে হবে, তবেই রোগটা পুরোপুরি সারবে।

চর্মরোগ বহুপ্রকারের হয়ে থাকে। এই রোগ গরু-মোষের প্রায়ই হয় এবং রোগটা খুবই ক্ষতিকর। এখন কয়েকটি চর্মরোগের বিষয়ে এই পুস্তকে আলোচনা করা হচ্ছে। গরু-মোষের পক্ষে রোগগুলি শুধু ক্ষতিকরই নয়, অত্যন্ত বিরক্তিকরও।

এখানে আলোচনা করা হচ্ছে যে যে রোগ সম্বন্ধে, সেগুলি হলো—

১। **একজিমা** (Eczema);

২। **দাদ** (Ringworm)।

৩। **ডারমাটাইটিস** (Dermatitis);

এই রোগ তিনটি প্রায়ই গরু-মোষের হতে দেখা যায়। পালনকারী নানারকম মলম এনে লাগান, কিন্তু ভালো হয় না। তাই রোগগুলির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে।

## ১। একজিমা
## (Eczema)

রোগটা দেখতে অনেকটা পুরনো দাদের মতো। দাদের মতোই এটি চাপড়া বেঁধে থাকে চামড়ার ওপরে। ওপরটা খসখসে দেখালেও ভিতরে পুঁজ-রক্ত থাকে বলে মাঝে মাঝে খুব চুলকায়। এমনি চুলকানি সময়ে সময়ে অসহ্য হয়ে ওঠে। আবার আরামের জন্য বেশি চুলকালে জ্বালা করে। ব্যথাও হয়।

**এ রোগ হয় কেন ঃ**

রোগটা হয় নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণে। কারণগুলি এই—

১। শরীর ভিজে থাকা।

২। শরীর অপরিষ্কার ও নোংরা থাকা।

৩। সূর্যকিরণের অভাব।

৪। স্যাঁতসেঁতে আবাসস্থল।

৫। উন্মুক্ত বায়ুর অভাব।

৬। অপুষ্টি।

৭। পচনশীল জীবাণুর উৎপাত।

৮। দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্য।

৯। শরীরের তাপ কম-বেশি হলে।

১০। রাসায়নিক কারণে।

১১। দেহস্থ যন্ত্রাদির কারণে।

১২। আবাসস্থলের নোংরামির জন্যে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য একজিমা হয় বটে, কিন্তু সঠিকভাবে বলা যায় না

কারণটা আসলে কি। তবে কারণ যাই হোক, উপরের কারণগুলির বিষয়ে সাবধান থাকলে রোগটা আক্রমণের ভয় কম থাকে।

**রোগটা কোথায় হয় ঃ**

মানুষের একজিমা হয় সাধারণত দেহের নিম্নাংশে। উপরের অংশে একেবারেই হয় না তা নয়, তবে তা খুবই কম। কিন্তু গবাদি পশুর একজিমা হয় যেখানে-সেখানে। তবে বেশির ভাগ যে-সব জায়গায় হয়ে থাকে তা হলো—

১। লেজের গোড়ায়।

২। গলায়।

৩। মুখের ওপরের দিকে।

উপরোক্ত তিনটি স্থানেই বেশি হতে দেখা যায়।

**রোগের শ্রেণী ঃ**

একজিমাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। তবে দুটি শ্রেণীই ক্ষতিকর ও জ্বালা-যন্ত্রণাদায়ক।

শ্রেণী দুটি এই-—

(ক) স্বল্পস্থায়ী।

(খ) দীর্ঘস্থায়ী।

উপরোক্ত দুটি শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী একজিমা খুবই কষ্টদায়ক। এটি দ্রুত বিস্তারশীলও। অনেক দূর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি থাকে ভিতরের দিকে। এতে পুজ-রক্তও জমে অনেক বেশি। কোনো কারণে ওপরের চাপড়াটা যদি উঠে যায়, তাহলে দেখা যাবে ভিতরের দগ্‌দগে ঘা। ঘা-টা দেখতে কাঁচা মাংসের মতো।

**রোগটা চিনবেন কি করে ঃ**

রোগটা যে একজিমা, দাদ বা অন্য কিছু নয়, তা চিনবেন কি করে? রোগটাকে চিনতে না পারলে চিকিৎসা ঠিকমতো করা যাবে না অথবা ভুল চিকিৎসা করা হবে। সুতরাং আগে রোগটাকে চিনে নিন।

চেনার উপায় এগুলি—

১। ক্ষতস্থান ফোলা-ফোলা দেখাবে।

২। কালশিটে বা ধূসর রঙের দেখাবে ওপর থেকে।

৩। ওপরের আবরণটা হবে খস্‌খসে ও ফাটা-ফাটা গোছের।

৪। ভিজে-ভিজে গোছেরও হতে পারে আবরণটা।

৫। আবরণের নিচেয় পুঁজ ও রক্ত থাকবে।

৬। খুব চুলকাবে। বেশি চুলকালে জ্বালা করবে ও ব্যথা হবে।

৭। আবরণের নিচে কাঁচা মাংসের মতো দেখতে হবে।

৮। পুঁজ ও রক্তে পচা দুর্গন্ধ থাকবে।

**চিকিৎসা ঃ**

একজিমা সহজে ভালো হতে চায় না। যেহেতু রোগটা চামড়ার নিচেয় অনেকদূর পর্যন্ত ঘায়ের বিস্তৃতি ঘটে থাকে, তাই এর চিকিৎসা করতে যথেষ্ট সময় লাগে। তবে সময় বেশি লাগলেও রোগটাকে সারানো যায়।

চিকিৎসা-পদ্ধতিকে কয়েকটি-ভাগে ভাগ করে পর পর চিকিৎসা করে যান। তাহলেই রোগটা সেরে যাবে।

১। গরম জলে ওপরের আবরণটাকে ভালো করে ভিজিয়ে দিন। তারপর তুলো দিয়ে আস্তে আস্তে সেটাকে তুলে ফেলুন। আবরণ তুলে ফেলার সময় অযথা টানাটানি করবেন না। প্রয়োজনে আরো কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবেন গরম জলে।

২। কাঁচা মাংসের মতো অংশটা বেরিয়ে পড়লে সেটাকে ঈষৎ গরম জলের সঙ্গে ১% ফিটকিরি ও ১% পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট মিশিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।

৩। ক্ষতটাকে শুকনো করুন তুলো দিয়ে ক্ষতের উপর কিছুক্ষণ চেপে ধরে। শুকনো তুলো যেন ক্ষতের সব রস শুষে নেয়।

৪। এবার পাউডার লাগান। পাউডারটা নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে।

| | |
|---|---|
| জিংক অক্সাইড— | ২ গ্রাম |
| চিনসল— | ২ গ্রাম |
| বোরিক অ্যাসিড— | ২ গ্রাম |
| কেয়োলিন— | ২ গ্রাম |
| মোট | ৮ গ্রাম |

দিনে দু'বার পাউডার লাগাবেন।

৫। পাউডার না লাগিয়ে লোশনও লাগাতে পারেন। সেটাও নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে।

| | |
|---|---|
| ট্যানিন— | ২০% |
| পটাসিয়াম বাই-কার্বোনেট— | ২০% |
| সোডা হাইপো-ফসফেট— | ৩০% |
| এক্রিফ্লোডিন— | ২০% |

৬। চুলকানি বেশি থাকলে পরিষ্কার করার পরেই প্যারাফিন ও বেনজোকেন একসঙ্গে মিশিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেবেন। তারপর পাউডার বা লোশন ব্যবহার করবেন।

## ২। দাদ
## (Ringworm)

দাদের লক্ষণগুলি একজিমার মতোই। যেসব কারণে একজিমা হয়ে থাকে অনুরূপ কারণগুলির দ্বারা দাদরোগেরও সৃষ্টি হয়। নিম্নে চিকিৎসা পদ্ধতি দেওয়া হলো।

**চিকিৎসা ঃ**

একজিমার মতো পরিষ্কার করে নিন ও ঘা-টাকে শুকনো তুলো দিয়ে শুকিয়ে নিন। তারপর মলম লাগান। মলম নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে।

মলম

| | | |
|---|---|---|
| সালফার সারলিকেট— | | ৫ গ্রাম |
| স্যালিসিলিক অ্যাসিড— | | ৫ গ্রাম |
| ক্রেমোলিন— | | ১০ গ্রাম |
| প্যারাফিন— | | সামান্য |
| | মোট | ২০ গ্রাম |

মলমটা বিষ-জাতীয়। সুতরাং গরু-মোষ যেন তাতে মুখ দিতে না পারে সেজন্য ক্ষতস্থান ভালো করে বেঁধে রাখবেন।

## ৩। ডারমাটাইটিস
## (Dermatitis)

প্রথমেই জানা দরকার রোগটা কেন হয়। যে-সব কারণে এ রোগ হয় তা হলো—

১। ছোঁয়াছুঁয়ির জন্য।
২। এলার্জির জন্য।
৩। পরজীবীর জন্য।
৪। ভাইরাসের জন্য।
৫। জন্মসূত্র থেকে।
৬। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে।
৭। লালাহীন গ্রন্থির কারণে।
৮। টিউমার থেকে।
৯। অপরিষ্কাব গোয়ালঘরের জন্য।
১০। গবাদি পশুকে অপরিষ্কার রাখার জন্য।

**চিকিৎসা ঃ**

রোগটা প্রথম অবস্থায় দেখা দেয় ফুসকুড়ির আকারে। পরে ঘষাঘষিতে তা ঘায়ে পরিণত হয়। ঘা হলে তবেই বোঝা যায় রোগটা কি। সুতরাং, তার আগে চিকিৎসা করার কোনো উপায় নেই।

এক্ষেত্রে মলমই শ্রেষ্ঠ ওষুধ। 'দাদের মলম'-টি এই ঘায়ে লাগালে রোগটা সেরে যাবে। তবে তার আগে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে ও ঘা শুকনো করে নিতে হবে। মলমটা দিনে দু'বার লাগাবেন।

অন্য পাউডারও লাগানো যেতে পারে—

১। Tetmosol Powder
২। Lorexene Powder

যে-কোনো একটি পাউডার লাগাবেন। দিনে দু'বার লাগাতে হবে।

# হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে গো-মোষাদির রোগ-চিকিৎসা

## গরু-মোষাদির চর্মরোগ

চর্মরোগ বলতে আমরা খোস-পাঁচড়া, ঘা, আঁচিল, গুটি ইত্যাদিকে বুঝি। মানুষের মতো গো-মোষাদির শরীরেও এগুলি প্রকাশ পায়। মনে রাখতে হবে যে, যাবতীয় চর্মরোগ হ'ল অভ্যন্তরীণ **রক্ত দুষ্টির** বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যানাকার্ডিয়াম ২০০**—গরু-মোষাদির গায়ে টোপ তোলা ফোস্কার মতো উদ্ভেদ বের হলে এবং মুখাংশে উদ্ভেদের সংখ্যা বেশি হলে।

২। **ক্রোটন ৩০,২০০**—গাভীর পালানে বা বাঁটের ক্ষতে যদি বেশি চুলকানি হয়।

৩। **ইচিনেসিয়া θ, ২x**—খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি নানা প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত চর্ম পীড়ায়।

৪। **ক্রিয়াজোটাটাম ২০০**—কানের চারপাশে রসস্রাব যুক্ত উদ্ভেদ বের হলে।

৫। **গ্রাফাইটিস ২০০**—গরু-মোষাদির যে-কোন চর্ম পীড়ায়—যদি মধুর ন্যায় চট্‌চটে স্রাব নির্গত হয়।

৬। **পেট্রলিয়াম ২০০, ১০০০**—প্রতি বছব শীতকালে চর্মরোগ হলে বা পুরাতন চর্মরোগে।

৭। **নেট্রাম মিউর ২০০, ১০০০**—এক্‌জিমাতে যদি রস, পুঁজ তথা মামড়ি থাকে। হাঁটুর নীচে তথা অণ্ডকোষের চুলকানিতে।

৮। **সিপিয়া ২০০**—গাভীর যোনিমুখের কাছে অতিরিক্ত চুলকানি যুক্ত ফুস্কুড়িতে।

## আঁচিল

গরু-মোষাদির চোখের চারদিকে তথা ঠোঁটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডবৎ পরিলক্ষিত হলে একে গো-আঁচিল বলে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **ক্যালকেরিয়া ক্যালসিনাটা ৬**—সর্বপ্রকার আঁচিলের অন্যতম ওষুধ।

২। **থুজা θ, ২০০, ১০০০**— আঁচিল রোগের সর্বাপেক্ষা প্রধান ওষুধ।

৩। **নাইট্রিক অ্যাসিড ২০০, ১০০০**—রক্তস্রাবী আঁচিল—সামান্য স্পর্শে যদি রক্ত বেরোয় তথা দুর্গন্ধ যুক্ত হলে।

## এঁষে ঘা (মুখ ও পায়ের রোগ)

**কারণ ঃ** যদি অপরিষ্কার তথা অপরিচ্ছন্ন স্থানে গরুকে রাখা হয় এবং অপুষ্টিকর খাদ্যাদি খাওয়ানো হয়—তবে এই প্রকার রোগ সূচিত হয়ে থাকে।

**লক্ষণ ঃ** এই রোগের সূচনাতে গরু-মোষাদির কাঁপুনি সহ জ্বর দেখা দেয়। শিং, মুখ এবং পা গরম হয়ে ওঠে এবং মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে মুখে, পালানে, নাকের মধ্যে তথা পায়ের ক্ষুরের সংযোগস্থলে ফুস্কুড়ি দেখা দেয এবং ঐ ফুস্কুড়িগুলো ফেটে যায়। মুখে ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায় গরু খেতে পারে না, ক্ষুরের মধ্যভাগে ক্ষত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে পারে না। ইংরেজিতে এই প্রকার রোগকে Foot and Mouth Disease আ্যাখ্যা দেওয়া হয়।

এই রোগটি অত্যন্ত সংক্রামক।

## লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **রাসটক্স** ৩০, ২০০—এই রোগের একটি প্রধান ওষুধ। ফোস্কার মতো উদ্ভেদ, পুঁজ তথা মামড়ি পড়লে।

২। **থুজা** ৩০, ২০০—পায়ের ফুস্কুড়ি সামান্য টেপামাত্রই যদি রক্ত বেবোয়।

৩। **সিকেল** ২০০—জলবৎ রসযুক্ত তথা দুর্গন্ধযুক্ত স্রাবে।

৪। **নাইট্রিক অ্যাসিড** ২০০, ১০০০—মুখের ঘা কিছুতেই আরোগ্য না হলে।

৫। **মার্কসল** ৩০, ২০০—অত্যন্ত সাংঘাতিক ধরনের পুঁজ যুক্ত ঘা তথা মুখ দিয়ে অনবরত লালা ঝরতে থাকলে।

# পাঁচড়া

**লক্ষণ ঃ** প্রাথমিক অবস্থায় গরু-মোযাদি জন্তু গাছে বা দেওয়ালে গা ঘষতে থাকে, এবং ঐরূপে গা ঘষার পর ফুস্কুড়ি বেরোয়। ঐ সকল ফুস্কুড়ি থেকে জলবৎ স্রাব ঝরে এবং মামড়ি পড়ে—পরবর্তী কালে ক্ষত সৃষ্টি হয়।

গো-মোষাদির মাথায় বা মুখে পাঁচড়া হয় না।

## লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **সালফার** ৩০, ২০০, ১০০০—পাঁচড়ার প্রধান ঔষধ। যে সকল গবাদি পশু অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।

২। **সেরিনাম** ২০০, ১০০০—সালফারে যদি কাজ না হয়—তথা পাঁচড়ার স্রাবে বা রক্ত পুঁজে যদি দুর্গন্ধ থাকে।

৩। **মেজোরিয়াম** ৬, ৩০, ২০০—শীতকালে যদি খোস-পাঁচড়া হয়।

৪। **কার্বোভেজ** ৩০, ২০০—সারা শরীরে যদি ছোট ছোট আকারের ফুস্কুড়ি বেরোয়।

৫। **আর্সেনিক** ৩০, ২০০—যদি ক্ষত সৃষ্টি হয় তথা চারপাশ যদি শক্ত হয় এবং ক্ষতস্থান যদি লালবর্ণ যুক্ত হয়।

৬। **সিপিয়া** ৩০, ২০০—সাদা বর্ণের জলপূর্ণ ফোস্কাতে।

৭। **হিপার** ৬x, ৩০, ২০০—বড় আকারের বিশেষ ব্যথা যুক্ত পাঁচড়া হলে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হয়।

## কাউর ঘা

**লক্ষণ ঃ** চর্ম প্রদাহ সহ পুঁজ রস নির্গত হয়। এই অবস্থায় গরু-মোষাদি গাছে বা দেওয়ালে গা ঘষে। ক্ষত বিরাট হয়, তথা ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরোয়। শরীরের যে-কোন স্থানে এরূপ ক্ষত সূচিত হ'তে পারে এবং ক্ষতস্থান থেকে জলের মত বা হলদে স্রাব নির্গত হয়।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **গ্রাফাইটীস** ২০০, ১০০০—পুরাতন কাউর ঘায়ের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ওষুধ। ক্ষতস্থান থেকে যদি মধুর ন্যায় আঠালো রস বেরোয় এবং গরু বা মোষটি যদি মোটা হয়।

২। **সেরিনাম** ২০০, ১০০০—সর্বদা চুলকাবার ইচ্ছা, শিরদাঁড়াটি যদি বেঁকে যায়, স্রাব যদি দুর্গন্ধ যুক্ত হয়।

৩। **ওলিয়েণ্ডার** ৩০, ২০০—বিশেষ চুলকানি যুক্ত মাথায় তথা কানের পিছনের কাউর ঘাতে।

৪। **রাসটক্স** ৩০, ২০০—অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত কারণে রসপূর্ণ ফোস্কা এবং মামড়ি যুক্ত কাউর ঘাতে।

৫। **আর্সেনিক** ২০০—শুষ্ক, শল্কযুক্ত তথা দুর্গন্ধ যুক্ত কাউর ঘাতে।

৬। **ক্রোটন** ৩০, ২০০—গরু-মোষাদির মুখের, লিঙ্গের তথা অণ্ডকোষের কাউর ঘাতে।

## বিসর্প

কবিরাজগণ এই রোগকে **বাত রোগ** আখ্যা দিয়ে থাকেন। **স্টেপটোক্কাস** নামক এক প্রকার জীবাণুই এই রোগ সূচিত করে।

এই রোগটি মারাত্মক ধরনের সংক্রামক রোগ বিশেষ।

**লক্ষণ ঃ** রোগের প্রথমাবস্থায় গবাদি পশুর গায়ের লোমগুলো খাঁড়া খাঁড়া হয়ে ওঠে, ক্ষুধা, হ্রাস পায় বা ভালোভাবে খেতে পারে না, স্বল্প জ্বর থাকে। রোগ যত বাড়তে থাকে—আক্রান্ত স্থানসমূহ তত ফুলে ওঠে এবং প্রবল জ্বর হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদাহ যুক্ত স্থানে ফোস্কা দেখা যায়। ইংরেজিতে এই রোগকে 'ইরিসিপেলাস' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই রোগটি সাংঘাতিক ধরনের সংক্রামক রোগ।

এই রোগে আক্রান্ত হলে যে-কোন সময়ে গবাদি পশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যান্থ্রাক্সিনাম** ২০০—দাহযুক্ত বিসর্পের প্রধান ওষুধ। আক্রান্ত স্থানটি যদি ভীষণ জ্বালা করে।

২। **হিপোজিনিয়াম ৩০**—সাংঘাতিক ধরনের বিসর্প রোগে।

৩। **বেলেডোনা ৩০, ২০০**—রোগের প্রথম অবস্থায় আক্রান্ত স্থানটি যদি ফুলে ওঠে তথা লাল বর্ণের হয়। প্রবল জ্বর, চক্ষু-তারা বিস্তৃত এবং কটা লাল বর্ণের মূত্র নিঃসরণ হলে।

৪। **আর্সেনিক ৩০, ২০০**—গলিত ধরনের বিসর্পের প্রধান ঔষধ। রোগগ্রস্ত পশুটি যদি অস্থির ও নিতান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে।

৫। **গ্রাফাইটিস ২০০**—বিচরণশীল বিসর্প তথা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ রহিত করবার জন্য প্রধান ঔষধ।

৬। **ক্রোটেলাস ৩০, ২০০**—পচন আরম্ভ হলে এই ওষুধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

## বসন্তরোগ

গো-মোষাদির শরীরে চামড়ার উপর গুটি দেখা দিলে তাকে গো-বসন্ত বলে। বসন্ত রোগ দুই প্রকার; যথা— (১) সংযুক্ত বসন্ত ও (২) অসংযুক্ত বসন্ত।

(১) **সংযুক্ত বসন্ত** ঃ বসন্তের গুটিগুলি যদি একসঙ্গে লেগে থাকে অর্থাৎ দুই বা ততোধিক গুটি যদি একসঙ্গে লেগে থাকে—এই ধরনের বসন্ত অত্যন্ত মারাত্মক।

(২) **অসংযুক্ত বসন্ত** ঃ বসন্তের গুটিগুলি যদি পরস্পবের সঙ্গে লেগে না থাকে—তবে তাকে অসংযুক্ত বসন্ত আখ্যা দেওয়া হয়। অসংযুক্ত বসন্ত তেমন মারাত্মক নয়।

**বসন্ত নিম্নলিখিত চারটি ক্রমপর্যায় অনুযায়ী প্রকাশিত হয় ঃ**

(১) **অঙ্কুরায়মান**—১০।১২ দিন যাবৎ বিদ্যমান হতে থাকে। তেমন কোনো অসুবিধা হয় না।

(২) **গুটিকা-উদ্গম অবস্থা** ঃ শরীর গরম হয়; নাক, মুখ, বাহ্যদ্বার, মূত্রদ্বার লাল হয়; ২।৩ দিনের মধ্যেই এই পর্যায়ে গুটিকাসমূহ বের হয়।

৩। **পুঁজপূর্ণ অবস্থা** ঃ ৫।৬ দিনের মধ্যে গুটিতে রসপুঁজ সঞ্চার হয় এবং প্রবল জ্বর হয়; রক্ত তথা আমযুক্ত বাহ্য, রক্ত প্রস্রাব প্রভৃতি উপসর্গাদি দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে নিউমোনিয়া, উদরাময় তথা নানা প্রকার কু-উপসর্গাদি পরিলক্ষিত হয়।

৪। **শুষ্ক অবস্থা** ঃ পুঁজ কোষসমূহ এই অবস্থায় শুষ্ক হতে থাকে। গুটির খোসাসমূহ খসে পড়তে থাকে—এই সময়েই বসন্ত রোগ বিশেষভাবে সংক্রামিত হয়ে থাকে।

### প্রতিষেধক ঔষধ

১। **ভেরিওলিনাম—২০০** ২। **ভ্যাক্সিনিনাম—২০০**।

[আর চিকিৎসকের জন্য—**ম্যালন্ড্রিনাম—২০০**]

**পথ্য ঃ** গুটি বের হবার পূর্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে শীতল জল এবং বের হবার পরে গরুকে ঈষদুষ্ণ জল খাওয়াতে হবে। আহার করতে পারলে—নরম ঘাস, খড়, ভুসি ও খইল দিতে হবে। আহার না করতে পারলে বার্লি অথবা সাগু জলে সিদ্ধ করে খাওয়াতে হবে।

## লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট** ৬, ৩০, ২০০— রোগের প্রথম অবস্থায় প্রবল তৃষ্ণা তথা অস্থিরতায়।

২। **বেলেডোনা** ৬, ৩০, ২০০—প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বর তথা স্বভাবে উগ্রতা পরিলক্ষিত হলে।

৩। **অ্যান্টিমটার্ট** ৩০, ২০০—বসন্তের গুটিকা সমূহ ঠিকমতো না বেরোলে এবং গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হলে।

৪। **সালফার** ২০০—গুটি সমূহ বসে গেলে এবং বের না হতে পারায় কঠিন হলে।

৫। **মার্কসল** ৩০, ২০০—গুটিকা পুঁজপূর্ণ বা পক্কাবস্থায় থাকলে এবং রক্ত-আম যুক্ত বাহ্যে।

৬। **অ্যাসিড কার্বলিক** ৩০, ২০০—বসন্তের মতো পচে দুর্গন্ধ বের হলে।

৭। **কার্বোভেজ** ৩০, ২০০—জীবনীশক্তিহানি, দুর্বলতা, নাড়ীলোপ, ঘাম তথা অন্যবিধ সাংঘাতিক উপসর্গ দেখা দিলে।

৮। **ক্যান্থারিস** ৬, ৩০, ২০০—রক্তস্রাবী বসন্তে এই ওষুধের ব্যবহার হয়ে থাকে।

# গলা ফোলা রোগ

এই রোগে অনেকক্ষেত্রে গরুর মৃত্যু হয়ে থাকে। এটি একটি বিশেষ সংক্রামক রোগ। এই রোগে গবাদি পশুর গলার বীচি ফুলে যায়।

**বিশেষ লক্ষণ ঃ** চোয়ালের নিচে ও কানের নিকটের গ্রন্থিগুলো ফুলে ওঠে—মুখ দিয়ে লালা ঝরে তথা মুখের অভ্যন্তরে ক্ষত সৃষ্টি হয়।

## লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **সালফার** ২০০—গলা ফোলা রোগে অন্য ওষুধে কাজ না হলে এবং পিঠ বেঁকে গেলে।

২। **অ্যাকোনাইট** ৩০, ২০০—রোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর, অস্থিরতা এবং তীব্র পিপাসা বিদ্যমান থাকলে।

৩। **বেলেডোনা** ৩০, ২০০—ভয়ানক জ্বর এবং পশুটি মাঝে মাঝে চমকে উঠলে।

৪। **মার্কসল** ৬, ৩০— মুখ দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত লালা ঝরলে—তথা রাতে রোগলক্ষণ বেশি হলে।

৫। **ফাইটোলাক্কা** ৩০, ২০০—মুখে ও তালুতে অত্যন্ত ক্ষত তথা পর্যাপ্ত পরিমাণে লালা জমে উঠলে।

৬। **এপিস** ২০০—গলার ভিতরে এবং বাইরে থলের মতো ফোলা দৃষ্ট হলে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হয়।

## আন্ত্রিক তথা উদর সংক্রান্ত রোগাদি

### শূলরোগ

অন্ত্রের আক্ষেপজনিত কারণেই শূলবোগ হয়ে থাকে।

এই রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হলেও এই রোগের সঙ্গে দেহের কোনো তাপ বা জ্বর থাকে না।

**কারণ ঃ** পচা খড় এবং দূষিত খাদ্যাদি গ্রহণেব ফলেই প্রধানত এই রোগ হয়ে থাকে।

**লক্ষণ ঃ** এই অবস্থায় গরু মোষাদি জন্তু হাত পা ছুড়তে থাকে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পিছনের পা দিয়ে পেটে আঘাত হানতে থাকে। একবার শোয়, একবার বসে, একবাব দাঁড়ায়—এরূপ নানাভাবে অস্থিরতা প্রকাশ করে।

#### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **স্ট্যানাম** ৩০, ২০০—বাছুরের উদর শূলে।

২। **কস্টিকাম** ৩০, ২০০—পেট মোচরানি তথা ব্যথায়।

৩। **নাক্সভমিকা** ৬, ৩০—পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ সহ কোষ্ঠবদ্ধতায়।

৪। **কলোসিন্থ** ৬, ৩০, ২০০—শূল বেদনার প্রধান ওষুধ। গরু যেক্ষেত্রে পেটে চাপ দিয়ে শোয় অথবা পাগুলিকে নাভির নিকটে বেখে চাপ সৃষ্টি কবে।

৫। **ডায়স্কোরিয়া** ২x—গরুর শূল বেদনায় বিশেষ উপকারী।

৬। **ক্যান্থারিস** ৩০, ২০০—ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব এবং প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত দৃষ্ট হলে।

৭। **প্লাম্বার** ২০০—পেটফাঁপাহীন কোষ্ঠবদ্ধতায়। সামান্য বাহ্য, তাও ছাগল নাদির (বাহ্য) মতো।

৮। **সিনা** ৩, ৬, ৩০—বাছুরের পেটে-বায়ু জমলে।

### কোষ্ঠবদ্ধতা

**কারণ ঃ** প্রত্যহ এক জায়গায় বেঁধে রাখা তথা একই রূপ আহার, পরিশ্রম না করানো ইত্যাদির জন্য এই রোগ হয়ে থাকে।

**লক্ষণ ঃ** সামান্য জ্বর হয়, গবাদি পশু এই অবস্থায় আহার করতে চায় না।

#### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যালুমিনা** ৩০, ২০০—অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য সূচিত হলে। সামান্য বাহ্য, তাও যদি পাথরের মতো কঠিন হয়।

২। **নাক্সভমিকা ২০০**—পেট ফাঁপাসহ পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ হলে। গরুর স্বভাবটি রাগী—এরূপ ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

৩। **সিপিয়া ২০০**—গাভীর গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা সূচিত হলে, এবং তরল মলও অতিকষ্টে নির্গত হলে।

৪। **ওপিয়াম ৩০**—বাছুর তথা বৃদ্ধ গবাদি পশুর কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ উপযোগী।

৫। **নেট্রামিউর ২০০, ১০০০**—অত্যন্ত কঠিন মল, খুব জোরে বেগ দেওয়ার ফলে মলদ্বার ফেটে রক্ত বের হলে।

৬। **সালফার ২০০, ১০০০**—পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতায় কোনো ওষুধে উপকার না পাওয়া গেলে এটি প্রযোজ্য।

## উদরাময়

**কারণ ঃ** দূষিত খাদ্য তথা দূষিত জলপান, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রভৃতির ফলে এই রোগ সূচিত হয়ে থাকে।

**বিশেষ লক্ষণ ঃ** পেটফাঁপা, পেটবেদনা, বিবিধবর্ণ তথা দুর্গন্ধ যুক্ত তরল বাহ্য এবং শরীরে অবসন্নতা দেখা যায়।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **ক্যামোমিলা ১২, ৩০, ২০০**—শ্লেষ্মামিশ্রিত সবুজবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত মল এবং গরুটি যদি উগ্রস্বভাবযুক্ত হয়; দুগ্ধপোষ্য বাছুরের উদরাময়েও এই ওষুধটি উপকারী।

২। **অ্যাকোনাইট ৩০, ২০০**—শীতকালে ঠাণ্ডা লেগে উদরাময় হলে এবং অস্থিরতা ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ থাকলে।

৩। **অ্যালো ২০০**—পেটডাকা সহ দুর্গন্ধযুক্ত হরিদ্রাবর্ণের বাহ্যে।

৪। **কলচিকাম ৩০, ২০০**—নতুন ঘাস খেয়ে উদরাময় হলে।

৫। **পালসেটিলা ৩০, ২০০**—আহারের দোষে উদরাময় হলে।

৬। **কলোসিন্থ ৬, ৩০, ২০০**—পিত্ত বা রক্তমিশ্রিত বাহ্য এবং অত্যন্ত পেট-বেদনা হলে।

## রক্তামাশয় (ব্লাড ডিসেন্ট্রি)

**লক্ষণ ঃ** আমযুক্ত অথবা রক্তযুক্ত বাহ্য, ক্ষুধাহীনতা তথা পেট ব্যথায় অস্থির হয়ে গরুটি নিজের পেটে লাথি মারে।

রক্তযুক্ত মল অথবা মাছ-ধোয়া জলের ন্যায় মল।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **মার্কুরিয়াস ৬, ৩০, ২০০**—একটি প্রধান ওষুধ। রক্তসহ আমবাহ্য এবং মুখ দিয়ে লালা ঝরলে।

২। **অ্যাকোনাইট** ৬, ৩০—জ্বরহীন বা জ্বরসহ আমাশয়, ভয়ানক অস্থিরতা এবং পিপাসা থাকলে।

৩। **ট্রম্বিডিয়াম** ৩০, ২০০—পানাহারের পরেই বেদনা সূচিত হলে; কটা এবং রক্তবর্ণের পাতলা বাহ্যে।

৪। **আর্নিকা** ৩০, ২০০—বাহ্যের সঙ্গে আমরক্ত বা পূঁজ মিশ্রিত থাকলে, এবং গরুটি যদি পুনঃ পুনঃ কোথ দিতে থাকে।

৫। **আর্সেনিক** ৩০, ২০০—প্রবল তৃষ্ণা, অস্থিরতা থাকলে এবং গরুটি ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়লে।

৬। **সালফার** ২০০, ১০০০—পুরাতন আমাশয়ে এবং রোগটি জটিল হলে এই ওষুধটি প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

## যকৃতের প্রদাহ

শীতকালেই এই বোগ বেশি হয়ে থাকে। উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে রোগটি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং পরিশেষে মারাত্মক রূপ ধাবণ করে।

**লক্ষণ ঃ** প্রথমাবস্থায় স্বল্প জ্বর হয়; গবাদি পশু এই অবস্থায় সর্বদা শুয়ে থাকে। ক্রমশঃ জ্বর বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধাহীনতা, কাদার মতো সাদা বাহ্য, হলুদ রঙের প্রস্রাব তথা শীতকম্প প্রভৃতি লক্ষণ সূচিত হয।

## লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট** ৬, ৩০—যকৃতের তরুণ প্রদাহে; অস্থিরতা এবং শীতকম্পসহ জ্বর এবং ভীষণ পেট বেদনায়।

২। **চেলিডোনিয়াম** ৬, ৩০, ২০০—যকৃতের সাধারণ প্রদাহে, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং নাড়ীর ক্ষীণতা তথা অনিয়মিত অবস্থায়।

৩। **মার্কসল** ৩০, ২০০—যকৃতের তরুণ ও পুরাতন প্রদাহে—গরুটি যদি বাম দিকে শুয়ে থাকতে চেষ্টা করে।

৪। **ল্যাকেসিস** ৩০, ২০০— বেদনা এবং যকৃতের অভ্যান্তরস্থ স্ফোটকের ফলে যকৃৎটি যদি ফুলে ওঠে।

৫। **লাইকো** ২০০— বাছুব ও গরুর লিভারের সর্ববিধ রোগে। বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে রোগলক্ষণাদি বৃদ্ধি পৈলে।

৬। **হিপার** ৬, ৩০, ২০০—যকৃতের ভীষণ বেদনায়, গরু যখন পেটে হাত দিতে দেয় না—এরূপ ক্ষেত্রে।

## ন্যাবা বা কামলা রোগ

**কারণ ঃ** রক্তের সঙ্গে পিত্তবিষ মিশ্রিত হওয়ার ফলে এই রোগ সূচিত হয়।

**লক্ষণ ঃ** চোখ, গায়ের চামড়া, মূত্র এবং লালা ইত্যাদি হলুদবর্ণ হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময় প্রভৃতি উপসর্গও দেখা যায়।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট** ৩০, ২০০—রোগের প্রথম পর্যায়ে প্রবল জ্বর, অস্থিরতা, তীব্র পিপাসা তথা পেট বেদনায় প্রযোজ্য।

২। **কার্ডুয়াস** θ—সর্বপ্রকার ন্যাবা বা কামলা রোগের শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

৩। **মার্কসল** ৩০, ২০০—সর্বাঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ, প্রচুর লালাস্রাব এবং মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকলে।

৪। **চায়না** ৩০, ২০০—জ্বরের পরে এই রোগ হলে, এবং পিত্ত সংযুক্ত তরল বাহ্য তথা গরু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লে।

৫। **ক্রোটেলাস** ২০০—রক্ত দুষ্টির ফলে সাংঘাতিক ধরনের ন্যাবা রোগে এবং কালচে রক্তস্রাব হলে—ওষুধটি প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ হয়।

## পেট ফাঁপা ও মন্দাগ্নি

**লক্ষণ ঃ** ক্ষুধাহীনতা, পেট ডাকা, অস্থিরতা ও পৈটিক যন্ত্রণা সূচিত হয়। এই অবস্থায় গবাদি পশু জাবর কাটা বন্ধ রাখে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতদ্‌সত্ত্বে কোষ্ঠবদ্ধতাও বিদ্যমান থাকে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গবাদি পশু পিছনের পা ছুঁড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পরিশেষে শুয়ে থাকে। পেটে সঞ্চিত বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পেটটি ফুলে ওঠে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **নাক্সভমিকা** ৩০, ২০০—আহারের শেষে পেট ফাঁপলে এবং বারবার নিষ্ফল বাহ্যের বেগ হলে।

২। **কলচিকাম** ২x, ৬, ৩০, ১০০—অতিরিক্ত ঘাস খাওয়ার ফলে পেট ফাঁপলে।

৩। **পালসেটিলা** ২০০—শান্ত প্রকৃতির গাভীর মন্দাগ্নি রোগে এটি প্রযোজ্য। ঘন ঘন তরল আমভেদ হলেও এটি প্রয়োগ করা চলে।

৪। **টেরিবিন্থ** ৩০, ২০০—পেট ভীষণভাবে ফুলে ওঠার দরুন শ্বাস-প্রশ্বাস-জনিত কষ্ট সূচিত হলে।

৫। **কার্বোভেজ** ৩০, ২০০—অতিরিক্ত রোদ ভোগের ফলে দুর্বল গরুর পেট ফাঁপলে; জীবনীশক্তির হ্রাস তথা মৃত্যুবৎ অবস্থা সূচিত হলে।

## কৃমি

**লক্ষণ ঃ** উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, নাসারন্ধ্র চুলকান, মৃগী রোগের ন্যায় লক্ষণাদি, দাঁতে দাঁতে ঘষা, দুর্বলতা ও মূর্ছা প্রভৃতি কৃমিরোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **মার্কসল** ৬, ৩০—কৃমিরোগের একটি উত্তম ওষুধ। সর্বদা খাবার ইচ্ছা, মুখ দিয়ে লালা পড়লে এবং গুহ্যদ্বারে ক্ষত দৃষ্ট হলে।

২। **চায়না ৩০, ২০০**—উদরাময়ে মলের সঙ্গে কেঁচোর মতো বড় আকারের কৃমি নির্গত হলে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হয়।

৩। **স্যান্টোনাইন ৩০**—সর্বপ্রকার কৃমি-রোগের শ্রেষ্ঠ ওষুধ; অন্য ওষুধে কাজ না হলে ওষুধটি প্রযোজ্য।

## শোথ রোগ

**কারণ ঃ** শোথ রোগ এক প্রকার ফোলা রোগ—হৃৎপিণ্ড, কিডনি, লিভার এই **তিনটি** যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈকল্যের ফলেই শোথ রোগ সূচিত হয়ে থাকে।

**লক্ষণ ঃ** (১) **গবাদি পশুর পা ফুললে**—হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈকল্য জনিত শোথ; (২) **মুখ ফুললে**—কিডনির (মূত্রযন্ত্রের) এবং (৩) **পেট ফুললে**—লিভারের (যকৃতের) ক্রিয়া বৈকল্য-জনিত কারণে শোথ হয়েছে এরূপ বুঝতে হবে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **আর্সেনিক ৩০, ২০০**—সর্বপ্রকার শোথ রোগেই এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

২। **এপিস মেল ২০০**—শোথ রোগের একটি প্রধান ওষুধ। স্বল্প প্রস্রাব তথা পুনঃ পুনঃ জলপানের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকলে।

৩। **ডিজিটেলিস ৩০**—হৃদরোগ তথা মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়াবৈকল্য-জনিত শোথ রোগে, নাড়ী দুর্বল তথা ক্ষীণবোধ হলে, এবং বসন্ত রোগ ভোগের পরে শোথ হলে—এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

## জ্বর

সুস্থ ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম হলে অসুস্থতার কারণে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। শারীরিক এই উষ্ণতা বৃদ্ধির অপর নাম জ্বর।

জ্বর দু'প্রকার ঃ (১) **সবিরাম জ্বর** এবং (২) **স্বল্পবিরাম জ্বর**।

সবিরাম জ্বর একবার ছেড়ে গিয়ে পরদিন নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সময়ে আবার হয়। আর স্বল্পবিরাম জ্বর একেবারে ছেড়ে যায় না—হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে মাত্র।

**লক্ষণ ঃ** গাত্রতাপ, ঘর্ম, শীত, পিপাসা, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ও ক্ষুধাহীনতা থাকে; দুধ হ্রাস পায়, গরু জাবর কাটে না এবং কানের রক্তবাহী শিরাসমূহ কালো এবং পরিপুষ্ট হয়।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট ৩০, ২০০**—জ্বরের প্রথমাবস্থায় প্রয়োজ্য। প্রবল জ্বর, অস্থিরতা এবং পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গে বিশেষরূপে ফলপ্রদ।

২। **ব্রাইওনিয়া ৩০, ২০০**—শুষ্ক কাসি এবং কোষ্ঠকাঠিন্য সহ জ্বরে।

৩। **জেলসিমিয়াম ৩০, ২০০**—নিস্তেজ ভাবযুক্ত জ্বর তথা বাছুরদের জ্বরে প্রধান ওষুধ। উপসর্গবিহীন স্বল্পবিরাম জ্বর তথা কম্পজ্বরে বাছুরদের ক্ষেত্রে বিশেষরূপে প্রযোজ্য।

৪। **আর্সেনিক ২০০**—দিন বা রাত্রির দুই প্রহরের পরে জ্বরের বৃদ্ধি ঘটলে এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

৫। **চায়না ৩০, ২০০**—কেবলমাত্র দিনের বেলা যদি জ্বর আসে।

৬। **বেলেডোনা ৩, ৩০ ২০০**—প্রদাহজনিত জ্বরের কারণে চোখ-মুখ যদি লাল হয়।

৭। **আর্নিকা ৩০, ২০০**—আঘাতজনিত জ্বর তথা প্রসবের পূর্বেকার দুগ্ধ জ্বরে এটির প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

৮। **পডোফাইলাম ৩০, ২০০**—প্রাতঃকালীন জ্বরে এবং তৎসহ উদরাময় সূচিত হলে।

৯। **সিনা ২০০**—বাছুরের কৃমি বিকারজনিত জ্বরে প্রযোজ্য।

১০। **রাসটক্স ৩০, ২০০**—বৃষ্টিতে ভিজে বা স্যাঁৎসেঁতে স্থানে শয়নের ফলে বা অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত কারণে জ্বর হলে।

১১। **কার্বোভেজ ৩০, ২০০**—অতিরিক্ত রৌদ্র লাগা হেতু জ্বর হলে এবং পাগুলো ঠাণ্ডা হতে থাকলে।

১২। **ওপিয়াম ৩০, ২০০** — অল্প বয়স্ক বাছুর এবং বয়স্ক (বৃদ্ধ) গবাদি পশুর জ্বরে প্রযোজ্য।

১৩। **লাইকো ২০০**—যকৃত রোগ, পেটফাঁপা সহ জ্বরে প্রযোজ্য।

১৪। **সালফার ২০০, ১০০০**—নির্বাচিত কোনো ওষুধের দ্বারা উপকার না পাওয়া গেলে—এই ওষুধটি জ্বর রোগে ব্যবহার্য।

## শ্বাস, কাশি তথা ফুসফুস সংক্রান্ত রোগাদি

### পিনাস রোগ

নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষতকে চিকিৎসাশাস্ত্রে পিনাস রোগ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

**লক্ষণ ঃ** নিশ্বাস জোরে বয়, ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং ক্রমে সর্দি নির্গত হয়; সর্দিতে রক্ত, পুঁজ মিশ্রিত থাকে; এবং নাকে ভীষণ দুর্গন্ধ হয়।

#### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **ক্যাড্‌মিয়াম সালফ্ ২০০, ১০০০**—রোগের প্রথম পর্যায়ে এই ওষুধটি বিশেষ উপকারী।

২। **সোরিনাম ২০০, ১০০০**—নাক দিয়ে পাতলা জলের ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হলে।

৩। **কেলি বাইক্রম ২০০, ১০০০**—নাক দিয়ে পুঁজময় দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব নির্গত হলে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে।

## কাশি

বৃষ্টিতে ভিজে অথবা ঠাণ্ডা লেগে কাশি হয় তৎসহ জ্বর ও বমি হতে থাকে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট** ৩, ৬, ২০০—ঠাণ্ডা বাতাস লেগে কাশি হলে, জ্বর, অস্থিরতা তথা অত্যন্ত পিপাসা বিদ্যমান থাকলে।

২। **ইপিকাক** ৩০, ২০০—আপেক্ষিক তথা শ্বাসরুদ্ধকব কাশিতে এবং কাশতে কাশতে বমি হলে এটি প্রযোজ্য।

৩। **ডালকামরা** ৩০, ২০০—বৃষ্টিতে ভিজে কাশি হলে।

৪। **অ্যান্টিমটার্ট** ৬, ৩০, ২০০—বাছুরেব কাশিতে এই ওষুধটি প্রয়োগে বিশেষ উপকাব পাওয়া যায়।

## ঘুংড়ি কাশি

**লক্ষণ ঃ** অবিরাম কাশি হয় এবং তৎসহ শ্বাস কষ্ট বিদ্যমান থাকে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট** ৩০, ২০০—ঘুংড়ি কাশির প্রথম পর্যায়ে প্রযোজ্য। শুষ্ক কাশি, তৎসহ জ্বর, পিপাসা ও অস্থিরতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকলে।

২। **স্পঞ্জিয়া** ২০০—ঘুংড়ি কাশির একটি উৎকৃষ্ট ওষুধ।

৩। **হিপার** ৩০, ২০০—পূর্বে উল্লিখিত দুইটি ওষুধ [(১) +(২)] ব্যবহারেব পর এই ওষুধটি ব্যবহার করা হয়।

৪। **ফরফরাস** ২০০—ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়ার পরে ঘুংড়ি কাশি হলে—এই ওষুধটি প্রয়োগ করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

## বায়ুনালীভুজ প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস)

**কারণ ঃ** সচরাচর ঠাণ্ডা লেগেই এই রোগটি হয়ে থাকে। বাছুর তথা বৃদ্ধ গরুর ক্ষেত্রে এই রোগটি মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** প্রথমাবস্থায় সামান্য সর্দি, অল্প কাশি; গরু কিছু খেতে চায় না, সব সময় ঝিমুতে থাকে। পরে কাশি বৃদ্ধি পায়, গরু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বল্প তথা লাল বর্ণযুক্ত প্রস্রাব হয়ে থাকে।

রোগটি জটিল হয়ে দাঁড়ালে শ্লেষ্মায় শ্বাসনালী অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে গবাদি পশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট** ৬, ৩০, ২০০—রোগের প্রথম অবস্থায় তথা জ্বর, অস্থিরতা এবং পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গে প্রযোজ্য।

২। **ব্রাইওনিয়া** ৩০, ২০০—শুষ্ক তথা কষ্টকর কাশি হলে। এ অবস্থায় গরুটি চুপচাপ শুয়ে থাকে বা দাঁড়িয়ে থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলেও এটি প্রয়োগ করা চলে।

৩। **আর্সেনিক** ৩০, ২০০—শ্বাসকষ্ট সূচিত হলে।

৪। **ইপিকাক** ৩০, ২০০—কণ্ঠনালীতে শ্লেষ্মার দরুন ঘড় ঘড় শব্দ এবং মাঝে মাঝে বমি হলে এটি প্রযোজ্য।

৫। **আর্স-আইওড** ৩০, ২০০—জ্বর, শ্বাসকষ্ট তথা পুঁজের মত গয়ের বের হলে এবং রাত্রিকালে গরু ঘামলে এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

## ফুসফুস প্রদাহ

### [নিউমোনিয়া]

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট** ৩০, ২০০—রোগের প্রথমাবস্থায় অস্থিরতা, পিপাসা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকলে।

২। **রাসটক্স** ৩০, ২০০—অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হলে।

৩। **আর্নিকা** ৩০, ২০০—আঘাত লেগে নিউমোনিয়া হলে।

৪। **ব্রাইওনিয়া** ৩০, ২০০—বারংবার শুষ্ক খুসখুসে কাশি এবং নড়াচড়ায় কষ্ট হ'লে।

৫। **টিবারকুলিনাম** ২০০—যে সকল গরুর সহজে ঠাণ্ডা লাগে— সেই সকল গরুর নিউমোনিয়া হলে।

৬। **কার্বোভেজ** ৩০—নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় প্রযোজ্য। গবাদি পশু যখন দুর্বল এবং অবসন্ন হয়ে পড়ে—এরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

## হাঁপানি

ফুসফুসস্থ বায়ুনালীর অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী আছে— সেই পেশীসমূহের আক্ষেপকে হাঁপানি বলা হয়ে থাকে।

**লক্ষণ ঃ** শ্বাসপ্রশ্বাসে শিষ্ দেওয়ার মতো **সাঁই সাঁই** শব্দ হয়। মুখ নীলবর্ণ, চক্ষু কোটরাগত হয়, চোখ দিয়ে জল পড়ে এবং পেট ফাঁপা বিদ্যমান থাকে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট** ২x, ৬, ৩০ — হাঁপানির অন্যতম প্রধান ওষুধ। রোগের প্রথমাবস্থায় এটি প্রযোজ্য।

২। **কার্বোভেজ** ৩০, ২০০—বৃদ্ধ গরুর হাঁপানি রোগে বিশেষ উপকারী। রোদ লাগবার ফলে বা পেট ফাঁপা সহ হাঁপানিতেও প্রযোজ্য।

৩। **আর্সেনিক ৩০, ২০০**—মধ্যরাত থেকে অস্থিরতা সহ হাঁপানির টান এবং তৎসহ সাঁই সাঁই শব্দ থাকলে।

৪। **কেলি বাইক্রম ৩০, ২০০**—বর্ষাকালে এবং শীতে হাঁপানির প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে এবং ভোর রাতে কাশি বৃদ্ধি পেলে।

৫। **সালফার ২০০**—পুরাতন হাঁপানি রোগে এই ওষুধটি প্রয়োগ করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

# চোখ ও কানের রোগ

## চোখ-উঠা

**লক্ষণ :** চোখের সাদা-অংশ লালবর্ণযুক্ত, চোখের পাতাগুলো ফুলো এবং রক্ত জমা হওয়ার ফলে প্রদাহযুক্ত হয়, চোখ দিয়ে জল ঝরে, বাতি বা সূর্যালোকের দিকে তাকালে গরুর কষ্ট হয়; চোখ কর্ কর্ করে। ক্রমে চোখ দিয়ে বেশি জল পড়তে থাকে, দু'চোখ জুড়ে যায় এবং পুঁজ জমে।

এই রোগটিও একটি সংক্রামক রোগ। এই রোগটির ইংরেজি নাম অপথ্যালমিয়া।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **আর্নিকা ৩০, ২০০**—আঘাত-জনিত কারণে চোখ উঠলে।

২। **অ্যাকোনাইট ৩০, ২০০**—চোখের অভ্যন্তর ভাগ যদি ভয়ানক লাল হয় এবং তৎসহ জ্বর, পিপাসা এবং অস্থিরতা বিদ্যমান থাকে।

৩। **ইউফ্রেসিয়া ৩০, ২০০**—চোখ ওঠার যে-কোন অবস্থাতে এই ওষুধটি বিশেষ উপকারী।

৪। **বেলেডোনা ৩০, ২০০**—বিশেষ করে ডান চোখটি অত্যন্ত রক্তবর্ণ হলে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হয়।

৫। **ক্যাল্কে-কার্ব ৩০, ২০০**—চোখ থেকে প্রচুর হরিদ্রা বর্ণের স্রাব নির্গত হলে, কর্ণিয়ার ক্ষত তথা চোখের পাতায় শোথ হলে।

## কর্ণিয়ার ক্ষত

**লক্ষণ :** গভীর ক্ষতে পুঁজ জমে এই রোগে চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই রোগের প্রবলাবস্থায় অক্ষি-গোলকটি ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে। ক্ষতজনিত কারণে দৃষ্টিশক্তিরও হানি ঘটতে পারে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **আর্নিকা ৩০, ২০০**—আঘাতজনিত কারণে কর্ণিয়ায় ক্ষত সূচিত হলে বা চোখ দিয়ে রক্ত ঝরলে এটি প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

২। **আরাম মেট ২০০**—কর্ণিয়ার ক্ষত-জনিত কারণে গবাদি পশু যখন আলোর দিকে মোটেই তাকাতে পারে না; এবং গলার বীচিগুলো যদি বড় হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

৩। **আর্জেন্ট নাইট্রি ২০০**—সদ্যোপ্রসূত বা নবজাত বাছুরের কর্ণিয়ার ক্ষতে বিশেষ উপকারী।

৪। **ইউফ্রেসিয়া ২০০**—চোখ থেকে প্রচুর পীতাভ শ্বেতস্রাব নিঃসরিত হলে এবং চোখে ভয়ানক যন্ত্রণা হলে।

৫। **সাইলিসিয়া ৩০, ২০০**—কর্ণিয়াতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হলে বা চোখ নষ্ট হওয়ার সূচনা দেখা গেলে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হয়।

## চোখের ছানিপড়া

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **সিনেরেরিয়া মেরিটিমা সাক্কাস**—তরুণ ও পুরাতন সকল প্রকার ছানি পড়াতে প্রযোজ্য। আক্রান্ত চোখে এক ফোঁটা করে দিনে ৩ বার প্রয়োগ করতে হয়।

২। **কেনিয়াম ২০০, ১০০০**—আঘাতজনিত ছানি পড়া রোগে এই ওষুধটি প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৩। **ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওর ১২x, ২০০x**—এই ঔষধটি সর্বপ্রকার ছানির প্রধান ওষুধ; বিশেষতঃ শক্ত ধরনের ছানিতে এই ওষুধটি প্রয়োগের দ্বারা বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

## কর্ণমূল প্রদাহ

**মুখ্য কারণ**—একপ্রকার জীবাণু দ্বারা এর সৃষ্টি হয়—

**গৌণ কারণ ঃ** ঠাণ্ডা লাগা। সচরাচর বর্ষাকালে বা শীতকালে এই রোগ হয়ে থাকে।

**লক্ষণ ঃ** কর্ণমূলের গ্রন্থিটি স্ফীত ও শক্ত হয় এবং তৎসহ বেদনা ও জ্বর থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে গ্রন্থিসমূহ **বেশী স্ফীত** হলে গরু ঘাড় নাড়তে পারে না, খাদ্য গিলতে পারে না এবং জাবর কাটাও বন্ধ বয়ে যায়।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট ৩, ৬, ৩০, ২০০**—প্রথমাবস্তায় এটি প্রযোজ্য। শুষ্ক ঠাণ্ডা বায়ু লাগার ফলে রোগ হলে এবং জ্বর, অস্থিরতা ও পিপাসা বিদ্যমান থাকলে।

২। **গ্ল্যাণ্ডারিন ২০০**— কর্ণমুলের গ্ল্যাণ্ড সমূহ বিশেষভাবে ফুলে উঠলে এবং বিষাক্ত হয়ে দাঁড়ালে।

৩। **ব্যাডিয়াডা ২০০**— গ্ল্যাণ্ডগুলো পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠলে।

৪। **বেলেডোনা ৩০, ২০০**— বিশেষতঃ ডানদিকের কর্ণমূল ফুলে লাল হয়ে উঠলে।

৫। **রাসটক্স ৩০, ২০০**— বর্ষার জলে ভেজার ফলে কর্ণমূল প্রদাহিত হলে, বিশেষতঃ বামদিকের কর্ণমূল প্রদাহিত হলে—এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

## কান পাকা

**লক্ষণ ঃ** প্রথমে সামান্য অস্থিরতা বিদ্যমান থাকে। ২।১ দিন পরে কান থেকে জলের ন্যায় তরল স্রাব নিঃসরিত হতে থাকে—পরে পুঁজ বের হয়।

কখনও কখনও কানের অভ্যন্তরে ফোঁড়াও হয়ে থাকে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **বেলেডোনা ৩০, ২০০**—প্রাথমিক অবস্থায় কানের যন্ত্রণাসহ জ্বরে ওষুধটি প্রযোজ্য।

২। **সোরিনাম ২০০**— পুরাতন কান পাকা, পুঁজ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হলে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হয়।

৩। **পালসেটিলা ২০০**—কর্ণমূল প্রদাহের পরে কান পাকলে এবং গন্ধহীন তরল স্রাব নির্গত হলে।

৪। **সাইলিসিয়া ২০০**—বহুদিন যাবৎ কান থেকে পুঁজ বের হতে থাকলে—এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

## বাত রোগ

**কারণ ঃ** বাত রোগ অনেকাংশে বংশজ। বাত রোগকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা— **(১) তরুণ (Acute) ও (২) প্রাচীন (Chronic)।**

**লক্ষণ ঃ** বাতরোগ বৃদ্ধি পেলে গরু তেমন নড়াচড়া করতে পারে না, একস্থানে শুয়ে থাকে। পরিশেষে বাত রোগ হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে এবং বাত রোগগ্রস্ত গরুর চক্ষুরোগও হয়ে থাকে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **বেলেডোনা ৩০, ২০০**— গাঁটগুলো ফুলে উঠলে, প্রবল জ্বর এবং তৎসহ ঘাম ঝরলে।

২। **রাসটক্স ২০০**—বাত রোগের একটি প্রধান ওষুধ; নড়াচড়া করলে যে বাতব্যাধির উপশম হয়ে থাকে সেরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩। **কস্টিকাম ২০০**—বাত রোগাক্রান্ত স্থান শক্ত তথা অসাড় ভাবযুক্ত হলে—কোমর ও পায়ের বাতব্যাধিতে প্রযোজ্য।

৪। **ডালকামারা ৩০, ২০০**—ঠাণ্ডা লাগার ফলে বাতব্যাধি সূচিত হলে এটি প্রযোজ্য।

৫। **মেডোরিনাম ২০০, ১০০০**—সকল প্রকার বাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওষুধ। বিশেষতঃ প্রমেহ জনিত বাতব্যাধি নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৬। **পালসেটিলা** ৩০, ২০০—তরুণ ও পুরাতন বাতব্যাধিতে এই ওষুধটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বেদনা একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরে গেলে তথা প্রমেহ জনিত হাঁটুর বাতে।

৭। **অ্যাব্রোটেনাম** ২০০, ১০০০— আক্রান্ত স্থানটি ফুলে ওঠার আগে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হয়।

৮। **রুটা** ২০০—কোমরের বাতে এই ওষুধটি বিশেষ উপকারী।

৯। **ভিস্কাম অ্যালবাম** θ, ৬, ৩০—বাত এবং গেঁটে বাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

১০। **গুয়েকাম** ২০০—তরুণ বাত এবং অত্যন্ত প্রদাহ জনিত যন্ত্রণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

## আঘাত

আঘাত কোনো রোগ নয়, আকস্মিক দুর্ঘটনাই আঘাত লাগার অন্যতম কারণ। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে মলমাদি লাগাতে হলে—স্থানটি আগে পরিষ্কার করে নেওয়া আবশ্যক।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **আর্নিকা** ৬, ৩০, ২০০, ১০০০—আঘাতের ক্ষেত্রে একটি শ্রেষ্ঠ ওষুধ। কোনো কারণে আঘাত লেগে স্থানটি ছেঁচে গেলে বা কালশিরা পড়ে গেলে বা ভোঁতা অস্ত্রের দ্বারা কেটে গেলে প্রযোজ্য। পুরাতন আঘাতে ১০০০ শক্তি ব্যবহার করা সঙ্গত।

২। **লিডাম** ৬, ৩০, ২০০—সূঁচ, কাটা, পেরেক, পিন প্রভৃতি ফুটে গেলে—সেটি বের করে আরোগ্য লাভের জন্য।

৩। **ক্যালেণ্ডুলা** θ, ৩, ৬, ২০০— কোন স্থান কেটে গেলে—ঐ স্থান সেলাই করে এই ওষুধটি খাওয়াতে হবে।

৪। **আর্টিমিসিয়া** ৩, ৬, ৩০—চোখে আঘাত লাগলে।

৫। **ভার্বেনা** θ—আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেঁতলে গিয়ে রক্ত জমাট বাঁধলে।

৬। **কোনিয়াম** ২০০, ১০০০—পড়ে গিয়ে আঘাত লাগলে বা আঘাতের ফলে কোনো স্থান দীর্ঘদিন ফুলে থাকলে।

## অস্থির স্থানচ্যুতি

কোনো কারণে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে অস্থি বা হাড়ের স্থানচ্যুতি, ঘটলে—ঐ ধরনের অবস্থাকে অস্থির স্থানচ্যুতি আখ্যা দেওয়া হয়।

### প্রাথমিক পরিচর্যা

স্থানচ্যুত অস্থিকে যথাস্থানে বসিয়ে প্রথমে ব্যাণ্ডেজ করতে হবে; তবে যিনি

স্থানচ্যুত অস্থিকে যথাস্থানে বসাবেন—হাড়ের গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে তার **সঠিক জ্ঞান** থাকা আবশ্যক। অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা হাড় যথাস্থানে বসিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট** ৬—প্রথমে খাওয়াতে হবে।

২। **আর্নিকা** ৩০—বেদনা থাকলে ২।৩ ঘণ্টা পর পর আর্নিকা সেবন করানো সঙ্গত। এতে ব্যথার উপশম হয়।

## অস্থিভঙ্গ

কোনো কারণে হাড় ভেঙে গেলে প্রথমে সেই স্থানটি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা **ব্যাণ্ডেজ** করে নিতে হবে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **সিম্ফটাইম** ৩—এটি খাওয়ালে ভাঙা অস্থি জোড়া লাগে।

২। **ক্যাল্কেরিয়া ফস্** ৩, ২০০—বহুদিন পূর্বে হাড় ভেঙেছে, অথচ জোড়া লাগছে না—এরূপক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

## পোড়া ঘা চিকিৎসা

১। **ক্যান্থারিস θ**, ৩, ৬, ৩০— কোনো স্থান পুড়ে গেলে—তৎক্ষণাৎ এই ওষুধটির মূল আরক (θ) ২ ড্রাম পরিমাণ ২ আউন্স জল সহ মিশ্রিত করে ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে দগ্ধ স্থানে লাগাতে হবে।

২। **ইচিনেসিয়া θ**, ৩, ৬, ৩০—টিস্যু পুড়ে নষ্ট হলে এই ওষুধটির মাদার টিংচার দগ্ধ স্থানে লাগাতে হবে—এবং ৩০ শক্তি ওষুধ খাওয়াতে হবে।

৩। **আর্সেনিক** ৩০, ২০০—আগুনে পুড়ে কালো রঙের ফোস্কা পড়লে এবং তৎসহ তীব্র পিপাসা সূচিত হলে—এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

৪। **অ্যাসিড কার্বলিক θ**, ৩, ৬, ৩০, ২০০— পোড়া ঘা থেকে দুর্গন্ধ বেরুতে থাকলে—১ আউন্স পরিমাণ গ্লিসারিন বা অলিভ অয়েল বা ভেসলিনের মধ্যে ১৫।২০ ফোঁটা কার্বলিক অ্যাসিড মিশ্রিত করে ক্ষতস্থানে লাগাতে হবে এবং ৩০ বা ২০০ শক্তি যুক্ত ওষুধ খাওয়াতে হবে।

৫। **কস্টিকাম** ২০০—পোড়া ঘা শুকিয়ে যাওয়ার পর ক্ষতস্থানের দাগ মিলিয়ে দেবার জন্য প্রয়োগ করা হয়।

## সর্পদংশন

গরুর পায়ে সাপ দংশন করলে দষ্ট স্থানের উপরে প্রথমে পর পর তিনটি তাগা বাঁধতে হবে। বাঁধনগুলো বিশেষ শক্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু পা ছাড়া অন্যস্থানে সাপে দংশন করলে—দষ্ট স্থানটি চাকু দ্বারা দুই ইঞ্চি পরিমাণ গভীর করে চিরে নিয়ে ঐ স্থানে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত জল—বারবার স্প্রে করতে হবে; তৎপরে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **লিডাম ৬**—প্রাথমিক পর্যায়ে এই ওষুধটি প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

২। **আর্সেনিক ৩০**—দ্রুত অবসাদ তথা মূর্ছা-পতন ভাবযুক্ত অবস্থায় এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে।

৩। **অ্যাসিড হাইড্রো ৩০**— কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর খাওয়ালেও বিষক্রিয়া ব্যাহত হয়ে থাকে।

## কীট পতঙ্গাদির দংশন

শহরাঞ্চলে গো-মোষাদি পালনের জন্য আলাদা খাটালের ব্যবস্থা থাকে। তাছাড়া এদের খাদ্য হিসাবে বাজার থেকে খইল, ভুসি ইত্যাদি এনে দেওয়া হয়ে থাকে।

গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। বিশেষ করে খাদ্যের জন্য গো-মোষাদিকে বনে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সব বনে-জঙ্গলে নানা প্রকার কীটপতঙ্গাদির বাসা থাকে; যেমন—ভীমরুল, বোলতা, মৌমাছি, ইঁদুর প্রভৃতি। এই সব কীটপতঙ্গাদি দংশন করলে কোনোমতেই অবহেলা না করে তার উপযুক্ত চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **লিডাম ৩০**—কীটপতঙ্গাদিব দংশনে একটি অব্যর্থ ওষুধ।

২। **এপিস ৩০**—দষ্ট স্থানটি অত্যন্ত ফুলে গেলে।

৩। **অ্যাসিড কার্বলিক ৩০**—মৌমাছির দংশন জনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিশেষ উপকারী।

# হোমিওপ্যাথিতে গর্ভবতী গাভীর যাবতীয় রোগ চিকিৎসা

## গর্ভের লক্ষণ

গর্ভসঞ্চাব হলে গাভীর শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল হয়, যোনিমুখ স্ফীত হয়, চলার সময় থল থল করে, পেটটি ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকে, গাভীর পালান ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। স্তনেব বাঁটে চালের কুঁড়ার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার পদার্থ জমে—বাঁটে হাত দিলে সেগুলো হাতে লাগে। গর্ভবতী গাভীর দুধ গাঢ় আঠার মতো হয়। গর্ভের প্রথম অবস্থায় গাভীর স্বভাবটি উদ্ধত ধরনের হয়—পরে মাসের পর মাস পার হতে হতে ক্রমে স্বভাবটি শান্ত হয়।

## গাভীর শোথ রোগ

১। **এপিস ৩০, ২০০**—শোথ রোগের বিশেষ ওষুধ। অল্প অল্প প্রস্রাব তথা পিপাসা না থাকলে এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

২। **অ্যাসেটিক অ্যাসিড ৩, ৩০**—প্রবল তৃষ্ণা সহ যে-কোন শোথ রোগে এটি প্রযোজ্য।

৩। **লাইকো ৩০, ২০০**—প্রস্রাব লাল এবং কোষ্ঠবদ্ধতা সূচিত হলে।

৪। **সালফার ২০০, ১০০০**—অন্য ওষুধে উপকাব না পাওয়া গেলে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে।

## গাভীর ন্যাবা (কামলা) রোগ

১। **ক্যামো ২০০**—ন্যাবা রোগেব শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

২। **মার্কসল ৩০, ২০০**—উপরিউক্ত ওষুধে কাজ না হলে এই ওষুধটি প্রয়োগে অবশ্যই সুফল পাওয়া যায়।

## গর্ভিণী গাভীর কোষ্ঠবদ্ধতা

১। **কলিনসোনিয়া ৩০x**—গাভীর গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা সূচিত হলে ১০ ফোঁটা মাত্রায খাওযাতে হবে। এই ওধুটি কোষ্ঠবদ্ধতার একটি বিশিষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ।

## গর্ভিণী গাভীর কাশি

গর্ভাবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে গাভীর শুষ্ক ও কষ্টকর কাসি হযে থাকে।

১। **অ্যাকোনাইট ৩০, ২০০**—কাশির প্রথমাবস্থায় প্রয়োজ্য। শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লেগে কাশি হলে—এই ওষুধটিতে বিশেষ উপকাব পাওযা যায।

২। **নাক্সভমিকা ৩০, ২০০**—উগ্র স্বভাবযুক্ত গাভীর কাশিতে এই ওষুধটি বিশেষ কার্যকর।

## গর্ভস্রাবের পূর্ব চিকিৎসা

গর্ভ সঞ্চারের সময় হতে শুরু করে ছয় মাসের মধ্যে গাভীব পেট থেকে ভ্রূণ বা বাছুর নির্গত হওয়াকে গর্ভস্রাব আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। সাত-আট মাসের মধ্যে প্রসব হলে অকাল প্রসব আখ্যা দেওয়া হয়। গর্ভস্রাবের পূর্বে গাভী যন্ত্রণাময় ছটফট করতে থাকে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **স্যাবাইনা ৩x**—গর্ভের প্রথম তিন মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হবার উপক্রম হলে; অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্তস্রাবে প্রযোজ্য।

২। **আর্নিকা ৩০, ২০০**—কোন আঘাত জনিত কারণে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা হলে এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

৩। **সিকেল** ৩০, ২০০—অত্যন্ত রুগ্ন তথা দুর্বল গাভীর গর্ভের চতুর্থ মাসে বা তৎপরবর্তী গর্ভস্রাবের আশঙ্কা দেখা দিলে এটি প্রয়োগ করতে হবে।

৪। **সিপিয়া** ৩০, ২০০—পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবের উপক্রম হলে—এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

## গর্ভস্রাবের পরবর্তী চিকিৎসা

১। **সিকেল** ২০০—ক্ষীণকায়া গাভীর গর্ভস্রাবের পরে এই ওষুধটি প্রযোজ্য। গর্ভস্রাবের পরে জলবৎ রক্তস্রাব হলে এই ওষুধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

২। **পালসেটিলা** ৩০, ২০০—শান্তস্বভাবা গাভীর গর্ভস্রাবের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিশেষ উপকারী।

৩। **চায়না** ৩০, ২০০—গর্ভস্রাব জনিত কারণে গাভীটি অত্যন্ত দুর্বল হলে—এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

## অপ্রকৃত প্রসব বেদনা

**লক্ষণ ঃ** গাভীর পেটে যন্ত্রণা হলে অস্থিরতা প্রকাশ পায় এবং পিছনের পা দিয়ে পেটে লাথি মারে। প্রকৃত প্রসব বেদনার অন্যান্য লক্ষণগুলো বিদ্যমান থাকলেও—অপ্রকৃত প্রসব বেদনায় জরায়ুর মুখ বিস্তৃত হয় না এবং জল ভাঙে না।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **পালসেটিলা** ২০০—অজীর্ণতা জনিত কারণে বেদনা হলে—এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

২। **কলোফাইলাম** θ, ৩, ৬, ৩০, ২০০—অপ্রকৃত প্রসব বেদনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

৩। **অ্যাকটিয়া রেসিমেসো** ৩০—যে সকল গাভী সহজেই উত্তেজিত হয়, সেই সকল গাভীর অপ্রকৃত প্রসব বেদনায় এই ওষুধটি প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

## প্রকৃত প্রসব বেদনা

গর্ভসঞ্চারের ২৮০ দিন থেকে ২৯০ দিনের মধ্যে গাভী প্রসব করে থাকে। প্রসব বেদনা শুরু হলে—গাভীকে কিছু খেতে দিতে হবে এবং সঠিক ওষুধ প্রয়োগে সুখ-প্রসব সম্ভব।

১। **সিমিসিফুগা** ৩০—প্রসবের পূর্বে ২।৪ মাত্রা খাওয়ালে সুখপ্রসব হয়। নিষ্ফল প্রসব বেদনার ক্ষেত্রেও এই ওষুধটি বিশেষ কার্যকর।

২। **নাক্সভমিকা** ৩০, ২০০—পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ তথা প্রসব ইচ্ছায় এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

৩। **পালসেটিলা** ২০০—শান্তস্বভাবা গাভীর প্রসব বেদনায় প্রযোজ্য।

৪। **ক্যামোমিলা ৩০, ২০০**—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক প্রসব বেদনায় এটি প্রয়োগ করলে বেদনার উপশম হয়।

৫। **কলোফাইলাম ৩x ৬, ৩০, ২০০**—জরায়ুর মুখ দৃঢ় এবং শক্ত দৃষ্ট হলে এই ওষুধটি প্রয়োজ্য।

৬। **সিকেল ৩০, ২০০**—দীর্ঘক্ষণ প্রসব বেদনা চলছে—কিন্তু জরায়ুর মুখ খুলছে না—এরূপ ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

৭। **জেলসিমিয়াম ৩০, ২০০**—প্রথমে গাভীর প্রসব বেদনা ছিল, বর্তমানে নাই—জরায়ু থেকে বাচ্চা বের হবার প্রচেষ্টাও নাই—এরূপ ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও অবসন্নতা দৃষ্টে প্রযোজ্য।

## প্রসবের পরবর্তী পর্যায়ে গর্ভিণী গাভী এবং স্ত্রী-মোষের বিভিন্ন রোগাদি

### ফুল না পড়া

বাছুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ১ ঘণ্টার মধ্যে ফুল না পড়লে বিপদের আশঙ্কা থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ ওষুধ ব্যবহার করা কর্তব্য।

১। **আর্নিকা ৩০, ২০০**— ফুল পড়তে বিলম্ব হলে সর্বপ্রথমে প্রযোজ্য।

২। **চায়না ৩০, ২০০**—রক্তস্রাবজনিত কাবণে ফুল আবদ্ধ হয়ে থাকলে অর্থাৎ রক্তস্রাব হচ্ছে অথচ ফুল পড়ছে না—এরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩। **পালসেটিলা ৩০, ২০০**—ফুল আবদ্ধ হয়ে থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ওষুধটি প্রয়োগ করলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

৪। **সিকেল ২০০**—পালসেটিলা প্রয়োগ করে কাজ না হলে—এই ঔষধটি প্রয়োগ করা বিধেয়। বিশেষ লম্বা তথা শীর্ণকাযা গাভীর ক্ষেত্রে এই ঔষধটি প্রয়োগে বিশেষ সুফল লাভ সম্ভব।

### রক্ত স্রাব

প্রসবের পরে গাভী বা স্ত্রী মোষের স্বল্প স্বল্প রক্তস্রাব হওয়া স্বাভাবিক—কিন্তু যদি অত্যধিক রক্তস্রাব ঘটে, তবে ওষুধ প্রয়োগ আবশ্যক।

১। **ইরিজিরন ৬, ৩০, ২০০**—উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্তস্রাবের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

২। **কলোফাইলাম ৩০, ২০০**—শীঘ্র প্রসবের কারণে জরায়ুর দুর্বলতা জনিত কারণে প্রচুর রক্তস্রাব হলে এটি প্রয়োগ করতে হবে।

৩। **ফসফরাস ৩০, ২০০**—কষ্টকর প্রসবের পবে প্রভূত রক্তস্রাবের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গর্ভিণী গাভীটি যদি রোগা, লম্বা এবং সাদা বর্ণের হয়।

৪। **স্যাবাইনা ৩x, ৬, ৩০**—প্রসবের পরে কালো রঙের স্রাবে।

৫। **আর্নিকা ৩০, ২০০**—কষ্টকর প্রসব তথা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রসব বা আঘাত জনিত প্রসবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

## প্রসবান্তিক স্রাব

প্রসবের পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় কুড়ি দিন যাবৎ জরায়ু থেকে স্বল্পস্বল্প স্রাব হতে থাকে। প্রথম দুদিন যাবৎ ঘোর লাল বর্ণের হয়—পরবর্তী পর্যায়ে স্বল্প সাদাটে ভাব যুক্ত বা পীত আভা যুক্ত স্রাব হতে থাকে। ২০।২১ দিন পরে এই স্রাব আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ২০ দিনের পূর্বেই যদি এই স্রাব হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় বা ২০ দিনের পরেও স্রাব আরও অধিককাল স্থায়ী হয় অথবা এই স্রাবে যদি বিশেষ দুর্গন্ধ থাকে—তবে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট ৬, ৩০, ২০০**—হঠাৎ স্রাব বন্ধ হয়ে গেলে।

২। **সিকেল ৩০, ২০০**—২০ দিনের বেশি আরও অধিককাল স্রাব হ'তে থাকলে।

৩। **পাইরোজেন ২০০, ১০০০**— স্রাবে দুর্গন্ধ থাকলে প্রযোজ্য।

## সূতিকা জ্বর

**লক্ষণ ঃ** প্রাথমিক পর্যায়ে গাভী বা স্ত্রী-মোষ কিছু খেতে চায় না, সামান্য সামান্য খায়, মাথা নিচু করে ঝিমুতে থাকে, স্বল্প প্রস্রাব হয়, মল শক্ত হয়, নাক ও শিং গরম হয়, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস হয়। মুখ দিয়ে লালা পড়ে, সর্ব শরীরে ফোলা ফোলা দাগ দৃষ্ট হয় এবং শীতল ঘাম হয়।

উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে গাভীটি ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মারা যেতে পারে।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **অ্যাকোনাইট ৬, ৩০, ২০০**—প্রথমাবস্থায় প্রযোজ্য; বিশেষ করে অস্থিরতা ও প্রবল পিপাসা বিদ্যমান থাকলে।

২। **বেলেডোনা ৩০, ২০০**—অত্যন্ত জ্বরে এবং বাট স্ফীত হলে।

৩। **পাইরোজেন ২০০, ১০০০**—এই রোগের প্রধান ওষুধ। বিশেষ করে জরায়ু-স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হলে এবং অস্থিরতা বিদ্যমান থাকলে।

৪। **চায়না ৩০, ২০০**—রক্তস্রাব বা উদরাময়ে দুর্বলতার কারণে।

৫। **আর্সেনিক ৩০, ২০০**—ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, জীবনীশক্তির হ্রাস এবং দমবন্ধ অবস্থা সূচিত হলে এবং স্বল্প জলপানের ইচ্ছা প্রকাশে।

৬। **রাসটক্স ৩০, ২০০**—জরায়ু প্রদাহ, দীর্ঘকালব্যাপী স্রাব ও সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণে। বিশেষ করে গাভীটি দাঁড়িয়ে থাকতে অসমর্থ হলে এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

৭। **সালফার** ৩০, ২০০—অন্য কোনো ওষুধে কাজ না হলে—এই ওষুধটি প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

## বাঁটে ঘা

প্রসবের পরবর্তী পর্যায়ে বাঁটে ক্ষত সৃষ্টি হলে—ওষুধ প্রয়োগ বিধেয়। চর্মরোগ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।

**সালফার** ২০০—শুষ্ক একজিমাযুক্ত নোংরা তথা অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন গাভী বা স্ত্রী-মোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

## পালানের প্রদাহ

এই রোগের অপর নাম ধুনকো রোগ। ঠাণ্ডালাগা বা বাছুরের মাথার আঘাতে বা দোহনের দোষে পালানে প্রদাহ সূচিত হয়।

**লক্ষণ** ঃ পালানটি (স্তনের বোঁটা) ফুলে ওঠে এবং শক্ত হয়; পালানে কাউকে হাত লাগাতে দেয় না। এমন কি বাছুরকেও মুখ লাগাতে দেয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পালানে স্ফোটকও দেখা যায়।

### লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-ব্যবস্থা

১। **আর্নিকা** ৩০, ২০০—বাছুরের মাথার আঘাত বা অন্য কোনো কারণে পালানে আঘাত লাগার ফলে প্রদাহের সৃষ্টি হলে এই ওষুধটি বিশেষ উপকারী এবং উৎকৃষ্ট।

২। **অ্যাকোনাইট** ৬, ৩০, ২০০—ঠাণ্ডা লেগে প্রদাহ সৃষ্টিতে বা প্রদাহের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযোজ্য।

৩। **বেলেডোনা** ৩০, ২০০—পালানটি ফোলা, বেদনাযুক্ত এবং লালবর্ণ ধারণ করলে ও পালানে দুধ জমে থাকলে — এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

৪। **মার্কসল** ৩০, ২০০—পালানে ফোঁড়া হতে পারে এরূপ সূচনা দৃষ্ট হলে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে।

৫। **হিপার** ৬x, ৩০, ২০০—পালানে ফোঁড়া হলে—এই ওষুধটি প্রয়োগের দ্বারা বিশেষ সুফল লাভ হয়ে থাকে।

# বাছুরদের নানাবিধ রোগ ও তার প্রতিকার

## সদ্যোজাত বাছুরের মলমূত্র ত্যাগ না হলে

১। **বেলেডোনা** ৩০—যদি বাহ্য এবং প্রস্রাব দুই-ই না হয়—সেক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্রযোজ্য। বেলেডোনাতে উপকার না পাওয়া গেলে 'ওপিয়াম ৩০' প্রয়োগ করা সঙ্গত।

২। **অ্যাকোনাইট** ৩০—বাহ্য হওয়ার পর প্রস্রাব না হলে—এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

## বাছুরের বুকে সাঁই সাঁই শব্দ হলে

১। **ইপিকাক ৩০, ২০০**—যদি বুকে সাঁই সাঁই শব্দ হয় এবং মুখ দিয়ে শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

২। **আর্সেনিক অ্যাল্বাম ২০০**—অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট এবং দুপুরের পরে যদি রোগ-লক্ষণাদি বৃদ্ধি পায়।

## বাছুরের নাভিতে পুঁজ হলে

১। **সাইলিসিয়া ২০০**—পুঁজ পাতলা, রক্তাক্ত তথা দুর্গন্ধ যুক্ত হলে।

২। **সালফার ২০০**— পুঁজের ধরন গাঢ় এবং দুর্গন্ধযুক্ত হলে।

৩। **পালসেটিলা ২০০**—পুঁজে তেমন গন্ধ না থাকলে প্রযোজ্য।

৪। **সোরিনাম ২০০**—অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজস্রাবে প্রযোজ্য।

## বাছুরের উদরাময় হলে

১। **অ্যাকোনাইট ৩০**—প্রথমাবস্থায় ঠাণ্ডা লাগার ফলে উদরাময় হলে এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

২। **ইপিকাক ৩০**—উদরাময় সহ বমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩। **রিউম ৩০**—টক গন্ধ বিশিষ্ট বাহ্য হলে এবং বাছুর যদি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পা ছুড়তে থাকে সে ক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

৪। **মার্ক ভালসিস ৬, ৩০**—কর্দমবৎ বাহ্য তৎসহ পিপাসা থাকলে।

৫। **মার্কসল ২০০**—বাহ্যের সঙ্গে আমের ভাগ বেশী এবং রক্ত মিশ্রিত থাকলে।

৬। **সোরিনাম ২০০**—অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত বাহ্য হলে প্রযোজ্য।

## বাছুরের হ্যারিস বের হলে

গুহ্য তথা সরলান্ত্র বের হওয়ার নাম হ্যারিস বের হওয়া। নিম্নের ব্যবস্থামত এর চিকিৎসা করতে হয়।

১। **অ্যালো ৩০**—এই রোগের প্রধান ওষুধ। বিশেষ করে যদি সরলান্ত্র নির্গত হয়।

২। **পডোফাই ৩০, ২০০**—গুহ্যদ্বার বের হলে।

৩। **অ্যাসিড মিউর ৩০, ২০০**—মূত্রত্যাগ কালে হ্যারিস বের হলে।

## বাছুরের কোষ্ঠকাঠিন্য হলে

১। **ব্রাইওনিয়া ৩০; ২০০**—প্রথমাবস্থায় এই ওষুধটি প্রযোজ্য।

২। **লাইকোপডিয়াম ২০০**—কঠিন মল বহু কষ্টে নির্গত হলে এবং পেটে বায়ু সঞ্চয় জনিত কারণে গড় গড় শব্দ হলে।

৩। **নাক্সভমিকা ৩০, ২০০**— বেদনার জন্য পুনঃ পুনঃ বাহ্যের প্রচেষ্টায়।

৪। **ওপিয়াম ৩০, ২০০**—উদরাময়ের পরে কোষ্ঠকাঠিন্য সূচিত হলে।

৫। **সালফার ২০০, ১০০০**—অপর কোনো ওষুধে কাজ না হলে—সালফার প্রয়োগ সঙ্গত এবং এতে অবশ্যই ফল পাওয়া যায়।

## বাছুরের চক্ষু-প্রদাহ হলে

১। **আর্জেন্ট নাইট্রিকাম ২০০**—বাছুরেব চক্ষু প্রদাহ হলে।

২। **আর্নিকা ৩০, ২০০**—আঘাত জনিত কারণে চক্ষু প্রদাহ হলে তৎপরিবর্তে **ইউফ্রেসিয়া ২০০**।

৩। **বেলেডোনা ৩০**—চোখের পাতা ফুলে গেলে, চোখ লাল হলে এবং মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে রক্ত পড়লে।

৪। **অ্যাকোনাইট ৩০**—ঠাণ্ডা লেগে চক্ষু প্রদাহ সূচিত হলে।

## ধনুষ্টঙ্কার সদৃশ লক্ষণ দৃষ্ট হলে

গো-বৎস ভূমিষ্ঠ হবাব পব ২।১ দিনের মধ্যে রোগলক্ষণাদি প্রকাশ পায়। দুগ্ধ পান করতে পারে না, মাথা ঝুলিয়ে রাখে, ক্রমশঃ ঘাড শক্ত হয়, চোয়াল দু'টি অনড হয় বা ধবে যায়। পবে আর দাঁড়াতে পারে না। আঘাত লাগা বা নাড়ী কাটার দোযে বাছুবেব দেহে ধনুষ্টঙ্কারের বীজ অনুপ্রবেশ কবতে পারে। নিম্ন ব্যবস্থা অনুযায়ী এর চিকিৎসা করতে হয়।

১। **জেলস ৩০**—আক্ষেপ সহ মধ্যে মধ্যে কম্পন এবং চোয়াল যদি এপাশে ওপাশে নড়তে থাকে।

২। **আর্নিকা ৩০, ২০০**—আঘাত জনিত কারণে ধনুষ্টঙ্কার হলে। **আর্নিকায় উপকার না পাওয়া গেলে "হাইপেরিকাম ২০০" প্রযোজ্য।**

৩। **বেলেডোনা ৩০, ২০০**—নাভি-প্রদাহ জনিত কাবণে প্রযোজ্য।

## গরু-মোষের কৃত্রিম প্রজননকেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গের জেলায়, মহকুমায়, ব্লকে তথা থানার কোথায় কোথায় পশু-চিকিৎসালয় এবং কৃত্রিম প্রজননকেন্দ্র আছে, ঠিকানাসহ নিম্নে দেওয়া হলো। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কেবলমাত্র কৃত্রিম প্রজননকেন্দ্রে (Artificial Insemination Centre) গরম গরুদের কৃত্রিমভাবে প্রজনন করা হতো, কিন্তু আজকাল সব ধরনের পশুচিকিৎসালয়ে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা আছে।

### জেলা ঃ নদীয়া

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ১। হরিণঘাটা পশু-চিকিৎসালয় | হরিণঘাটা | নদীয়া |
| ২। চাকদা পশু-চিকিৎসালয় | চাকদা | নদীয়া |
| ৩। চাকদা শহর পশু-চিকিৎসালয় | চাকদা | নদীয়া |
| ৪। রাণাঘাট শহর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র, আইমতলা | রাণাঘাট | নদীয়া |
| ৫। রাণাঘাট পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র, রাণাঘাট ১ | হবিবপুর | নদীয়া |
| ৬। রাণাঘাট পশু-চিকিৎসা কেন্দ্র, রাণাঘাট ২ | রাণাঘাট | নদীয়া |
| ৭। শান্তিপুর পশু-চিকিৎসালয় | ফুলিয়া | নদীয়া |
| ৮। শান্তিপুর শহর পশু-চিকিৎসালয় | শান্তিপুর | নদীয়া |
| ৯। কৃষ্ণনগর শহর পশু-চিকিৎসালয় | কৃষ্ণনগর | নদীয়া |
| ১০। কৃষ্ণনগর পশু-চিকিৎসালয় | ঘূর্ণি | নদীয়া |
| ১১। ধুবুলিয়া কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | ধুবুলিয়া | নদীয়া |
| ১২। চাপড়া কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | চাপড়া | নদীয়া |
| ১৩। চাপড়া পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | চাপড়া | নদীয়া |
| ১৪। বেথুয়াডহরী পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | বেথুয়াডহরী | নদীয়া |
| ১৫। বেথুয়াডহরী কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | বেথুয়াডহরী | নদীয়া |
| ১৬। পলাশী কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | পলাশী | নদীয়া |
| ১৭। পলাশী পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | পলাশী | নদীয়া |
| ১৮। করিমপুর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | করিমপুর | নদীয়া |
| ১৯। করিমপুর কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | করিমপুর | নদীয়া |

### জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ২০। ভরতপুর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | ভরতপুর | মুর্শিদাবাদ |
| ২১। নওদা ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | নওদা | মুর্শিদাবাদ |

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ২২। নওদা কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | নওদা | মুর্শিদাবাদ |
| ২৩। বেলডাঙ্গা কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | বেলডাঙ্গা | মুর্শিদাবাদ |
| ২৪। বেলডাঙ্গা ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | বেলডাঙ্গা | মুর্শিদাবাদ |
| ২৫। কান্দী মহকুমা পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | কান্দী | মুর্শিদাবাদ |
| ২৬। কান্দী সহকারী পশুপালক আধিকারিক | কান্দী | মুর্শিদাবাদ |
| ২৭। বহরমপুর শহর পশু-চিকিৎসালয় | বহরমপুর | মুর্শিদাবাদ |
| ২৮। বহরমপুর কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | বহরমপুর | মুর্শিদাবাদ |
| ২৯। জেলা পশুপালন আধিকারিক | বহরমপুর | মুর্শিদাবাদ |
| ৩০। লালবাগ শহর পশু চিকিৎসালয় | লালবাগ | মুর্শিদাবাদ |
| ৩১। মুর্শিদাবাদ ব্লক পশু চিকিৎসালয় | মুর্শিদাবাদ | মুর্শিদাবাদ |
| ৩২। জিয়াগঞ্জ কৃত্রিম ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | জিয়াগঞ্জ | মুর্শিদাবাদ |
| ৩৩। জিয়াগঞ্জ কৃত্রিম গো প্রজনন কেন্দ্র | জিয়াগঞ্জ | মুর্শিদাবাদ |
| ৩৪। ভগবানগোলা কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | ভগবানগোলা | মুর্শিদাবাদ |
| ৩৫। ভগবানগোলা ব্লক চিকিৎসালয় কেন্দ্র | ভগবানগোলা | মুর্শিদাবাদ |
| ৩৬। লালগোলা ব্লক চিকিৎসালয় কেন্দ্র | লালগোলা | মুর্শিদাবাদ |
| ৩৭। লালগোলা কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | লালগোলা | মুর্শিদাবাদ |
| ৩৮। জঙ্গীপুর শহর পশু চিকিৎসালয় | জঙ্গীপুর | মুর্শিদাবাদ |
| ৩৯। সুতি ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র সুতি-১ | নিমতিতা | মুর্শিদাবাদ |
| ৪০। সুতি ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র সুতি-২ | সজনীপাড়া | মুর্শিদাবাদ |
| ৪১। সমশেরগঞ্জ ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | সমশেরগঞ্জ | মুর্শিদাবাদ |
| ৪২। নিমতিতা ব্লক পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্র | নিমতিতা | মুর্শিদাবাদ |
| ৪৩। ফারাক্কা ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | ফারাক্কা | মুর্শিদাবাদ |

## জেলা ঃ মেদিনীপুর

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ৪৪। কাঁথি ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | কাঁথি | মেদিনীপুর |
| ৪৫। এগরা ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | এগরা | মেদিনীপুর |
| ৪৬। পটাশপুর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | পটাশপুর | মেদিনীপুর |
| ৪৭। সুতাহাটা পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | সুতাহাটা | মেদিনীপুর |
| ৪৮। ভগবানপুর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | ভগবানপুর | মেদিনীপুর |
| ৪৯। গোপীবল্লভপুর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | গোপীবল্লভপুর | মেদিনীপুর |

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ৫০। নারায়ণগঞ্জ পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | নারায়ণগঞ্জ | মেদিনীপুর |
| ৫১। ময়না পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | ময়না | মেদিনীপুর |
| ৫২। মহিষাদল পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | মহিষাদল | মেদিনীপুর |
| ৫৩। খড়্গপুর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | খড়্গপুর | মেদিনীপুর |
| ৫৪। তমলুক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | তমলুক | মেদিনীপুর |
| ৫৫। ঝাড়গ্রাম শহর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | ঝাড়গ্রাম | মেদিনীপুর |
| ৫৬। ঝাড়গ্রাম ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | ঝাড়গ্রাম | মেদিনীপুর |
| ৫৭। মেদিনীপুর শহর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | মেদিনীপুর | মেদিনীপুব |
| ৫৮। পাঁশকুড়া ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | পাঁশকুড়া | মেদিনীপুব |
| ৫৯। কেশপুর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | কেশপুর | মেদিনীপুর |
| ৬০। ঘাটাল শহর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | ঘাটাল | মেদিনীপুর |
| ৬১। চন্দ্রকোণা ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | চন্দ্রকোণা | মেদিনীপুর |
| ৬২। গড়বেতা পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | গড়বেতা | মেদিনীপুর |

## জেলা ঃ হাওড়া

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ৬৩। উলুবেড়িয়া শহর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | উলুবেড়িয়া | হাওড়া |
| ৬৪। বাগনান ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | বাগনান | হাওড়া |
| ৬৫। আমতা ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | আমতা | হাওড়া |
| ৬৬। জয়পুর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | জয়পুর | হাওড়া |
| ৬৭। নিশ্চিন্তপুর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | নিশ্চিন্তপুর | হাওড়া |
| ৬৮। ঘোলা পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | ঘোলা | হাওড়া |
| ৬৯। সিঙ্গটী পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | সিঙ্গটী | হাওড়া |
| ৭০। উদয়নারায়ণপুর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | উদযনারায়ণপুব | হাওড়া |

## জেলা ঃ বর্ধমান

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ৭১। জামালপুর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | জামালপুর | বর্ধমান |
| ৭২। রায়না ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | রায়না | বর্ধমান |
| ৭৩। খণ্ডকোষ ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | খণ্ডঘোষ | বর্ধমান |
| ৭৪। মেমারি ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | মেমারি | বর্ধমান |

| | চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|---|
| ৭৫। | মেমারি কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | মেমারি | বর্ধমান |
| ৭৬। | কালনা কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | কালনা | বর্ধমান |
| ৭৭। | কালনা শহর পশু-চিকিৎসালয় | কালনা | বর্ধমান |
| ৭৮। | কালনা ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | কালনা | বর্ধমান |
| ৭৯। | ধাত্রীগ্রাম ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | ধাত্রীগ্রাম | বর্ধমান |
| ৮০। | সাতগাছিয়া কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | সাতগাছিয়া | বর্ধমান |
| ৮১। | বর্ধমান শহর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | বর্ধমান | বর্ধমান |
| ৮২। | বর্ধমান কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র, কালনা রোড | বর্ধমান | বর্ধমান |
| ৮৩। | রাণীবাঁধ ব্লক পশু-চিকিৎসালয কেন্দ্র | রাণীবাঁধ | বর্ধমান |
| ৮৪। | গলসী ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | গলসী | বর্ধমান |
| ৮৫। | ভাতার ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | ভাতার | বর্ধনাম |
| ৮৬। | মন্তেশ্বর পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্র | মন্তেশ্বব | বর্ধমান |
| ৮৭। | দুর্গাপুর শহর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | দুর্গাপুর-১ | বর্ধমান |
| ৮৮। | আউসগ্রাম ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | আউসগ্রাম | বর্ধমান |
| ৮৯। | মঙ্গলকোট পশু-চিকিৎসালয কেন্দ্র | মঙ্গলকোট | বর্ধমান |
| ৯০। | কাটোয়া শহর পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্র | কাটোয়া | বর্ধমান |
| ৯১। | কাটোয়া কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | কাটোয়া | বর্ধমান |
| ৯২। | অণ্ডাল শহর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | অণ্ডাল | বর্ধমান |
| ৯৩। | আসানসোল শহর পশু-চিকিৎসালয কেন্দ্র | আসানসোল | বর্ধমান |
| ৯৪। | আসানসোল শহর পশুপালন আধিকাবিক | আসানসোল | বর্ধমান |
| ৯৫। | রামনগর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় আধিকাবিক | রামনগব | বর্ধমান |
| ৯৬। | চিত্তরঞ্জন শহর পশু-চিকিৎসালয় | চিত্তরঞ্জন | বর্ধমান |

## জেলা ঃ হুগলী

| | চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|---|
| ৯৭। | খানাকুল ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | আরামবাগ | হুগলী |
| ৯৮। | আরামবাগ শহর পশু-চিকিৎসালয় | আরামবাগ | হুগলী |
| ৯৯। | গোঘাট ব্লক পশু চিকিৎসালয় | গোঘাট | হুগলী |
| ১০০। | জঙ্গীপুর পশু-চিকিৎসালয় | জঙ্গীপুর | হুগলী |
| ১০১। | তারকেশ্বর পশু চিকিৎসালয় | তারকেশ্বর | হুগলী |
| ১০২। | তারকেশ্বর কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | বালিগুড়ি | হুগলী |

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ১০৩। হরিপাল কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | হরিপাল | হুগলী |
| ১০৪। হরিপাল ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | হরিপাল | হুগলী |
| ১০৫। নালিকুল ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | নালিকুল | হুগলী |
| ১০৬। সিঙ্গুর কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | সিঙ্গুর | হুগলী |
| ১০৭। সিঙ্গুর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | সিঙ্গুর | হুগলী |
| ১০৮। ভাণ্ডারহাট ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | ভাণ্ডারহাট | হুগলী |
| ১০৯। বেলমুড়ি ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | বেলমুড়ি | হুগলী |
| ১১০। ধনিয়াখালি ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | ধনিয়াখালি | হুগলী |
| ১১১। চণ্ডীতলা ব্লক পশু চিকিৎসালয় | চণ্ডীতলা | হুগলী |
| ১১২। পোলবা ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | পোলবা | হুগলী |
| ১১৩। ডানকুনি শহর পশু চিকিৎসালয় | ডানকুনি | হুগলী |
| ১১৪। শ্রীরামপুর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | শ্রীরামপুর | হুগলী |
| ১১৫। সেওড়াফুলি ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | সেওড়াফুলি | হুগলী |
| ১১৬। বৈদ্যবাটী ব্লক পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | বৈদ্যবাটী | হুগলী |
| ১১৭। ভদ্রেশ্বর শহর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | ভদ্রেশ্বর | হুগলী |
| ১১৮। চুঁচুড়া শহর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | চুঁচুড়া | হুগলী |
| ১১৯। চন্দননগর শহর পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্র | চন্দননগর | হুগলী |
| ১২০। চন্দননগর কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | চন্দননগর | হুগলী |
| ১২১। ব্যাণ্ডেল শহর পশু-চিকিৎসালয় | ব্যাণ্ডেল | হুগলী |
| ১২২। পাণ্ডুয়া ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | পাণ্ডুয়া | হুগলী |
| ১২৩। ত্রিবেণী ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | ত্রিবেণী | হুগলী |
| ১২৪। গুপ্তিপাড়া ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | গুপ্তিপাড়া | হুগলী |

## জেলা ঃ বাঁকুড়া

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ১২৫। রাণীবাঁধ ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | রাণীবাঁধ | বাঁকুড়া |
| ১২৬। বিষ্ণুপুর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | বিষ্ণুপুর | বাঁকুড়া |
| ১২৭। বিষ্ণুপুর কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | বিষ্ণুপুর | বাঁকুড়া |
| ১২৮। সোনামুখী কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | সোনামুখী | বাঁকুড়া |
| ১২৯। সোনামুখী ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | সোনামুখী | বাঁকুড়া |
| ১৩০। বাঁকুড়া শহর পশু-চিকিৎসালয় | বাঁকুড়া | বাঁকুড়া |

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ১৩১। বাঁকুড়া কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | বাঁকুড়া | বাঁকুড়া |
| ১৩২। পাত্রসায়ের ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | পাত্রসায়ের | বাঁকুড়া |
| ১৩৩। গঙ্গাজলঘাটি কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | গঙ্গাজলঘাটি | বাঁকুড়া |
| ১৩৪। শালতোড়া কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | শালতোড়া | বাঁকুড়া |

## জেলা ঃ বীরভূম

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ১৩৫। বোলপুর শহর পশু-চিকিৎসালয় | বোলপুর | বীরভূম |
| ১৩৬। বোলপুর কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | বোলপুর | বীরভূম |
| ১৩৭। ইলামবাজার গো-প্রজনন কেন্দ্র | ইলামবাজাব | বীরভূম |
| ১৩৮। দুবরাজপুর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | দুবরাজপুর | বীরভূম |
| ১৩৯। বক্রেশ্বব ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | বক্রেশ্বর | বীরভূম |
| ১৪০। সিউড়ি শহর পশু-চিকিৎসালয় | সিউড়ি | বীরভূম |
| ১৪১। সিউড়ি কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | সিউড়ি | বীরভূম |
| ১৪২। সিউড়ি জেলা পশু-চিকিৎসালয় | সিউড়ি | বীরভূম |
| ১৪৩। সাঁইথিয়া শহর পশু-চিকিৎসালয় | সিউড়ি | বীরভূম |
| ১৪৪। সাঁইথিয়া কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | সিউড়ি | বীরভূম |
| ১৪৫। মহম্মদ বাজার গো-প্রজনন কেন্দ্র | মহম্মদ বাজার | বীবভূম |
| ১৪৬। মহম্মদ বাজার ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | মহম্মদ বাজার | বীরভূম |
| ১৪৭। রামপুবহাট শহর পশু-চিকিৎসালয় | রামপুরহাট | বীরভূম |
| ১৪৮। রামপুরহাট কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | রামপুরহাট | বীরভূম |
| ১৪৯। নলহাটি কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | নলহাটি | বীরভূম |
| ১৫০। নলহাটি শহর পশু-চিকিৎসালয় | নলহাটি | বীরভূম |
| ১৫১। লোহাপুর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | লোহাপুর | বীরভূম |
| ১৫২। মুরারই ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | মুরারই | বীরভূম |

## জেলা ঃ ২৪-পরগনা

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ১৫৩। সাগর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | সাগর | ২৪ পরগনা |
| ১৫৪। কাকদ্বীপ পশু-চিকিৎসালয় | কাকদ্বীপ | ২৪ পরগনা |
| ১৫৫। কুলপী পশু-চিকিৎসালয় | কুলপী | ২৪ পরগনা |

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ১৫৬। ডায়মণ্ডহারবার পশু-চিকিৎসালয় | ডায়মণ্ডহারবার | ২৪ পরগনা |
| ১৫৭। লক্ষ্মীকান্তপুর ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | লক্ষ্মীকান্তপুর | ২৪ পরগনা |
| ১৫৮। গোসাবা ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | গোসাবা | ২৪ পরগনা |
| ১৫৯। মগরাহাট ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | মগরাহাট | ২৪ পরগনা |
| ১৬০। জয়নগর-মজিলপুর ব্লক চিকিৎসালয় | জয়নগর | ২৪ পরগনা |
| ১৬১। বিষ্ণুপুর ব্লক চিকিৎসালয় | বিষ্ণুপুর | ২৪ পরগনা |
| ১৬২। সন্দেশখালি ব্লক চিকিৎসালয় | সন্দেশখালি | ২৪ পরগনা |
| ১৬৩। বজবজ শহর ব্লক চিকিৎসালয় | বজবজ | ২৪ পরগনা |
| ১৬৪। সোনারপুর ব্লক চিকিৎসালয় | সোনারপুর | ২৪ পরগনা |
| ১৬৫। আলিপুর শহর ব্লক চিকিৎসালয় | আলিপুর | ২৪ পরগনা |
| ১৬৬। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | হিঙ্গলগঞ্জ | ২৪ পরগনা |
| ১৬৭। ভাঙড় ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | ভাঙড় | ২৪ পরগনা |
| ১৬৮। হাসনাবাদ ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | হাসনাবাদ | ২৪ পরগনা |
| ১৬৯। হাড়োয়া ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | হাড়োয়া | ২৪ পরগনা |
| ১৭০। বসিরহাট ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | বসিরহাট | ২৪ পরগনা |
| ১৭১। বসিরহাট কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | বসিরহাট | ২৪ পরগনা |
| ১৭২। টাকি শহর পশু-চিকিৎসালয় | টাকি | ২৪ পরগনা |
| ১৭৩। বারাসত পশু-চিকিৎসালয় | বারাসাত | ২৪ পরগনা |
| ১৭৪। বারাসাত কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | বারাসাত | ২৪ পরগনা |
| ১৭৫। দেগঙ্গা কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | দেগঙ্গা | ২৪ পরগনা |
| ১৭৬। দেগঙ্গা পশু-চিকিৎসালয় | দেগঙ্গা | ২৪ পরগনা |
| ১৭৭। ব্যারাকপুর শহর পশু-চিকিৎসালয় | ব্যারাকপুর | ২৪ পরগনা |
| ১৭৮। বাদুড়িয়া ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | বাদুরিয়া | ২৪ পরগনা |
| ১৭৯। বাদুড়িয়া কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্রে | বাদুড়িয়া | ২৪ পরগনা |
| ১৮০। হাবড়া কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | হাবডা | ২৪ পরগনা |
| ১৮১। নৈহাটি শহর পশু-চিকিৎসালয় | নৈহাটি | ২৪ পরগনা |
| ১৮২। গাইঘাটা ব্লক পশু চিকিৎসালয় | নৈহাটি | ২৪ পরগনা |
| ১৮৩। চাঁদপাড়া কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | চাঁদপাড়া | ২৪ পরগনা |
| ১৮৪। বনগাঁ ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | বনগাঁ | ২৪ পরগনা |
| ১৮৫। বনগাঁ শহর পশু-চিকিৎসালয় | বনগাঁ | ২৪ পরগনা |
| ১৮৬। বনগাঁ কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | বনগাঁ | ২৪ পরগনা |
| ১৮৭। বাগদা (আশুরিয়াঘাট) গো-প্রজনন কেন্দ্র | আশুরি[illegible]ট | ২[illegible] [illegible]গনা |
| ১৮৮। বাগদা ব্লক. পশু-চিকিৎসালয় | বাগদা | ২৪ পরগনা |

## জেলা ঃ পশ্চিমদিনাজপুর

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ১৮৯। বালুরঘাট শহর পশু-চিকিৎসালয় | বালুরঘাট | পঃ দিনাজপুর |
| ১৯০। বালুবঘাট কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | বালুরঘাট | পঃ দিনাজপুর |
| ১৯১। তাপন ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | তাপন | পঃ দিনাজপুর |
| ১৯২। দেবীকোট পশু-চিকিৎসালয় | দেবীকোট | পঃ দিনাজপুর |
| ১৯৩। বাযগঞ্জ শহর পশু-চিকিৎসালয় | রাযগঞ্জ | পঃ দিনাজপুর |
| ১৯৪। দেউল ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | দেউল | পঃ দিনাজপুব |
| ১৯৫। ফতেপুব ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | ফতেপুব | পঃ দিনাজপুর |
| ১৯৬। ইসলামপুব শহব পশু-চিকিৎসালয | ইসলামপুব | পঃ দিনাজপুব |
| ১৯৭। ইসলামপুব গো-প্রজনন কেন্দ্র | ইসলামপুব | পঃ দিনাজপুব |
| ১৯৮। কিষাণগঞ্জ ব্লক পশু চিকিৎসালয় | কিষাণগঞ্জ | পঃ দিনাজপুব |

## জেলা ঃ মালদহ

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ১৯৯। ইংবেজবাজাব ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | ইংবেজবাজাব | মালদহ |
| ২০০। মালদহ শহব ব্লক পশু-চিকিৎসালয | ইংবেজবাজাব | মালদহ |
| ২০১। মানিকচক ব্লক পশু-চিকিৎসালয | মানিকচক | মালদহ |
| ২০২। মানিকচক ব্লক কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | মানিকচক | মালদহ |
| ২০৩। কালিযাচক ব্লক কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | কালিযাচক | মালদহ |
| ২০৪। হবিশচন্দ্রপুব পশু-চিকিৎসালয | হবিশ্চন্দ্রপুব | মালদহ |

## জেলা ঃ দার্জিলিং

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ২০৫। শিলিগুডি শহব পশু-চিকিৎসালয | শিলিগুডি | দার্জিলিং |
| ২০৬। শিলিগুড়ি কৃত্রিম গো প্রজনন কেন্দ্র | শিলিগুডি | দার্জিলিং |
| ২০৭। কার্সিযাং গো প্রজনন কেন্দ্র | শিলিগুডি | দার্জিলিং |
| ২০৮। দার্জিলিং পশু-চিকিৎসালয | দার্জিলিং | দার্জিলিং |
| ২০৯। দার্জিলিং কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | দার্জিলিং | দার্জিলিং |
| ২১০। কালিম্পং গো-প্রজনন কেন্দ্র | কালিম্পং | দার্জিলিং |
| ২১১। কালিম্পং শহব পশু-চিকিৎসালয় | কালিম্পং | দার্জিলিং |

## জেলা ঃ জলপাইগুড়ি

| চিকিৎসা কেন্দ্র | পোস্ট | জেলা |
|---|---|---|
| ২১২। জলপাইগুড়ি শহর পশু-চিকিৎসালয় | জলপাইগুড়ি | জলপাইগুড়ি |
| ২১৩। জলপাইগুড়ি কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র | জলপাইগুড়ি | জলপাইগুড়ি |
| ২১৪। আলিপুরদুয়াব গো-প্রজনন কেন্দ্র | আলিপুরদুয়ার | জলপাইগুড়ি |
| ২১৫। জলদাপাড়া ব্লক পশু-চিকিৎসালয | জলদাপাড়া | জলপাইগুড়ি |
| ২১৬। কালচিনি ব্লক পশু-চিকিৎসালয় | কালচিনি | জলপাইগুড়ি |

# ছাগল
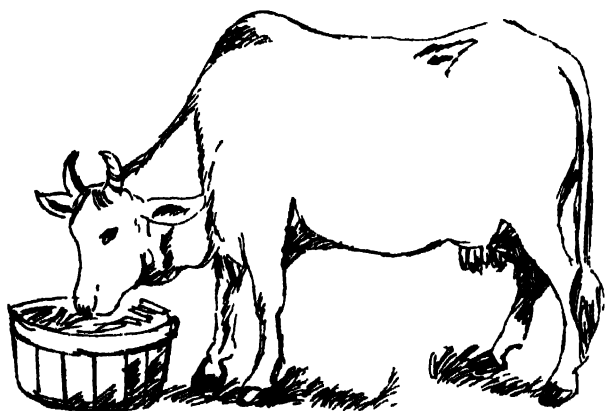
## ছাগল গৃহস্থের ছোট কামধেনু

গরিবের সংসারে যদি কোনো গৃহপালিত পশু পালন করতে হয় তবে সব থেকে আগে নাম করতে হবে ছাগলের। অভাবী মানুষের কাছে ছাগল হচ্ছে ছোট ক'মধেনু। যদি ভালো জাতের ছাগল পালন করা হয় তবে ওদেব খাওয়াতে সামান্য খরচ হবে। কিন্তু কয়েক মাস বাদে লাভ হবে অনেক বেশি। আবার সারাদিন মাঠে ছাগল চরলে এবং গাছের ডালপালা খাওয়াতে পারলে একটি পয়সাও খরচ করতে হয় না। যদি গোটা কুড়ি ছাগল পালন করা যায় তবে গরিবের সংসারে কোনো অভাব থাকে না। কয়েক মাস যাবার পর হাতে কিছু টাকাও জমে যায়।

পশুপালনের মাধ্যমে যাদের রোজগার হয় তাদের কাছে ছাগল হচ্ছে ছোট আকারেব গাই গরু পালনের সমান। সত্যি কথা বলতে কি, গরুর থেকেও ছাগলে লাভ বেশি। গরুর দুধের বিনিময়ে আয় হয়। তার মাংস, চামড়া, লোম, শিং এবং খুব কোনো হিন্দু পালনকারীর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। শত অভাব থাকলেও ধর্মের বিপক্ষে কোনো কাজ করার সাহস হবে না।

অপরদিকে ছাগলের মাংস খাসি অথবা পাঁঠা হিসারে বিক্রি করা যাবে। লোম থেকে ভালো গরমের পোশাক হয় বলে বাজারে ভালো চাহিদা রয়েছে। আবার ছাগলের চামড়ায় জুতো সহ বহু দামী জিনিস তৈরি হয়। সুতরাং সেটাও মূল্যবান। পাঁঠীর দুধও শিশুদের পক্ষে খুবই উপকারী। পেটের রোগীদের পক্ষে ছাগলের দুধ একদিকে ওষুধ আর অন্যদিকে পথ্য। কাজেই পশু সম্পদ হিসাবে অন্য কোনো পশুর সঙ্গে মোটেই তুলনা করা চলে না।

### পালনের উপযোগী বিভিন্ন জাতের ছাগল

আমাদেব দেশে সব জায়গায় আবহাওয়া একই রকম হয় না। কোথাও ঠাণ্ডা বেশি, আবার কোনো জায়গায় অসহ্য গরম। এমন রাজ্যও রয়েছে যেখানে গরম হলেও এমন কিছু বেশি নয়। আবহাওয়া অনুসারে ছাগলের জাত বা শ্রেণীও আলাদা হয়। ভারতের কয়েকটি জায়গায় আবহাওয়া অনুসারে ছাগলকে মোট তিনটি শ্রেণী বা জাতে ভাগ করা হয়। শ্রেণীগুলোর নাম হচ্ছে—(১) হিমালয় দেশীয় জাতের ছাগল, (২) উত্তর ভারতীয় প্রজাতি এবং (৩) পূর্ব অঞ্চলের ছাগল। এদের মধ্যে আরও কিছু ভাগ থাকলেও তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। এবার শ্রেণী বা প্রজাতি অনুসারে আলোচনা করা হচ্ছে।

**(১) হিমালয় দেশীয় শ্রেণীর ছাগল ঃ** নামটা দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে এরা পাহাড়ী এলাকার ছাগল। তবে শীতের সময় যখন তুষারপাত শুরু হয় তখন ওরা অনেকটা নিচের সমতল এলাকায় নেমে আসে। পাহাড়ী অঞ্চলের ছাগল হওয়ার ফলে ওদের দেহের গঠন যেমন মজবুত তেমনি কষ্ট সহ্য করতে পারে।

এই প্রজাতির ছাগলের আবার দুটো ভাগ রয়েছে। একটি হচ্ছে কাশ্মীরী এবং অপরটি গাদদি।

**কাশ্মীরী ঃ** হিমালয় পর্বতমালার অর্থাৎ সারা উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে এদের দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমের কাশ্মীর থেকে শুরু করে পূর্বের তিব্বত অবধি এই প্রজাতির ছাগল পালন করা হয়। খুব বেশি ঠাণ্ডার মধ্যে বাস করে বলে ওদের সারা দেহ লম্বা পশমের মতো লোমে ঢাকা থাকে। লোমের রঙ অধিকাংশ ছাগলের সাদা হয়। তবে কিছু মেটে অথবা তামাটে লোমের রঙও দেখতে পাওয়া যায়।
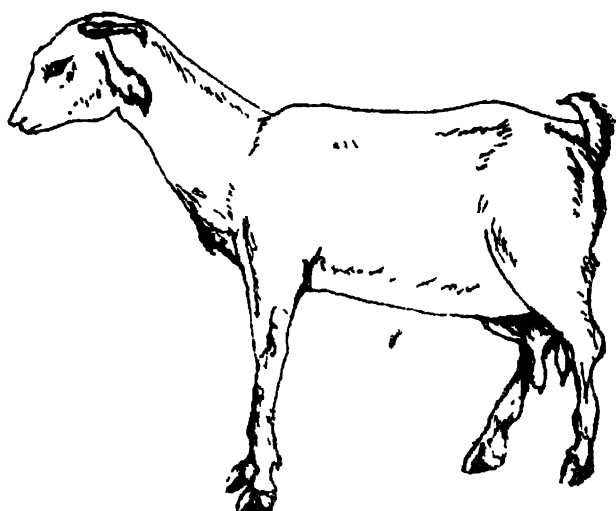
হিমালয় দেশীয় প্রজাতির কাশ্মীরী ছাগল।

একটা কাশ্মীরী ছাগলের দেহের ওজন ৭০ কিলোগ্রাম অবধি হতে পারে। একটি স্ত্রী ছাগল প্রসব করার পর প্রতিদিন ৫০০ মিলিলিটার দুধ দিয়ে থাকে। তবে বেশি দুধ দিলেও এদের দুধ শিশু এবং পেটের রোগীদের পক্ষে বিশেষ উপকারী নয়। কিন্তু দেহের লোম খুবই মূল্যবান এবং কাশ্মীরের কম্বল এদের লোম থেকেই তৈরি করা হয়। রেশমের মতো লোম হবার ফলে বাজারে খুবই ভালো দামে বিক্রি হয়ে থাকে। সমতল অঞ্চলে পালন করা হলে দুধের হার কমে এবং গায়ের লোম তেমন বড় এবং পশমের মতো নরম হয় না। কাজেই সমতল ভূমিতে এবং প্রায় বারো মাসই যেখানে গরম আবহাওয়া থাকে সেখানে কাশ্মীরী ছাগল কেউ পালন করে না।

**গাদদি ঃ** এই জাতের ছাগল হিমাচল প্রদেশের সিমলা উপত্যকায় পালন করা হয়। তবে খুবই কম সংখ্যায়। কাশ্মীরী জাতের ছাগলের মতো প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সময় ওপরের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে অনেকটা নিচে নেমে আসে।

অধিকাংশ ছাগলের শরীরের লোমের রঙটা সাদা। উভয় শিং সরু এবং আগার দিকটা খুবই সূচাল। লোম কাশ্মীরী ছাগলের মতো লম্বা হয় না। আকারে ছোট এবং রেশম যেমন নরম হয় সেইরকম নরম নয়। গাদদি ছাগী রোজ ৫০০ মিলিলিটার পর্যন্ত দুধ দিতে পাবে। এরা সারা বছরে একবার মাত্র বাচ্চা প্রসব করে। দেহের ওজন ৬০ কিলোগ্রাম অবধি হতে পারে।

এদের দেহের গঠন বেশ মজবুত। পাহাড়ী পথে দশ কিলোগ্রাম অবধি ভারী মাল পিঠে বহন করতে পাবে। কচি ঘাস সারাদিন চরে খেলেও রোজ কিছু পরিমাণে দানাশস্য জাতীয় খাদ্য দেওয়া দরকার। সমতল অঞ্চলে গাদদি ছাগল কেউ সহসা পালন করে না। কাবণ গবম আবহাওয়া এদেব মোটেই সহ্য করার ক্ষমতা নেই। এরা কঠিন কয়েকটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হযে পড়ে।

(২) **উত্তর ভারতীয় প্রজাতি ঃ** এই প্রজাতির ছাগল উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা, যমুনা ও চম্বল উপত্যকায় পাওয়া যায়। শ্রেণী হিসাবে আবার এদেব তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। (ক) বারবারি, (খ) বিতাল এবং (গ) যমুনাপিযারী।

**(ক) বারবারি ঃ** দিল্লি, আগ্রা, মথুরা এবং পাঞ্জাবে এই শ্রেণীর ছাগল খুবই বেশি সংখ্যায পালন করা হয। আকারে যেমন বেশি বড হয না আবাব পশ্চিমবঙ্গেব দেশী ছাগলের মতো ছোট হয না। কাজেই বলা চলে মাঝারি গডন বা চেহারা।
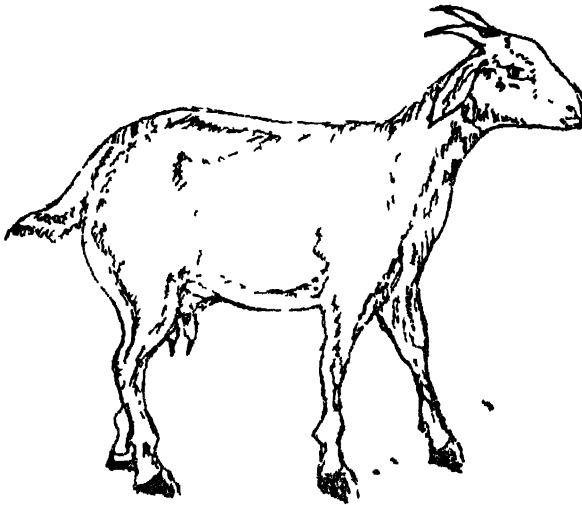
উত্তরপ্রদেশের ছাগল বারবারি। খামারে প্রতিপালন করার পক্ষে [illegible] উপযুক্ত।

বারবারি শ্রেণীর ছাগলের কান দুটি সরু এবং আকারে ছোট। [illegible] হয়ে থাকে। অধিকাংশ ছাগলের [illegible]। [illegible] নানটা বড় আকারের।

এরা বছরে দু'বার বাচ্চা প্রসব করে। একসঙ্গে তিনটে পর্যন্ত হতে পারে। কাজেই বংশ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। সারাদিনে দু'বারে দেড় কেজি অবধি দুধ দিতে পারে। মাঠে-ঘাটে চরতে না পেলেও কোনো ক্ষতি হয় না। দিনরাত একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে রেখেও পালন করা চলে। তবে রোজ পেট ভরে মিশ্র খাদ্য দিতে হবে। মাংসের জন্য পালন করলে বিশেষ লাভজনক হয় না। একমাত্র দুধের জন্য খামারি প্রথায় এদের পালন করা চলে।

**(খ) বিতাল ঃ** পাঞ্জাবেই বিতাল শ্রেণীর ছাগল পালন করতে খুব বেশি দেখা যায়। তবে কিছু সংখ্যায় হরিয়ানাতেও পালন করা হচ্ছে। দেহের গঠন বারবারি শ্রেণীর মতো। কিন্তু আকারে বারবা ের থেকে কিছুটা ছোট হয়। লোমের রঙ লালচে ধরনের।

বছরে এরা দু'বার বাচ্চা প্রসব করে। এক থেকে দু'টি বাচ্চা হতে পারে। এক জায়গায় বেঁধে অথবা মাঠে-ঘাটে চরিয়ে অর্থাৎ দু'ভাবেই এদের পালন করা চলে। তবে যে ভাবেই পালন করা হোক না কেন, এদের মিশ্রখাদ্য অবশ্যই খাওয়াতে হবে নতুবা ওদের শরীর ঠিক থাকবে না। প্রসবের পর একটি ছাগী দেড় কেজি অবধি দুধ দিতে পারে। বিতাল শ্রেণীর ছাগলের মাংস খুবই সুস্বাদু। কাজেই দুধ এবং মাংস এই ' রকম উদ্দেশ্যেই এদের পালন করা চলে।

**(গ) যমুনাপিয়ারী ঃ** এই শ্রেণীর ছাগলকে অনেকে যমুনাপাড়ি বলেও ডাকে। উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয়-যমুনা এবং চম্বল উপত্যকায় খুব বেশি সংখ্যায় এই ছাগল
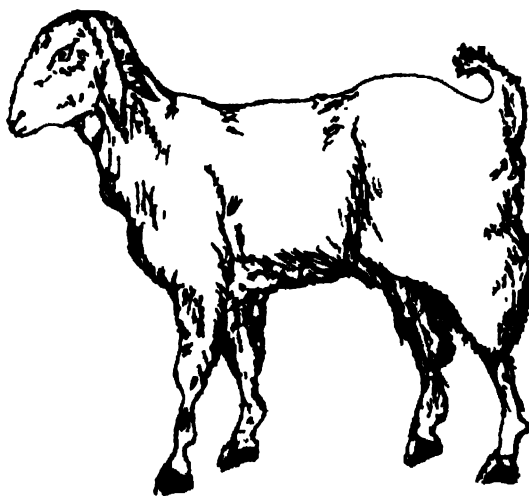
উত্তরপ্রদেশের ছাগল যমুনাপিয়ারী

লোকে পালন করে। পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ জেলায় ভালো জাতের যে কিছু সংখ্যক ছাগল নজরে পড়ে সেগুলো বেনারস এবং এলাহাবাদ থেকে যমুনাপিয়ারী শ্রেণীর ছাগল আমদানি করা। দুধের জন্য এদের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

সাধারণভাবে ছাগলের লোমের রঙ সাদার ওপর কালো ও বাদামী থাকে। পাঁঠার ওজন ৬০ থেকে ৮০ কেজি অবধি হতে পারে। প্রসব করার পর একটি পাঁঠী সারাদিনে দু' বেলায় আড়াই কেজি দুধ দিয়ে থাকে। যমুনাপিয়ারী বা যমুনাপাড়ির দুধ এবং মাংস দুটোই খেতে ভালো। এরা বছরে একবার এবং একটি মাত্র বাচ্চা প্রসব করে।

এদের মুখের গঠন দেখলেই চিনতে পারা যায়। নাকের হাড়টা সামান্য বাঁকা। উভয় কান বেশ লম্বা ও চওড়া ধরনের। সব সময় দুটো কান ঝোলানো অবস্থায় থাকে। প্রসব করার পর সাড়ে আট মাস অবধি একটি পাঁঠী দুধ দিয়ে থাকে।

যমুনাপিয়ারী ছাগল ছাড়া অবস্থায় থাকতে বেশি ভালোবাসে। এই সময় এরা মাঠে-ঘাটে চরে খায়। তবে সারাদিন মাঠে চরে খেলেও আলাদাভাবে এদের মিশ্র খাদ্য দেওয়া দরকার। যদি না দেওয়া হয় তবে দুধের হার কমে যায়। এইভাবে বেশি দিন চললে এদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।

(৩) **পূর্ব অঞ্চলের ছাগল ঃ** এই অঞ্চলের মধ্যে যতগুলো রাজ্য রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যায় পালিত হয় ব্ল্যাক বেঙ্গল শ্রেণীর ছাগল। অনেক জায়গায় আবার বেঙ্গল গোট নামে এই শ্রেণীর ছাগল পরিচিত। উভয় নামই ইংরেজি থেকে এসেছে। তবে পশ্চিমবাংলায় পরিচিত দেশী ছাগল হিসাবে।

**ব্ল্যাক বেঙ্গল বা দেশী ছাগল ঃ** গায়ের লোমের রঙ বহু রকমের হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ কালো রঙের যেমন ছাগল রয়েছে তেমনি লাল ও সাদা লোমের ছাগলও
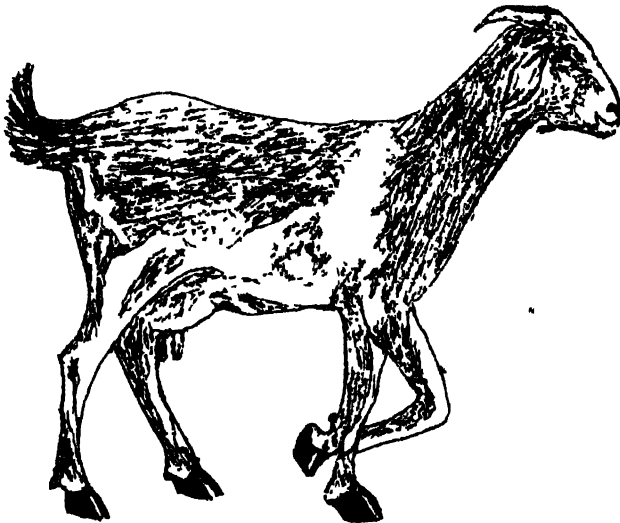
দেশী ছাগল অথবা ব্ল্যাক বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গে বেশি পালিত হয়।

দেখা যায়। এছাড়াও ধূসর বা ছাই, সাদা ও বাদামী মেশানো রঙ, আবার চকলেট ও সাদা রঙেরও ছাগল রয়েছে। আসল কথা হচ্ছে, দেশী ছাগলের গায়ের লোমের রঙ বহু রকমের হতে পারে।

আকারে খুবই ছোট। মুখটা লম্বা ধরনের এবং সরু। দেহের তুলনায় উভয় কান খুবই ছোট। সব সময় খাড়া অবস্থায় থাকে। পাগুলো সরু। পালান যেমন ছোট তেমনি ছোট দুধের বাঁটগুলো।

দেশী পাঁঠী বছরে দ'বার বাচ্চা দিয়ে থাকে। সাধারণভাবে দুটো, তবে অধিকাংশ সময়ে একটি পাঁঠী তিনটি বাচ্চাও প্রসব করে। ফলে খামারে কয়েক বছরের মধ্যে ছাগলের সংখ্যা সাত গুণ অবধি বেড়ে যায়। এই শ্রেণীর পাঁঠীর কাছ থেকে প্রসবের পর খুবই সামান্য পরিমাণে দুধ পাওয়া যায়। তবে দুধ খুবই পুষ্টিকর। পেটের যাবতীয় রোগে ওষুধের মতো কাজ করে। শিশুদের পক্ষে দেশী ছাগলের দুধ খুবই উপকারী। পাঁঠা অথবা খাসীর মাংস পূর্বাঞ্চলের মানুষের কাছে খুবই প্রিয় খাদ্য। মুরগির মতো দেশী ছাগলের মাংস নরম হয়।

দেশী ছাগলের চামড়া খুবই নরম এবং মসৃণ। বিদেশের বাজারে চাহিদা রয়েছে প্রচুর। ভালো দামও পাওয়া যায়। কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা এদের খুবই বেশি। তাছাড়া খাওয়াতে কোন রকম খরচ নেই বললেই চলে। সারাদিন মাঠে-ঘাটে চরতে পেলে আর কিছু খেতে দেবার দরকার হয় না। এদের বিশেষ গুণ হচ্ছে, খাদ্যের বিষয়ে কোন বাছবিচার নেই। দেশী ছাগল মুখের সামনে যা কিছু পাবে তাই খেয়ে ফেলবে। এদের দেহের ওজন কম হলেও পালন করা (কেবলমাত্র মাংসের জন্য) খুবই লাভজনক। যদি সারাদিনে সামান্য পরিমাণে মিশ্র খাদ্য এবং খুদ সিদ্ধ দেওয়া হয় তবে এদের কাছ থেকে সারাদিনে ৫০০ মিলিলিটার বা আরও কিছুটা বেশি পরিমাণে দুধ পাওয়া যাবে। বিগত কয়েক বছর ধরে দেশী পাঁঠী এবং উত্তরপ্রদেশের বারবারি, বিতাল অথবা যমুনাপিয়ারী পাঁঠার সঙ্গে দৈহিক মিলন ঘটিয়ে উন্নত শ্রেণীর বাচ্চা পাওয়া যাচ্ছে। তারা দুধ যেমন বেশি দিতে পারে তেমনি অপরদিকে দেহের ওজন বেশি হওয়াতে মাংসের পরিমাণ বাড়ছে। আর দেশী ছাগলের মাংসের যে সুনাম সেটাও উন্নত মানের ছাগল হলেও বজায় থাকে।

**পাটনাই ছাগল ঃ** সত্যি কথা বলতে কি এই প্রজাতির কোন ছাগল সারা বিহার রাজ্যের মধ্যে নেই। তবে পাটনাই ছাগল নামটি এসেছে বিহারের রাজধানী পাটনা শহরের নাম থেকে। প্রকৃতপক্ষে উত্তরপ্রদেশের যমুনাপিয়ারী শ্রেণীর ছাগলই হলো পাটনাই ছাগল। ঐ রাজ্যের ছাগল বিহারে পালন করা শুরু হয়। দীর্ঘ কয়েক যুগ পার হওয়ার পর আবহাওয়া এবং জলবায়ুর প্রভাবে ছাগলের দেহের আকৃতি, স্বভাব এবং গুণগত মানের কিছু পরিবর্তন ঘটে। ফলে বিহারে পালিত ছাগল ভারতের, বিশেষ করে পূর্ব অঞ্চলে পাটনাই ছাগল হিসাবে পরিচিত হয়। আজও পাটনাই ছাগলের দেহের গঠন যমুনাপিয়ারী ছাগলের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। তবে নাকের হাড়টা যমুনাপিয়ারীর মতো বাঁকা থাকেনি। ধীরে ধীরে প্রায় সোজা হয়ে গেছে।

পাটনাই ছাগল মাংসের জন্য পালন করা হলেও এই শ্রেণীর পাঁঠীর ভারতে পালিত সব প্রজাতির ছাগলের থেকে দুধ দেবার ক্ষমতা অনেক বেশি। পশ্চিমবাংলায় গ্রামাঞ্চলে পালিত সারাদিন চরে খাওয়া একটা দেশী গাভীর থেকেও বেশি দুধ

দেবার শক্তি এদের রয়েছে। সারাদিনে দেড় থেকে তিন কেজি পর্যন্ত দুধ দিতে দেখা যায়। দুধের এই হার বজায় থাকে আবার গর্ভবতী না হওয়া অবধি।
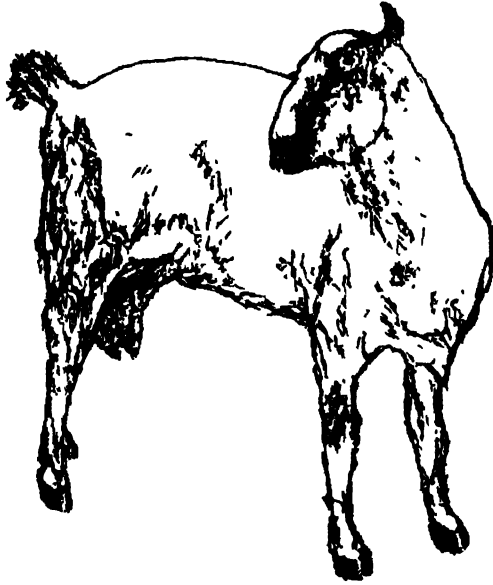
বিহারের পাটনাই ছাগল।

এরা সারা বছরে একবার মাত্র গর্ভধারণ করে। প্রতি বারে একটি করে বাচ্চা প্রসব করে। অবশ্য মাঝে মাঝে দুটো বাচ্চাও প্রসব করতে দেখা যায়। অধিকাংশ ছাগলের লোমের রঙ সবটা লাল। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে লালের সঙ্গে অন্য রঙও মেশানো থাকে।

পাটনাই ছাগল পালন করবার সব থেকে বড় অসুবিধে হচ্ছে, ওরা সারাদিনের মধ্যে মাঠে-ঘাটে কোথাও চরতে চায় না। সুতরাং ওদের মিশ্র খাদ্য এবং কাঁঠাল, অশ্বত্থ, জাম ইত্যাদি গাছের কচি ডালপালা সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন দেওয়া দরকার। গরুকে যেভাবে জাব দেওয়া হয় পাটনাই ছাগলকে ঠিক সেইভাবে জাবও খেতে দেওয়া উচিত। তবে খড়গুলো আধ ইঞ্চি আকারে ছোট করে কাটা দরকার। তার সঙ্গে গমের ভুসি, তিসি অথবা সরষের খোল ভেজানো এবং ডালের খোসা ভেজানো মেখে দিতে হয়। এইভাবে খেতে দিলে পাটনাই পাঁঠী পুনরায় গর্ভধারণ করবার আগে পর্যন্ত একই হারে দুধ দিতে থাকবে।

## ছাগল পালনের কয়েকটি বিষয়

বাড়িতে পালন করবার জন্য যত রকমের জীব রয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র ছাগলই সব থেকে বেশি উৎপাদনক্ষম। কারণ প্রায় সব জাতের ছাগল বছরে দু'বার

এবং দুই থেকে তিনটি করে বাচ্চা প্রসব করে। কাজেই টাকার মূল্যে বিচার করলে এটা যে বেশি লাভজনক সে ব্যাপারে মনে কোন সন্দেহ থাকে না।

ছাগল এমন একটা জীব যে ওদের বিশেষ পরিচর্যা করতে হয় না। আর ব্যবসা শুরু করতে খুব বেশি টাকা-পয়সারও দরকার পড়ে না। একেবারে গরিব মানুষ যারা তারা ঘরের দাওয়াতে এক কোণায়, চৌকি বা খাটিয়ার নিচে অথবা শোবার ঘরের এক পাশে গোটা কতক ছাগল রেখে সহজেই পালন করতে পারে। তবে ছাগলের সংখ্যা বেশি হলে তখন অবশ্য ওদের রাখার জন্য একটা ঘরের প্রয়োজন হয়। ওদের থাকবার ঘর অথবা চালাঘর বাসগৃহের খুব কাছে থাকা দরকার। কারণ রাতে ছাগী, বাচ্চা অথবা খাসী চুরি হবার আশঙ্কা থাকে। সেই কারণে বিকেলে মাঠ-ঘাট থেকে চরে আসার পর ভালোভাবে গুণে খোঁয়াড়ে রাখতে হবে আবার সকালে দরজার তালা খুলে মাঠে চরাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

পুরুষ বাচ্চা যাদের প্রজননের কাজে লাগানো হবে তাদের প্রথম থেকেই আলাদাভাবে পালন করা দরকার। এখন বাকি পুরুষ বাচ্চাদের খাসী করে পালন করলে মাংস হিসাবে ভালো দাম পাওয়া যাবে। পাঁঠী যারা তাদের প্রয়োজন বুঝে সংখ্যা হিসাব করে পালন করা হবে দুধ এবং বংশ বাড়াবার জন্য। বেশি সংখ্যাতে ছাগল পালন করবার জন্য যে তিনটে ভাগে ওদের ভাগ করা হলো তাদের পালন করতে হবে আলাদাভাবে এবং পরিচর্যার ব্যাপারেও (যেমন খাদ্য, মাঠে চরানো ইত্যাদি) বিশেষ ব্যবস্থা পালনকারীকে নিতে হবে। কারণ সঠিকভাবে পালন করতে পারলে লাভের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।

দেশী বাংলার ছাগলকে যদি পাটনাই অথবা যমুনাপিয়ারী পাঁঠার সঙ্গে দৈহিক-মিলন ঘটিয়ে উন্নত মানের বাচ্চা পালন করা হয় তাহলেও খরচ বেশি পড়ে না। সাধারণভাবে ঘাস, লতাপাতা, পরিবারের তরকারির খোসা, ভাতের মাড় এবং ফেলে দেওয়া সব ধরনের সবজি দেশী ছাগল আগ্রহ সহকারে খেয়ে নেবে। সেই কারণে দেশী এবং উন্নতমানের দেশী ছাগল পালন করা মোটেই খরচের ব্যাপার নয়।

## পালনের জন্য উন্নতমানের ছাগল বাছাই করা

দেশী অথবা উত্তর ভারতের যে কোনো শ্রেণীর বা জাতের ছাগল খামার প্রথায় পালন করা হলে তার জন্য কিছু নিয়ম-কানুন মেনে পালন করা দরকার। কারণ ছাগল পালন করা হয় দুধ এবং মাংসের জন্য। যেসব পুরুষ ছাগল মাংসের জন্য বাছাই করা হয়েছে তাদের পালন করা হবে অন্যভাবে। আবার যে পাঁঠী দুধ দেবে এবং বংশ বাড়াবে তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হবে। কাজেই সব কিছু ভালোভাবে দেখে এবং বাছাই করে তবেই খামারে পালন করা উচিত। সেই খামার থেকে পালনকারী সব থেকে বেশি লাভবান হবে। ছাগল নির্বাচন করার জন্য এখানে কয়েকটি বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে। সেগুলো প্রাথমিক ভাবে দেখে নির্বাচন করলে ভবিষ্যতে লোকসানের কোন আশঙ্কা থাকবে না।

(ক) **ছাগলের কাঁধ ঃ** সরু এবং সামান্য লম্বা ধরনের হবে। তবে উভয় দিক থেকে দেখলে সোজা দেখাবে। অনেকটা ঘোড়ার কাঁধ যেমন থাকে। এটা পাঁঠার ক্ষেত্রে ধরা হবে। অপরদিকে পাঁঠী বা ছাগীর ক্ষেত্রে বস্থিদেশ যদি মোটা এবং ফোলা থাকে তবে অবশ্যই ধরে নিতে হবে ছাগী কোন রোগে, বিশেষ করে 'নিমফোমোনিয়া' জনিত রোগে ভুগছে। সুতরাং সেই ছাগীকে অবশ্যই বাতিল করা দরকার। ছাগীর দাবনাতে কোন জায়গা টোল খাওয়া বা বসে যাওয়ার অবস্থায় থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে দাবনা হবে নিটোল ধরনের।

(খ) **বুকের গঠন ঃ** পাঁঠা এবং পাঁঠী উভয়ের বুকের গঠন হবে মাঝারি। সেইসঙ্গে গভীর হওয়া দরকার। তাছাড়া বুক থাকবে চওড়া, আর পাঁজরের গঠন হবে সুঠাম।

(গ) **মুখের উভয় পাটির দাঁত ঃ** ওপর এবং নিচের প্রত্যেকটি দাঁত হবে গঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ। অর্থাৎ সমপ্রকৃতির। কোন দাঁত ক্ষয়ে যাবে না।

(ঘ) **সামনের দুটো পা ঃ** প্রায় জোড়া এবং সোজা অবস্থায় থাকবে। উভয় পাকে বেশ শক্তিশালী বলে মনে হবে। ছাগলের (পাঁঠা ও পাঁঠী) দেহ যেমন লম্বা হবে সেইমতো পা লম্বা থাকবে। এছাড়াও গাঁটগুলো পায়ের উপযোগী বলে মনে হবে।

(ঙ) **পিছনের দুটো পা ঃ** সামনের দুটো পায়ের সঙ্গে সমতা বজায় থাকবে পিছনের দুটো পায়ের। অর্থাৎ সঠিক লম্বা এবং বেশ শক্তিশালী বলে মনে হবে। এটা চোখে দেখে বুঝতে হবে। যদিও সামনের পায়ের থেকে পিছনের পায়ের শক্তি বা জোর কম, তাহলেও পিছনের দুটি পায়ের যথেষ্ট জোর বা বল থাকবে।

(চ) **চার পায়ের খুর ঃ** ছাগল সোজা হয়ে দাঁড়ালে সব খুরগুলো মাটিতে সমানভাবে লেগে থাকবে। সামনের অথবা পেছনের পাতা বা গোড়ালিতে বেশি চাপ পড়বে না। আসল কথা হল, ছাগল সোজাভাবে মাটিতে দাঁড়াবে গোড়ালির ওপর বেশি চাপ বা ভর না দিয়ে।

(ছ) **দেহের গঠন ও বাইরের লাবণ্য ঃ** চমৎকার গঠন, সুন্দর এবং দেহ পেশীবহুল হবে। যখন দাঁড়াবে ছাগলের পিঠের শিরদাঁড়া পুরোটা সোজা অবস্থায় থাকবে। পিছন ও সামনের অংশ সুঠাম হবে। দেহের লোম হবে চকচকে। কোন খসখসে ভাব থাকবে না। শরীরের সব জায়গার লোম চামড়ার সঙ্গে লেপটে থাকবে। আমরা ভালোভাবে মাথায় তেল মেখে স্নান করার পর চুল আঁচড়ালে যেমন চুল সুন্দর দেখায় তেমনি সুন্দর দেখাবে লোম। ছাগল রোদে দাঁড়ালে চক্‌চক্ করবে।

(জ) **বুকের পাঁজর ঃ** বুকের খাঁচা বা পাঁজরের গঠন হবে সমপ্রকৃতির। কোথাও অসমতল বলে মনে হবে না।

(ঝ) **পালান ও দুধের বাঁট ঃ** পালানের কোথাও টোল থাকবে না। দেখে মনে হবে নিটোল মাংসের একটা থলি। হাতের তালুতে পালান রাখলে একটা নরম মাংসের থলির মতো বোধ হবে। খুবই পাতলা চামড়া দিয়ে ঢাকা এবং সব জায়গায় ছোট আকারের লোম থাকবে, তবে দুধের বাঁটে কোন লোম থাকবে না।

দুটো বাঁটের আকার এবং লম্বাতেও সমান হবে। উভয় বাঁটের গঠন একই রকম থাকা দরকার। বাঁটের গোড়ায় ছোট আকারের বাঁট বা মাংসপিণ্ড থাকবে না।

পালানে দুধের শিরা ওপর থেকে ভালোভাবে বুঝতে পারা যাবে। ছাগী যখন দুধ দেবে না তখন পালান চুপসে যাবে। প্রসবের পর পালান আবার নিটোল হবে এবং দুধের শিরা মোটা হয়ে ফুলে উঠবে।

## বংশ বাড়াবার কাজে পাঁঠা বাছাই করা

খামারে ছাগলের সংখ্যা বাড়াতে হলে ভালো জাতের পাঁঠা অবশ্যই পালন করতে হবে। দেশী পাঁঠাকে এই কাজে ব্যবহার করা হলে ভালো বাচ্চা পাওয়া যাবে না। তাদের কাছ থেকে যেমন মাংস কম পরিমাণে পাওয়া যাবে তেমনি পাঁঠী দুধ দেবে কম। অথচ পালন করার খরচ একই থাকবে। তার জন্য উত্তরপ্রদেশের ভালো প্রজাতির পাঁঠা সংগ্রহ করতে হবে।

যদি পাঁঠীর সঙ্গে মিলন বা প্রজননের উপযোগী পাঁঠা সংগ্রহ করা হয় তবে তার দেহের গঠন হবে সুঠাম এবং শরীর হবে বেশ বলশালী। দেহে চর্বি থাকবে মাঝারি পরিমাণে এবং গায়ের চামড়া হবে নরম। সারা দেহ ছোট আকারের লোমে ঢাকা থাকবে। পাঁঠার পিছন দিকটা বেশ ভারী এবং পা দুটো দুর্বল যেন না হয়।

অণ্ডকোষের মাঝ বরাবর যে রেখা থাকবে সেটা যেন উভয় দিকে সমানভাবে ভাগ করা থাকে। দুটো হাতের তালুতে অণ্ডকোষ চারদিকে সামান্য চাপ দিয়ে ধরলে নরম বলে মনে হবে। অণ্ডকোষের ওপরের চামড়া হবে মসৃণ। কোথাও খস্‌খসে ভাব থাকবে না।

প্রজননের উপযোগী একটি পাঁঠার দেহের ওজন হবে ৭০ কেজি থেকে ৯০ কেজির মধ্যে। আর পিছনের দিক থেকে সামনের দিকটা কিছুটা বেশি ভারী থাকবে।

ভালো প্রজাতির সবল পাঁঠা প্রজনন বা মিলনের কাজে উপযোগী হয় তার বয়স দশ মাস পূর্ণ হলে। তবে সব থেকে ভালো হয় আরও দু' মাস বাদে অর্থাৎ বয়স এক বছর পূর্ণ হলে। কারণ পাঁঠার বয়স কম হলে বাচ্চা দুর্বল হবে।

একটা পূর্ণবয়স্ক পাঁঠাকে পাঁঠীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের কাজে সারা বছরে মোট ১০০ বার ব্যবহার করা চলে। তবে সেটা ঠিক নয়। সারা বছরে ৬০ থেকে ৭০ বার পাঁঠীর সঙ্গে মিলিত হলে খুবই ভালো বাচ্চা পাওয়া যাবে। প্রজননের কাজে একটি পাঁঠাকে তিন বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। তারপর সেই পাঁঠাকে দিয়ে আর প্রজননের কাজ করানো উচিত নয়।

পশুদের মধ্যে পাঁঠার কাম এবং উত্তেজনা খুব বেশি। সারা দিনে একটি পাঁঠা পাঁচটি উত্তেজিত ছাগীর সঙ্গে ভালোভাবে মিলিত হতে পারে। তবে পাঁঠার শরীরের কথা ভেবে সারা দিনে এক থেকে দু' বারের বেশি উত্তেজিত ছাগীর সঙ্গে মিলিত হতে দেওয়া উচিত নয়।

## ছাগলের খামার পরিচালন ও পরিচর্যা ব্যবস্থা

ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পরিচালনা এবং তাদের সব কিছু প্রয়োজন মতো পরিচর্যা করা বিশেষ প্রয়োজন। এতে ছাগল পালনে সব থেকে বেশি সুফল লাভ করা যায়। খামার পরিচালন ও পরিচর্যা ব্যবস্থাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। ভাগগুলো হচ্ছে—(ক) ওদের থাকবার জায়গা বা বাস করবার ঘর, (খ) ছাগীর গর্ভ সঞ্চার, (গ) গর্ভ অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া, (ঘ) প্রসব করার পর বাচ্চার পরিচর্যা, (ঙ) পরবর্তীকালে ছাগীর পরিচর্যা, (চ) বাচ্চা, ছাগী, পাঁঠা এবং খাসীকে প্রয়োজনীয় খাদ্য দেওয়া এবং (ছ) রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা।

(ক) **থাকবার জায়গা ঃ** নিজের সখ মেটাতে এবং পরিবারের দুধের চাহিদা মেটাতে যদি কয়েকটা ছাগল পালন করা হয় তবে ওদের থাকবার জায়গার কথা বিশেষ ভাবতে হয় না। দাওয়াতে, বারান্দার এক কোণায় অথবা গোয়াল ঘরের একপাশে কয়েকটা ছাগল সহজেই রাতের জন্য রাখা চলে। তারপর সকাল হলেই
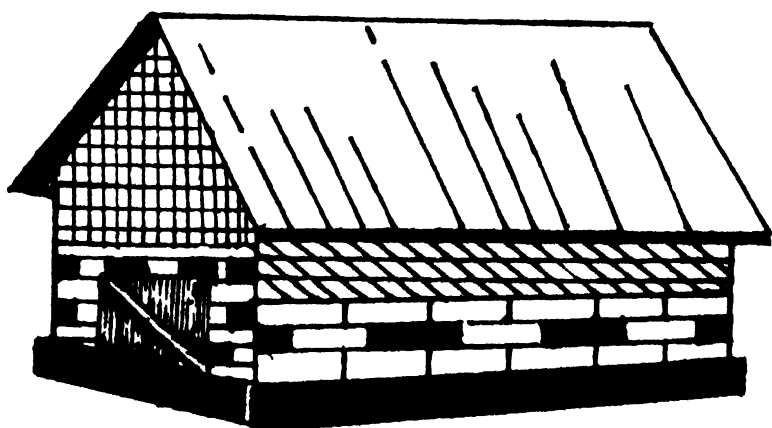
ছাগলের থাকার জন্য পাকা খামাব।

সারাদিন মাঠে-ঘাটে চরে খাবে। দেশী ছাগল হলে ওদের খাওয়াতেও কোন খরচ নেই। সংসারের ফেলে দেওয়া তরকারির খোসা, ভাতের মাড়, চালের কুঁড়ো ইত্যাদি যা দেওয়া হবে তাই খেয়ে ফেলবে। সুতরাং ওদের পরিচর্যা বলতে পালনকারীকে কিছুই করতে হয় না।

খামার প্রথায় শতাধিক ছাগল পালন করতে হলে তখন রাতে ওদের থাকবার জন্য ভালো ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। গ্রামের দিকে খড়ের ছাদের দোচালা হলে ওদের থাকতে কোন অসুবিধে হবে না। পয়সা বেশি থাকলে ছাদটা টালির করতে পারা যায়। আর চারপাশের দেওয়াল হবে মাটির। আবার কিছুটা ভালো করে

করতে হলে কম দামের ইট-কাদা দিয়ে গাঁথনি করে সিমেন্টের সঙ্গে বালি মিশিয়ে ভালোভাবে প্লাস্টার করতে হবে। চার দেওয়ালে বড় আকারের ছ'টি জানলা থাকলে আলো ও বাতাস ঘরে ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারবে।

যদি ১০০টি ছাগল পালনের উপযোগী ঘর করতে হয় তবে সেই ঘরের মাপ হবে ৬০×৪০×৫ ফুট। কারণ প্রতিটি ছাগলের জন্য ২৪ থেকে ২৫ বর্গফুট জায়গার দরকার হয়। খাসী এবং প্রজননের কাজে পাঁঠার জন্য ৬×৬×৫ ফুট অর্থাৎ ৩৬ বর্গফুট করে প্রত্যেককে জায়গা দিতে হবে। এছাড়াও সারা দিনে চরবার জন্য (কয়েক ঘণ্টা) খামারের কাছেই মাঠ দরকার।

এই যে বাসগৃহের কথা বলা হলো তার মধ্যে সকলে এক সঙ্গে থাকবে না। যে পাঁঠী বাচ্চা প্রসব করেছে তার জন্য আলাদা জায়গা ঘরেতে ঘিরে রাখতে হবে।
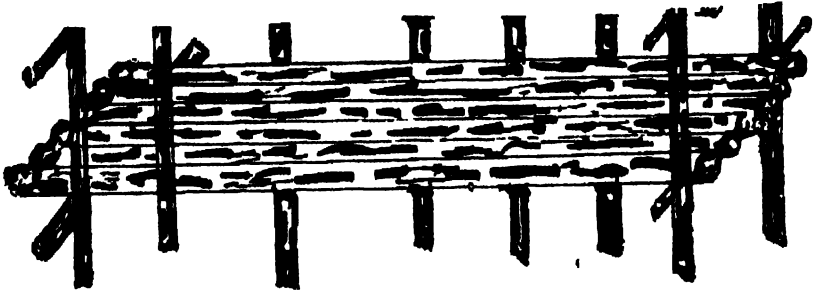
ছাগলের বিশ্রাম করার জন্য বাঁশের বাতায় তৈরি মাচা।

খাসী এবং প্রজননের পাঁঠাও আলাদা ঘেরা জায়গাতে থাকবে। কারণ পাঁঠীর সঙ্গে খাসী বা পাঁঠা রাখলে ছাগীকে সব সময় বিরক্ত করবে। তাছাড়া পাঁঠার গায়ের বিশ্রী গন্ধ দীর্ঘদিন ধরে এক সঙ্গে থাকলে পাঁঠীর দুধে এবং খাসীর মাংসে চলে আসার আশঙ্কা থাকে।

ঘরের মেঝে পাকা এবং জমি থেকে দেড় ফুট উঁচুতে করতে পারলে ভালো হয়। কারণ উঁচু থাকলে বর্ষার সময় ঘরে জল প্রবেশ করবে না। আর মেঝে স্যাঁতসেঁতে হলে ছাগলের রোগ-ব্যাধি এবং শরীর খারাপ হবার আশঙ্কা থাকে। ওদের থাকবার ঘরে উঁচু করে বাঁশের মাচা করে দিলে ভালো হয়। প্রায় সব প্রজাতির ছাগলের অভ্যাস হচ্ছে মাঝে-মাঝে উঁচু জায়গায় শুয়ে বা বসে বিশ্রাম করা। অবশ্য মাচা না করে দিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

খামারে ছাগলের খাবার জায়গা পাকা সিমেন্টের ছোট আকারের কয়েকটা চৌবাচ্চা করে দিতে পারা যায় তবে খুবই উত্তম হয়। তবে সেই চৌবাচ্চা রোজ ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এছাড়াও ছোট ডাবা (মাটির তৈরি যে বড় পাত্রে গরুকে জাব দেওয়া হয়) খেতে দেবার পাত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(খ) **ছাগীর গর্ভ সঞ্চার ঃ** যে কোন প্রজাতির ছাগী পাঁচ মাস বয়স হলেই গর্ভধারণ করতে পারে। তবে এই বয়সে কোন ছাগীকে পাঁঠার সঙ্গে সংযোগ করানো উচিত নয়। কারণ তাতে ছাগীর শরীর ভেঙে যাবে আর বাচ্চা হবে দুর্বল। কাজেই ছাগীর বয়স ছয়মাস হলে এবং উত্তেজনা প্রকাশ পেলে তখন পাঁঠার সঙ্গে দৈহিক মিলন ঘটাতে পারা যায়। আবার কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থায় ভালো জাতের বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে। তবে এসব কাজে কৃত্রিম উপায় গ্রহণ না করাই ভালো।

দেশী ও বারবারি প্রজাতির ছাগী যে কোন সময় বা ঋতুতে গর্ভধারণ করতে পারে। ওরা একবার উত্তেজিত হলে সেটা বজায় থাকে ২১ ঘণ্টা অবধি। যদি পাঁঠার সঙ্গে ঐ সময় দৈহিক মিলন না ঘটে তবে আবার ১৮ থেকে ২৪ দিনের মধ্যে উত্তেজিত হয়।

অপরদিকে বিতাল ও যমুনাপিয়ারী ছাগল শ্রাবণ থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে গর্ভধারণ করে। উত্তেজিত থাকা অবস্থায় যে সময়সীমার কথা বলা হয়েছে তার শেষ দিকে পাঁঠার সঙ্গে দৈহিক মিলন ঘটলে গর্ভ সঞ্চারের আশা বেশি থাকে। ছাগীর **গর্ভকাল ১৫০ দিন** অর্থাৎ **পাঁচ মাস** বা তার কয়েক দিন কম বা বেশি।

ছাগী বা পাঁঠী উত্তেজিত হলে তার কিছু লক্ষণ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে—(ক) ছাগী অন্য ছাগলের পিঠে ওঠার চেষ্টা করে, (খ) মাঝে মাঝে অকারণে চিৎকার করে ডাকে, (গ) যে কোন লোভনীয় খাদ্য মুখের সামনে ধরলেও খেতে চায় না, (ঘ) লেজটা প্রায় সব সময় নাড়াতে থাকে, (ঙ) প্রস্রাবের জায়গা ফুলে ওঠে, সাদা তরল আঠার মতো পদার্থ বের হয় এবং ফিকে গোলাপী রঙের মতো দেখতে হয় যোনিমণ্ডল।

(গ) **গর্ভাবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া ঃ** ছাগী যদি ছয় মাস বয়স হলে প্রথম গর্ভ ধারণ করে তবে বয়স যত বাড়তে থাকে তার প্রজনন ক্ষমতা ভালোভাবে বেড়ে যায়। এই সময় ছাগীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। তাকে আলাদাভাবে রাখা, পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া এবং অন্য ছাগলের সঙ্গে যাতে মারামারি না করে সেটাও দেখা দরকার।

ছাগী গর্ভ ধারণ করার পর এক মাস বাদেই তাকে (উন্নত মানের ছাগল হলে) প্রতিদিন ৫০০ গ্রাম হিসাবে সুষম খাদ্য খাওযাতে হবে। দেশী ছাগীকে ৩০০ গ্রাম পরিমাণে সুষম খাদ্য দিলেই চলবে। এছাড়াও রোজ প্রচুর পরিমাণে সবুজ ঘাস খাওয়াতে হয়। কারণ সবুজ ঘাসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ থাকে। এতে গর্ভের বাচ্চা পুষ্টি লাভ করে। আর সুষম খাদ্য খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণ ছাগী ও বাচ্চার শরীর গঠনে সহায়তা করে।

গর্ভবতী ছাগীকে খামারে অন্য ছাগলের সঙ্গে রাখা মোটেই উচিত নয়। কারণ মারামারি করলে বা পেটে আঘাত লাগলে গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে। খামারের ঘরে এক কোণায় কিছুটা জায়গা ঘিরে সেখানে রেখে দিলে গর্ভপাতের আশঙ্কা মোটেই থাকে না। আবার মাঠে চরতে না দিয়ে খামার ঘরের কাছাকাছি লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলে সব থেকে ভালো হয়।

ছাগীর গর্ভাবস্থায় ১৪০ দিনের মাথায় যখন তাকে বাচ্চা হবার ঘরেতে রাখা হবে তখন পালান পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এটা রোজ সকালে একবার করে অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত। যদি দেখা যায় পালান ফুলে উঠেছে, বেশি গরম বলে মনে হচ্ছে অথবা পালান সাধারণভাবে যেমন নরম হয় সেরকম লাগছে না তখন মাঝারি গরম নুন-পুঁটলির সেঁক দিতে হবে। কয়েকদিন রোজ দু'বার করে দশ থেকে পনের মিনিট সেঁক দিলেই পালান স্বাভাবিক নরম হয়ে যাবে। কারণ পালান নরম থাকলে ছাগীর কাছ থেকে বেশি দুধ পাওয়া যায়।

(ঘ) **প্রসব করবার পর বাচ্চার পরিচর্যা ঃ** উত্তরপ্রদেশের ছাগী একটি, পাটনাই ছাগী একটি অথবা দুটি কিন্তু পশ্চিমবাংলার দেশী পাঁঠী প্রতিবারে একসঙ্গে তিনটি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তবে ছাগী একসঙ্গে সব বাচ্চা প্রসব করে না। প্রথম বাচ্চা প্রসব করবার পর পরের বাচ্চাটি জন্মায় পনের থেকে কুড়ি মিনিট বাদে। এই নিয়মে তৃতীয় বাচ্চা ছাগী প্রসব করে। যদি কোন কারণে এর থেকে বেশি সময় লাগে তবে বুঝতে হবে গর্ভের বাচ্চা সঠিক পথে নেই। তখন দেরি না করে পশু চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া খুবই প্রয়োজন। নতুবা বাচ্চা এবং ছাগী উভয়েরই মৃত্যু ঘটতে পারে। এসব ক্ষেত্রে পালনকারীর কিছু করা উচিত নয়।

প্রথম বাচ্চাটি প্রসব হবার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার মুখ ও নাক থেকে পিচ্ছিল পদার্থ এবং পাতলা পর্দা পরিষ্কার করে দিতে হবে। তারপর ভালোভাবে কাচা এবং পরিষ্কার শুকনো কাপড়ের ফালি দিয়ে বাচ্চার সারা শরীর মুছিয়ে দেওয়া দরকার। বাকি বাচ্চাদেরও একইভাবে প্রথমে পালনকারীকে সারা শরীর মুছিয়ে দিতে হবে। পালনকারী পরিষ্কার করে দিলেও ছাগী যাতে বাচ্চার দেহ চেটে পরিষ্কার করে সেই চেষ্টাও করতে হবে। তার জন্য বাচ্চাকে ছাগীর মুখের কাছে নিয়ে আসতে হবে।

বাচ্চাকে ছাগীর মুখের কাছে নিয়ে আসবার আগে তার নাড়ী পরিষ্কার তুলো দিয়ে মুছে পেট থেকে এক ইঞ্চি ছাড় দিয়ে ধারালো ছুরি, কাঁচি অথবা ব্লেড দিয়ে কেটে টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। এই কাজটি ভালোভাবে না করলে নাড়ি পেকে যাবার আশঙ্কা থাকে। এরপর কয়েকদিন রোজ সকালে জায়গাটা ডেটল জল দিয়ে মুছিয়ে আবার বেঁধে রাখা দরকার। নাড়ি শুকিয়ে যেতে সাতদিন সময় লাগে।

সবকটা বাচ্চা জন্মাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছাগীর বাঁট থেকে দুধ খেতে শুরু করে। এই সময় দুটো বাঁটে সামান্য চাপ দিয়ে টেনে দেখতে হয় বাঁট থেকে দুধ যেন সহজেই বের হয়। যদি না হয় তবে বাঁটের মুখটা সামান্য পরিষ্কার করে দিলেই দুধ বের হতে থাকে। যে বাচ্চা দুর্বল তাকে দুধ খেতে সাহায্য করতে হয়। বাচ্চাদের ভালো স্বাস্থ্যের জন্য খুব কম করে এক মাস ছাগীর দুধ পান করানো দরকার। এছাড়াও ঐ সময়ের দুধে এমন কিছু উপাদান থাকে যা ভবিষ্যতে বাচ্চাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতো তৈরি হয়। নাড়ি কাটা এবং বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর কাজ শেষ হলে একটা ঝুড়িতে কুচো খড় বিছিয়ে ওদের

রাখতে হবে। শীতের সময় রাতে ওদের গায়ে চট বেঁধে দেওয়া উচিত। নতুবা ঠাণ্ডা লেগে যাবে। কারণ জন্মাবার পর এক মাস পর্যন্ত ওপরের চামড়ায় লোম থাকে খুবই ছোট এবং কম। বাচ্চার ওজন জন্মাবার সময় দেড় থেকে তিন কেজির মধ্যে থাকে। পাঁঠার ওজন সামান্য বেশি হতে পারে। একটি ছাগল ছানার তিন সপ্তাহ বয়স অবধি রোজ ৮০ থেকে ১৫০ মিলিলিটার দুধ পাঁচ বারে খাবে। এরপর তিন মাস বয়স পর্যন্ত ঐ পরিমাণ দুধ সারাদিনে তিনবারে খাওয়াতে হবে।

(ঙ) **পরবর্তীকালে ছাগীর পরিচর্যা ঃ** প্রসবের পর বাচ্চার পরিচর্যা শেষ হলে ছাগীর জন্য কিছু করণীয় কাজ অবশ্যই করা দরকার। সব বাচ্চা পরপর প্রসব করবার পর ছাগীর যোনির বাইরের দিকে পাতলা পরদায় ঢাকা যে থলি বা ফুল ঝুলমতো অবস্থায় থাকে সেটা প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই সহজেই নিজের থেকে মাটিতে খসে পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য থলি বা ফুল ঐভাবে আটকে থাকে। যদি প্রসবের পর বারো ঘণ্টার মধ্যে ওটা খসে না পড়ে তবে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। ফুল পড়ে যাবার পর মাটির নিচে এক হাত গভীর গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া দরকার।

এর পরের কাজ ছাগীর জাং, লেজ এবং পিছনের দুটো পা সামান্য গরম জলে ডেটল মিশিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে দিতে হবে। তারপর শুকনো কাপড় দিয়ে এমনভাবে মুছিয়ে দেওয়া উচিত যাতে লোম বেশি ভিজে না থাকে। এসব যদি পরিষ্কার না করা হয় তবে পালানে ঠুনকো (পালান শক্ত হয়ে যাওয়া) রোগ হবার আশঙ্কা থাকে।

বাচ্চা প্রসব করবার পর ছাগীকে তিন থেকে চার দিন কোন শক্ত খাদ্য খেতে দেওয়া উচিত নয়। তবে গমের আটার ভুসি, চালের কুঁড়ো, কম দামের ঝোলা গুড় এবং ভাতের মাড় বা ফ্যান সামান্য গরম জলে গুলে ওদের খেতে দিলে শরীর যেমন ভালো থাকে তেমনি সহজে হজম করতে পারে। তাছাড়া ওদের পেটও পরিষ্কার থাকে। কারণ ঐ সময়টা ছাগীর হজম করবার ক্ষমতা খুব কমে যায়। ছাগীর খাদ্য যাতে ভালোভাবে হজম হয় তার জন্য অনেকে খাদ্যের সঙ্গে ছোট চায়ের চামচের এক চামচ জোয়ান গুঁড়ো মিশিয়ে দেয়।

এরপর অর্থাৎ চারদিন বাদে কিছু পরিমাণে শক্ত খাদ্য যথা সুষম খাবার দেওয়া চলতে পারে। এইভাবে দশ থেকে বারো দিন বাদে প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য ছাগী খেতে পারবে।

ছাগীর সঙ্গে বাচ্চাদেরও খাদ্যের ব্যাপারে পালনকারীকে নজর দিতে হবে। বাচ্চা জন্মের পর থেকে তিন সপ্তাহ অবধি কেবলমাত্র ছাগীর দুধ পান করবে। যদি ছাগীর পালানে কম দুধ থাকে অথবা কোন কারণে বাচ্চারা না পায় তবে অন্য ব্যবস্থা হিসাবে গরুর দুধে চার ভাগের একভাগ জল মিশিয়ে বাচ্চাদের খাওয়াতে পারা যায়। ছাগীর অথবা গরুর এদের মধ্যে যে কোন একটি দুধ বাচ্চারা পেট ভরে খেলেও সাত দিন পর থেকে ওদের রোজ কিছুটা পরিমাণে ভুসি জাতীয় খাদ্য খাওয়াতে হবে। কারণ এই সময় থেকে বাচ্চাদের খাদ্যদ্রব্য হজম করবার কাজকর্ম

ভালোভাবে শুরু হয়ে যায়। বাচ্চার বয়স তিন সপ্তাহ হলে ওরা রোজ কিছু পরিমাণে শক্ত বা সুষম খাদ্য খেতে শুরু করতে পারে। খাদ্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। সুষম খাদ্য খেতে দেবার সহজ নিয়ম হচ্ছে ওদের দেহের ওজন অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করা। সেই হিসাবে দেহের যা ওজন হবে
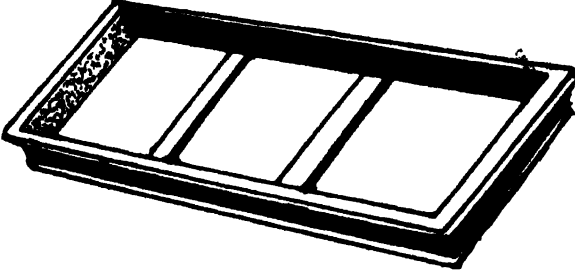
বাচ্চা ছাগলকে খেতে দেবাব পাত্র।

তার শতকরা ৩ ভাগ। যেমন ১০০ কেজি ওজন হলে সুষম খাদ্য দিতে হবে মাত্র ৩ কেজি। এই খাদ্যের সঙ্গে বাচ্চা সারাদিনে মাঠে ঘুরে-ফিরে যতটা পারে সবুজ কাঁচা কচি ঘাস খাবে। অপরদিকে দুধেল ছাগীকে সুষম খাদ্য দিতে হবে তার দেহেব ওজনের শতকরা সাত ভাগ হিসাবে। এরসঙ্গে পেট ভরে কাঁচা সবুজ ঘাস যতটা পারবে নিজের ইচ্ছেমতো পেট ভরে খাবে।

মাংসের জন্য যে সব ছাগলকে পালন করা হচ্ছে তাদের প্রত্যেককে দৈনিক সুষম খাদ্য দেওয়া দরকার তার দেহের ওজনের শতকরা হিসাবে ৪ ভাগ।

সুষম খাদ্য প্রতিদিন দিলেও খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা একটি গরুর থেকে ছাগলের বেশি। তার জন্য খাবার লবণের একটি বড় আকারের ডেলা খামার ঘরেব ভিতর কাঠের বাক্সের মধ্যে বাখতে হয়। ছাগল তার প্রয়োজন অনুসারে লবণ খেয়ে থাকে।

**(চ) বাচ্চা, ছাগী, পাঁঠা, খাসীকে খাদ্য দেওয়া ঃ** আগেই বলা হয়েছে ছাগলে সব কিছু খেয়ে ফেলে। কথাটা নিশ্চয় কিছুটা সত্য। তবু ছাগলের স্বাদ বোঝবার ক্ষমতা অন্যান্য গৃহপালিত পশুদের থেকে কিছুটা বেশি। যদি পচা এবং দুর্গন্ধ বের হচ্ছে এমন খাবার এদের খেতে দেওয়া হয় বিশেষ করে সবজি এবং শাক-পাতা, সেই খাবার ওরা মোটেই খায় না, তবে মিষ্টি, তেতো, টক, নোনতা ইত্যাদি যে কোনো ধরনের পাতা অথবা সবজি ওদের মুখের সামনে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলবে। এছাড়াও কাঁটা শ্রেণীর কোন গাছের কচি ডালপালা পেলে ওরা খেতে কোন আপত্তি করবে না। একমাত্র পুরনো পাকা পাতা এবং খুব শক্ত শুকনো ডাল খায় না। কারণ খাবার অসুবিধে থাকায় তাই খেতে পারে না।

কচি সবুজ ঘাস সব প্রজাতির ছাগলের খুবই প্রিয় খাদ্য। সুতরাং সারা দিনের মধ্যে পাঁচ থেকে ছ' ঘণ্টা যদি মাঠে চরে কাঁচা ঘাস খেতে পায় তবে ঐ সময়ের মধ্যে ওরা ঘাস খেয়ে পেট ভবিয়ে ফেলবে। সেই কারণে একেবারে গরিব পরিবারে

গোটা কতক দেশী ছাগল পালন করলে তারা সারাদিন মাঠে-ঘাটে চরে ঘাস খেয়ে এবং ফ্যান ও তরকারির খোসা এবং পাতের পড়ে থাকা ভাত-তরকারি খেয়ে ওরা ভালোভাবেই বেঁচে থাকে। তবে সংখ্যায় কিছু বেশি দেশী ছাগল পালন করলে তখন সামান্য পরিমাণে আলাদাভাবে খাদ্য তাদের দিতে হয়। পরিমাণটা খুব বেশি
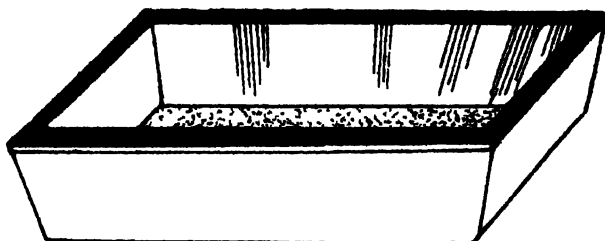
ছাগলকে খেতে দেবার ধাতুর তৈবি খাদ্য পাত্র।
এই ধরনের পাত্রে খাদ্য দিলে খাদ্যের অপচয় হয় না।

নয়, একটি ছাগীকে ১৫০ গ্রাম পোস্টাই খাদ্য এবং সামান্য কাঁঠাল বা অশ্বত্থ গাছের কচি পাতা দেওয়া দরকার।

অপরদিকে উত্তর ভারতীয় প্রজাতির যে কোন শ্রেণীর ছাগল পালন করা হলে ওরা ঘাস খেলেও মোটেই মাঠে চরতে চায় না। কচি ঘাসের ডগা কেটে মুখের সামনে রাখলে তখন খাবে। সেই কারণে ওদের সব বয়সের ছাগলকে পোস্টাই খাদ্য সহ অশ্বত্থ, কাঁঠাল, জাম এবং বাঁশপাতা নিত্য কিছু পরিমাণে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। ঐ খাদ্য সারা দিনে দু'বার দিতে হবে। আর ছাগীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে যখন দুধ দিচ্ছে তখন দুধ দুইবার আগে খেতে দেওয়া দরকার।

পোস্টাই খাদ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। আবার বাড়িতে দরকার মতো তৈরি করা যেতে পারে। বাজার থেকে কেনা পোস্টাই খাদ্য কিনতে বেশি দাম পড়বে এবং খাদ্যের মান তেমন ভালো নাও হতে পারে। এছাড়াও দূর থেকে খামারে আনতে পরিশ্রম এবং আলাদা খরচ পড়বে। সুতরাং বাড়িতে তৈরি করলে খাদ্য যেমন উন্নত মানের হবে তেমনি দামেও কম পড়বে। পোস্টাই খাদ্য কিভাবে তৈরি করা হবে তার উপাদান সহ পরিমাণ উল্লেখ করে ফরমূলা দেওয়া হচ্ছে।

## পোস্টাই খাদ্যের ফরমূলা

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| গমের ভুসি | ১০ কেজি |
| চুনি (ডালের গুঁড়ো খোসা সহ) | ২০ কেজি |
| গুঁড়ো করা বাদাম খোল | ১০ কেজি |
| খাবার লবণ | ৪০০ গ্রাম |

*সব প্রজাতির ছাগলকে খেতে দেবার উপযোগী এটা একটা আদর্শ পোস্টাই* খাদ্য। এই খাদ্যের সঙ্গে আরও কিছু খাদ্য মিশিয়ে একটা সম্পূর্ণ আদর্শ পোস্টাই খাদ্য বাড়িতে তৈরি করা যায়।

পোস্টাই খাদ্যের সঙ্গে যে সমস্ত অন্য উপাদান মেশাতে হবে তাদের নাম ও পরিমাণ সহ একটা তালিকা দেওয়া হচ্ছে। পোস্টাই খাদ্যের সঙ্গে দ্বিতীয়টা মেশালে সেটা হবে মিশ্রিত পোস্টাই খাদ্য।

আগে যে পোস্টাই খাদ্যের কথা উল্লেখ করা হলো তার উপাদানগুলো একে একে মিশিয়ে তৈরি করবার পর ভালোভাবে বস্তার মধ্যে রেখে দিতে হবে। যদি খোলা অবস্থায় রাখা যায় তবে বিশেষ করে বর্ষার সময় হাওয়া লেগে খাদ্য নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকবে। কাজেই সারা দিনে একবার বস্তা খুলে যেটুকু পোস্টাই খাদ্য লাগবে সেটা বের করে আবার বস্তার মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে রাখতে হবে।

এবার পোস্টাই খাদ্যের সঙ্গে যে সব অন্য খাদ্য মেশাতে হবে তাদের একটা তালিকা দেওয়া হচ্ছে। এই খাদ্যটাই মিশ্রিত পোস্টাই—ছাগলের একটা আদর্শ খাদ্য। যে ছাগী দুধ দিচ্ছে এবং যাদের মাংসের জন্য পালন করা হচ্ছে, এমনকি বংশ বাড়াবার জন্য যে পাঁঠা খামারে রাখা হয়েছে তাদের প্রত্যেককেই এই মিশ্রিত খাদ্য দেওয়া যাবে। এতে সব উদ্দেশ্যই সফল হবে। মিশ্রিত পোস্টাই খাদ্য নিত্য দেওয়া হলেও যে সব প্রজাতির ছাগলের মাঠে চরার অভ্যাস রয়েছে তারা যদি রোজ কয়েক ঘণ্টার জন্য মাঠে চরে তবে ওদের শরীর আরও ভালো থাকবে। এবার বিভিন্ন বয়সের ছাগলের রোজ কতটা পরিমাণে খাদ্য দিতে হবে তার একটা তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

| ছাগলের বয়স | খাদ্যের শ্রেণী | দৈনিক পরিমাণ |
|---|---|---|
| বাচ্চার জন্ম থেকে তিন দিন অবধি। | কেবলমাত্র ছাগীর দুধ পান করবে। | পেট ভরে দুধ খাবে। |
| জন্মের চার দিন বয়স থেকে ২৪ দিন পর্যন্ত। | ছাগীর দুধ, পানীয় জল ও খাবার লবণ। | দুধ ও পানীয় জল ৪৫০ মি.লি.। খাবার লবণ ৪ থেকে ৬ গ্রাম। |
| বয়স ২৫ দিন থেকে চার মাস অবধি। | সিম জাতীয় ঘাস। দানা খাদ্যশস্য। পানীয় জল ও খাবার লবণ। | কচি সবুজ ঘাস এক থেকে দেড় কেজি। দানা খাদ্য-শস্য ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম। পানীয় জল ৫০০ মি.লি. ও লবণ ১২ গ্রাম। |
| বয়স চার মাস হলে। ছাগী এবং খাসী। | দানা খাদ্যশস্য, কচি ঘাস। পানীয় জল ও খাবার লবণ। | দানা খাদ্যশস্য ৪৫০ গ্রাম। কচি ঘাস খাবে নিজের ইচ্ছে মতো। পানীয় জল ৫০০ মি.লি.। খাবার লবণ ১৫ থেকে ২০ গ্রাম। |

| ছাগলের বয়স | খাদ্যের শ্রেণী | দৈনিক পরিমাণ |
|---|---|---|
| প্রসবের পর ছাগী দুধ দিলে। | দানা খাদ্যশস্য। কচি ঘাস। পানীয় জল ও খাবার লবণ। | এক লিটার দুধ দিলে দানা খাদ্যশস্য ৪০০ গ্রাম। পানীয় জল ৬০০ মি.লি. এবং খাবার লবণ ১৫ থেকে ১৮ গ্রাম। |
| পূর্ণ বয়স্ক পাঁঠা প্রজননেব উপযোগী। | মাঠে চরে ঘাস খাবে। দানা খাদ্যশস্য। খাবার লবণ ও পানীয় জল। | সবুজ ঘাস পেট ভরে খাবে। দানা খাদ্যশস্য ৪০০ গ্রাম। পানীয় জল ৫০০ মি.লি. ও লবণ ১৫ গ্রাম। |

যদিও তালিকাতে বলা হয়েছে বাচ্চারা ২৪ দিন পর্যন্ত ছাগীর দুধ পান করবে, কিন্তু ১৫ দিন বয়স হলেই ওরা কচি ঘাস সামান্য পরিমাণে খেতে চায়। কাজেই ঐ সময় থেকে কয়েক ঘণ্টাব জন্য বাচ্চাকে মাঠে ছেড়ে দেওয়া দরকার। আবার বাচ্চারা তিন মাস পর্যন্ত ছাগীর দুধ খায়। ঐ বয়স অবধি দুধ না দিলেও চলে। দু' মাস বযস অবধি দুধ পেলেই যথেষ্ট বলে ধরা হয।

বেশি সংখ্যাতে ছাগল পালন করলে অনেক সময় চরে খাবার মাঠের অভাব হতে পারে। সেক্ষেত্রে ওদের একটা ছোট্ট সীমানার মধ্যে পালন করতে হয়। তখন মাঠ থেকে কচি ঘাসের ডগা আধ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বায় কেটে ওদের রোজ খেতে দিতে হবে। এটা নিত্য অবশ্যই করা দরকার। যদি না করা হয় তবে ওদের শরীর ঠিক মতো গড়ে উঠবে না। এর সঙ্গে কচি অশ্বথ, বাঁশ, জাম ও কাঁঠালের কচি পাতা কিছু পরিমাণে দিতে হবে।

এখানে আরও একটা খাদ্য তালিকা দেওয়া হচ্ছে। তালিকা তৈরি করা হয়েছে ছাগলের দেহের ওজন অনুসারে। মাংস, প্রজননের কাজে পালিত পাঁঠা এবং বংশ বাড়াবার জন্য পাঁঠীকে খাওয়াতে পারা যাবে। তবে যে সব ছাগল সারাদিন মাঠে-ঘাটে চরে খাবে তাদের তালিকা অনুসারে ঐ পরিমাণ খাদ্য না দিলেও চলবে। প্রয়োজন বুঝে কিছুটা কম দিলে কোন বিশেষ ক্ষতি হবে না।

| দেহের ওজন কেজি হিসাবে | দুধ মি.লি. হিসাবে | | দানা খাদ্য ও ভুসি কেজি হিসাবে | কাঁচা ঘাস কেজি হিসাবে |
|---|---|---|---|---|
| | সকাল | বিকেল | | |
| ২ কেজি ৫০০ গ্রা. | ২০০ | ২০০ | — | — |
| ৩ কেজি | ২৫০ | ২৫০ | — | — |
| ৩ কেজি ৫০০ গ্রা. | ৩০০ | ৩০০ | — | — |
| ৪ কেজি | ৩০০ | ৩০০ | — | — |
| ৫ কেজি | ৩০০ | ৩০০ | দানা ৫০ + ভুসি ৫০ | যতটা খেতে পারে |

| দেহের ওজন কেজি হিসাবে | দুধ মি.লি. হিসাবে সকাল | বিকেল | দানা খাদ্য ও ভুসি কেজি হিসাবে | কাঁচা ঘাস কেজি হিসাবে |
|---|---|---|---|---|
| ৬ কেজি | ৩৫০ | ৩৫০ | দানা ৫০ + ভুসি ৫০ | ” |
| ৭ কেজি | ৩৫০ | ৩৫০ | দানা ১০০ + ভুসি ৫০ | ” |
| ৮ কেজি | ৩০০ | ২৫০ | দানা ১৫০ + ভুসি ৫০ | ” |
| ৯ কেজি | ২৫০ | ২৫০ | দানা ২০০ + ভুসি ৫০ | ” |
| ১০ কেজি | ২০০ | ২০০ | দানা ২৭৫ + ভুসি ৭৫ | ” |
| ১৫ কেজি | ১৫০ | ১৫০ | দানা ২৭৫ + ভুসি ৭৫ | ” |
| ২০ কেজি | — | — | দানা ২৭৫ + ভুসি ৭৫ | ১ কেজি ৫০০ গ্রা |
| ২৫ কেজি | — | — | দানা ২৭৫ + ভুসি ৭৫ | ২ কেজি |
| ৩০ কেজি | — | — | দানা ৩০০ + ভুসি ১০০ | ২ কেজি ৫০০ গ্রা |
| ৪০ কেজি | — | — | দানা ৩৭৫ + ভুসি ৭৫ | ৪ কেজি |
| ৫০ কেজি | — | — | দানা ৪০০ + ভুসি ১০০ | ৫ কেজি |

তালিকাতে দানা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে দানা জাতীয় সুষম খাদ্য। আর ভুসি হিসাবে সব সময় গম ভাঙা আটার ভুসি দিতে হবে। খাবার লবণ ছাগলের পক্ষে একটা প্রয়োজনীয় উপাদান। সুতরাং সুষম খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজনীয় লবণ রোজ যেন দেওয়া হয়।

**(ছ) রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি ঃ** প্রাণী মাত্রেরই রোগ-ব্যাধি হবেই। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকলে রোগ-ব্যাধি কম হয়। আর ঐ পরিবেশ থেকে সরে এলে রোগের আক্রমণ বেশি ঘটে। যে পাখি বনে থাকে, আকাশে উড়ে বেড়ায় তার শরীরের গঠন যেমন ভালো হয় তেমনি ওদের রোগ-ব্যাধি হয় না বললেই চলে। অথচ ওদের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ধরে এনে বাড়িতে প্রতিপালন করলে শরীর রক্ষার জন্য যেমন পরিচর্যা করতে হয় তেমনি মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন সেবা করে ওষুধ-পথ্য খাইয়ে সারিয়ে তুলতে হয়।

গৃহপালিত পশু হিসাবে যাদের আমরা পালন করি তাদের মধ্যে একমাত্র ছাগল ও মেষ রোগ-ব্যাধিতে খুব একটা আক্রান্ত হয় না। যদিও বা কোন সময় সামান্য অসুস্থ হয় তবে সেটা তেমন গুরুতর আকার ধারণ করে না। সামান্য পরিচর্যা ও চিকিৎসা করলে ভালো হয়ে যায়।

ছাগলের কয়েকটা রোগ ও ব্যাধির বিষয়ে আলোচনা করবার আগে ওদের শরীর সম্পর্কে কয়েকটা বিষয় জেনে রাখা দরকার। যে-কোন প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা, শ্বাস নেওয়া ও ত্যাগ করার হার, নাড়ীর গতি শরীর ভালো থাকলে যেমন শরীর সামান্য অসুস্থ হলেই তার পরিবর্তন ঘটে। পশুরা আমাদের মতো কথা বলতে পারে না। সুতরাং শরীর খারাপ করলে দেহের বাইরের লক্ষণ যেমন দেখতে হয় তেমনি দেখতে হয় দেহের ঐসব কাজ কিরকম অর্থাৎ কতটা অস্বাভাবিকভাবে হচ্ছে। কাজেই সঠিকভাবে রোগটির বিষয়ে জেনে এবং ওষুধ

দেবার আগে ছাগলের দেহের তাপমাত্রা সহ বাকিগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ছাগলের দেহের সুস্থ অবস্থায় তাপমাত্রা থাকে ১০২° থেকে ১০৪° ফারেনহাইট। এই তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে আমরা জ্বর দেখতে যে থার্মোমিটার ব্যবহার করি সেই থার্মোমিটারের সাহায্যে। আমরা মুখের ভিতর, জিভের নিচে অথবা বগলে যে দিকটায় পারদ থাকে সেই অংশটুকু এক মিনিট রেখে তারপর পরীক্ষা করি। ছাগলের ক্ষেত্রে ওদের প্রস্রাবের দ্বারে পারদের দিকটা দেড় ইঞ্চি প্রবেশ করিয়ে ৩০ থেকে ৪০ সেকেণ্ড রেখে তারপর থার্মোমিটার বাইরে বের করে পরীক্ষা করতে হবে।

ছাগল যখন বিশ্রাম করে সেই সময় তার শ্বাস গ্রহণের হার থাকে প্রতি মিনিটে ১৩ থেকে ২০ বার। এর থেকে কম বা বেশি হলেই বুঝতে হবে ছাগলের শরীর খারাপ করেছে।

সাধারণভাবে নাড়ীর গতি থাকে প্রতি মিনিটে ৭০ থেকে ৮০ বার। শরীর খারাপ করলে নাড়ীর গতি বেড়ে হবে ৯০ থেকে ১০০ বার। কিছু ক্ষেত্রে আরও বেশি হতে পারে। যেসব পরীক্ষার কথা এখানে বলা হলো সেগুলো পরীক্ষা করতে হবে যখন ছাগল খামারে বিশ্রাম করবে। রোদের মধ্যে মাঠ থেকে চরে এলে সেই সময় পরীক্ষা করলে সঠিকভাবে বুঝতে পারা যাবে না।

এবার ছাগলের কয়েকটা রোগের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, যে কোনও প্রজাতির ছাগলকে রোগ-ব্যাধিতে বিশেষ একটা আক্রান্ত হতে দেখা যায় না। আর যদিও বা রোগে আক্রান্ত হয় তবে সেটা তেমন মহামারী আকার ধারণ করে না। সময় মতো সামান্য ওষুধ এবং পথ্য দিলে ওরা খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়।

## ছাগলের বিভিন্ন রোগ ও তার চিকিৎসা

### পাতলা পায়খানা অথবা পেট খারাপ

**কারণ ঃ** গরমের সময় এই রোগটি বেশি দেখা দেয়। যে কোনো বয়সের ছাগলের হঠাৎ পেট খারাপ হতে পারে। কোন সময় খামারের দু-চারটি ছাগল অথবা অধিকাংশ ছাগল পাতলা মলত্যাগ করতে শুরু করে। এতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। পুকুর-ডোবার নোংরা এবং দূষিত জল পান করে অথবা বেশি পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করার জন্য পেট খারাপ করে। একই কারণে বাচ্চাদেরও পেট খারাপ হয়।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** পাতলা জলের মতো ছাগল বারবার মল ত্যাগ করে। মলের রঙ সবুজ বা হলুদ হতে পারে। ভীষণ দুর্গন্ধ থাকে মলে। মলদ্বার থেকে শুরু করে ল্যাজের লোম এবং পিছনের দুটো পা মল লেগে ভিজে যায়। ছাগল খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকে। জাবরও কাটে না।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** এই রোগে ছাগল কোন সময় মরে না, এমনকি শরীরের খুব একটা ক্ষতিও হয় না। রোগ ধরতে পারার সঙ্গে সঙ্গে যদি ওষুধ দেওয়া হয় তবে ভালো হতে দেড় দিন সময় লাগে।

ওষুধ খাওয়াতে হবে সালফা-গোয়াইডিন ট্যাবলেট। এটা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা। প্রথমে চারটি ট্যাবলেট এক সঙ্গে গুঁড়ো করে ৫০ মিলিলিটার পরিষ্কার জলে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। এরপর তিন ঘণ্টা অন্তর একটা করে ট্যাবলেট একই ভাবে খাওয়ানো দরকার। জলেতে গুলে নেওয়া ট্যাবলেট ঝিনুক, বড় চামচ অথবা ছোট কাচের বোতলে ভরে সহজেই খাওয়াতে পারা যাবে। মোট ১৬টি ট্যাবলেট খাওয়াবার প্রয়োজন হয়। এই মাত্রা বড় ছাগলের জন্য। যে বাচ্চা ছাগলের বয়স ছয় মাসের নিচে তাকে একই ওষুধ অর্ধেক মাত্রায় দিতে হবে।

**পথ্য ঃ** ভাতের পাতলা ফেন সামান্য লবণ মিশিয়ে। কচি ঘাস, বাঁশ পাতা ও কচি জাম পাতা। যদি খেতে চায় তবে অল্প পরিমাণে গমের আটার ভুসি দিতে পারা যায়।

## পেট ফাঁপা বা পেট ফোলা

**কারণ ঃ** পুষ্টিকর এবং বেশি পরিমাণে খাবার একসঙ্গে ছাগল যদি খায় তবে পেট ফাঁপে অথবা পেটে গ্যাসের সৃষ্টি হয়। যে কোনো বয়সের ছাগলের হঠাৎ এরকম হতে পারে। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। অনেক সময় বয়স বেশি হলে ছাগী অথবা পাঁঠার হজম করবার ক্ষমতা কিছুটা কমে যায়। ফলে একটু বেশি পরিমাণে খাদ্য খেলে পেট ফুলে বা ফেঁপে ওঠে।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** ছাগলের পেট ফোলার সঙ্গে সঙ্গে জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যায়। মল ও মূত্র ত্যাগও করে না। খুবই কষ্ট হয়, ফলে গভীরভাবে শ্বাস ত্যাগ করে। ভিতরের জমে থাকা গ্যাস যদি বুকের দিকে উঠে আসে তখন ছাগলের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কষ্টের জন্য মাঝে মাঝে চিৎকার করে। গ্যাস অর্থাৎ বায়ু যদি বেশি হয় তাহলে অনেক সময় শ্বাস নিতে না পারায় মারা যেতে পারে।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** খাবার সোডা ৫০ গ্রাম ১০০ মিলিলিটার পরিষ্কার পানীয় জলে গুলে ছাগলকে খাইয়ে দিতে হবে। কয়েক মিনিট বাদেই মলদ্বার দিয়ে গ্যাস বাইরে চলে আসবে। এটি ছাড়াও দ্বিতীয় ওষুধ হিসাবে জিনট্যাক-৩০০ মিলিগ্রাম একটি ট্যাবলেট ৫০ মিলিলিটার পানীয় জলে গুলে ছাগলকে খাওয়ালে মলদ্বার দিয়ে গ্যাস বাইরে চলে আসবে।

গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে রাতের দিকে যেখানে কাছাকাছি ওষুধের দোকান নেই সেখানে কবিরাজী একটি ওষুধের কথা বলা হচ্ছে। এতেও খুব ভালো কাজ দেয়। উপাদান হিসাবে প্রয়োজন হচ্ছে কাঁচা হলুদ বাটা ৮০ গ্রাম, কচি দূর্বা ঘাসের রস ৭৫ মিলিলিটার, আখের গুড় ১৫০ গ্রাম, আদার রস ৩০ মিলিলিটার এবং পরিষ্কার পানীয় জল চায়ের কাপের দেড় কাপ। সবগুলো একটা কাচের বোতলে ভরে ছাগলকে খাওয়ালে মলের সঙ্গে গ্যাস বের হয়ে যাবে এবং ভালোভাবে প্রস্রাব করবে।

অনেক সময় দেখা যায় এই ওষুধ প্রয়োগে কোন কাজ হয়নি তখন দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা বাদে একই ওষুধ আরও একবার খাওয়াতে হবে। তৈরি করবার নিয়মের কোন পরিবর্তন করা হবে না।

যদি ছাগলের অবস্থা খুবই গুরুতর হয় তাহলে সব থেকে শক্তিশালী ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। অ্যালোপাথিক ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে। ব্রোটোসিল, বুমেনটন অথবা হারবোগ্যাস্টিন—এই তিনটি ওষুধের মধ্যে যে কোন একটা ওষুধ খাওয়াতে হবে। কিভাবে খাওয়াতে হবে ওষুধ বিক্রেতা বলে দেবে। এটা সব থেকে ভালো ওষুধ এবং উপকার অবশ্যই পাওয়া যাবে।

**পথ্য ঃ** এই রকম অবস্থা হলে ছাগলকে কিছুই খেতে দেওয়া উচিত নয়। তবে মল ও মূত্র ত্যাগ করবার পর পিপাসা পেলে সামান্য জল পান করতে পারে। পরের দিন কেবল কচি ঘাস খাবে এবং দুপুরে পাতলা করে ভাতের মাড় দেওয়া হবে। এইভাবে দু'দিন খাবার পর তবেই মিশ্র পোস্টাই খাদ্য দেওয়া চলবে।

## সাদা ও রক্ত আমাশয়

**কারণ ঃ** ছাগীর দুধ বেশি পবিমাণে পান করে বাচ্চা ছাগল এবং মানুষের মাধ্যমে বয়স্ক ছাগল সাদা ও রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়। কোন আমাশয় রোগী মাঠে-ঘাটে মল ত্যাগ করলে সেখানকার ঘাস ছাগল মাঠে চরবার সময় খেলে আমাশয় রোগের জীবাণু ছাগলের পেটে প্রবেশ করে। এইভাবেই ছাগল উভয় প্রকার আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়।

দু' রকমের আমাশয় রোগে ছাগল আক্রান্ত হতে পারে। সাদা আমের ক্ষেত্রে মলের সঙ্গে সাদা কফের মতো এক ধরনের পিচ্ছিল পদার্থ মেশানো থাকে। এটাই সাদা আমাশয়। অপরটি হচ্ছে মলের সঙ্গে সাদা কফ সহ তাজা রক্ত মেশানো অবস্থায় ছাগল মল ত্যাগ করে। একে বলে রক্ত আমাশয়।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** যে কোনো আমাশয় রোগে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা করে। তার জন্য ছাগল মাঝে মাঝে চিৎকার করে ডেকে ওঠে। সব সময় মলের বেগ এবং বারবার অল্প পরিমাণে মলত্যাগ করে। মলের রঙ স্বাভাবিক থাকে না। সব সময়েই মল জলের মতো পাতলা হয়। আমাশয় হলেই এক দিনের মধ্যে ছাগল ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি ভালোভাবে উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকে না। যদি চিকিৎসা করা না হয় তবে কয়েক দিন রোগ ভোগ করবার পর ছাগল মারা যায়। ভালোভাবে চিকিৎসা করা না হলে সাময়িকভাবে রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থা একটু কমে তবে এইভাবে দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করলে তখন ওষুধ দিলেও কোন কাজ হয় না। কাজেই আমাশয় হলেই ভালোভাবে না সারা অবধি চিকিৎসা করতে হয়।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** সাদা আমাশয় রোগ বেশি বাড়াবাড়ি হলে তখন অ্যামিক্লিন প্লাস ২টি ট্যাবলেট জলে গুলে খাওয়াতে হবে। এরপর তিন ঘণ্টা অন্তর ১টি

ট্যাবলেট একইভাবে খাওয়ানো দরকার। রোগ যদি বাড়াবাড়ি না হয় এবং ছাগল যদি সারাদিন চার থেকে পাঁচবার মলত্যাগ করে তাহলে অ্যামিক্লিন প্লেন একইভাবে খাওয়াতে হবে। রোগ সম্পূর্ণভাবে ভালো করার জন্য মোট ২০টি ট্যাবলেট খাওয়ানো উচিত। হিসেব করে দেখা গেছে মোট ছ'দিন ওষুধ ছাগলকে খাওয়াতে হয়।

আম এবং রক্ত যদি মলের সঙ্গে থাকে তাহলে সিফ্রানসিটি (এর শক্তি মাত্রা হবে ২৫০ মিলিগ্রাম) ক্যাপসুল সারাদিনে চার ঘণ্টা অন্তর মোট তিনটি করে খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রেও ছ'দিন ওষুধ নিয়ম করে খাওয়ানো দরকার। এছাড়াও দ্বিতীয় ওষুধ হিসাবে ব্রেকী (এর শক্তি মাত্রা হবে ৫০০ মিলিগ্রাম) সারাদিনে ২টি করে খাওয়াতে হবে। মোট ছ'দিন ওষুধ খাওয়াবার নিয়ম। রোগের অবস্থা বুঝে ছ' দিনের জায়গায় আরও দু'দিন অর্থাৎ আট দিন নিয়মিত ওষুধ খাওয়ানো উচিত।

**পথ্য ঃ** এই রোগে পথ্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওষুধে রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থা সামাল দেয় আর পথ্য রোগ সারাতে সাহায্য করে। কাজেই পথ্য ঠিক মতো না দেওয়া হলে রোগ ওষুধে মোটেই সারে না, তার পবিবর্তে গুরুতর আকার ধারণ করে।

ওষুধ প্রয়োগ করবার পর একদিন বাদে খুব পাতলা করে সামান্য খাবার লবণ মিশিয়ে দিনে একবার দিতে হবে। কচি ঘাসের ডগা ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম, খুব কচি বাঁশপাতা অথবা কচি জামপাতা দেওয়া যেতে পারে। রোগ সম্পূর্ণভাবে সেরে না যাওয়া অবধি এভাবে পথ্য দিতে হবে। যদি খামারে এক সঙ্গে বেশি সংখ্যায় ছাগল আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সকলকে ভাতের ফেন দেবার অসুবিধে থাকে সেক্ষেত্রে পাতলা করে বার্লি তৈরি করে ঠাণ্ডা হবার পর সামান্য খাবার লবণ মিশিয়ে পথ্য হিসাবে ছাগলকে খাওয়াতে পারা যাবে। মনে রাখতে হবে, সাদা অথবা রক্ত সহ আমাশয় রোগ সম্পূর্ণভাবে সারতে আট থেকে বারো দিন পর্যন্ত সময় লাগে।

## ছোট এবং ফিতা ক্রিমির আক্রমণ

**কারণ ঃ** মাঠে চরবার সময় ঘাসের সঙ্গে ফিতা ক্রিমির ডিম ছাগলের পেটে চলে যায়। কয়েকদিন পরে ছাগল এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই ছাগল আবার খামারে মল ত্যাগ করে। যে ব্যক্তি খামারে কাজ করে, সে যখন ছাগলের মল পরিষ্কার করে তার হাতের মাধ্যমে ক্রিমির ডিম ওদের খেতে দেবার সময় খাদ্যে মিশে যায়। এইভাবে খামারে অন্যান্য ছাগলের মধ্যে ক্রিমি ছড়িয়ে পড়ে। তবে যেসব পূর্ণবয়স্ক ছাগল মাঠে চরে ঘাস খায় তারাই প্রথম ফিতা ক্রিমি রোগে আক্রান্ত হয়। তাদের মল থেকে আবার অন্য পূর্ণবয়স্ক ছাগলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ছোট আকারের এক শ্রেণীর ক্রিমি রয়েছে। বাচ্চা ছাগল এই ধরনের ছোট ক্রিমিতে আক্রান্ত হয় বেশি। প্রসবের পর বাচ্চারা ছাগীর যে দুধ পান করে সেটা

বেশি পরিমাণে খেলে, আবার খামারের কাছাকাছি জায়গায় মাঠে মুখ ঘষলে অথবা খাদ্য ভেবে মুখে কিছু দিলে ছোট ক্রিমির ডিম বাচ্চাদের পেটে চলে যায়। অনেক সময় ছাগী মলের ওপর শুয়ে পড়ে। তখন পালানের বাঁটে ক্রিমির ডিম লেগে যায়। বাচ্চা যখন দুধ পান করে সেই সময় ছোট ক্রিমির ডিম ওদের পেটে চলে যাবার আশঙ্কা থাকে।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** ছোট ক্রিমি খুব একটা ক্ষতিকারক নয়। তবে এর জন্য একটা সাংঘাতিক রোগ—ইমমেচুওর এমকিসটো—মিয়াসিস্ হবার আশঙ্কা থাকে। এই রোগ দেখা দিলে ছাগল প্রথমে খেতে চায় না। ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল ত্যাগ করতে থাকে। দেহের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট অবধি বেড়ে যায়। এই রকম অবস্থায় ছাগল তিন থেকে চারদিন বেঁচে থাকে। দুর্ভোগ এইখানেই শেষ নয়। রোগটা মহামারীর মতো খামারে অন্যান্য ছাগলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

বড় ছাগল যারা ফিতা ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়েছে তারা প্রথম দিকে কিছুটা সাদা পাতলা মল ত্যাগ করতে থাকে। কোন খাবারই খেতে চায় না। পেটের আকার বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ঝুড়ির মতো দেখায়। দেখলে মনে হবে ছাগল সব সময় ঝিমিয়ে রয়েছে। অবশ্য দেহের তাপমাত্রা প্রায় স্বাভাবিক থাকে। যদি এইভাবে দুই থেকে তিন মাস বিনা চিকিৎসায় থাকে তবে শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে যায় যে শেষ অবধি মারা যায়। সাধারণভাবে দেখা গেছে, প্রবল শীতের সময় অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস অবধি ফিতা ক্রিমির আক্রমণ বেশি হয়। আর ছোট ক্রিমির আক্রমণ বর্ষায় বেশি।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** উভয় ধরনের ক্রিমির জন্য অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খুব কার্যকর। কেবলমাত্র ক্রিমি নষ্ট করা নয়, যাতে ক্রিমির আক্রমণ না ঘটে তার জন্য আগাম প্রতিরোধ হিসাবে একই ওষুধ প্রয়োগ করা যায়। এখানে দুটো ওষুধের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রতিরোধ এবং ছাগলের পেটে ক্রিমি নষ্ট করতে একইভাবে কাজ দেবে। একটি ওষুধের নাম হচ্ছে ডিসটোডিন এবং অপরটি হলো হেকসাথেন। উভয় ওষুধের কার্যকর ক্ষমতোর কোন পার্থক্য নেই। খাওয়াবার নিয়ম বাচ্চা এবং বড় ছাগলের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে লেখা থাকে। তাছাড়া ওষুধ বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলে সব কিছু ভালোভাবে জানিয়ে দেবে।

**পথ্য ঃ** ছাগল যদি পাতলা মল ত্যাগ না করে তাহলে যে পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য রোজ দেওয়া হয় তার কোন পরিবর্তন করা হবে না। ওষুধ প্রয়োগ করবার পর দশ থেকে বারো ঘণ্টা বাদেই ছাগলের পেট থেকে মরা অথবা আধ-মরা ক্রিমি মলের সঙ্গে বাইরে চলে আসে।

## গুটি বসন্ত

**কারণ ঃ** এক ধরনের ভাইরাস, যার মাধ্যমে রোগটি ছাগলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কেবল ছাগল নয়, ভেড়া, গবাদি পশু এবং আমাদের শরীরের মধ্যে বসন্ত

রোগের ভাইরাস আক্রমণ চালায়। ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ। খামারে কোন ছাগল এই রোগে আক্রান্ত হলে যদি তাকে সঙ্গে সঙ্গে খামার থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে না নেওয়া হয় তবে দু'-তিন দিনের মধ্যেই অন্য ছাগলরা ঐ রোগে আক্রান্ত হবে। বসন্ত রোগে আক্রান্ত কোন মানুষ যদি খামারের ঘরে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রেও রোগটি ছাগলের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** ছাগল গুটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে দেহের তাপমাত্রা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। দেহের তাপমাত্রা ১০৬ থেকে ১০৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে। মুখের ভিতর, ঠোঁট এমনকি পালান ও দুধের বাঁটে ছোট বড় ফোসকার মতো গুটি দেখা যায়। ছাগল কিছু খেতে চায় না। জাবর কাটা বন্ধ থাকে। মল ত্যাগ করে খুবই সামান্য। ছাগল এতটাই দুর্বল হয়ে যায় যে চলাফেরা করতে অসুবিধে হয়। ফলে সব সময় শুয়ে অথবা বসে থাকে। অনেক সময় জ্বরের সঙ্গে সর্দিও হয়। তখন নাক দিয়ে সর্দি গড়িয়ে পড়তে থাকে।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** গুটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত ছাগলকে ভালো করবার ওষুধ চিকিৎসাশাস্ত্রে আজও কিছু বের করা সম্ভব হয়নি। ফলে এই রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর হারটা খুব বেশি হয়। যদি দু'-চারটে ছাগল বেঁচে যায় তবে তাদের শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। ছাগীর দুধ দেবার ক্ষমতা কমে। দুর্বল বাচ্চা প্রসব করে। খাসীর শরীর ভেঙে যায়। ভালোভাবে পরিচর্যা করলেও শরীরে মাংস ঠিক মতো বাড়ে না। আবার যে পাঁঠাকে বংশ বাড়াবার কাজে পালন করা হচ্ছে তাকে খামারে ঐ কাজের জন্য না রেখে বিক্রি করে দেওয়াই ভালো।

প্রতিকার হিসাবে রোগে আক্রান্ত ছাগলকে খামারের আশে-পাশে কোথাও না রেখে পশু চিকিৎসালয়ে পাঠানো সব থেকে নিরাপদ। কারণ পালনকারীকে রোগে আক্রান্ত ছাগলকে আর সেবা বা পরিচর্যা করতে হবে না। কারণ পরিচর্যাকারীর মাধ্যমে রোগের ভাইরাস অন্য ছাগলের মধ্যে রোগ ছড়াতে পারে। তবে আগাম প্রতিরোধ হিসাবে বসন্ত রোগ কোথাও শুরু হলে সব ছাগলকে টিকা দিতে হবে। এই কাজটি করবেন কোন পশু চিকিৎসক।

**পথ্য ঃ** পশু চিকিৎসালয়ে ছাগলকে পাঠাবার আগে সামান্য জল মিশিয়ে পাতলা করে ঠাণ্ডা বার্লি খাওয়াতে হবে। এছাড়া জল মেশানো ঠাণ্ডা ভাতের ফেনও দিতে পারা যায়। কোন শক্ত খাদ্য দেওয়া চলবে না। কারণ গুটি বসন্ত হলে জিভে, মুখের ভিতর এবং পেটেও ঘা হয়। ফলে ছাগল কিছুই হজম করতে পারে না। তখন পাতলা মল ত্যাগ করতে শুরু করে।

## নিউমোনিয়া

**কারণ ঃ** ছাগলের ক্ষেত্রে সাংঘাতিক রোগ নিউমোনিয়া। বর্ষার সময় কয়েক দিন ধরে বৃষ্টিতে ভিজলে অথবা শীতের সময় বিশেষ করে বাচ্চা ছাগলের ঠাণ্ডা লাগলে নিউমোনিয়া হয়। ছাগলের স্বভাব হলো সামান্য বৃষ্টি পড়লেই ওরা চিৎকার

করে দৌড়ে গাছতলা, কোন বাড়ির দাওয়ায় অথবা কাছাকাছি ওপরে সামান্য আচ্ছাদন দেওয়া অল্প জায়গা পেলে সকলেই সেখানে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। কারণ দেহের মোটা এবং ঘন লোম একবার ভিজলে সহজে শুকাতে চায় না। সেই কারণে গৃহপালিত পশু ও পাখিদের মধ্যে ছাগল, মুরগি এবং খরগোসকে মোটেই স্নান করাতে হয় না।

নিউমোনিয়া খুবই ছোঁয়াচে রোগ। রোগে আক্রান্ত ছাগলের নাক দিয়ে যে সর্দি গড়িয়ে পড়ে তার সঙ্গে মিশে থাকে নিউমোনিয়ার অসংখ্য জীবাণু। তাছাড়া রোগটি জীবাণুর আক্রমণের জন্য হয়ে থাকে। অবশ্য ক্ষমতা অনুসারে জীবাণুদের কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সুতরাং জীবাণুর শক্তি অনুসারে রোগের তীব্রতা কম অথবা বেশি হয়।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** ছাগলের দেহের তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রী থেকে ১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত বেড়ে যায়। রোগের তীব্রতা বেশি হলে দেহের তাপমাত্রা বেশি বেড়ে যায়। বুকের ভিতর সর্দি বসে যায়। ছাগলের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কিছু খেতে চায় না এবং জাবর কাটা বন্ধ করে দেয়। শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। শুয়ে অথবা বসে ঘুমোতে থাকে। সময়ে চিকিৎসা শুরু না করলে ছাগল মরে যাবার আশঙ্কা থাকে।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** নিউমোনিয়া রোগে ছাগলের মৃত্যুর আশঙ্কা নেই বললেই চলে। কারণ এই রোগের বেশ কিছু কার্যকর ওষুধ রয়েছে। কিন্তু পালনকারীর কোন ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ বুকে কি পরিমাণে সর্দি বসেছে সেটা কল দিয়ে দেখে একমাত্র চিকিৎসক বুঝতে পারেন। তাছাড়া রোগের তীব্রতা কতটা বেশি সেটাও পশু চিকিৎসক ছাড়া আর কারুর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সুতরাং নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত ছাগলকে পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া অথবা খামারে চিকিৎসককে ডেকে চিকিৎসা করানো উচিত।

**পথ্য ঃ** একমাত্র পাতলা করে সামান্য গরম বার্লি অথবা ভাতের ফেন সামান্য লবণ মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে পশু চিকিৎসক দেখার পর যেভাবে পথ্য দেবার নির্দেশ দেবেন সেই মতো খাদ্য দেওয়া দরকার।

## গলার নলি ফোলা

**কারণ ঃ** যদিও এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে ছাগল এই রোগে আক্রান্ত হয় কিন্তু কিভাবে এবং কার মাধ্যমে ভাইরাস ছাগলের দেহে প্রবেশের সুযোগ পায় সেটা আজও জানা যায়নি। রোগটা ভীষণ ছোঁয়াচে। সুতরাং খামারে কোন ছাগল এই রোগে আক্রান্ত হলেই তাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেওয়া দরকার। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই রোগটিকে বলে 'ফুট অ্যাণ্ড মাউথ রোগ'। আবার সংক্ষেপে এফ. এম. ডি চিকিৎসকরা বলে থাকেন।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** রোগের প্রথম দিকে জিভ এবং মুখের মাঝখান বরাবর ঘা হয়। কয়েক দিন যাবার পর গলার নলির কাছটা বেশ ফুলে ওঠে। অনেক সময় শ্বাসনালীতেও ঘা হতে পারে।

দেহের তাপমাত্রা ভীষণ বেড়ে যায়। যদি তাপমাত্রা ১০৬ থেকে ১০৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট অবধি ওঠে সেটা এমন কিছু অবাক হবার ব্যাপার নয়। যদি ছাগীর গর্ভে বাচ্চা থাকে তবে গর্ভপাত হবার আশঙ্কা থাকে।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** গৃহপালিত পশু-পাখির চিকিৎসা সাধারণভাবে পালনকারী এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করে নিজেই করে থাকে। কিন্তু পালনকারীকে মনে রাখতে হবে সে চিকিৎসক নয়। লক্ষণ মিলিয়ে ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা করে ওষুধ দিলেও সামান্য ভুলের ফলে পশুটি মারা যায়। এভাবে অসময়ে একটি পশুর মৃত্যুর অর্থ হল খামারীর আর্থিক ক্ষতি। কাজেই সামান্য সন্দেহ হলেই পশু চিকিৎসকের সাহায্য এবং সুপরামর্শ গ্রহণ করা দরকার।

গলার নলি ফোলা রোগের ক্ষেত্রেও কোন পালনকারীর নিজের বিচার অনুসারে ছাগলকে কোন ওষুধ দেওয়া ঠিক হবে না। প্রথম কারণ হলো, এই রোগটি খুবই জটিল। তার পরের কারণটি হচ্ছে, যদি ঠিক মতো ওষুধ নির্বাচন করা না হয় তাহলে পরে রোগ প্রবল আকার ধারণ করবার আশঙ্কা থাকে। তখন পশু চিকিৎসক সঠিক ওষুধ দিলেও কোন কাজ হবে না। সুতরাং প্রথমেই পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে ছাগলকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো অথবা চিকিৎসককে খামারে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আর কাজটি যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করা দরকার।

**পথ্য ঃ** রোগ যদি কঠিন আকার ধারণ করে তবে ছাগলের ইচ্ছে থাকলেও নলিতে ঘা থাকায় কিছুই খেতে পারে না। তবে সামান্য লবণ মেশানো ঠাণ্ডা ভাতের ফেন অথবা ঠাণ্ডা পানীয় জল ছাগলের মুখের সামনে রাখা দরকার। পিপাসা পেলে তখন কষ্ট করে সামান্য পরিমাণে ফেন অথবা জলপান করতে পারে।

## এঁটুলি ও থাইলেরিয়া

**কারণ ঃ** একটির সঙ্গে অপর একটি আলাদা ধরনের রোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। এঁটুলি এক ধরনের পরজীবী পোকা। পরজীবী হচ্ছে যারা অপরের ওপর নির্ভর করে নিজেরা বেঁচে থাকে। ছাগলের চামড়ার ওপর এঁটুলি আশ্রয় নেয় এবং ওদের রক্ত চুষে খেয়ে নিজেরা বেঁচে থাকে। ছাগলের চামড়ার ওপর এঁটুলি যদি আশ্রয় নেয় তবে এদের মাধ্যমে থাইলেরিয়া নামে অন্য একটি রোগে ছাগলের আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। অনেকটা ম্যালেরিয়ার মতো রক্তের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। মশা যেমন ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে তেমনি এঁটুলির মাধ্যমে থাইলেরিয়া সংক্রামিত হয় ছাগলের মধ্যে। রোগটি ধরবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ছাগলের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা। থাইলেরিয়ার কোন বাংলা নাম নেই।

যে শ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে তারা মানুষকে কামড়ালেই যে তার ম্যালেরিয়া হবে সেটা মোটেই ঠিক কথা নয়। যদি মশাটি

ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত কোন মানুষকে কামড়ায় তবেই মশাটি ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করবে। ছাগলের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। এঁটুলি যদি থাইলেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে তবেই ছাগল ঐ রোগে আক্রান্ত হবে। নতুবা এঁটুলি ছাগলের শরীর থেকে রক্ত চুষে খেতে থাকবে। ছাগল প্রতিদিন পরিমাণ মতো এবং পুষ্টিকর খাদ্য খেয়েও রক্তশূন্যতার জন্য ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। সাধারণভাবে ছাগল যখন মাঠে চরে ঘাস খায় সেই সময়ে এঁটুলি ওদের লোমের নিচে চামড়ার ওপর আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে এঁটুলি খামারে অন্যান্য ছাগলের শরীরে আশ্রয় নেয়। কারণ ছাগলের শরীরে আশ্রয় নেবার পর খুব তাড়াতাড়ি বংশ বাড়াতে থাকে।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** এঁটুলি যদি থাইলেরিয়া রোগের জীবাণু বহন না করে তবে ওরা একবার আশ্রয় নিলেই ছাগলের লোমের চাকচিক্য নষ্ট হয়ে যায়। ছাগলের শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রক্ত কমে যাবে। ছাগল ধীরে ধীরে দুর্বল এবং রোগা হতে থাকবে।

এঁটুলির মাধ্যমে ছাগল যদি থাইলেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় তবে প্রথম লক্ষণ হচ্ছে ছাগলের খিদে মোটেই থাকবে না। ফলে যে কোনো খাদ্য ছাগলের মুখের সামনে রাখলেও মোটেই খাবে না, ছাগী গর্ভধারণ করবার জন্য কোন সময়েই উত্তেজিত হবে না এমনকি নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেও। অবশ্য যারা বেশি সংখ্যায় ছাগল পালন করছে তাদের পক্ষে এসব সঠিকভাবে মনে রাখাটা সব সময় সম্ভব হয় না। রোগ বহু ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে না। যখন সব কিছু চিকিৎসার বাইরে চলে যায় তখন বুঝতে পারা গেলেও আর কোন উপায় থাকে না। ছাগল ভীষণ দুর্বল হয়ে শেষে মারা যায়।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** কেবলমাত্র এঁটুলির হাত থেকে ছাগলকে রক্ষা কববার জন্য ওষুধ হিসাবে এসকাবিয়েল প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স এবং স্যানডোজ কোম্পানির ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। যে দোকান থেকে ওষুধ কেনা হবে তারাই ওষুধ খাওয়াবার পরিমাণ বলে দেবে।

এঁটুলি যদি থাইলেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে এবং ছাগল যদি ঐ রোগে আক্রান্ত হয় তবে ভালো করবার কোন ওষুধ নেই। তবে আগাম প্রতিরোধ করবার জন্য টিকা রয়েছে। তবে সব থেকে হতাশার বিষয় হচ্ছে এই টিকা আমাদের দেশে তৈরি হয় না। বিদেশ থেকে মোটা টাকা খরচ করে আনাতে হয়। কাজেই থাইলেরিয়া রোগে আক্রান্ত ছাগী, খাসী অথবা পাঁঠাকে মাংস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়াই খামারের পক্ষে লাভজনক।

এঁটুলির হাত থেকে ছাগলকে রক্ষা করতে হলে খামার প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যদি পাকা দেওয়াল হয় তবে বছরের মধ্যে একবার চুনকাম করা উচিত। দেওয়াল দরমা ঘেরা এবং টালির ছাদ থাকলে বাঁশের কাঠামো এবং

দরমাতে প্রতি বছর বর্ষার আগে সব জায়গায় ভালোভাবে আলকাতরা লাগানো দরকার। এইভাবে পরিষ্কার রাখলে খোঁয়াড়ে প্রতিপালিত ছাগল এঁটুলির আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে।

**পথ্য ঃ** এঁটুলির মাধ্যমে ছাগল যদি থাইলেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় তবে বিশেষ কোন পথ্যের দরকার নেই। কারণ ছাগল কিছুই খেতে চায় না। তবে সাধারণভাবে এঁটুলির আক্রমণে মিশ্র সুষম খাদ্য যেমন খেতে দেওয়া হবে তার সঙ্গে সামান্য কিছুটা বেশি পরিমাণে খনিজ লবণ দেওয়া দরকার।

## বিবিধ

খামারে বেশি সংখ্যাতে ছাগল পালন করতে গেলে কয়েকটা অতিরিক্ত কাজ পালনকারীকে করতে হয়। এটা তার নিজের সুবিধার জন্য। ঐসব কাজের মধ্যে রয়েছে—(ক) শিং নষ্ট করা, (খ) খামারের ছাগল চেনার জন্য চিহ্ন দেওয়া, (গ) ছাগলকে ব্যায়াম করানো এবং (ঘ) পাঁঠাকে নিজেই খাসী করা। যে চারটি কাজের কথা বলা হলো খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। একটু সাবধান হয়ে করলেই কোন রকম অসুবিধা হয় না।

**(ক) শিং নষ্ট করা ঃ** এটা করা হয় যাতে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে শিং ভেঙে না ফেলে। শিং ভাঙলে ভালো রকম রক্ত বের হয় এবং ছাগল দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজটি করতে হবে ছাগলের বয়স ১৫ দিন হলে। আবার ২১ দিনের বেশি বয়স হলে শিং নষ্ট করা চলবে না। শিং ওঠার জায়গাটায় ছোট কাঁচির সাহায্যে যতটা সম্ভব ছোট করে লোম কেটে দিতে হবে। এরপর ভেজলিন লাগিয়ে বেঁধে রাখা দরকার। পর পর তিন দিন ভেজলিন লাগিয়ে দেবেন।

এবার ঐ জায়গা থেকে পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে ভেজলিন ভালোভাবে তুলে কস্টিক দ্রবণ কাঠিতে কাপড়ের তুলির সাহায্যে হালকা চাপ দিয়ে ঘসতে হবে। ঘসতে হবে সেই সময় অবধি যে পর্যন্ত না জায়গাটা বেশ লাল হয়। শেষে ওখানে ভেজলিন লাগিয়ে বাচ্চাকে আলাদা রাখতে হবে। ঘা শুকিয়ে যেতে শীতকালে আট থেকে দশ দিন লাগবে। গরমের সময় এক সপ্তাহ লাগতে পারে। তবে বর্ষার সময় কাজটি না করাই ভালো। কস্টিক দ্রবণ করতে হবে কাচের পাত্র অথবা চিনামাটির কাপে। জল লাগবে ৫০ মিলিলিটার আর কস্টিক ৬ গ্রাম। জলে কস্টিক দিয়ে স্টিলের চামচ দিয়ে নাড়লেই দ্রবণ হবে। দ্রবণ বা কস্টিকে হাত দেওয়া উচিত নয়। এতে চামড়া খারাপ হয়ে যায়।

ছাগলের ঘা যদি দু' সপ্তাহের মধ্যে না শুকিয়ে যায় তবে সুফ্রামাইসিন অথবা টেরামাইসিন মলম সারা দিনে দু'বার করে তিন দিন লাগালেই ঘা শুকিয়ে যাবে।

**(খ) খামারের ছাগল চেনার চিহ্ন দেওয়া ঃ** এই কাজের জন্য পাঁচটি উপায় রয়েছে। তাদের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে পারা যাবে। (১) **কানের পাতায় নম্বর দেওয়া হয়** এক মাস বয়সের বাচ্চাকে ট্যাটুইং মেশিনের সাহায্যে। ব্যবহার

করা সহজ এবং কাজ তাড়াতাড়ি করা যায়। (২) **কানের খাঁজ কাটা** হবে কোন ধারালো কাঁচির সাহায্যে ২০ দিনের বাচ্চা ছাগলের। সব ছাগলের যে কোনো একদিকে কানের খাঁজের কাছে এবং কাটার আকৃতি হবে বর্শার ফলার মতো। (৩) **কানে রিং পরানো** হয় যে কোন একদিকে এবং সব ছাগলকে এক মাস বয়সের মধ্যে। কানের পাতায় জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে সরু সূঁচকে মুছে ফুটো করে তার মধ্যে সরু তামার তার গোল করে উভয় দিক মুড়ে দিতে হয়। অনেকটা মেয়েদের কানের রিংয়ের মতো। (৪) **উলকি এঁকে** দিতে পারা যায় কানের পাতার নিচের দিকে। যে কোনো একটা চিহ্ন ডান অথবা বাঁদিকের সব ছাগলের। কাজটা করা হবে ছাগলের বয়স এক মাস হলে। (৫) **গলায় নাম্বার ঝোলানো**—যে কোনো ধাতুর পাতে নম্বর খোদাই করে সেটা সরু তারের সাহায্যে ছাগলের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

**(গ) ছাগলকে ব্যায়াম করানো :** উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে পালিত ছাগল মাঠে চরতে চায় না। তাদের খাদ্য হজম করতে এবং শরীর ভালো রাখতে খামারের সামনে কিছুটা জায়গা ঘিরে রাখতে হবে। সেখানে দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টার জন্য ছাগলকে ঘুরতে দেওয়া দরকার।

**(ঘ) পাঁঠাকে খাসী করা :** ছাগলের বয়স ১৫ দিন হলে সেই সময় থেকে ২০ দিনের মধ্যে খাসী করতে হয়। এর থেকে বেশি বয়স হলে ওদের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে কাজটি হাতে-কলমে দেখে এবং ভালোভাবে শিখে নিজেই করা যায়। এতে সময়ে কাজ মেটে এবং পয়সাও খরচ হয় না।
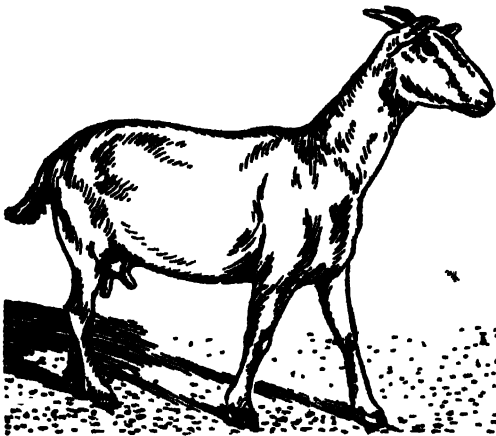
# কুকুর

## কুকুর পালন

গো জাতির দ্বারা যে রকম উপকার পাওয়া যায়, কুকুর দিয়েও আমাদের প্রায় অনেকাংশে সে রকম উপকার হয়ে থাকে, কারণ কুকুরের মতো প্রভুভক্ত পশু আর দেখা যায় না। কিসে প্রভুর উপকার হয়, কিসে প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধিত হয়, কুকুর প্রাণপণে কেবল সে রকম আচরণই করে থাকে। অধিকন্তু এরা অল্পেই সন্তুষ্ট, এক মুষ্টি খাবার পেলে পেট না ভরলেও তারা প্রভুর উপর সন্তুষ্ট থাকে।
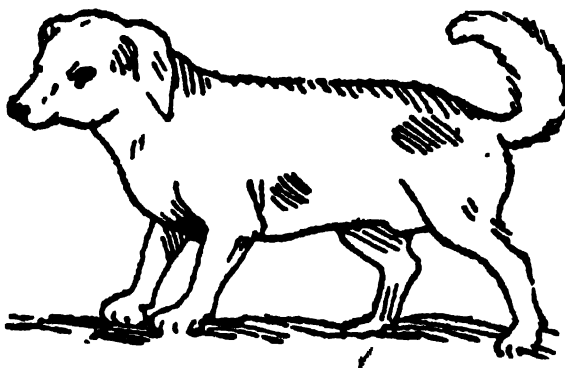
কুকুরেরা সর্বদা আপন প্রতিপালক প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেই ভালোবাসে। তাদের মনে এই ধারণা যে, পথের মধ্যে প্রভু কোনরকম বিপদে পড়লে সাধ্যানুসারে তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। অন্য হিংস্রজন্তু আক্রমণ করলে প্রভুকে সে আক্রমণ হতে রক্ষা করবে। এটিই কুকুরের আন্তরিক অভিপ্রায়।

কুকুরের অনেক গুণ আছে। এদের মতো সতর্ক পশু পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। এরা রাত্রিতে প্রায়ই ঘুমায় না। বাড়ির চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় এবং পাহারা দেয়—যাতে চোর ডাকাত বা অপরিচিত কোন ব্যক্তি ঢুকতে না পারে। এ বিষয়ে কুকুর খুবই যত্নশীল।

আমাদের দেশের চাইতে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে কুকুরের প্রতি যত্ন ও আদর অনেক বেশি দেখা যায়। ঐ সব দেশের লোকেরা কুকুরকে এমন শিক্ষা দেন, যাতে তাদের দ্বারা মানুষ অপেক্ষা অনেক গুরুতর কাজ ও আবশ্যকীয় কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। আজকাল ঐ সকল মহাদেশে কুকুরেরা দূতের কাজ করছে। কোনখানে চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হলে কুকুরের দ্বারাই তা পাঠানো হয়। কুকুর যথাস্থানে পত্র দিয়ে তার উত্তরও নিয়ে আসে তার প্রভুর কাছে। আজকাল কুকুর যুদ্ধে প্রহরীর কাজও করে থাকে। সুতরাং এই প্রকার জন্তুকে আদর যত্ন করা উচিত।

আমাদের দেশে কুকুরকে অস্পৃশ্য বলে। এরকম মহোপকারী জন্তুকে শাস্ত্রে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হলো কেন তা আমরা বুঝতে অক্ষম। তবে একথা বলতে পারি, সে যদি অস্পৃশ্য হয় তবে স্পর্শ না করলেই হলো। কিন্তু পালন করলে তাদের আদর বা যত্ন করব না কেন? তাই কুকুরকে যে আদর যত্ন করা উচিত এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

## কুকুরের শুভাশুভ লক্ষণ

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিহ্ন দেখে যেমন মানুষের স্বভাবচরিত্র ও শুভাশুভ জানা যায়, সে রকম কুকুরের চেহারা বা মুখ দেখলেও তাদের প্রতিপালকের শুভাশুভ ফল জানা যায়।

যে কুকুরের পিছনের পদযুগলের প্রত্যেকটিতে পাঁচটি নখ এবং সামনের দিকের বাঁ পাশের পায়ে তিনটি ও দক্ষিণ দিকের পায়ে ছয়টি নখ দেখা যায়, যার ওষ্ঠ ও নাকের আগের দিক রক্তবর্ণ, গতি সিংহের মতো, যে কুকুর যাওয়ার সময়ে মাটি শুঁকতে শুঁকতে যায়। যার লাঙ্গুল রোমময়, চোখ নক্ষত্রের মতো দেখতে, কান লম্বা ও মৃদু। এরকম কুকুর তার প্রতিপালক স্বামীর শ্রীবৃদ্ধি করে থাকে।

যে কুকুরীর পিছনের পায়ে প্রত্যেকটিতে পাঁচ পাঁচটি এবং সামনের দিকে বাঁদিকের পায়ে পাঁচ ও দক্ষিণদিকের পায়ে ছয়টি নখ আছে, লেজ রক্তবর্ণ ও হলদে, কান লম্বা, এরকম লক্ষণযুক্ত কুকুরী তার প্রভুকে রাজ্যের অধীশ্বর করে দেয়।

কুকুরেরা ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে চার প্রকার। যার রং সাদা ও আকার লম্বা, যাদের কান সিধে, পুচ্ছ ছোট, পেট দীর্ঘ, দাঁতের পাটি সাদা ও তীক্ষ্ণ, তারা ব্রাহ্মণ বলে গণনীয়। যাদের গা লাল রংয়ের, কান লম্বা, নখ ও দাঁত লম্বা এবং যারা অল্প লোম বিশিষ্ট, ক্রোধী, যাদের জিহ্বা লম্বা, তারা বৈশ্যজাতি। যে সব কুকুর কালো, মুখ লম্বা, রাগশূন্য, পরিশ্রমী ও যারা লম্বা লোমযুক্ত, তারা শূদ্রজাতীয় বলে গণ্য। এ ছাড়া যে সব কুকুরের দৈর্ঘ্য পরিমাণে অল্প, পেট ও লেজ বড়, চোখ ছোট ও লঘু, যারা অপবিত্র খাদ্য খায় ও যাদের অনেক বাচ্চা হয়, তারা অন্ত্যজ বলে গণ্য হয়।

# কুকুরের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা

## জ্বর রোগ চিকিৎসা

**লক্ষণ ঃ** কুকুরের জ্বর হলে তার গা গরম বোধ হয়, চোখ স্বাভাবিক রং থেকে বেশি লাল হয়ে ওঠে, সবসময় শুয়ে থাকে। দেখলে মনে হয় যেন তার মনে স্ফূর্তি নেই। আহারে কোন রুচি থাকে না। পিপাসা বেড়ে যায়। এরা লেজ নেড়ে যে আনন্দ প্রকাশ করে, জ্বর হলে আর সেরকম করে না।

## চিকিৎসা

| | | |
|---|---|---|
| (১) | যমানী (যোয়ান) | আধ ছটাক |
| | কর্পূর | সিকিভরি |
| | মেথি | আধছটাক |
| | কৃষ্ণজীরক | ১ তোলা |

উপরোক্ত জিনিসগুলো একসাথে অর্ধেক কুটে আধ সের জলে কাঠের জ্বালে সিদ্ধ করবেন। আধপোয়া অবশিষ্ট থাকতে নামাতে হবে। এর অর্ধেক সকালে ও বিকালে অর্ধেক খাওয়াতে হবে। এতে বেশ উপকার হয়।

(২) গোলমরিচ, তেলাকুচাগাছের মূল, সাদা জিরে, হলুদ, কচি দূর্বাঘাস, সৈন্ধব লবণ—এই সকল দ্রব্যসূমহ ২ তোলা হিসেবে নিয়ে একটা নতুন মাটির পাত্রে আধ সের জলের সাথে সিদ্ধ করবেন। কাঠের জ্বালে সিদ্ধ করাই বিধি। আধ পোয়া অবশিষ্ট থাকতে নামাতে হবে। ঐ জলের অর্ধেক সকালে ও অর্ধেক বিকালে খাওয়াতে হবে। এতে কুকুর সুস্থ বোধ করবে।

## আমাশয় ও রক্তামাশয় চিকিৎসা

**লক্ষণ ঃ** আমাশয় বা রক্তামাশয় হলে কুকুর ছটফট করে বেড়ায়, ঠিক হয়ে এক জায়াগায় বসে থাকতে পারে না। কোন জিনিসই খেতে চায় না, গায়ে হাত দিলে বোধ হয় যেন লোমগুলি শিহরিয়া উঠে। পেটে হাত বুলালে আরাম বোধ করে। বারে বারে অল্প পরিমাণে শ্বেত তরল পায়খানা করে। এই রোগ কুকুরের পক্ষে মারাত্মক। শীগগিরই এর প্রতিকার না করলে কুকুরের প্রাণসংশয় ঘটে।

## চিকিৎসা

(১) ভেরেন্ডার তেল, ধুতুরা পাতার রস, যোয়ানের আরক, নাটা করঞ্জার মূলের রস, বাঁশপাতা সিদ্ধ, হাতিসুরা পাতার রস, পিপ্পলী সিদ্ধ জল—এই সব জিনিস একসাথে করে ভালোভাবে মিশাতে হবে। তারপর এটি ধীরে ধীরে কুকুরের নাভিতে মালিশ করতে হবে। দৈনিক ৪/৫ বার মালিশ করা উচিত। এইরকম করলে ৩-৪ দিনেই সেরে যায়।

| | | |
|---|---|---|
| (২) | মধু | ১ ছটাক |
| | তেজপাতা গুঁড়ো | আধ ছটাক |
| | গুগগুল | আধ ছটাক |
| | পিপুল | আধ তোলা |

উপরোক্ত জিনিসগুলি (মধু ব্যতীত) মিহি চূর্ণ করে কাপড়ে ছাঁকতে হবে। তারপর চূর্ণ একসাথে করে মধুর সাথে মিশিয়ে অবলেহ তৈরি করতে হবে। দৈনিক ৫-৬ বার এই ওষুধের একটু একটু কুকুরের মুখের জিহ্বায় দিলেই এটি খেয়ে ফেলে। এর দ্বারা তাড়াতাড়ি রোগ মুক্ত হয়।

## উপদংশ চিকিৎসা

কুকুরের উপদংশ রোগ হলে জননেন্দ্রিয় স্থূল হয় এবং ঝুলে পড়ে; এতে দাগড়া দাগড়া রক্তবর্ণ ঘা হয়, পুঁজও পড়তে পারে। শীগগিরই এর চিকিৎসা করা দরকার। নইলে মৃত্যুমুখে পড়তে পারে।

### চিকিৎসা

| | | |
|---|---|---|
| (১) | মেথি | ৮ তোলা |
| | সোহাগার খৈ | ৪ তোলা |
| | গব্যঘৃত | প্রয়োজন মতো |

প্রথমতঃ সোহাগার খৈ ও মেথি একসাথে গুঁড়ো করে নিয়ে প্রয়োজন মতো ঘিয়ের সাথে মেশাতে হবে। এটি মলমের মতো হলে রোগ স্থানে প্রলেপের মতো প্রয়োগ করবেন। এতে অল্পদিনের ভিতরই কুকুর সুস্থ হয়ে যায়।

## কুকুরকে নীরোগ রাখবার প্রক্রিয়া

কুকুরকে নীরোগ রাখতে হলে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। সাবানের জল দিয়ে মাঝে মাঝে গা ধুয়ে দিতে হবে। নোংরা স্থানে অর্থাৎ কাদা ও মলাদি দূষিত জায়গায় যেতে দিতে নেই। যা তা খেতে দেওয়া অনুচিত। কুকুরকে দুবেলা খেতে না দিয়ে দিনান্তে সন্ধ্যাকালে পেট ভরে খেতে দিতে হবে।

### চিকিৎসা

| | | |
|---|---|---|
| (১) | বিট লবণ | ৩ ছটাক |
| | পুরাতন ইক্ষুগুড় | ৬ তোলা |
| | শুণ্ঠী চূর্ণ | ৩ তোলা |
| | গন্ধক চূর্ণ | ১ তোলা |
| | পাপড়ি খয়ের | আধ তোলা |

উপরোক্ত জিনিসগুলি একসাথে করে তার সামান্য কিছু নিয়ে খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দেবেন। অথবা যে কোন উপায়ে প্রতিদিন খাওয়াবেন। এতে কুকুরের দেহ হৃষ্টপুষ্ট নীরোগ থাকে সন্দেহ নেই।

## কাস চিকিৎসা

**লক্ষণ ঃ** কুকুরের কাস রোগ হলে কুকুর সর্বদা খক্ খক্ করে কাসে; মুখ এবং নাক দিয়ে লালা ঝরে। পাঁজরায় ব্যথা হয়, একস্থানে ঠিক হয়ে থাকতে পারে না। শুয়ে থাকতেও কষ্ট বোধ হয়। খেতে রুচি থাকে না। ক্ষুধার তাড়নায় যদিও কিছু আহার করে তা হজম করতে সমর্থ হয় না। বমি করে ফেলে।

## চিকিৎসা

| | | |
|---|---|---|
| (১) | পুরাতন ইক্ষু গুড় | ৬ তোলা |
| | বিট লবণ | ২ ছটাক |
| | শুণ্ঠী চূর্ণ | ২ তোলা |
| | গন্ধক চূর্ণ | ৫ তোলা |
| | মধু | প্রয়োজন মতো। |

প্রথমে উপরোক্ত চারটি জিনিস ভালোভাবে গরমজলে পিষে নিয়ে একদিন রোদে শুকনো করতে হবে। তারপর মধুর সাথে মিশিয়ে রাখবেন। দিনের মধ্যে ৪-৫ বার এর একটু একটু করে কুকুরকে খাওয়াতে হবে। এতে উপকার হয়।

(২) গেঠেলা, আকর কোরা, গুলঞ্চমূল, তেউড়ী, তেজপাতা, বেড়েলা—এই সব দ্রব্য সমানভাবে নিয়ে জলে সেদ্ধ করতে হবে। অর্ধেকটা হলে নামিয়ে নিয়ে কুকুরের গলায় মালিশ করতে হবে। এতে অনেক উপকার হয়।

## জিহ্বার ঘা

এই রোগ কুকুরের পক্ষে যারপরনাই মারাত্মক। শীগগিরই এর প্রতিকার করতে না পারলে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে।

### চিকিৎসা

| | | |
|---|---|---|
| (১) | জাঙ্গাল | আর্ধ তোলা |
| | সমুদ্র ফেনা | ১ তোলা |
| | নিমপাতা | সিকি তোলা |
| | কাঁটানটের শিকড় | আধ তোলা |
| | মোম | সিকি তোলা |

এই সমস্ত জিনিস একসাথে পিষে নিয়ে সামান্য গরম জলের সঙ্গে মেশাবেন। যখন কাদার মতো হবে তখন একটু একটু করে জিহ্বায় দিতে হবে।

(২) নিমের পাতা সিদ্ধ করে দৈনিক সেই জল দিয়ে দুবেলা জিহ্বা ধুয়ে দিতে হবে। এতে খুব অল্পদিনের মধ্যেই জিহ্বাক্ষত সেরে যায়।

# শিয়াল বা শৃগাল দংশন চিকিৎসা

কুকুরকে যদি শিয়ালে কামড়ায়, তাহলে শিয়ালের বিষ কুকুরের দেহে ঢুকে যায়। অতিরিক্ত পরিমাণে সেই বিষ রক্তের সাথে মিশলে কুকুরের প্রাণ সংশয় হয়।

**লক্ষণ ঃ** যদি কুকুরকে শিয়ালে কামড়ায়, তাহলে সে বিষে কুকুরের স্ফূর্তি নষ্ট হয়ে যায়। কুকুর যেন ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকিয়ে থাকে। জ্বর হয়। অথবা যেন জ্বরভাব হয়েছে বলে বোধ হয়।

## চিকিৎসা

| | |
|---|---|
| ঘলঘসিরা শিকড় | ৩ তোলা |
| ফটকিরি | ২ তোলা |
| নিমের পাতা | ১ ছটাক |
| নরমূত্র | ৪০ ফোঁটা |

প্রথম তিনটি জিনিস চূর্ণ করে নরমূত্রের সাথে মিশাতে হবে। তারপর গরম জলের সাথে মিশিয়ে আট বারে এটি খাইয়ে দেবেন। প্রতিদিন দুবার খাওয়ালেই যথেষ্ট। কুকুরকে খুব গরমে রাখতে হবে অর্থাৎ শীতল জায়গায় থাকতে দেবেন না। কম্বল বা অন্য কোন গরম কাপড়ের উপর শুতে দেবেন এবং যতদিন আরোগ্যলাভ করতে না পারে ততদিন মাংস খেতে দেবেন না। বিশেষত জল খেতে দেবেন না। তৃষ্ণায় নিতান্ত ছটফট করলে অল্প পরিমাণে জল দেবেন। অধিকন্তু নিচের ওষুধের জল দিয়ে দংশনজনিত ঘা ধুয়ে দিতে হবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| গুড়ুচি | ১ দফা | হিরাকস | ১ দফা |
| পটারির পাতা | ১ দফা | সমুদ্র ফেনা | ১ দফা |
| কলার এঁটে | ১ দফা | গুগগুল | ১ দফা |

এই কয়টি জিনিস সমানভাবে নিয়ে অনুমান মতো জলে সিদ্ধ করবেন। পরে সেটা ছেঁকে নিয়ে সেই জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

# অশ্ব
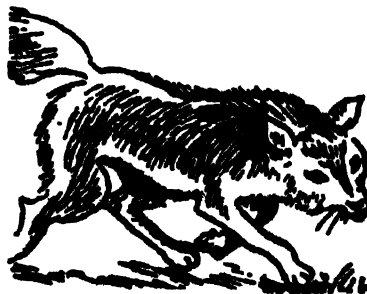
## অশ্ব পালন

আমাদের জাতীয় জীবনে অশ্ব পালন ততটা প্রচলিত নয়। কেবল পার্বত্য অঞ্চল ইত্যাদিতে অশ্ব পালন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক ধনী ব্যক্তি অশ্ব পালন করেন।
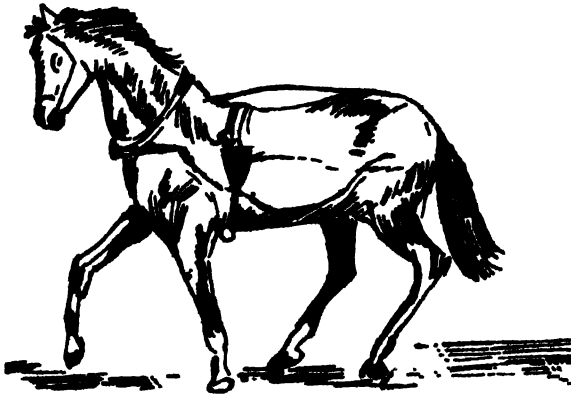
ভারতের অশ্ব অপেক্ষা অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলের অশ্ব অনেক বলশালী ও দ্রুতগামী। বর্তমানে ভারতে বিদেশী অশ্ব বা দেশী-বিদেশী মিশ্রণে বাচ্চা তৈরি হচ্ছে ও পালিত হচ্ছে। আগে এ দেশে বিদেশী অশ্ব ব্যতীত ঘোড় দৌড় হতো না আজকাল দেশী অশ্ব বা মিশ্রিত প্রজাতির অধিকাংশ অশ্ব এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অশ্ব পালন করা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। বিশেষ করে উঁচু জাতের অশ্ব পালন করতে হলে বিশেষভাবে যত্ন অবলম্বন করতে হয়।

অশ্ব পালন করতে হলে তাদের আহারের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম করানোও প্রয়োজন হয়।

### আহার

ঘোড়া ঘাস, ছোলা, খড় ইত্যাদি আহার করে। বেশি খাওয়ালে ঘোড়া যদি মোটা হয়ে যায় তবে তার দৌড়াবার ক্ষমতা কমে যায়। আবার খুব দুর্বল ঘোড়াও ভালো নয়।

রেসের ঘোড়াকে দৌড়াবার আগে মিষ্টান্ন, মদ, ফল ইত্যাদিও খাওয়াতে হয় এবং তা হজমও করতে পারে।

## মন্দাগ্নি রোগের চিকিৎসা

ঘোটকের মন্দাগ্নি জন্মিলে প্রত্যহ গো-মূত্রের সঙ্গে ত্রিফলার জল সেবন করালে আরোগ্য হয়।

## পোস্টাই

যে সকল ঘোড়া কৃশ, তাদের পুষ্টির নিমিত্ত খাওয়ার জিনিসের সাথে মাংসের যূস মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। অধিকন্তু শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুতে সকালে ৪০ তোলা পরিমাণ গুড়চি পেষণ করে সেবন করাতে হবে।

## বাতিক বিকারের ওষুধ

ঘোড়ার বাতিক বিকার লক্ষণ দেখা দিলে দুধ মিশানো শালিধানের ভাত খাওয়াতে হবে। এতে তাড়াতাড়ি ফল হয়।

## পিত্তজনিত বিকারের চিকিৎসা

যদি প্রথমে পিত্তজনিত কারণে বিকারগ্রস্ত হয়, তাহলে মাংসের যূসের সাথে ঘি ও মুগের যূস মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

## সর্ববিধ পীড়ার জন্য

ত্রিদোষজনিত বিকার লক্ষণ দেখা দিলে এবং ঘোটক বধির হয়ে পড়লে তাকে গুগ্‌গুল খাওয়াতে হবে।

## ত্রিদোষজনিত বিকারের চিকিৎসা

ঘোড়ার যে কোন রোগ হোক না কেন, প্রথমে নস্য দেওয়া উচিত। তাহলে রোগ বাড়তে পারে না এবং ঘোড়ার জীবন সংশয়াপন্ন হয় না।

| | |
|---|---|
| জটামাংস | ১ ছটাক |
| গোড়ানেবুর রস | ১ ছটাক |

এই দুটি দ্রব্য একত্র করে নস্য প্রয়োগ করতে হবে।

| | |
|---|---|
| চিনি | ১ ভাগ |
| সরষের তেল | ১ ভাগ |
| ঘি | ২ ভাগ |
| শর্করা | ২ ভাগ |

এই দ্রব্যগুলো একত্র করে নস্য দিলে বাতিক রোগে উপকার হয়।

| | |
|---|---|
| শুণ্ঠী | ১ ভাগ |
| মরিচ | ১ ভাগ |
| পিপুল | ১ ভাগ |

এই কটি দ্রব্যের সাথে সরষের তেল মিশিয়ে নাকের ভিতর দিলে শ্লেষ্মা রোগ নিবারিত হয়।

| | |
|---|---|
| বহেড়া | ১ ভাগ |
| হরীতকী | ১ ভাগ |
| আমলকী | ১ ভাগ |

এই সব জিনিস ভিজিয়ে রেখে তার জল দিয়ে নস্য দিলে পিত্তজনিত রোগ দূর হয়।

## ঘোড়ার বাচ্চা বলিষ্ঠ করার উপায়

বাচ্চা প্রথম ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তার গায়ে ঘি দিয়ে মালিশ করতে হবে। অন্তত ১সপ্তাহ এরূপ চলবে। এর ফলে বাচ্চা ক্রমে বলবান ও নীরোগ হয় এবং বড় হয়ে ঘোড়ীর সঙ্গে সংসর্গ করে না।

এছাড়া বাচ্চাকে ২/১ দিন অন্তর ১ সের আটা ও ১ সের ঘি খেতে দিতে হবে।

### হজমী

| | |
|---|---|
| শুণ্ঠী | ১ পোয়া |
| পিপুল | ১ পোয়া |
| কালো লবণ | ১ পোয়া |
| কটকী | ৷৴পোয়া |
| গোলমরিচ | ১ পোয়া |

এই সকল দ্রব্য এক সাথে চূর্ণ করে দানার সাথে ঘোড়াকে খাওয়ালে কখনো ঘোড়ার পেটের রোগ হবে না। যা খাবে তাই হজম হয়ে যাবে।

### জোলাপ

নিম্নলিখিত ওষুধে ঘোড়ার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

| | |
|---|---|
| খাড়ি লবণ | ২ তোলা |
| হরীতকী | ২ তোলা |

এই দুটি জিনিস একসাথে চূর্ণ করে জলের সাথে ঘোড়াকে খাওয়াতে হবে।

### বারমাসিক জোলাপ

| | |
|---|---|
| কর্পূর | ২ তোলা |
| কমলাগুড়ি | ২ তোলা |
| মুসকর | ২ তোলা |

এই কটি জিনিস ভালোভাবে চূর্ণ করে রেড়ির তেলের সাথে মাখাতে হবে। ভালোভাবে মাখানোর পর ৩টি সমান বড়ি তৈরি করতে হবে। প্রত্যহ ১টি করে

বড়ি তিনদিন জলের সাথে খাওয়াতে হবে। প্রতিমাসে এই ওষুধ প্রয়োগ করলে ঘোড়ার দেহের সমস্ত মল দূর হয়। ওষুধ খাওয়ানোর দিন ঘোড়াকে দানা দেওয়া চলবে না। কেবল খড়, ভুসি ও ঘাস দিতে হবে।

| | |
|---|---|
| কাঠ নিম | ২ তোলা |
| পিপুল | ২ তোলা |
| মুসকর | ২ তোলা |

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একসাথে করে ৮ রতি প্রমাণ এক একটি বড়ি তৈরি করতে হবে। সকালে ছাতুর সঙ্গে ১টি করে বড়ি খাওয়াতে হবে।

## বাত বেদনার ঔষধ

ঘোড়ার পায়ে বা কোনস্থানে বাত বেদনা হলে ভাতের মাড় খুব গরম করে সেখানে ঢেলে দিতে হবে। এতে ঘোড়া ছটফট করতে থাকবে ঠিকই কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এর সুফল পাওয়া যায়।

## জহর বাত

ঘোড়ার দেহে কোন কোন স্থানে কখনো কখনো ফুলে যায় এবং তা ক্রমে ঘা হয়ে যায়। এরূপ হলে নিম্নের ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

| | |
|---|---|
| নীল বড়ি | ১ ভাগ |
| পান | ১ ভাগ |
| নিসিন্দা | ১ ভাগ |

উপরোক্ত ৩টি দ্রব্য একসাথে ভালোভাবে পিষে নিতে হবে। ভালোভাবে মেশানোর পর এটি ঘোড়াকে খাইয়ে দিতে হবে। তাহলেই এ রোগ নিরাময় হবে।

## বরছাতি বা পায়ের ঘা

ঘোটকের পায়ের তলায় ঘা হলে তাকে বরছাতি বলে। এরূপ হলে মসুর কলাই জলের সঙ্গে ভালোভাবে পিষে নিয়ে ঘায়ের জায়গায় লাগিয়ে বেঁধে দিতে হবে, অথবা মুরগির ডিমের মধ্যকার হলদে অংশ ফেটিয়ে ঘায়ে লাগালে তাড়াতাড়ি ঘা সেরে যায়।

এই প্রক্রিয়া যদি সম্ভব না হয় তাহলে নিচের দ্রব্য সকল এক সের পরিমাণ সরষের তেলের সাথে মিশিয়ে গরম করে লাগাতে হবে।

| | |
|---|---|
| কুচিলা | ১ ভাগ |
| হরীতকী | ১ ভাগ |
| জয়পাল | ১ ভাগ |

ঘায়ে যদি পোকা হয় তাহলে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে দিবারাত্রি বেঁধে রাখতে হবে।

## প্রস্রাবের পীড়া

ঘোড়া যদি ঘন ঘন প্রস্রাব করে তাহলে নিম্নোক্ত দ্রব্যসমূহ দানার সঙ্গে ৪/৫ দিন খাওয়ালেই উপকার হবে।

| | |
|---|---|
| মোম | ৮ তোলা |
| সোহাগার খৈ | ৮ তোলা |

## অজীর্ণ রোগ

ঘোড়ার অজীর্ণ রোগ হলে অর্থাৎ ভুক্ত জিনিস উত্তমরূপে পরিপাক না হলে ঘোড়ার উদর স্ফীত হয়, খাওয়াতে কোন রুচি থাকে না, মুহুর্মুহু দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ হয়। এই অবস্থায় নিম্নোক্ত ওষুধ প্রযোজ্য।

| | |
|---|---|
| আটা | ১ সের |
| জোয়ানের আরক | ১ সের |

এই দুটি জিনিস একসাথে উত্তমরূপে মিশিয়ে ঘোড়াকে খাওয়াতে হবে।

### ক্ষুধা বৃদ্ধির উপায়

যদি দেখা যায় ঘোড়া দানা কম খাচ্ছে, তখন বোঝা যায় ঘোড়ার ক্ষুধামান্দ্য হয়েছে। এই অবস্থায় ৩ আনা পরিমাণ হিং ও লবণ একসঙ্গে চূর্ণ করে ছাতুর সাথে মিশিয়ে ভালো করে জলে গুলতে হবে। সকালে দানা খাওয়ার এক ঘণ্টা আগে খাওয়াতে হবে।

## খুক খুক করে কাশি

ঘোড়ার খুক খুক কাশি হলে নিম্নলিখিত ওষুধ ২/৪ দিন ব্যবহার করলেই উপকার হয়।

(১) কাঁটানটের শীষ কেটে ২/৩ দিন খাওয়ালেই এই রোগ দূর হয়।

(২) আধপোয়া সজনের আঠা গরম করে ঈষদুষ্ণ থাকতে থাকতে খাওয়াতে হবে।

## পৃষ্ঠক্ষত

যদি ঘোড়ার পিঠে কোন কারণবশতঃ ক্ষত হয় তাহলে নিচের ওষুধে তাড়াতাড়ি সেরে যায়।

| | | |
|---|---|---|
| (১) | চাখড়ি | ১ ভাগ |
| | লবণ | ১ ভাগ |

এই দুটি জিনিস উত্তমরূপে চূর্ণ করে পিঠের ঘায়ের উপর লাগাতে হবে।

| | | |
|---|---|---|
| (২) | রসুন | ১ ভাগ |
| | গোলমরিচ | ১ ভাগ |
| | ধুনা | ১ ভাগ |

উপরোক্ত জিনিষগুলো একসাথে উত্তমরূপে চূর্ণ করে অনুমান মতো সরষের তেলে গরম করতে হবে। ঐ তেল রোজ ৫/৭ বার করে ঘায়ে লাগালেই ভালো হয়ে যাবে।

## উদর স্ফীতি বা পেট ফাঁপা

যদি ঘোটক বা ঘোটকীর অতিরিক্ত খাওয়া বা কোন বিষাক্ত দ্রব্য ভোজনের ফলে পেট ফাঁপে তাহলে নিচের ওষুধ প্রয়োজন।

(১) পরিষ্কার ঝুরা মাটির দ্বারা পেটে প্রলেপ দিলে তাড়াতাড়ি কাজ দেয়।

(২) ইসবগুল বেঁটে তাই দিয়ে প্রলেপ দিলেও অচিরে উপকার হয়।

(৩) জলে সাবান গুলে গরম করে ঘন কাদার মতো হলে তার দ্বারা প্রলেপ দিতে হবে।

(৪) সরষেব তেলের সঙ্গে সাবান গুলে গরম কবে তা লাগালেও উপকার হয়।

## সর্দির চিকিৎসা

ঘোড়ার সর্দি হয়ে নাক দিয়ে পোঁটার মতো ঝরলে নিচের ওষুধ প্রয়োজন।

| | | |
|---|---|---|
| (১) | ঘি | ৪ তোলা |
| | খালিস | ৪ তোলা |
| | জায়ফল | ৪ তোলা |
| | সিন্দুর | ৪ তোলা |

এই সব জিনিস একত্র করে গরম করে নিয়ে সামান্য গরম থাকতে ঘোড়ার নাকে ঢেলে দিতে হবে।

(২) কুকসিমা গাছ বেঁটে সন্ধ্যার সময় খাওয়ালে উপকার হয়।

(৩) জায়ফল চূর্ণ করে তা নলের ভিতর দিয়ে নাকে ফুঁ দিলে সর্দি সেরে যায়।

## ঘায়ের মলম

| | |
|---|---|
| মেটে সিঁদুর | ১ ভাগ |
| মুদ্রাশঙ্খ | ১ ভাগ |
| চামড়াভস্ম | ১ ভাগ |
| মনঃশিলা | ১ ভাগ |
| নীলবড়ি | ১ ভাগ |

এই সকল জিনিস এক সাথে চূর্ণ করে মেশালেই মলম হবে। ঘোড়ার যে কোন জায়গায় ঘা হোক না কেন এই ওষুধে সেরে যায়।

## দানা খেয়ে পেট ফুলে গেলে

| | | |
|---|---|---|
| (১) | রসুন | ১ ভাগ |
| | পেঁয়াজ | ১ ভাগ |
| | পুরাতন গুড় | ১ ভাগ |
| | লবঙ্গ | ১ ভাগ |
| | বিট লবণ | ১ ভাগ |
| | সিদ্ধি | ১ ভাগ |

উপরোক্ত দ্রব্যসমূহ একসাথে বেঁটে বড়ি প্রস্তুত করতে হবে। এর একটি বড়ি সকালে ও একটি বড়ি সন্ধ্যায় দানা খাওয়ার আগে খাওয়ালে উপকার হবে।

(২) মদের সিটা খাওয়ালেও বিলক্ষণ উপকার হয়। ব্র্যাণ্ডি এর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

## কুষ্ঠ হলে

(১) রসুনের ক্বাথ খাওয়ালে এবং সরষের তেল মালিশ করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(২) ঘোড়ার শরীরে কুষ্ঠের লক্ষণ দেখা দিলে অথবা খোঁড়া হওয়ার উপক্রম হলে রোজ ত্রিফলার ক্বাথ খাওয়াতে হবে।

| | | |
|---|---|---|
| (৩) | হরীতকী | ১ ভাগ |
| | খদির কাঠ | ১ ভাগ |
| | বহেড়া | ১ ভাগ |
| | আমলকী | ১ ভাগ |
| | পলতা | ১ ভাগ |

এই সব জিনিস জলে সিদ্ধ করে ঘোড়াকে খাওয়াতে হবে।

## ক্রিমি ও মদরোগ চিকিৎসা

| | |
|---|---|
| চিতামূল | ১ ভাগ |
| বচ | ১ ভাগ |
| পিপুল | ১ ভাগ |
| আদা | ১ ভাগ |
| পলতা | ১ ভাগ |
| নিমপাতা | ১ ভাগ |

এইসব জিনিস ভালভাবে চূর্ণ করে একসাথে মিশাতে হবে। এই চূর্ণের ২ আনা পরিমাণ নিয়ে ছাতুর সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। এর দ্বারা ক্রিমি ও মদ রোগ দূর হয়।

## ঘোড়ার চোখের কোণ দেখে রোগ নির্ণয় ও তার ওষুধ

১। ঘোড়ার চোখের কোণে যদি গোলাপী রং দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে এটি সর্দিগর্মী অসুখের লক্ষণ। তখন নিচের ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

(ক) দুই তোলা পরিমাণ আদা খাওয়ালেই উপকার হয়।

| (খ) | খোর্মা | ১ তোলা |
|---|---|---|
| | বাদাম | ১ তোলা |

এই দুটি জিনিস এক সাথে করে খাওয়াতে হবে। ৩/৪ দিন খাওয়ালেই উপকার পাওয়া যাবে।

২। যদি ঘোড়ার **চোখের কোণে জরদ্বর্ণ চিহ্ন** দেখা যায় তখন বুঝতে হবে যে সর্দি গর্মীর সূত্রপাত হয়েছে। তখন নিচের ওষুধ দেওয়া প্রয়োজন।

(ক) ১ তোলা পরিমাণ গোলমরিচ চূর্ণ ছাতুর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

| (খ) | হিং | ৬ মাসা |
|---|---|---|
| | শুণ্ঠীচূর্ণ | ২ তোলা |

এই দুটি জিনিস ছাতুর সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। ৩/৪ দিনের বেশি এই ওষুধ খাওয়াতে হয় না। ঐ সময়ের মধ্যেই রোগ সেরে যায়।

| (গ) | ছাতু | ১ পোয়া |
|---|---|---|
| | ছোহারার বীজচূর্ণ | ১ তোলা |

এই দুটি জিনিস খাওয়ালেও উপকার হয়। ৫/৬ দিনের বেশি এ ওষুধ ব্যবহার করতে হয় না।

৩। যদি ঘোড়ার **চোখের কোণে লাল রং** দেখা যায়, তবে গর্মীর লক্ষণ বুঝতে হবে। নিচের ওষুধ দেওয়া প্রয়োজন।

(ক) ৫ তোলা পরিমাণ ত্রিফলা রাত্রে জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে ঐ জল তিন দিন খাওয়াতে হবে।

(খ) সরষের তেলের সাথে সমান পরিমাণ জল মিশিয়ে ৫ দিন খাওয়ালেই উপকার হয়।

| (গ) | সজিনার আঠা | ২ ভাগ |
|---|---|---|
| | শ্বেতজীরা | ১ ভাগ |

এই দুটি জিনিস একসাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। শ্বেতজীরা চূর্ণ করে নিতে হবে। ৫ দিনেই উপকার হয়।

### চোখের কোণে লাল কালো রং হলে

এ রোগে ঘোড়ার বাঁচবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এর কোন ওষুধ নাই বললেও চলে। তথাপি নিচের ওষুধ প্রযোজ্য।

| | |
|---|---|
| গঁদ | ১ তোলা |
| কট্‌কী | ১ তোলা |
| শ্বেতজীরা | ১ তোলা |
| পুরাতন গুড় | ১ ছটাক |

এই সকল জিনিস একসাথে শিলে বেটে খাওয়াতে হবে।

## ছানি চিকিৎসা

ছানি হলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করতে হবে, নচেৎ ঘোড়া হঠাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। অতএব পীড়ার সূত্রপাত হলে নিম্নলিখিত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

একটি মুরগির গলা কেটে (রক্ত না বেরিয়ে যায়) পালকগুলি সব ফেলে দিয়ে ভালোভাবে সিদ্ধ করে তার সাথে ১ সের দেশী মদ মিশাতে হবে। এই মাংস যূস সকালে ঘোড়াকে খাওয়াতে হবে। বিকেলে আধপোয়া গোলমরিচ চূর্ণ করে আটার সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। এতে ছানি শীঘ্র নিরাময় হবে।

## ব্রণ চিকিৎসা

ঘোড়ার দেহে যে সকল ব্রণ হয় তা দুই প্রকার। আগন্তুক ও দোষজ। বাতজন্য কষ্টদায়ক হয়, রক্তদোষ জন্য ব্রণে অল্প বেদনা অনুভব হয়।

(১) ঘোড়াকে ঘি মিশিয়ে গরুর দুধ খাওয়ালে বাতপিত্তজনিত ব্রণ রোগ সেরে যায়।

(২) আগন্তুক দুষ্ট ব্রণ অস্ত্রোপচার করে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

## কুরকুরি চিকিৎসা

ঘোড়ার প্রস্রাবের থলি যদি ফুলে ওঠে, তবে তাকে কুরকুরি বলে। এটি অষ্টবিধ অর্থাৎ এই পীড়ায় আট প্রকার উপসর্গ জন্মে। সেই অনুযায়ী ওষুধও আট প্রকার।

১। ঘোড়ার প্রস্রাবের থলি স্বাভাবিক অবস্থা হতে দ্বিগুণ ফুলে যায় ও প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তখন নিম্নোক্ত ব্যবস্থা প্রযোজ্য—

(ক) একটি গোটা লঙ্কা প্রস্রাব দ্বারে পুরে দিলে কাজ হয়।

(খ) মদের পটি প্রস্রাবের যন্ত্রে বেঁধে দিলেও ফল হয়।

(গ) কর্পূর চূর্ণ প্রস্রাবের দ্বারে পুরে দিলেও উপকার হয়।

(ঘ) আধ সের সরষের তেল ঘোড়া বা ঘোড়ীর কানে ঢেলে দিলেও ফল হয়।

২। দ্বিতীয় অবস্থায় ঘোড়া ঘুমাতে পারে না। তখন নিম্নোক্ত ওষুধ প্রযোজ্য—

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | হিং | ১ ছটাক |
| | শুণ্ঠী চূর্ণ | ২ তোলা |
| | পুরাতন গুড় | আধ পোয়া |

উপরোক্ত দ্রব্যসমূহ একসঙ্গে পিষে খাইয়ে দিলেই প্রস্রাব হবে ও ঘুমও হবে।

(খ) ২ তোলা আন্দাজ মতো গুড়ুক তামাক নিয়ে প্রস্রাব দ্বারে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রস্রাব হবে।

৩। তৃতীয় অবস্থায় ঘোড়ার কাঁপুনি দেখা দেবে। কাঁপুনিতে ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, বার বার পড়ে যায় ও শুয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায়—

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | পাকুড় ছাল | ১ ভাগ |
| | হাতির নাদ | ১ ভাগ |

এই দুটি জিনিস ৪ সের জলে সিদ্ধ করতে হবে এবং আধ সের জল থাকতে নামিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করে ঘোড়াকে খাওয়াতে হবে।

| | | |
|---|---|---|
| (খ) | রসুন | আধ তোলা |
| | লঙ্কা | আধ তোলা |
| | গোলমরিচ | আধ তোলা |

উপরোক্ত দ্রব্যসমূহ একসঙ্গে বেটে নিয়ে ঘোড়াকে খাওয়াতে হবে।

৪। চতুর্থ অবস্থায় ঘোড়র বাতকর্ম বন্ধ হয়ে যায় ও মাঝে মাঝে মাটিতে পড়ে যায়। এরূপ অবস্থায়—

সোহাগার খৈ গুঁড়ো ৫ মাষা জলের সঙ্গে মিশিয়ে ঘোড়াকে খাওয়াতে হবে। পরে নিমকাঠ পুড়িয়ে ধোঁয়া দিতে হবে।

৫। পঞ্চমাবস্থায় ঘোড়ার বুকে ও পেটে ব্যথা বেদনা দেখা দেবে। ঘোড়া যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। এ অবস্থায় নিম্নোক্ত ওষুধ দিতে হবে—

| | |
|---|---|
| দুধ | ১ সের |
| ঘি | আধতোলা |

এই দুটি জিনিস একসঙ্গে মিশিয়ে গরম কবে নিয়ে ঘোড়াকে খাওয়াতে হবে।

৬। ষষ্ঠ উপসর্গ হলো ঘোড়ার অণ্ডকোষ বৃদ্ধি ও শক্ত হবে। ঘোড়া ধড়ফড় করতে করতে মাটিতে শুয়ে পড়বে। এমনাবস্থায়—

যত শীঘ্র সম্ভব অস্ত্রোপচার করতে হবে। বিলম্বে ঘোড়ার জীবনহানি হতে পারে।

৭। সপ্তম উপসর্গে ঘোড়ার অস্বাভাবিকভাবে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ হলে—

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | গমেব আটা | ১ সের |
| | খেঁজুর | ১ পোয়া |

এই দুটি জিনিস একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। পরে ছেঁকে নিয়ে ভোরবেলা অর্ধেকটা খাইয়ে দিতে হবে।

(খ) একটা ছাগলের মাংস ১০ সের জলে সিদ্ধ করে নিয়ে তার যূসটা ঘোড়াকে খাওয়াতে হবে।

৮। অষ্টমাবস্থায় সমস্ত উপসর্গগুলিই পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে নাভিমূলে অত্যধিক যন্ত্রণা ও বেদনা হতে থাকে। এরূপ অবস্থায়—

| | |
|---|---|
| দুধ | ২ সের |
| ঘি | ২ সের |

এই দুটি জিনিস একত্র মিশিয়ে গরম করে নিয়ে ঘোড়াকে খাইয়ে দিতে হবে।

## চোখ দিয়ে জল পড়া

ঘোড়ার চোখ দিয়ে যদি সর্বক্ষণ জল পড়তে থাকে তাহলে নিম্নোক্ত বিধি প্রযোজ্য—

(ক) রিঠা উত্তমরূপে গুঁড়ো করে নিয়ে ছেঁকে নিতে হবে এবং বারে বারে চোখে দিতে হবে।

(খ) গিরিমাটি ও শুকনো কলমি ডাঁটা ১ ভাগ করে নিয়ে চূর্ণ করতে হবে। পরে ছেঁকে নিয়ে তার থেকে সামান্য সামান্য নিয়ে রোজ ২ বার করে ঘোড়ার চোখে দিতে হবে।

(গ) জলের কুলকুচি করে চোখে দিলেও উপকার হয়।
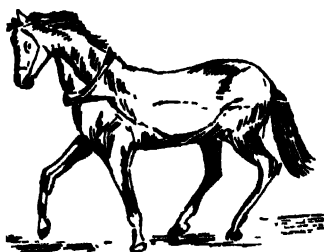
# শূকর

## শূকর পালনে খরচ কম—লাভ বেশি

ওপরে যা বলা হয়েছে সেটা ষোল আনাই খাঁটি। মাত্র গুটি কয়েক শূকর পালন করতে শুরু করলে দেড় বছরের মধ্যেই রাবণের বংশের মতো বেড়ে যায়। বিশেষ করে দেশী শূকর পালন করলে খাওয়াতে খরচ হয় খুবই কম এবং সামান্য পরিশ্রম করে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারলেই ওদের ভালোভাবে পেট ভরে যাবে। একটা শূকরী বছরে বারোটি করে বাচ্চা প্রসব করবে। সুতরাং চারটি শূকরী থাকলে বছরে শূকরের পাল বেড়ে হবে ৫২টি। এই হিসাব সম্পূর্ণ সত্য।

বিদেশের উন্নত জাতের শূকর পালন করলে ওরা দেশী শূকরীর মতো বেশি সংখ্যাতে বাচ্চা প্রসব করে না। তবে মাংস পাওয়া যায় দেশী শূকরের থেকে প্রায় দশ গুণ বেশি। আর বাজারে মাংস ভালো দামেতেই বিক্রি হয়। বিদেশী শূকর পালন করতে হলে ওদের খাওয়াতে খরচ অবশ্য সামান্য বেশি হয়। তবে পালন করার পর বিক্রি করা হলে লাভের পাল্লা অন্যান্য গৃহপালিত পশুদের থেকে অনেক বেশি হয। সেই কারণে শূকর পালন করে কেউ ক্ষতির মুখ দেখে না।

## পালনের উপযোগী বিভিন্ন জাতের শূকর

### (বিলেতে পালিত জাত)

**সাদা বড় ইয়র্কশায়ার ঃ** খামারে পালন করতে হলে বিদেশী সংকর জাতের শূকর পালন করা দরকার। অবশ্য দেশী শূকরও খামার পদ্ধতিতে পালন করা চলে। কিন্তু তারা আকারে বেঁটে, ভালো খাদ্য খেলেও মাংস বেশি পাওয়া যায় না। বাজারে মাংস কম দামে বিক্রি হয়। দেশী শূকর ভালো পুষ্টিকর খাদ্য খেয়েও যৌবন বয়সে দেহের ওজন হতে পারে ৬০ থেকে ৭০ কেজি। অপরদিকে বিদেশী সংকর জাতের শূকরের একই বয়সে দেহের ওজন বেড়ে হয় ৩৫০ থেকে ৪০০ কেজি। অবশ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশে উন্নত জাতের শূকর রয়েছে। তাদের বিষয়ে পরে নিশ্চয় আলোচনা করা হবে। তার আগে ইউরোপের উন্নত সংকর জাতের শূকর সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

সাদা ইয়র্কশায়ার শূকর আকারে যেমন বড় হয় তেমনি পাওয়া যায় প্রায় ৪০০ কেজির কাছাকাছি মাংস। সেই কারণে ওদের বলা হয় বৃহৎ সাদা জাতের শূকর। এই শূকরের জাতটির জন্ম বিলেতে এবং সংকর জাতের। ঐদেশ থেকে ভারতে আমদানি করে এখানে চাষ করা শুরু হয়। বর্তমানে এখানকার জলবায়ু এবং আবহাওয়া ওরা ভালোভাবে মানিয়ে নিয়েছে। পালনকারী এই জাতের শূকর পালন করে সব থেকে বেশি লাভবান হয়। এদের শরীরের বিশেষ গুণ হলো, কেবল ভারতবর্ষের আবহাওয়া নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আবহাওয়াকেও ওরা মানিয়ে নিয়েছে। কাজেই আমাদের দেশে পালন করতে বিশেষ অসুবিধে নেই।

শূকরের দেহের রঙ সাদা। কানের আকার ছোট এবং খাড়া থাকে। সারা শরীরে লোমের আকার খুবই ছোট এবং লোমের সংখ্যাও কম। চোখের আকারও ছোট। মুখটা সামান্য লম্বা।
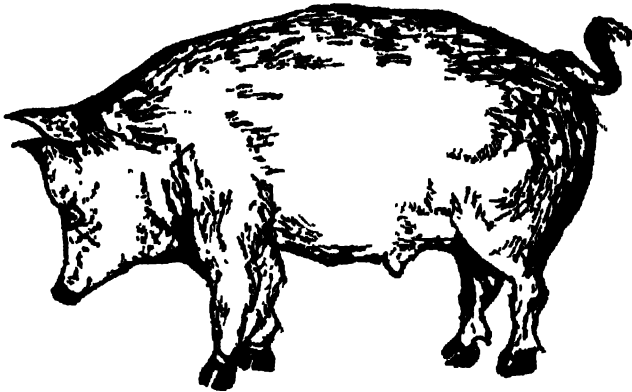
সাদা বড় জাতের ইয়র্কশায়ার শূকর বৃটেন থেকে এদেশে আনা হয়েছে। বর্তমানে ভারতের আবহাওয়াতেও ভালোভাবে পালন করা সম্ভব।

শূকরী প্রসবের পর বাচ্চাদের ভালোভাবে যত্ন করে এবং বুকের দুধ খেতে দেয়। সেই কারণে ইয়র্কশায়ার বাচ্চা মরে কম। ফলে খামারে শূকরের সংখ্যা তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। তাছাড়া এরা বেশি সংখ্যায় বাঁচ্চা প্রসব করে থাকে। বাচ্চা পালনের ক্ষেত্রে শূকরী খুবই যত্নবান।

এদের দিনের বেলায় চরবার জন্য বড় মাঠের দরকার হয় না। কারণ এদের মাঠে চরা স্বভাব নয়। তবে খামার ঘরের সামনে সামান্য খোলা জায়গা থাকলে এরা ঘুরে বেড়াতে পারে। সেই কারণে শহর অঞ্চলেও এই জাতের শূকর পালন করা যায়। ভারতে পালিত হলেও দেশী কোন নাম নেই।

**সাদা মাঝারি ইয়র্কশায়ার ঃ** এই শ্রেণীর শূকরও সংকর জাতের এবং বিলেত থেকে আমদানি করা। তবে জাতটি তৈরি করা হয়েছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ চিনের একটি জাতের শূকরের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে। শূকরী বিলেত থেকে আমদানি করা আর শূকর এশিয়ার একটি দেশের। কাজেই যে জাত পাওয়া গেছে তার সঙ্গে সাদা বড় ইয়র্কশায়ারের বহু ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। তবে আগেরটির মতো লম্বায় অতটা বড় হয় না এবং উচ্চতাও কম হয়। সেই কারণে বলা হয় মধ্যম সাদা ইয়র্কশায়ার। আর পালন করা হয় মাংসের জন্য।

এরা খোলা মাঠে চরতে ভালোবাসে। সেই কারণে গ্রাম অঞ্চলে পালন করা দরকার। এই জাতের শূকরের কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা বেশি। শূকরীর দেহের ওজনের থেকে শূকরের ওজন প্রায় ৫০ কেজি বেশি হয়। মাঝারি শ্রেণীর সাদা

ইয়র্কশায়ার শূকরের শরীরের একটা বিশেষ গুণ হলো এরা তাড়াতাড়ি দেহের ওজন বাড়াতে পারে। পূর্ণ যৌবনে শরীরের ওজন দাঁড়ায় ৩০০ থেকে ৩৫০ কেজির কাছাকাছি। এদের কাছ থেকে মাংস সামান্য কম পাওয়া গেলেও পালনকারীদের কাছে এই জাতের শূকরের চাহিদা খুবই বেশি। শূকরীর দেহের ওজন ২৭৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

**বার্কশায়ার ঃ** বিলেতে সংকর জাতের শূকরটি সৃষ্টি করা হয়েছে। এর আবার দুটো শ্রেণী রয়েছে। একটি কানাডার শূকরের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে যে বাচ্চা পাওয়া
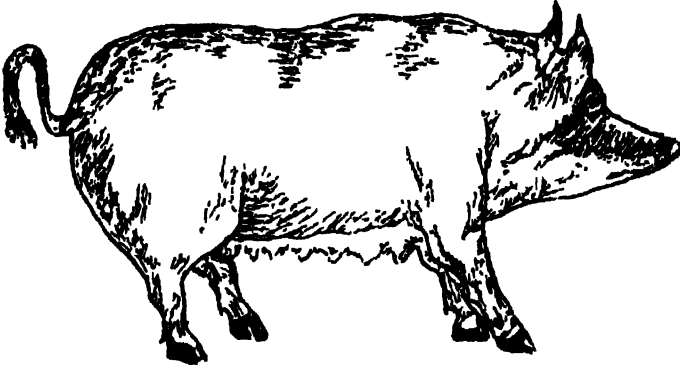
ব্রিটেন পালিত বার্কশায়ার শূকরী। এই জাতটি
সংকর শ্রেণীর এবং ক্যানাডিয়ান গোত্র

গেছে তার শ্রেণী বা গোত্র হল কানাডিয়ান গোত্র। এদের শরীরে মাংস বেশি হয় না। তবে বেকন মাংসের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে সুনাম রয়েছে।
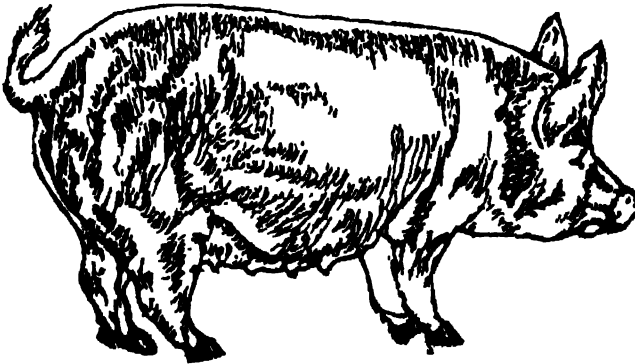
ব্রিটিশ শূকর পর্ক টাইপ গোত্রীয় বার্কশায়ার।

অপর শ্রেণীটিকে ব্রিটিশ পর্ক টাইপ গোত্রীয় বলা হয়। এদের দেহের ওজন বেড়ে যাওয়ার হারটা খুব বেশি। ফলে মাংস বেশি পাওয়া যায়। তবে বড় সাদা ইয়র্কশায়ারের মতো এই জাতের শূকর তেমন বড় আকারের হয় না।

দেহের রঙ কালো। তবে মুখে, বিশেষ করে নাকের কাছে চারটি এবং পায়ের নিচের দিকে সাদা দাগ থাকে। মুখের ওপর দিকটা প্রায় গোলাকার তবে নাকের মাঝখান থেকে সামনের দিকে কিছুটা সরু হয়ে প্রায় সোজা অবস্থায় থাকে। কান আকারে ছোট এবং খাড়া বলা চলে।

দুই শ্রেণীর বার্কশায়ার শূকর খামারে পালন করবার পক্ষে উপযোগী। সব থেকে বড় কথা হলো, ওরা প্রতিকূল পরিবেশে খুব ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারে। অবশ্য যাঁরা প্রাণিবিজ্ঞানী তাঁরা জানিয়েছেন, বড় সাদা ইয়র্কশায়ার জাতের শূকর পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং মধ্য ভারতের সব রাজ্যেই ভালোভাবে পালন করা যেতে পারে। বার্কশায়ার জাতের শূকর (উভয় শ্রেণী) দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে পালন করবার পক্ষে উপযোগী। সেখানে অবশ্য ব্যাপক হারে চাষ হচ্ছে।

এরা মাঝারি আকারের শূকর। সুতরাং মাংসের পরিমাণ ইয়র্কশায়ার জাতের থেকে অবশ্যই কম পাওয়া যায়। তবে ভালোভাবে পরিচর্যা সহ যত্নের সঙ্গে পালন করতে পারলে দেহের ওজন ২০০ থেকে ২৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

**টেমওয়ার্থ ঃ** ইংরেজরা শূকরের মাংস বেশি পছন্দ করে। ভারতবর্ষে পাকাপাকি ভাবে নিজেদের শাসন কায়েম করবার পর শূকরের মাংসের চাহিদা মেটাতে ওখানকার শূকরীর সঙ্গে ভারতের শূকরের মিলন ঘটিয়ে যে নতুন জাতের বাচ্চা জন্মায় তার নাম দেয় টেমওয়ার্থ। বেকন মাংসের চাহিদা মেটাতে ভারতে এর পালন শুরু হয় খামার পদ্ধতিতে। ভারতের মতো গরম দেশে জন্ম হওয়ার ফলে এরা প্রায় সব রাজ্যে ভালোভাবে বেঁচে থাকে। আমাদের দেশে যে তিন-চারটি রাজ্যে ঠাণ্ডা বেশি সেখানে, আবার রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি যেসব রাজ্যে গরমের সময় যখন আগুনের মতো গরম বাতাস বয় সেই আবহাওয়াতেও ওরা ভালোভাবে মানিয়ে নেয়। এটাই এদের শরীরের বিশেষ গুণ।

শরীরের গঠন লম্বা ধরনের। শরীর খুব একটা মোটা হয় না। লোম মোটা এবং খসখসে ভাব। দেহের ওজন খুব বেশি হলে ২৫০ কেজি অবধি হতে পারে। যেহেতু ভারতীয় শূকরের রক্ত রয়েছে এদের শরীরে সেই কারণে স্বভাবটা দেশী শূকরের সঙ্গে অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। যদি সারাদিন খোলা মাঠে-ঘাটে চরতে পারে তবে খাদ্যের চাহিদার প্রায় ৬০ ভাগ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলে। দেশী শূকরের মতো খুবই কম দামের খাদ্য দিলে ওদের আর কিছু প্রয়োজন হয় না। সেই কারণে শহর অঞ্চলে পালন না করে গ্রামে পালন করলে সুবিধে হয়। আর কম দামে এদের পেট ভরা খাবার সংগ্রহ করতেও কোন রকম অসুবিধে হয় না। তবে শহর অঞ্চলেও পালন করা চলে এবং খাদ্যের জন্য খরচ কিছু বেশি হয়।

**ডেনিস ল্যাণ্ডরেস ঃ** এটাও বিলাতের সংকর জাতের শূকর। ঠাণ্ডার দেশে জন্মালেও ভারতের মতো গরমের দেশে এদের মানিয়ে নিতে বিশেষ অসুবিধে হয়

না। সেই কারণে আমাদের দেশে বিভিন্ন সরকারি খামারে এই জাতের শূকর পালন করা হয় এবং বেসরকারি ইচ্ছুক সংস্থাকে খুবই কম দামে বাচ্চা বিক্রি করবার ব্যবস্থাও রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, যাতে বেসরকারিভাবে শূকর পালন প্রসার লাভ করে।
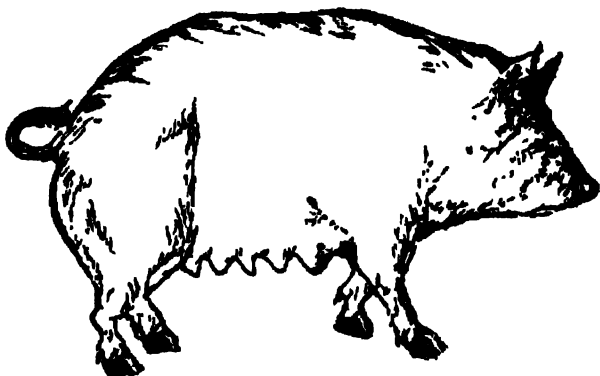
ব্রিটেনে পালিত ডেনিস ল্যাণ্ডরেস শূকর। ভারতেও এই জাতের শূকর পালন করা হচ্ছে।

বিলেতে যেসব জাতের শূকর পালন করা হয় এদের দেহের গঠন যেমন হয় ভারতের গরম আবহাওয়াতে পালিত ডেনিস ল্যাণ্ডরেসের দেহের গঠন এবং আকৃতি প্রায় একই রকম বলা চলে। তবে এদের কান দুটো বেশ বড় এবং নুইয়ে দুটো চোখের ওপরে ঝুলে থাকে। খুবই কম সময়ের মধ্যে এদের দেহের ওজন বেড়ে যায়। কাজেই মাংসের চাহিদা মেটাতে খামারে পালন করা লাভজনক হয়।

শূকরী বাচ্চাদের ভালোভাবে পালন করে। তাছাড়া প্রতিবার একসঙ্গে বেশি সংখ্যাতে বাচ্চা প্রসব করে থাকে। ফলে খামারে শূকরের সংখ্যা তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। ঠিকভাবে পরিচর্যা এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য দিলে দেহের ওজন ২০০ কেজি হতে পারে। অন্য জাতের শূকরের কাছ থেকে এই পরিমাণে মাংস পেতে যে সময় লাগে তার থেকে ডেনিস ল্যাণ্ডরেস শূকর কম সময় নেয়। কাজেই পালনকারীর লাভটা বেশি থাকে।

## আমেরিকায় পালিত কয়েকটি জাতের শূকর

ব্রিটিশরা পৃথিবীর বহু দেশে দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করেছে। তারা নিজেদের প্রয়োজনে সেই সব দেশে নিজেদের ভাষা, পোশাক, খেলা এবং খাদ্য হিসাবে যা প্রয়োজন কৃষিজাত হলে তার চাষ এবং প্রাণী হলে সেই জীবের পালন শুরু করেছে। শূকরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। ফলে ব্রিটেনের উন্নত জাতের কয়েকটি শূকর আজও খামার প্রথায় পৃথিবীর নানা জায়গায় পালন করা হচ্ছে। সেই তুলনায় আমেরিকায় পালিত বিভিন্ন উন্নত জাতের শূকর অন্য দেশে পালন

করা হয় না। অবশ্য আমেরিকায় পালিত শূকরদের মান উন্নত করেছে ব্রিটিশরা। কারণ ব্রিটিশরা আমেরিকায় কলোনি গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শূকরের মধ্যে দৈহিক মিলন ঘটিয়ে কয়েকটি উন্নত সংকর জাতের শূকর সৃষ্টি করে। আমেরিকান শূকরের একটি অসুবিধে হচ্ছে ওদের শরীরে যেমন মাংস বেশি হয় তেমনি একই পরিমাণে দেহে চর্বি জমে। কারণ আমেরিকায় পালিত সব জাতের শূকর শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য বেশি পরিমাণে খায়। কারণ গম ও ভুট্টা ওদেশে প্রচুর জন্মায়।

**পোল্যান্ড চায়না ঃ** সংকর জাতের শূকরের শরীরে ব্রিটিশ শূকরের রক্ত রয়েছে। আমেরিকায় যদি ভুট্টার ফলন খুব বেশি হয় তাহলে চাষীরা শূকর কিনে তাদের ভুট্টার দানা খাওয়ায়। পোল্যান্ড চায়না শূকর ভুট্টার দানা খেয়ে সেটা আমিষে পরিণত করে ফেলে। এটা ওদের শরীরের বিশেষ একটা ক্ষমতা বলা চলে।

পৃথিবীর কোন দেশেতে পোল্যান্ড শূকরের মতো বড় জাতের শূকর নেই। এই শূকর পূর্ণবয়স্ক হলে দেহের ওজন ৪৫০ কেজি থেকে ৫০০ কেজি অবধি হয়ে থাকে। কোথাও এত বড় জাতের শূকর জন্মায় না। কারণ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য অন্য দেশে পালিত এই শূকর পায় না।
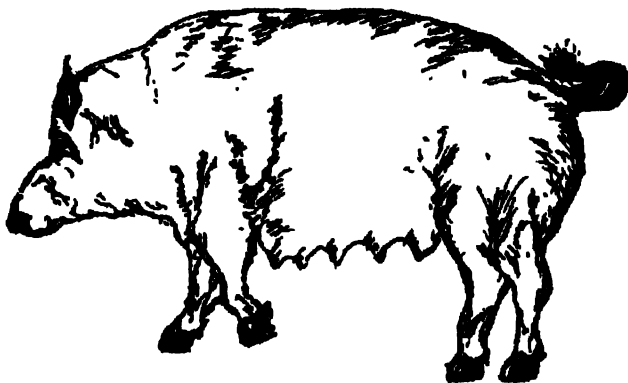
আমেরিকায় পালিত সংকর জাতের শূকরী পোল্যাণ্ড চায়না।
এরা সব থেকে বড় জাতের শূকর।

দেহের রঙটা কালো। তবে চারটি পায়ে কিছুটা অংশে সাদা দাগ থাকে। আবার এই জাতের কিছু শূকর দেখা যায় যাদের নাকের সামনের দিকটা সাদা হয়। কান দুটো দেহের তুলনায় আকারে খুবই ছোট। সর্বদা সোজা হয়ে থাকে।

খামারে পালন করা লাভজনক হয়। তবে প্রধান অসুবিধে হলো, মাংস এবং চর্বি প্রায় একই হারে শরীরে জমে যায়। ভারতে শূকরের মাংসের চাহিদা থাকলেও শূকরের তেল খাদ্য হিসাবে মোটেই প্রচলন নেই। সেই কারণে ভারতের পক্ষে এই জাতের শূকর পালন খুব একটা লাভজনক হয় না।

**চেস্টার হোয়াইট ঃ** উন্নত সংকর জাতের শূকর। তবে এদের চেহারার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তিনটি আলাদা জাতের শূকরের সঙ্গে কিছুটা করে মিল দেখতে পাওয়া যায়।

শরীরের ওপরের চামড়ার রঙটা সাদা। সারা দেহে হালকা লোম এবং আকারে খুবই ছোট হয়। কান দুটো ছোট এবং সর্বদা খাড়া অবস্থায় থাকে। এরাও বড় আকারের শূকর। একটি শূকরের ওজন ৪০০ কেজি হয়। তবে মাংসের পরিমাণ বেশি থাকলেও প্রায় ৩০ ভাগ চর্বি পাওয়া যায়। চর্বি সহ মাংস খেতে অনেকেই পছন্দ করে।

এরা সারা দিন মাঠে চরে খেতে ভালোবাসে। শূকরী সংখ্যাতে বেশি বাচ্চা প্রসব করে। তাছাড়া বাচ্চাদের যত্নের সঙ্গে পালন করে। ফলে বাচ্চার মৃত্যুর হারটা যথেষ্ট কম। সুতরাং খামারে পালন করলে লাভবান হওয়া যায়।

**ডিয়ারক জারসি ঃ** এই জাতের শূকরকেও ইংরেজরা অন্য জাতের শূকরের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে নতুন সংকর জাতের সৃষ্টি করেছে। সেই কারণে ইংরেজদের দেওয়া নামটাতেই এরা পৃথিবীর সব দেশে পরিচিত।

ডিয়ারক জারসি আকারে বেশ বড় হয়। শরীবে যেমন মাংস জমে তেমনি চর্বিও পাওয়া যায়। পূর্ণবয়স্ক শূকরের ওজন ৪২৫ কেজি অবধি হতে পারে। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য খেতে ভালোবাসে এবং ভালোভাবে হজমও করতে পারে। এই খাদ্যকে আমিষে পরিণত করবার ক্ষমতাও রয়েছে।

সারা শরীর ছোট ছোট লোমে ঢাকা থাকে। দেহের রঙ সাদা তবে লালচে আভা থাকে। শূকরী একত্রে অনেকগুলো বাচ্চা প্রসব করে। তবে বাচ্চাদের প্রতি তেমন নজর দেয় না। দেহের তুলনায় কান দুটো ছোট এবং সোজা হয়ে ওপর দিকে উঠে থাকে। দেহে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকায় ভারতে এই জাতের শূকর খামারী পালন করতে চায় না।

## এশিয়া মহাদেশে পালিত কয়েকটি জাতের শূকর

এই মহাদেশে যেসব দেশ রয়েছে তার মধ্যে মুসলিম, বৌদ্ধ এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে শূকর পালন মোটেই করা হয় না। তবে চিন, ফিলিপিন এবং ভারতে উন্নত সংকর জাতের শূকর পালন করা হচ্ছে। এশিয়ার যে কয়েকটি দেশে শূকর পালন করা হয় সেটা কেবলমাত্র মাংসের চাহিদা মেটাবার জন্য। যে জাতের শূকরের শরীরে চর্বি বেশি জমে তাদের মোটেই পালন করা হয় না। কারণ শূকরের চর্বি থেকে যে তেল পাওয়া যায় সেটা কেউ খায় না। এবার আলোচনা করা হচ্ছে চিনে পালিত কয়েকটি উন্নত জাতের শূকর এবং ভারতের অনির্দিষ্ট জাতের দেশী শূকর সম্পর্কে।

**চিনে পালিত ক্যানটোনিস শূকর ঃ** চিনের দক্ষিণ অঞ্চলে এই জাতের শূকর পালন করা হয়। এরা উন্নত শ্রেণীর এবং সংকর জাতের। যে কোন পরিবেশে কষ্ট

সহ্য করে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সব থেকে বড় গুণ হচ্ছে, বিশেষ কোন জটিল রোগে আক্রান্ত হয় না। এটাই সুখের ব্যাপার খামারীর কাছে।

সাদা এবং কালো উভয় প্রকার রঙ লোমে মেশানো থাকে। দেহের ওজন ৩৫০ কেজি অবধি হয়। শূকরী তাড়াতাড়ি বংশ বাড়াতে পারে এবং পাঁচ মাস বয়স হলেই শূকরী গর্ভ ধারণ করবার উপযুক্ত হয়ে থাকে।

আরও দুটো জাতের শূকর চিনে পালন করা হয়। ঐ দেশে শূকরের জাতের নাম সুম্বা। জাতটি ঐ এলাকার এবং উন্নত সংকর শ্রেণীতে পরিবর্তন করা হয়েছে। অন্যান্য জাতের থেকে এদের দেহে যৌবন আসে একটু কম বয়সে।

অপর জাতটি চিনা শূকর হিসাবে প্রায় সব জায়গায় পরিচিত। এরাও উন্নত সংকর শ্রেণীর শূকর। বিলেতের মধ্যম সাদা ইয়র্কশায়ার জাতের শূকরের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে নতুন জাতের সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের পালন করে খামারী ভালোই লাভবান হয়। কারণ ঠিকভাবে পরিচর্যা করলে দেহের ওজন ৩২৫ কেজি অবধি হয়ে থাকে। তবে চিনে পালিত কোন শূকরের জাত ভারতে আজও পালন করা শুরু হয়নি। আমাদের দেশে প্রথমে সরকারিভাবে উন্নত জাতের শূকর পালন শুরু হয়। আর এ ব্যাপারে উন্নত সংকর জাতের শূকরের বাচ্চা আনা হয়েছে বিলেত থেকে। ঐ বাচ্চা পরিণত হলে তার সঙ্গে দেশী শূকরীর মিলন ঘটিয়ে উন্নত জাত সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের কাছ থেকে ভালো রকম মাংস পাওয়া যাচ্ছে।

**ভারতবর্ষে পালিত দেশী শূকর ঃ** ভারতে যেসব শূকর পালন করা হয় এদের নির্দিষ্ট কোন জাত বা শ্রেণী নেই। তবে ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর একটা অনুমান করে এদের সাস্ ভিট্রাটাস শ্রেণীতে চিহ্নিত করে। যার অর্থ হচ্ছে, এশিয়ার মধ্যে যে কোন দেশেতে জন্মাতে পারে। হিন্দুদের দীর্ঘ সময় ধরে রাজত্ব, তারপর মুসলিম শাসন অবধি ভারতে শূকর পালন এবং তাদের জাতের উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে কোনরকম নজর দেওয়া হয়নি। বন্যপ্রাণী হিসাবে গরিব নিচু বর্ণের হিন্দু এবং আদিবাসীদের মধ্যে সমাজের বাইরে শূকর পালন করে মাংস খাবার প্রচলন ছিল। বাকি সব শ্রেণীর সমাজে শূকরের মাংস ছিল নিষিদ্ধ।

শূকরের মাংস খাওয়ার বিষয়ে মানুষের মনে বিশেষ কোন আগ্রহ না থাকার একটি মাত্র কারণ হলো, দেশী শূকরের নোংরা পরিবেশে থাকা এবং মানুষের মল খাওয়ার অভ্যাস দেখে এদের মাংস খাবার কোন রুচি হতো না। একই কারণে হিন্দুরা মুরগির মাংস খাওয়া তো দূরের কথা এদের ছুঁতেও ঘৃণা বোধ করতো। তবে মুসলিম সমাজে মুরগির মাংস খাওয়াতে কোন বাধা ছিল না।

এই কারণটি ছাড়াও শূকরের মাংস খাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি তার যুক্তিটা হচ্ছে, সেই সময় ভারতে আজকের মতো এতো লোকসংখ্যা বাড়েনি। বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও খাদ্যশস্যের প্রচুর ফলন হত। একেবারে গরিব মানুষের পেট ভরে খাবারের কোন অভাব ছিল না। সেই কারণে মাংসের বিশেষ চাহিদা ছিল না। পাঁঠা, ভেড়া, হাঁস ইত্যাদি যা সামান্য সংখ্যাতে পালন করা হতো সেটাই ছিল

প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। তাছাড়া মাছের কোন অভাব না থাকায় আমিষ জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি তাতেই মিটে যেত। তবে কিছু সংখ্যক হিন্দুর বাড়িতে পাঁঠার মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর দেশ ভাগ করার ফলে লোকসংখ্যা যা ছিল সেটা দু'গুণ বেড়ে যায়। ফলে আমিষ খাদ্যের অভাব মানুষ অনুভব করে। ধীরে ধীরে শূকরের মাংস সম্পর্কে ধারণা পালটাতে থাকে। ফলে দেশী শূকর খামারে পালন করা শুরু হয়। এরপর দেশী শূকরের মান উন্নত করে সৃষ্টি করা হয় নতুন সংকর জাতের শূকর।

আমাদের দেশে পালিত দেশী শূকর (যাদের উন্নত করা হয়নি) নানা আকারের এবং বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। তবে কালো এবং ধূসর রঙের শূকরের সংখ্যাই বেশি। উচ্চতায় খুব একটা বড় হয় না। কিছুটা বেঁটে ধরনের বলা যেতে পারে।

কোন রকম পরিচর্যা সহ খাদ্যের জন্য যদি একটি পয়সাও খরচ করা না হয় তবে শূকর অথবা শূকরীর যৌবন পূর্ণ হলে দেহের ওজন হয় ৫০ থেকে ৬০ কেজির মধ্যে। সামান্য পরিচর্যা এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য দিলে একই সময়ের মধ্যে দেহের ওজন হবে ১২৫ কেজি থেকে ১৪০ কেজির কাছাকাছি। এদের পূর্ণ যৌবন আসতে সময় লাগে প্রায় আড়াই বছর। এই সময়টা পৃথিবীর নানা দেশে পালিত বিভিন্ন জাতের শূকরের থেকে দ্বিগুণ বেশি সময়।

দেশী শূকরের শরীরে একটি জিনিস খুবই দামী। সারা দেহের লোমের মধ্যে ঘাড়ের লোম খুবই শক্ত এবং মোটা ধরনের। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যত রকমের শূকর রয়েছে এদের ঘাড়ে এই রকম মোটা এবং শক্ত লোম জন্মায় না। সেই কারণে এদের ঘাড়ের লোমের সাহায্যে ছবি আঁকবার ছোট-বড় এবং সরু-মোটা তুলি সহ বুরুশ তৈরি করা হয়। কেবলমাত্র দেশী শূকর নয়, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে পালিত এই শ্রেণীর শূকরদের ঘাড়ে যে লোম গজায় এদের লোমও একই শ্রেণীর।

**দেশী শূকর পালন ঃ** এর আগে বিদেশী সহ দেশে উন্নত মানের সংকর জাতের শূকরের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এদের খাদ্য, থাকবার জায়গা এবং পালন পদ্ধতির বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। কারণ ঐসব বিষয়গুলো প্রতিটি আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। তবে দেশী শূকরের ক্ষেত্রে ওসব নিয়ম এবং পদ্ধতি সঠিকভাবে মেনে এদের কেউ পালন করে না। যদি কেউ করে লোকসানের পরিমাণ হিসাবের বাইরে চলে যাবে। কাজেই খুব সংক্ষেপে বিষয়টি বলা হচ্ছে। তাছাড়া দেশী শূকর পালন সম্পর্কে এমন কিছুই নেই। সুতরাং কয়েকটি বিষয়ের কথা জানলেই আর কোন অসুবিধে হবে না। এই জাতের শূকর সম্পূর্ণ অবহেলায় বড় হবে এবং বাচ্চা দেবে।

মোট দু'ভাবে শূকর পালন করা হয়। সম্পূর্ণ ছাড়া অবস্থায় সকাল থেকে বিকেল অবধি শূকর মাঠে-ঘাটে চরে খাবে এবং সন্ধে হবার কিছুটা আগে কেবল রাতটুকুর জন্য একটা ছোট ঘরে থাকবে। ছোট ঘর না বলে খোঁয়াড় বলাই ভালো।

কারণ খুবই সামান্য জায়গায় ওরা কোনমতে কষ্ট করে থাকে। যে পরিমাণ জায়গায় মোটামুটিভাবে চারটি শূকর রাখা চলে সেখানে আট থেকে দশটি শূকরকে রাখা হয়। খোঁয়াড়ের উচ্চতা থাকে মাত্র সাড়ে তিন থেকে চার হাত। আর লম্বাতে হয় সাত হাত। চওড়া খুব বেশি হলে ছ' হাত হবে। দেওয়াল ও মেঝে মাটির। ছাদে ভাঙা চোরা টিন কিছুটা আর বাকিটা ভাঙা টালি। যদি শূকরদের ভাগ্য ভালো থাকে তবে ছেঁড়া পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢেকে বড় ইঁটের টুকরো চাপা দেওয়া থাকে। এর উদ্দেশ্য হল, যাতে হাওয়াতে উড়ে না যায়। এভাবে রাখার ফলে এরা যেমন বর্ষার সময় জলে ভেজে তেমনি শীতের মরসুমে ঠাণ্ডায় কাঁপে। বড় শূকর এসব কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকে কিন্তু বাচ্চারা মারা যায়। কারণ জন্মের পর পনের দিন পর্যন্ত বাচ্চা শূকরকে যত্ন করা প্রয়োজন।

আদিবাসী এবং হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও দেশী শূকর প্রতিপালন করার ঝোঁক রয়েছে। উভয় সমাজে প্রায় প্রতিটি পরিবার আট থেকে দশটি করে শূকর পালন করে। ঐসব পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। যার ফলে ইচ্ছে
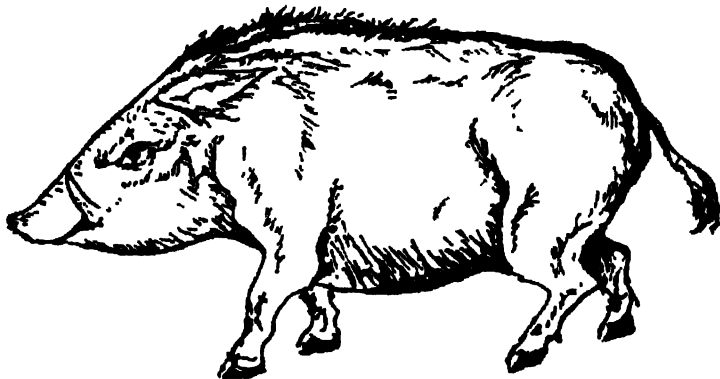
দেশী শূকর।

থাকলেও আর্থিক কারণে শূকরদের ঠিকভাবে পরিচর্যা করা সম্ভব হয় না। বাচ্চা শূকরের মৃত্যুর হার বাড়ে, ক্ষতি হয় জেনেও শূকর পালন থেকে সরে আসে না। কারণ দেশী শূকর পালন করতে এদের একটি পয়সাও খরচ করতে হয় না। সুতরাং, দু'-চারটে শূকর মরে গেলে, দল সংখ্যা কমলেও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয় না।

এইভাবে দুটো বছর পালন করতে পারলে পারিবারিক কোন শুভ-অনুষ্ঠানে মাংসের চাহিদা মেটানো যায় এবং বাকি শূকর বাজারে বিক্রি করলে মোটা টাকা হাতে আসে। সুতরাং বিনা খরচে শূকর পালন করে যদি পরিবারের মাংসের চাহিদা মেটে এবং দু' বছর বাদে একসঙ্গে মোটা টাকা আয় হয় তবে অবহেলায় কয়েকটা বাচ্চা মরলেও কোন ক্ষতি হয় না। এভাবেই দেশী শূকর পালিত হয়ে আসছে।

অথচ পাকা খোঁয়াড়ে রেখে এবং পুষ্টিকর খাদ্য দিলেও পালনকারীর পরিশ্রম ও খরচ বৃথা যাবে। কারণ শূকরের দেহে ৬০ কেজির পরিবর্তে মাংস বাড়বে মাত্র ৪০ কেজি। আর সময় লাগবে প্রায় দু' বছর। কাজেই দু' বছরে ৪০ কেজি বেশি মাংস পেলেও কোন লাভ নেই। দেশী শূকরের ক্ষেত্রে আরও একটা অসুবিধে হচ্ছে, আবদ্ধ অবস্থায় পালন করলে এরা বিভিন্ন রোগে ভুগতে থাকে। চিকিৎসা করে ওষুধ খাওয়ালেও শরীর ভেঙে পড়ে।
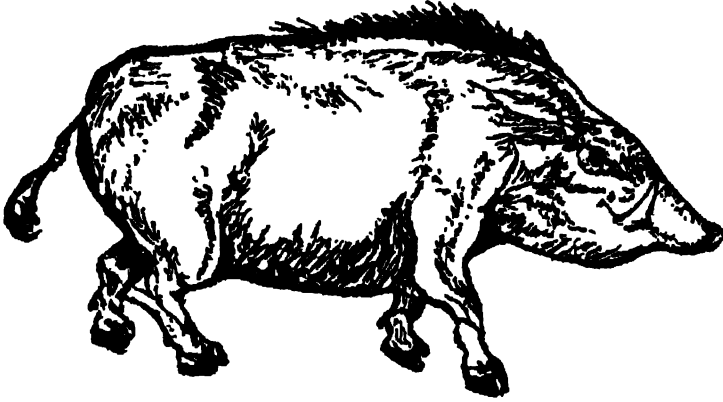
ভারতে অধিকাংশ রাজ্যে পালিত নিম্নমানের দেশী শূকর।

আগেই বলা হয়েছে খাদ্য হিসাবে কিছুই খরচ করতে হয় না। সারাদিন মাঠে চরে পেট প্রায় ভরিয়ে ফেলে। এরপর যেটুকু ঘাটতি থাকে সেটা হোটেলের ফেলে দেওয়া খাবার এবং বাজারের সামান্য পচা এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া সবজি সংগ্রহ করতে পারলে এদের পেটও ভরবে এবং শরীরও ভালো থাকবে। এই সামান্য কয়েকটা পরিচর্যা করতে পারলে দেশী শূকর পালন করে ভালোই লাভ করা যাবে। তবে খামার পদ্ধতিতে বেশি সংখ্যাতে দেশী শূকর পালন করা হলে ঐভাবে বেশি পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করা কোন খামারীর পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে খাদ্য কিনতে হয় এবং খরচ বেশি পড়ে।

## শূকরের থাকবার ঘর

খামার গড়ে তোলার আগে ভাবতে হবে জমিটা কোথায় অর্থাৎ তার অবস্থান যেন গ্রাম অথবা শহর থেকে বহু দূরে না থাকে। কারণ খামার যেখানে হবে তার চার পাশের এলাকায় রোজ একটি অথবা দু'টি শূকরের ৪০০ থেকে ৮০০ কেজি মাংস বিক্রি হয়ে যাবে সেটা ভাবা মোটেই ঠিক নয়। ফলে বিক্রি করবার উপযোগী শূকরকে শহরে নিয়ে আসতে হবে। কাজেই শূকরের খামার এমন জায়গায় হবে যেখান থেকে শহরের যোগাযোগ সহজে হয় এবং পরিবহনের জন্য খরচ যেন বেশি

না পড়ে। সুতরাং রেল স্টেশন এবং পাকা রাস্তা খামারের কাছাকাছি থাকলে উভয় ধরনের সুযোগ এবং সুবিধা পাওয়া যায়।

**খামারের জমি ঃ** এ ব্যাপারে প্রধান কথা হচ্ছে, খামারের চারপাশটা যেন ফাঁকা থাকে। বেশি গাছপালা যেমন থাকবে না, তেমনি ফাঁকা মাঠও হবে না। জমি যেন নিচু না হয় এবং জল না জমে। বর্ষার জলে খামারের মেঝে ডুবে থাকলে শূকরের নানা রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকবে। কাজেই জমি হবে কিছুটা উঁচু।

খামার ঘর পরিষ্কার করা এবং শূকরদের জন্য পানীয় জল যাতে সব সময় পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা খামারের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে। খামারের জন্য যে জমি ঠিক করা হবে তার মধ্যে ছোট আকারের পুকুর (যাতে বারো মাস জল পাওয়া যায়) থাকলে ভালো হয়। যদি না থাকে তবে পাতকুয়া অথবা অগভীর নলকূপ এদের মধ্যে যেকোন একটির ব্যবস্থা করা দরকার। পুকুরের জল যদি দূষিত হয় এবং জলজ উদ্ভিদে ভরা থাকে, তবে সেগুলো তুলে পরিষ্কার করে তারপর পুকুরের জলে ভালোভাবে ছড়াতে হবে গুঁড়ো চুন। এরপর আবার পনের দিন বাদে ছড়াতে হবে ব্লিচিং পাউডার। তাহলে জলে জীবাণু থাকবে না। তিন সপ্তাহ পুকুরের জল কোন কাজেই ব্যবহার করা যাবে না। তারপর ঐ জল শূকরে পান করতে পারবে। জীবাণুমুক্ত জলে দেড় মাস বাদে কিছু রুই-কাৎলা এবং তেলাপিয়া মাছ ছাড়লে জল ভালো থাকবে এবং খামারীর প্রতি বছর মাছ বিক্রি করে একটা মোটা টাকা আয় হবে। তাছাড়া মাছও খুব তাড়াতাড়ি বাড়বে। তার কারণ শূকরের মল-মূত্র পচে যে সার হবে সেটা কিছুটা পরিমাণে জলে ফেলে দিলে মাছেরা খাবে। এটা এদের পক্ষে পুষ্টিকর খাবার।

খামার ঘরের সামনে ও পিছনে অবশ্যই কিছুটা জায়গা থাকা দরকার। কারণ দিনের বেলা সকালে ও বিকেলের দিকে শূকরেরা যাতে ঘুরে বেড়াতে পারে। খোলা জায়গায় কয়েকটা বড় গাছ থাকলে ভালো হয়। কারণ গরমের সময় গাছের ছায়াতে শূকরেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে পারবে। খামারের চারদিকের সীমানা পাঁচিল দিয়ে ঘিরতে পারলে ভালো হয়। যদি অর্থের অভাব থাকে তবে তার দিয়ে অবশ্যই ঘেরা দরকার। তবে কাঁটাতার ব্যবহার করা চলবে না। কারণ শূকর গা ঘসলেই আঘাত পাবে। এর জন্য শরীরে যে ঘা হবে সেটা ভালো হতে দেরী হতে পারে। তবে আর্থিক সুবিধা হলেই পাঁচিল দেবার ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন। কারণ দিন এবং রাতে কুকুর, শিয়াল এবং বিড়াল খামারে ঢুকে বাচ্চাদের ক্ষতি করতে পারে।

**জমির মাটি ঃ** খামারের জন্য যে জমি ঠিক করা হয়েছে তার মাটি কোন্ শ্রেণীর সেটা দেখা দরকার। কাদামাটি না থাকাই ভালো। কারণ শূকর ছোটাছুটি করবার সময় বিশেষ করে বর্ষাকালে অসাবধানতার জন্য পা পিছলে পড়ে যেতে পারে। শূকর পড়ে গেলে পায়ের হাড় ভেঙে যাবার আশঙ্কা থাকে। কারণ ভারি দেহ এবং সেই তুলনায় পাগুলো ছোট এবং সরু। আর শূকরের পায়ের হাড় তেমন একটা শক্ত নয়।

আবার বেলেমাটি হলে গরমের সময় মাটির তাপ বেড়ে যায়। কাজেই শূকরের খামারের আদর্শ মাটি হচ্ছে বেলে-দোআঁশ শ্রেণীর। যদি তা না থাকে তবে মাটি কুপিয়ে ও পরিমাণ মতো বালি মিশিয়ে আবার সমান করে দিতে হবে। ঐ শ্রেণীর জমিতে ভালো দূর্বা ঘাস জন্মায়। বর্ষায় খুব একটা নরম হয় না এবং পিচ্ছিল হবারও কোন সুযোগ থাকে না।

**প্রয়োজনীয় জমি ঃ** খামারের জন্য কতটা পরিমাণে জমি লাগবে সেটা নির্ভর করে শেষ অবধি (অর্থাৎ শূকরের পাল বেড়ে কত সংখ্যায় পালন করা হবে) কতগুলো শূকর নিয়ে খামার করা হবে। যদি বড় ধরনের খামার করবার ইচ্ছে থাকে তবে শূকর প্রতিপালন করবার মতো আর্থিক ক্ষমতা বুঝে তবেই বড় আকারের খামার করা চলবে। খামার দু'ভাবে করা চলে। এখানে ছোট অথবা বড় শূকরের খামারের কথা বলা হচ্ছে না। যদি আর্থিক ক্ষমতা ভালো হয় তবে বেশি পরিমাণে জমি কিনতে পারা যায়। শূকরের খামার ঘর এবং এদের ঘুরে বেড়াবার জন্য যে পরিমাণে জায়গা দরকার সেটা রেখে বাকি জায়গায় ছাগল ও মেষ এবং ব্রয়লাব সহ ডিমের জন্য মুরগির খামার করা চলবে। আর জমির সীমানা বরাবর চাবধারে বড় ফলের গাছ লাগালে তার থেকে সারা বছর ফল বিক্রি করে মোটা টাকা আয় হবে। এটা অতিরিক্ত আয় এবং খামারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এই ধবনেব বড় খামাবকে মিশ্র খামার বলা হয়।

অনেকে আবাব সীমানা ববাবর চারপাশে ফলের গাছ লাগিয়ে ছাগল, মেষ এবং মুরগি পালন করে না। তার বদলে ফাঁকা জায়গায় শূকরের খাদ্য হিসাবে কযেক রকমেব ঘাসের চাষ কবে। ঘাস বলতে বজরা, ভুট্টা এবং প্যারা ঘাসের চাষ কবা যায়। ঘাস চাষ করার অসুবিধা থাকলে সবজি চাষও করা চলে। তখন বাঁধাকপি, গাজর, মুলো, রাঙা আলু ইত্যাদি সবজি লাগালে শূকবে সবই কাঁচাই খেযে নেবে। এসব সবজি এদের শরীরের পক্ষেও ভালো। যা কিছু বলা হচ্ছে, সেটা সম্ভব হবে যদি পালনকারীর আর্থিক ক্ষমতা থাকে। নতুবা খামারের ঘর এবং শূকর ঘুরে বেড়াবার প্রয়োজনীয় জায়গা থাকলেই কাজ মিটে যাবে। এই ধরনের খামার একমাত্র গ্রামাঞ্চলেই করা সম্ভব।

কালো অথবা ছাই রঙের দেশী শূকর পালন করা হলে এদের দেহ তেমন বাড়ে না, ওজনও কম। সুতরাং থাকবার জন্য বেশি জায়গা দেবার প্রয়োজন নেই। একটি শূকরকে যদি দু' বর্গফুট পরিমাণ জায়গা দেওয়া হয় তাহলে এরা ভালোভাবে থাকতে পারে। যদি বিদেশী সংকর জাতের শূকর পালন করা হয় তবে প্রতিটি শূকরের জন্য লাগবে ১৮ বর্গফুট জায়গা। কারণ এদের দেহের ওজন ৩০০ থেকে ৩৫০ কেজি অবধি হয়ে থাকে। সেই অনুপাতে লম্বাতেও বড় হয়। কাজেই প্রয়োজনীয় থাকবার জায়গা দেওয়া খুবই জরুরী।

জাত অনুসারে একটি শূকরের কতটা পরিমাণে জায়গার প্রয়োজন হয় সেটা বলা হলো। সুতরাং পালনকারী কতগুলো শূকর পালন করবে তার একটা হিসাব করে সেই অনুপাতে জায়গা সংগ্রহ করতে কোন অসুবিধে হবে না। তবে জমি

সামান্য বেশি পরিমাণে কিনতে পারলে ভবিষ্যতে খামারে শূকরের সংখ্যা বাড়াতে হলে কোন অসুবিধে হবে না।

**খোঁয়াড় বা ঘর তৈরি ঃ** এ ব্যাপারে পালনকারীর আর্থিক ক্ষমতা থাকলেও ওদের জন্য খোঁয়াড় তৈরি করতে প্রথমেই বেশি খরচ করার কোন প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যবসাতে লাভ বা লোকসান হতে পারে। কাজেই প্রথম ব্যবসা শুরু করতে গিয়ে কিছু ক্ষতি হবেই সেটা ধরে নিয়ে কাজে নামা দরকার। এতে ক্ষতি সামলাতে পারা যায়।
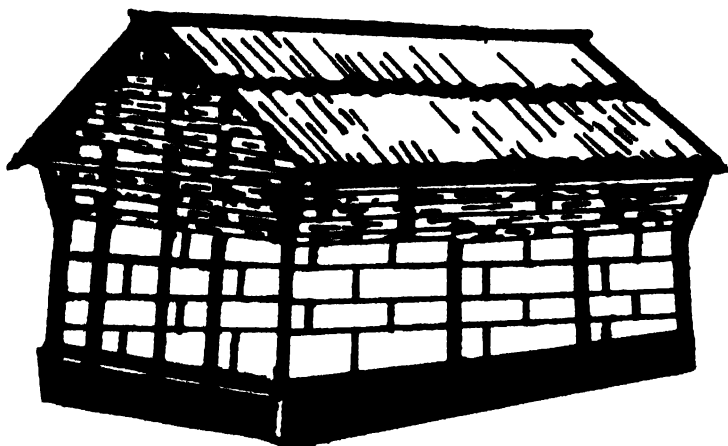
শূকর পালনের জন্য পাকা খামার। জমি থেকে পাঁচ ফুট উঁচু পাঁচিল তুলে বাকী ছাদ পর্যন্ত লোহার জাল অথবা বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা থাকে, যাতে বাতাস এবং আলো ভিতরে প্রবেশ করে।

খোঁয়াড়ের চারপাশের দেওয়াল মাটির অথবা কম দামের ইট কাদা দিয়ে গেঁথে এবং ছাদটা খড়ের অথবা পুরনো টালি দিয়ে করা চলতে পারে। শূকরদের বছর দুই ভালভাবে প্রতিপালন করে এবং লাভ হিসাবে মোটা টাকা আয় হলে তখন দেওয়ালে মোটা করে সিমেন্টের পলেসতরা ও ছাদে এ্যাসবেস্টর দেওয়া যাবে।

প্রথম শুরুতেই খোঁয়াড়ের মেঝে অবশ্যই পাকা করা উচিত। তবে বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলাতে খোঁয়াড় করলে মেঝে মাটির হলে কাজ চলে যায়। কারণ ঐ তিন জেলার প্রায় সর্বত্রই মাটিতে বালি এবং কাঁকর উভয়ের ভাগ বেশি থাকে। কাজেই বর্ষার সময় মেঝে কাদাতে ভরে যায় না। সামান্য রাবিস বা কয়লার ঘেঁস ফেলে দুরমুস দিয়ে পিটিয়ে মাটি বসিয়ে দিলে বেশ শক্ত হয়। আর খোঁয়াড়ের যে দিকে নর্দমা থাকবে মেঝে যেন চার ইঞ্চি ঢাল সেই দিকেই থাকে। পাকা মেঝে করলেও একই নিয়ম পালন করতে হবে।

পাকা মেঝে করার সামর্থ্য না থাকলে প্রথমে মাটি পিটিয়ে ছয় ইঞ্চি বসাতে হবে। তারপর ছোট ইঁটের খোয়া বিছিয়ে একই ভাবে পিটিয়ে বসিয়ে শেষে ইট

বিছিয়ে উভয় ইঁটের ফাঁকগুলো সিমেন্ট কি বালি দিয়ে ভরাট করে দিলে সেটাও পাকা মেঝের মতো কাজ করবে।

লম্বা টানা হলঘরের মতো খোঁয়াড় হলে ভিতরে চারটি ভাগ করে ঘিরে দিতে হবে। কিছুটা জায়গা ঘেরা থাকবে যে শূকরী বাচ্চা দিয়েছে তার জন্য এবং পাশেই থাকবে ঘেরা জায়গায় তার বাচ্চা। এরপর ঘেরা জায়গায় থাকবে কম বয়সের
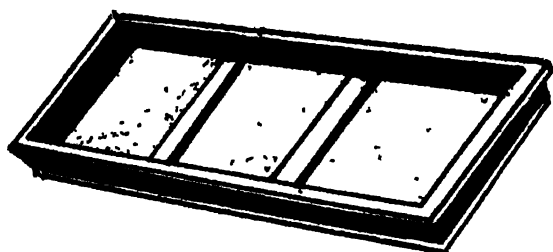
দেড় মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চা শূকবদের জল পানের অ্যালুমিনিযাম পাতে তৈবি পাত্র।

শূকর বাচ্চা যারা সবে শূকরীর বুকেব দুধ পান করা বন্ধ করেছে। তৃতীয় ঘেবা অংশে থাকবে পূর্ণবয়স্ক শূকর ও শূকরী। আর চতুর্থ অংশে রাখা হবে দুটি অথবা তিনটি প্রজননের কাজে ব্যবহার করা শূকর। ঘিরে দেওয়া অংশ ইঁটের পাকা
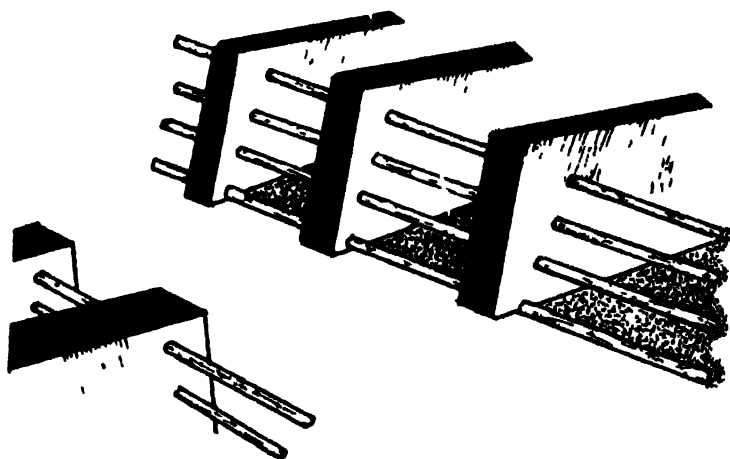
পাকা খামার ঘবে এইভাবে উন্নত জাতের শূকরদের আলাদাভাবে রাখা দরকার।

দেওয়াল হলে ভালো হয়। কারণ বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিলে সেটা বেশি দিন চলে না। তার কারণ ৩৫০ কেজি ওজনের শূকর মাঝে মাঝে গা ঘসে। ভারি শূকবের ভারে বাঁশের বেড়া সহজেই ভেঙে যায়। কাজেই প্রথমেই পাকা কাজ করা ভালো।

প্রত্যেকটি ঘেরা অংশে ছোট আকারের খাবার জল রাখার চৌবাচ্চা করতে হবে। প্রতি কুড়িটি শূকরের জন্য একটি করে জলের পাত্র থাকলে ভালো হয়। আর খাবার দেবার জন্য পাকা লম্বা নালা থাকবে। এটা দেওয়াল বরাবর করা হবে। একটি শূকরের জন্য এক ফুট হিসাবে জায়গা মেপে নালা লম্বা হবে। প্রয়োজনে দুটো ঐ রকম দেওয়াল বরাবর নালা করতে পারা যায়। নালা এক ফুট চওড়া রাখলেই শূকরদের খেতে কোন অসুবিধে হবে না।
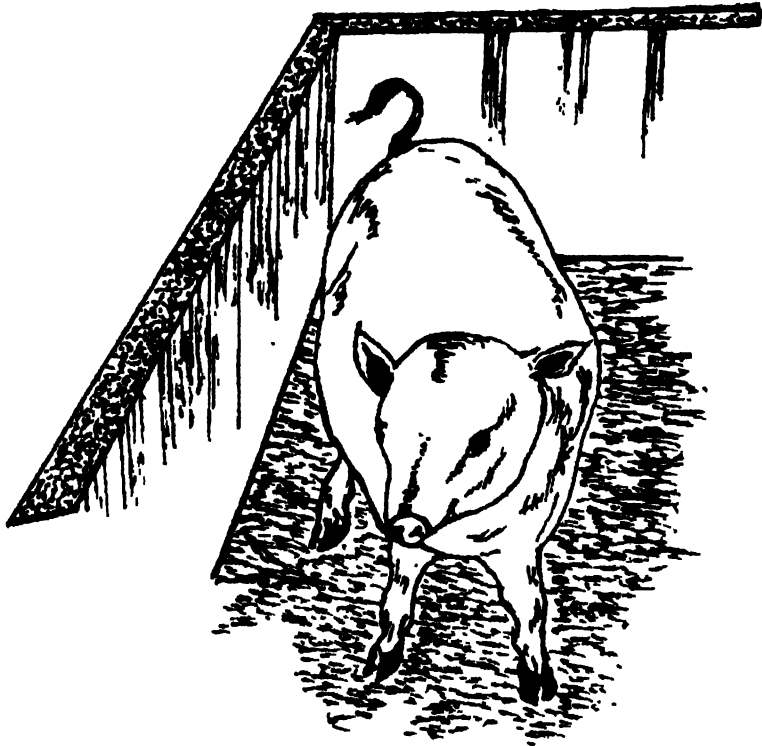
জন্মাবার পর বাচ্চা শূকরদের মেঝেতে খড় বিছিয়ে রাখতে হবে।

খোঁয়াড়ের যে দরজাগুলো দিয়ে শূকর বাইরে বের হবে বা ভিতরে প্রবেশ করবে তার সামনে যে নালা থাকবে সেটা যেন ভালোভাবে ঢাকা থাকে। নতুবা শূকর পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যেতে পারে। মেঝে কোন সময়েই জল দিয়ে ধোয়া চলবে না। তার বদলে একদিন অন্তর ফিনাইল জলে মিশিয়ে সেই জল মেঝেতে ভালোভাবে ছিটাতে হবে। তারপর ঝাঁট দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করা দরকার। এরপর কাটা খড় হালকা ভাবে মেঝের চারদিকে বিছিয়ে দিতে হবে। এই কাজটি কাঁচা মেঝের ক্ষেত্রে করা দরকার।

**শূকরদের মল ত্যাগের জায়গা ঃ** দেশী, বিদেশী এবং সংকর জাতের শূকর মল ত্যাগ করে মানুষের মতো একটা নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গায়। অথচ দেশী শূকর মানুষের মল খায়, গায়ে মাখে এবং খুবই নোংরা জিনিস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। তবে যে জায়গায় রাতে শুয়ে থাকে এবং পালনকারীর দেওয়া খাদ্য খায় সেখানে কোন জাতের শূকরই মল ও মূত্র ত্যাগ করে না। খোঁয়াড়ের ঘরে এক কোণায় সামান্য জায়গা ঘিরে দিলে সেখানে গিয়ে সকালে মলমূত্র ত্যাগ করবে। তবে যে শূকর রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং চলবার ক্ষমতা নেই, তার কথা আলাদা। শূকর নীরোগ থাকলে তারা একটি ব্যাপারে সভ্য মানুষের মতো আচরণ করে। এমনকি ছোটরা বড়দের দেখে সেই মতো আচরণে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

## প্রজননের কাজে শূকর নির্বাচন

এশিয়া সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের উন্নত জাতের শূকরের বিষয়ে জানবার পর খামারে এদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য প্রজননের কাজে উপযোগী উন্নত জাতের শূকর নির্বাচন করা দরকার। যদি এই কাজটি ঠিক মতো করা না হয় তা হলে খামার লাভজনক হতে পারবে না। কারণ যাদের মাধ্যমে শূকরের বংশ বাড়বে সেই সব শাবকরা যদি দুর্বল হয তবে একদিকে যেমন মাংসের উৎপাদন কম হবে তেমনি দুর্বল শূকরী সবল বাচ্চা প্রসব করবে না। তাছাড়া শাবকের মৃত্যুর হাব বেশি হবে।

উন্নত জাতের শূকরকে বাচ্চা অবস্থায় যদি ঠিকমতো খাদ্য দেওয়া ও সঠিক পরিচর্যা করা হয় তাহলে মাত্র নয় মাস বয়স হলেই তার শরীরে প্রজননের ক্ষমতা আসে। তবে এদের শরীর ঠিক রাখার জন্য **এক বছর** বয়স না হলে শূকরীর সঙ্গে মিলন ঘটানো উচিত নয়। এই নিয়ম অবশ্যই পালন করা দরকার।

প্রজননের কাজে নির্বাচিত শূকরকে আবার বেশি খাদ্য দেওয়াও চলবে না। রোজ পরিমাণ মতো সবুজ খাদ্য খাবে। দিনের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য ঘোরাফেরা এবং ছোটাছুটি করলে শূকর সতেজ থাকবে। কারণ এতে এদের শরীরের পক্ষে ব্যায়ামের কাজ হবে। নতুবা শরীরে বেশি চর্বি জমতে শুরু করবে।

তবে শূকর নির্বাচন করার জন্য এসব ছাড়াও আরও কতকগুলো লক্ষণ রয়েছে সেগুলো একটু নজর দিয়ে দেখলে আগামী দিনে খুবই ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রজননের কাজে নির্বাচিত শূকর হবে লম্বা ধরনের। ভালো স্বাস্থ্য থাকলেও যেন বেঁটে না হয়। একবার দেখলেই মনে হবে দেহের গঠন বা কাঠামো বেশ মজবুত ধরনের। একটা পৌরুষ ভাব তার চলা ফেরায় এবং সারা শরীরে ফুটে উঠবে। দেহের গঠন যেমন ভালো হবে তেমনি শরীর হবে শক্তিশালী। উভয় পাছা হবে মজবুত। দেহের তুলনায় চারটি পা সরু হলেও অবশ্যই শক্ত হবে। যেসব বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হলো, তার সবগুলো যদি ঠিক মতো মিলে যায় তাহলে সেই শূকরকে প্রজননের কাজের পক্ষে সব থেকে উপযুক্ত বলে অবশ্যই

ধরা যাবে। এই রকম শূকরের সঙ্গে যদি ভালো জাতের শূকরীর দেহের মিলন ঘটে তবে সেই শূকরী অবশ্যই স্বাস্থ্যবান এবং নীরোগ বাচ্চা প্রসব করবে।

উন্নত জাতের, ভালো স্বাস্থ্য এবং এক বছর বয়সের শূকর হলেও শূকরীর সঙ্গে তার মিলন একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। একটি শূকর সারা বছরের মধ্যে ৫০ বার শূকরীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। মিলনের এই সংখ্যা যদি পালনকারী সঠিকভাবে মেনে চলে তবে শূকরের শরীর যেমন ভালো থাকবে তেমনি ভালো শাবক শূকরীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। অপরদিকে লোভের বশে এর থেকে বেশি বার শূকর যদি শূকরীর সঙ্গে মিলিত হয় তবে শূকরের শরীর ভেঙে যাবে এবং শূকরী দুর্বল বাচ্চা প্রসব করবে। পশুদের মধ্যে শূকরের শরীরে কাম-উত্তেজনা খুবই প্রবল। কাজেই সারাদিনে একটি শূকরকে যদি দশ বার শূকরীর সঙ্গে মিলিত হতে দেওয়া যায় তাহলেও শূকর ক্লান্ত হয় না। একটা বছরে হয়তো এর কু-প্রভাব বা কুফল বুঝতে পারা যাবে না তবে দ্বিতীয় বছর হলেই শূকরী দুর্বল, রোগা, আকারে ছোট এবং কম সংখ্যায় বাচ্চা প্রসব করবে। এই রকম শূকর বাচ্চাকে খামারে ভালো খাদ্য দিয়ে এবং উপযুক্ত পরিচর্যা করেও তার কাছ থেকে পরিমাণে মতো মাংস এবং ভালো শাবক পাওয়া যায় না। সুতরাং খামারীর লোকসান হবেই। তাছাড়া সেই শূকরের দেহে মাংস বৃদ্ধিও কম হবে।

## পালনের উপযোগী শূকরী

খামারে পালন করবার জন্য শূকরীও নির্বাচন করতে হবে শূকরের মতো বাইরের দেহের গঠন এবং কয়েকটা লক্ষণ দেখে। কারণ শূকরীর মাধ্যমে যে বাচ্চা পাওয়া যাবে এরাই পালিত হবে খামারে। এইভাবে বাড়বে শূকরের সংখ্যা। ভালো স্বাস্থ্য এবং নীরোগ শরীর হলে সেই শূকর নির্দিষ্ট সময় অবধি পালন করলে প্রত্যেকের কাছ থেকে সঠিক পরিমাণে মাংস না পাবার কোন কারণ নেই। অপরদিকে শূকরীর শরীর দুর্বল হলে এর বাচ্চা হবে দুর্বল। তাকে ভালোভাবে পালন করলেও পালনকারী লাভের মুখ দেখতে পাবে না। এটা অঙ্কের হিসাব।

শূকরীর দেহ ভারি হলেও মাথার গঠন হবে সরু। কানের চামড়া হবে পাতলা। আর পেটের নিচে দু' পাশে বারো থেকে চোদ্দটি স্তনের বোঁটা পালান থেকে নিচের দিকে সোজাভাবে ঝুলে থাকবে। শূকরীর দেহের গড়ন হবে লম্বা ধরনের। পিঠের দিকটা কঠিন এবং চারটি পা সরু হলেও দেখলে মনে হবে বেশ মজবুত। দেহের সব কিছুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। শূকরীর সতেজ ভাব একবার দেখলেই সহজেই বোঝা যাবে। এসব লক্ষণ মিলে গেলে সেই শূকরী খামারে পালন করার পক্ষে খুবই উপযোগী বলে ধরা হবে। পালানের কোন বোঁটা যদি কোন দিকে বাঁকানো অবস্থায় থাকে তবে সেই শূকরী পালন করা উচিত নয়।

যদি সব কিছু নিয়ম-কানুন মেনে শূকরীকে পালন করা হয় তবে আমাদের মতো গরমের দেশে খুবই কম বয়সে শূকরী গর্ভধারণ করবার জন্য শূকরের সঙ্গে

মিলিত হতে পারে। ইউরোপের কয়েকটি দেশে এবং এশিয়ার মধ্যে চিনেও শূকরীর পাঁচ মাস বয়স হলে এর গর্ভধারণ করবার ক্ষমতা হয়। কিন্তু গরমের দেশে শূকরীর কাছ থেকে এভাবে বাচ্চা নেওয়া উচিত নয়। কয়েক বছরের মধ্যেই শূকরীর শরীর দুর্বল হয়ে যায়। ফলে ভালো বাচ্চা প্রসব করতে পারে না। সুতরাং বয়স দশমাস পূর্ণ না হলে শূকরের সঙ্গে মিলিত হতে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য জীব বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে শূকরীর বয়স দু' বছর পূর্ণ না হলে এর গর্ভধারণ করা উচিত নয়। কিন্তু খামারে যে শূকরীদের পালন করা হচ্ছে এদের ঐ সময় অবধি অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। দশ মাস থেকে এক বছর পূর্ণ হলেই শূকরের সঙ্গে মিলন ঘটালে ভালো এবং সবল বাচ্চা পাওয়া যাবে এবং শূকরীর স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হবে না।

**গর্ভধারণ ঃ** শূকরী প্রথমবার প্রসব করবার পর সাত থেকে আট দিনের মধ্যে বাচ্চারা শূকরীর বুকের দুধ পান করা ছেড়ে দেয়। মাত্র সাত দিন পরেই শূকরী আবার গর্ভধারণ করবার জন্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে। গ্রাম বাংলায় চলতি কথায় উত্তেজনার সময়কে গরম অবস্থা বলা হয়। শূকরীর স্বাস্থ্য ভালো হলে গরম বা উত্তেজনা তিন দিন অবধি থাকে। এই তিন দিনের মধ্যে যে কোন একদিন শূকরের সঙ্গে মিলন ঘটলে কোন ক্ষতি হয় না। সুতরাং শূকরীকে মিলিত হতে দেওয়া যেতে পারে।

তবে প্রকৃতির নিয়মে শূকরীদের বছরের দুটো ঋতুতে যৌন মিলন স্বাভাবিকভাবে ঘটে। মাস হিসাবে ধরলে আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর এবং ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস অবধি। সারা বছরের মধ্যে এই চারটি মাস শূকর এবং শূকরীদের পক্ষে মিলনের সব থেকে ভালো সময়। তবে এই নিয়ম সব সময় খাটে না।

শূকরী উত্তেজিত হলেই অর্থাৎ ঋতুকালে এদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা ভাব দেখা যাবে। জরায়ুর আকারও বড় দেখাবে এবং ভালো করে দেখলে ভারী বলে মনে হবে। জরায়ু দিয়ে মাঝে মাঝে পিচ্ছিল জলের মতো পাতলা এক ধরনের রস গড়িয়ে পড়বে। প্রায় সব সময় মুখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করবে। খামারে যেসব শূকরী রয়েছে এদের পিঠে সামনের দুটো পা দিয়ে চড়বার চেষ্টা করবে। কোন কম বয়সের শূকরী একইভাবে উত্তেজিত শূকরীর পিঠে যদি চাপে তবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে।

**মিলনের পদ্ধতি ঃ** শূকরের সঙ্গে উত্তেজিত শূকরীর মিলন ঘটাবার প্রয়োজন হলে খামার ঘরের ভিতরে শূকরকে নিয়ে আসা উচিত নয়। উত্তেজিত শূকরীকে খামার ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে শূকরের সঙ্গে মিলন ঘটাতে হবে। কয়েক দফায় মিলন ঘটার পর শূকরকে তার থাকবার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। কারণ উভয়কে সারাদিন একত্রে রাখলে বার বার মিলনের ফলে এদের শরীরের পক্ষে ক্ষতির কারণ হতে পারে। শূকরী এই সময় খুবই স্থির এবং চুপটি করে দাঁড়িয়ে থেকে মিলন সুখ উপভোগ করে। একটি উত্তেজিত শূকরী মোট চার ঘন্টা যদি শূকরের

সঙ্গে মিলিত হয় তবে ঐ সময়টাই গর্ভ ধারণ করবার পক্ষে যথেষ্ট বলে ধরা হয়। এর থেকে কম সময় পর্যন্ত মিলিত হলেও গর্ভ ধারণের ক্ষেত্রে অসুবিধে হয় না।

যেসব শূকরীর গর্ভধারণ করবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে বলে ঠিক করা হয়েছে তাদের ২১ দিন অন্তর উত্তেজিত হতে দেখা যায়। উত্তেজনা তিন দিন অবধি প্রকাশ পায়। ঐ সময়ের মধ্যে শূকরের সঙ্গে মিলন ঘটলে যদি শূকরী গর্ভবতী হয় তবে ২১ দিন বাদে আবার উত্তেজিত হবে না। সেক্ষেত্রে মিলনের আর প্রয়োজন নেই। এক মাসের মধ্যে শূকরীর দেহের পরিবর্তন দেখা যাবে। পাছার দিক ভারি দেখাবে। আরও দশ-বারো দিন বাদে অর্থাৎ ৪২ দিন বাদে পাছা আরও ভারি হবে। শূকরীর পালানের বোঁটা বা বাঁট কিছুটা ফোলা বলে মনে হবে এবং মিলনের জন্য শূকরী উত্তেজিত হবে না।

**শূকরীর বাচ্চা প্রসব করা ঃ** প্রসবের দিন আগে থাকতে ঘোষণা করা যেমন পালনকারীর পক্ষে সম্ভব নয় তেমনি কোন পশু চিকিৎসকও এ ব্যাপারে আগে থাকতে কিছু বলতে পারেন না। যা কিছু বলা হয় সবই অনুমান করে। শূকরী
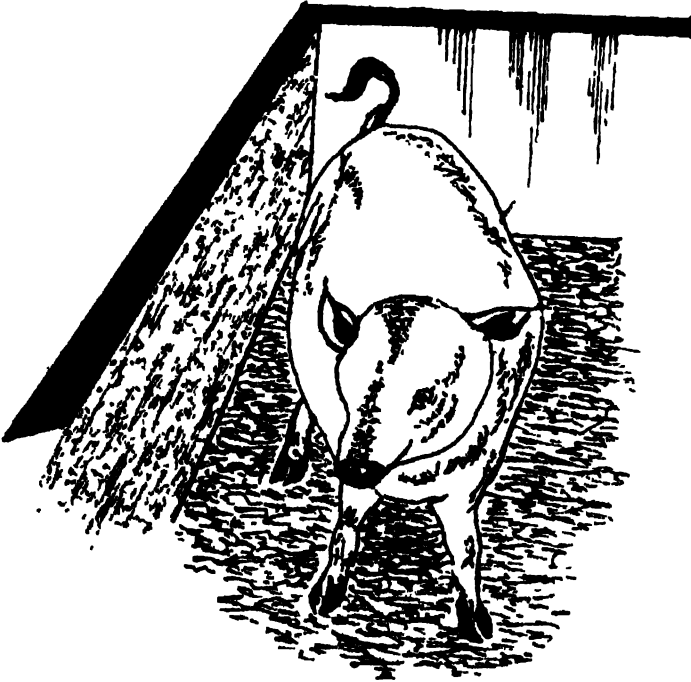
বাচ্চা শূকরদের মেঝেতে ছোট আকারের
কাটা খড় বিছিয়ে রাখা দবকার।

গর্ভধারণ করবার পর ১১২ দিন থেকে ১১৪ দিন, আবার কিছুক্ষেত্রে ১১৬ দিন পার হবার পর আট থেকে নয় দিনের মধ্যে শূকরী যেকোন দিন বাচ্চা প্রসব করতে

পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সব থেকে কম সময় ১২১ দিন এবং সব থেকে বেশি সময় ১২৫ দিন লাগতে পারে।

**প্রসবের আগে এবং পরে পরিচর্যা ঃ** শূকরী প্রসব করবার ২০ দিন আগেই তাকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে। তার কারণ খামারের অন্যান্য শূকরের সঙ্গে মারামারি করলে জখম হবার আশঙ্কা থাকে।

যে ঘরে শূকরী থাকবে তার মেঝেতে শুকনো খড় বেশ পুরু করে বিছিয়ে দিতে হবে। কারণ অনেক সময় মেঝেতে পা পিছলে শূকরী পড়ে যেতে পারে। তার ফলে গর্ভপাত অথবা পিছনের পায়ের হাড় ভেঙে যাবার আশঙ্কা থাকে। এই সময় খাদ্য হিসাবে রোজ দেড় কেজি কচি সবুজ ঘাস এবং ২ কেজি সুষম খাদ্য দেওয়া দরকার। সবুজ কচি ঘাস বাচ্চাদের শরীরে পুষ্টি সাধন করবে।

শূকরী বাচ্চা প্রসব করতে শুরু করলে তাকে বিরক্ত করা চলবে না। সবকটি বাচ্চা প্রসব না করা অবধি শূকরী যাতে চুপচাপ শুয়ে থাকে সেটা পালনকারীকে দেখতে হবে। যদি দেখা যায় শূকরী প্রসব করতে খুবই কষ্ট পাচ্ছে এবং বাচ্চা অর্ধেক বের হয়ে আটকে রয়েছে তাহলে নিজে কিছু না করে পশু চিকিৎসকের সাহায্য অবশ্যই নেওয়া উচিত।
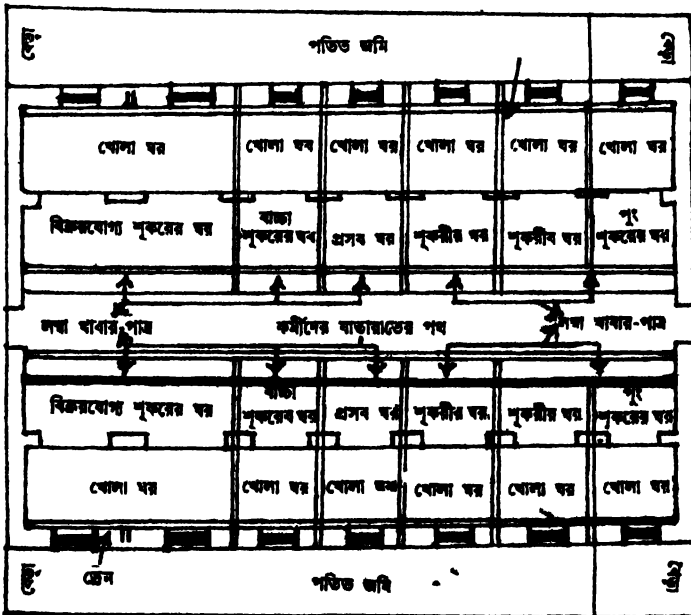
শূকরের আদর্শ খামার।

প্রতিটি বাচ্চা জন্মাবার পর তাকে আলাদা জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার কারণ শূকরী অনেক সময় বাচ্চাকে মেরে ফেলে। অবশ্য বাচ্চাকে শূকরীর কাছ থেকে সরাবার আগে তার নাড়ী দেহ থেকে এক ইঞ্চি দূরে কেটে পরিষ্কার

পাতলা কাপড়ের ফালি দিয়ে বেঁধে দেবার আগে নাড়ীকে ডেটল মেশানো জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হয়। নাড়ী কাটার কাজটি নতুন ব্লেড দিয়ে করা উচিত।

বাচ্চা শূকর থাকবে তার মায়ের সঙ্গে। তবে বেতের ঝুড়ি অথবা কাঠের বাক্সের তলায় কাটা খড় পুরু করে বিছিয়ে তবেই রাখা উচিত। এদের এভাবে রাখবার আগে পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়ে শরীরের সব নোংরা মুছিয়ে দিতে হবে।

শূকরী গর্ভের সব বাচ্চা প্রসব করবার পর তাকে জল দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। যদি শীতের রাত হয় তবে সামান্য গরম জল এই কাজে ব্যবহার করতে হবে। আর বাচ্চাদের যাতে রাতে ঠাণ্ডা না লাগে তারও ব্যবস্থা করা উচিত। জল দিয়ে পরিষ্কার করার পর শুকনো কাপড় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুছিয়ে দেওয়া দরকার।

## শূকরের পুষ্টিকর খাদ্য

দেহের গঠন, শরীরে মাংস বেশি হারে বেড়ে যাওয়া, নীরোগ শরীব এবং প্রজননের কাজে পালিত শূকরের প্রজনন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সুষম খাদ্যের খুবই দরকার। এক কথায় বলা চলে, সুষম খাদ্য শূকরের শরীরের যাবতীয় প্রয়োজন সঠিকভাবে মেটায়। শূকরের বয়স অনুসারে ও বিশেষ ক্ষেত্রে চাহিদা

কলাগাছ। মূল হিসাবে কলাগাছ তার থোড় শূকরকে দেওয়া যাবে।

অনুপাতে উপাদানের পরিমাণ কম অথবা বেশি মাত্রায় মিশিয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করা হয়। এই খাদ্য মিশ্রিত অবস্থায় বিভিন্ন দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। সরকারি প্রতিষ্ঠান (এপিক) মোটামুটি ভাবে সঠিক মাপ ও মাত্রায় বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে

সুষম খাদ্য বিক্রি করে। খাদ্যের দাম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের থেকে কিছুটা কম। তবু নিজে বাড়িতে তৈরি করে নিলে খাদ্যের মান যেমন ভালো হবে তেমনি দামটা আরও কম পড়বে। খামারে ১০০ অথবা ১৫০টি শূকর পালন করা হলে ছোট, মাঝারি এবং বড় মিলিয়ে প্রত্যেকে গড়ে দু' কেজি পরিমাণ সুষম খাদ্য খেলে মাসে কত কেজি সুষম খাদ্য লাগছে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারা যাচ্ছে। সুতরাং বাড়িতে তৈরি করে নিলে এবং কেজি প্রতি ১ টাকা লাভ রাখলে কত টাকা বাঁচানো সম্ভব

কচি ভুট্টা গাছ, শূকরকে ছোট আকারে কেটে
সবুজ খাদ্য হিসাবে খাওয়ানো যাবে।

হচ্ছে সেটা হিসাব করলে সহজেই বোঝা যাবে। কোন কঠিন কাজ নয়। সুষম খাদ্যের উপাদানগুলো বাজার থেকে কিনে এনে ভাগ অনুপাতে মিশিয়ে দিলেই কাজ মিটে যাবে। বাড়িতে তৈরি করা সুষম খাদ্যের মান খুবই উন্নত হবে।

এই ব্যাপারে পালনকারীকে মনে রাখতে হবে, যতটা কম পয়সায় খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করতে পারা যাবে খামার থেকে শেষ অবধি লাভের পরিমাণ সেই ভাবে অনেক বেশি হবে। সেই কারণে যখন যে উপাদানের দামটা কম হবে সেটা বেশি পরিমাণে কিনে রাখা উচিত। যেমন পৌষ ও মাঘ মাসে যখন নতুন চাল বাজারে বিক্রি হয় সেই সময় দামটা অনেক কম থাকে। খুব মোটা এবং যার মধ্যে ভাঙা বেশি সেই চাল এবং ক্ষুদ, ক্ষমতা থাকলে বেশি পরিমাণে কিনে রাখা যাবে। একইভাবে ভুট্টা এবং ভাঙা গমের বাজার দর কম থাকে। অবশ্য সব কিছু নির্ভর করছে শূকরের খাদ্যের উপাদান ঠিকভাবে রাখবার জায়গা এবং বেশি করে কিনে রাখবার মতো আর্থিক ক্ষমতা যদি খামারীর থাকে।

সুষম খাদ্য তৈরি করতে যেসব উপাদান লাগে এবং কিছু পরিমাণে খনিজ পদার্থ সহ কয়েকটি ওষুধের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। কেবল উল্লেখ নয়, কতটা পরিমাণে প্রতিটি উপাদান মেশাতে হবে সবই বলা হবে তালিকায়। বিভিন্ন বয়সের শূকরদের উপাদান কতটা পরিমাণে মেশানো উচিত সেটাও তালিকা দেখলে বুঝতে পারা যাবে।

| সুষম খাদ্যের উপাদান | বাচ্চা শূকরের | মাঝারি বয়সের শূকরের | প্রজননের শূকর ও গর্ভবতী শূকরী |
|---|---|---|---|
| | কেজি হিসাবে | কেজি হিসাবে | কেজি হিসাবে |
| চালের খুদ | ৩০ | ৪০ | ৩৫ |
| ভুট্টা বা গম ভাঙা | ২০ | ২০ | ২০ |
| বাদাম খোল (গুঁড়ো) | ২০ | ১০ | ১৫ |
| কালো তিল খোল (গুঁড়ো) | ৫ | ৩ | ৫ |
| গমের ভুসি | ১০ | ১০ | ১০ |
| চালের কুঁড়ো | ১০ | ১৫ | ১০ |
| মাছের (গুঁড়ো) | ৫ | ২ | ৫ |
| | ১০০ | ১০০ | ১০০ |

তালিকা অনুসারে বিভিন্ন উপাদানগুলো সঠিক ভাবে ওজন করে মিশিয়ে দিলেই সুষম খাদ্য তৈরি হয়ে যাবে। তবে এদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আরও কিছু মেশাতে হয়। প্রতি ১০০ কেজি খাদ্যের সঙ্গে ৫০০ গ্রাম খাবার লবণ, ধাতব লবণ ১ কেজি এবং ২৫ গ্রাম ভিটামিন-এ, বি-$_২$, ডি-$_৩$ মিশিয়ে দিলেই সুষম খাদ্য শূকরদের খাওয়াবার উপযোগী হয়ে যাবে। সব বয়সের শূকরকে খাদ্যের সঙ্গে ভিটামিন এবং লবণ দিতে হবে।

বাচ্চা শূকররা যখন সুষম খাদ্য খেতে শুরু করবে তখন একটি জিনিস আলাদা ভাবে সুষম খাদ্যে মেশানো দরকার। এতে এদের শরীরের বাড় তাড়াতাড়ি হবে। প্রতি ১০০ কেজি সুষম খাদ্যে ৫৫০ গ্রাম অরোফ্যাক-২এ অথবা টি-এম-৫ যেকোন একটি ভালোভাবে মিশিয়ে দেওয়া দরকার । এটা বাচ্চা শূকরকে পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত দিতে হবে।

জন্মের পর বাচ্চা শূকর ১৫ থেকে ১৮ দিন অবধি শূকরীর বুকের দুধ খায়। তারপর এদের সুষম খাদ্য খাওয়াবার অভ্যাস করাতে হয়। এদের বয়স একমাস পূর্ণ না হওয়া অবধি সারা দিনের মধ্যে পাঁচ থেকে ছ' বার সুষম খাদ্য দিতে হবে। এরপর খাদ্য বারে কমিয়ে (পরিমাণ ঠিক রেখে) সারা দিনে মোট তিন বারে

সমানভাগে ভাগ করে খাওয়াতে হবে। পালনকারীকে খেয়াল রাখতে হবে, খাদ্য যতবারই দেওয়া হোক না কেন নষ্ট যেন না হয়।

শূকরকে খাদ্য দেবার ব্যাপারে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে, এদের জন্মের পর থেকে পাঁচ মাস বয়স অবধি বেশি পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করবার একটা ঝোঁক থাকে। সেই মতো প্রয়োজন বুঝে এদের রোজ খাদ্য দিলেই শরীরের অভাব

শূকরকে ইনজেকশান দেবাব সিরিঞ্জ।

মিটবে এবং দেহেব ওজন তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকবে। তবে প্রয়োজনের বেশি খাদ্য কোন সময়েই দেওয়া উচিত নয়। এরা হজম করতে পারবে না এবং শরীরের ক্ষতি হবে। তাছাড়া বেশি খাদ্য দেওয়া মানেই খাদ্যের অপচয় এবং আর্থিক ক্ষতি।

এবার বয়স অনুসারে প্রতিটি শূকরকে রোজ কতটা পরিমাণে সুষম খাদ্য দিতে হবে তার একটা তালিকা এখানে দেওয়া হচ্ছে। তালিকা অনুসারে খাদ্য দিলে এদের শরীর যেমন ভালো থাকবে তেমনি খাদ্য নষ্ট হবে না। তালিকা মতো খাদ্য দেবার পরেও শূকর আরও বেশি খেতে চাইলেও কোন মতেই দেওয়া ঠিক নয়।

## শূকরের বয়স ও দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ

### তালিকা

| বয়স | দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ | শূকরের দেহের ওজন |
|---|---|---|
| ১দিনের বাচ্চা থেকে ১৫ দিন | শূকরীর বুকের দুধ খাবে | ১ কেজি ৫০ গ্রাম |
| ১৬ দিন থেকে ২৯ দিন | ২৫০ গ্রাম | ৪ কেজি ১০০ গ্রাম |
| ১মাস থেকে ২ মাস | ৫০০ গ্রাম | ১২ কেজি ১৫০ গ্রাম |
| ২ মাস থেকে ৩ মাস | ১ কেজি | ১৫ কেজি ১৭০ গ্রাম |
| ৩ মাস থেকে ৪ মাস | ১ কেজি ২৫০ গ্রাম | ৩৬ কেজি ৪০০ গ্রাম |
| ৫ মাস থেকে ৮ মাস | ২ কেজি ২৫০ গ্রাম | ৫৫ কেজি ৬৫০ গ্রাম |
| প্রজননের কাজে শূকর | ৩ কেজি | ৯০ কেজি ৮০০ গ্রাম |
| প্রসূতি শূকর বাচ্চাসহ | ২ কেজি ২০০ গ্রাম | বাচ্চার বয়স হিসাবে খাদ্য |

তালিকা অনুসারে বাচ্চা শূকর জন্মের পর থেকে পনের দিন অবধি শূকরীর বুকের দুধ খাবে। তারপর বাচ্চারা বুকের দুধ খেতে চাইলেও দেওয়া উচিত নয়।

তার পরিবর্তে সারাদিনে সুষম খাদ্য খাবে। তালিকাতে বলা হয়েছে, বাচ্চারা ১৬দিন থেকে এক মাস বয়স অবধি প্রত্যেকে মোট ২৫০ গ্রাম করে প্রতিদিন সুষম খাদ্য খাবে। তবে বুকের দুধ ছেড়ে দিলে ১৬ দিন থেকেই কোন বাচ্চা শূকর ঐ পরিমাণে সুষম খাদ্য খাবে না এবং খেতেও চাইবে না। এদের কিছুটা জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করতে হবে। যদি এরা প্রত্যেকে সারা দিনে ২০০ গ্রামও সুষম খাদ্য খায় তাতেও শরীরের কোন ক্ষতি হবে না। এব্যাপারে কয়েক দিন অসুবিধে হলেও এক সপ্তাহের মধ্যেই এরা নিজের থেকেই খাবে।

## তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি

সাধারণ নিয়ম অনুসারে শূকরী সারা বছরের মধ্যে মোট দু'বার বাচ্চা প্রসব করে। গর্ভধারণ করবার পর যদি তাড়াতাড়ি বাচ্চা প্রসব করে তা হলে সময় লাগে ১১৫ দিন। আবার বেশি দেরি হলে ১২২ দিন থেকে ১২৫ দিন অবধি সময় লাগতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শূকরীর গর্ভে বাচ্চা থাকছে চারমাস অথবা তার থেকে কয়েক দিন বেশি। এরপর বাকি যে সময়টা থাকছে সেটা যায় বাচ্চাদের বুকের দুধ দিতে। তার জন্য সময় লাগে ১৫ থেকে ১৮ দিন। বহু পালনকারী নিজের স্বার্থে ৫ দিনের মাথায় বাচ্চার বুকের দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এটি ঠিক নয়। কারণ তাতে বাচ্চা দুর্বল হয়।

অ্যালুমিনিয়াম পাতের তৈরি পূর্ণ বয়স্ক শূকরের জল পানের পাত্র।

বাচ্চাদের শূকরী বুকের দুধ দেওয়া বন্ধ করলে গর্ভধারণ করবার জন্য উত্তেজিত হয় ২১ দিন বাদে। উত্তেজনা বজায় থাকে তিন দিন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শূকরী বছরে দু'বার বাচ্চা প্রসব করে আরও চার মাস সময় নিচ্ছে অন্যান্য কাজের জন্য। ঐসব কাজগুলোর সময় যদি কমিয়ে আনতে পারা যায় তাহলে শূকরী ১৩ থেকে ১৪ মাসের শুরুতেই তিন বার বাচ্চা প্রসব করতে পারে। সুতরাং সময়টা বাঁচাতে পারলে পালনকারীর লাভ দু'ভাবে হবে— (১) বংশ বাড়বে তাড়াতাড়ি এবং (২) যে চারমাস নানা কাজের জন্য গর্ভধারণ করবার সুযোগ পেত না, ফলে খাওয়াতে যে অর্থ খরচ হতো সেটা বেঁচে যায়।

এই কাজে সাফল্য লাভ করতে হলে বাচ্চাদের শূকরীর বুকের দুধ খেতে দিতে হবে দশ দিন। এই কাজটি করতে পারলে বাচ্চারা দুধ পান করা ছাড়বার পর ২১ দিনের মাথায় শূকরী গর্ভধারণ করবার জন্য উত্তেজিত হবে। অথচ বাচ্চারা নিয়ম মতো শূকরীর বুকের দুধ পান করলে প্রায় দেড় মাস সময় লাগতো উত্তেজিত হতে। এভাবে স্বাভাবিক নিয়মে প্রসব করবার পর যদি দু'বারে প্রায় আড়াই মাস সময়টা বাঁচানো যায় তাহলে হিসেব মতো শূকরী ১৪ মাসের মধ্যে তিন বার বংশ বাড়াতে পারবে।
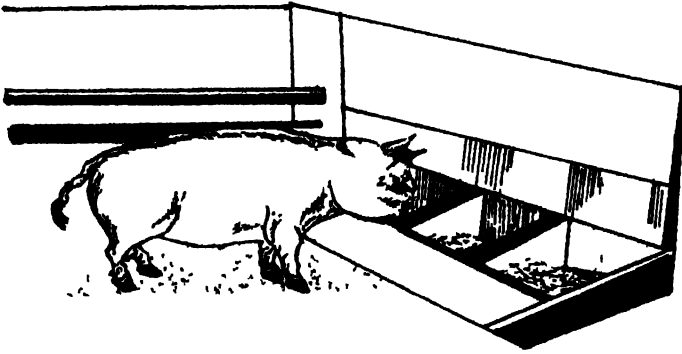
বাচ্চা থেকে শুরু করে সব বয়সের শূকরদেব খামাবে পাকা চৌবাচ্চার মধ্যে খাদ্য দেওযা হলে কোন বকম অপচয় হয না।

আগে বাচ্চাদের একটা খাদ্য তালিকা দেওয়া হয়েছিল। সেই হিসেবটা ছিল ওরা ১৫ দিন থেকে ১৮ দিন শূকরীর বুকের দুধ পান করবে। অথচ বংশ বাড়াবার তাগিদে শূকরীকে গর্ভধারণ করানো হচ্ছে অনেক আগেই। আর সেটা করা হচ্ছে বাচ্চাকে ১০ থেকে ১২ দিন শূকরীর বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করে। সুতরাং বাচ্চাদের বাঁচাতে এবং যাতে এদের শরীরের কোন ক্ষতি না হয়, তার জন্য আরও পুষ্টিকর খাদ্য (অবশ্যই উন্নত মানের সুষম খাদ্য) এবং শূকরীর বুকের দুধের মতো খাদ্য দিতে হবে। সেই কারণে বিশেষ ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য শূকরের বাচ্চাদের দিতে হবে। অর্থাৎ সেই খাদ্য হবে শূকরীর বুকের দুধের সমতুল্য।

বাচ্চাদের জোর করে বুকের দুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলে উচ্চ মানের পুষ্টিকর খাদ্য দিলেও এরা সেই খাদ্য মোটেই খেতে চাইবে না। সুতরাং ঐ খাদ্য অভ্যাস করার জন্য দুই থেকে তিন ঘণ্টা অন্তর খাবার পাত্রে খাদ্য রেখে জোর করেই মুখটা খাদ্যের ওপর রাখলেই এরা খুবই কম পরিমাণে খেতে শুরু করবে। এভাবে জোর করে খাদ্যের ওপর মুখটা ধরলেও যদি বাচ্চারা খেতে না চায় তখন চামচের সাহায্যে মুখটা সামান্য ফাঁক করে অল্প পরিমাণে খাদ্য জোর করে খাইয়ে দিতে হবে। এভাবে সারাদিনে পাঁচ থেকে ছ'বার বাচ্চাদের খাওয়াতে হবে। তবে রাত দশটায় শেষ বার খাদ্য খাইয়ে দেবার পর আবার শুরু করতে হবে পরের দিন ভোর

চারটে অথবা পাঁচটায়। কয়েক দিন এভাবে জোর করে খাইয়ে দিলে বাচ্চারা নিজের থেকেই খাদ্য খেয়ে নেবে। শূকরী প্রসব করবার পর প্রতিবারেই এটা করতে হবে।

বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্যটি কিভাবে তৈরি করতে হবে এবং যেসব উপাদানের প্রয়োজন হবে তাদের নাম ও পরিমাণ তালিকাতে উল্লেখ করা হচ্ছে। আগের মত বাজার থেকে কিনে এনে সবগুলো মিশিয়ে দিলেই খাদ্যটি তৈরি হয়ে যাবে।

## বাচ্চাদের বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য

| উপাদান | পরিমাণ কেজি হিসাবে |
|---|---|
| মাখন তোলা (পাউডার) দুধ | ১০ লিটার |
| গুড় | ১০ কেজি |
| ভুট্টাদানা মিহিভাবে গুঁড়ো | ৪০ কেজি |
| বাদাম খোল মিহিভাবে গুঁড়ো | ১০ কেজি |
| গমের ভুসি | ১০ কেজি |
| তিল খোল মিহিভাবে গুঁড়ো | ১০ কেজি |
| শুকনো মাছের গুঁড়ো | ৮ কেজি |
| খনিজ পদার্থ মিশ্রণ | ২ কেজি |
| | ১০০ কেজি |

সব উপাদানগুলো পরপর মিশিয়ে দিলেই বাচ্চাদের বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্যটি তৈরি হয়ে যাবে। তবে এর সঙ্গে আলাদাভাবে মেশাতে হবে আরও একটি জিনিস। প্রতি ১০০ কেজি সুষম খাদ্যে ১০ গ্রাম ভিটামিন-এ, বি$_{২}$ এবং ডি$_{৩}$। এবার খাদ্য পরিমাণ মতো বাচ্চাদের খাওয়াতে পারা যাবে।

জোর করে দুধ ছাড়িয়ে দেওয়া বাচ্চাদের রোজ কতটা পরিমাণে খাদ্য দেওয়া উচিত সেটা জানা দরকার। অবশ্য সব বাচ্চা যে একই পরিমাণে খাবে সেটাও ঠিক কথা নয়। সামান্য কম বা বেশি হতে পারে। তবে দশ থেকে বারো গ্রাম কম বা বেশি খেলে কোন ক্ষতি হয় না।

## বাচ্চাদের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ

| বাচ্চার বয়স | সারাদিনে খাদ্যের পরিমাণ |
|---|---|
| দুধ খাওয়া ছাড়ার দিন | ৫০ থেকে ৬০ গ্রাম |
| বাচ্চার বয়স ১৫ দিন | ৯০ থেকে ১০০ গ্রাম |
| বাচ্চার বয়স ২৫ দিন | ১৪০ থেকে ১৫০ গ্রাম |
| বাচ্চার বয়স ৩০ দিন | ১৯০ থেকে ২০০ গ্রাম |

সারাদিনের মধ্যে এই খাদ্য পাঁচ বারে খাবে। যে পরিমাণ খাদ্য সারাদিনের জন্য ঠিক করা আছে সেটা প্রতিবার সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রতিবার খাদ্য খাবার পর এরা যাতে পরিষ্কার জল পান করে সেটা দেখতে হবে। যদি কোন বাচ্চা জলপান না করে তবে জোর করে খাইয়ে দিতে হবে। রাতে শেষবার খাবে গরমকালে ১০টায় এবং শীতকালে ৯টার মধ্যে।

## বিশেষ খাদ্যের বিষয়ে সতর্কতা

তালিকাতে বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে যে বিশেষ খাদ্য তৈরি করা হবে তার ওজন ১০০ কেজি হচ্ছে। ঐ পরিমাণ খাদ্য শেষ হতে দু' থেকে আড়াই মাস সময় লাগবে। কারণ জোর করে দুধ খাওয়া বন্ধ করা বাচ্চার সংখ্যা বড় খামার হলেও ২০ থেকে ৩০টির বেশি হবে না। কাজেই খুব বেশি প্রয়োজন হলে সারাদিনে (বিশেষ করে দশ দিন বয়সের বাচ্চা হলে) দেড় থেকে পৌনে দু' কেজি সুষম খাদ্যের প্রয়োজন হবে। অথচ মাঠা তোলা গুঁড়ো দুধ, ভিটামিন এবং শুকনো মাছের গুঁড়ো বেশি দিন খোলা অবস্থায় রাখলে ছত্রাক বা ছাতা পড়ে খাবার পচে যায়। এই রকম খাবার বাচ্চাদের শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এমনকি মারাও যেতে পারে। সুতরাং দু' দিনের প্রয়োজন যাতে মেটে সেই মতো পবিমাণে বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে খাদ্য তৈরি করে নিতে হবে। দু' দিনের খাদ্যও রাখতে হবে মুখ বন্ধ করা পাত্রে।

তালিকাতে উপাদানের ভাগ দেওয়া আছে কেজি হিসাবে। সেটা প্রতিটি গ্রাম হিসাবে নিলে পরিমাণ অবশ্যই কমে যাবে। যেমন গমের ভুসি দশ কেজি নিতে বলা হয়েছে সেটা ১০ গ্রাম নিতে হবে। অথবা সব দ্বিগুণ করে নিলেও তালিকা থেকে কোন রকম পার্থক্য হবে না। তবে প্রত্যেকটি উপাদান কমাতে হবে সমানভাবে। গমের ভুসি ৬০ গ্রাম নেওয়া হলো আর তিল খোল যদি নেওয়া হয় ৪০ গ্রাম সেটা ঠিক হবে না। অর্থাৎ প্রত্যেকটি উপাদান থেকে একই পরিমাণে কমাতে বা বাড়াতে হবে।

### খনিজ পদার্থ মিশ্রণ

শূকরদের শরীর রক্ষা এবং কয়েকটি রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অভাব পূরণ করা দরকাব। এই অভাব দু'ভাবে মেটানো যায়। বিশেষ কয়েক শ্রেণীর শাক ও সবজি খাইয়ে অথবা খনিজ পদার্থের মিশ্রণ সরাসরি খাদ্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণে রোজ মিশিয়ে দিয়ে। বাজারে খনিজ পদার্থ মেশানো অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়। সেটা অনেক সময় খুব একটা ভাল হয় না। আবার দামটাও বেশি পড়ে। কাজেই এটা বাড়িতে তৈরি করে নেওয়া সব থেকে ভালো। জিনিসটাও ভালো হয় এবং দামে কম পড়ে। খনিজ পদার্থের বিভিন্ন উপাদানের নাম এবং তাদের পরিমাণ উল্লেখ করে একটা তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

## খনিজ পদার্থের তালিকা

| উপাদানের নাম | পরিমাণ |
|---|---|
| জীবজন্তুর হাড়গুঁড়ো | ৫০ ভাগ |
| চুনা পাথর | ২৫ ভাগ |
| কাঠকয়লা গুঁড়ো | ১০ ভাগ |
| কাঠের পোড়া ছাই | ১০ ভাগ |
| খাবার লবণ | ৫ ভাগ |
| | ১০০ ভাগ |

তালিকায় পরিমাণের ক্ষেত্রে ভাগের কথা বলা হয়েছে। এটা কেজি হিসাবে অথবা গ্রাম হিসাবেও নেওয়া যেতে পারে। খনিজ পদার্থের মিশ্রণে আরও একটা জিনিস মেশানো দরকার। সেটা হচ্ছে পটাসিয়াম আইওডাইড। পরিমাণটা হবে প্রতি ১০০ কেজি খনিজ মিশ্রণে ১৬ গ্রাম হিসাবে। এটা মেশালে শূকর গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত হয় না।

খনিজ পদার্থ বিশেষ করে বাচ্চা শূকররা খেতে চায় না। অবশ্য বাচ্চা বয়স থেকেই অভ্যাস করানো দরকার। তারজন্য খাবারে কাঠের বাক্সে খনিজ পদার্থের মিশ্রণ রেখে দেওয়া হয়। বাচ্চারা যখন শূকরীর বুকের দুধ পান করা বন্ধ করে তখন এদের বেশি খাদ্য গ্রহণ করবার ঝোঁক থাকে। সেই সময় খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে খনিজ পদার্থের মিশ্রণ মিশিয়ে দিলে এদের অভ্যাস হয়ে যায়। এভাবে মাসখানেক দিলে এদের অভ্যাস হয়ে যাবে। এভাবে মাসখানেক খাওয়ালেই এরা নিজের থেকে যেটুকু প্রয়োজন সেটা খাবে।

## শূকরের খাবার সময়

বিভিন্ন বয়সের শূকরকে কতটা পরিমাণে খাদ্য দিতে হবে সেটা আগেই বলা হয়েছে। কাজেই সে বিষয়ে আবার আলোচনা করবার আর প্রয়োজন নেই। তবে সারাদিনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এদের জন্য নিত্য বরাদ্দ খাদ্য সমানভাবে ভাগ করে খেতে দিতে হবে। আবার উল্লেখ করা হচ্ছে, যেন বরাদ্দের বেশি খাদ্য যেন না দেওয়া হয়।

বিদেশের উন্নত জাতের এবং দেশী শূকর সহ সংকরজাতের শূকরকে পর্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য দিলেও এদের খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছে পূরণ করা যায় না। সুতরাং খামারে পালিত শূকরদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য সময় মতো দিলে খামার লাভজনক হবেই। অপরদিকে অতিরিক্ত খাবার দেওয়া হলেও শূকরের দেহের বৃদ্ধি নিয়মানুসারে ঘটবে। সুতরাং অতিরিক্ত খাদ্যের জন্য যে অর্থ খরচ হবে সেটা খামারের লাভের অংশ থেকেই কমে যাবে। কাজেই নিয়ম অনুসারে খাদ্য দেওয়া দরকার।

দুধ ছাড়ার পর দু' মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চা শূকর সারা দিনে পাঁচ বার তার বরাদ্দ খাদ্য গ্রহণ করবে। এর পর থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তিন বার খাদ্য দেওয়া দরকার। সকালে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে শুকনো সুষম খাদ্য। দুপুরে কচি দূর্বা

কলাগাছ ও কচি ভুট্টা গাছ শূকবেব খাদ্য।

ঘাস, কন্দ জাতীয় গাছের শেকড়, ভুট্টা ঘাস, জোয়ার ঘাস, গাছের মূল অথবা বাতিল করা ফল। শেষ বার অর্থাৎ সন্ধ্যের সময় ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে শাক-

কন্দজাতীয় গাছের শেকড় শূকবেব খাদ্য।
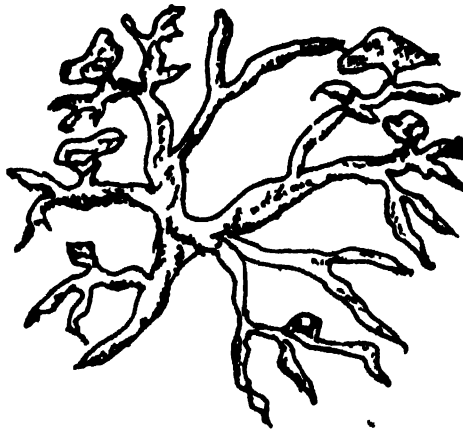
পালা সহ খুদ সিদ্ধ। এভাবে দশমাস বয়স পর্যন্ত খাদ্য দেওয়া দরকার। এরপর শূকর মাংসের জন্য বিক্রি করা হবে। যদি বিক্রি না হয় তবে খাদ্য ৫০০ গ্রাম কমানো দরকার।

# শূকরের রোগ ও প্রতিকার

অন্যান্য গৃহপালিত পশুরা যেমন বেশ কয়েক শ্রেণীর রোগে আক্রান্ত হয় তেমনি বাচ্চা সহ পূর্ণবয়স্ক শূকরও কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এদের প্রয়োজন মতো খাদ্য, ভালোভাবে পরিচর্যা এবং পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখলেই তবে রোগ-ব্যাধির আক্রমণ কম হয়।

খামারের কোন শূকর যদি রোগে আক্রান্ত হয় তবে পালনকারীকে সে বিষয়ে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। এমনকি কোন শূকরের দেহে যদি কোন রকম উপসর্গ ধরা পড়ে তবে সেই শূকরকে দল থেকে আলাদা করে তার উপযুক্ত চিকিৎসা এবং পরিচর্যা করা উচিত। কোন শূকর যদি তার স্বাভাবিক খাদ্য খেতে না চায়, দল থেকে সরে গিয়ে আলাদাভাবে ঝিম মেরে শুয়ে অথবা বসে থাকে, পাতলা মল ত্যাগ করে তবে সেই শূকরকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

কোন সংক্রামক রোগের আক্রমণে খামারের শূকর যদি মারা যায় তবে তাকে পুড়িয়ে অথবা মাটির নিচে গভীর গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিতে হবে। খামার ঘরের মেঝে ফিনাইল জল দিয়ে পরিষ্কার এবং খাবার ও জলের পাত্র ঐ জল দিয়ে ধুতে হবে। সংক্রামক রোগ যাতে না ছড়ায় তার জন্য শূকর বাইরেও চরতে যাবে না। বাইরের লোকের খামার ঘরে প্রবেশ বন্ধ থাকবে। পালনকারী খামার ঘরে ঢুকলে পা ডেটল জল দিয়ে ধুয়ে তবেই ঢুকতে পারবে। এসব সতর্কতা প্রয়োজন শূকরদের রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। অবশ্য রোগের বিস্তার যাতে না ঘটে সেটাও একটা কারণ বলা যেতে পারে। সতর্কতাই রোগ-ব্যাধির আক্রমণকে দূরে রাখে।

এবার রোগ-ব্যাধির আক্রমণ এবং প্রতিকারের জন্য যেসব ওষুধ প্রয়োগ করা সহ অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে বাচ্চা শূকরদের রোগ, পরে বড় শূকরদের রোগের বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

## বাচ্চাদের দুধের মতো মল ত্যাগ

শূকরীর স্বাস্থ্য ভালো এবং বুকেতে দুধের পরিমাণ বেশি। ফলে বাচ্চারা এই রকম ক্ষেত্রে বুকের দুধ বেশি খেয়ে ফেলে। এই দুধ খুবই পুষ্টিকর। শরীরের প্রয়োজনের থেকে বেশি পরিমাণে বাচ্চারা দুধ পান করলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় সাদা রঙের মল ত্যাগ করতে থাকে। অনেক সময় মলের রঙ হলুদও হতে পারে। বারবার এই ভাবে মল ত্যাগ করলে বাচ্চার শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে যায়। প্রতিকারের দেরি হলে বাচ্চা শূকরদের মারা যাবার আশঙ্কা থাকে।

**প্রতিকার ঃ** দুই থেকে তিন বার ঐ ধরনের মল ত্যাগ করলেই প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে ছোট চায়ের চামচের **এক চামচ চুনের জল** সকালে একবার এবং বিকেলে একবার খাওয়াতে হবে। এতে উপকার না হলে **সালফাথিয়াজল** ও **অ্যানটিবায়োটিক** বা **নেফাটিন জাতীয় ওষুধ** খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। ওষুধের পরিমাণ ঠিক করতে হয় বাচ্চার বয়স অনুপাতে। অথবা পশু চিকিৎসকের

মতামত নিতে হবে। অবশ্য ওষুধের লেবেলে বয়স অনুপাতে খাওয়ার নিয়ম লেখা থাকে। সেই মতো ব্যবস্থা নিতে হবে।

**প্রতিরোধ ঃ** বাচ্চারা যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দুধ খায় সেটা প্রথম থেকেই পালনকারীকে সেই মতো ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও শূকরীর খাদ্যে নাইট্রোফুরাজোন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে এই রোগে বাচ্চারা আক্রান্ত হয় না। ওষুধের পরিমাণ এবং কতটা খাদ্যে কিভাবে খাওয়াতে হবে সেটা পশু চিকিৎসকের সঙ্গে আগাম পরামর্শ করে সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

## শিশুশাবক রোগ

এটাও রোগের মধ্যে পড়ে। এদের জন্মের পর থেকে ১৫ দিন অবধি এই রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা বেশি থাকে। এর প্রধান কারণ হলো, বাচ্চাদের শরীরে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজের অভাব।

রোগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, হঠাৎ বাচ্চারা কাঁপতে শুরু করে। অথচ এদের শরীর বেশ সুস্থ এবং দেহ সবল থাকে। কাঁপুনি সব সময় থাকে না। শীতের সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কনকনে হাওয়া বইলে মানুষ যেমন কাঁপতে থাকে অনেকটা সেভাবে বাচ্চারা কাঁপতে থাকে। এভাবে কয়েক দিন যাবার পর বাচ্চাটি মারা যায়।

**প্রতিকার ঃ** বাচ্চারা জন্মের পর থেকেই প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ পায় শূকরীর বুকের দুধ থেকে। সুতরাং এদের আলাদাভাবে গ্লুকোজ খাওয়ালে এবং পরিমাণ মতো দুধ খাওয়ালে রোগ সেরে যায়। বাচ্চার জন্মের পর প্রত্যেককে পরিষ্কার এক কাপ জলে ছোট চায়ের চামচের দেড় চামচ গ্লুকোজ মিশিয়ে সেটা দিনে একবার করে খাওয়ালে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যাবে। দিন এবং রাত্রি সব সময়েই কাঁপুনি থাকে।

তাড়াতাড়ি রোগ সারাতে হলে বাচ্চাকে শিরায় গ্লুকোজ স্যালাইন ইনজেকশান দিতে হবে। কাজটি নিজে না করে চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত।

**প্রতিরোধ ঃ** শূকরীর বুকের দুধ প্রত্যেকটি বাচ্চা ঠিকমতো পাচ্ছে কিনা সেটা পালনকারীকে ভালোভাবে দেখতে হবে। যদি মনে হয় শূকরীর বুকের দুধ কম, তাহলে এদের জল খাবার পাত্রে বাচ্চা শূকরের সংখ্যা অনুসারে দেড় চামচ হিসাবে গ্লুকোজ মিশিয়ে দিতে হবে। যদি বাচ্চারা জলপান না করে তবে আগের মতো কাপে জলের সঙ্গে গ্লুকোজ গুলে সেটা প্রত্যেক বাচ্চাকে খাইয়ে দিতে হয়।

## বাচ্চার রক্তশূন্যতা

রোগটি তিন থেকে পাঁচ মাস বয়স অবধি বাচ্চার হয়ে থাকে। যেসব বাচ্চা জন্মের পর থেকেই খামারের মধ্যেই প্রতিপালিত হয় অর্থাৎ বাইরে ঘুরতে বা চরতে পারে না এদের মধ্যে রক্তশূন্যতা রোগ বেশি দেখা দেয়। বাইরে চরতে না পারলে লোহা এবং তামাঘটিত লবণের অভাব দেখা দেয়। ফলে শরীরে রক্ত তৈরির কাজে বাধার সৃষ্টি হয়। আবার শূকরীর বুকের দুধেও ঐ দু'টি উপাদান কম

পরিমাণে থাকে। আর মাঠে-ঘাটে চরে সবুজ ঘাস সহ লতা-পাতা খেতে না পারার ফলেও লবণ দুটোর অভাব থেকে যায়।

**রোগের লক্ষণ ঃ** বাচ্চারা ঠিক মতো বাড়ে না। গায়ের চামড়া সহ মুখের রঙ ফ্যাকাসে দেখায়। এমনকি উভয় চোখ ঘোলাটে হয়ে যায়। বাচ্চার চঞ্চলতা থাকে না। সামান্য ঘোরা-ফেরা করলেই হাঁপাতে থাকে। শেষ অবধি মারা যায়।

এসব লক্ষণ ছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে বাচ্চারা এই রোগে হজমের গোলমালেও ভুগতে পারে। মল ত্যাগ করে পাতলা। শূকর কোন রোগে আক্রান্ত না হলে পাতলা মল ত্যাগ করে না। যদি সু-চিকিৎসা না হয় তবে দশ থেকে পনের দিন যাবার পর মরে যায়। রোগ ধরতে না পারলে রক্ত পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া যাবে।

**প্রতিকার ঃ** খাবারে প্রয়োজন অনুপাতে নির্দিষ্ট মাত্রায় লোহা ও ধাতব তাম্র লবণ মিশিয়ে দেওয়া এবং বাচ্চা সহ শূকরীকে পরিষ্কার মাঠে কয়েক ঘণ্টা চরতে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি ফল পাবার জন্য একটা কাপে সামান্য জলে ৫ গ্রাম করে **কপার সালফেট ও ফেরাস সালফেট** গুলে শূকরীর স্তনের সব বাঁটে লাগিয়ে দিতে হবে। বাচ্চারা দুধ পান করবার সময় ওষুধ পেটে চলে যাবে। এতেও একই উপকার পাওয়া যাবে। সারা দিনে বাঁটে তিন বার ওষুধ লাগালেই কাজ মিটে যাবে।

**প্রতিরোধ ঃ** আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে বাচ্চার বয়স তিন দিন হলে প্রথম বার, ১০ দিনে দ্বিতীয় বার এবং ২১ দিনে শেষ দফায় ওষুধ খাওয়াতে হবে। ওষুধ কেনা যায় আবার কম খরচে বাড়িতেও তৈরি করে নিতে পারা যায়।

| | |
|---|---|
| ফেরাস সালফেট | ৩·৫ গ্রাম |
| কপার সালফেট | ০·৫ গ্রাম |
| এনগ্রাম (স্কুইব) বড়ি | ৫টি |

তিনটি উপাদানই শক্ত। কাজেই ভালোভাবে গুঁড়িয়ে তার সঙ্গে মেশাতে হবে ৫ মিলিলিটার গ্লিসারিন। এটা তিন দিন সকালের দিকে খাওয়াতে হবে। যে পরিমাণে **ওষুধ তৈরি করা হলো সেটা ১০টি বাচ্চাকে খাওয়ানো চলবে।** সুতরাং ওষুধ দশভাগ করে একটি ভাগ একটা বাচ্চা শূকরকে খাওয়াতে হবে। যদি প্রথম বারের ওষুধ কিছুটা বেঁচে যায় তবে সেটা দ্বিতীয় বার খাওয়াতে হবে।

## নিউমোনিয়া

যে কোনো বয়সের শূকর এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে বাচ্চা শূকরের মৃত্যুর হারটা খুব বেশি। বিশেষ করে শীতপ্রধান দেশে পালিত শূকর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় বেশি এবং মারাও যায় সেই হারে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পালিত একমাত্র শীতকাল ছাড়া নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা কম। এই রোগে ঠাণ্ডা লেগে বুকে সর্দি জমে যায়। শীতের রাতে বাচ্চাদের বেশি ঠাণ্ডা লাগলে, বর্ষায় ক্রমাগত জলে ভিজলে এবং ভিজে ও স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে থাকলে শূকরের

নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা বেশি। এছাড়াও শীতের রাতে খামার ঘরে বেশি ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করলে এই রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রবল জ্বর, নাক দিয়ে সর্দি গড়িয়ে পড়বে, চোখ লাল এবং ফুলতেও পারে। দু' চোখ দিয়েও অনেক সময় জল গড়ায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ফলে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়। মোটেই খেতে চায় না। চিকিৎসা না করালে শূকর মারা যায়।

**প্রতিকার ঃ** যে ঘরে নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত শূকর থাকবে সেই ঘরের দরজার পাল্লা বন্ধ থাকবে। দিনের বেলা জানলার পাল্লা খোলা থাকলেও শীতকাল হলে জানলা বন্ধ থাকবে। মেঝেতে পুরু করে খড় ছড়ানো থাকবে যাতে শূকর আরামে শুয়ে থাকতে পারে।

এই রোগের একমাত্র ওষুধ হচ্ছে **টেরামাইসিন ক্যাপসুল**। একটি করে দিনে তিন বারে মোট তিনটি ক্যাপসুল বাচ্চাদের দিতে হবে। বড় শূকরদের তিন ঘণ্টা অন্তর একই ক্যাপসুল চারবার খাওয়ানো দরকার। রোগ তাড়াতাড়ি সারাতে হলে **স্ট্রেপটোপেনিসিলিন** ইনজেকশন দিতে হবে। তবে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কোন খামারীর শূকরকে ইনজেকশান দেওয়া ঠিক নয়।

**প্রতিরোধ ঃ** ভারতে পালিত শূকরের এই রোগের ভয় একমাত্র শীতকালে। কাবণ শীতের দু' মাস ছাড়া বাকি দশ মাস গরম। কাজেই ঐ সময় যাতে ঠাণ্ডা না লাগে এবং রাতে মেঝেতে পুরু করে খড় ছড়িয়ে দিলে নিউমোনিয়া রোগ খামাব থেকে দূরে থাকে। তবে বেশি জলে যাতে শূকরা না ভেজে সেটাও পালনকারীকে দেখতে হবে।

## বাচ্চা শূকরের কলেরা

যদিও সব বযসের শূকর এই রোগে আক্রান্ত হয় তবে বাচ্চাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। শূকর বাচ্চার এই রোগের দ্বারা মৃত্যুর হার সব থেকে বেশি। কেবল এশিয়ার দেশগুলোতে নয় ইউবোপের সব দেশেই বাচ্চা শূকর কলেরায় আক্রান্ত হয়। তবে আয়ারল্যান্ডে পালিত শূকরদের মধ্যে কলেরার আক্রমণ প্রায় ঘটে না বললেই চলে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় কলেরাকে সোয়াইন ফিভার বলে।

ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ। খামারের কোন শূকর যদি কলেবায় আক্রান্ত হয় তবে এক দিনের মধ্যে অধিকাংশ শূকরের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কারণ অসুস্থ শূকরের লালা, প্রস্রাব, চোখের জল এবং সর্দিতে কলেরার জীবাণু থাকে। মাছি, কাক, অন্যান্য পাখি, এমনকি মানুষের মাধ্যমে রোগ ছড়িয়ে পড়ে খামারে।

শূকরের খাবার রুচি থাকে না। দেহে প্রবল উত্তাপ থাকে। মাঝে মাঝে কাসি হয়। ঠিকভাবে শ্বাস নিতে পারে না। পাতলা মল ত্যাগ করে। অনেক সময় শূকর বমি করতে থাকে। বাচ্চারা সাতদিন এবং বড় শূকর হলে বারো থেকে পনের দিনের মধ্যে মারা যায়।

**প্রতিকার ঃ** প্রকৃতপক্ষে এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। একমাত্র চিকিৎসা

হচ্ছে সিরাম প্রয়োগ। চিকিৎসায় খরচ বেশি এবং সব পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে না।

**প্রতিরোধ ঃ** বাচ্চা শূকরকে চিকিৎসা না করে মেরে পুড়িয়ে অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। নিয়মিত টিকা দিলে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। টিকা দিতে হবে বাচ্চা জন্মের সাত দিনের মধ্যে। দ্বিতীয়বার আট সপ্তাহ বাদে। এরপর বছরে একবার করে নিয়মিত টিকা দেওয়া দরকার ।

খামারের মেঝে এবং এদের জল ও খাদ্যের পাত্র ফিনাইল জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া দরকার। খামারের চারপাশে ব্লিচিং পাউডার অথবা গুঁড়ো চুন রোজ সকালে ছড়ানো উচিত। সবজি বাজার থেকে সংগ্রহ করা (বিনামূল্যে) সামান্য পচা আনাজ ও শাক-পাতা, হোটেলের ফেলে দেওয়া খাদ্য কোন শূকর কলেরায় আক্রান্ত হলে ঐ সব খাদ্য মোটেই দেওয়া চলবে না। খামার থেকে কিছু দূরের খামারে শূকর কলেরায় আক্রান্ত হলে সে ক্ষেত্রেও রোগ প্রতিরোধের জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

## বাচ্চার নাভি পেকে যাওয়া

বাচ্চা জন্মাবার পর শূকরীর সঙ্গে বাচ্চার নাড়ির যে যোগ থাকে সেটা কেটে উভয়কে আলাদা করতে হয়। নাভি কাটার দোষে অথবা কাটা নাভিতে কোন জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার না করার জন্য সেটা পেকে যায়। নাভির গোড়া ফুলে যায়, লাল হয়ে ওঠে, ভিতরে পুঁজ জমে। এর ফলে বাচ্চার জ্বর হয়। শূকরীর বুকের দুধ খেতে পারে না। শ্বাস নেওয়া দ্রুত হয়। কোন রকম চিকিৎসা না হলে বাচ্চা মারা যায়।

**প্রতিকার ঃ** সহ্য করার মতো গরম জলে বোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে সারা দিনে দশ মিনিট করে তিন বার সেঁক দিলে ভিতরের পুঁজ বেরিয়ে যায়। এরপর পটাশ পারমাঙ্গানেট জল দিয়ে ধুয়ে পেনিসিলিন মলম কয়েক দিন লাগালে ভালো হয়। অবশ্য এর সঙ্গে **টেরামাইসিন ক্যাপসুল** দিনে দুটো করে তিন থেকে চার দিন খাওয়াতে হবে। তবে নাভি ভালোভাবে শুকিয়ে না যাওয়া অবধি পাতলা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়।

**প্রতিরোধ ঃ** নাভি কাটবার সময় সতর্ক হলে নাভি পাকবার কোন রকম আশঙ্কাই থাকে না। সেই কারণে জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হলেও নাভি ভালোভাবে শুকিয়ে না যাওয়া অবধি বেঁধে রাখতে হয়।

## প্রসবের সময় শূকরীর ফুল আটকে যাওয়া

শূকরী প্রসবের সময় ঠিক ভাবে যাতে বাচ্চা প্রসব করে সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ব্যাপারে কোন জটিলতা দেখা দিলে বাচ্চার মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। কাজেই শিশুশাবক রোগের সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে।

উন্নত জাতের এবং সংকর শ্রেণীর শূকর হলেও এদের বংশ বৃদ্ধির হারটা খুবই বেশি। একটি শূকরী সাত থেকে দশটি পর্যন্ত বাচ্চা পর পর প্রসব করে থাকে। একটি বাচ্চা প্রসব করলে একটি ফুল বা পর্দা স্বাভাবিকভাবে বাইরে বেরিয়ে আসে। কারণ প্রতিটি বাচ্চার জন্য শূকরীর গর্ভে আলাদা ভাবে একটি করে ফুল বা পর্দা থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, ভিতরে কোন জটিলতার জন্য শূকরীর গর্ভকোষে ফুল আংশিক অথবা প্রায় সবটাই আটকে যায়। অথচ শূকরীর গর্ভে যতগুলো বাচ্চা থাকে সবকটি ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ ফুল শূকরীর গর্ভের মধ্যেই পচতে শুরু করে।

শূকরী দু' দিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। একমাত্র সামান্য জল ছাড়া আর কিছু খায় না। তিন-চার দিনের মধ্যে শূকরীর গর্ভে আটকে থাকা ফুল পচতে শুরু করে। কিছু ক্ষেত্রে পুঁজও জমে যায়। খাওয়া বন্ধ, শরীর দুর্বল এবং ফুল পচনের ফলে বাচ্চারা খুবই সামান্য পরিমাণে দুধ পায়। এই রকম অবস্থায় শূকরীর বুকের দুধও বাচ্চাদের পক্ষে বিষের সমতুল্য। ফলে বিষাক্ত দুধ পান করে বাচ্চারা মরে যায়।

**প্রতিকার ঃ** প্রসবের দ্বারে যদি ফুলের সামান্য অংশ আটকে থাকে তবে খামারী ধীরে ধীরে টেনে ফুল বের করতে পারে। তবে দেখা দবকার যাতে টানতে গিয়ে ফুলের কিছু অংশ থেকে না যায়। এতে কাজ না হলে পশু চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।

## বড় শূকরদের রোগ

খামারে যে গুলো বড শূকর অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক শূকর সেগুলো যেসব রোগে আক্রান্ত হয় সেই রোগগুলোর বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। তবে ঐসব রোগে যে কম বয়সের শূকর আক্রান্ত হবে না সেটা ঠিক নয়। যদি আক্রান্ত হয়, রোগটি খুবই ছোঁয়াচে। বাচ্চাদের একটু সাবধানে রাখলে রোগের আক্রমণ ঘটে না। সব থেকে নিরাপদ ব্যবস্থা এদের অন্য ঘরে সরিয়ে রাখা।

## এঁষো রোগ

গৃহপালিত অন্যান্য পশু সহ রোগটি শূকরের দেখা দিতে পারে। শূকরের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। পায়ের খুরে, জিভের আশেপাশে, দাঁতের মাড়িতে, নাকের গর্তে ফোস্কা দেখা দেয়। প্রথমে ফোস্কার আকার খুব ছোট থাকে। কয়েকদিন বাদে বড় হয়ে শেষে ফেটে যায় এবং ঘায়ে পরিণত হয়। বাচ্চারা এই রোগে আক্রান্ত শূকরের সঙ্গে থাকলে এরাও আক্রান্ত হয় এবং এদের মৃত্যুর হারটা বেশি হয়। মুখে ও মাড়িতে ঘা থাকায় শূকর কিছুই খেতে পারে না।

**প্রতিকার ঃ** ডেটল অথবা পটাশ পারমাঙ্গানেট সামান্য গরম জলের মিশিয়ে ফোস্কা বা ঘা রোজ ধুইয়ে দিতে হবে। পায়ের খুরের ঘায়ে স্টকহলম টার ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়। নিত্য মুখ ধুইয়ে দিতে হবে এক লিটার জলে ২ গ্রাম ফটকিরি মিশিয়ে। ঘা সারতে পাঁচ থেকে সাত দিন সময় লাগে।

**প্রতিরোধ ঃ** গরু, ছাগল, মোষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশুরা এই রোগে কাছাকাছি কোন এলাকায় আক্রান্ত হলে শূকরদের মাঠে চরতে দেওয়া চলবে না। বাজার থেকে সংগ্রহ করা সবজি খাওয়ানো কয়েকদিন বন্ধ রাখতে হবে। আর খামারের চারপাশে দশ দিন রোজ সকালে গুঁড়ো চুন ছড়ানো উচিত। খামার ঘরের মেঝে রোজ একবার করে ফিনাইল জল দিয়ে ধুলে ভালো হয়। শূকর সুস্থ হয় সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে। তবে রোগ গুরুতর হলে দু' সপ্তাহ লাগে ভালো হতে।

## গুটি বসন্ত

অরণ্যে স্বাধীনভাবে যেসব পশু ঘুরে বেড়ায় সেই সব পশুর গুটি বসন্ত রোগ হয় কিনা সেটা ঠিক জানা নেই। তবে এদের ঘরেতে পালন করা হয় এরা সহ মুরগিও এই রোগে আক্রান্ত হয়। এটা জীবাণুঘটিত রোগ এবং ছোঁয়াচে। বয়স্ক শূকর বসন্ত রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। বাচ্চারা একসঙ্গে থাকলে এরাও আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে খুব ক্ষতিকারক রোগ নয়। শূকরের সুস্থ হতে সময় লাগে ১৮ থেকে ২০ দিন। আক্রান্ত শূকরের মাধ্যমে রোগ তাড়াতাড়ি ছড়ায়। তবে মাছি এবং মানুষের মাধ্যমেও রোগের জীবাণু খামারে আসে। কাজেই এব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়।

**লক্ষণ ঃ** রোগের প্রথমে শূকরের দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এর দু' দিন পরে কানের লতি, পাছা, তলপেট এবং গলায় ছোট আকারের গুটি বের হয়। শূকরের খাওয়া কমে যায়। চলাফেরা খুব একটা করে না। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। সামান্য শ্বাস কষ্ট হয়। শেষের দিকে দুর্বলতার জন্য দিনরাত শুয়ে থাকে।

**প্রতিকার ঃ** চিকিৎসা বলতে কিছুই নেই। তবে সামান্য গরম জল করে তার মধ্যে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে সকালে একবার করে গুটি ধুইয়ে দিতে হবে। জল লাগবে এক লিটার এবং পটাশ ৫০০ মিলিগ্রাম দিয়ে ভালোভাবে গুলে নিতে হবে। এইভাবে ঘা শুকিয়ে না যাওয়া অবধি রোজ ধুইয়ে দেওয়া দরকার। পটাশ জল শুকিয়ে যাবার পর গুটিতে গায়ে মাখা পাউডারের সঙ্গে বোরিক পাউডার মিশিয়ে ভালোভাবে মাখাতে হবে। পাউডার তিন গ্রাম এবং বোরিক পাউডার মেশানো হবে এক গ্রাম। গুটি ভালোভাবে শুকিয়ে না যাওয়া অবধি এভাবে পরিচর্যা করতে হবে।

এছাড়াও দ্বিতীয় ওষুধ হিসাবে টিংচার আয়োডিন ৫ মিলিলিটার এবং সমপরিমাণ গ্লিসারিন মিশিয়ে গুটি ধুইয়ে দেবার পর লাগাতে হবে। রোজ একবার করে এবং গুটি শুকিয়ে না যাওয়া অবধি ওষুধ লাগানো দরকার।

**প্রতিরোধ ঃ** আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে কিছুই করবার নেই। তবে কোন শূকর গুটি বসন্তে আক্রান্ত হলে তাকে খামার থেকে সরিয়ে অন্য ঘরে রাখতে হবে। বাইরে বেশ কিছুদিন শূকরের চরা বন্ধ থাকবে। খামারের মেঝে ফিনাইল জল দিয়ে কয়েক দিন ধুয়ে দিয়ে খামারের চারপাশে গুঁড়ো চুন দিন দশেক ছড়িয়ে

দিলে ভালো হয়। শূকরদের যে পরিচর্যা করবে সে ছাড়া আর কেউ খামারে প্রবেশ করবে না।

## শূকরের এরিসিপেলাস রোগ

খুবই সংক্রামক রোগ। মাঠে চরবার সময় রোগে আক্রান্ত শূকর মল ত্যাগ করলে কয়েক দিন বাদে সুস্থ শূকর সেই জায়গায় ঘাস খেলে এই রোগে আক্রান্ত হয়। আবার শরীরে কোথাও ঘা থাকলে সেখানে মাছির মাধ্যমে জীবাণু প্রবেশ করে।

বড় শূকরদের এরিসিপেলাস রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা খুব বেশি। কারণ তারা মাঠে চরে। তবে বাচ্চারা একসঙ্গে থাকলে তারাও আক্রান্ত হয়। খুবই ক্ষতিকারক রোগ। শূকরের মৃত্যুর হার প্রায় ৯০ ভাগ। প্রথমে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চাকা চাকা দাগ দেখা যায়। কয়েক দিন পরে হীরের টুকরোর মতো দাগগুলো লাল হয়ে ফুলে ওঠে। দেহের তাপমাত্রা বাড়ে। পাতলা মল ত্যাগ করে। বমিও করতে পারে। চোখ দিয়ে জল গড়ায়। শেষে পায়ের গাঁটগুলো ফুলে যায়। তখন শূকর ভালোভাবে চলতে পারে না, কেবল শুয়ে থাকে।

**প্রতিকার ঃ** কোন প্রতিকার নেই। কারণ রোগ ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। রোগের প্রথম দিকে পালনকারী মোটেই বুঝতে পারে না। শেষে রক্ত পরীক্ষা করে তবেই রোগ ধরা পড়ে। এই রকম ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগ করেও কোন ফল পাওয়া যায় না। তবে বোগের শুরুতেই চিকিৎসা কেন্দ্রে শূকরকে নিয়ে এলে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় কোন ওষুধ প্রয়োগ করলে শূকর মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। তবে এই রোগে আক্রান্ত শূকরকে খামারে রেখে কোন লাভ নেই। বিক্রি করে দেওয়াই ভালো।

**প্রতিরোধ ঃ** রোগের যেমন প্রতিকার নেই তেমনি প্রতিরোধ হিসাবে তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। শূকর মাঠে চরতে গিয়ে রোগে আক্রান্ত হয়। তবে যেসব শূকর খামারের সীমানার মধ্যে পালিত হয় এদের রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা কম। যদি খামারের কোন শূকর এই রোগে মারা যায় তবে পুড়িয়ে অথবা মাটির নিচে পুঁতে দিতে হবে। খামারের চার দেওয়ালে জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটানো এবং মেঝে ফিনাইল জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া দরকার। শূকর যদি মাঠে চরে তবে দিন পনের চরা বন্ধ রাখতে হবে। এমনকি আশেপাশের অঞ্চলে কোন খামারে শূকরের এই রোগ দেখা দিলে শূকরদের দিন পনের মাঠে চরা বন্ধ থাকবে।

## কৃমির আক্রমণ

শূকর সহ প্রায় সব গৃহপালিত পশু কৃমিতে আক্রান্ত হতে পারে। কৃমি দু' রকমের হয়। একটি ফিতা এবং অপরটি গোল কৃমি। ফিতা কৃমি ফিতের মতো চ্যাপ্টা এবং লম্বাতে বড় হয়ে থাকে। মাঠে যেসব পশু চরে খায় তাদের পেটে কৃমির আক্রমণ যে কোনো সময়েই হতে পারে।

**প্রতিকার ঃ** কৃমিতে আক্রান্ত কোন পশু মাঠে মলত্যাগ করলে তার সঙ্গে কৃমির ডিম থাকে। সেখানকার ঘাস কয়েক দিন বাদে যে কোন পশু খেলেই এর পেটে কৃমির ডিম প্রবেশ করে। খামারেও অন্য শূকরের মধ্যে কৃমির ডিম জল অথবা খাদ্যের সঙ্গে পেটে চলে যায়।
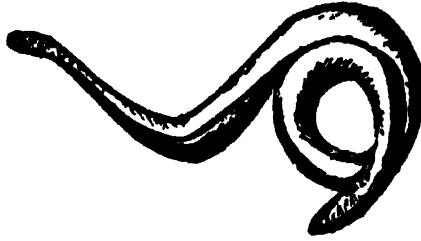
গোলকৃমি।

প্রথমে বোঝা যায় না। এদের কাজ হচ্ছে শরীরের সারাংশ খেয়ে বেঁচে থাকা এবং বংশ বাড়ানো। ফলে শূকর পরিমাণ মতো এবং পুষ্টিকর খাদ্য খেলেও শরীরে
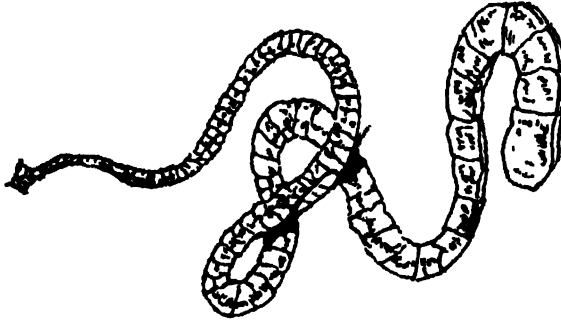
সব জাতের শূকরের ফিতা কৃমিতে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে।

মাংস বাড়ে না। কেবল পেটটা ঝুড়ির মতো বড় হতে থাকে। কৃমি সংখ্যায় খুব বেশি হলে তখন শূকর পাতলা মল ত্যাগ করে।

গোলাকার কৃমি কিছু ক্ষেত্রে এই রকম হয়ে থাকে।

ওষুধ হিসাবে ছোট গোল কৃমির জন্য পাইপারজিন। শূকরের দেহের ওজন ২ কেজি হলে ওষুধের মাত্রা ০·২ গ্রাম। ওষুধ খাওয়াবার আগের দিন শূকর কিছু খাবে না। কেবল জল পান করবে। ওষুধ খাবার নিয়ম দোকানদার বলে দেবে।

ফিতা কৃমি থাকলে ডাইসেস্টল জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। ওষুধের মাত্রা সহ খাওয়াবার নিয়ম ওষুধ বিক্রেতা বলে দেবে। এছাড়াও হেলমাসিড (তরল) কৃমির উত্তম ওষুধ। এটাও খাওয়ানো যেতে পারে।

**প্রতিরোধ ঃ** কৃমির ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সব থেকে ভালো ব্যবস্থা। বাচ্চার বয়স তিন মাস হলেই অর্থাৎ মাঠে চরবার সময় থেকে কাজটি করতে হবে। যে ওষুধে কৃমি নষ্ট হয় সেই ওষুধেই ওদের শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। খাওয়াবার নিয়ম এক।

## উকুনের আক্রমণ

এরা পরজীবী পোকা। কৃমি দেহের ভিতরে আশ্রয় নেয় আর উকুন চামড়ার ওপর বসবাস করে। মাঝে মাঝে কামড়ায় এবং রক্ত চুষে খায়। এছাড়াও দ্রুত গতিতে বংশ বাড়াতে থাকে। কেবল শূকর নয়, সব গৃহপালিত পশুর শরীরে চামড়ার ওপর উকুন আশ্রয় নিতে পারে।

উকুনে যখন কামড়ায় তখন শূকর অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ সেই জায়গাটা ভীষণ চুলকায়। শূকর তখন দেওয়ালে অথবা কোন খুঁটিতে গা ঘসতে থাকে। ঘসবার সময় চামড়া উঠে যায়। লোম খসে পড়ে। ধুলো-বালি এবং ময়লা লেগে

শূকরের গায়ে উকুনের আক্রমণ।

ঘা হয়। এরপর ঐ ঘায়ে শরীরের অন্য জায়গায় আশ্রয় নেওয়া উকুন খাদ্যের লোভে জড় হয়। শূকরের অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়। ঠিক মতো খাদ্য খেতে পারে না। দেহের ওজনও কমতে থাকে। ব্যবস্থা না নিলে শূকর শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

**প্রতিকার ঃ** ঘা হলে সেই জায়গাটা পটাশ পারমাঙ্গানেট মেশানো জল দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এরপর জল শুকিয়ে গেলে ওষুধ হিসাবে ক্লোরডেন ভালোভাবে ছিটানো দরকার। যদি পিঠে, কাঁধে অথবা মাথায়, কানের ওপরে হয়

তবে শূকরে ওষুধ চাটতে পারে না। শরীরের অন্য জায়গায় হলে টুকরো কাপড় পুরু করে ভাঁজ করে তার ওপর লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে চাপা দেওয়া উচিত। কারণ ওষুধটা মানুষ সহ পশুদের পক্ষেও ক্ষতিকর। কাজেই শূকর ওষুধ চাটলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

**প্রতিরোধ ঃ** একই মাঠে শূকরদের দীর্ঘদিন চরাতে নেই। অন্য পশুরা যাতে খামারে পালিত শূকরের সঙ্গে একই মাঠে না চরে সেটাও দেখা দরকার। খামার পরিষ্কার রাখতে হবে। শূকরদের মাঝে মাঝে লাইফবয় সাবান মাখিয়ে স্নান করানো দরকার।

## ক্ষয়রোগ অথবা টি. বি.

মানুষ সহ যে কোন জীবজন্তু টি. বি. অথবা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এক ধরনের জীবাণু এই রোগের মূল কারণ। খুবই ছোঁয়াচে অর্থাৎ সংক্রামক রোগ। সাধারণ ক্ষেত্রে এই রোগের জীবাণু ফুসফুসে আক্রমণ চালায়। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে শূকরের ক্ষেত্রে এরা গলায় আক্রমণ শুরু করে। কিছু ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, জীবাণু গলার পরিবর্তে শরীরের অন্যান্য গ্রন্থিতেও আক্রমণ করে।

**রোগের লক্ষণ ঃ** শূকর এই রোগেতে আক্রান্ত হলে প্রথম দিকে রোগের আক্রমণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বুঝতে পারা যায় না। অবশ্য দেহের উত্তাপ প্রথমেই সামান্য বৃদ্ধি পায়। বাকি যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। বেশ কিছুদিন যাবার পর কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পায় অথচ রোগ গুরুতর আকার ধারণ করে না। জ্বরের সঙ্গে সামান্য সর্দি, কাসি, খাদ্য গ্রহণে স্বাভাবিক রুচি থাকে না এবং ধীরে ধীরে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত শূকরের মাংস খাওয়া খুবই ক্ষতিকর। কারণ এর থেকে মানুষেরও ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে।

**প্রতিকার ঃ** শূকর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলে খামারীর কোনরকম ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ রোগের জীবাণু শূকরের গলার গ্রন্থি সহ শরীরের অন্যান্য গ্রন্থিতে আক্রমণ করে। তাছাড়া খামারীর পক্ষে সব ক্ষেত্রে রোগ চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। ফলে চিকিৎসা বিভ্রাট হবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং কাছাকাছি কোন পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া দরকার। সেখানে পশু চিকিৎসক শূকরের রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসা শুরু করেন।

**প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঃ** রোগের তীব্রতা যদি বেশি না হয় এবং শূকর তাড়াতাড়ি সুস্থ হলে তাকে খামারে রেখে প্রতিপালন করা যাবে। কিন্তু রোগের তীব্রতা বেশি হলে সুস্থ হতে দেরি হবে। রোগমুক্ত শূকরকে খামারে এনে তাকে পালন করা উচিত নয়। কারণ পুষ্টিকর এবং পরিমাণ মতো খাদ্য শূকরকে দিলেও তার শরীরের বৃদ্ধি ঠিক মতো হবে না। সেক্ষেত্রে খামারীর লোকসান অনিবার্য। সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে, রোগমুক্ত দুর্বল শূকরকে বিক্রি করে দেওয়া।

**প্রতিরোধ ঃ** আগেই বলা হয়েছে শূকরের ক্ষেত্রে ক্ষয়রোগের আক্রমণের স্থান

হচ্ছে গলার গ্রন্থি সহ দেহের অভ্যন্তরের অন্যান্য গ্রন্থি। সব থেকে অসুবিধার ব্যাপার হচ্ছে, রোগের কারণ আজও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। সাধারণভাবে দেখা গেছে শূকরের শরীর যদি বেশি দুর্বল হয় তবেই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। ক্ষয়রোগে শূকরের আক্রান্ত হবার আরও একটি কারণ হচ্ছে, পালে বেশি সংখ্যাতে একটি ঘরের মধ্যে শূকরদের যদি রাখা হয়। পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে শূকরদের ক্ষয়রোগের টিকা দিলে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

## শূকরের প্লেগ

সাধারণভাবে দেখা যায় গরু, মোষ এবং ভেড়া এই তিন শ্রেণীর পশুদের মধ্যে প্লেগ রোগটির আক্রমণ বেশি হয়। শূকররা প্লেগে আক্রান্ত হয় খুবই কম। এক ধরনের জীবাণু এই রোগটির প্রধান কারণ। রোগে আক্রান্ত শূকরকে যদি সময় মতো চিকিৎসা করা না হয় ওদের বাঁচানো সম্ভব হয় না। সাধারণভাবে দেখা গেছে, যে কোন রোগে আক্রান্ত হবার পর সুস্থ হলে শরীর যদি দুর্বল হয় তাহলে শূকর প্লেগ রোগেতে আক্রান্ত হয়। এছাড়াও শূকরকে বেশি দূরে নিয়ে যাওয়া হলে এবং পথযাত্রায় যদি এরা বেশি ক্লান্ত হয় সেক্ষেত্রেও প্লেগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া রোগটি খুবই সংক্রামক। খামারে পালিত কোন শূকর যদি প্লেগে আক্রান্ত হয় তাহলে সেই শূকরকে দল থেকে আলাদা অন্য ঘরে রাখতে হবে। কারণ রোগে আক্রান্ত শূকরের মল, মূত্র, পানীয় জল এবং এর পবিত্যক্ত খাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে রোগটি সুস্থ শূকরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

**রোগের লক্ষণ :** প্লেগে আক্রান্ত হলে প্রথমে শূকরের দেহেব তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়। দু' দিনের মধ্যে দেহের তাপমাত্রা আরও বেড়ে যায়। এরপর সারা দেহে ছোট আকারের গুটি বের হয় এবং ফেটে গিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হলে যেভাবে নাক দিয়ে সর্দি গড়িয়ে পড়ে এক্ষেত্রেও নাক থেকে সেরূপ সর্দি বের হয়। শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে যায়। খাদ্য গ্রহণ করে খুবই সামান্য পরিমাণে। রোগের চরম অবস্থায় শূকরের মলমূত্রের সঙ্গে রক্ত বের হয় এবং নাক থেকেও রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যে শূকর মারা যায়। নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত শূকরের যেসব লক্ষণ থাকে প্লেগের ক্ষেত্রেও একই লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাজেই পালনকারী রোগ নির্ণয় করতে পারে না। সুতরাং সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে কোন পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে শূকরকে নিয়ে যাওয়া এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

**প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা :** শূকর রোগে আক্রান্ত হলেই একে খোঁয়াড় থেকে সরিয়ে নিতে হবে এবং অন্য ঘরেতে (খোঁয়াড় থেকে কিছু দূরে) রাখতে হবে। যদি রোগটি ধরা পড়ে তাহলে শূকরকে ওষুধ হিসাবে **টেরামাইসিন, পেনিসিলিন** অথবা **স্ট্রেপটোপেনিসিলিস** এই তিনটি ওষুধের মধ্যে যে কোন একটি প্রয়োগ করা হবে। একটি করে ক্যাপসুল সারাদিনে চারবার খাওয়ানো দরকার। ওষুধ প্রয়োগ করবার

পরেও যদি রোগের উপশম না হয় এবং নাক, মলদ্বার এবং প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বের হয় তাহলে শূকরকে মেরে ফেলে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলা দরকার। যদি শূকর বেঁচে যায় তাহলে পালন না করে একে বিক্রি করে দেওয়া উচিত। কারণ একে উপযুক্ত খাদ্য দিলেও শরীরে প্রয়োজনীয় মেদ বৃদ্ধি ঘটবে না।

**রোগ প্রতিরোধ ঃ** যেসব শূকরকে খামার থেকে দূরে মাঠে চরানো হয় সেক্ষেত্রে প্রতিরোধ ব্যবস্থার কোন উপায় থাকে না। কারণ অন্য খামারের (প্লেগ রোগে আক্রান্ত) শূকর মাঠে চরার পর সেখানে এর মল এবং মূত্রের মাধ্যমে রোগের জীবাণু সুস্থ শূকরের শরীরে প্রবেশ করে। এভাবে সুস্থ শূকর প্লেগে আক্রান্ত হয়। কাজেই এই রকম ক্ষেত্রে প্রতিরোধের কোন উপায় নেই। খামারের সব শূকর বাইরে বের করে ঘর উত্তমরূপে জল দিয়ে ধুতে হবে।

# মেষ
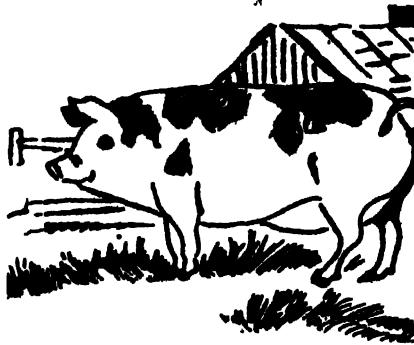
## মেষ পালনে খরচ নেই

ভারতের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য ছাড়া ভারতের প্রায় অধিকাংশ রাজ্যেই মেষ পালন করা হয়ে থাকে। তবে উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে মেষ পালনের সংখ্যা খুব বেশি। এমনকি আমাদের পাশের রাজ্য বিহারেও ভালো সংখ্যক মেষ পালন করা হয়ে থাকে। ওখানকার মেষপালকরা মাঘ মাসের শেষ দিকে যখন পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ মাঠ থেকে ফসল তোলা হয়ে যায় তখন মেষের দল নিয়ে এখানে চলে আসে। চার থেকে পাঁচ মাস বিভিন্ন মাঠে মেষের দল দিনভর চরিয়ে বর্ষার মুখে নিজের রাজ্যে ফিরে যায়। ওরা এভাবে এক জেলা থেকে অপর জেলায় ঘুরে বেড়ায় এবং রাতের বেলা বড় মাঠের গাছতলায় মেষদের নিয়ে আশ্রয় নেয়। একটা দলে ১০০ থেকে ১৫০টি মেষ থাকে। আর থাকে দু' জন পালক। মেষেরা মাঠের ঘাস এবং লতাপাতা খেয়ে পেট ভরায়। ফলে এদের খাওয়াতে একটি পয়সাও খরচ হয় না।

মেষের দল ঐভাবে ঘুরে বেড়ালেও স্ত্রী মেষ বাচ্চা দেয়। এভাবে মেষের পাল বাড়ে। আবার যে চাষীর মাঠে মেষ সারাদিন চরে সেই খেতের মালিক মেষ পালনকারীকে কিছু নগদ অর্থও দেয়। তার কারণ ১৫০টি মেষ জমিতে যে মল ও মূত্র ত্যাগ করে সেটা জমিকে উর্বর করে। এতেই পালনকারীর নিত্য খাবার খরচ মিটে যায়। এছাড়া স্ত্রী মেষের দুধ বিক্রি করেও ভালো টাকা রোজগার হয়।

মেষ পালনে ছাগলের থেকেও লাভ বেশি থাকে। তার কারণ, একটা মেষের কাছ থেকে সারা বছরে ৪০০ গ্রাম থেকে দু' কেজি পর্যন্ত পশম পাওয়া যায়। ভালো জাতের পশমে অমূল্য বিদেশী মুদ্রা ঘরে আসে। আবার চামড়া সহ মেষের লোমও বিদেশে চালান যায়। এর সঙ্গে মাংসের বাজার তো দেশেতে রয়েছেই। তবে আমাদের দেশে কয়েকটা রাজ্য ছাড়া বাকি সব জায়গায় মেষ পালন করা হয় অবহেলায় এবং কোন রকম পরিচর্যা করা হয় না। কাজেই পশম হয় নিকৃষ্ট মানের এবং মাংসের উৎপাদনও যথেষ্ট কম। অপরদিকে সঠিক পদ্ধতিতে প্রজনন এবং প্রয়োজনীয় উন্নতমানের খাদ্যের সঙ্গে ভালো করে পরিচর্যা করলে মাংসের পরিমাণ বাড়বে এবং পশম পাওয়া যাবে খুবই উন্নত মানের। সুতরাং পালনকারীর লাভও বেড়ে যাবে।

### পালনের উপযোগী মেষ

গরম এবং শীতপ্রধান অঞ্চল, এই দু' ধরনের আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে খামারে পালন করার উপযোগী মেষ নির্বাচন করা হয়ে থাকে। শীতপ্রধান অঞ্চল বলতে সারা বছরের মধ্যে মাত্র দেড় থেকে দু' মাস সামান্য গরম থাকে, বাকি দশ

মাস হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। আবার গরম অঞ্চল হচ্ছে মাত্র দু' মাস ঠাণ্ডা থাকে। বাকি সময়টা প্রচণ্ড গরম। কাজেই মেষ নির্বাচন করবার আগে যে আবহাওয়াতে পালন করা হবে সেই ধরনের রাজ্য বা অঞ্চল থেকে মেষ সংগ্রহ করা দরকার। কারণ ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে পালিত মেষ গরম অঞ্চলে পালন করা হলে তার কাছ থেকে ভাল পশম এবং উপযুক্ত পরিমাণে মাংস পাওয়া যায় না। একই অসুবিধে হয় গরম অঞ্চলে পালিত মেষ ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে পালন করা হলে। কাজেই এলাকার উপযোগী মেষের শাবক সংগ্রহ করে পালন করলে পালনকারীর সব দিক থেকেই লাভ হয়। এরসঙ্গে উন্নত জাতের এবং স্বাস্থ্যবান ভেড়ার সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে যে শাবক পাওয়া যাবে এদের পালন করা সব থেকে লাভজনক হয়ে থাকে।

## প্রজননের উপযোগী ভেড়া

যে ভেড়াকে (পুরুষ মেষ) প্রজননের কাজের জন্য পালন করা হবে এর শরীর হবে সুগঠন ও সবল। পাগুলো দৃঢ়, বুকটা হবে উন্নত এবং সেইসঙ্গে মাংসল ও চওড়া ধরনের। পুরুষ ভেড়ার চেহারার যে বিবরণ দেওয়া হলো তার সবগুলো মিলে গেলেও যদি ঠিকমতো লম্বা এবং চওড়া না হয় তবে প্রজননের কাজে নির্বাচন করা মোটেই উচিত নয়।

## উন্নত মানের পশমের জন্য মেষ নির্বাচন

যে মেষের কাছ থেকে উন্নত মানের পশম পাওয়া যাবে শাবক অবস্থায় কিছু লক্ষণ দেখে নির্বাচন করতে হয়। কাজটা খুবই সহজ। কেবল দেখতে হবে এদের শরীরে যেন উৎকৃষ্ট পশম থাকে। যদি দেখা যায় এদের শরীরে পশমের থেকে লোমের সংখ্যা বেশি সেই শাবক পালনের জন্য নির্বাচন করা উচিত নয়। মাথা এবং মুখের লোম দেখে এটা ঠিক করতে হয়। মাথা, মুখ এবং পায়ে যদি সাদা রঙের লোম থাকে তবে আগামী দিনে সেই মেষের কাছ থেকে ভালো পশম পাওয়া যাবে না। এর পরিবর্তে মুখে ও পায়ে ঘন, নরম, স্বচ্ছ ও চক্চকে লোম যদি থাকে তাহলে আশা করতে পারা যায় বড় হলে এর কাছ থেকে উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যাবে। অবশ্য কিছু কারণে পশমের পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে।

এটি ছাড়াও অন্য একটা পদ্ধতি রয়েছে যার সাহায্যে আগেই বলা যায় ভবিষ্যতে কি রকম পশম মেষটির কাছ থেকে পাওয়া যাবে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম এদেরই কাছ থেকে পাওয়া যাবে যাদের মাথায় দুটো শিং-এর মাঝখান বরাবর কোন শক্ত লোম পাওয়া যাবে না।

## কয়েকটা রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর মেষ

যদিও ভারতবর্ষে আজও ব্যাপক হারে মেষ পালন করা হয় না কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ভারতবর্ষ মেষ পালনের ক্ষেত্রে

চারটি দেশের পরেই রয়েছে। তবে ভারতে কয়েকটি রাজ্যে উন্নত জাতের মেষ পালন করা হয়। এদের অন্য রাজ্যে এনে (যদি পালনের উপযোগী আবহাওয়া থাকে) উন্নতিকরণ সহ সঠিকভাবে পালন করলে সব দিক থেকেই খামারী লাভবান হয়। আগে বলা হয়েছে, ঠাণ্ডা এবং মাঝারি গরম এই দু' রকম আবহাওয়াতে দু' শ্রেণীর মেষ পাওয়া যায়। যে রাজ্যে মেষ পালন করা হবে তার আবহাওয়া বুঝে সেই মতো অঞ্চল থেকে মেষ শাবক সংগ্রহ করে পালন করলে মাংস, পশম এবং চামড়া এই তিনটি বিষয়ে পালনকারী ভালোই ফল লাভ করবে। সুতরাং এবার আলোচনা করা হচ্ছে ঠাণ্ডা এবং গরম আবহাওয়াতে পালিত বিভিন্ন শ্রেণীর মেষ সম্পর্কে।

উত্তর ভারতের তিনটি রাজ্যে কয়েকটি শ্রেণীর মেষ পালন করা হয়ে থাকে। রাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ এবং কাশ্মীর। রাজ্য অনুসারে পালিত মেষের শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এছাড়াও দক্ষিণ ভারতের কিছু রাজ্যে পালিত হয় উন্নত শ্রেণীর মেষ।

## উত্তর ভারতের মেষ

**লোহী ঃ** রাজস্থানে বহু পালনকারী লোহী জাতের মেষ পালন করে থাকে। খুবই উন্নত জাতের মেষ এবং গরম ও শুকনো আবহাওয়াতে সমতল ভূমিতে পালন করবার উপযোগী।
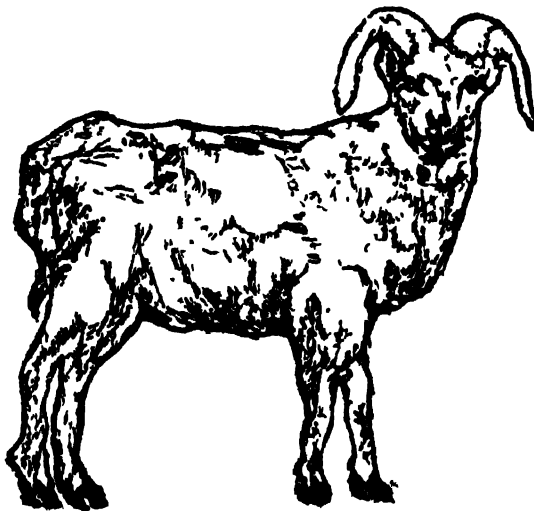
রাজস্থানের লোহী মেষ।

মেষের মাথাটা খয়েরী পশমে ঢাকা থাকে। কান লম্বা ধরনের এবং খাড়া অবস্থায় পিছন দিকে থাকে। নাক বেশ উন্নত। পশম হিসাবে খুব একটা পাতলা নয়। প্রকৃত পক্ষে মোটা ধরনের বলা চলে। প্রচুর পরিমাণে মাংস পাওয়া যায় বলে

কেবল মাংসের জন্য পালন করা হয়। তবে মোটা লোম হলেও ভালো কম্বল তৈরি হয়ে থাকে।

এদের শরীরের বিশেষ গুণ হচ্ছে শীতের সময় যেমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে তেমনি গরমের দিনে যখন 'লু' বা গরম বাতাস বয় তখনও লোহী মেষের মানিয়ে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। সুতরাং যেসব রাজ্যে বারো মাসই প্রায় বৃষ্টিপাত হয় একমাত্র সেইসব অঞ্চল ছাড়া সমতল ভূমিতে বাকি সব আবহাওয়াতেই এদের ভালোভাবে পালন করা চলে।

**বিকানেরী ঃ** এই শ্রেণীর মেষও রাজস্থানে পালন করা হয়ে থাকে। তবে খুবই সীমাবদ্ধ অঞ্চলে। বিকানীর এলাকায় মাগরা, চোকলা এবং নালী অঞ্চলে বিকানেরী মেষ পালন করতে দেখা যায়। কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা খুব বেশি। যেসব অঞ্চলে বারো মাস শীত একমাত্র সেখানে ছাড়া বাকি সব আবহাওয়াতে এবং সমতল অঞ্চলে ও বৃষ্টিপাত বেশি না হলে এদের পালন করা চলে।

বিকানেবী মেষ।
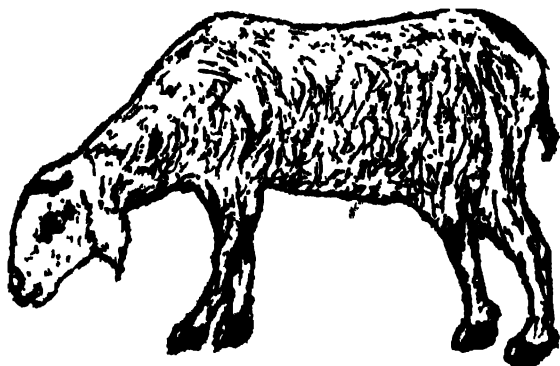
এই শ্রেণীর মেষ চেনবার সহজ উপায় হলো এদের সারা মুখে কিছুটা থোকার আকারে খয়েরী লোম গজায়। লোম বা পশম লোহী শ্রেণীর মেষের মতো বেশ মোটা। এই ধরনের মুখে পশম গজায় যাদের মাগবা এবং নালী অঞ্চলে পালন করা হয়। এছাড়াও দেহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দুটো কানের আকৃতি। বেশ চওড়া ধরনের কান এবং দেখতে অনেকটা চওড়া কলার মতো।

রাজস্থান অঞ্চলে আরও কয়েকটি শ্রেণীর মেষ পালন করা হয়ে থাকে। তবে সেগুলো মোটেই উন্নত জাতের নয়। উত্তম জাতের ভেড়ার মাধ্যমে ভেড়ীর প্রজনন না হওয়ার ফলে মেষের নিজের গুণাগুণ প্রায় হারিয়ে গেছে। ফলে নিচু মানের মেষ হিসাবে পাশের রাজ্যগুলোতে খুবই অবহেলায় এবং অনাদরে পালন করা হয়। ঐসব মেষের কাছ থেকে যেমন পরিমাণ মতো মাংস পাওয়া যায় না তেমনি পশমের উৎপাদনও খুবই কম হয়। এদের পালন করা অবধি যেটুকু পশম সংগ্রহ

করা হয় সেটাও খুবই নীচু মানের হয় ফলে বাজারে ভালো দাম পাওয়া যায় না। সেই কারণে এদের সম্পর্কে কিছু বলা হলো না।

## হিমাচল প্রদেশের মেষ

**রামপুর ঃ** এই শ্রেণীর মেষ পালন করা হয় হিমাচল প্রদেশের বুশহরে। সেই কারণে অনেকে রামপুরের সঙ্গে বুশহর জায়গার নামটা যোগ করে মেষের নামকরণ করেছে রামপুর-বুশহর মেষ। বর্তমানে এই নামটি খুব বেশি পরিচিত। এই অঞ্চলটি ছাড়াও তিব্বত সীমান্তে শিবালিক পর্বতের যমুনা ও শতদ্রু নদীর উপত্যকায় রামপুর শ্রেণীর মেষ পালন করা হয়ে থাকে।

এদের পালন করা হয় মূলত মাংসের জন্য। আর সেটাই পালনকারীর কাছে লাভজনক হয়। দেহের গঠন মাঝারি। খুব একটা ভাল মানের পশম ওদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। এছাড়াও মেষের পশম উৎপাদনের হারটাও কম। পশমটা মাঝারি মানের বলা চলে।

## কাশ্মীর রাজ্যের মেষ

**ভাখরওয়াল ঃ** এই শ্রেণীর মেষ কাশ্মীর উপত্যকার পাদদেশে, জম্মু এবং কাশ্মীরের কিছুটা গরম অঞ্চলে এদের পালন করা হয়। এদের মধ্যে ভেড়ার কেবল শিং গজায়, অপরদিকে ভেড়ীর মোটেই শিং গজায় না। দেহের মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য কববার বিষয় হলো দেহের তুলনায় কানের আকারটা লম্বায় বেশ বড়, সেই সঙ্গে চওড়া এবং ঝোলা অবস্থায় থাকে। এদের দেহ থেকে যে পশম সংগ্রহ করা হয় সেটা মাঝারি মানের। কারণ পশমে শতকরা হিসাবে দশ ভাগ মোটা লোম থাকে। যেসব অঞ্চলে গরম এবং ঠাণ্ডা চরম নয় অর্থাৎ মধ্যম, সেখানে ভাখবওয়াল মেষ পালন করলে পরবর্তীকালে যে বাচ্চা পাওয়া যায় এরা এলাকার আবহাওয়া ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারে।

**গুরেজ ঃ** ভারতে যত শ্রেণীর মেষ পালন করা হয় এদের মধ্যে গুরেজ মেষ আকারে সব থেকে বড়। একমাত্র সেই কারণে এদের বড় জাতের মেষ বলা হয়ে থাকে। গুরেজ মেষ কাশ্মীরের তহশীরে বেশি পালিত হয়। সব ঋতুতেই ভালো রকমের ঠাণ্ডা থাকে সেই ধরনের আবহাওয়াতে এরা ভালো থাকে। যদি গুরেজ মেষকে সামান্যতম গরম আবহাওয়াতে পালন করা হয় তবে এদের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। অপরদিকে পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানে বারো মাস ভালো ঠাণ্ডা থাকে সেইরকম পরিবেশে এদের শরীর যেমন ভালো থাকে তেমনি পায়ের গঠনও মজবুত হয়।

দেহ বড় আকারের হলেও কানগুলো সেই তুলনায় খুবই ছোট। অধিকাংশ মেষের শিং মোটেই গজায় না। খুবই সামান্য সংখ্যক মেষের শিং গজাতে দেখা যায়। তবে শিং আকারে মোটেই বড় হয় না। ভেড়ীর কাছ থেকে দুধ পাওয়া যায় না। কারণ প্রত্যেকটি ভেড়ী এর শাবকদের অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পালন করে। সেই কারণে গুরেজ মেষ শাবক ছোট থেকেই স্বাস্থ্যবান হয়ে বড় হয়।

এদের মূলত পালন করা হয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশমের জন্য। কারণ পশমের মধ্যে কোন লোম থাকে না। তাছাড়া পশমও খুব নরম হয়ে থাকে। বিদেশের বাজারে চড়া দামেতে বিক্রি হয়। একমাত্র কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোথাও যেখানে বারো মাসই ভালো ঠাণ্ডা রয়েছে সেখানে গুরেজ মেষ পালন করলেও এদের কাছ থেকে তেমন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম পাওয়া যায় না।

গাদি ঃ জম্মুর কিষটার ও ভদরওয়া তহশীল, কুলু এবং কাংড়া উপত্যকায় ব্যাপক হারে গাদি শ্রেণীর মেষ পালন করা হয়ে থাকে। এদের দেহের গঠন খুব একটা বড় হয় না। তবে শরীর খুবই মজবুত। পাগুলো সামান্য সরু হলেও খুবই শক্ত। খাড়াই পাহাড়ে ওঠা এবং ঢালুতে নামতে উভয় কাজেই খুবই পটু। একদিকে ভীষণ ঠাণ্ডা যেমন সহ্য করবার ক্ষমতা রয়েছে তেমনি অপরদিকে সামান্য গরম আবহাওয়াতেও ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারে।

মুখের পশমের রঙ ফিকে খয়েরী। তবে সারা শরীরে পশমের রঙটা অধিকাংশ মেষের সাদা হয়। পশম খুবই উন্নত মানের। এছাড়া পশমের উজ্জ্বলতাও বেশি। সেই কারণে দেশবিদেশে গাদি মেষের পশমের চাহিদা বেশি থাকায় পালনকারী ভালো দাম পায়।

## দক্ষিণ ভারতের মেষ

বেশ কয়েকটি উন্নত জাতের মেষ দক্ষিণ ভারতের কিছু রাজ্যে পালন করা হয়। তবে এদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট মানের পশম পাওয়া যায় না। যে সামান্য পরিমাণে পশম সংগ্রহ করা হয় তা সবই মোটা। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কায়বাটি মেষের মাংস খুবই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এমনকি মেষের মাংসকে খাসীর মাংস হিসাবে বিক্রি করলে খাবার সময় পার্থক্য বুঝতে পারা যাবে না।

ডেকানী ঃ ভারতের পশ্চিম উপকূলে মুম্বই সহ আরও দক্ষিণে বেশ কয়েকটি রাজ্যে ডেকানী জাতের মেষ পালন করা হয়। এই শ্রেণীর মেষের দেহের আকার খুব একটা বড় হয় না তবে শরীর বেশ মজবুত ধরনের সেটা দেখলেই বোঝা যায়। পশমের রঙ ফিকে খয়েরী অথবা কালো রঙেরও হতে পারে।

ডেকানী মেষের চেহারার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হলো গলার নিচের দিকে ছোট লম্বা থলির মতো মাংসের পিণ্ড ঝুলে থাকে। মেষের বয়স বাড়তে থাকলে থলির আকারও বড় হয়। কেবলমাত্র মাংসের জন্য এদের পালন করা হয়ে থাকে। সামান্য পরিমাণে লোম পাওয়া গেলেও সেটা যেমন মোটা তেমনি খুবই নিচু শ্রেণীর।

নেললোর ঃ কাশ্মীরের যেমন নিজস্ব জাত গুরেজ তেমনি দক্ষিণ ভারতের এই জাতের মেষকে নিজস্ব জাত বলা হয়। খুবই উন্নত জাতের এবং সারা ভারতে যত জাতের এবং শ্রেণীর মেষ রয়েছে লম্বায় সব থেকে বড়।

সাধারণ মেষের থেকে লেজের আকার ছোট। আর লেজটা পাকানো লোম দিয়ে ঢাকা থাকে। সারা দেহে পশমের রঙ সামান্য লালের আভা যুক্ত অথবা পাটকিলে ধরনের। নেললোর মেষের কাছ থেকে যে পশম পাওয়া যায় সেটা একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হলেও উত্তম শ্রেণীর পশম বলতে পারা যায়। সেই কারণে বিদেশের বাজারে ভালো দামে বিক্রি হয়ে থাকে। খামারে পালন করা হয় মূলত পশমের জন্য।

**বেনুর ঃ** এটিও উন্নত জাতের মেষ। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পালন করা হয়। কেবলমাত্র মাংসের জন্য এই জাতের মেষের চাহিদা বেশি। আর যে সামান্য পরিমাণে পশম এদের কাছ থেকে পাওয়া যায় সেটা খুবই নিম্নমানের। সেই কারণে দেশের বাজারেও ভালো দাম পাওয়া যায় না।
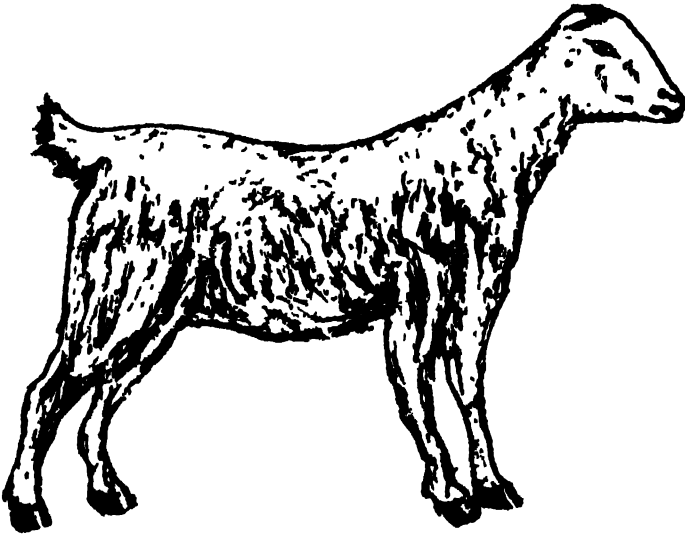
দক্ষিণ ভাবতে পালিত বেনুব মেষ। এদেব পালন কবা হয় মাংসের জন্য।

এই জাতের মেষ চেনবার সহজ উপায় হলো, লেজের আকার খুবই ছোট আর মুখটা লম্বা ধরনের। পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া যেমন গরম এই ধরনের আবহাওয়াতে এরা সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। অবশ্য গরম আবহাওয়া থাকলেও যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম সেই অঞ্চলেও এরা ভালোভাবে বেঁচে থাকে।

**শ্রেণী বিহীন মেষ ঃ** দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চলে এমন কিছু শ্রেণীর মেষ পালন করা হয় যাদের নির্দিষ্ট কোন শ্রেণী বা জাত হিসাবে পরিচিতি নেই। এদের সারা দেহে পশমের রঙটা কিছুটা সাদা ধরনের। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম নয়। তবে মাংস হিসাবে খুবই সুস্বাদু। দেহের গঠন মাঝারি আকারের এবং খুবই শক্তসমর্থ শরীর। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে এদের ভালোভাবে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা রয়েছে।

## মেষের খামার

আগে বলা হয়েছে মেষ পালন করা হয় দু' রকম ভাবে।

(ক) মেষের মালিক কোন পরিচিত এবং খুবই বিশ্বাস যোগ্য ব্যক্তিকে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় মেষ কিনে তাকে দিয়ে দেয়। ঐ ব্যক্তি দেড় বছর পর থেকে প্রতি বছর মেষের মালিককে একটা মোটা অঙ্কের অর্থ দিতে শুরু করে। এভাবে পাঁচ থেকে সাত বছর অর্থ দেবার পর যে সংখ্যাতে মেষ দেওয়া হয়েছিল এবং এদের যা বয়স ছিল সেই মতো মেষ ফেরত দেয়। এই কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘুরে ঘুরে মেষ মাঠে-ঘাটে চরায়। রাতে কোন বড় গাছ তলায় আশ্রয় নেয়। মেষ সহ নিজেদেরও বিশ্রাম হয়। সুতরাং এভাবে মেষ পালন করা হলে এদের জন্য রাতে থাকবার কোন ঘরের দরকার হয় না।

(খ) অপরদিকে যেসব মেষ খামার পদ্ধতিতে পালন করা হয় এদের জন্য রাতে থাকবার ব্যবস্থা করতে হয়। কাজেই এদের থাকবার জায়গা কেমন হবে এবং কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটা অবশ্যই জানা দরকার।
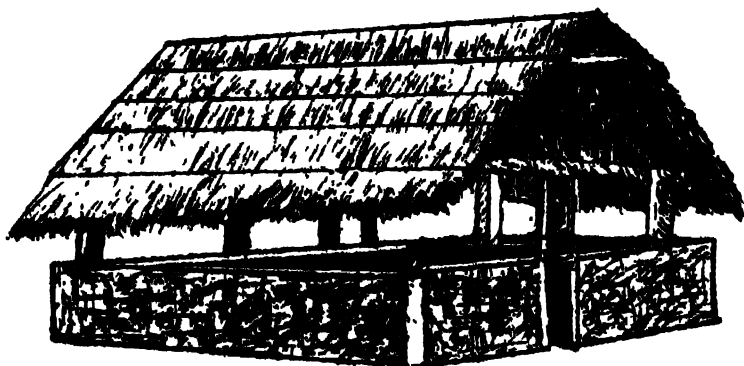
মেষের সাধারণ বাসস্থান।

কিছুটা উঁচু ধরনের জমিতে মেষেদের থাকবার ঘর তৈরি করতে হবে। কারণ শুকনো আবহাওয়া ও পরিবেশে এদের রাখতে হয়। আর ঘরের ভিতর জায়গা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে প্রত্যেকে লম্বা এবং চওড়াতে সাড়ে তিন ফুট করে জায়গা অবশ্যই পায়। মেষ খুবই ভীতু প্রাণী এবং নিরীহ। দিনে এবং রাতে সব সময় দলের সঙ্গে একে অপরের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ায়, বিশ্রাম করে, শুয়ে ঘুমায়, এমনকি পথ চলবার সময় ঐভাবে চলে। দলের প্রথম মেষটি দাঁড়ালে সবাই দাঁড়াবে। সে কোন কারণে ভয় পেয়ে কোন দিকে ছুটলে সকলে সেই দিকেই ছুটবে। ভালো অথবা খারাপ যা কিছু হোক সেটা সকলে সমানভাবে ভোগ করবে। সুতরাং এদের প্রয়োজন মতো জায়গা এবং ভালোভাবে ঘেরা জায়গায় এদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে।

পয়সা কম থাকলে সাত ফুট উঁচু করে খড়, টালি অথবা টিনের ছাউনি দিয়ে চারপাশ বাঁশের দরমা দিয়ে ঘিরে খামার সহজেই তৈরি করা যায়। তবে চারপাশ দরমা দিয়ে ঘেরবার সময় ছাদ অবধি উঁচু না করে এক ফুট ফাঁকা রাখলে ভালো হয়। তাহলে ঘরে বাতাস ভালভাবে আসা-যাওয়া করতে পারবে, গরমের সময় মেষেদের কষ্ট হবে না। ঘরের দরজা মজবুত করা দরকার। কারণ ঘরে শিয়াল, কুকুর যদি প্রবেশ করে তবে শাবকসহ মেষের ক্ষতি করতে পারে। দরমার ভিতর এবং বাইরের দিকে পুরু করে আলকাতরা মাখিয়ে দিলে বর্ষায় নষ্ট হবে না এবং চলবে অনেক দিন। আর প্রতি বছর বর্ষার আগে এই কাজটি করা উচিত।

পালনকারীর যদি আর্থিক সুবিধে থাকে তবে দরমার পরিবর্তে কাদা দিয়ে কম দামের ইঁট গেঁথে চারপাশ ঘিরে পরে সিমেন্ট ও বালি দিয়ে প্লাস্টার করে দিলে দীর্ঘদিন চলবে। আর ছাদটা টিন অথবা টালি দিয়ে ছাউনি করলে কোন অসুবিধে হবে না। ঘরের দরজা টিনের করলে কোন ফাঁক থাকবে না ফলে সাপ বা ইঁদুর সহজে প্রবেশ করতে পারবে না।

মেঝে যেন জমি থেকে খুব কম করে এক-দেড় ফুট উঁচুতে থাকে। পাকা সিমেন্টের মেঝে করতে পারলে ভালো হয় নতুবা ইঁটের খোয়া দিয়ে পিটিয়ে তারপর ইট বিছিয়ে ফাঁকগুলো সিমেন্ট ও বালি দিয়ে বন্ধ করে দিলে কাজ চলে যাবে। খামারের এক কোণায় প্রজননের কাজে পালিত ভেড়া ঘিরে আলাদাভাবে রাখতে হবে। কতটা জায়গা ঘেরা দরকার সেটা নির্ভর করে ভেড়ার সংখ্যার ওপর। তবে একটি ভেড়ার জন্য চার ফুট লম্বা এবং চার ফুট চওড়া জায়গার প্রয়োজন হয়। যদি দুটি অথবা তিনটি ভেড়া প্রজননের কাজে পালন করা হয় তবে সেই হিসাবে জায়গা রাখা উচিত।

## ভেড়া ও ভেড়ীর প্রজনন ব্যবস্থা

মেষ পালনের ক্ষেত্রে প্রজনন ব্যবস্থা যদি ঠিক মতো করা না হয় তবে মেষের পালে সংখ্যা বাড়ানো, মাংস ও পশম উৎপাদন—এই তিনটে ব্যাপারে আশা অনুসারে পালনকারীর না পাবার আশঙ্কাই বেশি। সুতরাং দলে মেষের সংখ্যা বাড়াতে হলে উন্নত জাতের ভেড়ার সঙ্গে ভেড়ীর দৈহিক মিলন প্রতিবার ঘটাতে হবে। ফলে মেষের পালে উন্নত জাতের ও মানের মেষের সংখ্যা বাড়বে।

দলের মধ্যে ৪০ থেকে ৫০টি ভেড়ীর জন্য একটি করে ভেড়ার প্রয়োজন হয়। এভাবে একটা করে ভেড়া দলেতে রেখে পালন করলে নতুন যেসব মেষ জন্মাবে এদের কাছ থেকে সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে।

ভেড়ার বয়স আট থেকে দশ মাস হলেই তার মাধ্যমে প্রজননের কাজ মেটাতে পারা যায়। তবে কম বয়সের ভেড়াকে এই কাজে লাগালে এদের শরীর তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই কারণে পনের মাস বয়স হলে তখন প্রজননের কাজে লাগালে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। একটি ভেড়াকে তার সাত বছর বয়স অবধি

প্রজননের কাজে ব্যবহার করা চলে। তবে ঠিক মতো পরিচর্যা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য দিলে এদের প্রজননের ক্ষমতা দশ বছর অবধি বেড়ে যায়। সেটা না করাই ভালো। ভেড়ার বয়স আট বছর হলেই তাকে বাতিল করা উচিত।

প্রজননের কাজে ব্যবহার করবার জন্য ভেড়া ছাড়া বাকি সব শাবক ভেড়াকে পালন করা হবে মাংসের জন্য। এদের অবশ্যই খাসী করতে হবে ভেড়ীর দুধ পান করা বন্ধ করলেই। এরপরেও ভেড়াকে খাসী করা চলে। কিন্তু বয়স বাড়লেই ঐসব ভেড়া ভেড়ীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের চেষ্টা করে। এতে মেষের পালে খুবই ক্ষতি হয়।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যদি অন্য কোন জায়গা থেকে প্রজননের উপযোগী ভেড়া আনা হয় এবং এটির মাধ্যমে মেষের পালে বংশ বাড়ানো হলে ঐ ভেড়াকে কয়েকদিন আলাদাভাবে খামারে রাখতে হবে। এটা করা হয় দলের সব ভেড়ীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। নতুন পরিবেশে এভাবে পরিচিত হলে তবেই প্রজননের কাজে ব্যবহার করতে পারা যাবে।

## ভেড়ীর গর্ভধারণের বয়স

সবল বাচ্চা এবং ভেড়ীদের শরীর যাতে ঠিক থাকে তার জন্য গর্ভধারণ করার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ নিয়মকানুন পালন করা দরকার। যে কোন জাতের ভেড়ীর সাধারণভাবে দু' বছর বয়স হলে গর্ভধারণ করবার ক্ষমতা হয়। তবে যে সব অঞ্চলে আবহাওয়া গরম সেখানে ভেড়ী দেড় বছর বয়স হলেই গর্ভধারণের জন্য উত্তেজিত হয়। তবে পালনকারীর উচিত এতো কম বয়সে ভেড়ীকে গর্ভধারণের জন্য ভেড়ার সঙ্গে মিলিত হতে না দেওয়া।

সাধারণভাবে দেখা গেছে প্রায় সব জাতের ভেড়ী বছরে একবার বাচ্চা প্রসব করে। তবে ভালোভাবে পরিচর্যা এবং প্রয়োজন মতো সুষম খাদ্য দেওয়া হলে বছরে দু'বার পর্যন্ত গর্ভধারণ করতে পারে। গর্ভধারণ করবার সময় ১৪০ দিন। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৫০ দিন অবধি গর্ভে বাচ্চা থাকার পর ভেড়ী শাবক প্রসব করে।

ভেড়ীর ক্ষেত্রে আরও একটা নিয়ম হলো, সারা বছর ধরে গর্ভধারণের জন্য উত্তেজিত হয় না। বছরের মধ্যে গরমকাল, শরৎ এবং হেমন্ত ঋতুতে ভেড়ার সঙ্গে দৈহিক মিলনের জন্য তারা উত্তেজিত হয়। পালেতে যদি একের বেশি ভেড়া থাকে তাহলে ভেড়ী অসময়ে উত্তেজিত হতে পারে। অবশ্য প্রকৃতির নিয়মে কিছু ক্ষেত্রে হেমন্ত ঋতুর পরিবর্তে শীতের প্রথম মুখে অর্থাৎ পৌষ মাসের গোড়ার দিকে উত্তেজিত হয়ে থাকে।

গরমের সময় এবং শরৎকালে ভেড়ী যদি গর্ভধারণ করে তবে ১৪০ থেকে ১৫০ দিন বাদে যে বাচ্চা জন্মায় তার স্বাস্থ্য ভালো হয়। তার কারণটা হলো, বর্ষায় এবং হেমন্ত ঋতুতে ভেড়ী প্রচুর কচি সবুজ ঘাস খেতে পায়। ফলে সুস্থ এবং সবল

বাচ্চা জন্মায়। গরমের সময় ভেড়ী প্রসব করলে সেই বাচ্চার শরীর কিছুটা দুর্বল হয়। সুতরাং খামারী যদি এসব মেনে চলে তবে মেষের পালে ভালো নীরোগ ও সবল মেষের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

## প্রসবের সময় ভেড়ীর পরিচর্যা

ভেড়ীর শরীর যদি দুর্বল না হয় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকলে বাচ্চা প্রসব করবার সময় কোন রকম সাহায্যের দরকার হয় না। তবে দুর্বল ভেড়ী হলে এবং বাচ্চা প্রসবের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া দরকার। মেষ শাবক ভূমিষ্ঠ হবার সময় তার মাথাটা সামনের দুটো পায়ের মাঝখানে গোঁজা অবস্থায় থাকে। প্রকৃতির এই নিয়মের কোন পরিবর্তন ঘটলেই তখন অবহেলা করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। পশু চিকিৎসক অথবা যার এ বিষয়ে ভালো জ্ঞান আছে সেই রকম কোন পালনকারীর সাহায্যে ভেড়াকে প্রসব করানো দরকার। নতুবা ভেড়ী অথবা বাচ্চার মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

সবল বাচ্চা হলে ভূমিষ্ঠ হবার পনের মিনিটের মধ্যেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে ভেড়ীর পালান থেকে দুধ পান করে। যদি শাবক দুর্বল হয় তাহলে বারবার দাঁড়াবার চেষ্টা করলেও দাঁড়াতে পারে না। তখন পালনকারীকে সাহায্য করতে হবে যাতে বাচ্চা ভেড়ীর পালান থেকে দুধ পান করতে পারে।

বাচ্চা সহ ভেড়ীকে মেষের পালের সঙ্গে রাখা উচিত নয়। আলাদা ঘরে উভয়কে এক সঙ্গে রাখা দরকার। তবে পনের দিন পর খামারে এক সঙ্গে এদের রাখা যেতে পারে।

জন্মের সময় মেষ শাবকের ওজন খুব কম হলেও আড়াই কেজি হওয়া দরকার। তবে স্বাস্থ্যবতী ভেড়ীর শাবকের ওজন পাঁচ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। জন্মাবার পর থেকে তিন মাস অবধি শরীরের ওজন বাড়বার হারটা বেশি। যখন এদের বয়স ১৮ মাস পূর্ণ হয় তখন এদের দেহের ওজন বৃদ্ধির হার শেষ হয়। তবে সাত মাস বয়স হলেই মাংসের জন্য ভেড়াকে বাজারে পাঠাতে পারা যায়। ভেড়া বলতে অবশ্য খাসীর কথা এখানে বলা হচ্ছে।

## খাসী করা

ভেড়াকে যদি খাসী করতে হয় তবে খুব ছোট বয়সেই করা উচিত। সাধারণভাবে বাচ্চারা পালানের দুধ পান করা বন্ধ করে দিলেই কাজটি শেষ করা দরকার। অবশ্য এর পরেও বাচ্চার বয়স বাড়লে খাসী করতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। তবে ভেড়ীর পালের সঙ্গে রাখা অথবা একসঙ্গে মাঠে চরতে দেওয়া চলবে না। যদি দেওয়া হয় তবে ভেড়ীকে প্রায় সব সময় বিব্রত করবে এবং প্রজনন ক্ষেত্রে পালনকারীর কাছে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

## মেষের প্রধান খাদ্য

গরমকালে সকাল সাতটা এবং হেমন্ত ও শীতের সকালে বেলা নটার পর থেকে সূর্য ডুবে যাবার আধ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত মেষ মাঠে-ঘাটে চরে তার প্রধান

খাদ্য কচি কাঁচা ঘাস, শাক-পাতা এবং আগাছা পেট ভরে খাবে। হেমন্ত ও শীতের মরসুমে মেষের পাল বেলা নটার পর মাঠে চরতে দেবার কথা বলা হয়েছে। তার প্রধান কারণটা হলো, ঐ সময় ঘাসে যে শিশিরকণা থাকে সেটা এদের শরীরের পক্ষে ভালো নয়। কাজেই বেলাতে রোদ উঠলে শিশির ঘাস থেকে ঝরে অথবা শুকিয়ে গেলে তবেই মেষের খামার ঘর থেকে বাইরে বের করা উচিত। যদি দেখা যায় মেঘলা হবার ফলে ঘাসে তখনও শিশির রয়েছে তাহলে আরও ঘণ্টাখানেক মেষের পাল হাঁটিয়ে তারপর মাঠে চরতে দেওয়া উচিত। এতে এদের পক্ষে ব্যায়াম হয় এবং শিশির সমেত ঘাস খাবার সুযোগ থাকে না। দুপুরে (শীত ও গরমে) মেষের দল মাঠে চরবে না, গাছতলায় বিশ্রাম নেবে।

গরমের সময় শীতের ঘাসের সঙ্গে দূর্বা ঘাস মাঠে থাকে। যদি দূর্বা ঘাস না পাওয়া যায় তবে কুশাজাতীয় ঘাস (এটা কিছুটা শক্ত ধরনের ঘাস) খাওয়ানো দরকার। বয়স বাড়লে মেষের দেহের ওজনও বাড়তে থাকে। ঐ সময় এদের রোজ এক থেকে দু' কেজি শুঁটি জাতীয় ঘাস খাওয়াতে হয়। রোজ ঐ পরিমাণ ঘাস ১০০ থেকে ১৫০টি মেষকে কোন পালনকারীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। আর গরমকালে মাঠে চরলেও পেট ভরা ঘাস প্রতিটি মেষ খেতে পারে সে কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। কাজেই ঘাসের অভাবটা রোজ মেটাতে হয় কয়েকটা তৈল বীজের খইলের মাধ্যমে। ঐসব তৈল বীজের মধ্যে রয়েছে বাদাম, তিল এবং কুসুম। যেটির খইল সহজে পাওয়া যাবে এবং দামটা কম সেই তৈল বীজের খইল (যেকোন একটি) একটি পূর্ণবয়স্ক মেষকে ১২৫ থেকে ২০০ গ্রাম রোজ খাদ্য হিসাবে দিতে হবে। আর সব শ্রেণীর মেষের শরীরের গঠন ঠিক রাখবার জন্য কিছু খনিজ পদার্থ খাওয়ানো দরকার। প্রতিটি মেষকে সারাদিনে একবার ৭৫ থেকে ১০০ গ্রাম পরিমাণ দিলেই যথেষ্ট এবং তা খাদ্যের সঙ্গে মেখে দেবার নিয়ম। বিশেষ করে গর্ভবতী ভেড়ীর ক্ষেত্রে খনিজ উপাদানের অভাব ঘটতে পারে।

## খনিজ মিশ্রণের ভাগ

| উপাদানের নাম | পরিমাণ |
|---|---|
| খাবার লবণ | ৫ গ্রাম |
| কাঠকয়লা গুঁড়ো | ১০ গ্রাম |
| চুনাপাথর গুঁড়ো | ২৫ গ্রাম |
| সিদ্ধ করা হাড়ের গুঁড়ো | ৬০ গ্রাম |
| | ১০০ গ্রাম |

এই কয়টি উপাদান মিশিয়ে যে খনিজ মিশ্রণ তৈরি করা হলো তার সবটা একটি মেষকে দেওয়া হবে না। এদের খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে একটি মেষকে কতটা দেওয়া দরকার সেটা ভেড়ীর খাদ্য তালিকাতে পরে দেওয়া হচ্ছে।

**গর্ভবতী ভেড়ীর খাদ্য ঃ** গর্ভবতী ভেড়ী গর্ভধারণের চার মাস পর রোজ মাঠে দলের সঙ্গে চরে যতটা সম্ভব ঘাস ও শাক-পাতা যা পারে খাবে। এরপর বাচ্চা প্রসব করবার এক মাস বাকি থাকতে তাকে ভালোভাবে খেতে দেওয়া দরকার। এইভাবে তার খাদ্যের প্রতি নজর দিলে আকারে বড় এবং সবল শাবক প্রসব করবে। যেসব খাদ্য গর্ভবতী ভেড়ীকে রোজ দিতে হবে সেই সব উপাদানের নাম এবং পরিমাণ উল্লেখ করে তার একটা তালিকা দেওয়া হচ্ছে। তালিকা অনুসারে প্রতিটি গর্ভবতী ভেড়ীকে নিত্য খাওয়ানো দরকার। যদি কোন সময় দেখা যায় তালিকাতে দেওয়া উপাদানগুলোর মধ্যে কোন একটা উপাদান পাওয়া যাচ্ছে না অথবা দামটা বেশি পড়ে যাচ্ছে তাহলে তার পরিবর্তে ঐ জাতীয় অন্য উপাদান অবশ্যই দেওয়া দরকার। যদি বাদাম খইলের দাম বেশি লাগে তাহলে সমপরিমাণ তিল খইল দিতে হবে। এভাবে উপাদানের পরিবর্তন করা হলে খাদ্যের মান কমবে না।

## গর্ভবতী ভেড়ীর খাদ্য তালিকা (সুষম খাদ্য)

| খাদ্যের নাম | পরিমাণ |
|---|---|
| কচি সবুজ ঘাস | পেট ভরে খাবে |
| শুঁটি জাতীয় ঘাস | ৫০০ গ্রাম |
| ছোলার দানা ভাঙা (৬ ঘণ্টা ভেজানো) | ১০০ গ্রাম |
| বাদাম অথবা তিল খোল ( ” ” ) | ৭৫ গ্রাম |
| গমের ভুসি | ৪০০ গ্রাম |
| খাবাব লবণ | ১২ গ্রাম |
| খনিজ পদার্থ মিশ্রণ | ৫০ গ্রাম |

তালিকায় দেওয়া খাদ্য (ঘাস বাদ দিয়ে, কারণ মেষ চরে খাবে) সব মিশিয়ে সারাদিনে অর্ধেক পরিমাণে সকালে একবার এবং বিকেলে চরে আসার পর বাকি অর্ধেক খাবে। কাজেই খাবার তৈরি করবার সময় প্রতিটি গর্ভবতী ভেড়ীর জন্য তালিকা অনুসারে প্রতিটি উপাদান অর্ধেক পরিমাণে নিয়ে খাওয়ানো হবে। মেখে রাখা খাদ্য দশ থেকে বারো ঘণ্টা বাদে খাওয়ানো উচিত নয়।

প্রসব করবার পর পনের দিন বাদে আবার আগের মতো সারাদিন মাঠে চরবে এবং সুষম খাদ্য খাবে। তবে সব উপাদানগুলো কিছুটা পরিমাণে কমিয়ে ৪০০ গ্রাম করে রোজ দু' বেলায় খাওয়াতে হবে।

প্রজননের কাজে খামারে যে কয়টি ভেড়া (দুটো অথবা তিনটে) পালন করা হবে তারা সারা দিনে যতটা পারবে কচি সবুজ ঘাস চরে খাবে। এরপর সকাল এবং বিকেলে কিছু পরিমাণে সুষম খাদ্য দেওয়া দরকার। এদের জন্য দুটো খাদ্য তালিকা দেওয়া হচ্ছে। একটি তালিকা গরমকালের জন্য, কারণ ঐ সময় মাঠে ঘাস কম থাকে। অপর তালিকাটি শীতের মরসুমের জন্য।

## গরমের সময় সুষম খাদ্য তালিকা

| খাদ্যের নাম | পরিমাণ |
|---|---|
| ছোলা ভাঙা (ভেজানো) | ১২৫ গ্রাম |
| গমের ভুসি | ২১০ গ্রাম |
| খাবার লবণ | ১৫ গ্রাম |
| | ৩৫০ গ্রাম |

## শীতের সময় সুষম খাদ্য তালিকা

| খাদ্যের নাম | পরিমাণ |
|---|---|
| গুয়ার বীজ ভাঙা (ভেজানো) | ১০০ গ্রাম |
| গমের ভুসি | ২০০ গ্রাম |
| লবণ | ১২ গ্রাম |
| | ৩১২ গ্রাম |

**বাচ্চার খাদ্য ঃ** ভেড়ীর পালানের দুধ শাবকরা খাওয়া বন্ধ করে দিলে দলের সঙ্গে মাঠে চরতে দিতে পারা যায়। তবে জন্মের পর পনের দিন পার হলে পালের সঙ্গে মাঠে গেলে কোন ক্ষতি হয় না। কারণ ঐ সময় থেকে বাচ্চারা ঘাস খেতে শুরু করে। পরে বয়স যত বাড়তে থাকে পেট ভরে ঘাস খেতে থাকে। যদি মাঠে চরে ভালোভাবে পেট ভরে খেতে পায় তবে জন্মের পর পাঁচ সপ্তাহ থেকে রোজ ২০০ গ্রাম পরিমাণ সুষম খাদ্য দেওয়া দরকার। এরপর বয়স বেড়ে দু' মাস হলে তখন প্রতিদিন ৩৫০ থেকে ৪০০ গ্রাম সুষম খাদ্য দেওয়া উচিত। এই নিয়মটা ভেড়ী, খাসী এবং ভেড়ার জন্য। যদি কোন কারণে মাঠে ভালো ঘাস না পায় তবে সুষম খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে প্রতিদিন ৫০০ গ্রাম হিসাবে প্রতিটি মেষকে দিতে হবে। অবশ্য বর্ষা শুরু হলে তখন ১০০ থেকে ১৫০ গ্রাম অবধি সুষম খাদ্য কম দিতে পারা যায়। গরমে খরা যদি বেশি দিন ধরে চলে তখন অবশ্যই সুষম খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে। নতুবা এদের শরীর দুর্বল হয়ে যাবে।

## বাচ্চাদের সুষম খাদ্য তালিকা

| খাদ্যের নাম | পরিমাণ |
|---|---|
| ভুট্টা গুঁড়ো (ভেজানো) | ২৫ গ্রাম |
| ছোলা ভাঙা ( " ) | ২০ গ্রাম |
| বাদাম খোল ( " ) | ২০ গ্রাম |
| গমের ভুসি | ৩০ গ্রাম |
| খাবার লবণ | ৫ গ্রাম |
| | ১০০ গ্রাম |

বাদাম খইলের পরিবর্তে তিল খইল দিলে কোন ক্ষতি হয় না। যদি দেখা যায় ছোলা ভাঙা দিলে খরচ বেশি পড়ছে তবে মটর, মুসুরি অথবা খেঁসারি ডালভাঙা ছোলার দরটা না কমা অবধি দেওয়া যেতে পারে। তবে ছোলার পরিবর্তে যে তিনটি ডালের কথা বলা হলো সেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে মেষকে খাওয়ানো উচিত নয়। কারণ কিছুটা পরিমাণে পুষ্টির অভাব থেকে যাবে।

## মেষের রোগ ও প্রতিকার

গৃহপালিত পশুরা মানুষের মতো কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হয়। তবে মানুষ যেমন কয়েক হাজার রকমের রোগে ভোগে পশুরা সেই তুলনায় মাত্র কয়েকটা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সেটা হয় ঘরেতে বেঁধে পালন করা হয় বলে। কিন্তু যারা খোলা অবস্থায় বনে, জঙ্গলে প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়ায় তারা বিশেষ কোন রোগে ভোগে না। যদিওবা কোন সময় রোগে আক্রান্ত হয় তবে ওষুধ ছাড়াই নিজের থেকে ভালো হয়ে যায়। গৃহপালিত পশুরা যে কয়েকটা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এদের মধ্যে কিছু রোগ ভয়ানক ছোঁয়াচে এবং আজও কোন ওষুধ না থাকায় অধিকাংশ পশু মরে যায়। যদিও কিছু ক্ষেত্রে প্রাণে বেঁচে যায় কিন্তু শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। একে পালন করার অর্থ হলো খামারীর লোকসানের বোঝা ভারি করা। সুতরাং সেই ধরনের পশুকে বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকে না।

এবার আলোচনা করা হচ্ছে মেষেরা যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত হয় এদের নাম সহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি। রোগের লক্ষণ মিলিয়ে সময়ে ওষুধ প্রয়োগ করলে খামারে রোগটি ছড়াতে পারে না এবং পশু তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।

### গুটি বসন্ত

**কারণ ঃ** বসন্ত কালে এবং গরমে মেষেরা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। খুবই ছোঁয়াচে এবং আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ মেষকে অন্য জায়গায় সরিয়ে না দিলে খামারের অন্যান্য মেষেরা ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে বসন্ত রোগটি দেখা দেয়। গবাদি পশু সহ অন্যান্য শ্রেণীর পশুরাও একই ভাইরাসের জন্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** মেষের দেহের তাপমাত্রা অনেকটা বেড়ে যায়। দাঁতের মাড়িতে, গলার ভিতরে এবং ভেড়ার পেটে ছোট আকারের গুটি বের হয়। ভেড়ীর দুধের পালান এবং বাঁটেও ফোসকার মতো গুটি বের হয়। মেষ কিছু খেতে চায় না। রোগের যন্ত্রণায় মেষ কাতর হয়ে পড়ে। গুটির ভিতর পুঁজ জমলে শরীর আরও দুর্বল হয়। তখন মেষের উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেষ মারা যায়।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** আজ অবধি এর কোন ওষুধ বের করা সম্ভব হয়নি। কাজেই চিকিৎসা বলতে কিছুই করবার নেই। গুটি পেকে খোলস উঠতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে। এই রোগে বাঁচার হার শতকরা হিসাবে দশ ভাগ। প্রাণ রক্ষা পেলেও মেষের শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে যায়। কাজেই ঐসব মেষ পালন করা হলে লোকসানের বোঝা বেড়ে যায়। কাজেই মাংস হিসাবে বিক্রি করে দিতে হয়।

রোগের প্রতিকার না থাকলেও **প্রতিরোধ** ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া যায়। রোগে আক্রান্ত মেষগুলো খামার ঘর থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরিয়ে দেবার পর বাকি সব মেষগুলো ঘর থেকে বের করে দিতে হবে। তারপর ঘরের মেঝে ফিনাইল অথবা ডেটল মেশান জল দিয়ে ভালোভাবে ধোয়া দরকার। এরপর ঘরের দেওয়াল, ছাদ, এমনকি দরজা-জানলার পাল্লাতে জীবাণুনাশক ওষুধ মেশিনের সাহায্যে ছিটাতে হবে। এভাবে খামার ঘর জীবাণুমুক্ত করার পর তবেই সুস্থ মেষগুলি রাখা চলবে। প্রত্যেককে **টিকা** দিতে হবে।

**পথ্য ঃ** গুটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত মেষের শক্ত কিছু চিবিয়ে খাবার ক্ষমতা থাকে না। কারণ মুখের ভিতরটা গুটিতে ভরে যায়। এমনকি তরল কিছু খেতেও অসুবিধে হয়। কাজেই সামান্য গরম ভাতের ফেন একটু লবণ মিশিযে দেওয়া যেতে পারে। বেশি সংখ্যাতে মেষ আক্রান্ত হলে তখন ঐ পরিমাণে ভাতেব ফেন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তখন বার্লি সামান্য গরম থাকা অবস্থায় লবণ মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

## নিউমোনিয়া

**কারণ ঃ** মেষের পশমের সাহায্যে তৈরি শীতবস্ত্র গায়ে দিয়ে আমরা ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করি। মেষেদের যদি ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয় তবে সেটা খুবই খারাপ ব্যাপার। দুটো কারণে ওরা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। যদি দেহের পশম অসময়ে এবং নিজের প্রয়োজন মেটাতে হঠাৎ ছাঁটা হয় আর সেই সঙ্গে মেষ কয়েকদিন ধরে মাঠে চরবার সময় দিনভর বৃষ্টিতে ভেজে তবে রোগটি দেখা দিতে পারে। এছাড়াও শীতের সময় খামার ঘরের জানলার পাশ খোলা থাকলে, বিশেষ করে বাচ্চারা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। এদের থাকবার ঘরের মেঝে স্যাঁতসেঁতে হলে সব বয়সের মেষের ঠাণ্ডা লাগবার আশঙ্কা থাকে। এসব প্রথম কারণ হিসাবে ধরা হয়।

অপর কারণটি হচ্ছে জীবাণুর আক্রমণ। রোগটা ভীষণ ছোঁয়াচে। মেষের নাক দিয়ে যে সর্দি বের হয় তার সঙ্গে থাকে রোগের জীবাণু। মোট তিন রকমের জীবাণু রয়েছে। সবগুলো ইংরেজি নাম। বাংলায় কোন নাম নেই। সেই কারণে এখানে এদের নামগুলো বলা হলো না। তবে জীবাণুর শ্রেণী অনুসারে রোগের তীব্রতা কম বা বেশি হয়।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** রোগের প্রথম দিকে মেষের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তারপর নাক দিয়ে পাতলা সর্দি গড়িয়ে পড়তে থাকে। শেষে শুরু হয় কাশি। দেহের

তাপমাত্রা প্রথম দিকে সামান্য বেশি থাকে। কয়েক দিন যাবার পর সর্দি ঘন হয়। শ্বাস নিতে কষ্ট হয় বেশি। দেহের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। বুকে সর্দি বসে যাবার ফলে মাঝে মাঝে ঘড়-ঘড় আওয়াজ হয়। রোগের এই রকম অবস্থায় মেষের আর দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা থাকে না। পিপাসা পেলে জল পান করে আর বিশেষ কিছু খেতেও চায় না। যেটুকু খায় তার পরিমাণ খুবই কম।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেষটিকে দল থেকে সরিয়ে শূন্য ঘরে রাখতে হবে। শীতকাল হলে সেই ঘরে যাতে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ না করে সেই মতো ব্যবস্থা করা দরকার।

ওষুধ হিসাবে দু'-চামচ করে (ছোট চায়ের চামচ) কডলিভার তেল দিনে দু'বার করে খাওয়াতে হবে। এছাড়াও বুকেতে জমে থাকা কফ তাড়াতাড়ি সরাবার জন্য টেরামাইসিন ক্যাপসুল একটি করে চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে। মোট পাঁচ দিন ক্যাপসুল পরপর খাওয়ানো দরকার। চিকিৎসার পরেও যদি কোন মেষ মরে যায় তবে তাকে মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলা দরকার। অনেকে মেষের লোম ও ছাল বিক্রির জন্য ছাড়িয়ে নেয়। এই কাজটি করা হলে খামার থেকে বেশ কিছুটা দূরে করতে হবে।

রোগের **প্রতিকার** হিসাবে বিশেষ কিছু করবার নেই। খামার পরিষ্কার রাখা এবং মেঝে যাতে স্যাঁতসেঁতে না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে আর শীতের সময় রাতে যাতে বেশি ঠাণ্ডা ওদের শরীরে না লাগে সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

**পথ্য ঃ** মেষ শক্ত ধরনের কোন খাদ্য খেতে চাইবে না। কাজেই কচি ঘাসের ডগা কেটে খাওয়াতে হবে। আর পিপাসা পেলে যাতে কিছুটা গরম ভাতের ফেন খায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। মাড় না থাকলে গরম বার্লি দেওয়া যাবে। তবে মাড় ও বার্লি যেটাই দেওয়া হোক না কেন প্রতি লিটারে আট গ্রাম পরিমাণ খাবার লবণ মিশিয়ে দিতে হবে।

## অ্যানথ্রাক্স

**কারণ ঃ** এক ধরনের জীবাণু এই রোগটির বাহক। যত প্রকারের ছোঁয়াচে রোগ রয়েছে তার মধ্যে অ্যানাথ্রাক্স সব থেকে বেশি ছোঁয়াচে। চিকিৎসা শাস্ত্রে ইংরেজি নামটাই সকলের কাছে পরিচিত, কারণ বাংলায় এর কোন নাম দেওয়া হয়নি।

যে মেষ এই রোগে আক্রান্ত হয় তার বাঁচার কোন আশাই থাকে না। পালনকারী কিছু বোঝবার আগেই মেষের মৃত্যু হয়। কারণ প্রতিটি অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত মেষ মাত্র চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা বেঁচে থাকে।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** রোগের প্রধান লক্ষণ হলো মলদ্বার দিয়ে কেবল রক্ত বের হতে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় নাক ও মুখ থেকেও রক্ত বের হচ্ছে। জিভ এবং গলা দুটোই ফুলে ওঠে। ফলে, ইচ্ছে থাকলেও মেষ কিছু খেতে পারে না। এভাবে কয়েক ঘণ্টা রোগ ভোগ করে শেষে মারা যায়।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** কোন ওষুধ নেই, কাজেই রোগের প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। তবে রোগের প্রতিরোধ করবার উপায় রয়েছে। আগে থাকতে টিকা দিলে রোগ আক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। যদি কোন মেষ অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয় তবে কোনরকম দেরি না করে খামার ঘর থেকে মেষটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তারপর সুস্থ মেষের দল ঘর থেকে বাইরে বের করে ডেটল অথবা ফিনাইল জল দিয়ে মেঝে ধুয়ে দেওয়া দরকার। তারপর ঘরের দরজা জানলার পাল্লা বন্ধ করে গন্ধক গুঁড়ো পুড়িয়ে ধোঁয়া দিতে হবে। তারপর সাত ঘণ্টা বাদে ঐ ঘরে মেষের দলকে রাখা চলবে।

যেসব মেষ রোগে আক্রান্ত হয়নি এদের তিন থেকে চার দিন মাঠে চরা বন্ধ রাখতে হবে। মৃত মেষকে গভীর গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া উচিত। অর্থের লোভে মেষের লোম অথবা চামড়া সংগ্রহ করা উচিত নয়। কারণ লোম থেকে রোগ খামারে ছড়াতে পারে।

**পথ্য ঃ** মেষ মোটেই খেতে পারে না। কাজেই পথ্যের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবে পিপাসা পেলে জল পান করতে পারে। কাজেই মুখের কাছে কোন পাত্রে জল রাখা দরকার। তবে ঐ পাত্র পরে ব্যবহার করা চলবে না।

## রিন্ডারপেস্ট

**কারণ ঃ** এক ধরনের ভাইরাস এদের শরীরে প্রবেশ করলে তবেই মেষ রিন্ডারপেস্ট রোগে আক্রান্ত হয়। পুকুর-ডোবার জল অথবা মাঠে চরবার সময় ঘাসের সঙ্গে রোগের ভাইরাস মেষের শরীরে প্রবেশের সুযোগ পায়। এই রোগে আক্রান্ত হলে শতকরা হিসাবে ৮০টি মেষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। মেষের মলের মাধ্যমে রোগটি সুস্থ মেষের পালের মধ্যে ছড়াতে সাহায্য করে।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** রোগের লক্ষণ খুবই সাধারণ, পেট খারাপ বলে মনে হবে। পাতলা মল পিচকারির মতো বেগে বের হয়। মল থেকে খুবই খারাপ গন্ধ বের হয়। এর সঙ্গে মেষের দেহের তাপমাত্রা ভীষণ বেড়ে যায়। এভাবে দেহের উত্তাপ বেড়ে যাওয়াটাই রিন্ডারপেস্ট রোগের বিশেষ লক্ষণ হিসাবে ধরা হয়। মেষ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে পাঁচ থেকে ছয় দিন। তারপরেই মারা যায়।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** রোগের শুরুতেই এবং বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হওয়া ছাড়া আর কোন বিশেষ ওষুধ নেই। রোগে আক্রান্ত সব মেষ একটি ঘরে খামার থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকবে। রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে মেষগুলো বাঁচবে সেগুলো বেশ কয়েক মাস ভালোভাবে পরিচর্যা করতে হবে। তবেই আগের মতো স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। যেগুলো মারা যাবে এদের হয় পুড়িয়ে অথবা মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিতে হবে।

**রোগের প্রতিকার ঃ** আগাম টিকা দিলে অবশ্যই রোগ আক্রমণের ভয় থাকে না। আর রোগ দেখা দিলে দলের সুস্থ মেষের কয়েকদিন মাঠে চরানো এবং বাইরের

পুকুর-ডোবার জল পান করতে না দেওয়াই ভালো। এতে রোগের বিস্তার ঘটে না। খামার ঘর থেকে সব মেষকে বাইরে বের করে দিয়ে মেঝে ভালোভাবে ফিনাইল জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া এবং পর পর তিন দিন ঘরে গন্ধক পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলে জীবাণুমুক্ত হয়।

**পথ্য ঃ** কচি ঘাস, কচি জামপাতা, কচি বাঁশপাতা এবং সামান্য পরিমাণে গমের ভুসি দিতে পারা যায়। মেষ জল পান করতে চাইলে ঠাণ্ডা পরিষ্কার জলে ১২ গ্রাম খাবার লবণ এবং ৫০ গ্রাম আখের গুড় মিশিয়ে দিতে হবে। সুস্থ না হওয়া অবধি এভাবে পথ্য দিয়ে যেতে হবে। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, যদি পশু চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ এবং সুবিধা থাকে তবে সেক্ষেত্রে দেরি না করে পরামর্শ অবশ্যই নেওয়া দরকার। এতে রোগে আক্রান্ত মেষ বেঁচে যেতে পারে এবং খামারীও লোকসানের হাত থেকে রেহাই পাবে।

## পেট ফাঁপা অথবা গ্যাসে পেট ফোলা

**কারণ ঃ** বেশি পরিমাণে খাবার ফলে হজম ঠিক মতো হয় না এবং বাতাস বা গ্যাস জমার ফলে পেট ফুলে যায়। বর্ষার সময় এই রোগটা বেশি হয়। কারণ ঐ সময় জলা জায়গায় ঘাস জন্মায় প্রচুর। রসাল ঘাস পেট ভরে খেয়ে ফেলে। এটা মোটেই ছোঁয়াচে রোগ নয়। এমনকি অসুস্থ মেষ যদি পাতলা মল ত্যাগ করে তাহলেও খামারে দলের সঙ্গে রাখলে কোন ক্ষতি হয় না।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** পেটের বাঁ দিকটায় মাঝ বরাবর বেশ ফুলে ওঠে। মেষের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। যদি পেটে যন্ত্রণা হয় তবে মাঝে মাঝে চিৎকার করে ডেকে ওঠে। শরীরে কষ্টের জন্য বহুক্ষেত্রে মেষ ছটফট করতে থাকে। খাবার ইচ্ছে একদম থাকে না। যদি দলের সঙ্গে মাঠে যায় কেবল ঘুরে বেড়ায়, ঘাসে মুখ দেয় না।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** মোট তিনটি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের নাম দেওয়া হচ্ছে। যে কোন একটি প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে। ওষুধ তিনটি হচ্ছে—

(১) হারবোগ্যাসটিন,

(২) বলোটোসিল এবং

(৩) রমেনটন।

কতটা পরিমাণে এবং কিভাবে খেতে হবে সেটা ওষুধের গাঁয়ে লেখা থাকে। অবশ্য দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলে সব কিছু ভালভাবে বুঝিয়ে দেবে।

গ্রাম অঞ্চলে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র বহু দূরে থাকে, আবার ওষুধের দোকানে ওষুধটি পাওয়া গেল না। সেক্ষেত্রে কবিরাজী ওষুধ প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া যায়। এই ওষুধ বাড়িতে খুবই কম খরচে তৈরি করা যেতে পারে। কিভাবে তৈরি করা হবে প্রথমে উপাদানের নাম ও পরিমাণের তালিকা দিয়ে তারপর প্রস্তুত করবার নিয়ম উল্লেখ করা হবে।

### তালিকা

| উপাদানের নাম | পরিমাণ |
|---|---|
| সোরা (গুঁড়ো) | ১৫ গ্রাম |
| যোয়ান ( ” ) | ১৫ গ্রাম |
| গোলমরিচ ( ” ) | ১০ গ্রাম |
| শুঁঠ ( ” ) | ১২ গ্রাম |
| পিপুল ( ” ) | ১০ গ্রাম |
| পিপারমেন্ট (দানা) | ১৫০ মিলি গ্রাম |

সব উপাদানগুলো ভালোভাবে গুঁড়ো করে ১০০ মিলিলিটার পরিষ্কার জলে মিশিয়ে মেষকে খাইয়ে দিতে হবে। পাতলা মল ত্যাগ করবে দু' থেকে তিন বার এবং পেটের ভিতরে জমে থাকা গ্যাসও বেরিয়ে যাবে। মেষ সুস্থ বোধ করবে। দু' থেকে তিন দিন মেষকে কম খাবার দিতে হবে। আর সুষম খাদ্য তিন দিন দেওয়া চলবে না।

**পথ্য ঃ** মেষ নিজের থেকেই কিছু খেতে চাইবে না। কারণ খিদে মোটেই থাকবে না। তবে পিপাসা পেলে ঠাণ্ডা পাতলা বার্লি সামান্য লবণ মিশিয়ে দেওয়া যাবে।

## পশমে উকুন বা পোকার আক্রমণ

**কারণ ঃ** গৃহপালিত পশুদের চামড়ায় উকুন বা পোকার আক্রমণ ঘটে। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। তবে সব পশুর শরীরে উকুনের আক্রমণ ঘটবে সেটাও ঠিক কথা নয়। মাঠে চরবার সময় অন্য পশুর কাছ থেকে অপরের শরীরে উকুন আশ্রয় নেয়। এরপর সেই পশুটির মাধ্যমে এক সঙ্গে থাকার ফলে দলের অন্যান্য পশুদের মধ্যে একে একে ছড়িয়ে পড়ে।

উকুন হচ্ছে পরজীবী জীব। অপরের দেহে আশ্রয় নেয় এবং তার শরীর থেকে রক্ত চুষে খেয়ে বেঁচে থাকে। মেষের ক্ষেত্রে ওপরের ঘন লোম ভেদ করে চামড়ায় আশ্রয় নেয়। তারপর তাড়াতাড়ি বংশ বাড়াতে থাকে। তখন দেহের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** প্রথম মুখে যখন একটি অথবা দুটি উকুন মেষের শরীরে আশ্রয় নেয় তখন মেষ যেমন বুঝতে পারে না তেমনি পালনকারীরও ধরবার ক্ষমতা থাকে না। তবে দিন কতক যাবার পর যখন ওরা ডিম পেড়ে বংশ বাড়িয়ে ফেলে এবং ছোট বড় উকুনের দল দেহের নানা জায়গায় কামড়ে রক্ত চুষে খেতে থাকে তখন মেষ অস্থির হয়ে ওঠে, দেহ জ্বালা করে এবং সব জায়গায় চুলকায়। তখন মেষ সুযোগ পেলে বাঁশের খুঁটি, দেওয়াল, বাগানের বেড়া ইত্যাদি যা কিছু সামনে পায় তাতে গা ঘসতে থাকে। বারবার গা ঘসার ফলে বহু ক্ষেত্রে চামড়ায় ঘায়ের সৃষ্টি হয়। কোন রকম ব্যবস্থা না নিলে ঘায়ে পোকা হয়। দেহের তাপমাত্রা

সামান্য বেড়ে যায়। মাঠে চরে ঘাস খায়। সুষম খাদ্য খায় পেট ভরে। তবে শরীরে গতি লাগে না। ধীরে ধীরে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** চৌবাচ্চার জলে টিকসাফেন অথবা ম্যালেথিয়ান যেকোন একটি ভালোভাবে গুলে মেষকে দশ মিনিট ঐ জলে চুবিয়ে রাখতে হবে। তবে **মাথা এবং মুখ যেন জলের ওপরে থাকে**। নতুবা মেষের ক্ষতি হবে। যদি অসুবিধে হয় তবে ওষুধ মেশানো জল পিচকারির সাহায্যে মেষের সারা শরীরে ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। এমনভাবে ভেজানো দরকার যাতে মনে হয় বৃষ্টিতে ভিজে গেছে এবং সারা শরীর থেকে জল টপ্ টপ্ করে উকুন ঝরে পড়বে। এইভাবে প্রতিদিন একবার করে সকালের দিকে মেষকে ওষুধ জলে চোবাতে অথবা পিচকারির সাহায্যে ভিজিয়ে দিতে হবে। পরপর তিনদিন ওষুধ প্রয়োগ করলেই উকুন মরে যাবে। কতটা জলে কি পরিমাণে ওষুধ মেশাতে হবে সেটা ওষুধ বিক্রেতা জানিয়ে দেবে।

উকুনের ব্যাপারে আগাম **প্রতিরোধ ব্যবস্থা** হিসাবে খামার ঘর পরিষ্কার রাখতে হবে। ঘরের দেওয়ালে মাসে একবার করে জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটানো এবং মেষের পাল মাঠে চরাবার সময় অন্য দলের সঙ্গে যাতে না মেশে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

**পথ্য ঃ** রোগটা এমন কিছু গুরুতর নয় যে পথ্য হিসাবে বিশেষ কিছু দিতে হবে। তবে উকুনের দল বেশ কিছুদিন ধরে রক্ত খেতে থাকে বলে এদের শরীর থেকে উকুন তাড়িয়ে সামান্য বেশি পরিমাণে সুষম খাদ্য এবং খনিজ মিশ্রণ তিন সপ্তাহ খাওযালে দেহের ক্ষতি বা ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়।

## পেট খারাপ ও সাদা আমাশয়

**কারণ ঃ** তেমন কোন ক্ষতিকারক রোগ নয়। তাছাড়া একসঙ্গে থাকলে দলের অন্যান্য মেষেদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে না। গরম এবং বর্ষাকালে যে কোন বয়সের মেষের পেট খারাপ হতে পারে। গরমের সময় পুকুর-ডোবার অতীব নোংরা জল পান অথবা মাঠে তেমন ঘাস বা শাক-পালা না থাকায় সুষম খাদ্য বেশি পরিমাণে খাবার ফলে হজম হয় না। ফলে পেট খারাপ হয় এবং মেষ পাতলা মল ত্যাগ করে। বর্ষার সময় নর্দমার পচা জল পুকুর বা খালে পড়ে এবং সেই দূষিত জল পান করার ফলে পেট খারাপ হয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে পেট খারাপ থেকে মেষ সাদা আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে আমাশয় রোগটি ছোঁয়াচে। মলের সঙ্গে জীবাণু থাকে। সুতরাং মেষকে আলাদা রাখা দরকার।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** সাধারণ পেট খারাপ হলে মেষ বারবার পাতলা মল ত্যাগ করবে। এই সময় মলদ্বার দিয়ে পেটের জমে থাকা গ্যাস বের হতে পারে এবং সেই কারণে শব্দ হয়। মেষ জল ছাড়া বিশেষ কিছু খেতে চাইবে না। বারবার মল ত্যাগ করবার ফলে শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে যায়। তখন মেষ দাঁড়িয়ে না থেকে বসে পড়ে।

সাদা আমাশয় হলে, লক্ষণ সবই এক থাকে। কেবল পাতলা মলের সঙ্গে সাদা কফ বের হয়। প্রথম দিকে কয়েক বার মল পরিমাণে বেশি হলেও শেষ দিকে মলের পরিমাণ কমে এবং কফের ভাগটা বেড়ে যায়। কিছুক্ষেত্রে মেষের দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** যদি সাদা আম না থাকে অর্থাৎ সাধারণ পেট খারাপ হয় তাহলে সালফা গোয়াইডিন ট্যাবলেট এক সঙ্গে তিনটে করে সারা দিনে তিন বার খাওয়াতে হবে। বাচ্চাদের দুটো করে এক সঙ্গে তিন বার। তিন দিন এই হারে ওষুধ দিলে পেট খারাপ ভালো হয়ে যাবে।

সাদা আমাশয়ের ক্ষেত্রে ট্রাগ-৫০০ ট্যাবলেট সারা দিনে তিনটি করে মোট সাত দিন খাওয়াতে হয়। এছাড়াও দ্বিতীয় ওষুধ হিসাবে অ্যামিক্লিন প্লাস ৩টি করে চার বার—মোট ৭দিন খাওয়াতে হবে। ওষুধ ট্যাবলেটের আকারে থাকে। কাজেই গুঁড়ো করে পরিষ্কার কাঁচের বোতলে ২-৩ কাপ খাবার জলে গুলে খাওয়াতে হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ট্যাবলেট এক সঙ্গে দুটি করে দিনে তিন বার খাওয়ানো দরকার।

**পথ্য ঃ** পেট খারাপ হলে মেষকে ভাতের ঠাণ্ডা মাড় জল মিশিয়ে পাতলা করে সামান্য লবণ দিয়ে দু' দিন খাওয়াতে হবে। পরের দিন এর সঙ্গে সামান্য গমের ভুসি ও কচি ঘাস খাবে। তৃতীয় দিন মাঠে চরবে। সাদা আমাশয় হলে সাত দিন একই পথ্য দেওয়া দরকার। তারপর মেষ স্বাভাবিকভাবে দলের সঙ্গে মাঠে চরবে।

## পেটে কৃমির আক্রমণ

**কারণ ঃ** সব গৃহপালিত পশু, বিশেষ করে যারা মাঠে চরে ঘাস খায় এদের পেটে কৃমি আশ্রয় নিতে পারে। কৃমিতে কোন পশু আক্রান্ত হলে পালনকারীকে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তার কারণ মলের সঙ্গে প্রচুর কৃমির ডিম বের হয় এবং খামারে এক সঙ্গে থাকার ফলে পানীয় জল অথবা খাদ্যের মাধ্যমে অন্য পশুদের পেটে চলে যায়।

যেসব পশুর পেটে কৃমি রয়েছে এরা মাঠে চরবার সময় মল ত্যাগ করে। তার মধ্যে বহু কৃমির ডিম থাকায় কয়েক দিন বাদে সুস্থ পশু ঘাস খাবার সময় সেই ডিম এদের পেটে চলে যায়। ডিম থেকে বাচ্চা বের হয় এবং পরে এরা বংশ বাড়াতে থাকে। অনেক সময় লাতাপাতা এবং আগাছার মাধ্যমেও কৃমির আক্রমণ ঘটে থাকে। কৃমির আক্রমণ যেকোন ঋতুতে হতে পারে।

**রোগ চেনার উপায় ঃ** মোট দু' রকমের কৃমির আক্রমণ হতে পারে। একটি দেখতে কেঁচোর মতো এবং অপরটি চ্যাপ্টা ফিতার আকারের। উভয়ের আক্রমণে মেষের পেট ঝুড়ির মতো বড় হতে থাকে। পরে পেটে গ্যাস জন্মায়। পাতলা মল ত্যাগ করে। খাবার হজম হয় না। শরীর দুর্বল হয়ে যায়। এবং পরে খাবার রুচি থাকে না।

**প্রতিকারের ওষুধ ঃ** কৃমির বহু ওষুধ রয়েছে। তবে খুবই প্রচলিত ওষুধ হচ্ছে হেকসাথেন। এছাড়াও ডিসটোডিন দিতে পারা যায়। কিভাবে খাওয়াতে হবে ওষুধের দোকানদার বলে দেবে।

একই ওষুধে রোগের **প্রতিরোধ** করা যায়। প্রতি বছর বর্ষার আগে ওষুধ খাওয়ালে কৃমির আক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। এছাড়াও প্রতিবার **প্রজননের পনের দিন আগে ভেড়ীকে অবশ্যই কৃমি নাশক ওষুধ** দেওয়া উচিত। তবে প্রজননের সময় ৬ মাস আগে ওষুধ খাওয়ালে কিছু করার দরকার নেই। কারণ ছ' মাস ওষুধের গুণ বজায় থাকে।

**পথ্য ঃ** মেষ সব কিছু এবং স্বাভাবিক খাদ্য খাবে।

## মেষের পশম সংগ্রহ

এই কাজটি প্রতিটি পালনকারীর নিয়ম মেনে করা দরকার। যদি না করা হয় তবে পশমের মান খারাপ হয় এবং মেষের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকে না জানার ফলে বছরের যে কোন ঋতুতে মেষের শরীর থেকে পশম সংগ্রহ করে নেয়। মনে রাখতে হবে, পশম মেষের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। দেহের পশম শীতে ঠাণ্ডা এবং গরমে তাপের হাত থেকে রক্ষা করে।

পাহাড়ী অঞ্চলে শীতের শেষে অথবা গরমের শুরুতেই পশম কেটে নিতে পারা যায়। কারণ ঐ সময় মাঠে কচি ঘাস জন্মায়। ফলে দেহের ক্ষতি বা ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়।

আবার বছরের মধ্যে যদি দু' বার পশম সংগ্রহ করা হয় তবে বর্ষার পর ভাদ্র মাসের শেষে কাজটি কবা উচিত। তবে সংগ্রহ করবার আগে দেখতে হবে এদের শরীরে কি পরিমাণে পশম রয়েছে। শীতের শেষে পশম কাটাব পর যদি ভালো পশম না গজায় তবে বর্ষার শেষে পশম সংগ্রহ করা ঠিক হবে না।

পশম সংগ্রহ করবার আগের দিন সকালে মেষের পাল নদী বা পুকুরে ভালো করে স্নান করাতে হবে। যতটা সম্ভব হাতে ঘসে ময়লা, কাদা, মাটি ইত্যাদি তুলে দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত। প্রয়োজন বুঝলে সাবান দিয়েও পরিষ্কার করতে পারা যায়।

এরপর মেষ সারাদিন মাঠে চরবে। যাতে রোদ এবং হাওয়াতে পশম শুকিয়ে যায়। খামার ঘরের মেঝে যেন পরিষ্কার থাকে। যাতে মেষেরা শুলে পশমে ময়লা না লাগে।

পরের দিন সকালে এদের খাবার আগে পশম কেটে নিতে হবে। ভেড়ী, খাসী এবং ভেড়া সবার ক্ষেত্রে একই নিয়মে পশম সংগ্রহ করার কাজ চলবে। যদি দলে অন্য জাত বা শ্রেণীর মেষ থাকে তবে এদের পশম আলাদাভাবে সংগ্রহ করে রাখা দরকার। কারণ পশম উন্নত মানের হলে দাম বেশি পাওয়া যাবে।

# মোরগ-মুরগী

## বিভিন্ন জাতের মোরগ-মুরগীর পরিচয়

মুরগী নানান জাতের হয়ে থাকে। একটি জাতের সঙ্গে অন্য জাতের কোন মিল থাকে না। এদের চেহারার মধ্যে গরমিল, মেজাজ এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন ভিন্ন। মাংস, ডিম প্রভৃতিতেও পার্থক্য থাকে।

বিভিন্ন দেশের অবহাওয়া বিভিন্ন রকম। সেজন্য আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী মুরগী পালন করতে হয়। শীতপ্রধান দেশের মুরগী গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পালন করা যায় না। আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মুরগী শীতপ্রধান দেশেও পালন করা যায় না। অবশ্য বর্তমানে বৈদ্যুতিক উন্নতির ফলে এই সমস্যা আর হয় না। অর্থ ব্যয় করতে পারলে যে-কোন দেশের মুরগী যে-কোন দেশেই পালন করা যায়। মুরগীর জাত বলতে আমরা সাধারণতঃ দুরকমই বুঝি—দেশী ও বিদেশী মুরগী। এদের মধ্যে আবার বিভিন্ন উপশ্রেণী আছে।

এখন দেশী ও বিদেশী কিছু মুরগীর বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে।

## ভারতীয় মুরগী বা দেশী মুরগী

ভারতের পল্লী অঞ্চলে অধিকাংশ বাড়িতে যে মুরগী পালন করা হয় সেই মুরগীর অধিকাংশই হচ্ছে দেশী মুরগী।

সাধারণ দেশী মুরগীর গায়ের রঙ অর্থাৎ পালকের রঙ এক রকমের নয়, আকার বা গঠনও এক প্রকার নয়।

দেশী মুরগী সচরাচর ধীরে ধীরে বড় হয়, অল্পসংখ্যক ডিম দেয় এবং এদের ডিমের আকারও ছোট হয়ে থাকে। যদিও দেশী মুরগী বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু এবং স্বভাবতঃ বিশেষ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত হয়ে থাকে এবং এরা ডিমেও ভালো তা দিতে পারে।

দেশী মুরগীদের মধ্যে নিম্নলিখিত জাতের মুরগী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) আসীল (Aseel), (খ) চাটগাঁয়ে (Chittagong) এবং (গ) ঘ্যাগাস (Ghagus) মুরগী।

### (ক) আসীল (Aseel) জাতের মুরগী

ভারতীয় দেশী মুরগীর মধ্যে এই জাতের মুরগীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই জাতের মুরগী এবং মোরগেরা লড়াই করতে বেশ দক্ষ। তাছাড়া এদের মাংসও বেশি হয় এবং মাংস খেতেও সুস্বাদু।

এই জাতের মুরগী স্বল্পসংখ্যক ডিম দেয় (poor layers) এবং এদের শরীরের বৃদ্ধিও ধীরে ধীরে ঘটে।

যদিও আসীল জাতের মুরগী ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই রয়েছে তবে এই জাতের সেরা সেরা মুরগী রয়েছে হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে এবং উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ এবং রামপুর জেলায়। আসীল জাতের মোরগ-মুরগী আমেরিকাতেও বর্তমানে পালন করা হচ্ছে।
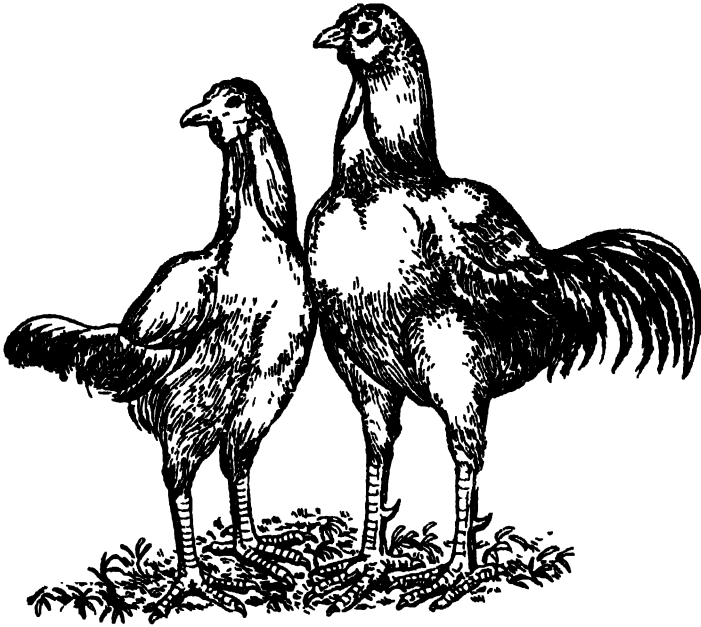
আসীল জাতের মোরগ ও মুরগী

## দৈহিক বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য দেশী মোরগ-মুরগী অপেক্ষা এই জাতের মোরগ-মুরগী আকারে বড়। এদের ঝুঁটি (comb) আকারে ছোট হলেও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। মুখ লম্বা ধরনের, গলার ফুল (wattle) খুব ছোট—নেই বললেই চলে। কানের লতিও (ear-lobe) এদের ছোট। এদের শরীরে পালকও কম। এদের রোঁয়া পালকও কম এবং পালকগুলো বেশ শক্ত। লেজ ছোট এবং ভূমি থেকে কয়েক সেন্টিমিটার থাকে।

মোরগের গড় ওজন : ৪·৫ কিলোগ্রাম।

মুরগীর গড় ওজন : ৩·৫ কিলোগ্রাম।

## (খ) চাটগেঁয়ে (Chittagong) মুরগী

বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলাতেই এই জাতের মুরগী বেশি পালিত হোত বা হচ্ছে বলে ঐ জেলার নামানুসারেই এই জাতের মুরগীর এই নাম রাখা হয়েছে। এই জাতের মোরগ-মুরগী খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং এদের মাংস খেতেও খুব সুস্বাদু।

এদের পালকের বর্ণ নানা রকমের হতে পারে। তবে সোনালী এবং ফিকে হলদে পালকযুক্ত মোরগ-মুরগীই বিশেষ জনপ্রিয়।
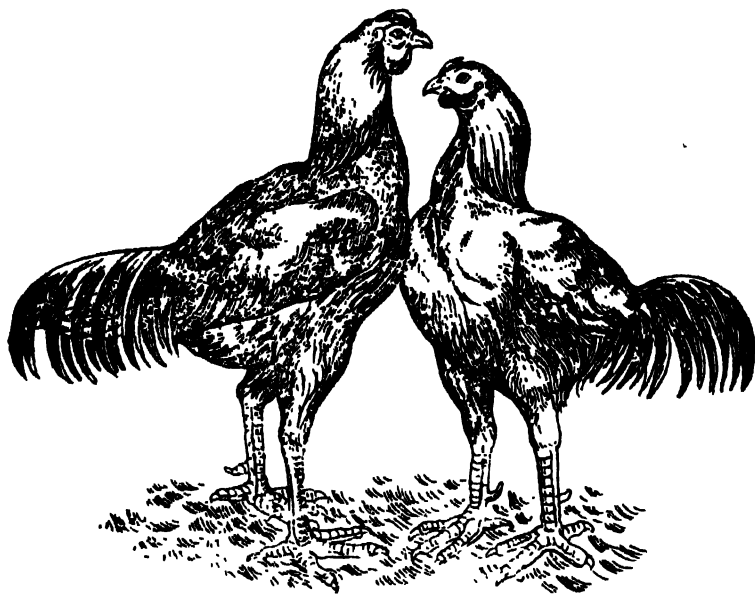
চাটগেঁয়ে মোরগ ও মুরগী

## দৈহিক বৈশিষ্ট্য

এদের ঝুঁটি (comb) একহারা এবং ছোট। কানের লতি (ear-lobes) এবং গলার ফুল (wattles) আকারে ছোট এবং লাল বর্ণযুক্ত। ঘাড় লম্বা, উচ্চতা অনুযায়ী দেহ আকারে ছোট। পাগুলো বেশ লম্বা এবং ভারী। হাঁটু থেকে পায়ের গাঁট পর্যন্ত (shanks) অংশটি হলুদ বর্ণযুক্ত এবং ওখানে কোন পালক নেই। বক্ষঃঅস্থির (breast-bone) কাছাকাছি অঞ্চলে পালক সন্নিবেশ ঘন নয়।

মোরগের গড় ওজনঃ প্রায় ৪·৫ কিলোগ্রাম।

মুরগীর গড় ওজনঃ ২·৫ থেকে ৪ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

## (গ) ঘ্যাগাস (Ghagus) মুরগী

এই জাতের মোরগ-মুরগী আকারে বড় এবং এদের গঠনও মজবুত। এই জাতের মোরগ বা মুরগীর মাংসও খেতে বেশ সুস্বাদু।

এই জাতের মুরগী ডিমও দেয় প্রচুর। তাছাড়া এই জাতের মুরগী ডিমে তা দিতে পারে ভালো। এই জাতের সেরা ধরনের মুরগী অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটক রাজ্যে অধিক সংখ্যায় প্রতিপালিত হয়ে থাকে।

## দৈহিক বৈশিষ্ট্য

ঝুঁটি ছোট একহারা অথবা মটর-ঝুঁটি (pea-shaped comb)। গলার ফুল (wattles) এবং কানের লতির (ear-lobes) আকারও ছোট। ঘাড় শিথিল ধরনের। পাগুলো লম্বা, সোজা ধরনের এবং মজবুত। পালকের রং সচরাচর লাল, তামাটে, কালো এবং ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে।

## উন্নত জাতের বিদেশী মুরগী

ভারতেও উন্নত জাতের বিদেশী মুরগী বিশেষ জনপ্রিয়। তাছাড়া ভারতীয় জল-আবহাওয়া এই ধরনের উন্নত জাতের বিদেশী মুরগী পালনের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। ভারতে বর্তমানে পর্যাপ্ত সংখ্যক উন্নত জাতের বিদেশী মুরগী পালন কবা হচ্ছে। তাছাড়া দেশী মুরগী বা মোরগের সঙ্গে উন্নত জাতের বিদেশী মুবগী বা মোবগের breed করিয়ে উন্নত ধরনের বর্ণ-সঙ্কর দেশী মুরগী সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

ভারতে প্রতিপালিত উন্নত জাতের বিদেশী মুবগীগুলোকে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ কবা হয়ে থাকে ঃ

(ক) আমেবিকান শ্রেণীর মুরগী (American Class),
(খ) ভূমধ্যসাগবীয় শ্রেণীব মুরগী (Mediterranean Class),
(গ) ইংলিশ শ্রেণীর মুরগী (English Class)।

### (ক) আমেরিকান শ্রেণীর মুরগী (American Class)

এই শ্রেণীব মুবগীর মধ্যে প্লাইমাউথ রক্ (The Plymouth Rock), রোড
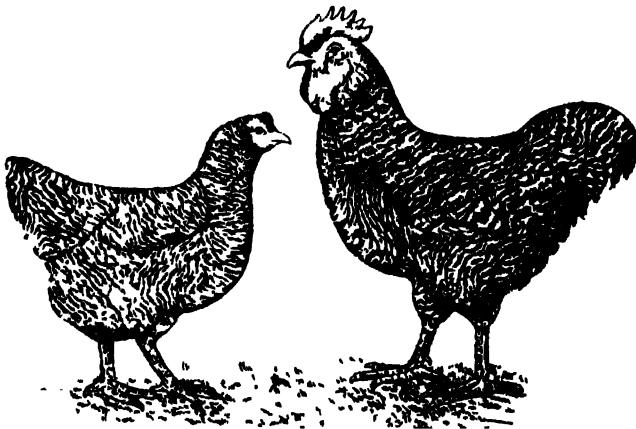
ডোরা দাগযুক্ত প্লাইমাউথ বক্ মোবগ ও মুবগী

আইল্যাণ্ড রেড (Rhode Island Red) এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার (New Hamphshire) জাতের মুরগীই ভারতে বিশেষ জনপ্রিয়।

আমেরিকান শ্রেণীর মোরগ বা মুরগীর হাঁটু থেকে পায়ের গাঁট পর্যন্ত অংশে (shanks) কোন পালক থাকে না। তাছাড়া ঐ অংশের রং হলদে হয়ে থাকে।

এই শ্রেণীর মোরগ মুরগীর কানের লতির (ear-lobes) রং লাল। এই জাতের মুরগীর ডিমের রং বাদামী (brown)। মাংস ও ডিম উভয়ের জন্যই আমেরিকান শ্রেণীর মুরগী পালন করা হয়ে থাকে।

## (খ) ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণীর মুরগী (Mediterranean Class)

এই শ্রেণীর মুরগীর মধ্যে হোয়াইট লেগহর্ন (White Leghorn) জাতের মুরগীই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ডিম উৎপাদনের জন্যই বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণীর মুরগী পালন করা হয়ে থাকে। ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণীর মুরগী আমেরিকান ও ইংলিশ শ্রেণীর মুরগী অপেক্ষা আকারে ছোট। এদের কানের লতির (ear lobes) রং সাদা। এদের ডিমের রং সাদা এবং ডিমের জন্য এই শ্রেণীর মুরগী পালন করা বিশেষ লাভজনক।

এই শ্রেণীর মুরগীর মধ্যে কর্নিশ (Cornish) এবং অস্ট্রালর্প (Australorp) জাতের মুরগীই বিশেষ জনপ্রিয়।

## (গ) ইংলিশ শ্রেণীর মুরগী (English Class)

যদিও বিশ্বের নানা অঞ্চলের প্রায় দুই শত জাতের মুরগী আমেরিকান স্ট্যাণ্ডার্ড অফ পারফেকশানে (American Standard of Perfection) তালিকাভুক্ত কবা হয়েছে, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার জাতের মুরগী পালন করাই লাভজনক প্রতিপন্ন হয়েছে ঃ

(১) হোয়াইট লেগহর্ন (White Leghorn) ;

(২) নিউ হ্যাম্পশায়ার (New hampshire) ;

(৩) প্লাইমাউথ রক (সাদা এবং দাগ-কাটা) (Plymouth Rock : White and Barred) ;

(৪) হোয়াইট কর্নিশ (White Cornish) ;

(৫) ব্ল্যাক অস্ট্রালর্প (Black Australorp) ;

(৬) রোড আইল্যাণ্ড রেড (Rhode Island Red)।

## ১। সাদা লেগহর্ন জাতের মুরগী (White Leghorn)

ডিম-পাড়া মুরগী হিসাবে এই জাতের মুরগী সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। এই জাতের মুরগী বেশি সংখ্যক ডিম দিয়ে থাকে। তবে এই জাতের মোরগ ও মুরগীর মাংসও খেতে তেমন সুস্বাদু বলা যায় না।

নানা রংয়ের লেগহর্ন মুরগী পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তবে সাদা রংয়ের লেগহর্ন (White Leghorn) মুরগীই সারা বিশ্বে বিশেষ জনপ্রিয় এবং সাদা রংয়ের লেগহর্ন মুরগীই অধিক সংখ্যায় পালন করা হয়ে থাকে।

ভারতের জলবায়ু সাদা লেগহর্ন জাতের মুরগী পালনের বিশেষ উপযোগী। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চল (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের কিছু অংশ, নদীয়া প্রভৃতি) এই জাতের মুরগী পালনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত বিবেচিত হয়ে থাকে। ভেজা মাটি (wet soils) বা পার্বত্য অঞ্চল এই জাতের মুরগী পালনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত বিবেচিত হয় না।

## উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(১) এই জাতের মুরগীর কানের লতির রং সাদা; (২) ডিমের রং সাদা; (৩) আকারের দিক থেকে এই জাতের মুরগী আমেরিকান ও ইংলিশ শ্রেণীর মুরগী
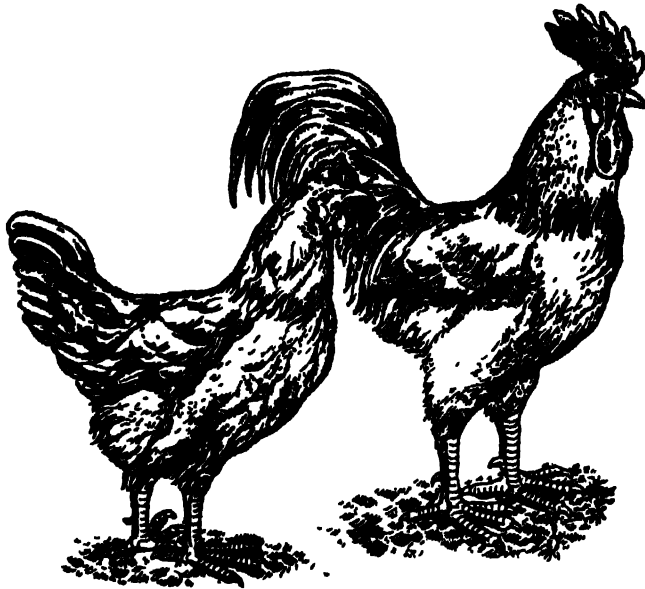
সাদা লেগহর্ন জাতের মোরগ ও মুরগী

অপেক্ষা ছোট; (৪) এদের ঝুঁটি হয় একহারা (single) নয়তো গোলাপ ঝুঁটি (rose comb) হবে।

## শরীর-সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ

এই জাতের মুরগীর দেহ অনেকাংশে খাড়া ধরনের এবং শরীরের উপরিভাগের গড়ন অর্থাৎ ঘাড় থেকে পিঠ এবং লেজ অনেকাংশে ধনুকের মতো বক্রতা ভাবযুক্ত। লেজটি সোজা হয়ে উঠে গেছে, ৪০ ডিগ্রী কোণের মতো হেলানো। পা লম্বা। এই জাতের মুরগীর কাঁধের দিক চওড়া আর লেজের দিক সরু হয়ে থাকে।

সাদা রংয়ের লেগহর্ন জাতের মুরগীর পালকগুলো সম্পূর্ণ সাদা হবে। পালকে অন্য কোন রংয়ের দাগ থাকে না। গায়ের চামড়ার বর্ণ হলদে। পায়ের রং-ও ফিকে হলদে বর্ণের।

এই জাতের মুরগীর পালকের সন্নিবেশ ঘন, ওড়বার পালকগুলো (primary flights) আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। এরা ৬ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে উড়তে পারে। এরা সচরাচর খুব চঞ্চল প্রকৃতিযুক্ত হয়ে থাকে।

এই জাতের একঝুঁটিওয়ালা (single) মোরগের ঝুঁটি মধ্যম আকার বিশিষ্ট এবং খাড়া ধরনের হয়ে থাকে। করাতের দাঁতের ন্যায় ঝুঁটি—পাঁচটি তীক্ষ্ণাগ্র ফলক থাকে। মুরগীর ঝুঁটির প্রথম ফলকটি খাড়া থাকে, বাদ-বাকী চারটি ফলক একপাশে হেলে থাকে।

এই জাতের মুরগীরা উত্তেজনাপ্রবণ এবং চঞ্চল প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এরা সামান্য কারণেই বিচলিত বোধ করে, ছোটাছুটি করে, উড়ে পালাতে চায়। এই জাতের মুরগী অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই যৌবন (maturity) প্রাপ্ত হয়। ৫ মাস বয়ঃক্রম কাল থেকেই এই জাতের মুরগীরা সচরাচর ডিম দিতে শুরু করে থাকে। এরা বছরে গড়ে খুব কম করেও ১৮০ থেকে ২০০টি ডিম দিয়ে থাকে। খায় কম, কিন্তু ডিম দেয় বেশি। অন্য জাতের কোন মুরগী আনুপাতিক হারে এত কম খেয়ে, এই জাতের মুরগীর মতো বেশি সংখ্যক ডিম দিতে সমর্থ নয়। ডিমের জন্য লেগহর্ন জাতের মুরগী পালন করাই বিশেষ সুবিধাজনক। কিন্তু এদের ওজন কম, মাংসও দেশী মুরগীর মতো তত সুস্বাদু না হওয়ায় কেবল মাংসের জন্য এই জাতের মুরগী পালন সুবিধাজনক নয়।

### ওজন

এই জাতের মোরগের standard ওজন গড়েঃ ৩·৭ কিলোগ্রাম।
এই জাতের মুরগীর standard ওজন গড়েঃ ৩ কিলোগ্রাম।

## ২। রোড আইল্যাণ্ড রেড (Rhode Island Red)

ডিম অথবা মাংস—অর্থাৎ উভয়বিধ প্রয়োজনে এই জাতের মুরগী পালন করা সুবিধাজনক। দেশী মোরগ বা মুরগীর মতো এই জাতের মোরগ বা মুরগীর মাংস তেমন সুস্বাদু না হলেও বিদেশী জাতের অন্যান্য উন্নত জাতের মোরগ বা মুরগীর মাংস অপেক্ষা এই জাতের মোরগ বা মুরগীর মাংস সুস্বাদু হয়ে থাকে। এই জাতের মুরগী পর্যাপ্ত সংখ্যক ডিম দিয়ে থাকে।

ডিমের রং বাদামী, ডিমগুলো আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে থাকে। ভারতে যে সকল উন্নত জাতের মোরগ-মুরগী বর্তমানে প্রতিপালিত হচ্ছে তন্মধ্যে এই জাতের মোরগ-মুরগী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছে।

তাছাড়া এই জাতের মোরগ বা মুরগী বিশেষ কষ্টসহিষ্ণুও বটে। এরা ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র আবহাওয়া সহ্য করতে পারে।

### উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(১) Shank (হাঁটু থেকে পায়ের গাঁট)-এর রঙ হলুদ, (২) ঝুঁটি—একহারা

(Single) অথবা গোলাপ ঝুঁটি (Rose comb), (৩) কানের লতির রং লাল ও (৪) ডিমের রং বাদামী।

## শরীর-সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ

রোড আইল্যাণ্ড রেড জাতের মোরগ-মুরগীর পালকের রং ঘোর খয়েরি, উজ্জ্বল লাল—অনেকাংশে মেহগনি রংয়ের মতো। কেবলমাত্র ডানার আগায় অর্থাৎ পালকের নিচের দিকে, ডানার সহকারী পালকের উপরাংশে এবং লেজের কাস্তে পালক, প্রধান পালক এবং লেজ-আবরকের পালকের রং কালো। কোন কোন মুরগীর গলার নিচের দিকের পালকের রং ঈষৎ কালো হতে পারে—তবে অন্যান্য পালক অর্থাৎ অধিকাংশ পালকের অভ্যন্তর ভাগের রং উজ্জ্বল খয়েরি, লাল বা মেহগনি রংয়ের। পালকসমূহের বেশি অংশের রং লাল হওয়ায় এই জাতের মোরগ-মুরগীর নামকরণ হয়েছে রোড আইল্যাণ্ড রেড। এদের ঠোঁটের রং লাল। কানের লতি আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু লতির রং লাল।

যদিও রোড আইল্যাণ্ড রেড মুরগীর দু'রকম ঝুঁটি হয়—একহারা (Single) এবং গোলাপ ঝুঁটি (Rose comb), তবে আমাদের দেশে সচরাচর একহারা ঝুঁটিযুক্ত রোড আইল্যাণ্ড রেড মুরগীই অধিক সংখ্যায় পালন করা হয়ে থাকে।

রোড আইল্যাণ্ড রেড মুরগী ডিমে ভালো তা দেয়। লেগহর্ন মুরগীর তুলনায় এই জাতের মুরগী একটু বেশি খায়। দেশী মুরগীর সঙ্গে রোড আইল্যাণ্ড রেড মোরগের breed করিয়ে উন্নত জাতের বর্ণ-সঙ্কর মুরগী সৃষ্টি করা সম্ভব।

রোড আইল্যাণ্ড রেড জাতের মোরগ-মুরগীরা দেখতে বেশ মোটাসোটা, বুক ও পেট অন্যান্য মোরগ-মুরগীদের অপেক্ষা চওড়া।

আসাম, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মতো বর্ষাপ্রধান আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত অঞ্চল এই জাতের মোরগ-মুরগী পালনের পক্ষে উপযুক্ত। দার্জিলিংয়ের মতো ঠাণ্ডা জায়গাও এই জাতের মুরগী পালন করার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

ডিম প্রদানের সংখ্যা লেগহর্ন জাতের মুরগী অপেক্ষা কিছু কম হলেও এই জাতের প্রতিটি মুরগী বছরে প্রায় গড়ে ১৮০টি ডিম দিয়ে থাকে। কোন কোন রোড আইল্যাণ্ড রেড মুরগী লেগহর্ন মুরগীর সমতুল্য ডিম দিয়ে থাকে।

### ওজন

এই জাতের মোরগের standard ওজন ঃ ৩·৮ কিলোগ্রাম।

এই জাতের মুরগীর standard ওজন ঃ ৩ কিলোগ্রাম।

## ৩। কালো মিনোর্কা (Black Minorca)

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মুরগীদের মধ্যে এই জাতের মুরগীই আকারে সর্বাপেক্ষা বড়। তবে পূর্বাপেক্ষা এই জাতের মুরগীর ডিম উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার জন্য এই জাতের মুরগীর জনপ্রিয়তা বর্তমানে ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

স্পেন দেশের সন্নিকটস্থ মিনোর্কা দ্বীপের নামানুযায়ী এই জাতের মোরগ-মুরগীর নাম কালো মিনোর্কা রাখা হয়েছে।
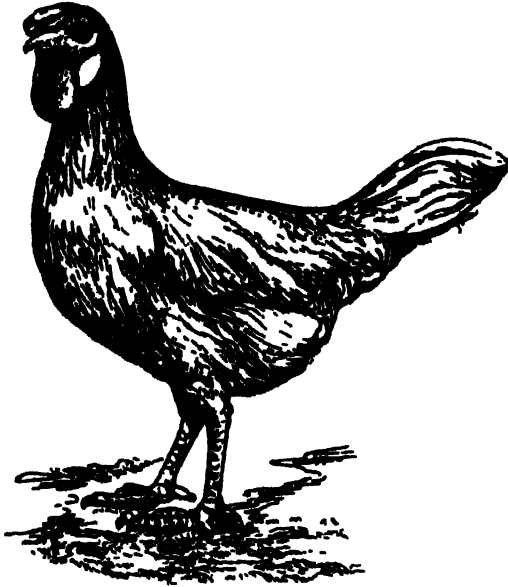
কালো মিনোর্কা জাতের মোরগ

## উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(১) এই জাতের মুরগীর ডিম আকারে খুব বড় এবং ডিমের রং সাদা হয়ে থাকে ; (২) Shank (অর্থাৎ হাঁটু থেকে পায়ের গাঁট)-এর রং শ্লেটবর্ণ; (৩) ঝুঁটি একহারা (Single) বা গোলাপ ঝুঁটি (Rose comb) এবং (৪) কানের লতির রং সাদা।

## শরীর-সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ

এক ঝুঁটিওয়ালা কালো মিনোর্কাই বিশেষ জনপ্রিয়। এই জাতের মোরগ-মুরগী লেগহর্নের মতোই দেখতে সুন্দর এবং এদের গড়নও খাড়া ধরনের। পালকের রং কালো। পায়ের রং শ্লেটের মতো। এই কারণে এই জাতের মোরগ-মুরগীর নাম Black Minorca রাখা হয়েছে। এদের পিঠ দীঘল—কাঁধ থেকে লেজ পর্যন্ত ঢালু। মাথার ঝুঁটি একহারা বা গোলাপ-ঝুঁটি। পালকসমূহের রং কালো অথচ কানের লতির রং সাদা হওয়ায় এই জাতের মুরগী দেখতে বেশ সুন্দর হয়ে থাকে। এই জাতের মুরগী ডিমও দেয় প্রচুর—অর্থাৎ, লেগহর্নের পরেই এদের স্থান।

এ জাতের মুরগী ডিমে তা দিতে চায় না। রোদে বা গরমে খুব কষ্ট হয়। ঠাণ্ডা বা আর্দ্র অঞ্চলই এই জাতের মুরগী পালনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত বিবেচিত হয়ে থাকে।

### ওজন

এই জাতের মোরগের standard ওজন ঃ ৩·৬ কিলোগ্রাম।
এই জাতের মুরগীর standard ওজন ঃ ৩ কিলোগ্রাম।

## ৪। প্লাইমাউথ রক (Plymouth Rock)

আমেরিকান শ্রেণীর মোরগ-মুরগী বিশেষ জনপ্রিয়। এই জাতের মোরগ-মুরগী আকারে বড় এবং এদের মাংসের qualityও উত্তম বিবেচিত হয়ে থাকে। এই
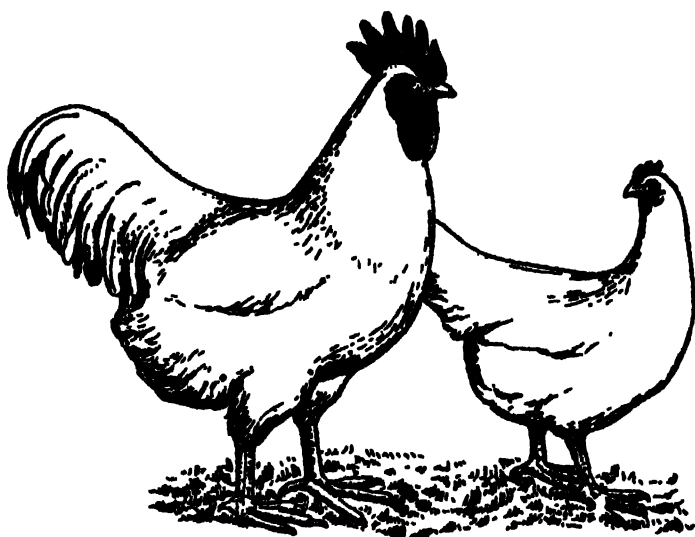
সাদা প্লাইমাউথ জাতের মোরগ ও মুরগী

জাতের মুরগী বছরে গড়ে প্রায় ১৬০ থেকে ১৮০টি ডিম দিয়ে থাকে। অতএব ডিম ও মাংস অর্থাৎ উভয়বিধ কারণেই এই জাতের মুরগী পালন করা সুবিধাজনক।

দেশী মুরগীর সঙ্গে এই জাতের মোরগের breed করিয়ে উন্নত জাতের বর্ণ সঙ্কর মোরগ-মুরগী বর্তমানে ভারতবর্ষে অধিক সংখ্যায় উৎপাদক করা হচ্ছে। সাধারণ দেশী মুরগী upgrade করার ক্ষেত্রে প্লাইমাউথ মোরগ ব্যবহার করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে।

এই জাতের মোরগ-মুরগী দু'প্রকার হয়ে থাকে—(১) সাদা প্লাইমাউথ (White Plymouth Rocks) ও ডোরা দাগযুক্ত প্লাইমাউথ রক (Barred Plymouth Rocks)।

### উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(১) ডিমের রং বাদামী, (২) কানের লতির রং লাল, (৩) Shank (হাঁটু থেকে

পায়ের গাঁট পর্যন্ত অংশ)-এর রং হলদে, (৪) ঝুঁটি—একহারা (Single) অথবা গোলাপ ঝুঁটি (Rose Comb)।

**(১) সাদা প্লাইমাউথ রক (White Plymouth Rocks)**ঃ পালকসমূহ ধবধবে সাদা, অনেকাংশে সাদা লেগহর্ন জাতের মুরগীর ন্যায়। কিন্তু সাদা প্লাইমাউথ রকের কানের পাটি হোয়াইট লেগহর্ন মুরগী অপেক্ষা ছোট, পিঠ অপেক্ষাকৃত চওড়া। ওজন লেগহর্ন অপেক্ষা বেশি। ডিম হোয়াইট লেগহর্ন অপেক্ষা কম, ডিমের রং বাদামী হলদে বা ঈষৎ লালচে।

**(২) ডোরা দাগযুক্ত প্লাইমাউথ রক (Barred Plymouth Rocks)**ঃ এর পালকের রং সাদা ও কালোয় ডোরা কাটা দাগ। মোরগের পালকের কালো ও সাদা
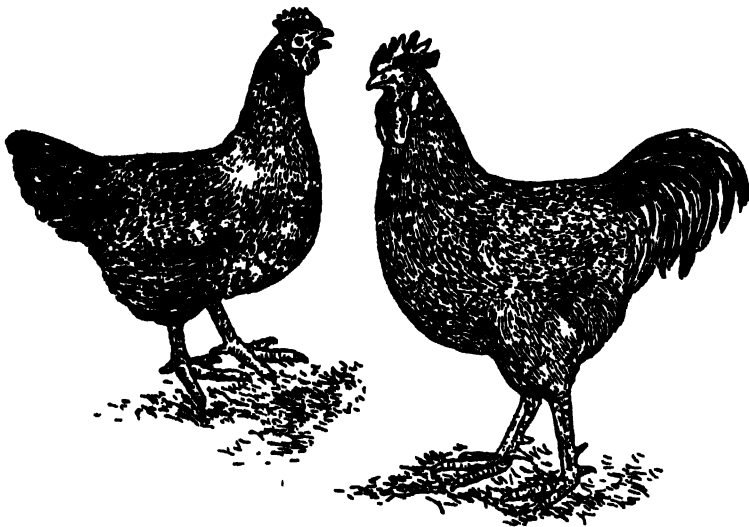
ডোরা দাগযুক্ত প্লাইমাউথ রক মোরগ ও মুরগী

ডোরা দাগগুলো সমান চওড়া, মুরগীর পালকের সাদা রংয়ের ডোরাগুলো চওড়ায় কালো রংয়ের ডোরা দাগগুলোর প্রায় অর্ধেক।

## বিশদ বিবরণ

প্লাইমাউথ রক জাতের মোরগ-মুরগীরা সকল প্রকার জলবায়ু সহ্য করতে পারে। অতএব দেশের সকল অঞ্চলেই এ জাতের মোরগ-মুরগী অনায়াসে পালন করা যায়।

## ওজন

এই জাতের মোরগের standard ওজনঃ ৪·২ কিলোগ্রাম।

এই জাতের মুরগীর standard ওজনঃ ৩·২ কিলোগ্রাম।

## ৫। অস্ট্রালর্প (Australorp)

এই জাতের মোরগ-মুরগী অধিক সংখ্যায় অস্ট্রেলিয়াতে পালন করা হয়ে থাকে বলে এই জাতের মোরগ-মুরগীর নাম অস্ট্রালর্প রাখা হয়েছে।
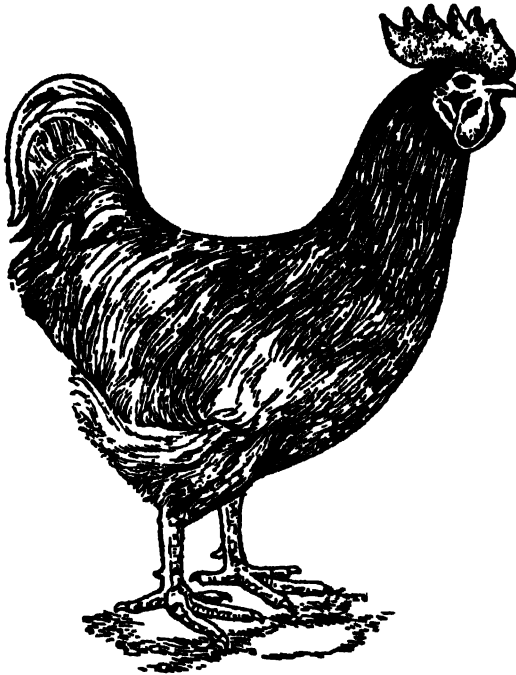
অস্ট্রালর্প জাতের মোরগ

ডিম তথা মাংসের জন্য মোরগ-মুরগী পালন করতে হলে এই জাতের মুরগী ভারতেও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশেষ করে আর্দ্র অঞ্চল (অর্থাৎ যে সকল জায়গায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়—বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম) এই জাতের মোরগ-মুরগী পালনের পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত হয়ে থাকে।

মূলতঃ এই জাতের মুরগী ইংলিশ শ্রেণীর অর্পিংটনের বংশজাত। বর্তমানে অস্ট্রালর্প জাতের মুরগী ভারতের অনেক স্থানে প্রতিপালন করা হয়ে থাকে।

### উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-

(১) ঝুঁটি—একহারা (Single), (২) কানের লতির রং—লাল, (৩) ডিমের রং—বাদামী, (৪) Shank (হাঁটু থেকে পায়ের গাঁট)-এর রং কালো অথবা শ্বেতবর্ণ।

### বিশদ বিবরণ

এই জাতের মোরগ-মুরগীর দেহ খাড়া ধরনের, পিঠ লম্বা, লেজের দিক ক্রমশঃ নিচু। ঠোঁট তুলনামূলকভাবে একটু বেশি লম্বা, কানের লতি ছোট, দেখতে বাদামের

মতো। চামড়ার রং সাদা। পালকের রং উজ্জ্বল ও সবুজ আভাযুক্ত কালো বা সবুজ-কালো। পায়ের রং কালো বা শ্লেটবর্ণ।

ব্যয়ের তুলনায় এই জাতের মোরগ-মুরগীর দৈহিক বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি ঘটে। শীতকালে এই জাতের মুরগী তুলনামূলকভাবে বেশি ডিম দিয়ে থাকে।

### ওজন

এই জাতের মোরগের standard ওজন : ৩·৮ কিলোগ্রাম।

এই জাতের মুরগীর standard ওজন : ৩ কিলোগ্রাম।

## ৬। লাইট সাসেক্স (Light Sussex)

প্রাথমিক বিচারে এই জাতের মোরগ-মুরগী হচ্ছে মাংসল জাতীয় (meat type), কিন্তু এই জাতের মুরগীরা (বর্তমানে বিশেষ Strain অনুযায়ী) পর্যাপ্ত সংখ্যক ডিম দিচ্ছে।
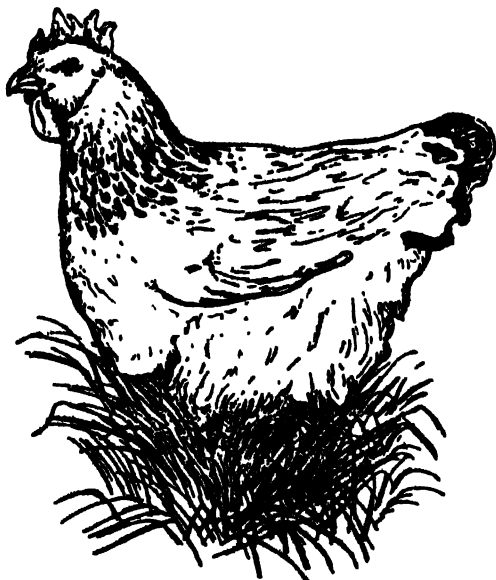
লাইট সাসেক্স জাতের মুরগী

ইংলণ্ডের সাসেক্স অঞ্চলের নামানুযায়ী এই জাতের মোরগ-মুরগীর নামকরণ হয়েছে।

### উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

সাধারণ মোরগ-মুরগী অপেক্ষা আকারে বড়। দেহ লম্বা ধরনের। বুকের হাড় বিশেষ সুগঠিত। ঘাড়ের অংশ তুলনামূলকভাবে চওড়া। মাথার ঝুঁটি একহারা (Single) এবং আকারে ছোট। কানের লতি ছোট। গায়ের চামড়া সাদা।

## বিশদ বিবরণ

পালকের রং সাদা; তবে গলার পালকগুলো কালো-সাদায় মেশানো—অনেকাংশে ডোরা ডোরা দাগের মতো দেখতে—গলার ঐ কালো রংয়ের জন্য মুরগীগুলো দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। লেজের পালকের প্রান্তগুলোতেও কালো দাগ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই জাতের মুরগী গড়ে বছরে ১৫০ থেকে ১৭০টি ডিম দিয়ে থাকে।

## ওজন

এই জাতের মোরগের standard ওজন ঃ ৯ পাউন্ড বা ৪ কেজি।

এই জাতের মুবগীর standard ওজন ঃ ৭ পাউণ্ড বা ৩·২ কেজি।

## ৭। নিউ হ্যাম্পশায়ার (New Hampshire)

এই নতুন জাতের মোরগ-মুরগী নিয়ে আমেরিকায় বিশেষ গবেষণা চলছে। ভারতেও এই জাতের বহু মোরগ-মুরগী বর্তমানে প্রতিপালন করা হচ্ছে। এই জাতের মোরগ-মুরগী অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু হয়ে থাকে। এই জাতের মুরগী পর্যাপ্ত সংখ্যক বাদামী বংয়েব ডিম দিয়ে থাকে। মাংস তথা ডিমের জন্য এই মুরগী পালন করা হয়ে থাকে। আমেরিকায় এই জাতেব মোরগ-মুরগী অত্যন্ত জনপ্রিয়।
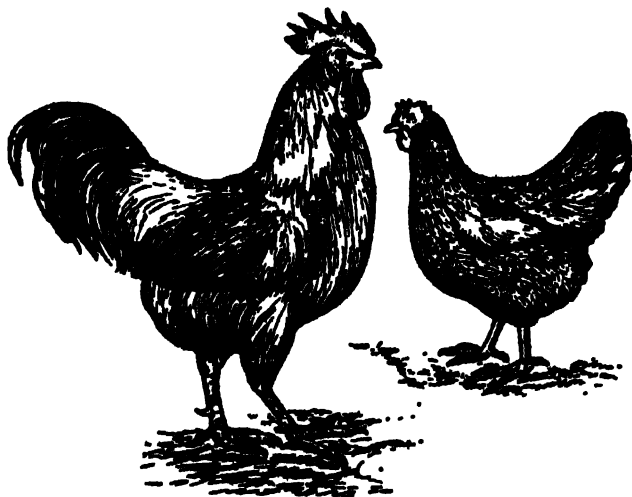
নিউ হ্যাম্পশায়ার জাতের মোরগ ও মুরগী

## উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

রোড আইল্যান্ড রেড জাতের মুরগী breed করিয়ে এই জাতের মোরগ-মুরগী উৎপন্ন করা হয়েছে বলে রোড আইল্যাণ্ড রোড জাতের মোরগ-মুরগীর সঙ্গে এই জাতের মোরগ-মুরগীর চেহারাগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

### বিশদ বিবরণ

এই জাতের মোরগ-মুরগীর পালকের রং তামাটে লাল এবং বেশি উজ্জ্বল। মুরগীর (hen) কাঁধের নিচের পালকগুলোর শেষাংশসমূহ কালো বর্ণের। পায়ের (Shank) রং হলদে। গায়ের চামড়ার রং হলদে। মাথায় ঝুঁটি একহারা (Single)। এই জাতের মুরগীর বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ৩ মাস বয়সের বাচ্চার ওজন ২ কিলোগ্রাম হয়ে থাকে। ৫ মাস বয়স থেকেই এই জাতের মুরগী ডিম পাড়তে শুরু করে। অত্যন্ত গরম বা স্যাঁত-স্যাঁতে আবহাওয়া এই জাতের মোরগ বা মুরগী পালনের উপযুক্ত নয়।

### ওজন

এই জাতের মোরগের standard ওজন : ৩·৮ কিলোগ্রাম।
এই জাতের মুরগীর standard ওজন : ২·৭ কিলোগ্রাম।

## ৮। সাদা প্লাইমাউথ রক এবং সাদা কর্নিশ (White Plymouth Rock and White Cornish)

এই দুই জাতের মোরগ-মুরগীর সংমিশ্রণে জাত বর্ণসঙ্কর মোরগ (Cross breed) বর্তমান ভারতবর্ষে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে। সাদা প্লাইমাউথ রক মোরগের সঙ্গে হোয়াইট কর্নিশ জাতের মুরগী এবং সাদা কর্নিশ জাতের মোরগের সঙ্গে সাদা প্লাইমাউথ জাতের মুরগীর breed করিয়ে উন্নত জাতের মোরগ-মুরগী সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

### ওজন

বর্ণ-সঙ্কর মোরগের standard ওজন : ৩·৬ কিলোগ্রাম।
বর্ণ-সঙ্কর মুরগীর standard ওজন : ২·৭ কিলোগ্রাম।

### বিভিন্ন জাতের মুরগীর পালকের রঙের বৈচিত্র্য

| শ্রেণী | জাত | পালকের রং |
|---|---|---|
| ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণী | (১) লেগহর্ন | কালো<br>নীল<br>তামাটে<br>সাদা<br>সোনালী ডানা যুক্ত<br>বাফ (Buff)<br>রূপালী |
| ” | (২) মিনোর্কা | কালো<br>সাদা<br>সোনালী ডোরা দাগযুক্ত |

| শ্রেণী | জাত | পালকের রং |
| --- | --- | --- |
| আমেরিকান শ্রেণী | (১) প্লাইমাউথ রক | রূপালী ডোরা দাগযুক্ত<br>কালো<br>বাফ্ (Buff)<br>সাদা |
| ,, | (২) রোড আইল্যাণ্ড রেড | লাল<br>সাদা<br>কালচে লাল |
| ,, | (৩) নিউ হ্যাম্পশায়ার | নানা বর্ণের |
| ইংলিশ শ্রেণী | (১) সাসেক্স | হালকা বাদামী<br>লাল<br>ছোপ দাগযুক্ত (speckaled) সাদা |
| | (২) কর্নিশ | কালো<br>রূপালী-ধূসর<br>বিচিত্র বর্ণের |

## মুরগীর দেহের বিভিন্ন অংশ

মুরগী পালন করতে হলে মুরগীর দেহের বিভিন্ন অংশ তথা শরীরের আভ্যন্তরীণ গঠন, কঙ্কাল, পরিপাকযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, মূত্রনিঃসরণ পদ্ধতি, প্রজননযন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা থাকা সঙ্গত।

**১। মুরগীর শরীরের বিভিন্ন অংশ এবং সেই সকল অংশের নাম ঃ** মুরগী নির্বাচন এবং রোগ প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে মুরগীর দেহের (বাইরের) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় ইত্যাদি জানার জন্য সর্ব প্রথমে মোরগ-মুরগীর বাইরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ করা একান্ত আবশ্যক।

১। মাথার ঝুঁটির ফলকের অগ্রভাগ (Points) ২। মাথার ঝুঁটি (Comb) ৩। ঝুঁটির ফলক (Blade) ৪। মাথা বা মস্তক (Head) ৫। মাথার ঝুঁটির ভিত্তি (Base) ৬। নাসারন্ধ্র (Nostril) ৭। চোখ (Eye) ৮। ঠোঁট বা চঞ্চু (Beak) ৯। গলার ফুল (Wattle) ১০। কান (Ear) ১১। মুখমণ্ডল (Face) ১২। কানের লতি (Ear lobe) ১৩। গলবেষ্টনী (Hackle) ১৪। গলবেষ্টনীর সম্মুখভাগ (Front of hackle) ১৫। কাঁধ (Shoulder) ১৬। স্কন্ধাবরণী (Cape) ১৭। পিঠ (Back) ১৮। পিঠের পশ্চাদ্ভাগ (Saddle of cock/cushion of hen) ১৯। ডানার অর্ধবৃত্ত (Semi-circle of the wings) ২০। ডানার সম্মুখভাগ (Front of the wings) ২১। বুক (Chest) ২২। ডানার আবরণী (Wing

coverts) ২৩। ডানার আবরণীর নিম্নস্তরের পালক (Seconderies) ২৪। ডানার প্রধান পালক (Primary coverts) ২৫। ঊরু (Thigh) ২৬। পা (Leg) ২৭। পায়ের নিম্নাংশের কাঠি (Spur) ২৮। গোঁড়ালির মাংসপিণ্ড (Ball of foot) ২৯। পায়ের আঙ্গুল (Toe) ৩০। নখ (Nail or claw) ৩১। জঙ্ঘা (Hock)
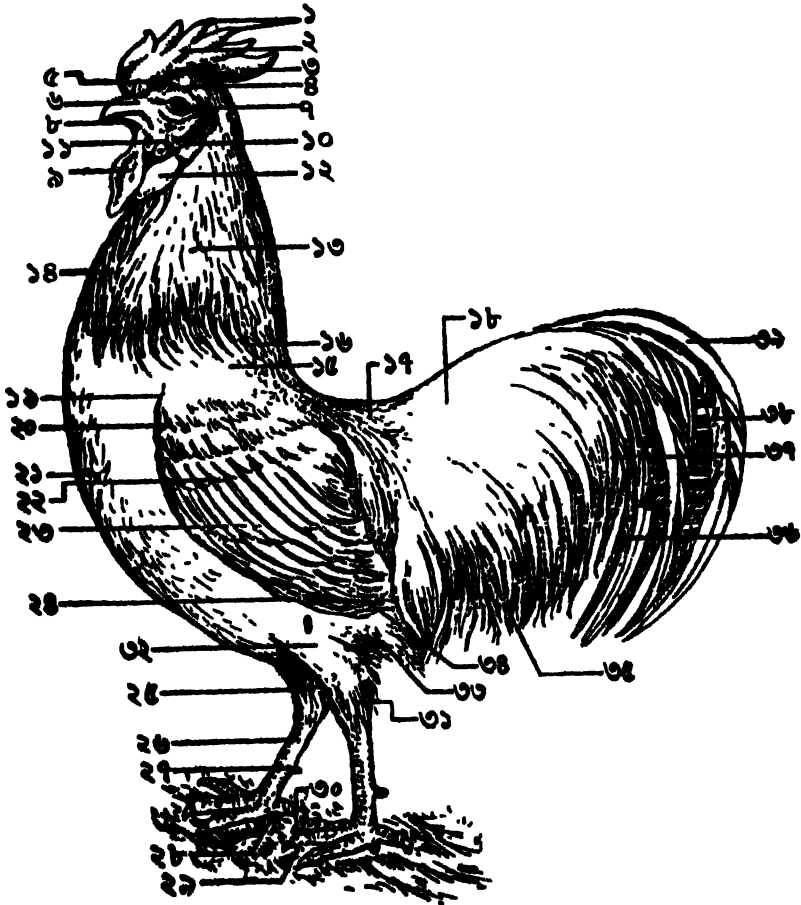
মুরগীর দেহের বিভিন্ন অংশ (বাহ্যিক)

৩২। সূক্ষ্ম পালক (Body feathers) ৩৩। রোঁয়া পালক (Fluff) ৩৪। উড়বার পালক (Primary flights) ৩৫। পিঠের পশ্চাৎভাগের আবরণীর সূক্ষ্ম পালক (Saddle feathers) ৩৬। লেজের আবরণী (Tail coverts) ৩৭। ছোট কাস্তে ধরনের পালক (smaller sickles) ৩৮। লেজের প্রধান পালক (Main tail feathers) ৩৯। লেজের কাস্তে ধরনের স্থূল পালক (Heavy sickles)।

## পালক

মুরগীর পালক তিন ধরনের।

১। **সূক্ষ্ম বা রোঁয়া পালক** (Filoplumes)**ঃ** সূক্ষ্ম পালক অত্যন্ত সরু। অনেকাংশে রোঁয়ার মতো মুরগীর দেহ থেকে চুলের ন্যায় বের হয়ে থাকে। কিন্তু এই সরু বা সূক্ষ্ম পালক দেহের আবরণ হিসাবে যথেষ্ট কার্যকরী নয়।

২। **ছোট পালক** (Plumules)**ঃ** ছোট পালক বড় পালক অপেক্ষা কোমল। পূর্ণবয়স্ক মুরগীর দেহ ছোট পালক ও বড় পালকের দ্বারা সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে।

৩। **বড় পালক** (Contour feathers)**ঃ** বড় পালক নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশে বিভক্ত ঃ

(ক) **কাণ্ড** (Quill or mainstem)**ঃ** কাণ্ড একটি ফাঁপা নল (calamus) মাত্র।

(খ) **ছাল** (Shaft or rachis)**ঃ** কাণ্ডটিকে আবরিত করে রাখে ছাল। ছাল থেকেই শাখা (barb) বের হয়। আবার শাখা থেকেই প্রশাখা (barbule)—প্রশাখা একটি শাখা থেকে অপর শাখা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে।

যদিও পালক শরীরের প্রায় সকল অংশই ঢেকে রাখে তবুও ত্বকের কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই বিশেষভাবে পালক জন্মায়। এরূপ ৯টি পালক অঞ্চল বিদ্যমান। যথা—কাঁধ, উরু, পাছা, বুক, গ্রীবা, পা, পিঠ, ডানা ও মাথা।

ভ্রূণ সূচিত হওয়ার ৫ম দিবসে পালকের চুচুক (papillae) সূচিত হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি ত্বকে এক একটি রসপিণ্ড (follicle) থেকে পালক সূচিত হয়। এবং ঐ রসপিণ্ডসমূহ ডিমে তা দেবার সময়ে বিকাশ লাভ করতে থাকে এবং ঐ রসপিণ্ড থেকেই মুরগীর বাচ্চার সূক্ষ্ম পালক সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে ঐ রসপিণ্ড থেকে প্রকৃত পালক বের হয়ে বাচ্চার সূক্ষ্ম পালক ঠেলে বাইরে বের করে দেয়। রসপিণ্ডের ভিত্তিস্থানে পালক-অঙ্কুর (feather germ) বিদ্যমান থাকে এবং প্রতিটি পালক-অঙ্কুর থেকেই পালক বেরিয়ে থাকে।

অধিকাংশ জাতের মোরগের (male) পিঠের পিছনের অংশের, জিনের ও লেজের কাস্তে (sickle) পালক বেশি লম্বা ও অগ্রভাগটি বিশেষ তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে—এই ধরনের পালককে তাই গৌণ লিঙ্গ পরিচায়ক (secondary sexual feathers) আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু কয়েকটি জাতের মোরগের (male) পালক মুরগীর (female) পালকের ন্যায় হয়ে থাকে। যথা—ক্যাম্পাইন ও সেব্রাইট জাতের মোরগ (male)।

শরীরের অভ্যন্তরভাগের রঞ্জক উপাদানই পালকের বর্ণের কারণ। ডিম তা'য়ে বসাবার ৮০ ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক রঞ্জক-কোষের (melanoblast) সৃষ্টি হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে রঞ্জক কোষ পালক-অঙ্কুরে প্রবেশ করে এবং রং গ্রহণ করে। পালকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রং পালকের শাখা, প্রশাখা ও ছালে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

## পালকের গুরুত্ব

পালক শুধুমাত্র মুরগী জাতিরই পরিচয় দেয় না, পালকের মাধ্যমে বহুবিধ রোগলক্ষণও প্রকাশ পেয়ে থাকে। পালকের রঙের পরিবর্তন এবং শাখার লোপ পাওয়া ভিটামিন ও প্রোটিনের অভাব এবং কয়েক প্রকার অপুষ্টিজনিত রোগ সূচিত করে থাকে।

গঠনগত কোন দোষ না থাকলে ডানার পালক তেমন ঝুলে পড়ে না—অতএব ডানার পালক ঝুলে পড়ার অস্বাভাবিক ভঙ্গিও রোগ সূচিত করে।

মুরগীর ডানার ও লেজের পালক খসা (molting) থেকে ডিম দেওয়া বন্ধের নির্দেশ পাওয়া যায়। ডানার ও লেজের নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক পালক নির্দিষ্ট সময়ে খসে পড়ে এবং পুনরায় গজায়। পালক খসে পড়ার সময় থেকে পুনরায় না গজানো পর্যন্ত মুরগীর ডিম পাড়া বন্ধ থাকে।

১২ থেকে ১৪ সপ্তাহের মধ্যে স্কন্ধাবরণ, পিঠের পশ্চাদ্ভাগের ও লেজের পালক দেখে sex নির্ধারণ করা সহজেই সম্ভব হয়। মোরগের (male) পালকের প্রান্তভাগ ক্রমশঃ সরু দৃষ্ট হয়, কিন্তু মুরগীর (female) পালকের প্রান্তভাগ কিছুটা গোলাকৃতি হয়ে থাকে।

## মুরগীর বিভিন্ন প্রকার ঝুঁটি (Comb)

মুরগী ও মোরগের ঝুঁটি (comb) নানান ধরনের হতে পারে ; (ক) একহারা ঝুঁটি, (খ) মটর ঝুঁটি, (গ) গোলাপ ঝুঁটি, (ঘ) 'V' ঝুঁটি, (ঙ) জটা ঝুঁটি, (চ) পদ্ম ঝুঁটি।

**(ক) একহারা ঝুঁটি** (Single) **:** এই ধরনের ঝুঁটি দেখতে চিরুনির মতো খাঁজকাটা। এই ধরনের ঝুঁটি মুরগী ও মোরগের মাথায় একটি করে থাকে এবং ওপরের দিক খাঁজকাটা হয়ে থাকে।

**(খ) মটর ঝুঁটি** (Pea) **:** কতকগুলো মটরদানা পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলে যেমন হয় মটর ঝুঁটিও অনেকটা সেইরকম। মাথার গড়নের সঙ্গে এই ঝুঁটি অনেকাংশে সামঞ্জস্যযুক্ত হয়ে থাকে।

**(গ) গোলাপ ঝুঁটি :** এই ঝুঁটি খুব উঁচু হয় না। সুজির দানা পর পর সাজালে যেমন হয় অনেকটা সেই ধরনের।

**(ঘ) ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো ঝুঁটি :** এই ধরনের ঝুঁটি ইংরেজির বর্ণমালার 'V' অক্ষরের মতো।

**(ঙ) জটা ঝুঁটি :** এই ঝুঁটি আকারে বেশ বড়ো—জটাধারী সন্ন্যাসীর জটার মতো মাথা প্রায় ঢেকে রাখে।

**(চ) পদ্ম ঝুঁটি :** এই ঝুঁটি খাঁজকাটা, তবে পদ্মের আকার সদৃশ।

## একহারা ঝুঁটি

ক—১। একহারা ঝুঁটিবিশিষ্ট প্লাইমাউথ রক ও রোড আইল্যাণ্ড রেড জাতের মুরগী (female)।

ক—২। একহারা ঝুঁটিবিশিষ্ট লেগহর্ন জাতের মুরগী (female)।
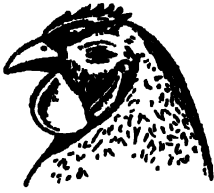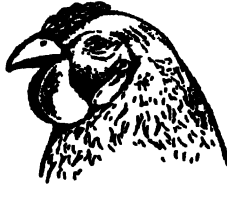
মুরগীর বিভিন্ন প্রকার ঝুঁটি

ক—৩। একহারা ঝুঁটিবিশিষ্ট মিনোর্কা জাতের মুরগী (female)। ঝুঁটির অগ্রভাগ সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে।

ক—৪। একহারা ঝুঁটিবিশিষ্ট লেগহর্ন জাতের মোরগ (male)।

## মটর ঝুঁটি

খ—১। মটর ঝুঁটিবিশিষ্ট ব্রাহ্মা জাতীয় মুরগী (female)।
খ—২। মটর ঝুঁটিবিশিষ্ট ব্রাহ্মা জাতীয় মোরগ (male)।

## গোলাপ ঝুঁটি

গ—১। গোলাপ ঝুঁটিবিশিষ্ট ওয়াইনডোট জাতের মুরগী (female)।
গ—২। গোলাপ ঝুঁটিবিশিষ্ট রোড আইল্যাণ্ড রেড জাতের মুরগী (female)।
গ—৩। গোলাপ ঝুঁটিবিশিষ্ট হ্যামবুর্গ জাতের মোরগ (male)।

## ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো ঝুঁটি

ঘ—১। 'V' ঝুঁটিবিশিষ্ট লা ফ্রেচ জাতের মোরগ (male)।

## জটা ঝুঁটি

ঙ—১। জটা ঝুঁটিবিশিষ্ট হুদান জাতের মোরগ (male)।

## পদ্ম ঝুঁটি

চ—১। পদ্ম ঝুঁটিবিশিষ্ট মোরগ (male)।

## পেশী (Muscles)

মোরগ ও মুরগীর দেহের অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশীকে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।
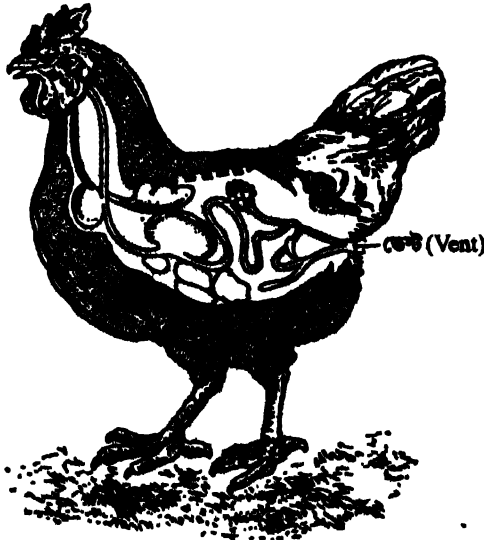
মুরগী দেহের বাইরের ও অভ্যন্তর ভাগের পার্শ্বচিত্র। মাংসপেশী, অরগান (organ) এবং পালকাদির অনুপাত এই রেখাচিত্র থেকে কিছুটা বিচার করা সম্ভব।

(১) ঐচ্ছিক বা ইচ্ছা-প্রবর্তিত পেশী (voluntary)।

(২) অনৈচ্ছিক বা স্বতঃপ্রবর্তিত পেশী (involuntary)।

(৩) বুকাস্থির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশী (cardiac)।

(১) ঐচ্ছিক পেশীর (voluntary) সাহায্যে চলা, ফেরা, মাথা ঘোরান, ওড়া প্রভৃতি কার্য সাধিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই পেশীসমূহকে ইচ্ছানুযায়ী সঙ্কোচন ও প্রসারণ করা যায়।

(২) অনৈচ্ছিক পেশী (involuntary) ইচ্ছার অধীন নয়। পাকস্থলী, অন্ত্র, ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের পেশী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শ্বাসক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া ও শোণিত সঞ্চালন প্রভৃতি এই পেশীসমূহের দ্বারা সাধিত হয়।

(৩) বুকাস্থির (breast bone) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশী (cardiac)—এই পেশীর সাহায্যে মোরগ-মুরগীর ডানা ওঠা-নামা করে। তাই পেশীটি আকারে বড়। এই পেশীকেও অনৈচ্ছিক (involuntary) পেশীর অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। হৃদ্‌যন্ত্রের পেশী cardiac পেশীর অন্তর্ভুক্ত—গঠন দৃঢ়, রং কালো।

## মোরগ ও মুরগীর ত্বক (Skin)

মোরগ ও মুরগীর ত্বক যতক্ষণ অক্ষত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মোরগ-মুরগী অনেক প্রকার রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে।

এই ত্বক পাতলা ধরনের এবং নিম্নলিখিত দুটি স্তরে বিভক্ত ঃ

(১) বাইরের ত্বক বা epidermis ;

(২) অভ্যন্তরের ত্বক বা dermis.

দেহের যে সকল জায়গা পালকের দ্বারা আবৃত থাকে সেই সকল স্থানের বাইরের ত্বক (epidermis) শুষ্ক এবং সূক্ষ্ম আঁশের (scale) দ্বারা ঢাকা থাকে। এই আঁশ মাঝে মাঝে খসে পড়ে এবং পুনরায় জন্মায়।

মুরগীর বা মোরগের ঘর্মগ্রন্থি নেই, কেবলমাত্র লেজের গোড়ায় 'তৈলগ্রন্থি' (preen gland) রয়েছে।

ত্বকের সঙ্গে উত্তোলক, অবনমনকারক ও সংকোচক পেশী যুক্ত থাকায় মোরগ ও মুরগী ডানা সঞ্চালন করতে সমর্থ হয়ে থাকে।

বাইরের ত্বকে এবং অভ্যন্তরের ত্বকে রঞ্জক জাতীয় উপাদান বিদ্যমান থাকায় মোরগ ও মুরগীর ত্বকের রং হলদে, কালো, সাদা, নীল বা সবুজ হয়ে থাকে।

ত্বকের রং মোরগ ও মুরগীর জাত নির্ণয়েও সহায়তা করে থাকে। আমেরিকান এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মোরগ ও মুরগীর ত্বকের রং সচরাচর হলদে এবং ইংলিশ জাতের মোরগ-মুরগীর ত্বকের রং সচরাচর সাদা বর্ণের হয়ে থাকে।

## কঙ্কাল (The Skeleton)

শরীরের structural background-ই হচ্ছে কঙ্কাল। এই কঙ্কালের দ্বারা দেহ-

অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের সংরক্ষণ ও দেহ সঞ্চালন কার্য সাধিত হয়। কঙ্কালের সাহায্যে প্রাণী খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে ও চলা-ফেরা করতে সমর্থ হয়ে থাকে।

যে সকল হাড় পরস্পরের মধ্যে সংযুক্ত থাকে—তা হচ্ছে fused bone। এরূপ fused bone-এর দ্বারাই সমগ্র দেহের কাঠামোটি দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ থাকে।

ডানা এবং পায়ের হাড়সমূহ (hollow bones) ফাঁপা হওয়ায় মোরগ-মুরগীর শরীরের ওজন অনেকাংশে কম হয়।

Public bones-এর সাহায্যে ডিম উৎপাদন তথা ডিম পাড়ার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

মুরগীর কঙ্কালকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ; যথা— (১) অক্ষদণ্ড (axial) এবং (২) অনুবন্ধ (appendicular portion)।

করোটি, মেরুদণ্ড, পঞ্জরাস্থি ও বুকাস্থি অক্ষদণ্ডের অন্তর্গত ; ডানা, পা এবং ডানা ও পায়ের অবলম্বনকারী কঙ্কাল বিন্যাস অনুবন্ধের অন্তর্গত।
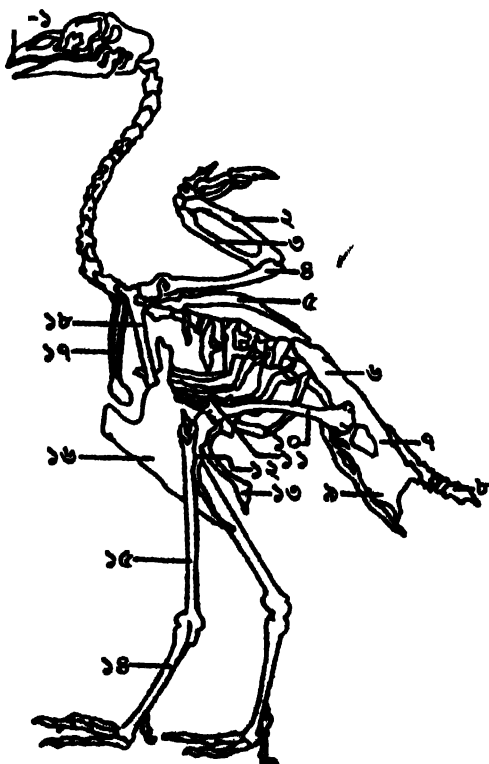
মুরগীর কঙ্কাল

১। ঠোঁট (Peak) ২। কফোনি বা প্রকোষ্ঠ অস্থি (Ulna) ৩। চক্রদণ্ড অস্থি (Radius) ৪। প্রগণ্ড অস্থি (Humerous) ৫। স্কন্ধ-অস্থি (Scapula) ৬। কট্যাস্থি

(Ilium) ৭। বক্ষাস্থি (Ischium) ৮। লেজের প্রান্তের হাড় (Pygostyle) ৯। বিটপাস্থি (Public bones) ১০। উরুর অস্থির উপরিভাগ [Femur (upper thigh)] ১১। জানুসন্ধি অস্থি [Patella (knee cap)] ১২। পশ্চাৎ জঙ্ঘাস্থি (Fibula) ১৩। উপাস্থি (Lateral process of sternum) ১৪। পায়ের নিম্নভাগের অস্থি [Metatarsus (shank)] ১৫। উরুর নিম্নাংশ [Tibia (lower thigh)] ১৬। বক্ষাস্থি (Sternum) ১৭। কণ্ঠাস্থি (Clavicle বা wish bone) ১৮। অংসতুণ্ড (Coracoid)।

মুরগীর ডানা কণ্ঠাস্থির (Clavicle) দ্বারা বিশেষ support পেয়ে থাকে। কণ্ঠাস্থি একজোড়া হাড়বিশিষ্ট।

Avian lukosis Complex (A. L. S) রোগাক্রান্ত হলে মোরগ ও মুরগীর হাড়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা সূচিত হতে পারে, হাড়ের গঠন বিসদৃশ হতে পারে বা বুকাস্থি (breast bones) বক্রভাবযুক্ত হতে পারে।

পিউবিক বোনের ব্যবধান এক আঙুল (ডিম-পাড়া মুরগী নয়)

আর্থারাইটিস (Arthritis) বা গ্রন্থি প্রদাহ (inflammation of the joints) বা গোড়ালি মাংসপিণ্ড সংক্রান্ত রোগে (bumblefoot) আক্রান্ত হলে সংশ্লিষ্ট কঙ্কালে প্রতিক্রিয়া সূচিত হতে পারে।

অপুষ্টিজনিত কারণে (nutrition-এর অভাবে) মোরগ ও মুরগীর রিকেট (Rickets) রোগ সূচিত হয়ে থাকে। রিকেট রোগজনিত কারণে হাড়ের গঠন বিসদৃশ হতে পারে এবং হাড় নরম হয়ে থাকে।

বক্ষাস্থি (Sternum)-এর শেষ প্রান্ত (১৬ নং) এবং বিটপাস্থির (public bones)—এই দুইয়ের ব্যবধান অনুভব করে অতীতের ডিম উৎপাদন এবং ভবিষ্যতের ডিম-পাড়া মুরগীর ডিম প্রদানের ক্ষমতা সম্বন্ধে অনুমান করা সম্ভব।

ডিম-পাড়া মুরগীর বক্ষাস্থির শেষ প্রান্ত (keel) এবং বিটপাস্থি (public bones)-এর বাহ্যিক অবস্থান টের পাওয়ার জন্য চিত্রে উল্লেখিত স্থানে আঙুল দিয়ে অনুভব করুন।

## রক্ত সংবহন (The System of Blood Circulation)

খাদ্য ও জলের পুষ্টিকর উপাদানাদি থেকে উৎপন্ন বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে দেহের সকল অংশে প্রবাহিত হয়ে দূষিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাবর্তন করে। বাতাস থেকে গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে ফুসফুস সেই দূষিত রক্তকে বিশোধিত করে। বিশোধিত সেই রক্ত আবার হৃৎপিণ্ড পাম্প করে শরীরের সকল অংশে সঞ্চালিত করে।

মোরগ ও মুরগীর হৃদ্‌পিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠে (Four chambered hearts) বিভক্ত।

পিউবিক বোনেব আর কীল বোনের ব্যবধান বেশি (ভালো ডিম পাড়া মুরগী)

রক্ত দেহের অন্যতম সারবস্তু। একটি জীবন্ত মুরগীর মোট ওজনের $\frac{১}{৫}$ অংশ হচ্ছে রক্তের ওজন।

রক্তের মধ্যে ৭৫ ভাগ জলীয় অংশ আর ২৫ ভাগ স্থূল অংশ।

রক্তের জলীয় অংশের নাম রক্তরস (plasma) এবং স্থূল অংশের নাম রক্ত-কণিকা (blood corpuscles)। রক্ত-কণিকা আবার দু'রকম—(১) লোহিত কণিকা (red blood corpuscles) এবং (২) শ্বেত কণিকা (white blood corpuscles)।

রক্তের জলীয় অংশ অর্থাৎ রক্তরসই (plasma) শরীর পোষক এবং শরীরে পরিত্যাজ্য দ্রব্যাদি ধারণ করে থাকে। রক্তরসের রং বিচালির (straw) ন্যায়। রক্তরসের মধ্যে বিদ্যমান তন্তুকারক পদার্থ (fibrinogen) রয়েছে—যা রক্তকে জমাট বাধায়। রক্ত বের হবার পর এই তন্তুকারক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে তন্তুজালে (fibrin) পরিণত হয়ে থাকে এবং তখন অতি তরল রক্ত থকথকে জেলির মতো হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ঐ থকথকে জেলির মতো রক্ত থেকে হরিদ্রাভ বস নির্গত হয়। ঐ হরিদ্রাভ রসকে রসমণ্ড (serum) বলা হয়ে থাকে। পুলোরাম বোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য ঐ রসমণ্ড (serum) ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

## শ্বাসক্রিয়া (Respiratory System)

শ্বাসক্রিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ করা এবং রক্তের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও দূষিত পদার্থ বাইরে বের করে দেওয়া।
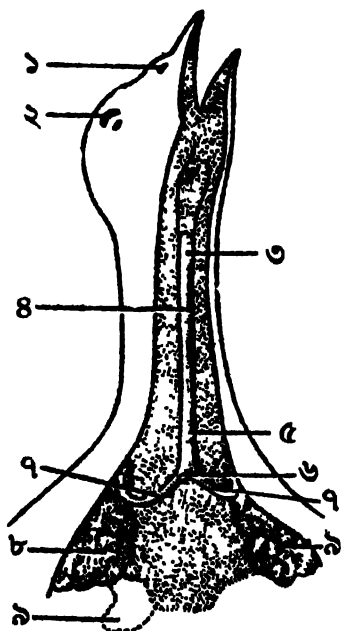
মুরগীর শ্বাসযন্ত্র

মুরগীর শ্বাসযন্ত্র অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের অপেক্ষা পৃথক।

ফুসফুস (lungs) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমতল ধরনের কোষের দ্বারা তৈরি। শ্বাসযন্ত্র নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত—

নাসারন্ধ্র (nostrils), শ্বাসনালী (trachea), কণ্ঠনালী (larynx), স্বরযন্ত্র বা কণ্ঠনালীর নিম্নাংশ (Syrinx or lower larynx), বায়ুনালী (bronchi), ফুসফুস (lung) এবং বায়ুথলি (air sacs)।

[ ১। নাসারন্ধ্র (nostrils) ২। চোখ (eye) ৩। কণ্ঠনালী (larynx) ৪। শ্বাসনালী (trachea) ৫। শ্বাসনালী ৬। স্বরযন্ত্র (syrinx) or lower larynx) ৭। বায়ুনালী (bronchi) ৮। ফুসফুস (lungs) ৯। বায়ুথলি (air sacs) ]

একটা লম্বা শ্বাসনালী কণ্ঠনালীকে স্বরযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছে। স্বরযন্ত্র থেকে শ্বাসনালী ২টি শাখায় বিভক্ত হয়ে ফুসফুসে গিয়ে পৌছেছে—ঐ দুটি শাখাকে বায়ুনালী (bronchi) আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। স্বরযন্ত্র (syrinx) থেকে মোরগ-মুরগীর শব্দ বা ডাক স্ফুরিত হয়। স্বরযন্ত্রকে voice-boxও আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

ফুসফুস বক্ষগহ্বরের দেওয়ালের সঙ্গে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ এবং পাঁজরার অভ্যন্তরে সংস্থাপিত। দুটি বায়ুনালী (bronchi) ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে উদরের বায়ুথলিতে (air sacs) গিয়ে পৌছেছে।

গলা থেকে উদর পর্যন্ত চার জোড়া অর্থাৎ ৮টি থলি বিদ্যমান, তাছাড়া বক্ষগহ্বরের মধ্যেও আর একটি বায়ুথলি রয়েছে। বায়ুথলির মোট সংখ্যা ৯টি।

রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রশ্বাস-বায়ুর প্রয়োজন হয়ে থাকে। বায়ুথলি যাঁতার ন্যায় কাজ করে বলে অম্লজান বাষ্প (oxygen) সহ প্রশ্বাস বায়ু অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অভ্যন্তর ভাগেই বাষ্পের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। নিঃশ্বাস ত্যাগকালীন বাতাস দূষিত বাষ্পযুক্ত হয়ে বায়ুথলি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে থাকে।

প্রশ্বাস বায়ু প্রথমে নাসারন্ধ্র দিয়ে কণ্ঠনালীর উপরিভাগের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে, তৎপরে শ্বাসযন্ত্র হয়ে বায়ুনালীর মাধ্যমে ফুস্ফুস ও বায়ুথলিসমূহে প্রবেশ করে থাকে।

প্রশ্বাস কার্য অপেক্ষা নিঃশ্বাস কার্যে দ্বিগুণ সময় লাগে।

রানীক্ষেত (Newcastle) রোগ বা জটিল শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত রোগের (Chronic Respiratory Disease) দ্বারা মোরগ বা মুরগী আক্রান্ত হলে—এই বায়ুথলিসমূহ (air sacs) ভারি এবং মেঘাচ্ছন্ন (cloudy) হতে পারে—এবং পনিরের মতো হলদে রংয়ের স্রাব নির্গত হতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এই ৯টি বায়ুথলি পাতলা, উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ ঝিল্লীযুক্ত থাকে।

তবে গৃহপালিত বা পোলট্রিতে প্রতিপালিত মোরগ ও মুরগীর জন্য এই বায়ুথলিসমূহ একান্ত প্রয়োজনীয় নয়, ফুসফুস থাকলেই যথেষ্ট—তবে ওড়ার সময় এই বায়ুথলিসমূহ শ্বাসকার্যে বিশেষ সহায়তা করে থাকে। কিন্তু পালিত মোরগ-মুরগীদের ওড়ার অবকাশ খুব কমই থাকে।

## পরিপাক পদ্ধতি (The Digestive System)

বেঁচে থাকার জন্য সকল প্রাণীরই খাদ্য প্রয়োজন। যে খাদ্য খাওয়া হয় সে খাদ্য অনেক কাজ করে। খাদ্যের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে—শরীরের পুষ্টি ও প্রবর্ধন, শরীর রক্ষণ, প্রজনন, তাপ সঞ্চারণ এবং ক্ষয়পূরণ। এই ধরনের বিভিন্ন কাজ পরিপাকযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে।

১। অন্ননালী (esophagus) বা গালেট (gullet)

২। খাদ্যের সাময়িক ভাণ্ডার (crop)
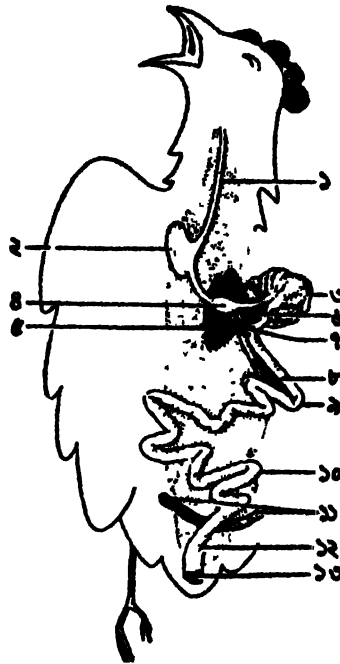
মুরগীর পরিপাক পদ্ধতি

৩। পেশীয় পাকস্থলী (gizzard)

৪। গ্রন্থিয় পাকস্থলী (proventriculus)

৫। যকৃৎ বা লীভার (liver)

৬। প্লীহা (spleen)

৭। পিত্তস্থলী (gall bladder)

৮। অগ্ন্যাশয় (pancreas)

৯। গ্রহণী (doudenum)

১০। ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine)

১১। উণ্ডুক (ceca)

১২। বৃহদন্ত্র (large intestine)

১৩। মলদ্বার (cloaca)।

মোরগ বা মুরগীর গাল, মাড়ি বা দাঁত নেই—ঠোঁটের সাহায্যেই এরা খাদ্য ও জল গ্রহণ করে থাকে। উপরকার ঠোঁটের সম্মুখভাগ ভেঙে দিলেও (debeaking) খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণে অসুবিধা হয় না। যখন মোরগ বা মুরগী মাথা তোলে এবং গলা বাড়ায়—তখন খাদ্যাদি গিলে ফেলে। এই ধরনের আবর্তনে পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি হয় এবং আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে (the force of gravity) খাদ্যাদি অন্ননালীতে (Oesophagus or gullet) সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

## সাময়িক খাদ্য ভাণ্ডার (Crop)

খাদ্যের সাময়িক ভাণ্ডার বা Crop অন্ননালীরই বিবৃদ্ধি। ভুক্ত দ্রব্যকে ক্রপ (Crop) সাময়িকভাবে Store করে রাখে—গ্রন্থিয় পাকস্থলিতে ভুক্ত দ্রব্যাদি অবিচ্ছিন্নভাবে সঞ্চালিত হওয়ার পূর্বে ভুক্ত দ্রব্যাদি ক্রপে (Crop) অবস্থান কালে কিছু অংশ নরম (partially softened) হয়ে থাকে।

কিন্তু এই সাময়িক খাদ্যভাণ্ডারে (Crop-এ) স্বল্প সময়ের জন্য Store থাকাকালীন ভুক্ত দ্রব্যাদির কোন রাসায়নিক পরিবর্তন বা পাচন ঘটে না।

এই Cropটি ভর্তি থাকা মোরগ বা মুরগীর দৈহিক সুস্থতার লক্ষণ। রোগগ্রস্ত মোরগ বা মুরগী খালি পাকস্থলী এবং অপূর্ণ Crop নিয়ে বসে থাকে বা ঘুমায়।

## গ্রন্থিয় পাকস্থলী (Proventriculus)

সাময়িক খাদ্যভাণ্ডার বা Crop থেকে ভুক্তদ্রব্যাদি গ্রন্থিয় পাকস্থলীতে সঞ্চালিত হয়। গ্রন্থিয় পাকস্থলী থেকে কিছু অম্লরস বা পাচকরস নিঃসারিত হয়। ভুক্ত দ্রব্যাদি গ্রন্থিয় পাকস্থলী থেকে পেশীয় পাকস্থলীতে (Gizzard) সঞ্চালিত হওয়ার পূর্বেই গ্রন্থিয় পাকস্থলী থেকে অম্লরস বা পাচক রস (Enzymes) নিঃসরিত হওয়ায় ভুক্ত দ্রব্যাদি হজমের সুবিধা হয়।

## পেশীয় পাকস্থলী (Gizzard)

পেশীয় পাকস্থলী বা Gizzard ডিম্বাকার দুই পার্শ্বে চ্যাপ্টা ধরনের শক্তিশালী মাংসপেশী দ্বারা গঠিত। এর অভ্যন্তরভাগে শৃঙ্গযুক্ত (Horny membrane) শক্ত ঝিল্লি বিদ্যমান এবং পশ্চাৎপট শক্ত গ্রন্থি দ্বারা বেষ্টিত। অতএব পেশীয় পাকস্থলী অনেকাংশে যাঁতার কাজ করে—ভুক্ত দ্রব্যের স্থূল ও কঠিন অংশকে ভেঙে চুরমার করে দেয় অথবা শক্ত ভুক্তদ্রব্যকে পেষাই করে দলিত-মথিত করে কাইয়ের আকারে পরিণত করে দেয়।

সর্বদা ম্যাশ (Mash) আহার্য গ্রহণকারী মুরগী বা মোরগের গিজার্ড শক্ত দানা-খাবার গ্রহণকারী মুরগী বা মোরগের গিজার্ড অপেক্ষা নরম এবং কম শক্তিশালী হয়ে থাকে।

## ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestines)

এই ক্ষুদ্রান্ত্র গিজার্ড থেকে সূচিত হয়ে উণ্ডুক (ceca) এবং বৃহদন্ত্রের (Large intestine) সংযোগস্থল বা মলনালী (Recturm) পর্যন্ত বিস্তৃত।

ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশকে গ্রহণী (Doudenum) বলা হয়। এই গ্রহণী অনেকাংশে ভাঁজকরা ফাঁসের আকার সদৃশ বা Loop এর মতো (পূর্ণবয়স্ক মুরগীর গ্রহণী ৮/৯ ইঞ্চি লম্বা) এবং এই গ্রহণীটি অগ্ন্যাশয়কে (Pancreas) ঘিরে রেখেছে। অগ্ন্যাশয় নালী ও পিত্তনালী (Pancreatic and bileduct) গ্রহণী অভ্যন্তরে সঞ্চারিত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাককারক আগ্নেয় রস ও পিত্তরস সঞ্চারিত করে। তাছাড়া ক্ষুদ্রান্ত্র থেকেও পাচকরস নিঃসরিত হয়ে থাকে। এই সম্মিলিত রস নিঃসরণের ফলে চর্বি, প্রোটিন, শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাদ্যাদি পরিপাক করা সম্ভব হয়। পরিপাক ক্রিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রেই শেষ হয়ে থাকে। ভুক্ত দ্রব্যের পুষ্টিকর উপাদান এখানে আরও তরল (changed to more soluble form) এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের দেওয়ালসমূহ সেই পুষ্টিকর উপাদান শুষে নিয়ে রক্তপ্রবাহে (Blood stream) সঞ্চারিত করে এবং রক্তপ্রবাহ তখন তা শরীরের বিভিন্ন অংশে সঞ্চারিত করে।

স্তন্যপায়ীদের ন্যায় মুরগীর ক্ষুদ্রান্ত্র মধ্যে মধ্যক্ষুদ্রান্ত্র (Jejunum) এবং নিম্নক্ষুদ্রান্ত্র (ileum) বিদ্যমান।

## বৃহদন্ত্র (Large intestines)

বৃহদন্ত্র মলনালী (Rectum) এবং মলদ্বার (Cloaca) নিয়ে গঠিত। মলদ্বারের মাধ্যমেই মোরগের Sperm এবং মুরগীর ডিম দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে। অতএব মলদ্বারকে অনায়াসে মোরগ ও মুরগীর Common opening আখ্যা দেওয়া চলে। এই পথেই ভুক্তদ্রব্যের অসার অংশ (Waste products) বাইরে বেরিয়ে আসে। মলদ্বারের বাইরের অংশকে Vent আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

ক্ষুদ্রান্ত্র ও মলনালীর সংযোগস্থলে উণ্ডুক (Ceca) বিদ্যমান। উণ্ডুকে ৭/৮ ইঞ্চি লম্বা দুটি থলে (Sacs) রয়েছে। মলনালী এবং উণ্ডুক মল ও মূত্র বাইরে নির্গত হওয়ার পূর্বে মল ও মূত্র থেকে জল শুষে নেয়। কঠিন তন্তুজাতীয় খাদ্যাদি (Crude fibre) হজমেও উণ্ডুক সহায়তা করে [ উণ্ডুক (Ceca) হচ্ছে বৃহদন্ত্রের প্রথম ও বিস্ফারিত অংশ। ]। পাচক রস এবং ব্যাক্টিরিয়াজনিত কারণেই পাচনকার্য সম্ভব হয়ে থাকে।

## যকৃৎ (Liver)

যকৃৎ দেহের সর্ববৃহৎ রস-নিঃসারক গ্রন্থি। যকৃতের দুটি ভাগ বিদ্যমান—(১) বাম খণ্ড (left lobe) এবং (২) দক্ষিণ খণ্ড (right lobe)। যকৃতের দুটি Lobe-ই গাঢ় লালবর্ণযুক্ত।

যকৃতেই সবুজ বর্ণের পিত্ত উৎপাদিত হয়ে থাকে।

যকৃতের গাত্রসংলগ্ন একটি থলির মধ্যে পিত্ত (Bile) সঞ্চিত থাকে। এই থলিকে পিত্তস্থলী (Gall-bladder) বলা হয়। দুটি নলী (ducts) যকৃতের দু'খণ্ড থেকে পিত্তরস বহন করে গ্রহণীতে (Doudenum) পৌছে দেয়।

পিত্ত চর্বি জাতীয় এবং শ্বেতসার জাতীয় ভুক্তদ্রব্যকে নরম করে। ফলে চর্বি জাতীয় এবং শ্বেতসার জাতীয় ভুক্ত দ্রব্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় রূপান্তরিত হয়ে জল ও রসের সমন্বয়ে দুধের মতো তরল রূপ গ্রহণ করে। যকৃতেই Gyclogen or Blood sugar উৎপন্ন হয় এবং সঞ্চিত থাকে। এই Sugar quick source of energy রূপে ব্যবহৃত হয়। যকৃতেই Uric acid উৎপন্ন হয়ে থাকে। যকৃতের বিভিন্ন কোষের আর একটি হচ্ছে ব্যাক্টিরিয়া—যা খনিজ বিষের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সহায়তা করে।

যকৃতের বর্ণ লাল হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু ডিমে তা দেবার পর ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত মুরগীর বাচ্চার যকৃৎটি হলুদবর্ণযুক্ত হতে পারে। যকৃৎ-কোষে পর্যাপ্ত পরিমাণে চর্বি সঞ্চিত থাকার ফলেই এরূপ হয়ে থাকে।

## প্লীহা (Spleen)

যদিও প্লীহাকে মূলতঃ পাচন পদ্ধতির অংশ আখ্যা দেওয়া যায় না—কিন্তু প্লীহার অবস্থান প্রায় পরিপাকযন্ত্রের সংলগ্ন বলে, এক্ষেত্রে প্লীহার উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় প্লীহার আকার ছোট, গোলাকৃতি, লালচে-তামাটে বর্ণযুক্ত। গিজার্ড ও লিভারের সংযোগস্থলে প্লীহা অবস্থিত।

প্লীহার মূল কাজ হচ্ছে রক্তকণিকা (Red blood cells) সঞ্চয় করে রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ বিনষ্ট করা। প্লীহা থেকে শ্বেতকণিকা (White blood cells) এবং রোগ-প্রতিষেধক শক্তিও সূচিত হয়ে থাকে।

## মূত্র নিঃসরণ পদ্ধতি

বৃক্কদ্বয় বা মূত্রগ্রন্থি (Kidney) এবং গবিনীদ্বয় বা মূত্রপ্রণালীদ্বয় (Ureter) নিয়ে মূত্রযন্ত্র গঠিত। মূত্রযন্ত্র ফুসফুসের পশ্চাদ্ভাগে মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন।

প্রত্যেকটি বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থির (Kidney) অসমান আকারে তিনটি খণ্ড বা Lobe বিদ্যমান।

১। শুক্রাশয় (অণ্ড, মুষ্ক) (Testes or gonads)

২। বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি (Kidney)

৩। গবিনী বা মূত্রপ্রণালী (Ureter)

৪। শুক্রনালী (Vas deferens)

৫। মলদ্বার, মূত্রদ্বার (Cloaca)।

প্রত্যেক বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি (Kidney) থেকে মূত্র নিঃসরিত হয়ে গবিনীর (Ureter) মাধ্যমে মূত্রবাহিত হয়ে মলনালী বা মলদ্বারে (Cloaca) এসে সঞ্চিত হয়। ওখান থেকে মূত্র মলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।
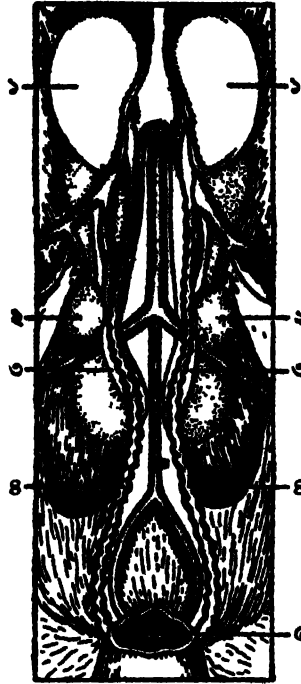
মোবগেব প্রজনন ও মূত্র-যন্ত্রাদি

মূত্রগ্রন্থিই (Kidney) হচ্ছে মূত্র নিঃসরণের যন্ত্রের প্রধান অংশ। ভুক্ত খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ ও পানীয়ের অংশকে কিডনি পরিশ্রুত করে মূত্রপ্রণালী পথে সঞ্চারিত করে। মলনালীর টিস্যু (Tissue)-সমূহ অতিরিক্ত জলীয় অংশ শুষে নেয়। জলীয় অংশ শুষে নেওয়ার পর এক প্রকার সাদা আঠাল পদার্থ থাকে—সেই আঠাল সাদা তরল পদার্থ মলের সঙ্গে মলদ্বার পথে বাইরে বেরিয়ে আসে।

## মোরগের প্রজনন-যন্ত্র

## (The Male Reproductive System)

শ্বাসযন্ত্র, পরিপাকযন্ত্র, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতি মোরগ ও মুরগীর একপ্রকার হলেও উভয়ের প্রজনন-যন্ত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান।

মোরগের দুটি শুক্রাশয় বা অণ্ডকোষ দেহের অভ্যন্তরে থাকে—বাইরে থেকে দেখা যায় না। এই দুটি অণ্ডকোষ বা শুক্রাশয় বৃক্কের (Kidney) শেষ প্রান্তে উদর-গহ্বরের দেওয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে।

প্রতিটি শুক্রাশয় (Testes) বহুসংখ্যক সরু ও লম্বা ধরনের নল দ্বারা গঠিত। ঐ নলসমূহকে শুক্র-নির্মাপক গ্রন্থি (Seminiferons tubles) বলা হয়। ঐ সকল গ্রন্থি থেকে শুক্রাণু (Spermatoza) নির্গত হয়ে Epididymis-এর মধ্য দিয়ে শুক্রনালীতে (Vas deferens) সঞ্চারিত হয়।

ঐ দুটি শুক্রনালী ঢেউ-খেলানো। শুক্রনালীর মাধ্যমে ঐ শুক্রাণুসমূহ বাহিত হয়ে মলদ্বারের (Cloaca) মধ্যমাংশে অবস্থিত ছোট দুটি উদ্ভেদের (Papilla) দ্বারা মুরগীর Vent-এর মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়।

মোরগের শিশ্নসদৃশ কোন লিঙ্গ নেই—চুচুকসদৃশ দুটি ছোট উজ্জ্বল উদ্ভেদ রয়েছে মাত্র। কিন্তু হাঁস ও রাজহাঁসের শিশ্নসদৃশ লিঙ্গ রয়েছে।

মুরগীর Vagina-তে মোরগের শুক্রাণুসমূহ সঞ্চারিত হওয়ার পর ঐ শুক্রাণুসমূহ লম্বা লেজের সাহায্যে ওপরের দিকে চলতে থাকে। চলতি পথের চর্বিসমূহ তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে পুষ্ট হয়। মুরগীর ডিম্বাশয় থেকে নিঃসরিত Mature yolk-এর সংস্পর্শে ঐ শুক্রাণু এলেই নতুন জীবন সূচিত হয়।

## মুরগীর প্রজনন-অঙ্গ ও ডিম উৎপাদন
## [The Female Reproductive System and Mechanism of Egg-production]

মুরগীর দেহ হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র, মুরগীকে যে খাদ্যাদি খাওয়ানো হয় সেই খাদ্যের বদলে ডিম পাওয়া যায়। অথবা বলা যায় যে, সরবরাহকৃত খাদ্য ডিমে রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসে। মুরগী হচ্ছে ডিম তৈরির একটি যন্ত্র বিশেষ।

ডিম পাড়ার জন্য প্রস্তুত এরূপ মুরগীর ডিম্বাশয়ে প্রায় ১২ থেকে ১৫ হাজার ডিম্বাণু বিদ্যমান। মুরগীর ডিম্বাশয় একটিই—কদাচিৎ দুটি ডিম্বাশয় (Ovary)-যুক্ত মুরগী পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

সহস্র সহস্র ডিম্বাণু (Egg-yolk) মুরগীর ডিম্বাশয়ে থাকলেও সকল ডিম্বাণুই ডিম হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে না। অর্থাৎ সব ডিম্বাণুই ডিম হয় না। তবে ডিম্বাণু থেকেই ডিম হয়। উন্নত জাতের মুরগী ৩/৪ বছরের বেশি ডিম দেয় না। যে সকল মুরগী এদের জীবিতকালে ১০০০ বা ততোধিক ডিম দিয়ে থাকে—এদের কথা স্বতন্ত্র।

ভালো জাতের মুরগী বছরে গড়ে ২০০ ডিম দিয়ে থাকে।

১। ডিম্বাশয় (Ovary) ২। পুষ্ট ডিম্বাণু (Mature Ovum) ৩। চুঙ্গী বা ডিম্ব-নালীর প্রসারিত মুখ (Funnel) ৪। ডিমের শ্বেতাংশ নিঃসরণকারী অংশ [Magnum—portion secreting (Albumen)] ৫। মূত্রগ্রন্থিদ্বয় (Kidney) ৬। ডিমের খোলার অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লির উৎপাদনকারী অংশ (Isthmus) ৭। জরায়ু বা

ডিমের খোলা উৎপাদনকারী অংশ [Uterus (portion secreting shell)] ৮। যোনি (Vagina) ৯। মলদ্বার (Cloaca)।
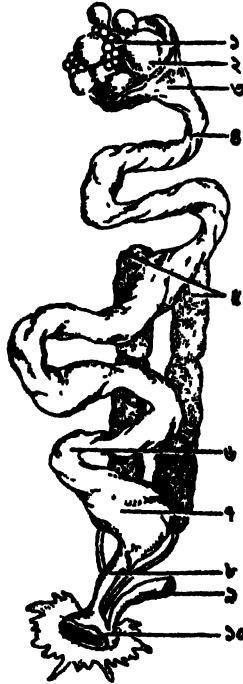
মুরগীর প্রজনন তথা ডিম উৎপাদন যন্ত্র

মুরগীর প্রজনন-যন্ত্র দুটি স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত—(১) ডিম্বাশয় (Ovary) এবং (২) ডিম্ববাহী নালী (Oviduct)।

**ডিম্বাশয় (Ovary) :** ডিমের প্রাথমিক ও মূল উৎপত্তিস্থল। এখানেই ডিম্বাণু বা ডিমের শতাংশ (the ova or yolks) উৎপত্তি হয়। অতি ক্ষুদ্র ডিম্বাণু (যা খালি চোখে দেখা যায় না) পুষ্ট অবস্থায় কম বেশি ঝিল্লি আবরিত হয়ে এখান থেকে নিঃসরিত হয়ে ডিম্ববাহী নলের চুঙ্গীতে পতিত হয়।

**ডিম্ববাহী নালী (Oviduct) :** নিম্নলিখিত পাঁচটি অংশে বিভক্ত—(১) চুঙ্গী (Funnel), (২) ম্যাগনাম বা ডিমের শ্বেতাংশ নিঃসরণকারী অংশ (Magnum), (৩) ইসথমাস বা ডিমের খোলার অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লি উৎপাদনকারী অংশ (Isthmus), (৪) জরায়ু বা ডিমের খোলা উৎপাদনকারী অংশ (Uterus) ও (৫) যোনি (Vagina)।

**চুঙ্গী (Funnel) :** এটি হচ্ছে ডিম্ববাহী নলের (Oviduct) প্রবর্ধিত অংশ। পুষ্ট ডিম্বাণু চুঙ্গী দ্বারা আকর্ষিত হয়। সচরাচর এখানেই শুক্রাণু সহযোগে ডিম্বাণু উর্বর হয়ে থাকে। ডিম্বাণু ডিম্ববাহী নলের প্রাথমিক অংশে ১৫' মিনিট কাল অবস্থান

করে। ডিম্বাণুটি যদি শুক্রাণুর সংস্পর্শে উর্বর হয় তবে তখন থেকেই Germ spot প্রবর্ধিত হতে থাকে।

**ম্যাগনাম (Magnum) :** এখান থেকেই ডিমের শ্বেতাংশ বা Albumen নিঃসরিত হয়ে থাকে। এখানে ডিম্বাণু ৩ ঘণ্টা কাল অবস্থান করার ফলে ডিম্বাণুর চারপাশে একটি সাদা ঘন আবরণ (Layer of thick white) পড়ে.। তৎপরে পেশীর নানাবিধ সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে সাদা পদার্থ দ্বারা আবরিত ডিম্বাণু ইসথমাসে (Isthmus) সঞ্চারিত হয়। এখানে সাদা পদার্থ দ্বারা আবরিত ডিম্বাণুটি প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল অবস্থান করে। এখানে অবস্থান কালে ডিম্বাণুটি পুনরায় দু'প্রকার Shell membrane (ডিমের খোলার অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লি) দ্বারা আবরিত হয়। দু'প্রকার Shell membrane দ্বারা আবরিত হওয়ার ফলে ডিমের অভ্যন্তরে বায়ুকোষ (Air cell or space) সূচিত হয়ে থাকে।

**জরায়ু (Uterus) :** এখানে প্রবর্ধিত ডিম্বাণুটি প্রায় ২১ ঘণ্টা কাল অবস্থান করে এবং প্রবর্ধিত ডিম্বাণুর চারপাশে খোলা উৎপাদনকারী (Calcium Carbonate Cystals) অংশ এখান থেকেই সংযোজিত হয়ে থাকে। তাছাড়া ডিম্বাণুর চারপাশে অতিরিক্ত আর এক প্রকার পাতলা তরল সাদা রসের আবরণও পড়ে যা ম্যাগনাম কর্তৃক নিঃসরিত শ্বেতাংশকে কিছুটা গলিয়ে দেয়। এখান থেকেই ডিমটি Oval আকার ধারণ করে।

**যোনি (Vagina) :** ডিম্ববাহী নলের (Oviduct) এটিই শেষাংশ। এখান থেকেই ডিম বাইরে নির্গত হয়। কিন্তু এখানে ৩০ মিনিট কাল অবস্থান করার সময়ে ডিমের খোলের চারপাশে একটি মোম জাতীয় (A waxy mucoid substance) আবরণ পড়ে। ঐ আবরণটি ডিমের খোলাকে শক্ত করে এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে ডিমের অভ্যন্তরকে রক্ষা করে। ডিমটি বহির্গত হবার পরে জল দ্বারা ধুলে ঐ মোমজাতীয় আবরণটি (Cuticle) জলে গুলে যায়।

যোনি থেকে পরিপূর্ণ ডিমটি মলদ্বারের মাধ্যমে বাইরে নির্গত হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পরেই ডিম্বাশয় থেকে আর একটি ডিম্বাণু ডিম্ববাহী নলে সঞ্চারিত হয়। এইভাবেই ডিম উৎপাদন চক্র কার্যকর হয়ে থাকে।

## ডিমের স্তর-বিন্যাস

ডিম্ব বা ডিম্বাণু থেকেই প্রায় সমগ্র প্রাণী জীবনের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ডিম্বাণুতে প্রবিষ্ট ভ্রূণের বৃদ্ধি ঘটে জননীর দেহের অভ্যন্তরে, কিন্তু হাঁস-মুরগীর ক্ষেত্রে ভ্রূণের বিশেষ বৃদ্ধি ঘটে দেহের বাইরে—অর্থাৎ ডিমে তা দেবার সময়।

প্রতিটি ডিম্বাণু (Oval) ঝিল্লী আবরিত অবস্থায় এক-একটি বোঁটার সাহায্যে ডিম্বাশয়ের (Ovary) সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তৎপরে পুষ্ট ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চুঙ্গীর (Funnel) মধ্যে আসে এবং ডিম্বনালীর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবর্ধিত

হতে হতে পরিশেষে যোনির মাধ্যমে শরীরের বাইরে বেরিয়ে আসে। ডিমের উৎপাদন সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

এখন ডিমের স্তর-বিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

১। বাইরের পাতলা শ্বেতাংশের স্তর (Outer thin white)

২। ঘন শ্বেতাংশ (Thick white)
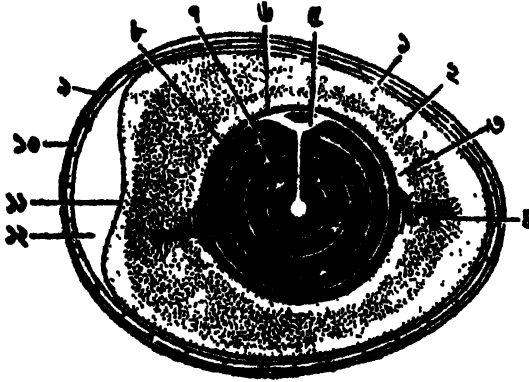
ডিমের স্তর-বিন্যাস

৩। অভ্যন্তরের পাতলা শ্বেতাংশের স্তর (Inner thin white)

৪। চালাজা (Chalaza)

৫। প্রাণমণ্ডল (Blastoderm)

৬। চালাজার স্তর (Chalaziferous layer)

৭। হলদে কুসুম (Yellow yolk)

৮। সাদা কুসুম (White yolk)

৯। মোমের ন্যায় সংরক্ষক আবরণ (Cuticle or Bloom)

১০। বাইরের জলবৎ ত্বক বা ডিমের খোলা (Outer shell membrane)

১১। খোলার অভ্যন্তরের ঝিল্লি (Inner shell membrane)

১২। বায়ু কোষ (Air cell)।

ডিমের প্রাণমণ্ডলটি কুসুমের ঠিক ওপরে থাকে। ডিমটি যে ভাবেই রাখা হোক প্রাণমণ্ডলটি সর্বদা কুসুমের ওপরেই থাকবে।

## ডিম প্রদানের ব্যবধান

কিছু কিছু মুরগী কয়েকদিন বা দীর্ঘদিন একাদিক্রমে প্রত্যেকদিন একটি করে ডিম পাড়ে। কোন কোন মুরগী আবার একদিন অন্তর-অন্তর ডিম পাড়ে। আবার কোন কোন মুরগী ২/৩ দিন একাদিক্রমে ডিম দেবার পর একদিন বা একাধিক দিন অন্তর-অন্তর ডিম পাড়ে।

## মোরগ ও মুরগীর খাদ্য এবং পানীয়

ব্রুডার হাউসে বাচ্চাদের স্থানান্তর করার পরই খাদ্য এবং পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। চটের বস্তার ওপর বা কাগজের ওপর প্রথম দিকে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। ডিম ফুটে বেরবার ২৪ ঘণ্টা পরে সচরাচর বাচ্চাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে। ডিম ফুটে বেরবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই বাচ্চারা যাতে খাদ্য ও পানীয় জল গ্রহণ করে—সেরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত। কাগজ বা চটের তৈরি বস্তার ওপর খাদ্য সরবরাহের পরবর্তী পর্যায়ে ছোট ধরনের কাঠের বা ধাতু নির্মিত পাত্রে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রথমে খাদ্য পাত্রটি ভর্তি করে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যপাত্রের দুই-তৃতীয়াংশ ভর্তি করে খাদ্য সরবরাহ করা চলতে পারে।

জলপাত্র হিসাবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রথমে Glass founts ব্যবহার করা সঙ্গত। ঈষদুষ্ণ টাটকা জল Glass founts-এর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে সরবরাহ করতে হবে। বাচ্চাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় পাত্রের আকারও ক্রমশঃ বড় হবে। নিচে একটি তালিকা দেওয়া হল।

### তালিকা

| বয়স | খাদ্যপাত্রের সংখ্যা ও আকার, ১০০টি বাচ্চা বা বয়স্ক মুরগীর জন্য | দৈনিক জলের প্রয়োজন ১০০টি বাচ্চা বা বয়স্ক মুরগীর জন্য |
|---|---|---|
| (১) ১ থেকে ৩ দিন | চটের বস্তা, কাগজ, কাগজের অল্প উঁচু প্লেট এবং ছোট ধরনের খাদ্যপাত্র (Chick-size hoppers) | ৬ থেকে ৮ পাঁইট (quarts) পানীয় জল (গ্লাস ফাউন্টস) |
| (২) ৩ দিন থেকে ৩ সপ্তাহ | দু'পাশ খোলা দু'টি ৩৬ ইঞ্চি খাদ্যপাত্র (Hoppers) | ৬ থেকে ৮ পাঁইট (Quarts) পানীয় জল (২ সপ্তাহ বয়স থেকে স্বয়ং পরিবেশিত পানীয় জলের পাত্র সরবরাহ করা চলতে পারে)। |
| (৩) ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ | দু'পাশ খোলা দু'টি ৬০ ইঞ্চির খাদ্যপাত্র (Hoppers) | * ৬ গ্যালন জল |
| (৪) ৭ থেকে ১২ সপ্তাহ | দু'পাশ খোলা দু'টি ৮ ফুটের খাদ্যপাত্র (Hoppers) | * ৬ থেকে ৮ গ্যালন জল |
| (৫) ১২ থেকে ২৪ সপ্তাহ | দু'পাশ খোলা পাঁচটি ৫ ফুট যুক্ত খাদ্যপাত্র (Hoppers) | * ৬ থেকে ৮ গ্যালন জল |

* স্বয়ং পরিবেশিত জলপাত্র বা অন্য ধরনের জলপাত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা প্রয়োজন।

যান্ত্রিক খাদ্যপাত্রের মাধ্যমে (Mechanical feeders) খাদ্য সরবরাহ করা হ'লে—প্রত্যেক ৬ থেকে ৮টি পূর্ণবয়স্ক মোরগ বা মুরগীর জন্য ১ ফুট পরিমাণ Feeding space প্রয়োজন।

মাংসের জন্যেই হোক বা ডিম উৎপাদনের জন্যেই হোক, খাদ্য ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত খাদ্য উপাদানাদির সামঞ্জস্য (Balanced supply) থাকা প্রয়োজন।

(ক) প্রোটিন (Proteins) জাতীয় খাদ্য উপাদান (খ) শ্বেতসার ও শর্করা (Carbo hydrates) জাতীয় খাদ্য উপাদান, (গ) খনিজ (Minerals) জাতীয় খাদ্য উপাদান, (ঘ) ভিটামিনস (Vitamins) জাতীয় খাদ্য উপাদান।

**(ক) প্রোটিন জাতীয় খাদ্য উপাদান ঃ** এই জাতীয় খাদ্য উপাদান শরীর গঠনে তথা রক্ত ও মাংসপেশীর প্রবর্ধনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। শুটকি মাছ, লীভার, বাদামের খইল, ভুট্টাচূর্ণ, মাংসের ছাঁট ইত্যাদি মেশ (Mash) খাদ্যে মিশ্রিত করা প্রয়োজন। ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার খাদ্যে শতকরা ২১ ভাগ প্রোটিন প্রয়োজন। ৮ থেকে ১২ সপ্তাহ বয়ঃক্রম যুক্ত বাচ্চার খাদ্যে ১৬ থেকে ১৮ শতাংশ প্রোটিন প্রয়োজন। পূর্ণবয়স্ক মুরগীর ডিম উৎপাদন বজায় রাখার জন্য খাদ্যের সঙ্গে কমপক্ষে ১৫ শতাংশ প্রোটিন সরবরাহ করা প্রয়োজন। সয়াবীন, তুলাবীজ, শুষ্ক রক্ত এবং গমের ভুসিতেও পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন বিদ্যমান।

**(খ) শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় (Carbohydrates) খাদ্য উপাদান ঃ** দেহের যন্ত্রসমূহকে সক্রিয় রাখার জন্য শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভুট্টা, গম, জই, জনার, বজরা এবং বার্লিতে শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় উপাদানাদি বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে উল্লিখিত খাদ্য উপাদানাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় উল্লিখিত খাদ্য উপাদানাদির বিকল্প হিসাবে চালের কুঁড়া এবং গুড় খাওয়াতে হবে।

**(গ) খনিজ উপাদান (Minerals) জাতীয় খাদ্য উপাদান ঃ** দেহ এবং দেহ অভ্যন্তরস্থ টিস্যুর কার্যকে স্বাভাবিক রাখার জন্য খাদ্যে খনিজ জাতীয় উপাদানাদির প্রয়োজন।

চুনাপাথর এবং ঝিনুকের গুঁড়োতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম (Calcium) বিদ্যমান।

লবণের মধ্যে রয়েছে সোডিয়াম (Sodium) এবং ক্লোরিন (Chlorine)।

ম্যাঙ্গানিজ, আইওডিন এবং দস্তা (Zinc) প্রভৃতি কেমিস্টের দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে। হাড়ের গুঁড়োতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসফরাস বিদ্যমান।

বাচ্চাদের মেশ (Mash) খাদ্যে নিম্নলিখিত পরিমাণ খনিজ উপাদানাদি থাকা আবশ্যক ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | ১ ভাগ | (১০০ ভাগের) |
| ফসফরাস | ০.৬ ভাগ | ” |
| লবণ | ০.৫ ভাগ | ” |
| পটাসিয়াম | ০.২ ভাগ | ” |

প্রতি ৪৫০ গ্রাম খাদ্যের সঙ্গে—

| | |
|---|---|
| ম্যাঙ্গানিজ | ২৫ মিলিগ্রাম |
| আইওডিন | ০.৫ মিলিগ্রাম |
| জিঙ্ক (Zinc) | ০.৫ মিলিগ্রাম |

**(ঘ) ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' খাদ্য উপাদান :** কডলিভার অয়েল বা অন্যবিধ feeding oil বা দানা খাবারের মাধ্যমে—'এ' ও 'ডি' ভিটামিনের সংযোজন আবশ্যক। ভিটামিন 'এ'—সর্দি-কাশি (Colds) রোধের সহায়ক।

ভিটামিন 'ডি'—বাচ্চাদের রিকেট (Ricket) রোগ প্রতিরোধে বিশেষ সহায়ক। তা ছাড়া পূর্ণবয়স্ক মুরগীর Egg-shell-এর গঠনেও ভিটামিন 'ডি' প্রয়োজন।

**ভিটামিন—এ**

বাচ্চার মেশ খাদ্যে প্রতি ৪৫০ গ্রাম খাদ্যের সঙ্গে ১২০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ'র সংযোজন আবশ্যক। শাক-সবজি, পাকা ভুট্টা এবং কডলিভার অয়েলে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন 'এ' বিদ্যমান।

**ভিটামিন—ডি**

প্রতি ৪৫০ গ্রাম খাদ্যের সঙ্গে ৯০ আন্তর্জাতিক ইউনিট (I.C.U.) ভিটামিন 'ডি' প্রয়োজন। যে সকল বাচ্চারা সূর্যালোকে পরিবর্ধিত হয় এদের দেহের অভ্যন্তরে আপনা থেকেই ভিটামিন-ডি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

## দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অ্যান্টিবায়োটিক্স

বাচ্চাদের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য—অরোমাইসিন (Aureomycin), টেরামাইসিন (Terramycin), ক্লোরোমাইসেটিন (Chloromycetin), এবং নিওমাইসিন (Neomycin) প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিকস প্রয়োজন। মাংসল জাতীয় (Meat-type) বাচ্চাদের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিকসের সংযোজন প্রয়োজন।

প্রতি টন খাদ্যের সঙ্গে ৪ থেকে ১০ গ্রাম অ্যান্টিবায়োটিকসের সংযোজন আবশ্যক। অ্যান্টিবায়োটিকসের প্রভাবে ১ থেকে ৪ বা ৬ সপ্তাহ বয়স্ক বাচ্চাদেরই দৈহিক বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব।

কিন্তু পূর্ণবয়স্ক এবং স্বাস্থ্যবান মোরগ বা মুরগীর দৈহিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকস কার্যকর নয়।

## জল

কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ না করেও মুরগীরা কয়েকদিন বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু জল না খেলে কিছু সময়ের মধ্যেই Collapse করতে পারে।

জল খাদ্য পরিপাকের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ; রক্তকে খাদ্যের সারাংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং রক্ত-সঞ্চালনের ক্ষেত্রেও জল বিশেষ সহায়ক। শরীরের অভ্যন্তরস্থ তাপমাত্রার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান করে জল। গ্রন্থিসমূহ (Joints) Lubricate কবার জন্যও জলের প্রয়োজন।

অতএব মুরগীর বাচ্চাদের বা বয়স্ক মোরগ বা মুরগীর বা মোরগদের পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা প্রয়োজন। ১ দিন বয়স্ক ১০০টি বাচ্চা ১ দিনে ৪ পাঁইট (Quarts) জল পান করে থাকে। ৬ সপ্তাহ বয়স্ক ১০০টি বাচ্চা ১ দিনে ৩ থেকে ৫ গ্যালন জল পান করে থাকে। বয়স যত বাড়বে—বাচ্চাদের জলের প্রয়োজনও তত বেশি হবে।

## বয়স অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণগত চার্ট

| বয়স | প্রতি পাউণ্ড দানা খাবারে ১০% প্রোটিন, প্রতি ১০০ পাউণ্ড মেশ খাদ্যে ২০% প্রোটিন | প্রোটিনের শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১ থেকে ৬ সপ্তাহ | মেশ খাদ্য ঃ দানা খাবার নয় | ২০ থেকে ২১ শতাংশ |
| ৭ থেকে ৮ সপ্তাহ | ১০ পাউণ্ড (দানা ও মেশে বিভক্ত করে) | ১৮ থেকে ১৯ শতাংশ |
| ৮ থেকে ৯ সপ্তাহ | ২০ পাউণ্ড | ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ |
| ১০ থেকে ১২ সপ্তাহ | ৪০ পাউণ্ড | ১৬ থেকে ১৭ শতাংশ |
| ১৩ থেকে ১৪ সপ্তাহ | ৬০ পাউণ্ড | ১৫ থেকে ১৬ শতাংশ |
| ১৫ সপ্তাহ | ৮০ পাউণ্ড | ১৫ থেকে ১৬ শতাংশ |
| *১৬ সপ্তাহ | ১০০ পাউণ্ড (½ ভাগ A.M. ½ ভাগ P.M.) | ১৫ থেকে ১৬ শতাংশ |

* প্রতি ১০০ পাউণ্ড মিশ্রিত দানা খাবারের সঙ্গে ১০% প্রোটিন এবং প্রতি ১০০ পাউণ্ড মেশ খাদ্যের সঙ্গে ২০% প্রোটিন থাকা আবশ্যক। ১৩ সপ্তাহ বয়স্ক তরুণ মুবগীর প্রতি ১০০ পাউণ্ড খাদ্যের সঙ্গে ১৫% প্রোটিন উপাদান থাকা উচিত।

## বাচ্চাদের খাওয়াবার ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ

১। ব্রুডার হাউসে আনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২। ব্রুডার হাউসের নানা স্থানে খাদ্যপাত্রাদি ছড়িয়ে রাখতে হবে। প্রথম সপ্তাহে হোডারের কাছাকাছি অঞ্চলে খাদ্যপাত্রাদি স্থাপন করা আবশ্যক। ১ পাঁইট (Quart) জল ধরে এরূপ গ্লাস ফাউন্ট সমূহ সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করতে হবে।

৩। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ৩০ মিনিটের বেশি সময় খাদ্যপাত্রাদি খালি রাখা চলবে না। বাচ্চারা যাতে নিজেদের ইচ্ছা তথা প্রযোজনমতো খাদ্য গ্রহণ করতে পারে—সেইরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেকদিন খাদ্যপাত্রাদি পরিষ্কার করতে হবে।

৪। ৬ সপ্তাহ বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার পরে দানা খাবার খাওয়ানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে। সপ্তাহে অন্ততঃ দু'দিন মেশ খাদ্যের ওপরে দানা খাবার ছড়িয়ে—দানা খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত করতে হবে।

৫। ৩ সপ্তাহ বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার পরে সূক্ষ্মভাবে কাটা শাক-সবজি খাওয়ানো চলতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে শাক-সবজি খাওয়াতে পারলে—খাদ্যজনিত ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

৬। বাচ্চাদের তথা বাড়ন্ত বাচ্চাদের প্রাথমিক খাদ্য তালিকায় (Starter) এবং মেশ খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ Calcium থাকায়—ডিম দিতে শুরু করার আগে—অতিরিক্ত ঝিনুক চূর্ণ খাওয়ানোর প্রয়োজন হয় না। ডিম দিতে শুরু করার পর অতিরিক্ত ঝিনুক চূর্ণ খাওয়ানো চলতে পারে।

৭। মোটা ও লম্বা ধরনের ঘাস-পাতা (শাক-সবজি) খাওয়ানো উচিত হবে না; সূক্ষ্মভাবে কেটে খাওয়াতে হবে।

৮। খাদ্যপাত্রাদি দিনে ১ বার করে পরিষ্কার করতে হবে। খাদ্যপাত্রে যে খাবাব অবশিষ্ট থাকবে—তা টাটকা মেশের (mash) সঙ্গে উত্তমরূপে মিশ্রিত করে সরবরাহ করতে হবে।

৯। পুরানো খাদ্যপাত্রের পরিবর্তে নতুন খাদ্যপাত্র Replace করতে হ'লে—নতুন খাদ্যপাত্রের সঙ্গে বাচ্চাদের অভ্যস্থ হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ কয়েকদিন আগে থেকেই পুরানো ও নতুন খাদ্যপাত্র পাশাপাশি রেখে উভয় ধরনেব খাদ্যপাত্রেই খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

## বাচ্চাদের প্রাথমিক খাদ্য

### [ Chick-starter or Starting Mash Formulae ]

### খনিজ উপাদান

৪০ ভাগ সেদ্ধ করা হাড়চূর্ণ (Bone meal) ; ৪০ ভাগ ঝিনুক চূর্ণ বা চুনাপাথর চূর্ণ; ১৯ ভাগ আইওডাইজড লবণ (Iodized salt); ১ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ সল্ট এবং ৩০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট।

প্রতি ১০০ ভাগ খনিজ জাতীয় উপাদানে উল্লিখিত উপাদানাদি থাকবে।

## বাচ্চাদের প্রাথমিক মেশ খাদ্য

### (Starter-Ration)

| | প্রতি ১০০ কিলোগ্রামের ভাগ |
|---|---|
| জনার বা ভুট্টা চূর্ণ | ২০ ভাগ |
| চালের কুঁড়ো | ২০ ,, |
| বাদাম খইল | ১০ ,, |
| তুলা বীজের খইল | ১০ ,, |
| গুড় | ৭ ,, |

| | প্রতি ১০০ কিলোগ্রামের ভাগ | |
|---|---|---|
| শুটকী মাছ চূর্ণ | ৩ | ” |
| শুষ্ক রক্ত মিশ্রিত গমের ভূসি | ০ | ” |
| খনিজ উপাদান | ৩ | ” |
| মহুয়া ফুলচূর্ণ | ৮ | ” |
| শুষ্ক বারসিম (Lucerne) | ৬ | ” |
| গোবর | ৩ | ” |
| ভিটামিন 'এ' | ৩ | গ্রাম |
| ভিটামিন 'ডি' | ১½ | ” |
| অ্যান্টিবায়োটিকস (অরোমাইসিন বা টেরামাইসিন) | ১½ | ” |

## মোরগ ও মুরগীর পৃথকীকরণ

৬ থেকে ৮ সপ্তাহ বয়ঃক্রমকালে তরুণ মুরগী এবং তরুণ মোরগ সচরাচর পৃথকস্থানে রাখা হয়। তরুণ মোরগদের, এবং মাংসল জাতীয় (meat type) মোরগ-মুরগীদের নির্দিষ্ট খাদ্য খাইয়ে পরে বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

## মাংসল জাতীয় (Broilers) মোরগ-মুরগীর খাদ্য

বাচ্চাদের যে খাদ্য খাওয়ানো হয়—মাংসলজাতীয় মোরগ-মুরগীর সেই খাদ্য খাওয়ানো হয়।

শীতকালে প্রতিটি Broiler-এর জন্য ৯ বর্গ ডেসিমিটার Floor-space প্রয়োজন। আর গ্রীষ্মকালে ৯·৩ বর্গ ডেসিমিটার Floor-space প্রয়োজন। এদের ক্ষেত্রে Rooting space বা roosts-এর কোন প্রয়োজন নেই। সচরাচর Broilers-গুলিকে দানা খাবার খাওয়ানো হয় না। কেবলমাত্র মেশ (mash) খাইয়ে ৮ সপ্তাহ বয়স হলেই বিক্রি করে ফেলা হয়। অধিকাংশ Broilers-এর ১০ সপ্তাহ বয়সে ১·৩৬ কেজি ওজন হয়—অতএব খাদ্যজনিত অপচয় রোধ করার জন্য—ঐ সময়েই Broilers গুলো বিক্রি করে ফেলা সঙ্গত।

প্রতি টন খাদ্যের সঙ্গে ১০ গ্রাম অরোমাইসিন খাওয়ালে—খুব শীঘ্র শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে এবং ১০ সপ্তাহ বয়ঃক্রমকালে বিক্রির উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

## ডিমপাড়া মুরগীর খাদ্য

ডিম উৎপাদনকারী মুরগীগুলো খাদ্য যোগাতেই বেশি ব্যয় হয়ে থাকে। অতএব বাছাইকরা মুরগীগুলোই (বেশি সংখ্যক ডিম উৎপাদনে সক্ষম) পালন করা সঙ্গত।

বেশি পরিমাণ খাদ্য খাওয়ালেই যে বেশি ডিম দেবে—তা নয়। যে খাদ্যাদি খাওয়ানো হবে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। খাদ্যে ১৬ থেকে ২০ শতাংশ

প্রোটিন উপাদান, খনিজ উপাদান, শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় উপাদান এবং ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'র সংযোজন আবশ্যক। উল্লিখিত খাদ্য উপাদানাদির গুণাগুণ ও উৎস সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

## খাদ্যের পরিমাণ

প্রতিটি মুরগী কি পরিমাণ খাদ্য খাবে—তা মুরগীর জাত, আকার, ডিম উৎপাদন এবং পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। যে মুরগীটি প্রতিদিন ১টি করে ডিম দেয়—তার শরীর সংরক্ষণের জন্য মোট খাদ্যের ৪/৫ অংশ প্রয়োজন, আর ১/৫ অংশ প্রয়োজন ডিম উৎপাদনের জন্য। খাদ্যের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে টাটকা জল খাওয়ানো আরও বেশি প্রয়োজন।

যে সকল মুরগী বেশি সংখ্যক ডিম দেয় এবং ডিমগুলো যদি আকারেও বড় হয়—সেই সকল মুরগীর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন। শরীর সংরক্ষণের কথা বাদ দিয়েও—প্রতি ১০টি ডিমের জন্য ০৪৫ কিলোগ্রাম (বা ৪৫০ গ্রাম) শুষ্ক খাদ্যের প্রয়োজন।

**Iowa পোলট্রির ডিম উৎপাদনের রেকর্ড অনুযায়ী জানা গেছে ঃ**

| | খাদ্য-পরিমাণ |
|---|---|
| প্রতিটি মুরগী গড়ে বছরে ২৪১ সংখ্যক ডিম দেয়। | বছরে গড়ে প্রায় ৪৯·৮৯ কেজি খাদ্য লেগেছে ঐরূপ প্রতিটি মুরগীর জন্য। |
| গড়ে বছরে ১৬০টি ডিম দেয় প্রতিটি এরূপ মুরগী | ঐরূপ প্রতিটি মুরগীর জন্য গড়ে বছরে খাদ্য লেগেছে ৪৮·৯৮ কেজি |

হাল্কা জাতের মুরগী ডিম দেয় বেশি কিন্তু খায় কম।

লেগহর্ন জাতের মুরগী কম পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করেও, ডিম বেশি দিয়ে থাকে।

## ডিমপাড়া মুরগীর মেশ (Mash) খাদ্য

| | | |
|---|---|---|
| হলুদ ভুট্টাচূর্ণ | — | ৩০০ গ্রাম |
| চালের কুঁড়া | — | ২০০ ” |
| বাদাম খইল | — | ১০০ ” |
| নারকেল খইল | — | ৫০ ” |
| তুলাবীজের খইল | — | ৫০ ” |
| শুটকী মাছ চূর্ণ | — | ২৪০ ” |
| ঝিনুক চূর্ণ ও গুড় | — | ৩০ ” |
| হাড়ের গুঁড়া বা চূর্ণ | — | ২০ ” |
| সাধারণ লবণ | — | ১০ ” |
| | মোট | ১০০০ গ্রাম |

## দানা খাবার

ভূট্টাচূর্ণ, গমচূর্ণ, চালের খুদ, জোয়ার ইত্যাদি। দুই বা ততোধিক শস্য মিশ্রিত শুষ্ক খাদ্যকে দানা খাবার আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

## খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য

সচরাচর একটি পূর্ণবয়স্ক মুরগী দৈনিক ৪ থেকে ৫ আউন্স খাদ্য গ্রহণ করে। ডিম পাড়ার দ্বিতীয় বছরে উত্তীর্ণ বয়স্ক প্রতিটি মুরগী দৈনিক ৬ আউন্স পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।প্রাত্যহিক খাবার—প্রতিটি বয়স্ক মুরগীর জন্য ২ থেকে ২½ আউন্স মেশ (mash) খাদ্য এবং ২ থেকে ২½ আউন্স দানা খাবার এবং ১ আউন্স শাক-সবজি ও ঘাস।

### খাদ্য খাওয়ানোর সময়

| | |
|---|---|
| সকাল ৫টা থেকে ৬টায়— | ১ আউন্স দানা খাবার |
| সকাল ১০টায়— | ১½ আউন্স মেশ খাদ্য |
| বেলা ১২টায়— | ১ আউন্স শাক-সবজি |
| দুপুব ২টায়— | ১ আউন্স মেশ খাদ্য |
| বিকাল ৫টায়— | ১½ আউন্স দানা খাবার |
| | মোট ৬ আউন্স |

একসঙ্গে অনেক মুরগী একঘরে রাখলে—অবশ্য অনুরূপ হিসাবে খাদ্য খাওয়ানো সম্ভব নয়—তবে প্রতিটি বাচ্চার জন্য ২ থেকে ৩ আউন্স মেশ এবং বাডন্ত বা তরুণ বা পূর্ণবয়স্ক প্রতিটি মুরগীর জন্য প্রত্যহ ৫ থেকে ৬ আউন্স পবিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রদত্ত মেশ ও দানা খাবার সম্বন্ধে নির্দেশ নিচে দেওয়া হলো ঃ**

| উপাদান | মেশ খাদ্য মুরগীর বাচ্চা ও ডিম পাড়া মুরগীর জন্য | মেশ খাদ্য মাঝারি ও বড় বাচ্চার জন্য |
|---|---|---|
| বাদাম খইল | ৩০ ভাগ | ১০ ভাগ |
| তিসির খইল | ১০ ভাগ | ৫ ভাগ |
| সরিষার খইল | ৩ ভাগ | ৩ ভাগ |
| শুটকী মাছ/মাংসের ছাঁট/গুঁড়া দুধ | ১০ ভাগ | ৫ ভাগ |
| গমের ভুসি বা চালের কুঁড়া | ১৫ ভাগ | ৫০ ভাগ |
| চালের খুদ/ভুট্টা চূর্ণ আটা | ৩০ ভাগ | ২৫ ভাগ |
| লবণ | ½ ভাগ | ½ ভাগ |
| চুনাপাথর কুচি/ঝিনুক চূর্ণ | ১ ভাগ | ১ ভাগ |
| খনিজ পদার্থ চূর্ণ | ½ ভাগ | ½ ভাগ |
| | মোট ১০০ ভাগ | মোট ১০০ ভাগ |

## দানা খাবার

গম, চাল, ভুট্টা ও জোয়ার—১০০ ভাগ। ১০০ ভাগ মিশ্রিত দানা খাবারের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় দানা খাবারের শতকরা ৫০ ভাগ চালের কুঁড়া এবং গুড়ের সমন্বয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে।

## খাদ্য সরবরাহের পদ্ধতি

কেবলমাত্র দানা খাবারের মধ্যে ডিমপাড়া মুরগীর জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার পুষ্টিকর উপাদান (Nutrients) লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব দানা খাবারের সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক খাদ্য অর্থাৎ প্রোটিন, খনিজ উপাদান এবং ভিটামিনস (এ এবং ডি) সরবরাহ করা প্রয়োজন। অতএব দানা খাবার ও মেশ (Mash) খাদ্য অর্থাৎ উভয় ধরনের খাদ্যই খাওয়ানো প্রয়োজন।

ডিমপাড়া মুরগীব খাদ্য খাওয়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) **দানা খাবার ও মেশ খাদ্য ঃ** এই পদ্ধতিতে প্রতিদিন বিকালে খাবার জন্য দানা খাবার খাদ্যপাত্রে রাখতে হবে আর দিনের অন্যান্য সময়ে কেবলমাত্র মেশ খাদ্য খাদ্যপাত্রে সরবরাহ করতে হবে। তবে মেশ খাদ্যের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ প্রোটিন উপাদানের সংযোজন প্রয়োজন।

(২) এই পদ্ধতি উল্লিখিত পদ্ধতির অনুরূপ। তবে মেশ খাদ্যে শতকরা ২০ ভাগের পরিবর্তে ২৬ ভাগ প্রোটিন কনসেন্ট্রেটের (Protein concentrate) সংযোজন প্রয়োজন।

(৩) **কেবলমাত্র মেশ খাদ্য ঃ** মেশ খাদ্যের সঙ্গে দানা খাবার চূর্ণ মিশিয়ে খাদ্যপাত্রে সরবরাহ করতে হবে। তবে মিশ্রিত উপাদানসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ (Balanced) হওয়া প্রয়োজন।
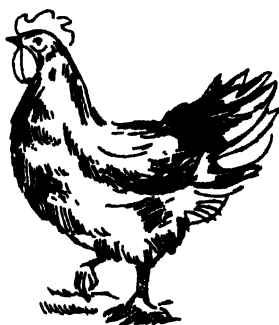
# মোরগ-মুরগি পালন ও পোষণ

বিগত ৫০ বছরের মধ্যে—পোলট্রির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নতি সূচিত হয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে যেভাবে হাঁস-মুরগি পালন করা হতো—এখন আর সেভাবে হাঁস-মুরগি পালন করা হয় না—অর্থনৈতিক কারণই হচ্ছে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মূল উৎস।

পঞ্চাশ বছর আগে পোলট্রি ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পের সমগোত্রীয়। হাঁস-মুরগির প্রতিপালকগণ তেমন যত্ন লওয়ারও প্রয়োজন বোধ করত না। ফলে উৎপাদনও কম হতো। তাছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে Poultry Birds-এর সংখ্যা এখনও কম। পোলট্রির ক্ষেত্রে এখনও ভারত অনেক পিছিয়ে রয়েছে। নিচের তালিকাটি লক্ষ্য করলেই এ বিষয়ে ধারণা জন্মাবে ঃ

| প্রতি ১০০ জন মানুষের জন্য | মুরগি ও মুরগির বাচ্চার সংখ্যা |
|---|---|
| ভারতে | ... ... ২৫টি |
| ডেনমার্কে | ... ... ৫৪০টি |
| ক্যানাডায় | ... ... ৩৭৩টি |
| আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে | ... ... ২৮৬টি |
| বৃটেনে | ... ... ১৭৯টি |
| অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে | ... ... ১৫০ থেকে ২০০টি |

ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারতীয় দেশী মুরগি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ভারতীয় দেশী মুরগি গড়ে প্রতি বছর মাত্র ৬০টি করে ডিম দিয়ে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের গড় উৎপাদনের তুলনায় এই ডিম উৎপাদনের সংখ্যা অর্ধেকেরও কম।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের এক-একটি মুরগি প্রতি বছর গড়ে ১৩০টি ডিম দিয়ে থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর এক-একটি মুরগি গড়ে ২১৭টি ডিম দিয়ে থাকে।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী বলা যায় যে—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ভারতের প্রতিটি মানুষ প্রতি বছর গড়ে | | | ৮টি | ডিম পেতে | পারে |
| আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের | ” | ” | ৩০৮টি | ” | ” |
| ক্যানাডার | ” | ” | ২৮২টি | ” | ” |
| আইরিশ রিপাবলিকের | ” | ” | ২৮১টি | ” | ” |
| পশ্চিম জার্মানির | ” | ” | ২৪৯টি | ” | ” |

অতএব উন্নত জাতের মুরগি পুষে বা ক্রশ-ব্রীডিং-এর মাধ্যমে উন্নত জাতের ডিমপাড়া মুরগি সৃষ্টি করে ডিম উৎপাদনের গড় বৃদ্ধি করা সঙ্গত, যাতে প্রতি বছর দেশের প্রতিটি মানুষ গড়ে অন্তত ১০০টি করে ডিম পেতে পারে।

ভারতবর্ষে প্রতিটি মানুষ প্রতি বছর গড়ে কেবলমাত্র ১৩১ গ্রাম করে মুরগির মাংস পেতে পারে, পক্ষান্তরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি ব্যক্তি গড়ে প্রায় ১৫ কিলোগ্রাম মুরগির মাংস পেতে পারে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের প্রতিটি ব্যক্তি গড়ে প্রতি বছর ২·৪৭ থেকে ৫·৯৫ কিলোগ্রাম মুরগির মাংস পেতে পারে।

## পোলট্রি পাখি (হাঁস-মুরগি)-র ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের স্থান

রাজ্যওয়ারী পোলট্রি পাখির পরিসংখ্যানে অন্ধ্রপ্রদেশের স্থান সকলের শীর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়।

| বিভিন্ন রাজ্যের নাম | | | পোলট্রি পাখীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| অন্ধ্রপ্রদেশে | ... | ... | ১৪,৭১৪,৬৮৩ |
| পশ্চিমবঙ্গে | ... | ... | ১২,৮১৮,১৯০ |
| তামিলনাড়ুতে | ... | ... | ১১,২২৫,৮৯০ |
| আসামে | ... | ... | ১০,৯৮৪,৫০২ |
| বিহারে | ... | ... | ১০,৮৪৯,৪৪৪ |
| কেরালায় | ... | ... | ৯,৯০৮,৯৮৭ |
| মহারাষ্ট্রে | ... | ... | ৯,৯০১,৯৮৭ |
| কর্ণাটকে | ... | ... | ৮,২৭৬,৭৯৭ |

## উৎপাদন (Poultry Production)

পোলট্রি সংক্রান্ত উৎপাদন আমাদের দেশে প্রথমে ক্ষুদ্র গ্রামীণ উদ্যোগ হিসাবেই কিছুটা প্রসার লাভ করেছিল মাত্র। খেয়ালখুশিমতো গ্রামের লোকের পারিবারিক যোগান অথবা সামান্য অর্থলাভের জন্য দেশী হাঁস-মুরগী পালন করতেন। কিন্তু বিগত ১৫ বছর থেকে পোলট্রির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণেই এই ধরনের উন্নতির প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের নানা বাড়িতে ৫ থেকে ১০টি মুরগী পালন করা বা ছোটখাটো পোলট্রি ফার্ম তো এখন মাঝে মাঝেই নজরে পড়ে। ১০০ থেকে ৫০০ মুরগী পালন করে অনেকেই নিয়মিত আয় করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করছেন—এমন দৃষ্টান্ত এখন আর বিরল নয়। ১০,০০০ থেকে ৫০,০০০ মুরগী পালন করছেন—এমন অনেক সংখ্যক পোলট্রিও ভারতে রয়েছে। তাছাড়া ডিমের চাহিদা এবং মাংসের চাহিদার কারণেও উন্নত জাতের ডিমপাড়া মুরগী তথা মাংসল (meat-type) মুরগী পোষার প্রবণতাও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বেকারীকে কিছু অংশে লাঘব করার জন্য রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারও পোলট্রির প্রসারের ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন। তাছাড়া ব্যাঙ্কের কাছ থেকেও পোলট্রি ব্যবসায়ের জন্য বর্তমানে ঋণ পাওয়া যাচ্ছে।

## মুরগী পালনের অর্থনৈতিক দিক

দেশী মুরগী পালন করে বা গ্রামাঞ্চলে অবিজ্ঞানসম্মতভাবে মুরগী পালন করে—এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া পোলট্রির উন্নতি বিধানের জন্য—অর্থনৈতিক দিকের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা অবশ্যই প্রয়োজন। ভারতবর্ষে পোলট্রির ব্যবসার ভবিষ্যতও—অর্থনৈতিক সুবিবেচনার ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

পোলট্রি ব্যবসায়ের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই আর্থিক দিক থেকে বিশেষ লাভবান হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মুরগী পালন করে—পোলট্রির মালিকগণ বেশি সংখ্যক ডিম ও পর্যাপ্ত মাংস পেতে পারে। কারণ একটি উন্নত জাতের মুরগী থেকে বছরে গড়ে ১৮০ থেকে ২০০টি ডিম পাওয়া যেতে পারে। যে মুরগীটি বছরে গড়ে প্রায় ২০০টি ডিম দিয়ে থাকে—সেই ডিমের শতকরা ২৫টি ডিমে যদি তা দেওয়া যায়—কম করে ৭৫ সংখ্যক স্ত্রী মুরগী পাওয়া যাবে এবং ঐ ৭৫টি মুরগী আবার ৬ মাস পরে ডিম দিতে শুরু করবে, এবং ঐ ডিমের শতকরা ৭৫ ভাগ তা দিয়ে পরবর্তী বছরে প্রায় ৫০০০ মুরগী সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ একটি মুরগী থেকে দু'বছরে প্রায় ৫০০০ মুরগী পাওয়া যাবে।

মোরগ বা ডিমপাড়া মুরগীর জন্য যে মোট ব্যয় হয়—সেই ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্যের জন্য ব্যয় হয়ে থাকে ; অতএব দেশী মুরগী পালন করে লাভ তো হয়ই না, বরং লোকসান হয়। কারণ দেশী মুরগী বছরে গড়ে ৫০ থেকে ৬০টি ডিম দিয়ে থাকে আর হোয়াইট লেগ হর্ন বা উন্নত জাতের মুরগী বছরে গড়ে ১৫০ থেকে ২০০টি ডিম দিয়ে থাকে। রোড আইল্যান্ড রেড জাতের মুরগীও বেশি সংখ্যক ডিম দিয়ে থাকে। তাছাড়া বিদেশী উন্নত জাতের মুরগীর ডিম আকারে বড় হওয়ায়—ডিমের দামও বেশি পাওয়া যায়। অতএব পোলট্রি ব্যবসায়ে অর্থনৈতিক দিক চিন্তা করলে হোয়াইট লেগ হর্ন বা রোড আইল্যাণ্ড রেড জাতের মুরগী পালন করাই সঙ্গত।

উত্তমরূপে খাদ্য খাওয়ালে দেশী মুরগী ১২০টি ডিমও দিতে পারে—তাহলেও দেশী মুরগী পালন করে খুব সামান্য অর্থই লাভ করা সম্ভব।

কিন্তু ক্রশ-ব্রীডিং এর মাধ্যমে উন্নত ধরনের (দেশী মুরগী—হোয়াইট লেগ হর্ন বা রোড আইল্যান্ড রেড মোরগ) বর্ণ-সঙ্কর মুরগী সৃষ্টি করলে—যেমন ডিমও পাওয়া যাবে বেশি, তেমনি ডিম আকারেও বড় হবে।

গ্রামাঞ্চলে যারা ৫/১০টি দেশী মুরগী পালন করেন তাঁরা অবশ্য মুরগীর খাদ্যের পেছনে বেশি ব্যয় করেন না ; কারণ মুরগীগুলো এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে খুঁটে খুঁটে খায়। মাঝে মাঝে মুরগীর মালিকদের পাড়া-পড়শীর অভিযোগও শুনতে হয়। কিন্তু ওভাবে মুরগী পালন করে পোলট্রি ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। পোলট্রির মাধ্যমে দেশী মুরগী পালন করলে—আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অবশ্যই হতে হবে। দেশী মুরগীর ডিমের দামও কম। প্রতি ডজন দেশী মুরগীর ডিমের দাম যদি

১৫ টাকা হয়, হোয়াইট লেগ হর্ন বা রোড আইল্যাণ্ড রেড জাতের মুরগীর ডিম প্রতি ডজনের দাম হবে ২০ টাকা।

দ্বিতীয় ডিমপাড়া বছর (Second laying-year) থেকে মুরগী প্রথম বছর (First laying year) অপেক্ষা কম ডিম দিয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় ডিম-পাড়া বছরে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়, সেইজন্যে অভিজ্ঞ পোলট্রির মালিকগণ দ্বিতীয় বছর থেকে মুরগী replace করে থাকেন। কিন্তু যে সকল মুরগী অত্যন্ত বেশি ডিম দেয়—সেই সকল মুরগীকে পরের ডিমপাড়া বছরে অনেক সময় বাতিল বা replace করা হয় না। তবে প্রথম ডিমপাড়া বছরের পরে মুরগীদের replace করতে হলে ঐ পোলট্রি ফার্মে অবশ্যই পৃথক ব্রুডিং হাউস (brooding house) থাকা আবশ্যক।

পুরানো ডিমপাড়া মুরগীদের পরিবর্তে নতুন ডিমপাড়া মুরগীদের আনতে হবে। কারণ ডিম পাড়ার প্রথম বছরে (First laying year) মুরগীরা বেশি ডিম দিয়ে থাকে। অতএব পুরানো ডিমপাড়া মুরগীদের dispose করা পোলট্রির দিক থেকে লাভজনক। তবে নতুন ডিমপাড়া মুরগীদের (Pullets) পুরানো ডিম-পাড়া মুরগীদের ঘরে আনার আগে—ঘরটি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করা আবশ্যক।

পোলট্রি ব্যবসায়ে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবেঃ

(১) যেহেতু মুরগীর খাদ্য পিছু ব্যয় সমগ্র ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক, সেই কারণে অধিক সংখ্যক ডিম দেয় এমন মুরগীই প্রতিপালন করতে হবে।

(২) পোলট্রি ফার্মে পৃথক brooding hens রাখতে হবে। কারণ, বাচ্চা মুরগীরা ঐ ঘরেই বাচ্চা থেকে ডিমপাড়া পর্যায়ে (Laying stage) উন্নীত হয়।

(৩) Sanitation ব্যবস্থা উত্তম হওয়া আবশ্যক।

(৪) যে সকল মুরগী বেশি সংখ্যক ডিম দেয় না—সেই সকল মুরগী বিক্রি করে ফেলতে হবে অথবা অন্যভাবে dispose করতে হবে। দ্বিতীয় বছরে বেশি সংখ্যক ডিম দেয় এরূপ মুরগীরও ডিম উৎপাদন হ্রাস পায় সেইহেতু—ঐ সকল মুরগীও replace করা লাভজনক।

(৫) অর্থনৈতিক দিকের ওপর সর্বদা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(৬) যে সকল মুরগী বেশি ডিম দেয় এবং ডিমগুলোও আকারে বড়—তেমন মুরগীই লাভজনক।

## ভারতে পোলট্রির উন্নতি বিধান করা কেন উচিত?

ক। স্বল্প ব্যয়ে অধিক পুষ্টিকর খাদ্যই ভারতে বর্তমানে প্রয়োজন।

খ। পোলট্রি ব্যবসায়ে মূলধন বেশি লাগে না। অথচ অন্যান্য ধরনের কৃষিফার্মে খুব বেশি মূলধন লাগে। স্বল্প মূলধনে পোলট্রি ব্যবসা অবশ্যই শুরু করা যায় এবং পোলট্রি ব্যবসায়ের আয় দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করা অবশ্যই সম্ভব।

গ। আধুনিক ব্যবস্থায় পোলট্রি ফার্মের জন্য খুব বেশি পরিমাণ space বা জমির প্রয়োজন হয় না। বড় তথা ছোট শহরে বাড়ির পেছনের সামান্য জমিতেও (back yard) ছোট পোলট্রি ফার্ম গড়ে তোলা সম্ভব।

ঘ। পোলট্রি ব্যবসায়ে খুব তাড়াতাড়ি আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব। হোয়াইট লেগ হর্ন মুরগী ৫ মাস বয়স থেকেই ডিম দিতে শুরু করে। আড়াই মাস পর থেকেই মাংস হিসাবে মোরগ (broilers) বিক্রি করে বিশেষ লাভবান হওয়া সম্ভব।

ঙ। দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারীজনিত সমস্যার অন্ততঃ কিছুটা নিরসন করা পোলট্রি ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্ভব। যখন হাতে কোন কাজ থাকে না বা অবসর সময়ে কাজ করে পোলট্রির ব্যবসা করে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব।

চ। ভারতে পুষ্টিকর খাদ্য, বিশেষ করে প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের যথেষ্ট অভাব বিদ্যমান। ৩½ কেজি খাদ্য খাইয়ে ১½ কেজি মুরগীর মাংস পাওয়া যায়। আর ২ থেকে ২½ কেজি খাদ্য খাইয়ে ১ ডজন ডিম পাওয়া সম্ভব।

ছ। ভারতে শিল্প কারখানার waste সমূহ যথাযথরূপে ব্যবহার করা হয় না। Cillin, Mycelia এবং Food byproduct সমূহকে অনায়াসে মুরগীর খাদ্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

জ। ভারতে বর্তমানে বিদেশী উন্নত জাতের মোরগ বা মুরগী যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া সম্ভব। ডিমের জন্য হোয়াইট লেগ হর্ন বা রোড আইল্যান্ড রেড মুরগী সরকারী তথা বেসরকারী পোলট্রি ফার্ম থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংগ্রহ করা সম্ভব। আর মাংসের জন্য উন্নত ধরনের হোয়াইট রকস এবং হোয়াইট কর্নিশ জাতের মোরগ-মুরগী এবং বাচ্চা সরকারী তথা বেসরকারী পোলট্রি ফার্ম থেকে অনায়াসে প্রয়োজনমত সংগ্রহ করা সম্ভব।

ঝ। জমির সার তথা soil-building-এর ক্ষেত্রেও পোলট্রির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বিদ্যমান। মুরগীর মল-মূত্রে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। অতএব জমির সার হিসাবে নিঃসন্দেহে এটি একটি উৎকৃষ্ট সার। মোরগ-মুরগী ঘেরা বা আবদ্ধ জায়গায় প্রতিপালন করলে মলমূত্রজনিত সারকে অনায়াসে কাজে লাগানো সম্ভব।

ঞ। নানা দৈব-দুর্বিপাকের কারণে অর্থাৎ প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত কারণে (খরা, বন্যা প্রভৃতি) ভারতীয় কৃষকদের মাঝে-মাঝেই ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। অতএব মিশ্র ফার্মিং-এর মাধ্যমে (কৃষি ও পোলট্রি ব্যবসা) ফার্মের আয়কে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

ডিম-পাড়া মুরগীর ডিম এবং মাংসল বা বাতিল মোরগ-মুরগীর মাংস বিক্রি করে সারা বছরই লাভ উঠানো সম্ভব।

## পোলট্রিতে উৎপন্ন সারের প্রয়োজনীয়তা

গো-মহিষাদির গোবর অপেক্ষা মুরগীর মল-মূত্রে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম উপাদান বিদ্যমান। অতএব মোরগ-মুরগীর মল-মূত্র সার হিসাবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। মুরগীর মলে আর্দ্রতা বা জলীয় পদার্থের ভাগ বেশি থাকায় খাদ্যের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ মল পাওয়া যায়।

ডিমপাড়া একটি মুরগীর দৈনিক নিঃসরিত টাটকা মল-মূত্রের (৭৫ ভাগ আর্দ্রতাযুক্ত) ওজন প্রায় ২২৭ গ্রাম।

ডিমপাড়া মুরগী থেকে কম সময়ের মধ্যে বেশি পরিমাণ সার উৎপন্ন করা সম্ভব।

অভিজ্ঞ পোলট্রির মালিকগণ বলেন, উন্নত জাতের প্রতিটি ডিমপাড়া মুরগী থেকে (বাচ্চা, খাদ্য ও labour cost বাদ দিয়েও) বছরে প্রায় ১০ টাকা লাভ হয়ে থাকে। তাছাড়া মলমূত্র সার হিসাবে বিক্রি করেও আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া যায়।

মোরগ-মুরগীর টাটকা মলমূত্র সার হিসাবে বাজারে তৎক্ষণাৎ বিক্রি করা সম্ভব হয় না বলে শুকিয়ে পাউডারের মতো করে নিতে হয়।

মুরগীর ঘরের শয্যাও (litter) কমপোস্ট সারে রূপান্তরিত করা যায় এবং পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তবে পশুর খাদ্য হিসাবে লিটারের খড়-বিচালি ব্যবহার করতে হলে লবণ, অন্যান্য খনিজ উপাদান ও গুড় মেশাতে হবে।

গবাদি পশুর গোবর-সার অপেক্ষা পোলট্রির সারের দাম বেশি।

## ডিমে পুষ্টিকর উপাদান

ডিম পুষ্টিকর খাদ্যের অন্যতম। দুধ সহ ডিম মানুষের জন্য best-balanced protein food হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ফসফরাস, আয়রন, লিপিডস (lipids), ফসফোলিপিডস (phospholipids) ছাড়াও ডিমে ভিটামিন এ, বি এবং ডি উপাদান বিদ্যমান। একটি ডিমের $\frac{১}{১৬}$ অংশই হচ্ছে প্রোটিন। ডিমের কুসুমে শতকরা ১৬ ভাগ প্রোটিন রয়েছে আর শ্বেতাংশে ওর্জন অনুযায়ী শতকরা ১০ ভাগ প্রোটিন বিদ্যমান।

ডিমে পর্যাপ্ত পরিমাণে amino-acid বিদ্যমান থাকায় ডিমের nutritive value যথেষ্ট।

## পোলট্রি ব্যবসায়ের সমস্যা

মুরগী পালন তথা ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে পোলট্রির মালিকগণকে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

**(১) রোগ এবং শোষক জীবাণুঘটিত সমস্যা (Disease and parasite problems) ঃ**

মুরগীর স্বাস্থ্য স্বাভাবিকভাবে উত্তম হলেও তারা রোগ এবং শোষক কীটাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যদি উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা বা প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

**(২) বিক্রিজনিত সমস্যা (Problems of marketing) ঃ**

পোলট্রির আয় ডিম ও মাংসের দামের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিছু কিছু ঋতুতে (during certain seasons) ডিম তথা মুরগীর মাংস বিক্রি করে ভাল দাম পাওয়া যায়। আবার, কোন কোন ঋতুতে ডিম তথা মুরগীর মাংস বিক্রি করে অপেক্ষাকৃত কম দাম পাওয়া যায়।

**(৩) খাদ্যজনিত এবং পরিচালনজনিত সমস্যা (Problems in feeding and management) :**

যদি মুরগীদের balanced রেশন যথেষ্ট পরিমাণে না খাওয়ানো হয় তবে খাদ্যজনিত ব্যয় বেশি হতে পারে এবং মুরগী পুষে সেক্ষেত্রে বেশি লাভ করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া মুরগীর ঘর তৈরি, Ventilation, রোগজনিত সমস্যা এবং শ্রমসঙ্কটের ফলেও পোলট্রির আয় হ্রাস পেতে পারে।

**(৪) মোরগ-মুরগী নির্বাচন (Selection of chicks, poultry and nature of birds) :**

মুরগী বা মুরগীর বাচ্চা যদি উন্নত জাতের না হয় মুরগী পালন করে কখনই তেমন আর্থিক লাভ করা সম্ভব হবে না। পোলট্রি ব্যবসায়ে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হতে হলে নির্বাচন (selection) সঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন অনুযায়ী মুরগীর বাচ্চাদের সঠিকভাবে নির্বাচন করে পালন করতে হবে। ডিমপাড়া মুরগী (poults or pullets) বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। প্রজননের জন্য যে সকল মোরগ ও মুরগী ব্যবহার করতে হবে সেই সকল মোরগ ও মুরগীর good-laying strains (ডিমপাড়ার বৈশিষ্ট্য) অনুযায়ী সতর্কভাবে নির্বাচন করা আবশ্যক।

**(৫) পোলট্রির আকার (Size of enterprise) :**

হাঁস-মুরগী স্বল্পকাল বেঁচে থাকে। তাছাড়া ছোটখাটো পোলট্রির জন্য তেমন বেশি মূলধনও খাটাতে হয় না। এই কারণে পোলট্রির মালিকগণ হাঁস-মুরগীর প্রতি তেমন যত্ন লওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু উদ্যোগটি যদি বড় হয় অর্থাৎ পোলট্রি ফার্মে যদি বেশি সংখ্যক মুরগী পালন করা হয় তবে মূলধন বিনিয়োগ বেশি হবে এবং মূলধন বিনিয়োগ বেশি হলেই পোলট্রির মালিকগণ যত্ন নিতে বাধ্য হবেন এবং পোলট্রি ফার্মের পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতেও সচেষ্ট হবেন।

**(৬) মূলধন (Finance) :**

বিশেষ শ্রেণীর (specialised) পোলট্রি ফার্মের জন্য অধিক সংখ্যক মুরগী পালন করা প্রয়োজন। অতএব সে ক্ষেত্রে মূলধনজনিত সমস্যা অবশ্যই রয়েছে। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ও ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করে মূলধনজনিত সমস্যা অনেকাংশে নিরসন করা সম্ভব।

**(৭) ডিম তথা মাংসের মান (Quality of Products) :**

উৎপাদিত ডিম ও মাংসের মান এমন উন্নত হওয়া উচিত যাতে অন্যান্য food products-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়।

যাঁরা ডিম ও মাংস ব্যবহার করেন তাঁরা quality সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, অতএব quality বজায় রাখার জন্য বা উচ্চ মান বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। তাছাড়া ডিম তথা মাংসের quality-র ওপরই পোলট্রির সুনাম অনেকাংশে নির্ভরশীল।

**(গ) অতিরিক্ত উৎপাদন (Surplus Production) :**

উৎপাদনজনিত দক্ষতা হেতু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তবে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাহিদা থাকায় অতিরিক্ত উৎপাদনজনিত সমস্যা এখন তেমন গুরুতর নয়। তা হলেও পোলট্রি ফার্মে সংরক্ষণ (storing arrangement) থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়াও দরকার প্রয়োজনীয় marketing arrangement। কারণ, marketing arrangement যদি যথোপযুক্ত হয় তবে অতিরিক্ত উৎপাদন কখনই তেমন সমস্যার কারণ হবে না।

**(৯) পোলট্রি ফার্মের জন্য জমি (Land for poultry farm) :**

পোলট্রি ফার্মের জন্য তেমন বেশি space বা জমির প্রয়োজন হয় না। তবে বড় পোলট্রি ফার্ম গড়ে তুলতে হলে শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে বা শহরতলীতে বেশ কিছু space বা জমি প্রয়োজন।

**(১০) পরিবহন (Transport) :**

টাটকা ডিম ও মাংস যত শীঘ্র সম্ভব consumer-দের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা যথোপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## পোলট্রি ব্যবসায়ের সুবিধা

গ্রামাঞ্চলের কৃষি ফার্মের মালিকগণকে তাঁদের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ তৎপর হতে হবে। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ বাড়িতে ছোটখাটো পোলট্রি ফার্ম অনায়াসে গড়ে তোলা যায়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হাঁস-মুরগী পালন করে এবং পরিচালন ব্যবস্থাকে কিছু অংশে সুনিয়ন্ত্রিত করে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ আর্থিক দিক থেকে পোলট্রি ফার্মের মাধ্যমে বিশেষ লাভবান হতে পারেন। প্রতিটি মুরগীর ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা অনায়াসে সম্ভব। অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন করে গ্রামাঞ্চলের লোকেরা অনায়াসে তাঁদের আয় বৃদ্ধি করতে পারেন।

## যুবকদের জন্য সুযোগ

যুবকগণ এককভাবে বা যৌথভাবে নিজ নিজ অঞ্চলে পোলট্রি ফার্ম গড়ে তুলতে পারেন। তাছাড়া পোলট্রি ফার্মের কাজে বেকার যুবকগণ অংশগ্রহণ করতেও পারেন। ক্রমবর্ধমান বেকারীজনিত সমস্যাকে পোলট্রি ব্যবসা অনেকাংশে লাঘব করতে পারে।

## পোলট্রি ব্যবসায়ে লাভের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতিসমূহ

(ক) স্বল্প-সংখ্যক ডিমপাড়া মুরগীদের যত শীঘ্র সম্ভব বাতিল ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) পুরানো মুরগী অপেক্ষা তরুণ ডিমপাড়া মুরগী অপেক্ষাকৃত স্বল্প খাদ্য গ্রহণ করে এবং ডিমও দেয় বেশি। অতএব তরুণ ডিমপাড়া মুরগী (pullets) পালন করে তুলনামূলকভাবে লাভ বেশি হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ডিমপাড়া বছরে মুরগীদের

ডিমের উৎপাদন সচরাচর ২০ থেকে ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে থাকে। অতএব দ্বিতীয় ডিমপাড়া বছর উত্তীর্ণ হলে পরবর্তীকালে পুরানো মুরগী না পালন করে তরুণ মুরগী পালন করাই লাভজনক।

(গ) সু-নির্বাচিত মুরগী পালন করার অর্থ খাদ্যজনিত এবং পরিচালন জনিত ব্যয় হ্রাস।

(ঘ) নিয়মিত বাতিল (cull) এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা লাভজনক।

(ঙ) যে সকল মুরগীর পালক খসতে দীর্ঘদিন সময় লাগে—ঐ ধরনের মুরগী বিক্রয় করাই সঙ্গত, কারণ পালক খসার সময়ে ডিম উৎপাদন বন্ধ থাকে।

(চ) দ্বিতীয় ডিমপাড়া বছর উত্তীর্ণ হলে মুরগীদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র শতকরা ২৫ ভাগ সুনির্বাচিত মুরগী পালন ও পোষণ করা চলতে পারে—৭৫ ভাগ মুরগী তরুণ মুরগীদের দ্বারা replace করা সঙ্গত।

## পোলট্রির সাজ-সরঞ্জাম

**জমি ঃ** পোলট্রি ফার্মের জমি নিচু হওয়া উচিত নয়, অল্প উঁচু এবং স্বল্প ঢালু ধরনের জমিই পোলট্রি ফার্মের পক্ষে উপযুক্ত। বায়ু চলাচল এবং জল নিষ্কাশনের জন্য একটি ঢালু ধরনের জমিই পোলট্রি ফার্মের পক্ষে উত্তম। ঘরের দক্ষিণ দিক খোলা বা জাল দিয়ে ঘেরা থাকলে আলো ও বাতাস পেতে অসুবিধা হবে না।

**বিল্ডিংস (Buildings) ঃ** বিভিন্ন ধরনের ঘরসমূহ এমনভাবে তৈরি করতে হবে—যা সুষ্ঠু পরিচালনের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী পোলট্রি ফার্মের বিভিন্ন ধরনের ঘর তৈরি করা হলে—সময় এবং অর্থের অপব্যয় অনেকাংশে রোধ কবা সম্ভব হবে।

**পোলট্রি ফার্মের ঘর তৈরির ব্যাপারে নিম্নের নির্দেশ অনুসরণ করুন—**

(ক) ঘরগুলো এমনভাবে তৈরি করুন—যাতে বাচ্চা ও বাড়ন্ত মুরগীদের বিশেষ যত্ন নেওয়া সম্ভবপর হয়।

(খ) বয়স্ক মোরগ ও মুরগীদের বাচ্চা ও তরুণ মুরগীদের পৃথক পৃথক ঘরে রাখুন। বাচ্চা ও তরুণ মুরগীদের ঘর থেকে বড় মুরগীদের ঘর বেশ কিছু দূরে তৈরি করুন।

(গ) বাচ্চা তথা তরুণ মুরগীদের ঘর এমন স্থানে নির্মাণ করতে হবে যাতে বয়স্ক মুরগীদের ঘরের নর্দমা বাহিত জল সেখানে এসে ঐ ঘরের জল বা ঘরটিকে দূষিত (contaminated) করতে না পারে।

(ঘ) বাচ্চা এবং তরুণ মুরগীদের ঘর এমনভাবে তৈরি করুন—যাতে বয়স্ক মুরগীদের ঘর থেকে বাতাস বাহিত হয়ে সংক্রামক রোগের কোন বীজাণু (airborne infections) বাচ্চা বা তরুণ মুরগীদের ঘরে প্রবেশ না করতে পারে।

(ঙ) যে ঘরটি ডিম store করার জন্য ব্যবহার করা হবে, সেই ঘরের কাছাকাছি nesting facilities থাকা সুবিধাজনক। প্রতি দিন ৩ থেকে ৪ বার ডিম সংগ্রহ করা

হয়ে থাকে—অতএব Egg storage room-এর কাছাকাছি nesting facilities থাকলে—ডিম সংগ্রহ করে শীঘ্র store করা সম্ভব হবে। Egg storage room-টি উত্তরদিকে বা পূর্বদিকে করা বাঞ্ছনীয়। এবং egg-storage room থেকে যাতে বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করা যায়—এইজন্য ঐ pic-up-tracks-এর আওতায় থাকা সুবিধাজনক।

(চ) খাদ্যের গুদামও Egg store-এর কাছাকাছি রাখা যেতে পারে। খাদ্যের গুদাম দুটি ভাগে ভাগ করে—বয়স্ক ও বাচ্চা মুরগীদের খাদ্য পৃথক পৃথক স্থানে রাখা যেতে পারে।

(ছ) বাতিল করা মুরগীদের সম্পূর্ণ পৃথক স্থানে রাখতে হবে, যাতে লরী, মোটর বা ভ্যানের মাধ্যমে বাতিল মুরগীদের বিক্রয়স্থলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

(জ) বাচ্চা মুরগী, তরুণ মুরগী বা ডিমপাড়া মুরগীদের ঘরের কাছাকাছি স্থানেও কোন লরী, ট্রাক, ভ্যান বা অন্য কোন ধরনের যানবাহন প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত হবে না। এমনকি জুতো পায়ে দিয়েও ঐ সকল ঘরে প্রবেশ করা সঙ্গত নয়।

(ঝ) বাচ্চা মুরগী, মাংসল মোরগ-মুরগী (broilers), তরুণ মুরগী (pullets) এবং মুরগীদের থাকার ঘর আলোবাতাসযুক্ত হওয়া আবশ্যক। ঘর ঘিঞ্জি (overcrowded) এবং স্যাঁতসেঁতে ধরনের (damp) হলে—তা দৈহিক পুষ্টির অন্তরায় হয় এবং সহজেই রোগবীজাণু এবং parasite জনিত আক্রমণ ঘটতে পারে।

যে সকল তরুণ মোরগ বা মুরগীদের খাদ্যপাত্র বা জলপাত্রের কাছে যাওয়ার জন্য পারস্পরিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হয়—সেইসব মোরগ বা মুরগীর পক্ষে তেমন দৈহিক পুষ্টি লাভ করা মুশকিল। অনুরূপ অবস্থায় মুরগীর ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব ডিম পাড়া ঘরে (Laying house) যথোপযুক্ত space থাকা বাঞ্ছনীয়।

## পোলট্রিতে কি কি ধরনের ঘর থাকা বাঞ্ছনীয়

(১) **পোলট্রিতে ব্রুডিং ইউনিটস (Brooding units)ঃ** মোরগ-মুরগী পালনের জন্য ব্রুডার হাউস থাকা উচিত। ব্রুডিং হাউসে বাচ্চা মোরগ-মুরগীদের প্রথমে রাখা হয় এবং পালন করা হয়। ব্রুডিং হাউসে অতিরিক্ত তাপসঞ্চয়ের ব্যবস্থা থাকে। ১ দিন বয়স্ক বাচ্চাদের ব্রুডিং হাউসে রেখে ততদিনই পালন করা হয়—যতদিন তাদের জন্য অতিরিক্ত তাপসঞ্চারের প্রয়োজন হয়।

(২) **তরুণ মোরগ-মুরগীদের থাকার ঘর (Growing pens)ঃ** ব্রুড়ার হাউসের পরবর্তী পর্যায়ে তরুণ-মুরগীদের ও মোরগদের এখানে এনে লালন-পালন করা হয়। এখান থেকেই মাংসল মোরগ বা মুরগীদের (Broilers) বাছাই করে বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। আর ডিম পাড়ার সম্ভাবনাযুক্ত

মুরগীদের এখান থেকেই ডিমপাড়া ঘরে (laying house or cages) চিরস্থায়ী ভাবে স্থানান্তর করা হয়।

(৩) **ডিম পাড়া ঘর (Laying house or cages)ঃ** ডিমপাড়া শুরু হওয়া থেকে তরুণ মুরগী ও বয়স্ক মুরগীদের বাতিল (Culled out) না হওয়া পর্যন্ত এখানেই রাখা হয়। ডিমপাড়া বন্ধ হওয়ার পর বা বাতিল করার পরই এখান থেকে মুরগীদের বিক্রির উদ্দেশ্যে সরিয়ে ফেলা হয়। বাতিল হওয়া মুরগীদের পরিবর্তে আবার ডিমপাড়াব সম্ভাবনা যুক্ত বা ডিম পাড়ছে এরূপ মুরগীদের এখানে আনা হয়।

**ব্রুডিং ইউনিটস বা ব্রুডার হাউস** (Broodıng Units or Brooder House)**ঃ** গ্রামাঞ্চলে যারা অল্প সংখ্যক মুবগী পালন করতে চান—তাদের

ইলেকট্রিক টায়ার ব্রুডাব

পক্ষে ২০ থেকে ২০০টি বাচ্চা পালনের জন্য ছোট ব্রুডার হাউসই যথেষ্ট। বিশেষ শ্রেণীর পোলট্রি ফার্মে—যেক্ষেত্রে হাজার হাজার বাচ্চা (chıckens)
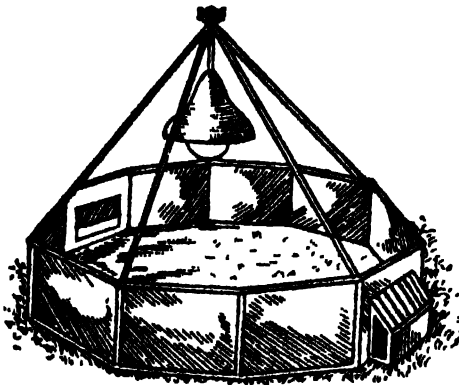
ইনফ্রা রেড ব্রুডার

পালন করা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে ব্রুডার হাউসটি বড় এবং পাকাপোক্ত বা চিরস্থায়ী ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ব্রুডার হাউসে যথোপযুক্ত তাপসঞ্চারের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এই ঘরের মেঝে ও দেওয়াল এমন হওয়া আবশ্যক—যাতে ইঁদুর বা বেজির কোন উপদ্রব না থাকে এবং অতি সহজেই ঘরের মেঝে এবং দেওয়াল পরিষ্কার এবং বীজাণুমুক্ত করা সম্ভব হয়।

তাছাড়া এই ঘরে ব্রুডার যন্ত্র স্থাপনের জন্যও space আবশ্যক এবং যথোপযুক্ত ventilation-এরও ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

## ব্রুডার হাউসের আকার (Size of Brooder House)

এক একটি ব্রুডিং পেনে একত্রে ৩৫০টির বেশি বাচ্চা রাখা উচিত নয়। বিশেষ শ্রেণীর পোলট্রি ফার্মে যেখানে মাংসের জন্য (broilers) হাজার হাজার বাচ্চা পালন করা হয় সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
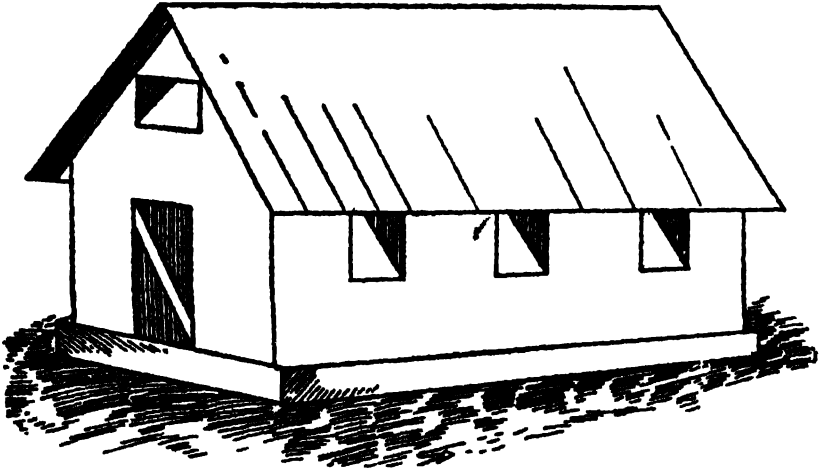
একটি ব্রুডার হাউসের বহির্ভাগ

কিন্তু সচরাচর সাধারণ ব্রুডিং হাউসে একসঙ্গে ৩৫০টি বাচ্চা পালন করাই সঙ্গত। ১৪২ সেন্টিমিটার যুক্ত hover-এর জন্য ব্রুডার হাউসটি ৩৬৫ × ৪২৭ সেন্টিমিটার হওয়া দরকার ; এরূপ হলে প্রতিটি বাচ্চা ৪৫ বর্গ সেন্টিমিটার হোভার space পাবে। প্রথম মাসে একজোড়া বাচ্চার জন্য ০·০৯ বর্গ মিটার floor space পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসে প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০·০৯ বর্গ মিটার floor space দরকার।

যে সকল ব্রুডার হাউসে মাংসল জাতীয় বাচ্চা পালন ও প্রবর্ধন করা হয়—সেই সকল ব্রুডার হাউস সচরাচর ৯ থেকে ১৫ মিটার চওড়া এবং ১৫ থেকে ৯০ মিটার লম্বা হয়ে থাকে। ঐ ধরনের ব্রুডার হাউস কয়েকটি অংশে (divided into pens) ভাগ করা হয়ে থাকে—বিভিন্ন বয়সের বাচ্চাদের পৃথক পৃথক অংশে

(pen) রাখা হয়—তবে প্রতিটি অংশে বা pen-এ ৩৫০টির বেশি বাচ্চা রাখা সঙ্গত নয়।

বাচ্চাদের ব্রুডার হাউসে রাখার কিছুদিন আগে থেকেই ব্রুডার হাউসটি উত্তমরূপে পরিষ্কার করা উচিত। ঘরের দেওয়াল, ছাদ এবং মেঝে উত্তমরূপে পরিষ্কার করা দরকার।
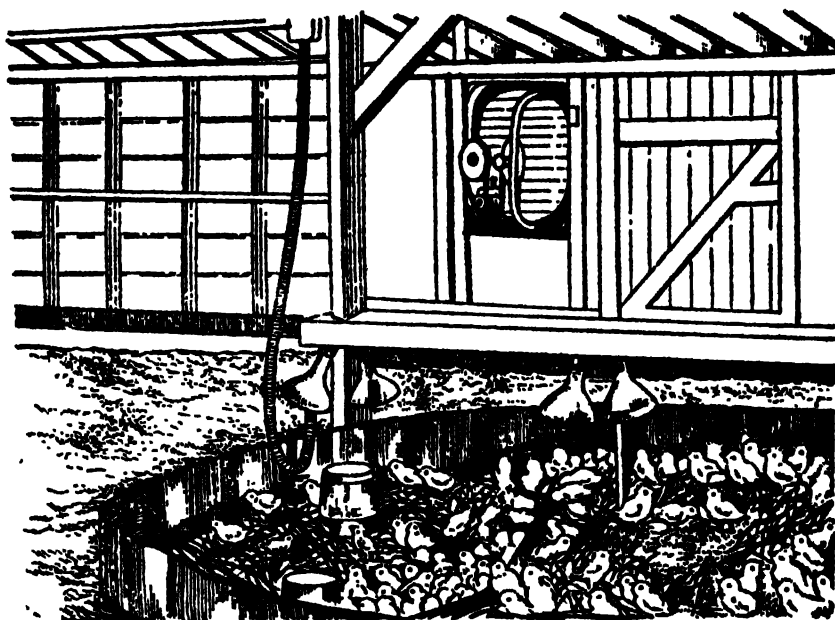
একটি আধুনিক ব্রুডার হাউসের অভ্যন্তর ভাগ—দুটি পৃথক অংশে (pen) বাচ্চাদের পৃথক করে রাখা হয়েছে। Infra-red lamp-এর সাহায্যে তাপসঞ্চার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

দেওয়ালের নিম্নাংশ এবং pen-এর চারপাশের পার্টিশান এবং মেঝেটি ৫% ক্লোরিন সলিউশন দ্বারা বীজাণুমুক্ত করা প্রয়োজন।

বাচ্চাদের ব্রুডার হাউসে স্থাপন করার পূর্বে (ধোওয়ার পর) ঘরটি শুকিয়ে (dry) নেওয়া আবশ্যক। খাদ্যপাত্র এবং জলপাত্রাদিও (feeders and fountains) পরিষ্কার তথা বীজাণুমুক্ত করা প্রয়োজন।

## ব্রুডার হাউসের ভূমিশয্যা (Litter)

ব্রুডার হাউসে ভূমিশয্যাটি (litter) উত্তম ধরনের হলে—তাপমাত্রা সঞ্চারের ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়, এবং সেক্ষেত্রে litter আর্দ্রভাব শোষণ করে blotter-এর কাজ করে। ধানের তুষ, আখের ছোব্‌ড়া ইত্যাদির দ্বারা উত্তম

ভূমিশয্যা তৈরি করা সম্ভব। খড় এবং গাছের পাতাও ব্যবহার করা যায়—তবে ভূমিশয্যা হিসাবে তা তেমন উত্তম নয়।

ব্রুডার হাউসে বাচ্চাদের আনার ২।১ দিন আগে ৮ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পুরু ভূমিশয্যার ব্যবস্থা করা সঙ্গত। সপ্তাহে অন্ততঃ ২ বার করে ভূমিশয্যাটি এদিক ওদিক আলোড়ন ঘটিয়ে শুকোবার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন শয্যার (new litter) প্রয়োজন হলে পুরানো শয্যার (old litter) ওপরই তা বিছোতে হবে। সেক্ষেত্রে ভূমিশয্যাটি ১৫ সেন্টিমিটার বা তদপেক্ষা উঁচু হলেও ক্ষতি নেই।

একটি বৈদ্যুতিক ব্রুডার যন্ত্র। এই বৈদ্যুতিক ইউনিটটি—Sunshine অথবা Outdoor ব্রুডারের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা চলে। নীচের অংশে ক্যানভাস থাকায় বাচ্চারা অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে।

**তার বা Slat-এর মেঝে ঃ** তারের বা Slat-এর মেঝে অবশ্যই ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের স্যাঁতসেঁতে শয্যার (damp litter) ওপর দিয়ে হাঁটতে হয় বটে—কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাপসঞ্চারের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া তার বা Slat-এর তৈরি মেঝে অন্যদিক থেকেও অসুবিধাজনক।

## বিভিন্ন ধরনের ব্রুডার ও পরিচালন ব্যবস্থা

বাচ্চাদের ব্রুডার হাউসে আনার ২।১ দিন পূর্বেই ব্রুডার যন্ত্রটি চালনা করে দেখা দরকার। ঠিকমত কাজ করছে কিনা। তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে কিনা। প্রথম সপ্তাহে ৩৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা ৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইট বিকিরণ করা প্রয়োজন।

বয়স অনুযায়ী তাপমাত্রা

| বাচ্চার বয়স | Hover-এর তাপমাত্রা শয্যার ২ ইঞ্চি ওপরে | ঘরের তাপমাত্রা |
|---|---|---|
| ১ম সপ্তাহ<br>২য় সপ্তাহ<br>৩য় সপ্তাহ<br>৪র্থ সপ্তাহ | ৭০°-৮০° ফারেনহাইট | ৬০° ফারেনহাইট |
| ৫ম সপ্তাহ<br>৬ষ্ঠ সপ্তাহ<br>৭ম সপ্তাহ | ৬০°-৭০° ফারেনহাইট | ৫৫° ফারেনহাইট |
| ৮ম সপ্তাহ-দ্বাদশ সপ্তাহ | ৫৫°-৬০° ফারেনহাইট | ৫০° ফারেনহাইট |

## বিভিন্ন ধরনের ব্রুডার যন্ত্র বা পদ্ধতি

(১) **বৈদ্যুতিক ব্রুডার** (Electric Brooders)ঃ এক্ষেত্রে তাপসঞ্চারক (heating elements) উপাদানসমূহকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাপসঞ্চারক উপাদানের চারপাশে insulated hover থাকে। হোভারের নিম্নস্থ বাচ্চাদের মধ্যে এই পদ্ধতিতে যথোপযুক্ত তাপ সঞ্চার করা সম্ভব। তাছাড়া এই যন্ত্র ওজনেও হালকা এবং সহজেই পরিষ্কার করা যায়।

তবে বৈদ্যুতিক ব্রুডারের মাধ্যমে প্রবল শীতের সময়ে অতিরিক্ত তাপমাত্রা* সঞ্চার করা যায় না। কারণ তাপমাত্রা এক্ষেত্রে সীমিত। যে দেশে বা যে স্থানে লোড-শেডিং নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—সেস্থানে বৈদ্যুতিক ব্রুডারের সাহায্যে বাচ্চা প্রবর্ধন করা বিশেষ অসুবিধাজনক।

(২) **কয়লা দ্বারা চালিত ব্রুডার (Coal Burning Brooders)**ঃ এই ধরনের ব্রুডার যন্ত্রে ২০০ থেকে ৪০০ বাচ্চা দক্ষতার সঙ্গে প্রবর্ধন করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে একটি Fire-box থাকে, এবং ঐ Fire-box-এ প্রায় ২৫ কে.জি. কয়লা ধরে। Fire box-এর চারপাশে ৪২ থেকে ৬০ ইঞ্চি ব্যাসার্ধযুক্ত ধাতুনির্মিত hover থাকে।

তবে যন্ত্রপাতির গোলযোগে এবং অসতর্কতার কারণে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি কোথাও ছিদ্র (Leak) থাকে বা চিমনিটি কোন কারণে clogged হয়ে যায়—তবে সব কিছুই বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অতএব এই ধরনের ব্রুডার যন্ত্র থাকলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

* শীতের দিনে এই তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট বাড়াতে হবে। বৈদ্যুতিক ব্রুডারের ক্ষেত্রে সর্বদা অতিরিক্ত ৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ সঞ্চারের প্রয়োজন।

**(৩) জ্বালানি কাঠের ব্রুডার (Wood burning Brooders) :** কয়লা দ্বারা চালিত ব্রুডার যন্ত্রের মতোই সুবিধাজনক—তবে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং আগুন লাগার সম্ভাবনাও বেশি।
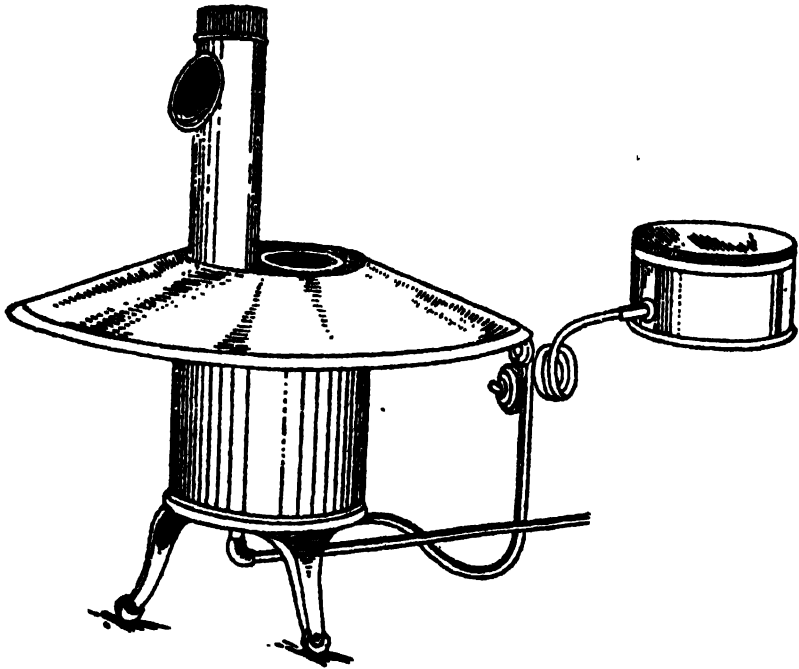
তেলের দ্বারা চালিত ব্রুডার যন্ত্র (The oil-burning brooder)

**(৪) অয়েল ব্রুডার (Oil Brooders) :** অয়েল ব্রুডার অনেকাংশে বেশি নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে source of heat-কে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তবে প্রস্তুতকারকের নির্দেশ অনুযায়ী Fuel line নিয়মিত পরীক্ষা করা আবশ্যক।

**(৫) চিরস্থায়ী রূপে ব্রুডার যন্ত্র স্থাপন (Permanent Brooder Installations) :** যে সকল পোলট্রি ফার্মে মাংসের জন্য অধিক সংখ্যক বাচ্চা (৪০০০/৫০০০) পালন করা হয়—সেক্ষেত্রে উষ্ণ জল বা উষ্ণ বায়ুর সাহায্যে স্বল্প ব্যয়ে চিরস্থায়িভাবে ব্রুডার স্থাপন আবশ্যক।

গ্যাস, তেল বা কয়লার ফার্নেসের সাহায্যে জল গরম করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ব্রুডার হাউসের প্রতিটি অংশে (to each pen)—৬ থেকে ১২টি ছোট পাইপের সাহায্যে (৪ ইঞ্চি অন্তর অন্তর) উষ্ণ জল প্রবাহের ব্যবস্থা করা হয়।

ঐ ছোট পাইপসমূহ floor থেকে ১০ বা ১৫ ইঞ্চি ওপরে সংস্থাপিত হবে। প্লাই-উড বা এল্যুমিনিয়াম শীট (sheet) এক্ষেত্রে তাপবিকিরণের জন্য hover হিসাবে ব্যবহার করা চলতে পারে।

হোভারসমূহ কপিকলে (pulleys) লটকানো থাকবে, যখন আর তাপসঞ্চারের প্রয়োজন হবে না, তখন তা টেনে সরিয়ে নিলেই চলবে।

**(৬) ব্যাটারি ব্রুডার (Battery Brooders)ঃ** যে সকল ব্রুডার হাউসের মেঝেটি তারের তৈরি—সে সকল ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক তাপসঞ্চারের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ব্যাটারি ব্রুডার ব্যবহার করা হয়। গ্যারেজ, গুদাম প্রভৃতি স্থানেও কেবলমাত্র ব্যাটারি ব্রুডার ব্যবহার করে বাচ্চাদের প্রবর্ধন করা যায়। তবে উপযুক্ত insulation এবং ventilation-এর ব্যবস্থা থাকা উচিত। সর্বদা ৭০ ডিগ্রী তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে। আর্দ্রতা ও বায়ু সঞ্চালন সেই সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক।

## বিভিন্ন ধরনের ব্রুডার যন্ত্র সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা

কয়লা অথবা তেলের দ্বারা চালিত ব্রুডার যন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র ঘরে এবং হোভারের নিম্নস্থ জায়গায় তাপ সঞ্চার করা সম্ভব। গ্যাস অথবা বৈদ্যুতিক ব্রুডার যন্ত্র দ্বারা hover area-তে তাপ সঞ্চার করা সম্ভব হলেও ঘরের সব অংশে তাপ সঞ্চারিত হয় না। বৈদ্যুতিক ব্রুডার চালনা করা সুবিধাজনক হওয়ায় অনেক পোলট্রি ফার্মের কর্তৃপক্ষ বৈদ্যুতিক ব্রুডার যন্ত্রই পছন্দ করেন। তবে যেস্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়মিত নয় (লোড-শেডিং যেখানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা)—সেক্ষেত্রে কয়লা বা তেল চালিত ব্রুডার যন্ত্র ব্যবহার করাই সঙ্গত।

**ব্রুডার হাউস পরিচালন ব্যবস্থা ঃ** আদর্শ ব্রুডার যন্ত্র হচ্ছে সেটিই, যার দ্বারা যথোপযুক্ত তাপসঞ্চার সম্ভব। হোভারের চারপাশে ৩৮ থেকে ৪৬ সেন্টিমিটার উঁচু তারের, কাঠের বা ইঁটের দেওয়াল (হোভার থেকে ৬০ অথবা ৯০ সেন্টিমিটার দূরে) থাকা বাঞ্ছনীয়—যাতে বাচ্চারা হোভারের তাপ-সঞ্চারিত অঞ্চল থেকে খুব দূরে না চলে যায়।

**তাপমাত্রা হ্রাস করা ঃ** প্রত্যেক সপ্তাহে ৫ ডিগ্রী করে তাপমাত্রা হ্রাস করা চলতে পারে—যতক্ষণ না তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে দাঁড়াচ্ছে। শীতকাল বা শীতপ্রধান দেশ ব্যতীত ৫ সপ্তাহ বয়স্ক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাপ সঞ্চারের প্রয়োজন হয় না। বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্ম ঋতুতে ৫ সপ্তাহ বা ততোধিক বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাপ সঞ্চারের প্রয়োজন নেই। অতএব ঋতু বা আবহাওয়া অনুযায়ী তাপমাত্রা কমানো বা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

### বাঁশের তৈরি ব্রুডার

গ্রামাঞ্চলে বাঁশের তৈরি ব্রুডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জ্বলন্ত হ্যারিকেন স্থাপন করে—বাচ্চাদের সেই হ্যারিকেনের চারপাশে রেখে—চওড়া মুখওয়ালা বড় বাঁশের তৈরি ঝুড়ির দ্বারা ঢাকা দিয়ে রাখা হয়।

ঝুড়ির চারপাশের সম্পূর্ণ অংশ গোবর দিয়ে লেপে দেওয়া হয়, যাতে সঞ্চারিত তাপ বাইরে তেমনভাবে না বেরুতে পারে। ঝুড়ির ওপরে (চিত্রের ক অংশ দেখুন)

কিছু ফাঁক রাখা হয়—যাতে হ্যারিকেন লণ্ঠনের গ্যাস ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

ঝুড়ির নিম্নে স্থাপিত হ্যারিকেন লণ্ঠনের মাধ্যমেই এক্ষেত্রে তাপ সঞ্চারের ব্যবস্থা করা হয়। তবে এই ধরনের ব্রুডারে খুব কম সংখ্যক বাচ্চাই প্রবর্ধন করা সম্ভব। তবে অনেকগুলো ঝুড়ি ও হ্যারিকেন লণ্ঠন ব্যবহার করে বহু সংখ্যক বাচ্চাও এভাবে প্রবর্ধন করা যায়। এই পদ্ধতিটিই সর্বাপেক্ষা সস্তা। ব্রুডার হাউসের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক গোবর লেপা ঝুড়ি এবং হ্যারিকেন লণ্ঠনের সাহায্যে ১০০ থেকে ২০০ মুরগীর বাচ্চা অনায়াসে প্রবর্ধন করা সম্ভব।
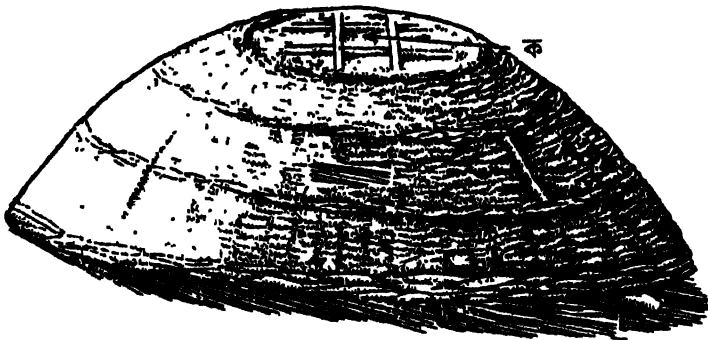
স্বল্পব্যয়ে নির্মিত বাঁশের তৈরি ব্রুডার

## গ্রোয়িং পেনস্ এবং রেঞ্জ শেল্টারস্
## [Growing Pens and Range Shelters]

ব্রুডিং হাউসের পরবর্তী পর্যায়ে তরুণ মুরগীদের এখানে প্রতিপালন করা হয়, ডিম পাড়ার সময় আসন্ন হলেই এখান থেকে নির্বাচিত মুরগীদের ডিম পাড়া ঘরে (Laying house) স্থানান্তরিত করা হয়।

১০ ফুট × ১০ ফুট পরিসর যুক্ত এই ধরনের ঘরে প্রায় ১০০টি তরুণ মুরগী রাখা সম্ভব। তবে এই ধরনের ঘর সেক্ষেত্রেই উপযুক্ত—যেখানে মুরগীগুলো দিনের বেলা বাইরে বিচরণ করে এবং রাতে ঘরে আশ্রয় নেয়। প্রয়োজনবোধে ঘরটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়াও সম্ভব হয়। খাদ্যপাত্র এবং জলের পাত্র ঘরের বাইরে রাখা হয়, ঘরের ভিতরে কেবলমাত্র দাঁড় রয়েছে—যেখানে দাঁড়িয়ে মুরগীরা ঘুমুতে পারে। এই ধরনের ঘরে অন্য কোন যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম থাকে না।

কিন্তু মুরগীদের যদি দিনের বেলায়ও ফাঁকা জায়গায় ছেড়ে দেওয়া না হয়—অর্থাৎ ঘরে রেখেই পালন করতে হয়—তবে Growing pens-এর অভ্যন্তরেই খাদ্যপাত্র এবং জলের পাত্র রাখা আবশ্যক। প্রতিটি মুরগীর জন্য ০·২৩ বর্গমিটার Floor Space প্রয়োজন। ধানের তুষের এবং কাঠের গুঁড়ো দ্বারা ১ থেকে ১½ ইঞ্চি পুরু শয্যা (litter) তৈরি করতে হবে।

খাদ্যপাত্রটি মেঝে থেকে অন্তত ২ ফুট ওপরে স্থাপন করতে হবে।

জলপাত্রটি এমন স্থানে স্থাপন করা দরকার—যাতে ঠোঁট দিয়ে ছিটানো জলের দ্বারা ভূমিশয্যা (litter) আর্দ্র, স্যাঁতসেঁতে হয়ে না ওঠে। ঘরের এক পাশে বাইরের
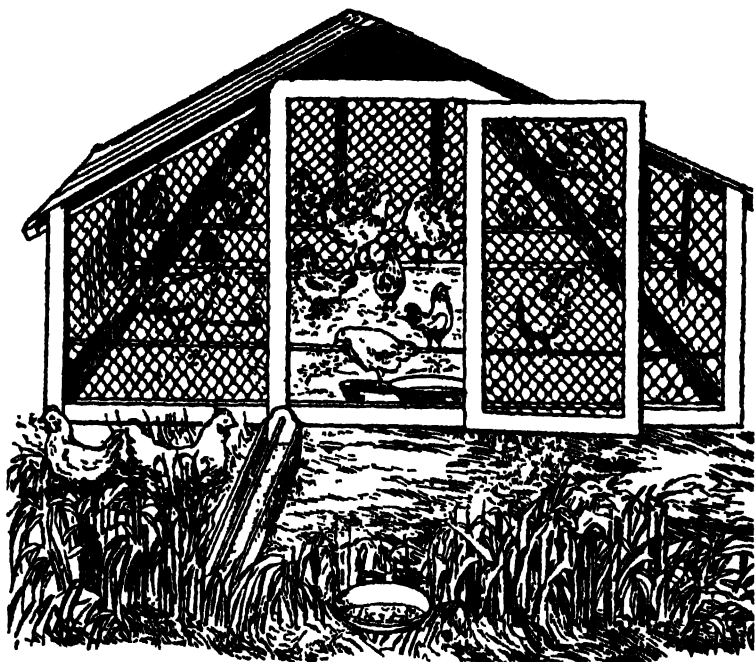
১০ ফুট × ১০ ফুট আয়তন যুক্ত রেঞ্জ শেল্টারস্
স্বল্প ওজনযুক্ত এবং প্রয়োজনবোধে সহজেই স্থানান্তর করা যায়

দিকে ঢালু কংক্রিট বা কাঠের পাটাতনের ওপর লম্বা ধরনের জলপাত্র রাখাই সঙ্গত। এই ঘর থেকে (Broilers) অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে।

## মুরগীদের ডিমপাড়া ঘরে স্থানান্তর

প্রত্যেকটি মুরগীর গড়ে বছরে প্রায় ১৮০ বা তার চেয়ে বেশি ডিম দেওয়া উচিত—পোলট্রি ব্যবসায়ে তবেই বিশেষভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব। অতএব বিশেষভাবে বাছাই করেই তরুণ মুরগীদের ডিমপাড়া ঘরে (laying house) রাখতে হবে।

৫ থেকে ৫½ মাস বয়সেই লেগহর্ন জাতের মুরগীরা ডিম দিতে শুরু করে। তদপেক্ষা ভারি জাতের মুরগীরা আরও কয়েক সপ্তাহে পরে ডিম দিতে শুরু করে।

তরুণ মুরগীদের ডিমপাড়া ঘরে স্থানান্তর করার আগে—ডিমপাড়া ঘরটি উত্তমরূপে পরিষ্কার তথা বিশোধন করা আবশ্যক। ঘরের দেওয়াল, মেঝে ইত্যাদি পরিষ্কার তথা বীজাণুনাশক ওষুধ স্প্রে করে প্রথমে বিশোধন করে নিতে হবে।

তৎপরে নতুন ভূমিশয্যা (litter) রচনা করতে হবে। খাদ্যপাত্র এবং পানীয় জলের পাত্র উত্তমরূপে পরিষ্কার করে কার্যকরী অবস্থায় আনতে হবে। Nests (ডিমপাড়ার জায়গা) সমূহ উত্তমরূপে পরিষ্কার তথা বিশোধন করে নিতে হবে—সম্ভব হলে নতুন Nesting Materials (nest তৈরির নতুন উপাদান) ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয় ডিমপাড়া বছরে উত্তীর্ণ মুরগীদের যদি ডিমপাড়া ঘরে (laying house) রাখতে হয়—তবে ডিমপাড়া ঘরে আলাদা তারের পার্টিশান দিয়ে বা অন্য কোনভাবে তাদের পৃথক স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তরুণ ডিমপাড়া মুরগীদের ও পুরানো ডিমপাড়া মুরগীদের একত্রে রাখা উচিত নয়।

**ডিমপাড়া ঘরে স্থানান্তর করার পূর্বে সতর্কতা ঃ** ডিমপাড়া ঘরে স্থানান্তর করার আগে প্রতিটি মুরগীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

বাতিল করা মুরগীদের আগেই অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে এবং বাছাই করা মুরগীদের পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে। স্থানান্তর করার সময় মুরগীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা উচিত হবে না। প্রথম রাতে বা দ্বিতীয় রাতে তরুণ মুরগীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন—খাদ্যপাত্রের ওপরে বা Nest-এ তারা যেন ভিড় না করে অথবা রাতের বেলা তারা যেন না ঘুমোয়।

## ডিমপাড়া ঘর (Laying House)

পোলট্রি উদ্যোগে ডিমপাড়া ঘরটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মুরগীগুলো পরিবেশের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। অতএব ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ অবশ্যই প্রয়োজন।

ডিমপাড়া ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শুষ্ক, আলো-বাতাসযুক্ত (well ventilated), শান্ত পরিবেশ যুক্ত এবং আরামপ্রদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কোন কোন পোলট্রি ফার্মে Laying House-এ যথোপযুক্ত space না থাকায়—ডিমপাড়া মুরগীদের বাইরে বিচরণ করতে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু ডিমপাড়া মুরগীদের ঘরে আবদ্ধ রাখাই সঙ্গত।

## ডিমপাড়া মুরগীর জন্য প্রয়োজনীয় স্থান (Space required)

ডিমপাড়া ঘরটি কখনই স্বল্প-পরিসর যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক হালকা জাতের মুরগীর জন্য (লেগহর্ন) ০·২৩ থেকে ০·২৭ বর্গমিটার Floor Space প্রয়োজন ; আর ভারী জাতের প্রত্যেকটি মুরগীর জন্য ০·২৭ বর্গমিটার Floor Space প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ব্যয়-সঙ্কোচ করা ক্ষতিকারক।

কারণ ঘিঞ্জি পরিবেশ (crowded conditions) মুরগীদের ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্তরায় স্বরূপ। তাছাড়া ডিমপাড়া ঘরটি ঘিঞ্জি পরিবেশযুক্ত হলে তা যথোপযুক্তভাবে পরিষ্কার তথা বিশোধন করা কঠিন।

ঘরটি যথোপযুক্তভাবে পরিষ্কার তথা বিশোধন করা সম্ভব না হলে—রোগ ছড়িয়ে পড়ার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

৬ মিটার চওড়া ও ১২ মিটার দৈর্ঘ্য যুক্ত ঘরে ৩০০টি হালকা জাতের মুরগী (লেগহর্ন) অনায়াসে রাখা যায়, ভারী জাতের (heavy breeds) মুরগী ২৫০ থেকে ২৬০টি অনায়াসে রাখা যায়।
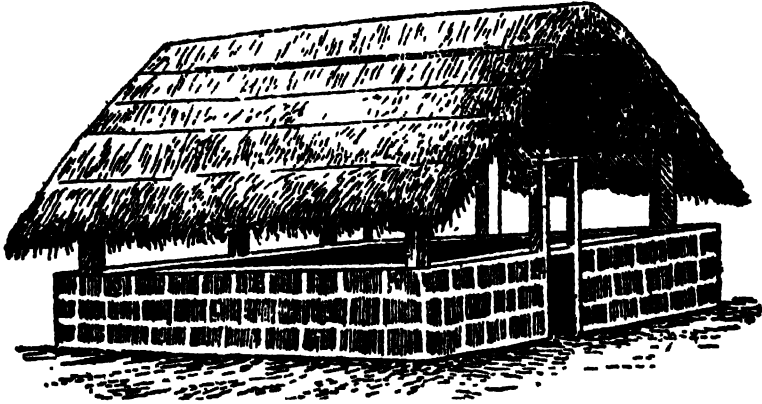
১০০টি লেগহর্ন জাতেব মুরগীব থাকাব জন্য ৪·৫ × ৫ মিটাব ঘর

অভিজ্ঞ পোলট্রির মালিকগণ প্রতিটি লেগহর্ন মুরগীর জন্য ০·১৯ বর্গমিটার Floor Space-এব ব্যবস্থা করেন। খাদ্যপাত্র এবং জলের পাত্রের জন্য পর্যাপ্ত
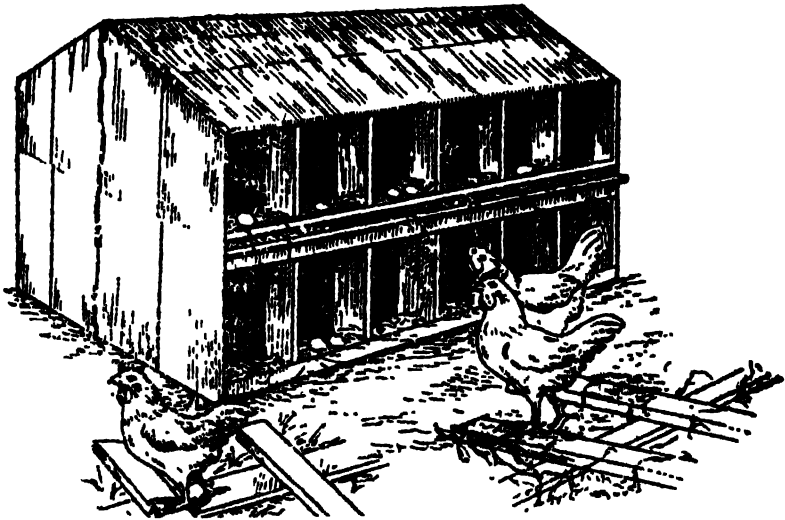
ডিমপাড়া ঘরের অভ্যন্তরে Nest স্থাপিত। লম্বা ধরনের খাদ্য ও পানীয়জলের পাত্র ঘরের অভ্যন্তরেই স্থাপন করা হয়েছে।

Space-এরও ব্যবস্থা করে থাকেন। ঠোক্‌রা-ঠুক্‌রি (cannibalism) বন্ধ করার জন্য মুরগীদের debeak (ওপরকার ঠোঁটের সম্মুখের ছুঁচালো প্রান্ত) ভেঙে দেন।

ডিমপাড়া ঘরেও পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো ও বাতাস সঞ্চরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। তাছাড়া মুরগীদের Balanced Ration খাইয়ে খাদ্যজনিত অপচয় রোধ করেন।

## ঘুমোবার বা বিশ্রাম নেবার দাঁড় (Roosts)

প্রত্যেকটি মুরগীর জন্য ১৭·৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার Roost Space প্রয়োজন। সচরাচর ঘরের পশ্চাদ্ভাগেই Roost-এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ২০০টি মুরগীর জন্য ৩৭ থেকে ৪০ মিটার Roost Space প্রয়োজন। ৩৩ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার অন্তর ৫ × ৫ অথবা ৫ × ৬ সেন্টিমিটার ব্যাস যুক্ত কাঠ বা ধাতব দ্রব্যাদির সাহায্যে Roost তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। নিম্ন ধরনের Roost-ই সুবিধাজনক। কারণ Roost উঁচু হলে মুরগীরা ওড়বার চেষ্টা করে। অনেক পোলট্রির মালিকগণ Roost-এর বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন না। বিষয়টি বিতর্ক-সাপেক্ষ; আসল কথা হচ্ছে—মুরগীদের আরাম প্রদানের ব্যবস্থা করা।

## পুরু শয্যা (Deep Litter)

পুরু বা মিশ্র ধরনের ভূমিশয্যা (Deep or Compost Litter) ব্যবস্থাই বিশেষ সুবিধাজনক। তরুণ মুরগীদের ডিমপাড়া ঘরে আনার আগে ধানের তুষ, কাঠের গুঁড়ো, আখের ছোব্ড়া ইত্যাদির দ্বারা ৭·৫ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার উচু ভূমিশয্যা রচনা করতে হবে। মুরগীর মল-মূত্রাদির ওপরে আবার নতুন করে শয্যার উপাদান বিছিয়ে শয্যাটিকে ২০ সেন্টিমিটার পুরু করতে হবে। পুরু ভূমিশয্যা (Deep Litter) সহজেই শুষ্ক রাখা সম্ভব। তাছাড়া পুরু শয্যা আর্দ্রতাকে অনেকাংশ শুষে নিয়ে insulating-এর কাজ করে।

প্রতি বর্গমিটার Floor Space-এর জন্য ৫০০ গ্রাম পরিমাণ hydrated lime (মিশ্র চুন) ছড়িয়ে দিলেও আর্দ্রভাব অনেকাংশে হ্রাস পায়। নতুন ভূমিশয্যা (a fresh deep litter) মিশ্রণ প্রক্রিয়ার সহযোগে তাপ বিকিরণ করে থাকে। ৬ মাসের বেশি ব্যবহৃত পুরানো ভূমিশয্যা ঠাণ্ডা ধরনের ভূমিশয্যায় (cool litter) রূপান্তরিত হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে ভূমিশয্যাটি ৫ সেন্টিমিটার উঁচু হলেও চলতে পারে। যদি ভূমিশয্যা উত্তপ্ত হয়—তবে গ্রীষ্মকালে Roosts-এর (ঘুমোবার বা বিশ্রাম নেবার জন্য দাঁড়ের) প্রয়োজন হয়।

পুরু ভূমিশয্যার উপরিভাগ (surface) মাঝে মাঝেই নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। নিচের স্তর তেমন নাড়া-চাড়ার প্রয়োজন নেই। মেঝের ওপর সমানভাবে ভূমিশয্যা রচনা করতে হবে। জলপাত্রের কাছাকাছি অঞ্চলের ভূমিশয্যা মাঝে মাঝেই পাল্টে শুষ্ক ভূমিশয্যার উপাদান ব্যবহার করতে হবে। নতুন ও পুরানো-ভূমিশয্যা মিলিয়ে-মিশিয়ে উপরিভাগ সমান (level) রাখতে হবে।

তারের প্লাটফর্ম যুক্ত খাদ্য ও পানীয় পাত্র ব্যবহার করা বিশেষ সুবিধাজনক। প্যারাসাইট তথা ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত রোগের সংক্রমণ এই ধরনের খাদ্য ও পানীয়
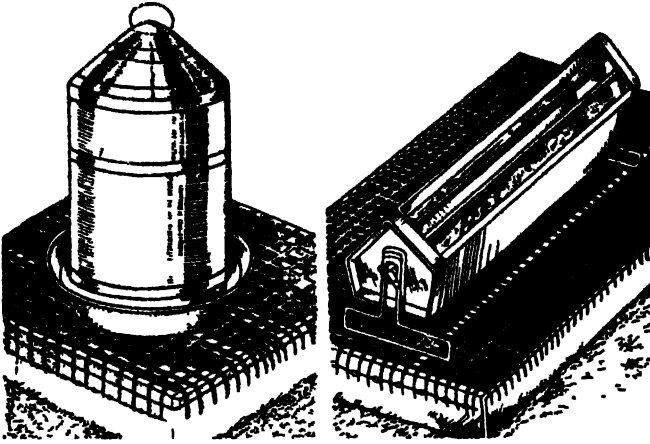
তাবেব প্লাটফর্ম যুক্ত খাদ্য ও পানীয-পাত্র

পাত্র ব্যবহাবে অনেকাংশে বোধ করা সম্ভব। তাছাড়া এই ধরনের খাদ্য ও পানীয় পাত্র উত্তম sanıtatıon ব্যবস্থা ও সতর্ক পবিচালন ব্যবস্থাব নির্দেশক।

## ডিমপাড়ার স্থান (Nests)

প্রত্যেক ডিমপাড়া ঘবেই Nests তৈবি করতে হবে। প্রতি ৫টি মুরগীর জন্য ০.০৯ বর্গমিটাব Nestıng Space প্রয়োজন। প্রতিটি Nest-ই একই ধরনের হওয়া
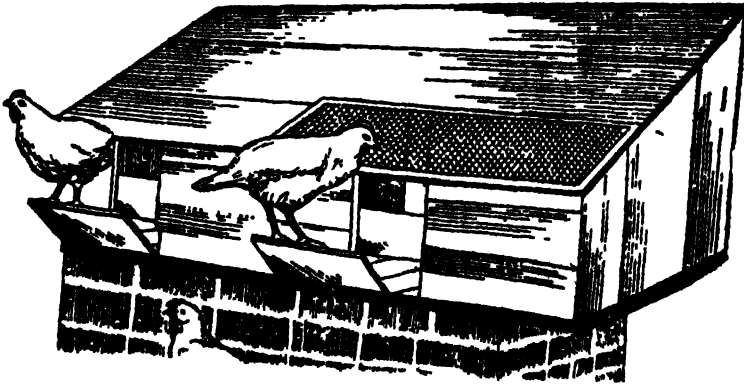
কমিউনিটি টাইপ নেস্ট (ডিমপাডাব স্থান)

বাঞ্ছনীয়---যাতে কোন কোন বিশেষ Nest-এ গিয়ে মুরগীরা ভিড় না জমায়। অতএব সব Nest-সমান আকৃতির, সমান পবিসর যুক্ত এবং একই উপাদান দিয়ে তৈরি করা উচিত। ডিমপাড়া ঘরের ভিতরেই Nests তৈরি করা বিধেয় ; কারণ সে ক্ষেত্রে

Nests-সমূহ অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়। তবে Nests-এর সংখ্যা, স্থান (location) এবং ধরন অনুযায়ী ডিম ভাঙা বা না ভাঙা অনেকাংশে নির্ভর করে। ডিমের খোলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ডিম সংগ্রহ করার সুবিধা এবং অসুবিধাও এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়। কমিউনিটি টাইপ নেস্ট ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। নিম্নে পৃষ্ঠায় কমিউনিটি Nest-এর একটি নক্‌শা দেওয়া হয়েছে। ঐটি ৬০ সেন্টিমিটার চওড়া এবং ১·২৫ থেকে ৩·৬৫ মিটার লম্বা। এতে ১½ মিটার অন্তর অন্তর ২০ সেন্টিমিটার প্রশস্ত মুরগীদের যাতায়াত করার জন্য দুটো পথ রাখা হয়েছে।
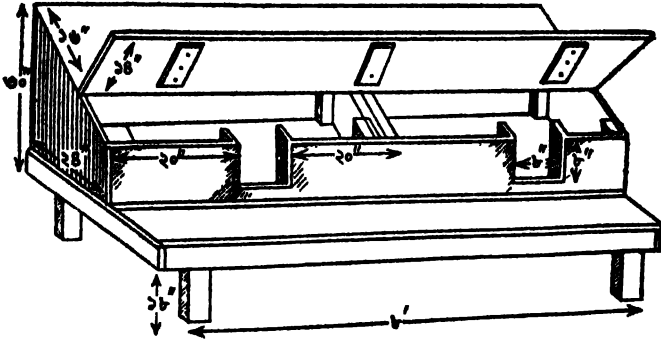
কমিউনিটি নেস্টের কাঠামোব নক্‌শা

এর সম্মুখ দিয়ে ডিম সংগ্রহ করা হয় এর পর্শ্চাৎভাগ দিয়ে মুবগীরা যাতায়াত করে থাকে।
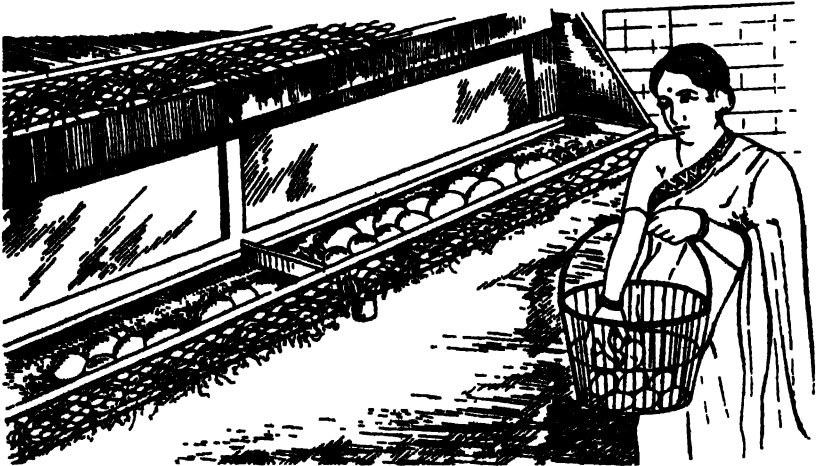
রোল-ওয়ে টাইপ নেস্ট

কোন কোন Nest-এর তলা তারের জাল দিয়ে তৈরি, নিম্নস্থ তারের পাটাতন একটু ঢালু হওয়ায়, ডিমগুলি সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ ঢালু পাটাতনের সাহায্যে roll করে লম্বা ধরনের গামলায় (trough) এসে পড়ে, কিন্তু একটুও ভাঙে না।

ডিমগুলো roll করে এসে আটকে থাকে বলে পড়ে যাওয়ার বা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

## খাঁচায় মুরগী পালন
## (Cage System)

খাঁচায় রেখেও মুরগী পালন করা যায়। খাঁচা সচরাচর ৮ থেকে ১২ ইঞ্চি চওড়া হয়ে থাকে। উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্য ১৮ ইঞ্চি। ৮ অথবা ৯ ইঞ্চি চওড়া খাঁচায়—একটি লেগহর্ন মুরগী রাখার পক্ষে যথেষ্ট। ভারি জাতের মুরগী রাখার জন্য ১০ ইঞ্চি চওড়া খাঁচার প্রয়োজন। যদি একসঙ্গে দুটি মুরগী রাখতে হয়—তবে খাঁচাটি ১২ থেকে ১৪ ইঞ্চি চওড়া হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ডিমপাড়া মুরগীর ঘরে কতকগুলো পৃথক পৃথক খাঁচা পাশাপাশি রেখেও একসঙ্গে অনেক মুরগী পালন করা সম্ভব।

এই ধরনের খাঁচায় ডিম পাড়বার পর ডিমগুলো গড়িয়ে এসে সামনে আটকে থাকে।

নিম্নস্থ পাটাতনও তারের হওয়ায়, নিঃসরিত মল-মূত্র ঘরের মেঝেতে পড়ে। অতএব মেঝেটি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। পরিবারের লোকদের জন্য ডিমের প্রয়োজনে কলোনী টাইপ খাঁচায় মুরগী পালন করা হয়ে থাকে। বাড়ির বারান্দায় অথবা ছাদে এই ধরনের কলোনী টাইপ খাঁচায় অনায়াসে ১০ থেকে ২০টি ডিমপাড়া মুরগী (hens) পালন করা সম্ভব।

ডিমপাড়া মুরগী রাখার খাঁচা

এই ধরনের খাঁচায় খাদ্যপাত্র সম্মুখভাগে, জলপাত্র পশ্চাদ্ভাগে থাকে। নিম্নস্থ তারের পাটাতন ঢালু হওয়ায়—ডিমপাড়ার পর ডিমগুলো খাদ্যপাত্রের নিচু দিয়ে সম্মুখভাগের ট্রেতে এসে জমা হয়।
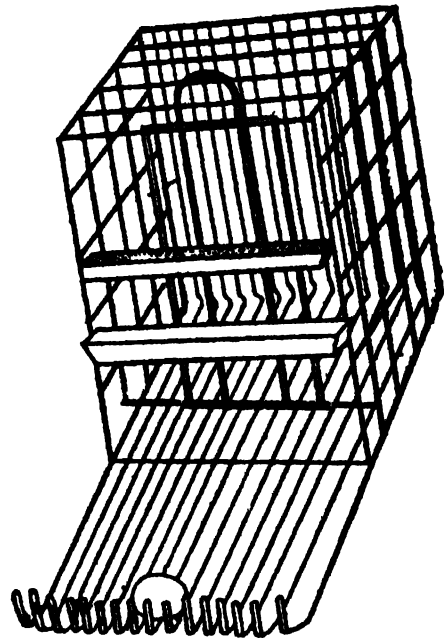
## পৃথক পৃথক খাঁচায় মুরগী পালনের সুবিধা ও অসুবিধা

### (ক) সুবিধা

(১) বাছাই এবং বাতিলের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয় না। যেহেতু মুরগীদের পৃথক পৃথক খাঁচায় রেখে পালন করা হয়,

অতএব ডিম উৎপাদনের রেকর্ড অনায়াসেই রাখা সম্ভব। যে সকল মুরগী অল্পসংখ্যক ডিম পাড়ে (Poor Layers)—সেই সকল মুরগীকে অনায়াসেই স্পট আউট (spot out) করা সম্ভব।

(২) পরিশ্রমেরও লাঘব হয়। খাদ্য তথা পানীয় জলের সরবরাহ যান্ত্রিক বা অটোমেটিক পদ্ধতিতে করতে পারলে অনেক সময় পরিশ্রমও বাঁচে। তাছাড়া এই পদ্ধতি ডিম সংগ্রহ করার পক্ষেও বিশেষ সুবিধাজনক।
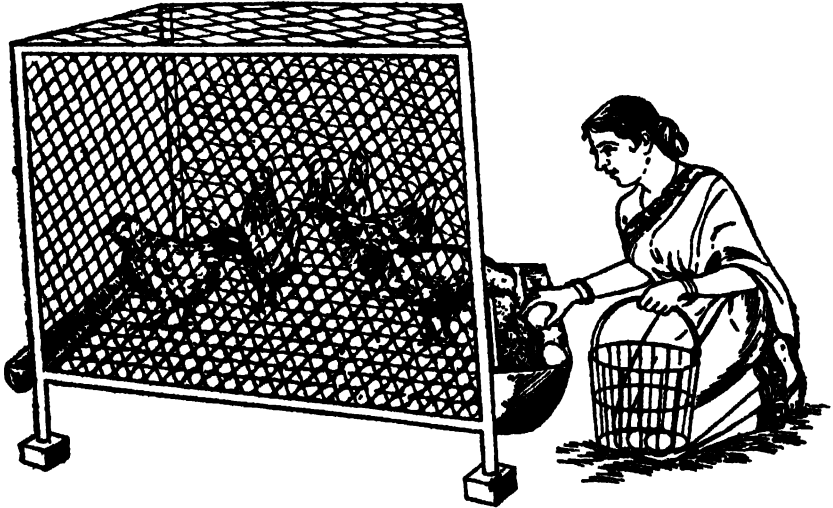
ছোটো কলোনী টাইপ খাঁচা (Small Colony Type Cage)

(৩) মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস। গোলকৃমি, ককসিডিওসিস্ প্রভৃতি রোগের আক্রমণ সম্ভব হয় না। যে রোগগ্রস্ত মুরগীটি ডিমপাড়া বন্ধ করেছে—সেই রোগগ্রস্ত মুরগীটিকে অনায়াসেই spot out করে বাতিল করা সম্ভব হয়। ফলে সংক্রামক রোগের বিস্তার অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হয়।

(৪) দুর্বল মুরগীদের বিশেষ যত্ন লওয়া সম্ভব হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহের ফলে—দুর্বল মুরগী বা মুরগীগুলো সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারে।

(৫) সারা বছর ধরে brooding করা সম্ভব হয়। বহুসংখ্যক তরুণ মুরগী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কারণ দ্বিতীয় ডিমপাড়া বছরে উত্তীর্ণ মুরগীগুলো তরুণ মুরগীদের অপেক্ষা বেশি খাদ্য খেয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যজনিত অপব্যয়ও রোধ করা সম্ভব হয়।

### (খ) অসুবিধা

(১) খাঁচায় প্রতিপালন করতে হলে—প্রাথমিক ব্যয় অত্যন্ত বেশি হয়।

(২) প্রাত্যহিক নিয়মিত খাদ্যপাত্র, জলপাত্রাদি (যান্ত্রিক বা অটোমেটিক ব্যবস্থা না থাকলে) পরীক্ষা করা বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ।

(৩) শ্বাসযন্ত্র ঘটিত রোগে (respiratory infections) মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। খাঁচায় মুরগী রাখার ফলে—পোলট্রির পরিচালন কর্তৃপক্ষ রোগাদির ব্যাপারে অসতর্ক থাকে। ফলে করিজা (Coryza), রানীক্ষেত রোগ, ব্রঙ্কাইটিস ও শ্বাসযন্ত্র ঘটিত রোগের প্রকোপ ঘটতে পারে।

(৪) ডিমগুলো নোংরা হতে পারে বা ভেঙে যেতে পারে। তারের ডিমপাত্রটি মাঝে মাঝেই পরিষ্কার করা দরকার।

(৫) মল মূত্রের দ্বারা বা জলের পাইপ লিক হলেও—আর্দ্রতা নিবারণের জন্য ডীপ লিটারে (পুরু ভূমিশয্যার) ব্যবস্থা না থাকায় মশা-মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক।

(৬) গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে—মাঝে মাঝে জল স্প্রে করার প্রয়োজন, আবার শীতের দিনে প্রবল ঠাণ্ডা বাতাসের হাত থেকে মুরগীদের রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণও বিশেষ প্রয়োজন।

## ডিমপাড়া ঘরে কি ধরনের ডিমপাড়ার স্থান হওয়া (Nests) উচিত

Nests যে ধরনেরই হোক, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

১। Nest-এর অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে।

২। সহজেই যাতে পরিষ্কার করা সম্ভব হয়—এমনভাবে Nest তৈরি করা আবশ্যক।

৩। ডিম সংগ্রহের সুবিধা থাকা চাই।

৪। মুরগীগুলো যাতে সহজেই ঢুকতে এবং বেরুতে পারে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

৫। রাতের বেলা বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

৬। Nests সমূহ আলোবাতাসযুক্ত (well ventilated) হওয়া প্রয়োজন।

## মুরগীর ঘরের কাঠামো যেরূপই হোক না কেন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে

(১) **ঘরটি বা ঘরের অংশ সমূহ বড় হলে**—পরিশ্রম লাঘব হবে, তবে অত্যধিক বড় হলে নিয়মিতভাবে মুরগীর যত্ন নেওয়া কঠিন হবে।

(২) মেঝেটি (Floor) কংক্রিটের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে পরিষ্কার করতে বিশেষ সুবিধা হবে।

**কংক্রিটের ফরমূলা ঃ** সিমেন্ট-১ ভাগ ; বালি-২ ভাগ ; পাথরকুচি (grovel) ৩ ভাগ।

এই মিশ্রণের দ্বারা মেঝেটি ২ ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু করতে হবে। তৎপরে ১ ইঞ্চি পরিমাণ নিম্নলিখিত মিশ্রণ প্রয়োগে ফিনিশিং করতে হবে।

সিমেন্ট—১ ভাগ ; বালি—২ ভাগ ; পাথরকুচি—২ ভাগ।

কাঠের দণ্ড বা স্টীলের দণ্ড দিয়ে মইয়ের মতো করে টালার পর উপরিভাগ মসৃণ করতে হবে।

মেঝেটি যদি কাঠের তৈরিও হয়—তবুও উপরিভাগে সিমেন্টের আস্তরণ দেওয়া সঙ্গত।

মেঝেটি কংক্রিটের হলে drainage-এর ব্যবস্থা থাকা বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক ৬ ফিট Floor Space-এর জন্য ১ ইঞ্চি পরিমাণ drainage-এর খাদ রাখতে হবে। Water fountain-এর কাছে নর্দমা রাখলে নোংরা জল বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা থাকবে।

বিভিন্ন ধরনের মুরগীর ঘরের বাইরের কাঠামোর স্কেচ

(৩) **দেওয়াল :** মুরগীর ঘরের দেওয়াল নানাবিধ উপাদান দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। কংক্রিট, কাঠ, তার, বাঁশ, কাদা মাটির গাঁথনি, ইট-সুরকির গাঁথনি ইত্যাদি। শীতপ্রধান অঞ্চলে দেওয়ালটি পুরু করা আবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে দেওয়াল তেমন পুরু না হলেও চলবে। তবে সকল অঞ্চলেরই মুরগীর ঘরের পশ্চাদ্ভাগের দেওয়াল পুরু হওয়া আবশ্যক, এবং Roosting-এর স্থানের ওপরে সিলিং (ceiling) থাকা সঙ্গত।
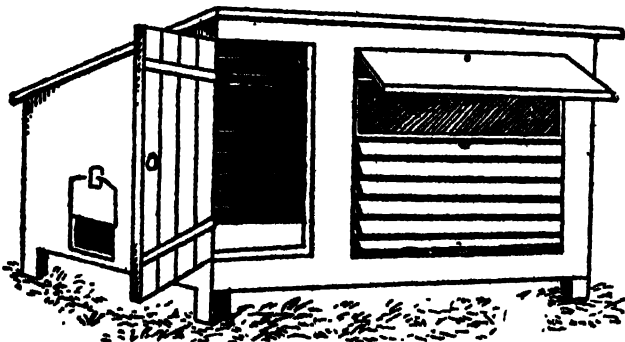
বাড়ির পেছনের উঠোনে মুরগী পালনের ঘর

(৪) **জানালা :** প্রতি ২০টি মুরগীর জন্য ১ বর্গফুট পরিমাণ জানালার Space থাকা আবশ্যক।

(৫) **দরজা ঃ** বাতাস যে দিকে বয়—ঠিক তার উল্টো দিকে দরজা থাকা আবশ্যক। অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশের মধ্যবর্তী দরজাগুলো Swing door হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৬) **ছাদ ঃ** মুরগীর ঘরের ছাদটি অ্যাসবেসটস্ বা টিনের তৈরি হলে—ছাদের নিম্নস্থ সিলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কাঠের বা বাঁশের দরমার সিলিং ব্যবহার করাই সঙ্গত। টালির তৈরি ছাদও চলতে পারে। কাঠের সিলিংই উত্তম; কারণ, কাঠের সিলিং শীত ও উত্তাপ-নিরোধক। ছাদের নিচে Straw Insulation শৈত্য ও উত্তাপ-নিরোধক।

(৭) প্রতিটি মুরগী রাখার ঘরে বা বিভক্ত অংশে (pens) খাদ্যপাত্র বা জলপাত্র স্থাপনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত।

## ডিমপাড়া মুরগীর পানীয় জলের পাত্র ও খাদ্যপাত্র

১০০টি মুরগী বছরে প্রায় ৫ থেকে ৭ টন জল পান করে। ডিমে শতকরা ৭৪ ভাগই জলীয় অংশ থাকে; অতএব ডিমপাড়া মুরগীর ঘরে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জলের সরবরাহ থাকা একান্ত প্রয়োজন। পানীয় জল সরবরাহেব ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব পরিশ্রম লাঘব করা যায়—তার চেষ্টা কবতে হবে।

ভূমিশয্যার ওপরে Stand স্থাপন করে, সেই Stand-এর উপর জলপাত্র রাখা যায়।

তাবের প্লাটফর্মের ওপরে জলপাত্র বাখা হলে—পানীয় জল অনেকাংশে পরিষ্কার রাখা সম্ভব (নিম্নের চিত্র দেখুন) হয়। পানীয় জলের পাত্রের পাশে রেলিং
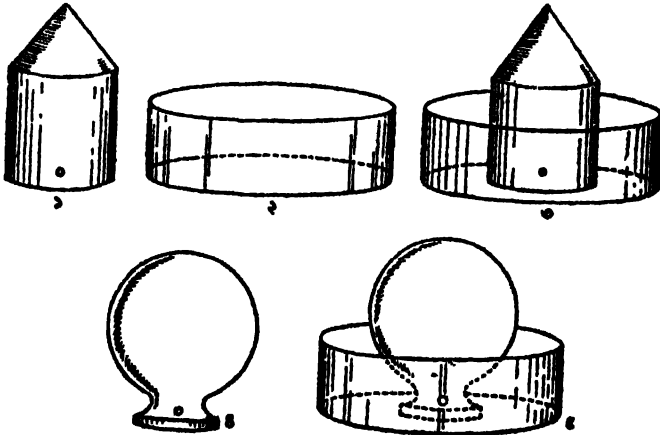
বিভিন্ন ধরনের পানীয় জলের পাত্র

বা অন্য ধরনের স্বল্প পরিসরযুক্ত আবেষ্টনী রাখলে বাচ্চা-মুরগীদের জলপাত্রের ওপরে ওঠার বা পড়ে যাবার সম্ভাবনা রোধ করা যেতে পারে।

১ নং থামের আকাবেব ছিদ্রযুক্ত টিনের পাত্র। মুরগী যাতে পাত্রের ওপরে না দাঁড়াতে পারে—সেইজন্য পাত্রটির উপরিভাগ কোণাকৃতি। পাত্রের কোণার দিক নিম্নে রেখে পাত্রটি জলপূর্ণ করে, ৩ নং নমুনাব অনুরূপ ২ নং পাত্রের ওপরে স্থাপন করুন। ২ নং পাত্রে জল আসবে, ছিদ্রের level-এ জল ওঠবার পরে পার্শ্বচাপজনিত কারণে জল আর বের হবে না, মুরগীর জল পান করবার পর জলের level নিচে নামার পর আবার জল ২ নং পাত্রে আসবে। অনুরূপভাবে, ৪ নং পাত্রের গোল দিক নিচু কবে জল ভরে, ৫ নং পাত্রে স্থাপন করলে জল আসবে।

প্রতি ১০০টি মুরগীর জন্য দুটি ২২·৫ লিটার (litres) fountains বা ১·২ মিটার ব্যাসযুক্ত স্বয়ংক্রিয় জলপাত্র প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত পানীয় জল সরবরাহ প্রয়োজন।

ব্রুডাব হাউসে বাচ্চা মুবগীদেব জন্য পানীয জলেব পাত্র (কাচেব)
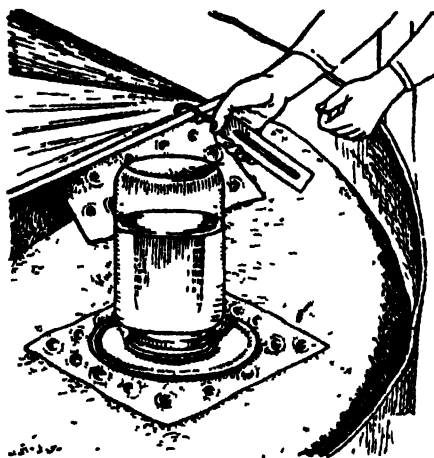
ব্রুডার হাউসে বাচ্চা মুরগী ও মোরগদের জলপানের নিমিত্ত ওপরের চিত্রেব অনুরূপ পানীয় জলের পাত্র ব্যবহার করা সঙ্গত। এক্ষেত্রে glass founts ব্যবহার করা উচিত। জল ঈষদুষ্ণ ও পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## খাদ্যপাত্র (Feeders)

প্রত্যেকটি বাচ্চা মোরগ বা মুরগীর জন্য (ব্রুডার হাউসে থাকাকালীন) ১ ইঞ্চি পরিমাণ feeding space প্রয়োজন, কিন্তু ডিমপাড়া প্রতিটি মুবগীর জন্য ১৩ সেন্টিমিটার পরিমাণ feeder space-এর প্রয়োজন। খাদ্যপাত্রের একটি প্রান্ত জানালার দিকে থাকলে খাদ্যপাত্রে ছায়া পড়বে না। প্রত্যেকটি খাদ্যপাত্র সমান উঁচুতে স্থাপন করা আবশ্যক।

খাদ্যপাত্রের ওপরে গ্রিল বা রেলিং থাকলে খাদ্য পরিষ্কার থাকে এবং অপচয় অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হয়।

বর্তমানে ঝুলন্ত খাদ্যপাত্র (hanging feeders) ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কারণ এই ধরনেব খাদ্যপাত্র ব্যবহাবেব ফলে পবিশ্রম লাঘব হয় এবং অপচয অনেকাংশে বোধ কবা সম্ভব হয়।

ঝুলন্ত খাদ্যপাত্র (A hanging feeder)

কাঠের তৈরি লম্বা ধবনের খাদ্যপাত্রটি ৫ সেন্টিমিটাবেব পোলট্রি নেটের দ্বারা আচ্ছাদিত কবলে— ঐ পাত্রে সবুজ শাক-সবজি জাতীয খাদ্য খাওযানো চলে।

ঝিনুকের গুঁড়ো, পাথরকুচি বা বালুকণার জন্য প্রতিটি মুরগীব ৩০ সেন্টিমিটার grit space দবকার। দেওযাল-সংলগ্ন ছোট আকাবেব খাদ্যপাত্রে পাথরকুচি বা বালুকণা এবং ঝিনুকেব গুঁড়ো সরবরাহ কবা প্রযোজন।

ব্রুডার হাউসে একেবারে ছোট বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য প্রথম দিনে চটের বস্তা বা কাগজের ওপর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
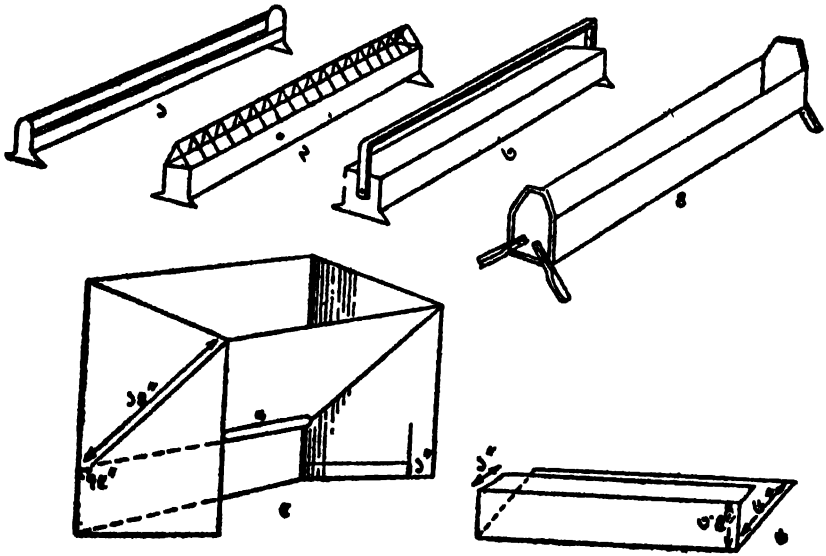
বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপাত্র (বয়স ভেদে)

১নং—এক সপ্তাহ বযস পর্যন্ত বাচ্চার খাদ্যপাত্র

২নং—১½ মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চার খাদ্যপাত্র

৩নং—৪, মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চার খাদ্যপাত্র

৫ নং—পূর্ণ বয়স্ক মুরগীর মেশ খাদ্য-সরবরাহের পাত্র

৫নং ও ৬নং—৬নং চিত্রের অংশটি ৫ নং চিত্রের নিম্নাংশে সংস্থাপন করলেই—স্বয়ং পরিবেশিত খাদ্যপাত্র তৈরি হবে।

২/৩ দিন পরে কাঠ বা ধাতুর তৈরি ছোট খাদ্যপাত্র ১০ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা চলতে পারে। প্রথম কিছু দিনের জন্য খাদ্যপাত্রটি ভর্তি করে রাখতে হবে—পরবর্তী সময়ে খাদ্যপাত্রটি ⅔ অংশ ভর্তি করে রাখলেও চলবে।

ব্রুডার হাউসে থাকাকালীন প্রতিটি বাচ্চার প্রথম ৫ সপ্তাহ পর্যন্ত ২½ সেন্টিমিটার trough space প্রয়োজন।

## ডিমপাড়া ঘরে (laying house) Ventilation-এর ব্যবস্থা

সমগ্র বছর ধরে ডিমপাড়া ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে—যথোপযুক্ত insulation এবং ventilation-এর ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। মুরগীর ঘরে টাটকা বায়ু ঢোকানোর জন্য এবং মল-মূত্র ত্যাগ জনিত আর্দ্রতা ও নিঃশ্বাস জনিত

দূষিত বায়ু নিঃসরণের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ventilation-এর ব্যবস্থা। ১০০টি মুরগীর মল-মূত্রের মাধ্যমে নিঃসরিত ১৩·৫ থেকে ১৮ লিটার পরিমাণ আর্দ্রতা শুকোতে প্রায় ১ দিন সময় লাগে।

ভারতীয় আবহাওয়ায় খড়ের চাল (roof) ব্যবহার করা হয়। খড়ের চাল তৈরিতে ব্যয় কম হয় এবং insulation effect-ও যথোপযুক্ত বিদ্যমান। ডিমপাড়া ঘরের ইঁট বা মাটির দেওয়াল ৩৮ থেকে ৭০ সেন্টিমিটার উঁচু করা হয়ে থাকে—বাদ বাকি অংশে তার ব্যবহার করা হয়।

## ডিমপাড়া ঘরে আলোর ব্যবস্থা

কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। বিশেষ করে শীতকালে অর্থাৎ অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ডিমপাড়া ঘরে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিটি মুরগী যাতে ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা দিনের আলো পায়—এরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত। যেক্ষেত্রে ১০ ঘণ্টা দিনের আলো পাওয়া সম্ভব—সেক্ষেত্রে বাদবাকি ৪ থেকে ৬ ঘণ্টার জন্য কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা উচিত। কিছু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লেগহর্ন জাতের মুরগীর জন্য ১৬ ঘণ্টা আলোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সচরাচর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ ঘণ্টা আলোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেই আলো প্রাকৃতিকই হোক বা কৃত্রিমই হোক—সর্বমোট ১৪ ঘণ্টা আলোর ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

## আলো ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক কেন?

মুরগীর প্রজনন চক্র হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ডিম উৎপাদনের জন্য যে হরমোনের প্রয়োজন, তা মুরগীর মস্তিষ্কস্থিত পিটুইটারী বা মাস্টার গ্ল্যাণ্ডে বিদ্যমান। চোখের স্নায়ু এবং চোখের চারপাশের টিস্যুতে আলোক সঞ্চারিত হওয়ার ফলে, পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বল্প আলো সঞ্চারিত হলে—স্বল্প পরিমাণ হরমোন নিঃসরিত হয়, ফলে ডিম উৎপাদন হ্রাস পায়।

অতএব বিশেষ করে শীতকালে অর্থাৎ অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। গ্রীষ্মের শেষেও কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করে অকালে 'পালক খসা' (premature molting) অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর।

যদিও কৃত্রিম আলোর দ্বারা ডিম প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব নয—তবে এই আলোক ব্যবস্থা মুবগীর অন্তর্নিহিত ডিম উৎপাদিকা শক্তিকে (inherited rate of production) সক্রিয় করে তোলে। ফলে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডিম পাওয়া যায়।

## সকালের আলো (Morning light)

প্রথম সপ্তাহে সূর্য ওঠার ঠিক আধ ঘণ্টা আগে থেকে কৃত্রিম বাতিগুলো সূর্য না ওঠা পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখতে হবে। পরবর্তী সপ্তাহে আরো আধঘণ্টা আগে থেকে

বাতিগুলো জ্বালাতে হবে। এভাবে আধ ঘণ্টা পূর্বে ক্রমশ জ্বালাতে জ্বালাতে বাতিগুলো ভোর রাত তিনটের সময় জ্বালাতে হবে। বর্ষার দিনে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে বাতিগুলো সূর্য ওঠার পরেও বেশ কিছুক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা প্রয়োজন।
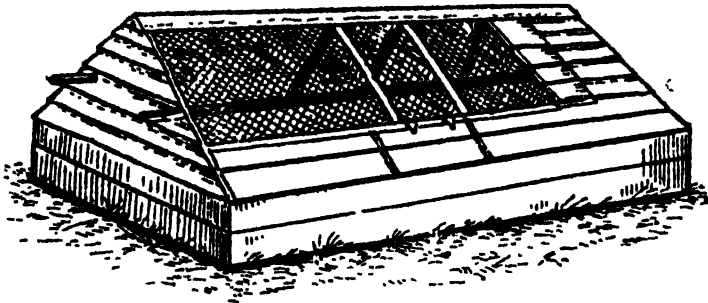
একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ডিমপাড়া মুরগী রাখার ঘর

প্রত্যেক ১৯ বর্গমিটার floor space-এর জন্য একটি ৬০ ওয়াটের বাল্ব প্রয়োজন। প্রত্যেক বাল্বের সঙ্গে রি-ফ্লেক্টর থাকা উচিত। বাল্বগুলো মেঝে থেকে ২ মিটার উঁচুতে সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হবে।
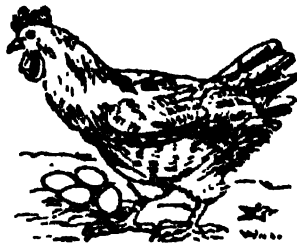
# মুরগীর বিভিন্ন প্রকার রোগ ও চিকিৎসা

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ককসিডিওসিস্ (Coccidiosis) এবং রানীক্ষেত (New-castle Disease) রোগ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। বাড়ন্ত মুরগীদের ক্ষেত্রে ককসিডিওসিস্ রোগের প্রসার লাভ পোলট্রি উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতি সূচিত করে।

ডিমপাড়া মুরগীদের ক্ষেত্রে লিউকোসিস (Avian Leukosis Complex), রানীক্ষেত (New-castle Disease), ক্রনিক রেসপিরেটরি (C. R. D.), বসন্ত (Fowl Pox) এবং কীটাণুর আক্রমণ বিশেষ ক্ষতি সূচিত করে।

## পুলোরাম রোগ বা ব্যাসিলারি সাদা উদরাময়
## [Pullorum Disease (Bacilliary White Diarrhoea-B. W. D.)]

পুলোরাম রোগ বা ব্যাসিলারি সাদা উদরাময় মুরগীর বাচ্চাদের এবং তরুণ মুরগীদের ক্ষেত্রে একটি সাংঘাতিক সংক্রামক রোগ। এই রোগ স্ত্রী হাঁস, রাজহংসী বা অন্য বন্য স্ত্রীজাতীয় পাখিদের হতে পারে। যদিও এই রোগটি বাচ্চাদের মধ্যেই বিশেষভাবে সূচিত হয়ে থাকে, তবে তরুণ মুরগী এবং পূর্ণ-বয়স্ক মুরগীর মধ্যেও এই রোগজীবাণু বিদ্যমান থাকতে পারে। রোগগ্রস্ত পূর্ণবয়স্ক মুরগীর মধ্যে এই রোগলক্ষণের কোন বাহ্যিক প্রকাশ না পেলেও বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

পুলোরাম রোগের ফলে শুধু বাচ্চারাই মারা পড়ে তা নয়, তরুণ মুরগীরাও মারা পড়ে, ডিম উৎপাদন হ্রাস পায় এবং মৃত্যু সূচিত হয়।

**কারণ (Cause) ঃ** Salmonella pullorum নামক এক প্রকার ব্যাক্টেরিয়া মুরগীর ডিম্বাশয়কে আক্রমণ করে—ফলে ঐ মুরগীর ডিমের অভ্যন্তরস্থ ভ্রূণটিও রোগজীবাণুযুক্ত হয়। ঐ রোগজীবাণুযুক্ত ডিম থেকে যে বাচ্চা উৎপন্ন হয়, সেই নবজাত বাচ্চার দেহে কয়েক ঘণ্টা বা ২।৩ দিনের মধ্যে এই রোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় এবং বাচ্চাটির মৃত্যু হয়। নবজাত কয়েকটি রোগগ্রস্ত বাচ্চা থেকে এই জীবাণু ইনকিউবেটারের সমগ্র অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। রোগগ্রস্ত মুরগীর মল-মূত্রের মাধ্যমে এই রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে। যথোপযুক্ত sanitation ব্যবস্থার অভাব, ঘিঞ্জি অবস্থা, দোষযুক্ত খাদ্য সরবরাহ, ব্রুডার যন্ত্রের অত্যধিক তাপ সঞ্চার—এই রোগ প্রসারে সহায়তা করে। রোগ-জীবাণুযুক্ত ইনকিউবেটার, ব্রুডিং হাউস, এবং একই ঘরে অবস্থিত রোগাক্রান্ত মুরগীর দেহ থেকে এই রোগজীবাণু সুস্থ মুরগীর দেহে সংক্রামিত হতে পারে। বন্য জন্তু বা বাইরে থেকে আগত পাখিদের মাধ্যমেও এই রোগজীবাণু পোলট্রির মুরগীদের বা বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। পরিদর্শকদের পায়ের জুতোর মাধ্যমেও এই রোগজীবাণু পোলট্রি ফার্মে আসতে পারে।

তবে সচরাচর এই রোগ রুগ্ন মুরগীর ডিম থেকে জাত বাচ্চার মধ্যে সংক্রামিত হয়ে থাকে। এই কারণে ব্রুডার হাউসস্থিত নবজাত বাচ্চাদের মধ্যেই এই রোগের প্রকোপ বেশি হয়ে থাকে। রুগ্ন বাচ্চার সংস্পর্শে এবং দুষিত মল থেকেও এই রোগ সুস্থ বাচ্চাদের দেহে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

**লক্ষণ (Symptoms)** ঃ বাচ্চাদের রোগ হলে—ব্রুডার হাউসটির সর্বত্র তাপযুক্ত হলে এই রোগে আক্রান্ত বাচ্চাগুলো ব্রুডার যন্ত্র সংলগ্ন হোভারের নিচে (বিশেষ তাপযুক্ত অঞ্চলে) একত্র হয়ে ঝিমুতে থাকে। তেমন নড়া-চড়া করে না।

পুলোরাম রোগগ্রস্ত কয়েকটি বাচ্চা মুরগী

চোখ বুজে থাকে, ডানাগুলো সঙ্কুচিত পরিলক্ষিত হয়। খুব কম খাদ্য গ্রহণ করে। অথচ খাবার গ্রহণের ঝোঁক থাকে না। চলতে চলতে টলে পড়ে যায়, মল পাতলা চটচটে এবং সাদা রংযুক্ত হয়ে থাকে (মলে রক্ত থাকে না)—মলদ্বারের চারপাশের পালকগুলোতে পাতলা চটচটে মল লেগে থাকে।

অনেক সময় রোগাক্রান্ত বাচ্চারা কয়েকবার শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

## পূর্ণবয়স্ক মুরগীদের ক্ষেত্রে এই রোগের লক্ষণ

এই রোগটি জটিল হলে এবং মুরগীর দেহে এই রোগজীবাণু দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান থাকায়—পূর্ণবয়স্ক মুরগীদের দেহে কোন বাহ্যিক লক্ষণ সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

তবে শারীরিক দুর্বলতা, বিষণ্নতা, সবুজ বা বাদামী রংয়ের তরল বাহ্য, ঝুঁটির সংকোচন ও বিবর্ণতা (Pale) এবং মৃত্যুহার বৃদ্ধি সূচিত হতে পারে।

**চিকিৎসা ব্যবস্থা** ঃ এই রোগ সম্পূর্ণভাবে নিরাময়ের জন্য—এখনও অবশ্য তেমন কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি—নিম্নলিখিত ওষুধটি সময়মতো প্রয়োগ করলে মৃত্যু-হার অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

(১)

R/-

Furasolidone (N. F. 180)

at 0·04% in the mash.

মেশ খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত ওষুধটি খাদ্য পরিমাণের ৪ শতাংশ মিশ্রিত করতে হবে। এবং

(২)

R\-

Sulfamethazine .......10 ml.

Aqua ........1 liter

Sulfamethazine (I. C. I. ) 16%

(mft. sol. )

পানীয় জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া থেকে শুরু করে ৮ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত মেশ খাদ্য ও পানীয় জলের সঙ্গে উল্লিখিত ওষুধ দুটি মিশিয়ে খাওয়ালে রোগের প্রকোপ এবং রোগজনিত মৃত্যুহারও অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

**প্রতিষেধক-ব্যবস্থা ঃ** যে সকল বাচ্চা উৎপাদনকারী ফার্মে পুলোরাম রোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে—সেই সকল বাচ্চা উৎপাদনকারী (Hatcharies) ফার্ম থেকে বাচ্চা কিনতে হবে।
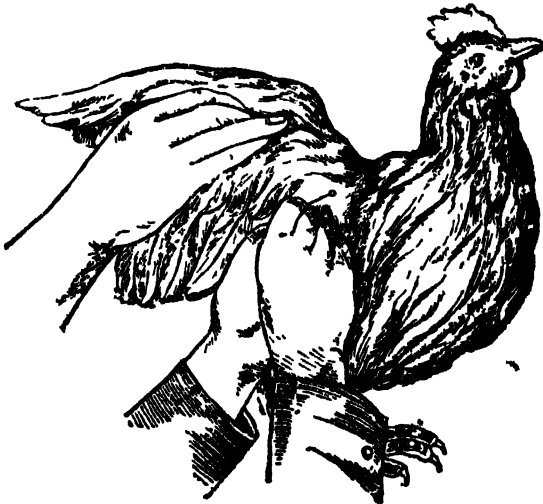
পুলোরাম রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষা

**রক্ত পরীক্ষা ঃ** পুলোরাম রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষা করা প্রয়োজন। রোগ নির্ণয়ের জন্য রঙীন অ্যান্টিজেন (antigen) কিনতে পাওয়া যায়। রোগগ্রস্ত মুরগীর

রক্তের সিরাম বা রক্তের তরল অংশের সঙ্গে সমপরিমাণ রঙীন অ্যান্টিজেন মেশাবার পর যদি রক্ত জমাট বাঁধে—তবে বুঝতে হবে যে ঐ মুরগীটির পুলোরাম বা B. W. D. রোগ হয়েছে।

১। প্রজননের জন্য ব্যবহৃত মোরগ ও মুরগী উভয়েরই অনুরূপভাবে রক্ত পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

২। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে রোগজীবাণুর অস্তিত্ব টের পাওয়া গেলে—রোগগ্রস্ত মোরগ বা মুরগীকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলতে হবে। ব্যবহৃত ঘরটি, খাদ্যপাত্র, জলপাত্র সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করতে হবে। লিটার পরিবর্তন করতে হবে।

৩। প্রতিবার ইনকিউবেটারটি চালু করবার পূর্বে ইনকিউবেটারের সমগ্র অংশ লাই-জলের দ্বারা (2% commercial lye solution) বিশোধন করা আবশ্যক। এবং পূর্ব উল্লিখিত ইনকিউবেটার বিশোধনের অন্যান্য উপায়গুলো অবলম্বন করতে হবে।

৪। পুলোরাম রোগযুক্ত বড় মুরগীদের পোলট্রি ফার্ম থেকে একেবারে বিদায় করতে হবে।

৫। বছরে ১ বার করে বয়স্ক মোরগ-মুরগীদের (বিশেষ করে প্রজননের কার্যে ব্যবহৃত) রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। প্রজননের জন্য ব্যবহৃত ৫ মাসের বেশি বয়স্ক সকল মোরগ ও মুরগীর রক্ত পরীক্ষা করা আবশ্যক।

## ককসিডিওসিস্ বা রক্ত আমাশয় (Coccidiosis)

মুরগীর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই রোগটি অত্যন্ত মারাত্মক—এবং এই রোগজনিত কারণে মৃত্যু হারও বেশি হয়ে থাকে।

**কারণ ঃ** ককসিডিওসিস্ রোগের কারণ ককসিডিয়া নামক একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র প্রাণীজাতীয় পরান্নভোজী (Protozoan) জীবাণু। ককসিডিয়া জীবাণুর জীবনে দুটি অবস্থা—(১) প্রথম অবস্থায় মোরগ বা মুরগীর অন্ত্র মধ্যে থাকে। (২) দ্বিতীয় অবস্থায় মাটিতে থাকে।

এই জীবাণুসমূহ যখন ক্যাপসুলের আধারে আবৃত থাকে তখন তাদের উসিষ্ট (oocyst) আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। রোগগ্রস্ত মোরগ-মুরগীর মলের সঙ্গে ঐ উসিষ্ট (oocyst) আকারে জীবাণু ভূমিতে পড়ে, তাপ, আর্দ্রতা ও বায়ু পাওয়ার পর ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঐ উসিষ্টসমূহ পরিপক্ক হয়।

পরিপক্ক অবস্থায় ঐ উসিষ্টসমূহ যদি দূষিত খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে (মুরগীর বাচ্চা যদি তা তুলে খায়) সুস্থ মুরগীর অন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়—তবেই ঐ সুস্থ মুরগীর বাচ্চা, বা বয়স্ক মুরগী ককসিডিওসিস্ রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

নবজাত বাচ্চাদের জন্মের ১০ দিন পর থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশি হয়ে থাকে। ১০ দিনের কম বয়স্ক বাচ্চাদের পুলোরামের প্রকোপ

ককসিডিয়ার জীবাণু-চক্র
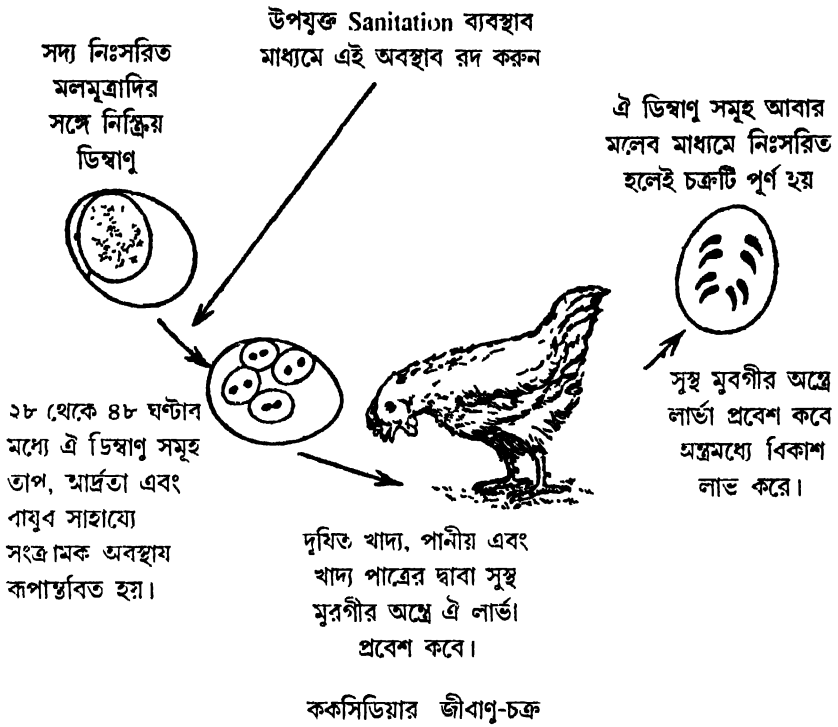
বেশি হয়, কিন্তু ককসিডিওসিসের প্রকোপ ১০ দিনের বেশি বয়স্ক বাচ্চাদের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ১০ দিনের কম বয়স্ক বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগ সচরাচর হয় না। বয়স্ক মোরগ-মুরগীদের ক্ষেত্রে এই রোগের প্রকোপ বেশি হয় না।

**লক্ষণ ঃ** রোগাক্রান্ত বাচ্চারা খেতে চায় না। নিস্তেজ হয়ে পড়ে। চোখ বুজে ঝিমুতে থাকে। জলের মতো পাতলা বাহ্য করে, বাহ্যের সঙ্গে রক্তের ছিট দৃষ্ট হয়। জলীয় মলের দ্বারা মলদ্বারের পালকসমূহ ভিজে থাকে। আক্রান্ত বাচ্চাগুলো আলোর কাছে (হোভারের নিচে) অথবা রৌদ্রে জড়ো হয়ে থাকে। ডানাগুলো একটু ঝুলে পড়ে। (পুলোরাম রোগের মল চটচটে ও সাদা হয়, মলদ্বারে চারপাশের পালকে মল লেপ্টে থাকে; ককসিডিওসিস্ রোগের মল তরল হয়, এবং তাতে রক্তের ছিট থাকে—মলদ্বারের চারপাশের পালকগুলো তরল মল নিঃসরণের কারণে ভিজে থাকে।)

এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত মুরগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েও ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয় না।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

ককসিডিওসিস্ রোগ খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে—অতএব যথাসম্ভব শীঘ্র চিকিৎসা করা দরকার। যথোপযুক্ত চিকিৎসা-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই রোগ আয়ত্তে আনা সম্ভব।

(১)

R/-
Sulfamethazine (sol. 16%) 10 ml.
Aqua ..... 1 liter
(mft sol.)

অথবা,

(২)

R/-
Sulment sol. ...... 30 ml.
Aqua ..... 4 liter
(mft sol.)

অথবা,

(৩)

R/-
Cordrinal ..... 4 gm.
Aqua .......1liter
(mft. sol.)

অথবা,

(৪)

R/-
Bifuran sol. Tab .......1 tab.
Aqua ....... 1 liter
(mft. sol.)

Aqua অর্থে এই ক্ষেত্রে পানীয় জল। উল্লিখিত চারটির যে কোন ওষুধই পানীয় জলের সঙ্গে উল্লিখিত পরিমাণে মিশ্রিত করে খাওয়াতে হবে। চিকিৎসা কালে ওষুধ মিশ্রিত পানীয় জল ছাড়া সাধারণ পানীয় জল সরবরাহ্ করা সঙ্গত নয়। রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত ওষুধ মিশ্রিত পানীয় জল খাওয়াতে হবে। ১ সপ্তাহ্ যাবৎ মিশ্রিত পানীয় জল খাওয়ালে রোগ নিরাময় করা সম্ভবপর হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

*১। উত্তম sanitation ব্যবস্থা। খাদ্যপাত্র, জলপাত্রাদি পরিষ্কার রাখা। রোগাক্রান্ত মুরগীকে দল থেকে সরিয়ে ফেলা।*

২। নবজাত বাচ্চাদের জন্মের ১০ দিন পর থেকে অর্থাৎ ৩য়-৪র্থ সপ্তাহের পরপর তিন দিন ককসিডিয়া নাশক ওষুধ মেশ খাদ্য ও পানীয় জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

(ক) Embazinpremix...... 0·5 gm.
(to be given along with 1kg of feed)
প্রতি কেজি মেশের সঙ্গে উল্লিখিত ওষুধ ০·৫ গ্রাম খাওয়াতে হবে।

(খ) Cordrinal .....1 gm.
(to be given along with 1 liter of drinking water)
১ লিটার পরিমাণ পানীয় জলের সঙ্গে উল্লিখিত ওষুধটি ১ গ্রাম মিশিয়ে ২/৩ দিন খাওয়াতে হবে।

Hostacyclıne ........ 5 gm.
(to be given with 10 liters of drinking water)
১০ লিটার জলে ৫ গ্রাম হস্টাশাইক্লিন মিশিয়ে ২/৩ দিন খাওয়াতে হবে।

## রানীক্ষেত রোগ
## [ New-castle Disease ]

এই রোগটি অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের সংক্রামক রোগ। এই রোগের দ্বারা শ্বাসযন্ত্র এবং স্নায়ু (nerve) বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই রোগে বাচ্চা, তরুণ এবং বয়স্ক মুরগীরাও আক্রান্ত হতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে এই রোগকে নিউ-ক্যাসল রোগ আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতে উত্তর প্রদেশের রানীক্ষেত অঞ্চলে—এই রোগ প্রথম সূচিত হয় বলে এই রোগকে ভারতবর্ষে রানীক্ষেত রোগ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগকে শ্বাসযন্ত্রের রোগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, ঐ দেশে এই দেশে এই রোগের নাম—'নিউমো-এন্‌কেফালাইটীস' (Phneu-moencephalitis)।

**কারণ ঃ** এক প্রকার filterable virus-ই হচ্ছে এই রোগ সংঘটনের কারণ। ঐ ভাইরাস শ্বাসনালী বা অন্ননালীর মাধ্যমে প্রবেশ করে। Virus-যুক্ত খাদ্য ও পানীয় জল গ্রহণের ফলে এই রোগ সুস্থ মোরগ বা মুরগী এবং মুরগীর বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। অন্য বুনো পাখি দ্বারা বাহিত হয়ে, পরিদর্শকদের জুতোর সঙ্গে, গাড়ির দ্বারা বাহিত হয়েও এই রোগজীবাণু পোলট্রি ফার্মে আসতে পারে। দোষযুক্ত এগ্-ক্রেট, খাদ্যের থলি বা অন্যবিধ সাজসরঞ্জাম বা টিকাদারদের মাধ্যমেও এই রোগজীবাণু এক পোলট্রি ফার্ম থেকে অপর পোলট্রি ফার্মে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

**লক্ষণ ঃ** হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ ইত্যাদি এই রোগের প্রথম লক্ষণ। পরিশেষে শ্বাসযন্ত্র ও নার্ভ বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। শ্বাসযন্ত্র আক্রান্ত হওয়ায় শ্বাসকষ্ট হয়—ফলে মুখ খুলে শ্বাস টানে। স্নায়ুমণ্ডলী আক্রান্ত হওয়ায় পরবর্তী পর্যায়ে পক্ষাঘাত সূচিত হয়।

মাথা একদিকে বাঁকিয়ে রাখে অথবা পিছন ফিবে ডানায় গুঁজে রাখে অথবা মাথা ঘুরিয়ে দু'পায়ের মধ্যে গুঁজে রাখে।

বানীক্ষেত বোগাক্রান্ত বাচ্ছাদেব হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতিব পব পক্ষাঘাতেব লক্ষণ প্রকাশ পায়

কোন কোন রোগাক্রান্ত মুরগী অস্থিব বা উত্তেজিত অবস্থায় পিছন দিকে ঢলে পড়ে বা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

রোগগ্রস্ত মুরগী ক্ষুধা হ্রাস পায়, অলসভাবে বসে থাকে। ডিমপাড়া বড় মুরগীদের ডিম উৎপাদন আকস্মিকভাবে হ্রাস পায় অথবা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

তাছাড়া ঐ অবস্থায় যে ডিম পাড়ে—সেই ডিমের খোলাগুলো নরম (soft shelled) বা আকারে বিসদৃশ হয়। আবার কখনও কখনও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৪।৫ দিনের মধ্যে আক্রান্ত বাচ্চা তথা বড় মুরগীদের মৃত্যু হয়। আক্রান্ত বাচ্চাদের মধ্যে মৃত্যুহার বেশি হয়ে থাকে। আবার কখনও কখনও বড় মুরগীদের মৃত্যুহারও বেশি হয়। যে সকল মুরগী বা মুরগীর বাচ্চা এই রোগ থেকে একবার আরোগ্য লাভ করে,—জীবিত অবস্থায় পুনরায় তারা আর ঐ রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় না এবং রোগের ভাইরাসও বহন করে না।

**চিকিৎসা-ব্যবস্থা ঃ** এই রোগ নিরাময়ের জন্য অদ্যাবধি কোন অব্যর্থ ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা তথা সেবার মাধ্যমে সত্বর আরোগ্যলাভ সম্ভবপর হতে পারে।

উষ্ণ জল মিশ্রিত মেশ খাদ্য খাইয়ে ক্ষুধা বাড়ানো যেতে পারে, টাটকা শাক-সব্জি খাইয়ে ক্ষুধা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। মেশ খাদ্যেব সঙ্গে পরিমাণ মতো টেরামাইসীন, অরোমাইসীন বা পেনিসিলিন খাওয়ালে কিছুটা উপকার পাওয়া যেতে পারে।

(১)

R/-
Aureomycin
or
Terramycin
বা
Procaine penicillin ..... 10 gm.
(to be mixed with per tonne of feed)

প্রতি টন মেশ খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত যে-কোন একটি অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ১০ গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত ফার্মের সকল মুরগীর খাদ্যের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিকস্ (অরোমাইসীন, টেরামাইসীন বা পেনিসিলিন) ঔষধ মিশিয়ে খাদ্য খাওয়ানো উচিত।

এবং

(২)

R/-
Hostacycline .... 1 gm
Aqua......... 1 liter
(mft. sol.)

১ লিটার জলের সঙ্গে ১ গ্রাম পরিমাণ হস্টাশাইক্লীন পাউডার গুলে নিয়ে রোগগ্রস্ত বাচ্চাদের খাওয়ালে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।

রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত পানীয় জলের সঙ্গে পরিমাণ মতো হস্টাশাইক্লীন পাউডার গুলে খাওয়াতে হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

(১) অন্য পোলট্রি ফার্ম বা বাইরের থেকে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা যতটা সম্ভব রোধ করুন।

(২) উত্তম sanitation ব্যবস্থা বজায় রাখুন।

(৩) নতুন আনা বাচ্চা বা বয়স্ক মোরগ-মুরগীদের পৃথকস্থানে রেখে ২ সপ্তাহ যাবৎ লক্ষ্য করুন।

(৪) বাইরের লোকদের মুরগীর ঘরে ঢুকতে দেবেন না।

(৫) দ্বিতীয় ডিমপাড়া বছরে উত্তীর্ণ মুরগীদের (১৮ মাস বয়স্ক) মধ্য থেকে প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় মুরগী রেখে—বাদ বাকি মুরগী বেচে ফেলুন।

(৬) তরুণ মুরগী পালন করুন।

(৭) বিভিন্ন বয়সের মোরগ-মুরগীদের বয়সানুযায়ী পৃথক পৃথক ঘরে বা পার্টিশান দেওয়া অংশে রেখে পালন করুন।

(৮) ডিমপাড়া মুরগীদের কাছ থেকে তরুণ মুরগী এবং প্রজননের জন্য ব্যবহৃত মোরগ-মুরগীদের আলাদা রাখুন।

(৯) নতুন আনা বাচ্চাদের ঘরে ঢোকাবার আগে ঘরটি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করুন।

(১০) নিউক্যাসল রোগের ভাইরাস—বিশোধক ওষুধাদি প্রয়োগে বিনষ্ট হয়।

(১১) একবার ব্যবহার করা থলেতে খাদ্য আনবেন না।

(১২) পোলট্রিতে ব্যবহার করার আগে সকল সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করে নিন।

(১৩) কাছাকাছি অঞ্চলে রানীক্ষেত রোগের প্রকোপ দেখা দিলে—প্রতিষেধক টিকা দানের ব্যবস্থা করুন।

## (ক) রানীক্ষেত রোগ-প্রতিষেধক (F-strain Vaccin)

নবজাত ১ দিন বয়স্ক বাচ্চাদেরও এই টিকা দেওয়া চলে। প্রতিক্রিয়া জনিত কোন বিপদ এতে নেই। তবে এই টিকার রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মাত্র ৩ মাস পর্যন্ত বজায় থাকে। অতএব এই টিকা দেওয়ার পরে অর্থাৎ বাচ্চাদের বয়স ১০ সপ্তাহ হলে পুনরায় ফ্রিজ-ড্রায়েড রানীক্ষেত টিকা দেওয়া প্রয়োজন।

F-strain Vaccine-এর একটি অ্যাম্পুল ৫ মিলি (5 ml.) জলসহ গুলে নিয়ে ২ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ২ ফোঁটা যথেষ্ট। সাধারণ কালির জন্য ব্যবহৃত ড্রপারের সাহায্যেও এই টিকা দেওয়া চলে। বাচ্চার মুখ এবং নাকের একটি ছিদ্র আঙুল দিয়ে চেপে ধরে—নাকের অপর ছিদ্রপথে এই Vaccine প্রয়োগ করতে হবে। নাকের ছিদ্রপথে এই vaccine প্রয়োগ করায়—বাচ্চারা শ্বাসগ্রহণের সময় Vaccine অভ্যন্তরে টেনে নেবে।

## (খ) রানীক্ষেত রোগ-প্রতিষেধক (Freeze-dried Vaccine)

এই Vaccine নিম্নতাপে শুষ্ক করা হয়ে থাকে। সচরাচর ২০০ মাত্রার Vaccine গুঁড়ো কিনতে পাওয়া যায়। ফ্রিজে বা ফ্লাস্কে বরফ ভর্তি করে এই Vaccine ঠাণ্ডায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। সাধারণ ঘরের তাপে এই Vaccine ১ সপ্তাহের বেশি ঠিক থাকে না।

Vaccine সলিউশান প্রস্তুতের জন্য ২০০ মাত্রার Vaccine ১০০ মিলি লিটার (100 ml.) পরিস্রুত জলে (Aqua distilled water) গুলে নিতে হবে। ২০০টি মুরগীকে ½ মিলি (0·05 ml.) লিটার মাত্রায় ইনজেক্ট করা সম্ভব হবে। সলিউশান তৈরি করার ২ ঘণ্টার মধ্যেই ইনজেকশান প্রয়োগ করতে হবে।

Vaccine সলিউশানটি সিরিঞ্জে ভরে চামড়ার নিচে (s/c inj.) অথবা পেশীর মধ্যে (intramascular) inject করতে হবে।

সিরিঞ্জের বদলে pricker সূঁচের সাহায্যেও এই Vaccine দেওয়া চলে। একটি কাঠের হ্যাণ্ডেলে দুটি পশম বোনার সূঁচের (knitting needle) এক প্রান্ত লাগিয়ে নিয়ে—অপর দুটি সরু প্রান্ত দিয়ে এই vaccine অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়।
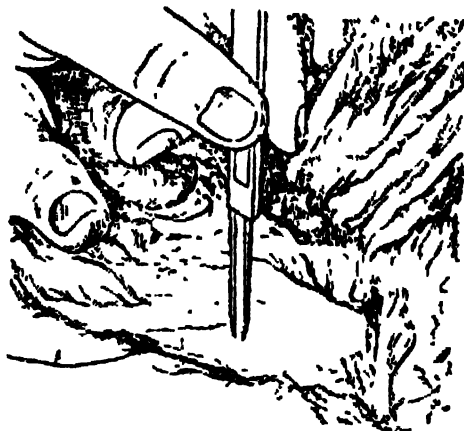
Wing-web পদ্ধতিতে pricker-এব সাহায্যে বানীক্ষেত বোগ-প্রতিষেধক vaccine দেওযা হচ্ছে।

দুটি সূঁচেব দুটি প্রান্ত vaccine-এ ডুবিয়ে নিয়ে মুরগীর ডানার জোড়ের সংলগ্ন চামড়ায় ঐ প্রান্ত দুটি বিঁধিযে দিলে vaccine দেহেব অভ্যন্তবে সঞ্চারিত হবে।

Vaccine প্রয়োগ করা হলে ৮ ঘণ্টার মধ্যেই রোগ-প্রতিষেধক শক্তি জন্মাবে।

ফার্মের প্রতিটি মুরগীকে রানীক্ষেত রোগ-প্রতিষেধক এই ইনজেকশানটি প্রয়োগ করা হলে—রোগ আক্রমণের ভয় রহিত হবে। ৭ সপ্তাহের কম বয়স্ক বাচ্চা এই Vaccine সহ্য করতে পারে না বলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প বয়স্ক বাচ্চাদের F-strain injection দেওয়া হয়ে থাকে।

## ফ্রিজ-ড্রায়েড Vaccine-এর প্রতিক্রিয়া

৭ সপ্তাহ বয়স উত্তীর্ণ হলে—যতশীঘ্র সম্ভব এই টিকা দেওয়া আবশ্যক। ঠাণ্ডা আবহাওয়াই এই টিকা দেবার পক্ষে উপযুক্ত। বেশি গরমের সময় এই টিকা দেওয়া উচিত নয়।

কখনও কখনও এই টিকা দেওয়ার ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়ে থাকে।

৩ থেকে ৬ দিনের মধ্যে মুরগীর মধ্যে ঝিমানোভাব সূচিত হয়, মুরগী খাবার খেতে চায় না।

২।১ দিন খোল খাওয়ালে অথবা Mixovit Sunshine Tablet সামান্য মাত্রায় গুঁড়ো করে ২ দিন জলের সঙ্গে খাওয়ালে প্রতিক্রিয়া থাকে না।

টিকা দেবার পর কোন কোন মুরগী অত্যন্ত খোঁড়া বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারে। শতকরা ৪ শতাংশের কম মুরগীদের মধ্যেই অনুরূপ সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কয়েকদিনের মধ্যে সেরে না গেলে ঐ ধরনের মুরগীকে অবশ্যই বাতিল করতে হবে।

তবে ১৪।১৫ দিনের মধ্যেই ঐ ধরনের খোঁড়ানো ভাব বা পক্ষাঘাতের লক্ষণাদি সচরাচর লোপ পায়।

ডিমপাড়া মুরগীকে টিকা দিলে ডিম উৎপাদন ১০% হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু ২।৩ সপ্তাহ পরেই মুরগী পুনরায় স্বাভাবিকভাবে ডিম দিতে থাকে।

## সংক্রামক করিজা (Coriza) রোগ
## (Infectious Colds, Rhinitis, Roup)

এই রোগটি শ্বাসযন্ত্রঘটিত একটি জটিল সংক্রামক রোগ বিশেষ। এই রোগকে ছোঁয়াচে সর্দিও আখ্যা দেওয়া চলে।

**কারণ ঃ** হেমোফিলাস গ্যালিনেরাম ব্যাকটেরিয়াম (Hemophilus gallınarum bacterium) নামক একপ্রকার জীবাণু থেকেই এই রোগ সূচিত হয়ে থাকে। শারীরিক দিক থেকে দুর্বল মোরগ-মুরগী বা মুরগীর বাচ্চারাই এই রোগের দ্বারা

সংক্রামক করিজা রোগাক্রান্ত একটি মুরগী

বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে। পুষ্টির অভাব, স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে থাকা এবং প্যারাসাইট কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলেও এই রোগ সূচিত হতে পারে। খাদ্য তথা জলপাত্রের কাছে অত্যধিক ভীড়, দোষযুক্ত ভূমিশয্যা, হরমোন চিকিৎসা, যথেচ্ছভাবে ওষুধের ব্যবহার এবং পরিচালন জনিত অব্যবস্থাও এই রোগের গৌণ কারণ।

**লক্ষণ ঃ** প্রথমে নাক থেকে আঠাল, ঘন, হরিদ্রাভ সাদা স্রাব নির্গত হয়। চোখগুলো জলপূর্ণ তথা দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

এই রোগের যদি যথাসময়ে চিকিৎসা না হয়—তবে স্রাবে নাক বুজে আসে, মুখ ফুলে যায়। চোখের পিচুটির মতো ক্লেদ জমতে জমতে চোখটি পরে প্রায় বুজে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষুধামান্দ্য সূচিত হয়।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

(১)

R/-
Sulfathiazole —½ kg.
(to be given with per 50 kgs. of mash)

প্রত্যেক 50 কেজি মেশ খাদ্যের সঙ্গে অর্ধ কেজি পরিমাণ সালফাথিয়াজল মিশিয়ে ৪ থেকে ৬ দিন খাওয়াতে হবে।

এবং

(২)

R/-
Sulmet. sol........30 ml.
Aqua.........4 liter
(mft. sol.)

৪ লিটার পরিমাণ পানীয় জলের সঙ্গে ৩০ মিলি লিটাব সালমেট সলিউশান মিশিয়ে ৪ থেকে ৬ দিন খাওয়াতে হবে।

অথবা

(৩)

R/-
Pulv. Hostacycline sol...... 1 gm.
Aqua....... 1 liter

১ লিটার জলের সঙ্গে হস্টাশাইক্লিন সলিউশান পাউডার ১ গ্রাম পরিমাণ গুলে নিয়ে খাওয়ালেও উপকার পাওয়া যাবে। ৫ দিন হস্টাশাইক্লিন মিশ্রিত জল খাওয়াতে হবে।

পূর্বে উল্লিখিত ওষুধে কাজ না হলে,

(৪)

R/-
Streptomycin.....50 mg.
Aqua dist... .....1ml.
(1/m inj.)

প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনযুক্ত মুরগীর পেশীর মধ্যে উল্লিখিত পরিমাণ ইনজেকশান দিলে করিজা রোগ আরোগ্য হবে। ২ দিন অন্তর ২টি ইনজেকশান দিতে হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

রোগমুক্ত হয়েও বয়স্ক মুরগীরা এই রোগজীবাণু বাচ্চাদের মধ্যে ছড়ায়—বিশেষভাবে মুরগীর বাচ্চাদের যদি বয়স্ক মুরগীদের কাছাকাছি রাখা হয়।

বিভিন্ন বয়সের মোরগ-মুরগীদের পৃথক পৃথক ঘরে রাখতে হবে।

রোগাক্রান্ত মুরগীটিকে পাল থেকে পৃথক স্থানে সরিয়ে বিক্রি করাই সুবিধাজনক।

সুস্থ বাচ্চাদের সম্পূর্ণ পৃথক স্থানে রেখে প্রতিপালন করলে—এই রোগের দ্বারা আক্রমণের ভয় থাকে না।

জটিলভাবে আক্রান্ত মুরগীটিকে অবশ্যই বাতিল গণ্য করে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্য ফার্ম থেকে কিছু বয়স্ক বা বয়স্ক মোরগ-মুরগী না কিনে ১ দিন বয়স্ক বাচ্চাদের পালন করুন।

উপযুক্ত. Ventilation -এর ব্যবস্থা, ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর করা এবং পুষ্টিকর খাদ্য (অ্যান্টিবায়োটিকস মিশ্রিত) খাওয়ানো—এই রোগের অন্যতম প্রতিষেধক-ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

## দীর্ঘকালস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ
## (Chronic Respiratory Disease—C. R. D.)

এই রোগটিকে জটিল ধরনের ফুসফুসের রোগ আখ্যা দেওয়াও চলতে পারে। এই রোগে শ্বাসযন্ত্রের বায়ু থলি (air sac) প্রধানতঃ আক্রান্ত হয় বলে এই রোগের অপর নাম Air Sac Infection। এই রোগটি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় এবং দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে। তাই এই রোগটিকে দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগও আখ্যা দেওয়া হয়।

**কারণ :** Mycoplasma gallinarum নামক এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা এই রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে।

রোগ আক্রান্ত মুরগীর সান্নিধ্য দ্বারা অথবা রোগ আক্রান্ত মুরগীর ডিম থেকে জাত হওয়ার ফলেও রোগ সংক্রামিত হতে পারে। রোগমুক্ত হয়েও এই রোগজীবাণু মুরগীরা বহন করতে পারে। ফলে সুস্থ মুরগীর দেহে সংক্রমণ ঘটতে পারে।

**লক্ষণ :** এই রোগে মুরগীর হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়ে ও গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হয়। অনেকাংশে রানীক্ষেত রোগের লক্ষণাদির মতো—কিন্তু রানীক্ষেত রোগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত লক্ষণাদির সঙ্গে উদরাময় ও পক্ষাঘাত সূচিত হয়ে থাকে বলে—এই রোগটিকে রানীক্ষেত রোগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয় না।

এই রোগে হাঁচি, কাশি এবং নাক দিয়ে জল পড়া ইত্যাদি লক্ষণ ক্রমশ স্থায়ী হতে পারে এবং দীর্ঘকাল ধরে বর্তমান থাকতে পারে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

(১)

R/-
Terramycin P. F. with Antigerm 77 ....1sp
*or*
Terramycin Liq.— 1sp.
(to be given with 4 liters of drinking water)

উল্লিখিত যে-কোন একটি ওষুধের ১ চামচ ৪ লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। ৪।৫ দিন খাওয়ালেই কিছুটা উপকার পাওয়া যাবে।

প্রতি টন খাদ্যের সঙ্গে ২০০ গ্রাম পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিকস মিশ্রিত করে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যেতে পাবে। অ্যান্টিবায়োটিকস মিশ্রিত মেশ-খাদ্য অন্ততঃ ১ সপ্তাহকাল খাওয়ানো আবশ্যক।

(২)

R/-
Streptomycin—200 mg.
Aqua dist.........1 c.c.
(1/m inj.)

পেশীর মধ্যে inject করতে হবে ২টি injection। প্রথম injectionটি দেওয়ার ৪ দিন পরে পুনরায় আর একটি injection দিতে হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

১। বাচ্চাদের বয়স্ক মোরগ বা মুরগী থেকে আলাদা রাখুন। কারণ রোগমুক্ত হয়েও বয়স্ক মুরগীগুলো এই রোগজীবাণু বাচ্চাদের দেহে ছড়াতে পারে।

২। ককসিডিওসিস্ রোগ আক্রান্ত বা প্যারাসাইট দ্বারা আক্রান্ত পাখিদের কোন প্রতিষেধক টিকা দেবেন না। কারণ ঐ অবস্থায় টিকা দিলে C. R. D. রোগ হতে পারে।

৩। রোগযুক্ত মুরগীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মে ঢুকতে দেবেন না।

৪। বাচ্চাদের জন্য পরিষ্কার এবং ভূমিশয্যার (clean, deep litter) ব্যবস্থা করুন।

৫। মিশ্র লিটার (compost) থেকে উত্থিত অ্যামোনিয়া গ্যাস—বাচ্চাদের শ্বাসনালীতে বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। একাধিক ভূমিশয্যার উপাদানকে মিশ্র লিটার বলা হয়।

৬। পোলট্রি ফার্মে C. R. D. রোগের প্রকোপ হলে সুস্থ সকল বয়সের মোরগ-মুরগীদের নিম্নলিখিত জীবাণুনাশক ওষুধ খাওয়ান—

R/-
Hostacycline......0·5 gm.
Aqua...... 1 liter
(mft. sol.)

প্রতি লিটার পানীয় জলের সঙ্গে উল্লিখিত পরিমাণ হস্টাশাইক্লিন পাউডার মিশিয়ে খাওয়ান। ৩ দিন খাওয়াতে হবে।

## মুরগীর পক্ষাঘাত

## (Fowl Paralysis or Avian Leukosis Complex—A. L. C.)

পক্ষাঘাত একটি অত্যন্ত জটীল ধরনের রোগ। সচরাচর মুরগীদের পায়ে পক্ষাঘাত হয়—তবে দেহের অন্যান্য অংশেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারে; যথা ডানা, চোখ, ঘাড় শরীরের বড় হাড় এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারে। পায়ের পক্ষাঘাতই বিশেষ হয়ে থাকে। এই রোগকে মারেকের (Marek's disease) রোগও আখ্যা দেওয়া হয়।

**কারণ ঃ** এই রোগের সঠিক কারণ অদ্যাবধি সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। এক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করায়—এই রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে বলে অনেকে অনুমান করে থাকেন। রোগগ্রস্ত মুরগীর ডিম থেকে জাত বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগ সংক্রমিত হতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** প্রথম পর্যায়ে একটু একটু খুঁড়িয়ে চলা, ডানাগুলো সামান্য ঝুলে পড়া, অথবা ঘাড় কোন বিশেষ এক দিকে বেঁকিয়ে থাকা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে—চলার ক্ষমতা একেবারেই থাকে না, ডানাগুলো বিশেষ ভাবে ঝুলে পড়ে বা ঘাড়টি হেলে পড়ে।
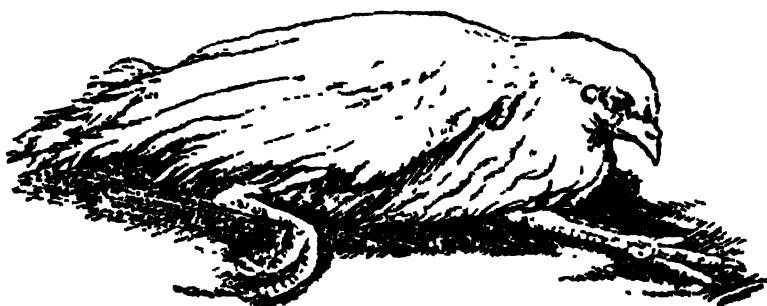
পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত একটি মুরগী। A L.C রোগের সাধারণ লক্ষণাদি এক্ষেত্রে বিশেষ প্রকট

চোখের পক্ষাঘাত হলে চোখের তারার রং ফিকে হয়ে যায় বা ধূসর হয় এবং পরিবর্তন সূচিত হয়।

পায়ে, ডানায় এবং শরীরের অন্যান্য অংশেও পক্ষাঘাত হতে পারে।

ঝুঁটি বিবর্ণ হয়, ক্ষুধা হ্রাস পায়, লীভার ও প্লীহার বৃদ্ধি ঘটে। যে সকল মুরগীর হাড়ের বা পায়ের ধরন স্থূল—সেক্ষেত্রে স্থূলত্ব আরও বেড়ে যায়।

সচরাচর ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ বয়স্ক তরুণ মুরগীগুলো এই রোগের দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

এই ধরনের রোগের ফলে তরুণ ও বয়স্ক মোরগ ও মুরগীগুলো বেশি মারা যায়।

সকল ক্ষেত্রে পক্ষাঘাত নাও হতে পারে। এই রোগটিকে সেই কারণে লিউকোসিস রোগ আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত।
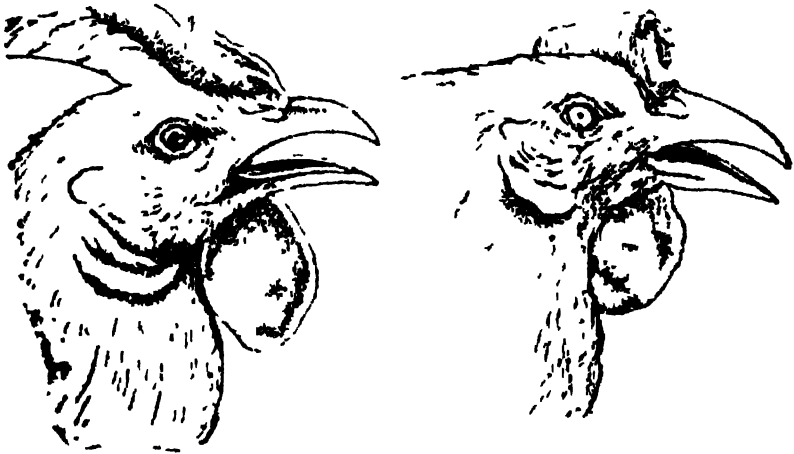
ডানদিকেব মুবগীটিব চোখ লক্ষ্য কবন।
চোখেব স্বাভাবিক ॥।৲ এক্ষেত্রে ধূসব হযেছে

লিউকোসিস রোগের দুটি বিভিন্ন পর্যায় বিদ্যমান, প্রকৃতপক্ষে রোগটিকে দুটি বিভিন্ন ধরনের রোগ হিসাবে আখ্যা দেওয়াই উচিত।

(১) **লিউকোসিস**—মানবদেহের রক্তে শ্বেতকণিকার ক্যানসারের সঙ্গে এই রোগের বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। দেহমধ্যস্থ যে যন্ত্রটি আক্রান্ত হয়—সেই যন্ত্রটি আকারে বৃদ্ধি পায়।

**(২) মারেকের রোগ** *(Marke'৲ disease)* —*এই রোগে স্নায়ু এবং* কখনও কখনও চোখ আক্রান্ত হয়ে থাকে। আক্রান্ত নার্ভটি মোটা হয়। সচরাচর ৩ থেকে ৫ মাস বয়স্ক তরুণ মোরগ বা মুরগীদের মধ্যে এই রোগ সূচিত হয়।

*চোখেব নার্ভে রোগ সূচিত হলে চোখ ঘোলাটে সাদা হয়,* আক্রান্ত মুরগীটি দৃষ্টি শক্তিও হারিয়ে ফেলতে পারে।

**মূল লক্ষণ :** মারেকের রোগে নার্ভ আক্রান্ত হলে একটি বা দুটি পায়ে এবং ডানায় পক্ষাঘাত হয়। *পক্ষাঘাতগ্রস্ত মুরগীব শয়নের ভঙ্গি দেখেই পক্ষাঘাত রোগের*

লক্ষণ ধরা যায়। আক্রান্ত মুরগী সামনের দিকে পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় মাটিতে পা থাকলে মুরগীর পায়ের থাবা (claw) স্বভাবতই প্রসারিত হয়। কিন্তু পক্ষাঘাত হলে থাবা (claw) প্রসারিত হয় না।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

এই রোগের কোন ওষুধ নেই। আক্রান্ত মুরগীকে পৃথক স্থানে রাখতে হবে এবং বাতিল গণ্য করে বেচে ফেলতে হবে। প্রজননের জন্য ব্যবহৃত মোরগ বা মুরগীদের A.L.C. রোগ প্রতিরোধ যুক্ত (resistent) বংশধারার কিনা তা দেখতে হবে। খাদ্যের সঙ্গে অরোমাইসীন (প্রতি কিলোগ্রাম খাদ্যে—১ গ্রাম) ৪।৫ দিন খাওয়াবার পর, প্রতি বয়স্ক মুরগীকে Mixovit Sunshine Tablet একটি করে এবং বাচ্চাদের সিকি পরিমাণ খাওয়ালে উপকার পাওয়া যাবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

বাচ্চা মুরগীদের বিশ্বস্ত বাচ্চা উৎপাদনকারী ফার্ম থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বয়স্ক মুরগীদের থেকে পৃথক স্থানে পালন করতে হবে। সন্দেহজনক মোরগ বা মুরগীকে দল থেকে বাতিল করতে হবে।

বাচ্চাদের জন্য এবং বয়স্ক মুরগীদের দেখাশোনার জন্য পৃথক কাজের লোক রাখতে হবে (caretaker)।

সু-নির্বচিত মোরগ ও মুরগীকে প্রজননের জন্য ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয় ডিমপাড়া বছরে উত্তীর্ণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন মুরগীদের প্রজননের কাজে ব্যবহার করা উত্তম পন্থা।

## ল্যারিংগোট্রাকিয়াইটিস
## (Laryngotracheitis – Chicken Influenza, Infectious Tracheitis)

এই রোগটি অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের ভাইরাস ঘটিত সংক্রামক রোগ। এই রোগজীবাণু সুস্থ মোরগ-মুরগীর স্বরযন্ত্র (larynx) এবং শ্বাসনালী আক্রমণ করে। ২ থেকে ১০ মাস বয়স্ক বাচ্চাদের মধ্যে রোগটির প্রকোপ সাংঘাতিক ভাবে বৃদ্ধি পায়।

**কারণ ঃ** একপ্রকার filterable virus এর দ্বারা এই রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। এই রোগের দ্বারা স্বাভাবিকভাবে আক্রান্ত মোরগ বা মুরগী—রোগমুক্ত হবার পরেও এই রোগের জীবাণু বহন করে থাকে। কিন্তু যে সকল মোরগ বা মুরগীকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়—তারা আর এই রোগজীবাণু বহন করে না। এগ-ক্রেট, জুতো, বস্ত্রাদি, ব্যবহৃত feed bags এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জামের মাধ্যমে এই রোগ এক পোলট্রি ফার্ম থেকে আর এক পোলট্রি ফার্মে ছড়িয়ে পড়ে।

**লক্ষণ ঃ** রোগটি সংক্রমিত হওয়ার পর খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। আকস্মিক আক্রমণ এবং দ্রুত প্রসার লাভের ফলে—কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগ নির্ণীত হওয়ার আগেই আক্রান্ত মুরগীটি মারা যেতে পারে।

**প্রধান লক্ষণ ঃ** হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট। শ্বাসকষ্ট মাঝে মাঝে এত বেশি হয় যে—মাথা তুলে ঘাড় লম্বা কবতে হয়—মুখ খুলে শ্বাস টানতে হয়। আবার বুকের
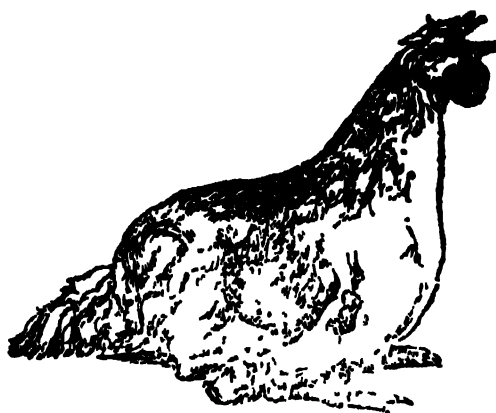
শ্বাস টানাব সময

শ্বাস ত্যাগেব সময

ল্যাবিংগোট্রাকিযাইটিস বোগেব জটিল পর্যায়ে শ্বাসকষ্ট

ওপব মাথা বেখে অতি কষ্টে শ্বাস ত্যাগ কবতে হয়। চোখ এবং নাক থেকে স্রাব নির্গত হয। ভীষণভাবে কাশতে পাবে—পরিশেষে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে পাবে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

এই বোগের কোন ওষুধ নেই। খাদ্য বা জলের সঙ্গে কোন ওষুধ খাইয়েও তেমন ফল পাওয়া সম্ভব নয়। তবে খাদ্যেব সঙ্গে সামান্য পরিমাণ অ্যান্টিবাযোটিক্‌স খাওয়ানো চলতে পারে। এবং মৃত-রোগগ্রস্ত মুবগীদের দেহ সত্বর আগুনে পুড়িয়ে অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

সত্বর বোগ-প্রতিষেধক টিকা প্রদানই এই বোগ প্রতিরোধেব অন্যতম উপায়। ৬ সপ্তাহ বয়স উত্তীর্ণ হলে—যে-কোন সময়ে এই রোগ-প্রতিষেধক টিকা দেওয়া চলতে পারে।

৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে প্রতিষেধক শক্তি জাগবে। Vent-এর brush-এর মাধ্যমে এই টিকা প্রয়োগ করতে হবে। টিকা প্রদানের ৪ থেকে ৫ দিনের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখতে হবে টিকা successful হয়েছে কিনা। Vent-এর ঝিল্লী বিশেষ লাল হয়ে উঠলে অথবা Vent থেকে চটচটে স্রাব নির্গত হলে বুঝতে হবে যে—টিকা successful হয়েছে।

## মুরগীর বসন্ত রোগ
## (Fowl Pox)

(Avian Diptheria, Canker, Sore Head)

এটি একটি অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। আমাদের দেশের মুরগীদের বসন্ত রোগ প্রায়ই হয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যেই এই রোগ বেশি হয়। বয়স্ক মুরগীদের ক্ষেত্রে বসন্ত তেমন মারাত্মক নয়—কিন্তু বাচ্চাদের এই রোগ হলে—প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাচ্চা মারা যেতে পারে।

**কারণ ঃ** এক প্রকার filterable virus-এর দ্বারাই এই রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। রোগগ্রস্ত পাখির সান্নিধ্যে থাকলে এই রোগ সুস্থ পাখির দেহে সংক্রমিত হতে পারে।
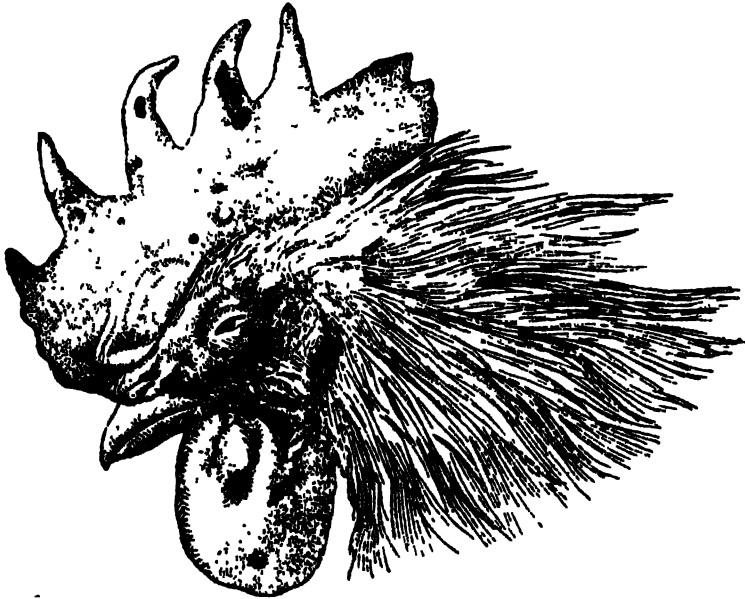
বসন্ত রোগাক্রান্ত একটি মুরগী
ঝুঁটি, গলার ফুল এবং মুখের পালক বিহীন অংশ লক্ষ্য করুন

মশা এবং মাছিরাও এই রোগজীবাণু বহন করে রুগ্ন পাখির দেহ থেকে সুস্থ পাখির দেহে সংক্রমণ ঘটায়। সুস্থ মুরগীর মুখে বা মাথায় কোন কাটা জায়গা বা ক্ষত থাকলে

এই রোগ সহজেই সংক্রমিত হতে পারে। স্যাঁতস্যাঁতে ঘর, প্যারাসাইটের প্রাদুর্ভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ—এই রোগ প্রসারের পক্ষে সুবিধাজনক।

**লক্ষণ ঃ** প্রথম পর্যায়ে ঝুঁটিতে, গলার ফুলে, চোখের পাতার কোণে এবং দেহের পালকহীন স্থানে—হলদে গুটি (blisters) বেরোয়। গুরুতর আক্রমণ ঘটলে—পায়ের পাতা, জিহ্বায়, মুখে এবং খাদ্যথলিতে (crop) আক্রান্ত হয়। মুখের ঝিল্লীতে এবং খাদ্যনালীর উপরে সাদা রংয়ের ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং শ্বাসকষ্ট হয়।

Pox দু'রকমের হয়—(১) Dry pox (২) Wet pox

Dry pox-এর প্রকাশ শুধুমাত্র দেহের বাইবেকার চামড়াতেই প্রকটিত হয়। যদি এই সঙ্গে অন্য কোন উপসর্গ না থাকে—তবে ২ সপ্তাহের মধ্যেই রোগ নিরাময় হয়, কিছুসংখ্যক মারা যায়। কিন্তু ডিমপাড়া মুবগীর ক্ষেত্রে ডিম উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

Wet pox-এর দ্বারা মুখের অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লী আক্রান্ত হয, স্বরযন্ত্রের ওপরে আঠালো membrane (ঝিল্লীর) -এর বিকাশ ঘটে। ফলে শ্বাসকষ্ট হয এবং দমবন্ধ হয়ে মারা যাবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। Wet pox- এর দ্বারা আক্রান্ত মুরগীদের প্রায শতকরা পঞ্চাশভাগ মাবা যেতে পারে।

Dry pox তেমন মারাত্মক নয়। ২ সপ্তাহের মধ্যেই গুটি শুকিয়ে যায়—ওপরে বাদামী বা কালো মামড়ি পড়ে। গুটিগুলো প্রথম অবস্থায় আকারে ছোট বা বড় হয়। শক্ত আঁচিলের মতো দৃষ্ট হয।

চোখে বসন্তের প্রকোপ ঘটলে চোখ ফুলে ওঠে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

এই রোগের কোন ওষুধ নেই। তবে নিম্নলিখিত ওষুধ প্রয়োগে কিছু উপকার পাওয়া যেতে পারে।

(১)

R/-
Hostacycline........20gm.
(to be given with 10 liters of drinking water)

১০ লিটার পানীয় জলে ২০ গ্রাম হস্টাশাইক্লীন মিশিয়ে খাওয়ালে কিছুটা উপকার পাওয়া যাবে। রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত ওষুধ মিশ্রিত জল খাওয়ান উচিত।

(২)

গুটিতে লাগাবার ওষুধঃ

R/-
Dettol................ 10%
Aqua dist.......... 70%
Tomato juice....... 20%
(Mft. Ointment for external use only)

ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে উল্লিখিত solution-টি গুটি না শুকনো পর্যন্ত লাগাতে হবে।

চোখ আক্রান্ত হলে—

Boric acid.............0·5 gm.
Aqua dist. ................30 ml.
Mft. sol. for eye-washing)

উল্লিখিত পরিমাণ পরিস্রুত জলের সঙ্গে উল্লিখিত পরিমাণ বোরিক এসিড মিশিয়ে ৩।৪ দিন চোখ ধোওয়াতে হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করাই এই রোগ প্রতিষেধকের উৎকৃষ্ট পন্থা। ২ থেকে ৪ মাস বয়স্ক বাচ্চাদের Fowl pox vaccine প্রয়োগ করতে হবে।

অপেক্ষাকৃত স্বল্প বয়স্ক বাচ্চাদের mild type pigeon pox vaccine প্রয়োগ বিধেয়। ফ্রিজ ড্রায়েড ফাউল পক্স ভ্যাক্সিন (Freeze-dried Fowl pox vaccine) গুঁড়ো অবস্থায় পাওয়া যায়। ঐ গুঁড়োকে তৎসঙ্গে সরবরাহকৃত দ্রবণের (50% glycerine saline solution)-এর সাহায্যে প্রথমে গুলে নিতে হবে। গুলে নেওয়ার পরে ঐ এক ফাইল vaccine—এ প্রায় ১০০ টি মুরগীকে দেওয়া সম্ভব হবে। এই vaccine থার্মো-ফ্লাস্কে বরফের মধ্যে রাখলে ২ সপ্তাহ ঠিক থাকবে। ফার্মের সকল মুরগীকেই (৬ থেকে ১২ সপ্তাহ বয়ঃক্রম কালের মধ্যে) বসন্ত রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়াতে হবে। তৎপরে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালের পূর্বে একবার করে Revaccination করা সঙ্গত। খুব গরমের সময় অবশ্য এই টিকা দেওয়া উচিত হবে না—যদি এক দলের সকল মুরগীকে vaccine না দেওয়া হয়—তবে যে মুরগীটিকে vaccine দেওয়া হলো সেই মুরগীটিকে পৃথক স্থানে রেখে পরীক্ষা করা কর্তব্য—টিকা প্রয়োগজনিত প্রতিক্রিয়া সূচিত হলে—বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক।

## টিকা প্রয়োগ পদ্ধতি

**(১) উয়িং ওয়েব স্টিক মেথড** (Wing Web Stick Method) :

একটি বা দুটি সূঁচের আগা Vaccine-এ ডুবিয়ে ডানার অভ্যন্তর ভাগের নিম্নাংশে এই পদ্ধতিতে vaccine প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে টিকা দানের এই পদ্ধতিকে Wing Web Stick Method আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

**(২) ফেদার ফলিকল মেথড** (Feather Follicle Method) :

সচরাচর এই পদ্ধতিতে Fowl Pox Vaccine মুরগীর উরুর চামড়ার পালক ঘষে লাগানো হয়ে থাকে।

উরুর সামনের অংশ থেকে ৩।৪টি পালক তুলে—রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট ব্রাশের সাহায্যে ঘষে রক্ত বের করে ঐ স্থানটি বিশোধিত করার পর তুলো বা তুলি দিয়ে ঐ স্থানে vaccine লাগাতে হয়।

টিকা প্রয়োগ সফল (Successful) হলে ১ সপ্তাহের মধ্যেই টিকা প্রয়োগ স্থলে পূঁয সঞ্চিত হবে এবং ২ সপ্তাহ যাবৎ জায়গাটি ঐ ভাবেই থাকবে।

# মুরগীর কলেরা
# (Fowl Cholera)

কলেরা রোগটি একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এই রোগ আকস্মিকভাবে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করায়, পোলট্রি ফার্মের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।

**কারণ :** Pasteurella avicida নামক এক প্রকার ব্যাক্টেরিয়ার কারণেই কলেরা রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। রোগগ্রস্ত মুরগীর মল-মূত্র তথা নাসাস্রাবের দ্বারা খাদ্য ও পানীয় জল দূষিত হওয়ার ফলেই এই রোগ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ঘিঞ্জি অবস্থায় মুরগীদের রাখলে, sanitation ব্যবস্থা খারাপ হলে, ঘরটি অত্যধিক স্যাঁতস্যাঁতে হলে—কলেরা দ্রুত প্রসার লাভ করে। যে কলেরা জীবাণু দ্বারা মানুষের কলেরা হয়—মুরগী ও হাঁসের কলেরা সেই জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয় না। Pasteurella avicida নামক এই জীবাণু মুরগী ও হাঁসের রক্তে বংশবৃদ্ধি করে এবং তার ফলে হাঁস ও মুরগীর রক্তে বিষ ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। মুরগী, পাতিহাঁস, রাজহাঁস প্রভৃতি এই একই প্রকার জীবাণুর কারণে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়।

**লক্ষণ :** কলেরা রোগ যদি প্রবলাকারে (acute form) প্রকাশ পায়—তবে রোগাক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যবান মোরগ-মুরগীগুলোও হঠাৎ মারা যেতে পারে। এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা ৯০ শতাংশও হতে পারে। প্রবলভাবে কলেরা রোগের আক্রমণ ঘটলে—মৃত্যুর পূর্বে কোন লক্ষণ নাও সূচিত হতে পারে।

## সাধারণ কলেরার লক্ষণ

রোগাক্রান্ত মোরগ-মুরগী দুর্বল হয়ে পড়ে। ঝিমুনিভাব প্রকাশ পায় এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পালক সমূহ কুঞ্চিত পরিলক্ষিত হয়, ক্ষুধা হ্রাস পায় এবং জ্বর সূচিত হয়। মাথা, ঝুঁটি এবং গলার ফুলের রং ফ্যাকাসে হয় অথবা কালো বা বেগুনে হয়। প্রথমাবস্থায় জলের মতো হলদে পাতলা বাহ্য হয়—ক্রমে সেই বাহ্যের রং বাদামী অথবা সবুজ হয়। শ্বাসনালীতে শ্লেষ্মা জমার ফলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং মুখ ও নাক দিয়ে ফেনা বেরোয়। ঐ অবস্থায় মুরগী নড়তে-চড়তে চায় না। রোগের বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ হবার পূর্বে—রোগ-জীবাণু ১।২ সপ্তাহ মোরগ-মুরগীর দেহে বিদ্যমান থাকতে পারে।

দীর্ঘকাল স্থায়ী কলেরা রোগের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার অপেক্ষাকৃত কম ঘটে—তবে আক্রান্ত মোরগ-মুরগীরা সচরাচর শ্বাসকষ্টে ভোগে, হাঁপাতে থাকে, মাথা ও কানের লতি ফুলে যায়।

গ্রীষ্মকালেই সচরাচর কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

(১)

কলেরা প্রবলাকারে (acute) প্রকাশ পেলে—

R/-
Sulfamethazine..................10 ml.
Aqua dist......................... 1 liter
(Mft. sol.)

১ লিটার পরিমাণ জলে ১০ মিলি লিটার সালফামেথাজিন মিশ্রিত করে ৩ দিন খাওয়াতে হবে। ৩ দিন খাওয়াবার পর ২ দিন ওষুধ প্রয়োগ বন্ধ করে পুনরায় ৩ দিন খাওয়াতে হবে। উপসর্গাদি আর না থাকলে ওষুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখতে হবে। ওষুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখার পর যদি পুনরায় উপসর্গাদি সূচিত হয়—তবে নিচের ২নং ওষুধটি খাওয়াতে হবে।

(২)

R/-
Terramycine Liquid ..............2 ml.
Aqua dist...............................1 liter
(Mft. sol.)

১ লিটার জলে ১ মিলি লিটার পরিমাণ টেরামাইসীন লিকুইড (ফাইজার কোং) মিশ্রিত করে ৩ দিন খাওয়ালে সকল ধরনের কলেরার ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যাবে।

অথবা

(৩)

সকল রকম কলেরার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ওষুধটি খাওয়ালেও বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।

R/-
Sulfaquinoxaline sol. (11·7%) ...$\frac{1}{2}$ oz.
Aqua dist. .........5 liters
(Mft. sol.)

এই সলিউশানটি ২ দিন খাওয়াবার পর ২ দিন বন্ধ রেখে—পুনরায় ২ দিন খাওয়াতে হবে।

অথবা

(৪)

R/-
Pulv. Sulfaquinoxaline
(to be given at 0·05% in the mash)

উল্লিখিত ওষুধটি মেশ খাদ্যের ০·০৫ শতাংশ পরিমাণ ৩ দিন খাইয়ে ২ দিন বন্ধ রেখে পুনরায় ৩ দিন খাওয়ানো আবশ্যক।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

(১) কলেরা প্রতিষেধকের ক্ষেত্রে sanitation ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন।

(২) ডিমপাড়া মুরগী replace করার জন্য—ফার্মে কোন নতুন পূর্ণবয়স্ক মুরগী না আনাই শ্রেয়। ১ দিন বয়স্ক বাচ্চা মুরগীদেরই লালন পালন করে বড় করে তুলতে হবে।

(৩) নতুন বাচ্চা মোরগ-মুরগীকে ফার্মের কোন ঘরে ঢোকাবার পূর্বে—ঐ ঘরটি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করা আবশ্যক। দেওয়াল, roosts, nests, খাদ্য, পানীয়পাত্রাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি—উষ্ণ জলের সঙ্গে লাইমিশ্রিত করে বিশোধন করা আবশ্যক।

(৪) বাচ্চা মুরগীর বা তরুণ মুরগীর ঘরটি কখনই নিচু এবং স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে তৈরি করা উচিত হবে না।

(৫) রোগাক্রান্ত সকল মুরগীকে সঙ্গে সঙ্গে পৃথকস্থানে সরাতে হবে এবং ঘরটি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করতে হবে।
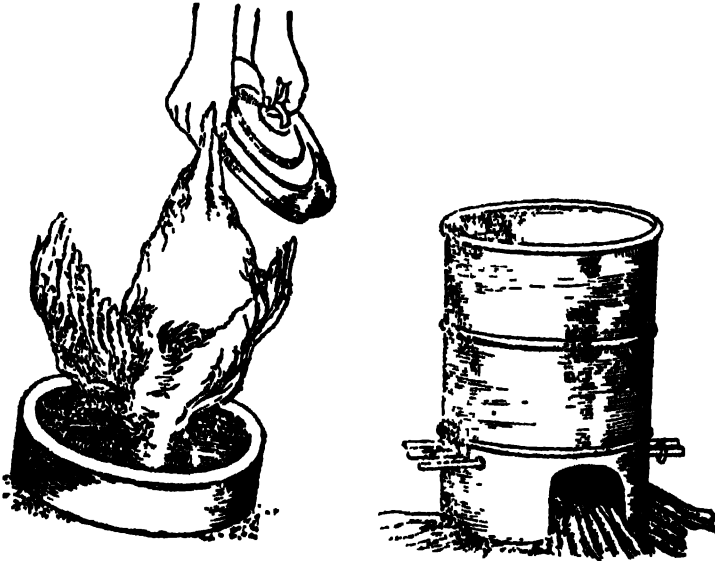
কলেবা রোগাক্রান্ত মৃত মুবগীকে এভাবে পুঁতে ফেলুন
অথবা আগুনে পুড়িয়ে দিন

দলের অনাক্রান্ত মুরগীদের নিম্নলিখিত ওষুধটি খাওয়াতে হবে।

R/-
Sulfadimidine sol. 16% .......10 ml.
Aqua dist. water ..................1 liter
(mft. sol.)

উপরে বর্ণিত solution টি দলের সকল অনাক্রান্ত মুরগীকে ২ দিন খাইয়ে ৩ দিন বন্ধ রাখার পর পুনরায় ২ দিন খাওয়াতে হবে।

(৬) রোগাক্রান্ত মৃত সকল মুরগীকে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে (disposal pit-এর মাধ্যমে) হবে। অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এবং ঘরটি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করতে হবে।

(৭) কলেরা প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয় বটে—তবে টিকাজনিত প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বল্পদিনের জন্য মাত্র বজায় থাকে।

তবে ফার্মে কলেরা রোগসূচিত ফার্মের সকল মুরগীকে Fowl Cholera Vaccine দেওয়া চলতে পারে।

R/-
Fowl Cholera Vaccine— 1 ml.
(s/c inj.)

চামড়ার নিচে উল্লিখিত injection-টি ১ বার মাত্র প্রদেয়।

## মুরগীর যক্ষ্মা
## (Tuberculosis)

এটি একটি জটিল ধরনের সংক্রামক রোগ। গৃহপালিত হাঁস-মুরগী জাতীয় সকল পাখি এবং বনের পাখিরাও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে মানুষের যক্ষ্মা রোগের জীবাণু থেকে মুরগী ইত্যাদির যক্ষ্মা রোগের জীবাণু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

**কারণ ঃ** Mycobacterium tuberculosis avian নামক একপ্রকার ব্যাক্টেরিয়ার কারণেই যক্ষ্মা রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। ডিমপাড়া মুরগীদের replace করার জন্য পোলট্রি ফার্মে যদি পূর্ণবয়স্ক মুরগী আনা হয়—তবে সেই সকল পূর্ণ বয়স্ক মুরগীদের মাধ্যমে ফার্মে যক্ষ্মা রোগ ছড়াতে পারে।

ইঁদুর এবং বুনো পাখিদের মাধ্যমেও—যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে।

যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত পাখির মৃতদেহ থেকেও যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে। ফার্মে যদি যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত মুরগী থাকে বা আনা হয়—তবে সেই যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত মুরগীর মল-মূত্রের (dropping) মাধ্যমে পর্যাপ্ত সংখ্যক যক্ষ্মা রোগের নিষ্ক্রিয় bacilli নির্গত হয়ে থাকে, ফলে ঐ ফার্মের বাচ্চা মুরগী এবং তরুণ মুরগীরা যক্ষ্মা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

শূকরদের মাধ্যমেও পোলট্রি ফার্মের মুরগীদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে। অতএব পোলট্রি ফার্মের মুরগীদের শূকরদের সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখা আবশ্যক।

**লক্ষণ ঃ** প্রধান লক্ষণ হলো যক্ষ্মারোগগ্রস্ত মোরগ বা মুরগীর দৈহিক ওজন হ্রাস পাবে। চোখ দুটি উজ্জ্বল থাকলেও যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত মুরগীর ঝুঁটি ও গলার ফুলের রং ফ্যাকাসে হবে। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত কিছু সংখ্যক মোরগ বা মুরগীর মধ্যে খঞ্জভাবও (lameness) সূচিত হতে পারে এবং গ্রন্থিসমূহ (joints) ফুলে যেতে পারে। বুকের উপর হাত দিয়ে পরখ করে দেখলে স্বল্প মাংস বা মাংসহীনভাব অনুভূত

হবে। মাঝে মাঝে সবুজ বা হলদে রঙের পাতলা বাহ্য হতে পারে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ক্ষুধা স্বাভাবিকই থাকতে পারে।

যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত মুরগীর মৃতদেহ কাটলে—লিভার, প্লীহা (spleen), কিডনী, ডিম্বাশয়, গ্রন্থিসমূহে এবং অন্ত্র মধ্যে হলদে বর্ণের শক্ত ছোট ছোট গুটি পরিলক্ষিত হবে।

যে-কোন বয়সের মোরগ বা মুরগী যক্ষ্মা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, তবে যক্ষ্মা রোগের জীবাণুসমূহকে দেহের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক শক্তির সঙ্গে লড়াই চালিয়ে টিকে থাকতে হয়। তাই ১ বৎসর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের বাহ্যিক লক্ষণাদি প্রকাশ নাও পেতে পারে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

যক্ষ্মা রোগের কোন ওষুধ নেই। সন্দেহজনক মুরগীকে মেরে ফেলা উচিত। টিউবারকুলিন টেস্ট (Tuberculin test)-এর মাধ্যমে নিরূপণ করা সম্ভব—মোরগ বা মুরগীটি যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত কিনা।

(বাঁ-দিক)
সন্দেহজনক মুরগীর গলার ফুলে testing fluid inject করা হচ্ছে
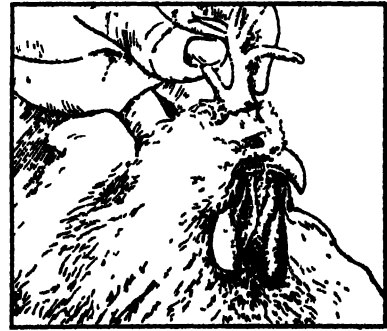
(ডান দিক)
Inject করার পর গলার ফুলটা ফুলে উঠেছে

১ ফোঁটা টিউবারকুলিন জীবন্ত মুরগীর গলার ফুলে inject করলে—৪৮ ঘণ্টা পরে যদি ঐ জায়গাটি ফুলে উঠে—তবে বুঝতে হবে যে মুরগীটি যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত।

পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত রোগগ্রস্ত মুরগীকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে ফেলতে হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

যেহেতু যক্ষ্মা রোগের জীবাণু দেহের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হতে থাকে, সেই কারণে ১৮ মাস বয়স্ক বা তার কম বয়স্ক মোরগ বা মুরগীগুলো সচরাচর রোগজীবাণু বহন করে না। যদি ডিমপাড়া বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর—সকল ডিমপাড়া মুরগীকে বেচে ফেলা হয়—তবে তরুণ বা বয়স্ক মোরগ-মুরগীদের মধ্যে এই রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পায়। স্বল্প বয়স্ক এবং তরুণ মুরগীদের স্বাস্থ্যকর এবং উত্তম sanitation ব্যবস্থাযুক্ত পরিবেশের মধ্যে প্রবর্ধন করলে—দলের মুরগীদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ প্রসারের সম্ভাবনা অনেকাংশে লোপ পায়। প্রথম ডিমপাড়া বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর—বয়স্ক মুরগীদের অন্যত্র সরিয়ে ফেলে বা বিক্রি করার পর (disposed of) নতুন মুরগীদের ঐ ঘরে ঢোকাবার পূর্বে ডিমপাড়া ঘরটি সম্পূর্ণ বিশোধন করা আবশ্যক। পূর্বতন বয়স্ক মুরগীদের বিচরণ ক্ষেত্র (runways) ১ বছরের মধ্যে ব্যবহার করা উচিত হবে না। স্যাঁতস্যাঁতে, অন্ধকার এবং আর্দ্রস্থানে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ২ বছরকাল জীবিত থাকতে পারে।

যক্ষ্মা রোগ নিরোধের জন্য উত্তম sanitation ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। ফার্মের সকল জায়গায় মুরগীদের বিচরণ করতে দেওয়া সঙ্গত হবে না। তাদের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে (ঘরে বা ঘেরা জায়গায়) আটক রাখা সঙ্গত। বিশেষ করে শূয়রদের কাছে যেতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ শূয়রদের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগ মুরগীদের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে।

## ব্লু-কম্ব্ রোগ

### (Blue Comb Disease, Pullet Disease, Avian Monocytosis, Mud Fever, Entero-Nephritis, Non-specific Enteritis)

এই রোগে সচরাচর ডিম দেওয়া শুরু করেছে এরূপ মুরগী আক্রান্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ডিম দেওয়ার প্রথম পর্যায়েই (primary stages of egg production) সচরাচর এই রোগ সূচিত হয়ে থাকে। ৪ থেকে ৫ সপ্তাহ বয়স্ক বাচ্চা মুরগীদের মধ্যেও এই রোগ সূচিত হতে পারে। তবে ডিম পাড়ার প্রথম পর্যায়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রোগ সূচিত হয় বলে এই রোগকে pullet disease আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। আরো অনেক নামেও এই রোগটিকে চিহ্নিত করা হয়।

**কারণ ঃ** যদিও এই রোগের সঠিক কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নি, তবুও এই রোগটি ভাইরাস ঘটিত রোগ হিসাবেই অনুমান করা হয়ে থাকে।

**লক্ষণ ঃ** সচরাচর গ্রীষ্মকালের শেষে এই রোগ সূচিত হয়ে থাকে। পুষ্ট এবং স্বাস্থ্যবতী মুরগী এই রোগের আক্রমণের ফলে আকস্মিকভাবে কাবু হয়ে পড়ে। ক্ষুধা হ্রাস পায়, পিপাসা বৃদ্ধি হয়। সবুজ বর্ণের পাতলা বাহ্য বার বার হতে থাকে।

ঝুঁটিসহ মাথাটি কালচে-লাল (dark-red) অথবা নীলবর্ণ ধারণ করে। ডিম উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ওজন হ্রাস পায়। একসঙ্গে দলের শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ মুরগী এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মৃত্যুহারের হেরফের ঘটে, তবে গড়ে শতকরা ৫টি মুরগী এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ মুরগীও মারা পড়তে পারে। ১ থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে রোগের প্রকোপ নিবারিত হয়, কিন্তু স্বাভাবিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে আরও বেশিদিন সময় লাগতে পারে।

**মূল লক্ষণ ঃ** রোগগ্রস্ত মুরগীর পা কাঁপতে পারে, গাত্রতাপ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং শুষ্কভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

(১)

R/-
Pot. Chloride ...............1sp (T)
(muriate Pot. Fertiliser)
Aqua dist water........... 4·5 liters
(mft. sol.)

৪·৫ লিটার পরিস্রুত জলের সঙ্গে এক চামচ করে পটাশিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত করে ১ সপ্তাহকাল খাওয়ালে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।

অথবা,

(২)

R/-
Terramycin P.F. with Antigerm 77... 10 mg.
(to be given along with 11 kgs. of mash)

১১ কেজি পরিমাণ মেশ খাদ্যের সঙ্গে ১০ মিলিগ্রাম পরিমাণ টেরামাইসীন মিশিয়ে খাওয়ালেও বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে। উল্লিখিত ওষুধ মিশ্রিত মেশ খাদ্য ১ সপ্তাহকাল খাওয়াতে হবে।

(৩)

R/-

B-grade molasses $\frac{1}{2}$ kg.
Aqua dist. water... 4·5 liters .

৪·৫ লিটার পরিস্রুত জলের সঙ্গে অর্ধ কেজি পরিমাণ চিটে গুড় মিশিয়ে ১০ দিন যাবৎ খাওয়ালেও বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।

**বিশেষ নির্দেশ ঃ** সকল রোগগ্রস্ত মুরগীকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে টাটকা পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে। রোগগ্রস্ত মুরগীদের উত্তম Ventilation ব্যবস্থাযুক্ত ঘরে রাখতে হবে। এবং ঘরটি আরামপ্রদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

(১) ডিমপাড়া মুরগীদের অত্যধিক পরিমাণে দানা খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে; মেশ খাদ্য বেশি পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

(২) নীল ঝুঁটি strain যুক্ত মুরগী পালন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৩) ডিম উৎপাদন সুরু করার পূর্বেই তরুণ মুরগীদের প্রতিবেধক টিকা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ১৪ থেকে ১৬ সপ্তাহের বেশি বয়স্ক মুরগীদের টিকা দেওয়া উচিত নয়।

(৪) উত্তম sanitation ব্যবস্থা তথা উত্তম ventilation ব্যবস্থা আবশ্যক।

(৫) দলের কোন কোন মুরগীদের মধ্যে রোগ-লক্ষণ সূচিত হলে মেশ খাদ্য অথবা পানীয় জলের সঙ্গে চিটে গুড় মিশিয়ে দলের সকল মুরগীকে খাওয়াতে হবে অথবা pre-mixed anti-biotic masher খাওয়াতে হবে।

## হিস্টোমনিয়াসিস (ব্ল্যাক-হেড)
## (Infectious Enterohepatitis *Histomoniasis* Black-head)

এই রোগটি অন্ত্র এবং যকৃতের রোগ। টার্কীর পক্ষে এই রোগটি বিশেষ মারাত্মক। ৫ থেকে ১৬ সপ্তাহ বয়স্ক বাচ্চা মুরগী এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

**কারণ ঃ** Histomonas meleagridis নামক একপ্রকার প্যারাসাইট জনিত কারণে এই রোগ সংঘটিত হতে পারে। মল-মূত্রের দ্বারা দূষিত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের ফলে সুস্থ-মুরগী বা টার্কীর এই রোগ হতে পারে। এই রোগের প্যারাসাইটসমূহ cecal worm-এর ডিম্বাণুর মাধ্যমেও সংক্রমিত হতে পারে, মাছিদের দ্বারাও ঐ ডিম্বাণু বিস্তার লাভ করতে পারে। Histomonad নামক এই কীটাণু আক্রান্ত মুরগী বা টার্কীর উণ্ডুকে (ceca) এবং যকৃতে (liver) বাস করে। আক্রান্ত মুরগীর বাচ্চারা বাহ্যিক কোন লক্ষণ প্রকাশ না করেও টার্কীদের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** সচরাচর ১০ সপ্তাহের বেশি বয়স্ক বাচ্চা মুরগীদের মধ্যেই এই রোগের প্রকোপ বেশি হয়ে থাকে এবং ৫ থেকে ১৬ সপ্তাহ বয়স্ক বাচ্চা বা তরুণ মুরগীরাই সচরাচর এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তাছাড়া সকল বয়সের টার্কীরা এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগ আক্রান্ত পাখিদের ক্ষুধা হ্রাস পায়, দৌর্বল্য এবং ঝিমুনীভাব দৃষ্ট হয়। পালকসমূহ কুঞ্চিত পরিলক্ষিত হয়। মাথার রঙ কালো আভা যুক্ত হতে (অবশ্য অন্য রোগেও মাথার রঙ কালচে হতে পারে) পারে। কিন্তু ব্ল্যাক-হেড রোগে পাতলা গন্ধক বর্ণের (Sulphur coloured) বাহ্য একটি বিশেষ লক্ষণ। রোগ আক্রান্ত পাখিদের ওজন সত্বর হ্রাস পায় এবং মারা যায়। মৃত্যুর হার ৯০ শতাংশও হতে পারে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

Parasite-এর দ্বারা লীভার আক্রান্ত হয়ে গেলে কোন ওষুধের দ্বারাই এই রোগ সারানো সম্ভবপর নয়। তবে নিম্নলিখিত ওষুধটি রোগ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল প্রদান করে।

(১)

R/-
Enheptin
(to be given at 0.05% in the mash)

প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লিখিত ওষুধটি ২ সপ্তাহ যাবৎ খাওয়ালে কিছুটা উপকার অবশ্যই পাওয়া যাবে। রোগলক্ষণ যুক্ত মুরগীদের বা টার্কীদের পৃথক স্থানে রেখে চিকিৎসা করে যত শীঘ্র সম্ভব বিক্রি করে ফেলতে হবে।

অথবা

(২)

R/-
Pulv. Enheptin (20%) .. 1½ lbs.
mash ........100 lbs.
(Pulv. one)

মেশ খাদ্যের সঙ্গে এনহেপটিনটি শতকরা ২০ হারে মিশিয়েও ২ সপ্তাহকাল খাওয়ালে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।

বি. দ্র. প্রাথমিক পর্যায়ে এনহেপটিন প্রয়োগ না সম্ভব হলে—মৃত্যুরোধ করা খুবই কঠিন।

### প্রতিষেধক-ব্যবস্থা
### [Prevention]

উত্তম sanitation ব্যবস্থার মাধ্যমে বাহ্যের সঙ্গে নিঃসরিত cecal worm নিয়ন্ত্রণ করাই ব্ল্যাক-হেড রোগের নিয়ন্ত্রণের প্রধান পন্থা।

যে সকল অঞ্চলে ব্ল্যাক-হেড রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়, সেই সকল অঞ্চলে টার্কী এবং বয়স্ক মুরগীদের নিম্নলিখিত ওষুধটি খাওয়াতে হবে।

R/-
Phenothiazine....1lb.
(to be given with per. 100 lbs. of feed)

১০০ পাউণ্ড খাদ্যের সঙ্গে ১ পাউণ্ড হারে উল্লিখিত ওষুধটি নিয়মিত খাওয়াতে হবে।

রোগলক্ষণ যুক্ত মুরগী বা টার্কীদের পৃথক স্থানে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঘরটি সম্পূর্ণ বিশোধন করতে হবে।

সুষ্ঠু পরিচালন তথা উত্তম sanitation ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্ল্যাক-হেড অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ব্ল্যাক-হেড রোগ প্রতিরোধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

(১) তরুণ মুরগীদের এবং টার্কীদের তারের প্লাটফর্ম যুক্ত ঘরে রেখে পালন করুন। যে সকল অঞ্চলে ব্ল্যাক-হেড রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সকল অঞ্চলে তারের প্লাটফর্ম যুক্ত ঘরে মুরগী বা টার্কী পালন বিধেয়।

(২) বাচ্চা বা তরুণ মুরগীদের বয়স্ক মুরগীদের থেকে পৃথক স্থানে রেখে পালন করুন।

(৩) টার্কীদের সঙ্গে মুরগীদের একত্রে পালন করবেন না।

(৪) Insecticide নিয়মিত প্রয়োগের মাধ্যমে মশা-মাছি নিয়ন্ত্রণ করুন।

(৫) ক্ষতিকারক ব্যাক্টেরিয়া বা প্যারাসাইট যাতে না জমতে পারে—সেই ব্যবস্থা করুন।

(৬) খাদ্য তথা পানীয় পাত্রাদি wire platform যুক্ত হলে cecal worms অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(৭) মুরগী ও টার্কীদের বিচরণ ক্ষেত্র মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করুন।

(৮) মুরগী বা টার্কীদের নিঃসরিত মল-মূত্র থেকে তৈরি সার-গাদার ওপর মুরগীদের বা টার্কীদের বিচরণ করতে দেবেন না।

## অন্ননালীর ক্রপ (Crop) অংশে শস্য আটকান
## (Crop Bound, Sour Crop, Pendulous Crop, Impacted Crop)

এই অসুখটি হলে মুরগীর অন্ননালীর ক্রপ অংশটির বিবৃদ্ধি ঘটে এবং পক্ষাঘাত হয়। অন্ননালীর ক্রপ অংশটি বৃদ্ধি পেয়ে পেণ্ডুলামের মতো ঝুলতে থাকে।

শস্য আটকানো মুরগীর ক্রপের বিবৃদ্ধি

**কারণ ঃ** অন্ননালীর ক্রপ-অংশে খাদ্য আটকে যাওয়ার ফলে ঐ অবস্থা সূচিত হয়ে থাকে। দুষ্পাচ্য বড় ঘাস, বিচালি, পালক প্রভৃতি প্রথমে ঐ স্থানে জমা হয়,

তৎপরে অন্যান্য খাদ্যাদি ঐস্থানে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে ডেলা পাকিয়ে যায়—ফলে অন্ননালীর পরবর্তী অংশে খাদ্য সঞ্চারিত হতে পারে না এবং ক্রপের বিবৃদ্ধি ঘটে। ক্রপটি পেণ্ডুলামের মতো ঝুলে পড়ে।

তাছাড়া ক্রপের এই ধরনের বিবৃদ্ধি বংশগত হতে পারে—যে সকল মুরগীর ক্ষেত্রে ক্রপের বিবৃদ্ধি বংশগত ব্যাপার—সেই সকল বংশধারাযুক্ত মুরগীদের পালন না করাই সঙ্গত।

**লক্ষণ ঃ** এই রোগ হলে মুরগীর Crop-এর বিবৃদ্ধি ঘটে।ফলে ক্রপটি নিচের দিকে ঝুলে পড়ে এবং Crop-টি টক-গন্ধ যুক্ত খাদ্য দ্বারা ভর্তি থাকে। ঐ অবস্থায় খাদ্য গিলতে মুরগীদের কষ্ট হয়। এবং ঠিকমতো খাদ্যগ্রহণ করতে না পারার জন্য মুরগী বা টার্কীদের দৈহিক ওজন হ্রাস পেতে থাকে।

## চিকিৎসা এবং প্রতিকার (Treatement and Prevention)

যে সকল মুরগীদের Crop-এর বিবৃদ্ধি ঘটেছে—তাদের যত শীঘ্র সম্ভব বিক্রয় করা সঙ্গত।

যাঁরা চিকিৎসা করাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

R/-
Venegar sol. (P)— 1 sp.
(Place sol. into the gullet with rubber bulb syringe)

রবার বাল্ব সিরিঞ্জের সাহায্যে এক চামচ ভিনিগার সলিউশান মুরগীর অন্ননালীতে প্রবেশ করান এবং গলনালীটি উপর থেকে নিচের দিকে মেসেজ করতে থাকুন।

কিছুক্ষণ মেসেজ করলেই—গলনালীর ঐ অংশ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। যদি স্বাভাবিক হয়ে না আসে—তবে ঐ মুরগীটিকে বিক্রি করে ফেলতে হবে অথবা কেটে মাংস হিসাবে বিক্রি করে ফেলাই সঙ্গত হবে।

অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এই অবস্থার নিরসন করা যায় বটে—তবে তাতে ঝামেলা বেশি।

Safety Razor-এর সাহায্যে অস্ত্রোপচার করা যায়। তবে Razorটি প্রথমে উষ্ণ জলে বা ক্লোরিন মিশ্রিত জলে ডুবিয়ে নিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে। Crop-এর উপরস্থ পালক সর্বাগ্রে তুলে নিতে হবে। তারপর Razor-এর দ্বারা প্রথমে Crop-এর উপরস্থ চামড়া কেটে নিতে হবে—তৎপরে ১ ইঞ্চি লম্বা এবং ১.৫ ইঞ্চি চওড়া করে Crop -এর পার্শ্ব দেওয়াল কেটে—ফরসেপ বা ছোট চামচের সাহায্যে Crop -এ সঞ্চিত খাদ্যাদি বের করে নিতে হবে। তৎপরে—

R/- Acid Boric .... 1 gm.
Boiled water....5 ml.
(mft. sol.)

উষ্ণ জলের সঙ্গে বোরিক এসিড মিশিয়ে—সেই সলিউশনের দ্বারা Crop-এর অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার (১ বার মাত্র) করে Stitch করতে হবে। Saturating material হিসাবে এক্ষেত্রে তুলা ব্যবহার করা চলতে পারে।

অস্ত্রোপচার করার ১২ ঘণ্টার মধ্যে মুরগীকে কিছু খেতে দেওয়া উচিত হবে না।

১২ ঘণ্টা পরে পথ্য হিসাবে ভিজা মেশ (wet mash) খাদ্য বা দুধ দেওয়া চলবে। সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত পথ্য হিসাবে কেবলমাত্র wet mash বা দুধ খাওয়াতে হবে। অবশ্য অস্ত্রোপচার সফল হলেও মুরগীটির Crop-এ পুনরায় শস্য আটকাতে পারে অর্থাৎ পুনরায় 'Crop Bound' হতে পারে। অতএব অস্ত্রোপচারজনিত ঝামেলা এড়িয়ে এই ধরনের মুরগী বিক্রয় করে ফেলাই সব দিক থেকে সুবিধাজনক।

## ডিম্ববাহী নলীতে ডিম আটকে যাওয়া
## (Egg Bound, Impacted Oviduct)

তরুণ মুরগী বা বয়স্ক মুরগীদের অনেক ক্ষেত্রে ডিম পাড়তে অসুবিধা হয়।

**কারণ ঃ** ডিম্ববাহী নলীতে কোন প্রদাহ বা infection হলে, ডিম্ববাহী নলে কোন অর্বুদাদি tumours) থাকলে, ডিম নিঃসরণের পথে কোন বাধা থাকলে, অথবা ডিমের আকার বিসদৃশ হলে ডিম্ববাহী নলে ডিম আটকে যেতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** ডিম পাড়া সম্ভব না হওয়ায় মুরগীটি বারবার nest-এ ডিমপাড়ার জন্য প্রবেশ করে। যদি পুনঃ পুনঃ চেষ্টাতেও ডিমপাড়া সম্ভব না হয়, ডিমপাড়ার প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে—ডিম্ববাহী নলীর কিছু অংশ vent-এর বাইরে বেরিয়ে আসে। Blood টিস্যু সমূহ ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণও হয়ে থাকে। তখন ঐ ঘরে অবস্থিত অন্যান্য মুরগীরা ঠুকরে ঠুকরে (cannibalism) মুরগীর প্রাণান্ত ঘটায়।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

বার বার nest-এ প্রবেশ করছে অথচ ডিমপাড়া সম্ভব হচ্ছে না—ঐরূপ মুরগীকে দল থেকে পৃথক করে নিয়ে তলপেট ম্যাসেজ করে ডিম pass করার ব্যাপারে সহায়তা করতে হবে। ডিমটি vent-এর কাছাকাছি এলে—আঙুলের সাহায্যে ডিমটি বের করে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

একটি আঙুলে ভ্যাসলিন বা petrolatum মাখিয়ে নিয়ে vent-এর মধ্যে সেই আঙুলটি প্রবেশ করিয়ে ডিমটি pass করার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে। যদি ডিমটি আকারে খুব বড় হয় এবং pass করা অসম্ভব হয়ে পড়ে—তখন তীক্ষ্ণ কোন সরু শলাকা দ্বারা ডিমটি ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

টিস্যুর inflamation রোধ করার জন্য সিরিঞ্জের সাহায্যে vent-এর মধ্যে ঠাণ্ডা জল সঞ্চালন করা আবশ্যক। মুরগীটি সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত দল থেকে পৃথক স্থানে রাখা আবশ্যক। Everted Oviduct (মাঝে মাঝে যে সকল মুরগীর

ডিমপাড়ার অসুবিধা হয়)-যুক্ত মুরগীকে যত শীঘ্র সম্ভব বিক্রির ব্যবস্থা করা সঙ্গত। যদিও টিস্যুসমূহ উল্লিখিত চিকিৎসা-ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়, কিন্তু ডিমপাড়াতে ঐ ধরনের মুরগীর বারবার অসুবিধা হতে পারে অর্থাৎ oviduct-টিস্যু সমূহে পুনরায় inflamation সূচিত হতে পারে। অতএব cannibalism রোধের জন্য এরূপ মুরগীকে দল থেকে পৃথক স্থানে রাখা অথবা বিক্রির করে ফেলা সঙ্গত।

## নাভির রোগ
## (Omphalitis, "Mushy Chick Disease")

নবজাত মুরগীর বাচ্চারা এবং তরুণ মুরগীরা এই রোগে কখনও কখনও আক্রান্ত হয়ে থাকে। দোষযুক্ত incubator এবং ডিমে তা দেবার পরিবেশটি অস্বাস্থ্যকর হলে—এই রোগটির প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

**কারণ ঃ** সদ্যজাত বাচ্চার নাভিক্ষত বিশুষ্ক না হওয়ায় নাভি ক্ষতের মাধ্যমে এক প্রকার bacteria বাচ্চা মুরগীর দেহে প্রবেশ করতে পারে। Incubation পর্যায়ে অত্যধিক আর্দ্রতা, sanitation ব্যবস্থার অভাব এবং সুষ্ঠ পরিচালন-ব্যবস্থার অভাবে এই রোগ সূচিত হতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** নাভিক্ষত রোগে যে সকল বাচ্চারা ভুগছে—স্বভাবতই অন্য বাচ্চাদের অপেক্ষা তারা বেশি দুর্বল এবং বিষণ্ণ ভাবযুক্ত থাকে। ক্ষুধা হ্রাস পায়, তলপেট ফুলে যায়, কাঁপতে থাকে বা ঝিমুতে থাকে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার ২।৩ দিনের মধ্যে নাভিক্ষত রোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে পারে। Navel Infection -এর ফলে পরিবহনকালে বা হ্যাচারিতে থাকাকালীনই ৫০ শতাংশ মুরগীর বাচ্চা মারা পড়তে পারে।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

রোগগ্রস্ত বাচ্চাদের উত্তম ধরনের সেবার মাধ্যমে সারিয়ে তোলা যায়। ব্রুডার যন্ত্রের তাপমাত্রা এরূপ ক্ষেত্রে ৫° সেন্টিগ্রেড (স্বাভাবিক অপেক্ষা) বাড়িয়ে—মৃত্যুহার অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব। তদুপরি নিম্নলিখিত ওষুধ প্রদানে অনেকাংশে উপকার পাওয়া যায়।

(১)

R/-
Sulfamethazine (16%) sol—1%
Aqua dist. water.....80%
(mft. sol.)

৮০ ভাগ পানীয় জলের সঙ্গে ১ ভাগ পরিমাণ উল্লিখিত সলিউশানটি মিশিয়ে খাওয়ালে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে। ১ সপ্তাহকাল ওষুধ মিশ্রিত পানীয় জল খাওয়াতে হবে।

অথবা

R\-
Terramycin P.F. with antigerm 77-1 sp.
Aqua dist. water....4·5 liters
(mft. sol.)

৪·৫ লিটার জলের সঙ্গে ১ চামচ পরিমাণ উল্লিখিত ওষুধটি ১০।১২ দিন যাবৎ খাওয়ালেও বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

(১) Incubator-টি পরিষ্কার তথা বিশোধনের ব্যবস্থা করা উচিত। সেইসঙ্গে কস্টিক সোডা দ্বারা Incubator এবং হ্যাচারির অপরাপর সাজসরঞ্জাম বিশোধিত করা প্রয়োজন।

(২) Incubator-এ প্রতিবার নতুন পর্যায়ের ডিমসমূহ তা'য়ে বসাবার পূর্বে fumigation-এর মাধ্যমে (formaldehyde এবং Potasium Parmanganate) ইনকিউবেটারটি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করা আবশ্যক।

## খাদ্যজনিত বিষক্রিয়া (Food poisoning) (Botulism or Limberneck)

এই রোগটি সংক্রামক নয়, কিন্তু খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত কারণে মুরগীর বাচ্চা ও পাতিহাঁসদের (ducks) মাংসপেশীর পক্ষাঘাত হতে পারে। যখন ঘাড়ের মাংসপেশী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়—তখন মাথা বা ঘাড় নাড়াতে অসুবিধা হয়। সেইজন্য রোগজনিত এই অবস্থাকে ইংরেজিতে "limberneck" রোগও আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

**কারণ** : পচা-গলা বা দূষিত খাদ্যে Clostridum botulinum নামক একপ্রকার bacteria-র কারণেই এই রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে পচা-গলা মাংসে এই প্রকার bacteria-র maggot বিদ্যমান থাকে। খাদ্যের সঙ্গে maggot সমূহ খাওয়ার ফলে এই রোগজনিত প্রতিক্রিয়া সূচিত হতে পারে।

**লক্ষণ** : দূষিত খাদ্য খাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগজনিত প্রতিক্রিয়া সূচিত হতে পারে। দৌর্বল্য, ঝিমুনি বা নিদ্রালুভাব, ক্ষুধাহ্রাস, খাদ্যদ্রব্য গিলতে কষ্ট—পরবর্তী পর্যায়ে পা, ডানা এবং ঘাড়ের পক্ষাঘাত সূচিত হয়। মাথা ঝুলে পড়ে। রোগগ্রস্ত মুরগী মাথা তুলতে অসমর্থ হয় বা মাথাটি স্বাভাবিকভাবে নাড়া-চাড়া করতে পারে না। রোগগ্রস্ত মুরগীটি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—এবং ক্রমশ পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পালকসমূহ আলগা হয়ে যায়—রোগগ্রস্ত মুরগীকে একটু নাড়া-চাড়া করলেই পালক খসে পড়ে। লক্ষণাদি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগগ্রস্ত মুরগীটি মারা যেতে পারে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

রোগলক্ষণাদি প্রকাশিত হওয়ার পর মুহূর্ত থেকেই আক্রান্ত মুরগীদের—পর্যাপ্ত পরিমাণে গমের ভূষি (জলে ভিজিয়ে) খাওয়াতে হবে।

(১)

R/-
Epsom salts......1sp.
(to be given along with the mash)

মেশ খাদ্য অথবা ভেজা গমের ভুসির সঙ্গে ১ চামচ করে এপসম সল্ট মিশিয়ে প্রতিটি রোগগ্রস্ত পাখিকে খাওয়াতে হবে। ১ দিন খাওয়ালেই চলবে।

(২)

দলগত চিকিৎসার ক্ষেত্রে অর্থাৎ একসঙ্গে অনেক মুরগী রোগগ্রস্ত হলে—

R/-
Epsom salt ....1 lb.
(in the mash for each 75 to 100 birds)

৭৫ থেকে ১০০ টি রোগগ্রস্ত মুরগীর মেশ খাদ্য বা ভেজানো গমের ভুসির সঙ্গে ১ পাউণ্ড পরিমাণ এপসম সল্ট মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। ১ দিন খাওয়ালেই উপকার পাওয়া যাবে।

(৩)

প্রতিটি রোগগ্রস্ত মুরগীর পানীয় জলের সঙ্গে নিম্নলিখিত পরিমাণ ক্যাস্টর অয়েল ১ দিন মাত্র খাওয়ালেও উপকার পাওয়া যাবে।

(৪)

R/-
Castor Oil ....3 sp.
(to be given with drinking water)

পানীয় জলের সঙ্গে এক-একটি মুরগীকে ৩ চামচ পরিমাণ ক্যাস্টর অয়েল ১ দিন মাত্র খাওয়ালেই বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।

### প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

পচা-গলা খাদ্য, বা পচা-গলা মাছ মাংস খাওয়াবেন না। মুরগীদের বিচরণ ক্ষেত্রের কাছাকাছি কোন মৃত পশু বা পাখির দেহ যাতে না পড়ে থাকে—তা লক্ষ্য করুন। মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে ফেলুন বা গভীর গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।

## বহুজনব্যাপক কম্পন (Epidemic Tremors)
## (Avaian encephalomyelitis, Trembling Chick Disease)

এই রোগটি একপ্রকার সংক্রামক রোগ যা তরুণ মুরগীদের স্নায়ু-কেন্দ্রকে আক্রমণ করে। মাংসপেশীর কম্পন এবং শরীর সঞ্চালনগত সামঞ্জস্যের অভাব এই রোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর ৫ দিন থেকে ৪।৫ সপ্তাহের মধ্যে এই রোগ সূচিত হতে পারে। তবে এই রোগের সঙ্গে—শ্বাসযন্ত্র ঘটিত কোন গোলযোগ বিদ্যমান থাকে না।

**কারণ ঃ** এক প্রকার filerable virus জনিত কারণেই এই রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। রোগ-জীবাণুযুক্ত ডিম থেকে বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগ সংক্রমিত হ'তে পারে—কিন্তু সুস্থ ও সবল বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগ তেমন প্রসার লাভ করতে পারে না। রোগমুক্ত হয়েও মুরগীরা এই রোগ-জীবাণু বহন করতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** বাচ্চাদের বয়স যখন ৫ থেকে ১০ দিন তখন প্রাথমিক লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে পারে। যদি স্বল্পসংখ্যক বাচ্চা এই রোগে আক্রান্ত হয়—তবে এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণাদি সচরাচর পোলট্রির পরিচালকদের অজ্ঞাতই থেকে যায়। রোগগ্রস্ত বাচ্চারা অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিসম্পন্ন (sluggish) এবং ঝিমুটে ভাবযুক্ত হয়—খাদ্য তথা পানীয় জল গ্রহণের ব্যাপারেও তারা তেমন তৎপর হয় না। তারা কাঁপতে থাকে—মাঝে মাঝে বেদনা জনিত কারণে চীৎকার করে ওঠে। মাথা ও ঘাড়ের মাংসপেশীর খিঁচুনি বা কম্পন আকস্মিকভাবে একদিন শুরু হয়। রোগগ্রস্ত বাচ্চাকে হাতে তুলে নিলে অনায়াসে এই দৈহিক কম্পন অনুভব করা যায়। আক্রান্ত বাচ্চাদের চলার সময় পক্ষাঘাতজনিত লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। অনশনজনিত কারণে বা পদদলিত হওয়ার কারণে রোগগ্রস্ত বাচ্চারা লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়ার কিছু সময় বা কিছুদিন পরেই মারা যায়।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

এই রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ফলপ্রদ কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত তরুণ মুরগীদের ডিমপাড়া মুরগীদের পরিবর্তে replace করা সঙ্গত হবে না। বিশেষ রোগলক্ষণ যুক্ত মুরগীদের মেরে ফেলা উচিত। যে সকল বাচ্চাদের মধ্যে তেমন স্নায়বিক দোষ লক্ষণ নেই, তাদের broilers হিসাবে শীঘ্র বিক্রি করে ফেলা উচিত, তবে broilers হিসাবে ঐ সকল বাচ্চাদের পালন করা হলেও পৃথক স্থানে বা ঘরে রেখে পালন করতে হবে। রোগ মুক্ত হওয়ার পরেও ঐ সকল মুরগীদের কখনই প্রজনন কার্যে ব্যবহার করা সঙ্গত হবে না। কারণ রোগমুক্ত হবার পরেও ঐ সকল মুরগী রোগ-জীবাণু বহন করতে পারে।

# মুরগীর টাইফয়েড
# (Fowl Typhoid)

এই একটি জটিল ধরনের সংক্রামক রোগ—এই রোগটি প্রবলাকারে প্রকাশ পেতে পারে। এই রোগের দ্বারা হাঁস ও মুরগীরা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হতে পারে এবং মৃত্যুহার ২০ থেকে ৭৫ শতাংশ হতে পারে।

**কারণ ঃ** Salmonella gallinaum নামক একপ্রকার bacteria ঘটিত কারণে এই রোগ সূচিত হতে পারে। রোগগ্রস্ত পাখির নাক-মুখ থেকে নিঃসরিত স্রাব এবং

মল-মূত্রের মাধ্যমে এই রোগের জীবাণু খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে (fecal contamination of food and water) সুস্থ মুরগীর দেহে প্রবেশ করে রোগের সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। এছাড়া কীট-পতঙ্গ, মশা-মাছি, ইঁদুর-বেজি বা বন্য পাখিরাও এই রোগ-জীবাণু ছড়াতে পারে। দোষযুক্ত ডিম থেকে জাত বাচ্চাদের মধ্যেও এই রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

রোগগ্রস্ত মুরগীদের যতশীঘ্র সম্ভব বিক্রি করে ফেলা সঙ্গত। রোগমুক্ত হবার পরও মুরগীদের যতশীঘ্র সম্ভব বিক্রয় করে ফেলা সঙ্গত। তবে দলে টাইফয়েড রোগ সূচিত হলে—মৃত্যুহার অনেকাংশে রোধ করার জন্য এবং রোগ নিরাময়ের জন্য নিম্নলিখিত চিকিৎসা-ব্যবস্থা অনুসরণ করা সঙ্গত। যদিও ওষুধাদির প্রয়োগে এই রোগকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা সম্ভব নয়, তবে ওষুধাদি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগলক্ষণাদি সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়ে থাকে এবং রোগজনিত মৃত্যুহার কমিয়ে আনে।

(১)

R/-
Furazolidone (N F. 180)
(to be given at 0.04% in the mash)

উল্লিখিত ওষুধটি মেশ খাদ্যের সঙ্গে ০ ০৪ শতাংশ হারে মিশিয়ে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যাবে। ৩ দিন খাইয়ে ২ দিন বন্ধ রেখে পুনরায় ৩ দিন খাওয়াতে হবে।

অথবা,

R/-
Sulfaquinoxaline
(to be given at 0.04% in the mash)

উল্লিখিত ওষুধটি মেশ খাদ্যের সঙ্গে অনুরূপ হারে খাওয়ানো আবশ্যক। ৩ দিন খাওয়াবার পর ২ দিন ওষুধ খাওয়ানো বন্ধ রেখে পুনরায় ৩ দিন ওষুধটি খাওয়াতে হবে।

অথবা,

(৩)

R/-
Sufamethazine Liq.....2sp. (T)
Aqua dist water ....4.5 liters
(mft. sol.)

৪.৫ লিটার পানীয় জলের সঙ্গে ২ চামচ ( টেবল) তরল সালফামেথাজিন মিশিয়ে ৪।৫ দিন খাওয়াতে হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

১। কোন কোন ফার্মের মুরগীদের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এরূপ টিকা প্রদান সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। টাইফয়েড রোধ করতে হলে—বিশ্বস্ত বাচ্চা উৎপাদনকারী ফার্ম (hatcharies) থেকে মুরগীর বাচ্চা সংগ্রহ করাই হচ্ছে টাইফয়েড নিরোধের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

২। রোগজনিত কারণে অসুস্থ তথা মৃতপ্রায় মুরগীদের যতশীঘ্র সম্ভব মেরে ফেলুন। টাইফয়েড রোগগ্রস্ত মুরগীর মৃতদেহ বা নাড়িভুঁড়ি (carcasses) পুড়িয়ে ফেলুন বা গভীর গর্ত করে পুতে ফেলুন এবং রোগগ্রস্ত পাখিদের পৃথক ঘরে রাখুন।

৩। ফুরাজলিডোন, সালফাকুইনোক্সালিন ইত্যাদি ওষুধ দলের সকল মুরগীদের মেশ খাদ্য বা পানীয় জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ান।

৪। রোগগ্রস্ত মুরগীদের অন্যত্র সরিয়ে রেখে এবং সুস্থ মুরগীদের আলাদা স্থানে রেখে ঘরটি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করুন। [৬ গ্যালন উষ্ণ জলের সঙ্গে ১ পাউণ্ড লাই (lye) মিশিয়ে নিন] মুরগীর ঘরের দেওয়াল, nest ইত্যাদি বিশোধন করুন।

৫। লিটার বা floor-এর ওপরে চুনের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। যাতে লিটার এবং floor থেকে মুরগীগুলো জীবাণুযুক্ত খাদ্য না খায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখুন।

৬। খাদ্য এবং পানীয় পাত্রাদি লাই সলিউশানের দ্বারা বিশোধন করুন।

৭। পানীয় জলের সঙ্গে ক্লোরিন (Chlorine) মিশিয়ে ফার্মের সকল মুরগীকে খাইয়ে অতিরিক্ত সতর্কতামুলক ব্যাবস্থা গ্রহণ করুন (Chlorine 1 spoon : 4.5 liters drinking water)।

৮। রোগগ্রস্ত মুরগীর ঘর থেকে সুস্থ মুরগীদের ঘরে যাওয়ার সময় জুতো ও পোশাক পাল্টে নিন অথবা জুতো ও পোশাক বিশোধন করে নিন।

৯। রোগের প্রবল প্রকোপ হ্রাস পাওয়ার পর এবং মৃত্যুহার কমে এলে যে দলে রোগগ্রস্ত মুরগীগুলো ছিল, সেই দলের সকল মুরগীদের শীঘ্র বিক্রয় করার বন্দোবস্ত করুন।

১০। ঘরে নতুন মুরগী রাখার আগে ঘরটি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করে নিন।

১১। ডিমপাড়া মুরগী নির্বাচনের জন্য, সব দিক দেখে বাতিল করুন। পুলোরাম রোগের test-এর মাধ্যমে—টাইফয়েড এবং পুলোরাম উভয় রোগের জীবাণুর বিদ্যমানতা সম্বন্ধেই অবহিত হওয়া সম্ভব।

## ফেভাস বা সাদা ঝুঁটিরোগ
## (Favus or White Comb)

একপ্রকার ছোঁয়াচে চর্মরোগ। পশু-পাখি তথা মানুষেরও এই রোগ হতে পারে।

**কারণ :** Achorion gallinae নামক একপ্রকার ছত্রাকের দ্বারা এই রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। রোগগ্রস্ত মুরগীর নিবিড় সান্নিধ্যের দ্বারা এই রোগ সুস্থ

মুরগীর দেহে সংক্রমিত হতে পারে। রোগগ্রস্ত মুরগীর চামড়ার আঁশে এবং ক্ষতে এই রোগ-জীবাণু বিদ্যমান থাকে। স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে তথা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সচরাচর মুরগীগুলো এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** ঝুঁটি, কানের লতি এবং গলার ফুলে প্রথম পর্যায়ের সাদা পাউডারের মতো ছোপ ছোপ দাগ দৃষ্ট হয়। চামড়ার ওপর সাদা রংয়ের ক্ষত দেখলে মনে হয় যেন ময়দা ছড়িয়ে রয়েছে।

রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে পালকের নিম্নস্থ চামড়াতেও সাদা বর্ণের ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে এবং পালক খসে পড়তে পারে। এই রোগের শেষ পর্যায়ে মুরগীর গায়ের চামড়া পুরু এবং সরের মতো স্তর যুক্ত এবং কুঞ্চিত দৃষ্ট হয় এবং তা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

রোগ আক্রান্ত সকল মুরগীকে দল থেকে সরিয়ে ফেলুন বা মেরে ফেলুন। যদি চিকিৎসা করতে চান—তবে যে সকল মুরগীর কেবলমাত্র ঝুঁটি, গলার ফুল এবং কানের লতি আক্রান্ত হয়েছে—তাদেরই নিম্নলিখিত ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করুন। কিন্তু এই রোগটি পালকেব নিচের চামড়াতে (feathered parts) ছড়িয়ে পড়লে এই রোগ নিবাময় করা দুঃসাধ্য। যে-সকল মুবগীর ঝুঁটি, গলার ফুল ও কানের লতি আক্রান্ত হয়েছে সেই সকল মুরগীকে পৃথক স্থানে সরিয়ে চিকিৎসা করুন।

(১)

R/-
Iodine (linet) ....1%
Glycerine . .. .. .6%
(Mft. Ointment : For external use only. Paint twice daily.)

উল্লিখিত ভাবে অয়েণ্টমেণ্টটি প্রস্তুত করে দিনে ২ বার ঝুঁটি, গলার ফুল ও কানের লতির ক্ষতস্থানে brush বা তুলির সাহায্যে লাগান। ক্ষত শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত এই মলমটি লাগাতে হবে।

অথবা,

(২)

R/-
Formaline ......1%
Veseline.........20%
(Mft. Ointment : Paint daily once.)

উল্লিখিতভাবে মলম প্রস্তুত করে দিনে একবার করে ক্ষতস্থানে লাগান। ক্ষতটি নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত বা সাদা দাগ না চলে যাওয়া পর্যন্ত ঝুঁটি, গলার ফুল বা কানের লতিতে এই মলমটি লাগান।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

পালক অঞ্চলে অর্থাৎ পালকের (Feathered parts) নিচেও এই ক্ষত বিস্তারিত হলে নিরাময় করা দুঃসাধ্য। ঝুঁটিতে বা গলার ফুলে বা কানের লতিতে সাদা দাগ বা ক্ষত সৃষ্টি হলে—প্রথম অবস্থাতেই অন্যত্র সরিয়ে চিকিৎসা চলতে পারে। কিন্তু পালক অঞ্চলে এই ক্ষত প্রসারিত হলে—রোগগ্রস্ত মোরগ বা মুরগীকে মেরে ফেলা উচিত। রোগগ্রস্ত মোরগ বা মুরগীর মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে ফেলুন বা গভীর গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।

রোগগ্রস্ত মুরগীদের অন্যত্র সরিয়ে কার্বলিক সাবান মিশ্রিত উষ্ণ জলের দ্বারা ঘরটি বিশোধন করুন। Sulphur Candle-এর গ্যাস দ্বারা ঘরটি এবং সন্নিহিত অঞ্চল বিশোধন করা আবশ্যক।

# ব্রুডার নিউমোনিয়া
## (Aspergillois, Brooder, Pneumonia, Fungus Pneumonia)

এই রোগটি ছত্রাক জাতীয় রোগ। এই রোগে দলের একটি বাচ্চা বা একসঙ্গে অনেক বাচ্চা আক্রান্ত হতে পারে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে এই রোগ সূচিত হতে পারে।

**কারণ ঃ** Aspergillus fumigalus নামক এক প্রকার ছত্রাকের দ্বারা এই রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। ছত্রাক যুক্ত litter বা পচা খাদ্যের মাধ্যমে এই ছত্রাক মুরগীর নাকের মধ্য দিয়ে শ্বাস টানার সময় প্রবেশ করে এবং রোগ সূচিত করে।

**লক্ষণ ঃ** শ্বাসকষ্টই হচ্ছে এই রোগের মূল লক্ষণ। ক্ষুধা হ্রাস, অস্বাভাবিক পিপাসা বৃদ্ধি, অনিদ্রা, জ্বর, পাতলা বাহ্য ইত্যাদি উপসর্গও সচরাচর বিদ্যমান থাকে। পরিশেষে আক্রান্ত বাচ্চাটি এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে নড়াচড়া করতে অসমর্থ হয়। এই রোগের দ্বারাও কখনও কখনও চোখের টিস্যু সমূহও আক্রান্ত হতে পারে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

এই রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কোন ফলপ্রদ ওষুধ নেই। রোগ আক্রান্ত মুরগীটিকে মেরে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা বা মাটিতে পুঁতে ফেলা সঙ্গত।

তবে একসঙ্গে বহু বাচ্চা আক্রান্ত হলে—মৃত্যুহার অনেকাংশে হ্রাস করার জন্য নিম্নলিখিত ওষুধটি পানীয় জলসহ মিশ্রিত করে খাওয়ালে কিছুটা উপকার পাওয়া যাবে এবং মৃত্যুহারও অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

R/-
Sulfadimidin Sodi sol. (16%) .... 30 ml.
Aqua dist. water....1.5 liters
(Mft. sol.)

১.৫ লিটার জলে উল্লিখিত ওষুধটি ৩০ মিলিলিটার পরিমাণ মিশিয়ে খাওয়ালে কিছুটা উপকার পাওয়া যাবে। ৩ দিন খাওয়াতে হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

সুস্থ তথা স্বাস্থ্যবান বাচ্চাদের নিজেদের দেহের মধ্যেই রোগ-প্রতিষেধক স্বাভাবিক শক্তি বিদ্যমান।

দুর্বল বাচ্চাদের স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে বা আর্দ্র লিটারে রাখলে এই রোগের সংক্রমণ ঘটা স্বাভাবিক। পচা-গলা খাদ্য খাওয়ানো বন্ধ করুন। স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে এবং আর্দ্র লিটারে বাচ্চাদের পালন করবেন না।

# পা-ফোলা (পায়ের তলায় ফোঁড়া) বা বাম্বলফুট (Bumblefoot)

এই রোগে মুরগীর পায়ের পাতার নিচে আঙুলের গোড়ায় বা আঙুলের ফাঁকে, গোড়ালিতে পূঁজযুক্ত স্ফীতি দৃষ্ট হয়।

**কারণঃ** ব্যাক্টেরিযা ঘটিত কারণেই এই রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। Roostwire-এব তাব, নখ, কর্কশ মেঝে, ক্ষত বা কোন কিছুর দ্বারা কেটে গেলে এই বোগ সূচিত হতে পাবে। বক্ত প্রবাহে ব্যাক্টেবিযাব অনুপ্রবেশ অথবা স্থানিক রক্ত দুষ্টিব ফলে এই রোগ সূচিত হয়।

**লক্ষণঃ** পায়ের তলায়, আঙুলের ফাঁকে পূঁজযুক্ত স্ফীতি বা ফোঁড়াব কারণে খঞ্জভাব সূচিত হয়।
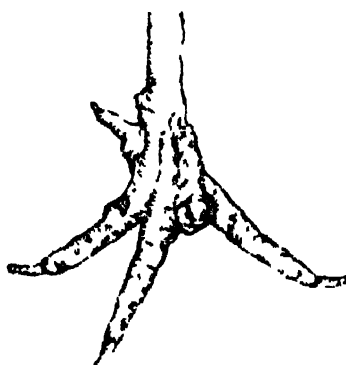
পায়ের আঙুলেব ফাঁকে স্ফীতি

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

ডিমপাড়া তথা লাভজনক মুরগী bumblefoot রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। লাভজনক নয় এরূপ মুরগীর এই রোগ হলে কেটে মাংস হিসাবে বিক্রয় কবে ফেলাই সঙ্গত। ডিমপাড়া লাভজনক মুরগীর এই বোগ হলে নিম্নলিখিত চিকিৎসা-ব্যবস্থা অনুসরণ করুন।

রোগগ্রস্ত মুরগীটিকে একটি ছোট ঘরে বা পার্টিশান দেওয়া ছোট অংশে পৃথক রাখুন।

প্রথমে একটি ধারাল ক্ষুর বা কাঁচিকে উষ্ণ জলে ডুবিয়ে রেখে বিশোধন করে নিন।

তৎপরে আক্রান্ত মুরগীর পায়ের তলার ফোঁড়াটি কেটে ফেলুন, রক্ত ও হলদে বর্ণের পূঁজ বেরোবে।

R/-
Make the incision on the
upper side of the infection.

ফোঁড়ার উপরের অংশে অস্ত্রোপচার করুন।

R/-
Paint the wound
with Iodine (linet).
Clean the wound daily
& apply fresh Iodine.

ক্ষতস্থানে আইওডিন লাগান। ক্ষতস্থানটি রোজ পরিষ্কার করে নতুন করে রোজ আইওডিন লাগান এবং পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধুন। আইওডিনের পরিবর্তে নিম্নলিখিত ointment-টিও ঘা না শুকান পর্যন্ত লাগাতে পারেন।

R/-
Pulv. Sulfathiazole ...2%
Glycerine...... . ........5%
(Mft. Ointment)

আইওডিনের পরিবর্তে উল্লিখিত মলমটি লাগালেও উপকার পাওয়া যাবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

১। মুরগীর ঘরের মেঝেতে অন্তত ৬ ইঞ্চি পুরু litter (শয্যা)-এর ব্যবস্থা করুন।

২। Roost সমূহ পরীক্ষা করুন, কোথাও পেরেকের তীক্ষ্ণ প্রান্ত বেরিয়ে রয়েছে কিনা লক্ষ্য করুন। তারের তীক্ষ্ণ প্রান্তসমূহ পিটিয়ে ঠিক করে সমতল করে দিন।

৩। বিচরণ ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ ধরনের পাথর কুচি রয়েছে কি না লক্ষ্য করুন, যদি থাকে তা সরিয়ে ফেলুন।

## অপুষ্টিজনিত রোগ এবং প্রতিকার

খাদ্যের মধ্যে উপযুক্ত পুষ্টিকর উপাদান না থাকলে বা অপরাপর অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে মুরগী পালন করলে বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ সূচিত হতে

পারে। মুরগীর স্বাস্থ্য রক্ষা তথা শারীরিক বৃদ্ধি এবং প্রজনন-ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও খনিজ জাতীয় উপাদানাদি প্রয়োজন।

মুরগী পালন লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। খাদ্যে যদি পুষ্টিকর উপাদানাদির সুষম বণ্টন না হয়, তবেই নানাবিধ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সূচিত হতে পারে।

**বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন এবং কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান তার তালিকা :**

| ভিটামিন (Vitamins) | কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান (Source of Vitamins) |
|---|---|
| ভিটামিন-এ (Vitamins-A) | ফিশ্‌লীভার অয়েল, হলদে শস্য, গাজর, সবুজ ঘাস ইত্যাদি। |
| ভিটামিন-ডী (Vitamins-D) | ফিশ্‌লীভার অয়েল, সূর্যের আলো এবং রোদে শুকানো খড়। |
| ভিটামিন-জী (Vitamins-G) | সবুজ শাক-সব্‌জি, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, খোল, মাংসের ছাঁট, মাছ, গাঁজলা (Yeast), লীভার প্রভৃতি। |
| ভিটামিন-বী১ (Vitamins-$B_1$) | শস্যাদি, গমজাত দ্রব্যাদি, গমের ভুষি, সয়াবীন, তিসির এবং তুলা বীজের তেল, মদেব গাঁজলা, মাঠা তোলা দুধ, সবুজ শাক-সব্‌জি। |
| ভিটামিন-বী৬ (Vitamins-$B_6$) | ভিটামিন বী১-এব অনুরূপ আছে· গুড় এবং লীভার-মিল। |
| ভিটামিন-ঈ (Vitamins-E) | শস্যাদি, গম, গমেব ভুষি, সবুজ ঘাস, সযাবীন ও তুলাবীজের তেল। |
| ভিটামিন-এইচ্ (Vitamins-H) | শস্যাদি, গম এবং গমের ভুষি, গমজাত দ্রব্যাদি, চাল, ভাত, চালের কুঁড়া, মদের গাঁজলা, সবুজ ঘাস, আখের গুড়, সয়াবীন, লীভার। |
| ভিটামিন-কে (Vitamins-K) | শস্যাদি, সবুজ ঘাস, মাছ, মাংসের ছাঁট, লীভার, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি এবং তুলাবীজ। |
| নায়াসিন (Niacin) | ভুষি জাতীয় খাদ্য, গম, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, সয়াবীনের (Niacin) তেল, মদের শুষ্ক গাঁজলা, ধান জাত দ্রব্যাদি, এবং লীভার। |
| কোলিন (Choline) | গম, জই, গমজাত দ্রব্যাদি, সয়াবীন, মদের গাঁজলা, (Choline) মাংসের ছাঁট, শুটকি মাছ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, তুলাবীজ। |

| ভিটামিন (Vitamins) | কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান (Source of Vitamins) |
| --- | --- |
| আইনোসিটল (Inositol) | শস্যাদি, গমজাত দ্রব্যাদি, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, মদের গাঁজলা, লীভার। |
| ফোলিক অ্যাসিড (Folic Acid) | দুধ, গম, ঘাস, সয়াবীন, ধানজাত দ্রব্যাদি, শস্যকণা লীভার। |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (Pantothenic Acid) | ঘাস, লীভার, গম, জই, গমজাত দ্রব্যাদি, গমের ভুষি, গুঁড়োদুধ, ঘোল, শুটকিমাছ চূর্ণ। |
| ভিটামিন -বী১২ (Vitamin-$B_{12}$) | লীভার, শুটকিমাছ, মাংসের ছাঁট এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি। |
| ভিটামিন-বী১৩ (Vitamin-$B_{13}$) | সয়াবীন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, শুটকি মাছ চূর্ণ, মদের গাঁজলা। |

## ভিটামিনস (Vitamins)

### (ক) ভিটামিন-এ'র অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** এই ভিটামিনের অভাবে চোখের পাতা ফোলে, চোখ দিয়ে জল ঝরে, নাক দিয়ে জল ঝরে, অল্পেতেই ঠাণ্ডা লাগে এবং ডিম উৎপাদন ও প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

### প্রতিকার-ব্যবস্থা

**(১) বাচ্চার জন্য ঃ**

R\-
Rovimix (Roche)......0.2 gm.
(per 0.45 kg. of mash)

প্রত্যেক ৪৫০ গ্রাম মেশ খাদ্যের সঙ্গে 0.2 গ্রাম Rovimix- এর সংযোজন আবশ্যক। অপুষ্টি দূর না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত খাওয়াতে হবে।

**(২) বয়স্ক মুরগীর জন্য**

R\-
Rovimix (Roche).... 0.3 gm.

অথবা

Vit-A... 3,300 I.C.U.
(Per 0.45 kg. of mash)

উল্লিখিত পরিমাণ ভিটামিন-এ মেশ খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত খাওয়াতে হবে।

## (খ) ভিটামিন-ডী'র (তৎসহ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের) অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** এই ভিামিনের অভাব হলে 'রিকেট' রোগ দেখা দেয়—শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ধীরভাবে চলাচল করে, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়, নরম-খোলাযুক্ত (soft-shelled) ডিম পাড়ে, বুকের ও পায়ের হাড় বিসদৃশ হয়।

### প্রতিকার-ব্যবস্থা

**(১) বাচ্চাদের জন্য ঃ**

R/-
Vit-D...135 I.C.U.

অথবা,

Rovimix (Roche)... 3 gm.
(per 0·45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশ খাদ্যেব সঙ্গে উল্লিখিত পরিমাণ ভিটামিন-ডি অথবা Rovimix ওষুধটির সংযোজন প্রয়োজন। অপুষ্টিজনিত প্রতিক্রিয়া দূর হবার পর প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশ খাদ্যের সঙ্গে ৯০ ইউনিট (I.C.U.) Vitamin-D সংযোজন করলেও চলবে অথবা বৌদ্র সেবন করালে আপনা থেকেই ভিটামিন ডি উৎপন্ন হবে।

**(২) বয়স্ক মুরগীর জন্য ঃ**

R/-
Vit-D 340 I.C.U
(Per 0·45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশ খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত পরিমাণ ভিটামিন-ডি'র সংযোজন প্রয়োজন। তবে অপুষ্টিজনিত প্রতিক্রিয়া দূর হওয়ার পর, প্রতি ৪৫০ গ্রাম খাদ্যের সঙ্গে ১০০ ইউনিট (I.C.U.) ভিটামিন-ডি'র নিয়মিত সংযোজন করতে হবে।

## (গ) ভিটামিন-জী'র (রিবোফ্ল্যাভিন) অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** এই রোগের ফলে মুরগীর মুখে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এছাড়া মুখে মামড়ি পড়ে, বারবার পাতলা বাহ্য হয়, প্রজনন ক্ষমতা ও ডিম উৎপাদন হ্রাস পায় এবং পক্ষাঘাতের সূচনা হতে পারে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

**(১) বাচ্চাদের জন্য ঃ**

R/-
Riboflavin...1.7 mg.
(per 0·45 kg. of mash)
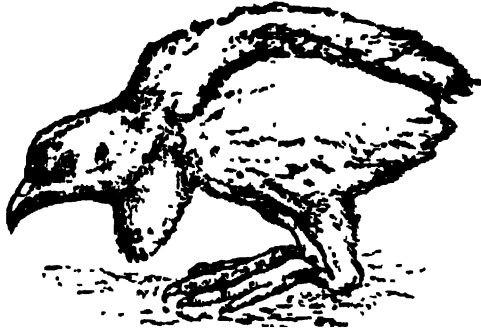
ভিটামিন বি$_2$-এর অভাবে পায়ের পক্ষাঘাত

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশ খাদ্যের সঙ্গে ১·৭ মিলিগ্রাম রিবোফ্ল্যাভিন নিয়মিত মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

**(২) বয়স্ক মুরগীর জন্য ঃ**

R\-
Pulv. Riboflavin....1.3 mg.
(per 0.45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশখাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত উল্লিখিত পরিমাণ রিবোফ্ল্যাভিন খাওয়ানো আবশ্যক। রিবোফ্ল্যাভিনের (১০ মিলিগ্রামের) ট্যাবলেট গুঁড়ো করেও প্রয়োজনীয় হারে মেশানো চলতে পারে।

## (ঘ) ভিটামিন-বী$_1$-এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** এই ভিটামিনের অভাবে মুরগীর ক্ষুধা হ্রাস পায়। নার্ভাসনেস এবং অস্থিরতা দেখা যায়।

### প্রতিকার

**বাচ্চা ও বয়স্কদের জন্য ঃ**

R\-
Thiamine....0.9 mg.
(per 0.45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশখাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত পরিমাণ থিয়ামিনের সংযোজন আবশ্যক।
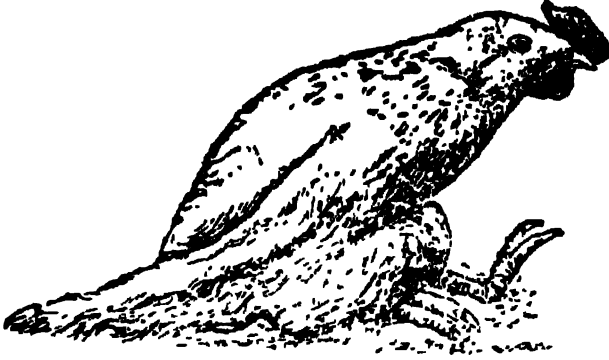
ভিটামিন বী১-এব অভাবে মোবগেব অবস্থা

### (ঙ) ভিটামিন-বি৬-এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** এই ভিটামিনের অভাবে মুরগীর শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তাছাড়া প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অহেতুক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

**(১) বাচ্চাদের জন্য ঃ**

R/-
Pyridoxine...1 mg
(per 0.45 kg of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশখাদ্যের সঙ্গে ১ মিলিগ্রাম পরিমাণ পাইরিডক্সিন মিশিয়ে নিয়মিত খাওয়াতে হবে।

**(২) তরুণ মুরগীর জন্য ঃ**

R/- Pyridoxine. ..1.5 mg.
(per 0.45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশ খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত ওষুধটি দেড় মিলিগ্রাম পরিমাণ মিশ্রিত করে নিয়মিত খাওয়াতে হবে।

### (চ) ভিটামিন-ঈ-এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** এই ভিটামিনের অভাবে মোরগের প্রজনন শক্তি হ্রাস পায় এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তাছাড়া ২ থেকে ৪ বছর বয়স্ক বাচ্চাদের নানাবিধ রোগ দেখা দেয়।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

**(১) বাচ্চাদের জন্য ঃ**

Rovisol oral (Roche)....15 ml.
Aqua dist. water .....1liter
(Mft. sol.)

১ লিটার পরিমাণ জলে ১৫ মিলিলিটার পরিমাণ উল্লিখিত ওষুধটি গুলে উপশম না হওয়া পর্যন্ত খাওয়াতে হবে।

**(২) তরুণ ও বড় মুরগীর জন্য ঃ**

R/-
Rovisol oral....25 ml.
Aqua dist. water....... 6 liters
(Mft. sol.)

৬ লিটার পরিমাণ জলে উল্লিখিত ওষুধটি মিশিয়ে প্রতিক্রিয়া দূর না হওযা পর্যন্ত নিয়মিত খাওয়াতে হবে।

## (ছ) ভিটামিন-এইচ-এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** এই ভিটামিনের অভাবজনিত কারণে হাড়ের গঠন ব্যাহত হয়। হাঁটু
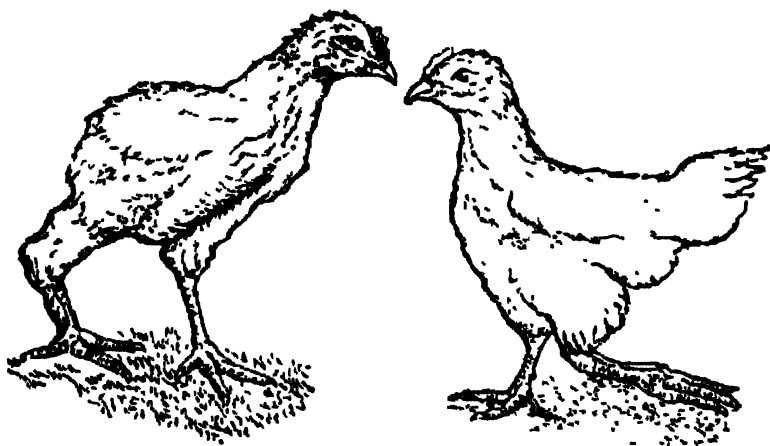
পেরোসিস রোগাক্রান্ত মুরগী

ফুলে যায়। পায়ের হাড় চ্যাপ্টা হয় এবং হাঁটুর কাছ থেকে পা বেঁকে যায়। পেরোসিস (Perosis or Slipped Tendon) রোগ সূচিত হয়।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

(১)

রোগ আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে—

R/-
Sulph. Manganese...1 gm.
(per 9 kg. of mash)

প্রতি ৯ কেজি পরিমাণ মেশখাদ্যের সঙ্গে ১ গ্রাম পরিমাণ উল্লিখিত ওষুধটি মিশিয়ে ৩ সপ্তাহ্ যাবৎ খাওয়াতে হবে।

অথবা,

(২)

**(১) বাচ্চাদের জন্য ঃ**

R/-
Biotin....0.045 mg.
(per 0.45 kg of mash)

**(২) বয়স্ক বা ডিমপাড়া মুরগীর জন্য ঃ**

R/-
Biotin ... 0.07 mg.
(per 0.45 kg. of mash)

বি. দ্র. ৪৫০ গ্রাম পরিমাণ মেশ খাদ্যের সঙ্গে বয়স ভেদে ওষুধ দুটি কমপক্ষে ২ সপ্তাহ যাবৎ খাওয়ানো আবশ্যক। পেরোসিস রোগ সূচিত হলে অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত উপাদান খাওয়ানো চলবে না।

## (জ) ভিটামিন-কে-এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** রক্ত জমাট বাঁধার জন্য ভিটামিন-কে-এর বিশেষ প্রয়োজন। অতিরিক্ত ও বেশি মাত্রায় অন্য ওষুধ খাওয়ালে খাদ্যস্থিত ভিটামিনের অভাব ঘটে এবং অন্ত্রস্থিত ক্ষতি করে না এরূপ ব্যাক্টেরিয়া বিনষ্ট হয়। ফলে রক্ত জমাট বাঁধে না এবং **Hemorragic Syndrome** রোগ সূচিত হয়। ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ বয়সের মধ্যে এই রোগ সূচিত হয়ে থাকে। সুস্থ ও সবল মুরগীগুলো এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ঝুঁটির রং ফ্যাকাশে হয়, পালকসমূহ কুঞ্চিত হয়, রক্ত মিশ্রিত মল বা রক্তাক্ত রঙের মল নির্গত হয়।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

R/-
Menadione ... 5 mg.
(per 0.45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশ খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত পরিমাণে ওষুধটি মিশিয়ে ২ সপ্তাহ যাবৎ খাওয়াতে হবে।

## (ঝ) নায়াসিনের (Niacin) অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** এই ভিটামিনের অভাবে মুরগীর শরীর স্বল্প পালকযুক্ত হয় এবং শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। গাত্রচর্মে এবং পায়ের পাতায় একজিমা সূচিত হয়। মুখে এবং Crop-এ স্ফীতি বা প্রদাহ হতে থাকে।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

R/-
Acid Nicotinic... 8.0 mg.
(per 0.45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত ওষুধটি মিশিয়ে ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ যাবৎ খাওয়ালে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।

## (ঞ) প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** মুখে ও চোখের পাতায় পোস্তদানার মতো ফুস্কুড়ি বা মামড়ি (scad) পড়ে। স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। প্রজনন শক্তি হ্রাস পায়।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

**(১) বাচ্চা মুরগীর জন্য ঃ**

R/-
Acid Pentothenic 5.0 mg.
(per 0.45 kg. of mash)

**(২) ডিমপাড়া মুরগীর জন্য ঃ**

R/-
Acid Pentothenic....2.5 mg.
(per 0.45 kg. of mash)

**(৩) প্রজননের জন্য ব্যবহৃত মোরগ-মুরগীর জন্য ঃ**

R/-
Acid Pentothenic...5.0 mg.
(per 0.45 kg. of mash)

**বি. দ্র.** রোগ না সারা পর্যন্ত খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত হারে পেন্টোথেনিক অ্যাসিড মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

## (ট) কোলিনের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** পিরোসিন (Slipped Tendon) রোগের আক্রমণ, হাড়ের বিচ্যুতি, ডিম উৎপাদন হ্রাস এবং শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

**(১) বাচ্চাদের জন্য ঃ**

R/-
Choline...700 mg.
(per 0.45kg. of mash)

**(২) তরুণ মুরগীর জন্য—**

R/-
Choline...900gm.
(per 0.45 kg. of mash)

প্রতিক্রিয়া না দূর হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাদের ও তরুণ মুরগীদের মেশ খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত পরিমাণ Choline মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। Choline মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ালে পিরোসিস রোগের সম্ভাবনা বিদূরিত হবে।

কিন্তু পিরোসিস রোগ সূচিত হলে নিম্নোক্ত ওষুধটি খাওয়াতে হবে।

R/-
Manganese Sulf...8 ozs.
(per 0.45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশ খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত ওষুধটি মিশ্রিত করে রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত খাওয়াতে হবে।

## (ঠ) ফোলিক অ্যাসিডের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** বাচ্চা উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস (poor hatchability) পায়। ডিম উৎপাদন ও শারীরিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। Slipped Tendon রোগের সূচনা। টার্কীদের এরূপ অবস্থায় ঘাড় শক্ত হয় এবং পক্ষাঘাতের মতো অবস্থা সূচিত হয়।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

**(১) বাচ্চাদের জন্য ঃ**

R/-
Acid Folic ...1.5 mg.
(per 0.45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম খাদ্যের সঙ্গে ১.৫ মিলিগ্রাম পরিমাণ ফোলিক অ্যাসিডের সংযোজন প্রয়োজন। রোগ না সারা পর্যন্ত খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত ফোলিক অ্যাসিড মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত।

**(২) বয়স্ক মুরগীর জন্য ঃ**

R/-
Acid Folic....2.5 mg.

অথবা,

Mixovit Sunshine tab....3 mg.
(per 0.45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশ খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত যে-কোন ওষুধ মিশ্রিত করে রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত খাওয়াতে হবে।

### (ড) ভিটামিন-বী$_{১২}$-এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** পালক বিন্যাস তথা শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বাচ্চা উৎপাদনের ক্ষমতা (hatchability) হ্রাস পায়।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

**বাচ্চা ও বয়স্ক মুরগীর জন্য ঃ**

R/-
Vita $B_{12}$....2mcg. (মাইক্রোগ্রাম)
(Cobalmin)
(per 0.45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশ খাদ্যের সঙ্গে ২ মাইক্রোগ্রাম পরিমাণ উল্লিখিত ওষুধটি মিশ্রিত করে রোগ না সারা পর্যন্ত খাওয়াতে হবে। তাছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে শুটকি মাছ চূর্ণ খাওয়াতে হবে।

### (ঢ) ম্যাঙ্গানিজের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিকার

**লক্ষণ ঃ** এই ভিটামিনের অভাবে Slipped Tendon রোগজনিত প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

R\-
Manganese Sulph...25mg
(per 1 kg. of mash)

প্রতি কেজি মেশ খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত ওষুধটি ২৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় মিশিয়ে রোগ না সারা পর্যন্ত খাওয়াতে হবে।

## প্যারাসাইট জনিত বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার

### সর্বপ্রকার প্যারাসাইটজনিত রোগের প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

অধিকাংশ প্যারাসাইটজনিত রোগ সুষ্ঠু পরিচালন-ব্যবস্থা তথা উত্তম sanitation ব্যবস্থার মাধ্যমে রোধ করা সম্ভব। প্যারাসাইটজনিত রোগাদি নিরোধকল্পে নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহ অবশ্য পালনীয়।

১। বয়স্ক মুরগীদের থেকে পৃথক স্থানে বা ঘরে তরুণ এবং বাচ্চা মুরগীদের পালন করুন। কারণ রোগগ্রস্ত বয়স্ক মুরগীদের দ্বারাই কক্সিডিওসিসের জীবাণু,

গোলকৃমি এবং অন্যান্য ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়াঘটিত রোগ বাচ্চা ও তরুণ মুরগীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে থাকে।

২। উঁচু জমি থেকে প্রবাহিত নর্দমার কাছে বা নিচু জমিতে মুরগীদের বিচরণ করতে দেওয়া উচিত হবে না। নিচু এবং স্যাঁতস্যাঁতে জমিই ব্যাক্টেরিয়া এবং প্যারাসাইটের আবাসস্থল। মুরগীর ঘর এবং বিচরণ ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং শুষ্ক জমিতে হওয়া আবশ্যক।

৩। Insecticide নিয়মিতভাবে স্প্রে করে মশা, মাছি এবং কীট-পতঙ্গাদি নিয়ন্ত্রণ করুন। কারণ মশা-মাছি এবং কীট-পতঙ্গাদি ফিতা কৃমির (tape worm) সঞ্চরণের অন্যতম মাধ্যম। শামুক, আরশোলা, গুবরে পোকা, ছোট গুগলি ইত্যাদিও বিভিন্ন ধরনের প্যারাসাইট বহন করে।

৪। পোলট্রি ফার্মে ব্যবহৃত তক্তা, নেস্ট বা roosts-এর তক্তায় কীটাণু নষ্টকারী carbolineum ব্যবহার করুন। কাঠের তৈরি roost বা nest-এর ওপর ধাতুর পাত লাগান অথবা ধাতুর তৈরি nest বা roost ব্যবহারে লাগান। অন্ধকার স্থানে, বিশেষ করে কাঠের ফাটলই হচ্ছে পোলট্রির লাল ক্ষুদ্র কীটাণুর (mite) আবাসস্থান। অতএব কাঠের তৈরি nests বা roosts মাঝে মাঝেই carbolineum দ্বারা paint করা আবশ্যক।

৫। নতুন আনা মুরগীদের জন্য পুরানো লিটার কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। পুরানো লিটার দিয়ে একমাত্র কমপোস্ট সার তৈরি হতে পারে।

ভূমিশয্যা বা litter হবে পরিষ্কার, শুষ্ক এবং ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি পুরু। বিশেষ করে বাড়ন্ত মুরগীদের জন্য এরূপ লিটার প্রয়োজন।

৬। যে সকল স্থানে মুরগীরা বিচরণ করে—সেই সকল স্থানে পোলট্রির সার ছড়ানো উচিত নয়।

৭। খাদ্য ও পানীয় মল-মূত্রজনিত দূষিতকরণের হাত থেকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য Wire platform যুক্ত খাদ্য ও পানীয় পাত্র ব্যবহার করুন।

৮। মুরগী এবং টার্কীদের একসঙ্গে রাখবেন না।

৯। পূর্বে ব্যবহৃত খাদ্য ও পানীয় পাত্রাদি নতুন করে ব্যবহার করার আগে খাদ্য ও পানীয় পাত্রাদি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করে নিন।

১০। আভ্যন্তরীণ parasite জনিত আক্রমণ সম্বন্ধে পূর্বে নিশ্চিত হয়ে—যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

## বিভিন্ন প্যারাসাইটজনিত রোগের চিকিৎসা

[ গোলকৃমি এবং ফিতা কৃমি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ প্যারাসাইটদের মধ্যে বিশেষ মারাত্মক। উকুন (lice), টিক্ (ticks) এবং মাইট (mites) হচ্ছে বাহ্যিক প্যারাসাইটদের মধ্যে বিশেষ মারাত্মক ]

# আভ্যন্তরীণ প্যারাসাইট

## (ক) গোলকৃমি (Round Worms)

এই আভ্যন্তরীণ কৃমি কীটসমূহ আক্রান্ত মুরগীর ক্ষুদ্রান্ত্রে (small intestine) বাস করে এবং মলমূত্রের সঙ্গে ঐ কৃমির ডিম্বাণু বাইরে বেরিয়ে আসে। মুরগী বা বাচ্চা মুরগী ঐ ডিম্বাণু খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে খেয়ে ফেলার পর ঐ সকল মুরগী বা বাচ্চা মুরগীর অন্ত্রমধ্যে ২ মাসের মধ্যে প্রবর্ধিত হয়ে ঐ ডিম্বাণু পূর্ণাঙ্গ কৃমি কীটে রূপান্তরিত হয়।

### গোলকৃমির জীবন-চক্র
### (Life cycle of Round Worm)
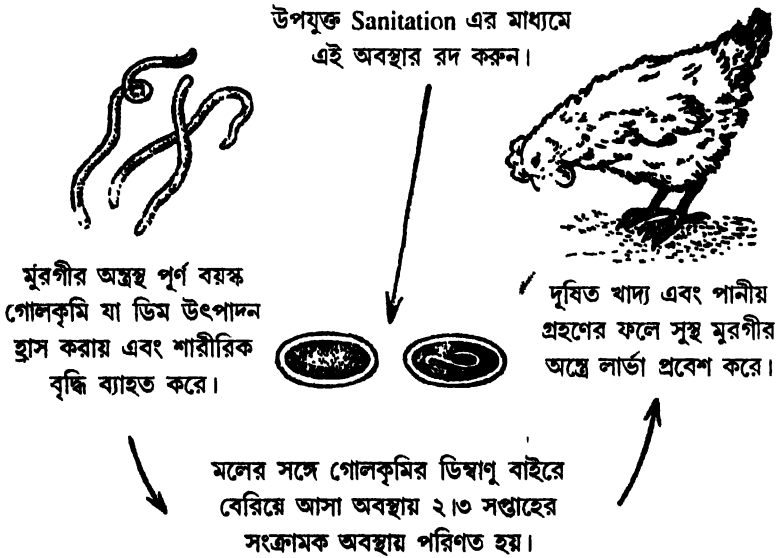
গোলক্রিমির জীবন-চক্র

**লক্ষণ ঃ** বিশেষভাবে আক্রান্ত হলে মুরগীর বাচ্চারা অস্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করে, মাঝে মাঝে চমকায়, ঝিমুনিভাব যুক্ত হয়, ঝুঁটি এবং গলার ফুল বিবর্ণ বা ফ্যাকাসে হয়। ক্ষুধা হ্রাস পায়, কৃশ হয়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ডিমপাড়া মুরগীদের ডিমপাড়া বন্ধ হয়ে যায়, অন্ত্রমধ্যস্থ হজমিকৃত খাদ্যের সারাংশ বড় গোলকৃমিরাই খেয়ে ফেলে। ফলে শারীরিক বৃদ্ধি তথা ডিম উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যাদি খাওয়াতে হয়। দৌর্বল্য, বারবার পাতলা বাহ্য ইত্যাদি সূচিত হয়।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

**(১) বাচ্চা বা তরুণ মুরগীর জন্য ঃ**

R/-
Phenothiazine....28.25 gm.
(in one feeding per 100 young chickens
weighing about 1.5 kgs.)

প্রায় দেড় কেজি দৈহিক ওজনযুক্ত ১০০টি বাচ্চা বা তরুণ মুরগীদের খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে ১ দিন মাত্র খাওয়াতে হবে।

**(২) বয়স্ক মুরগীর জন্য ঃ**

R/-
Phenothiazine. ...28.25 gm.
(in one feeding per 60 birds)

৬০টি বয়স্ক মুরগীব খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত পরিমাণ ওষুধ মিশিয়ে ১ দিন মাত্র খাওয়াতে হবে।

অথবা,

বাচ্চা তথা বয়স্ক সকল মুরগীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ওষুধটি বিশেষ ফলপ্রদ।

R/-
Pulv. Piperazine Citrate. 0.5 gm.
Aqua dist. water ... ... 2 liters
(Mft. haust)

উল্লিখিত ওষুধটি জলের সঙ্গে মিশিয়ে কেবলমাত্র ১ দিন খাওয়াতে হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

উত্তম Sanitation তথা সুষ্ঠু পরিচালন-ব্যবস্থা রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক। ঘর এবং ঘরের সকল সরঞ্জামাদি মাঝে মাঝে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার তথা বিশোধন করুন।

পূর্বে উল্লিখিত প্যারাসাইট প্রতিষেধক নির্দেশ পালন করুন এবং বর্ষাকাল শুরু হওয়ার ১ মাস আগে ফার্মের সকল মুরগীকে পাইপারেজিন খাওয়ান।

## (খ) ফিতা কৃমি (Tape Worms)

ফিতা কৃমি হচ্ছে অনেকটা সমতল ধরনের (flat) কৃমি কীট। এই কৃমিসমূহ আক্রান্ত মুরগীদের ক্ষুদ্রান্ত্রের ওপরের অংশে বাস করে। গোলকৃমি এবং cecal কৃমি অপেক্ষা এই কৃমি স্বতন্ত্র ধরনের। এদের জীবনচক্র (life cycle) স্বতন্ত্র। শামুক, মাছি, গুবরে পোকা, পিঁপড়ে প্রভৃতির মধ্যে এই কৃমিকীটের ডিম্বাণু বিদ্যমান থাকে। মুরগীরা ঐ সব কীট-পতঙ্গ (অর্থাৎ এক্ষেত্রে intermediate host) খেয়ে

থাকে। ফলে মুরগীর দেহের অভ্যন্তরে অর্থাৎ অন্ত্রে ঐ কৃমিকীটসমূহ ডিম পাড়ে। ঐ ডিম্বাণু মলের সঙ্গে নিঃসরিত হয় এবং কীট-পতঙ্গের মাধ্যমে কিছু অংশে প্রবর্ধিত হয়ে পুনরায় মুরগীর অন্ত্রে (অর্থাৎ কীট-পতঙ্গাদি খাওয়ার পরে) প্রবেশ করে এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।

**লক্ষণ ঃ** বিশেষভাবে আক্রান্ত মুরগীর হাবভাব অস্বাভাবিক হয়, ওজন হ্রাস পায়, বারংবার পাতলা বাহ্য হয়, ডিম উৎপাদন হ্রাস পায়, ক্ষুধা একেবারেই থাকে না, এবং ক্রমশ কৃশ হতে থাকে।

## ফিতা কৃমির জীবন-চক্র
## (Life cycle of Tape Worm)
## চিকিৎসা-ব্যবস্থা
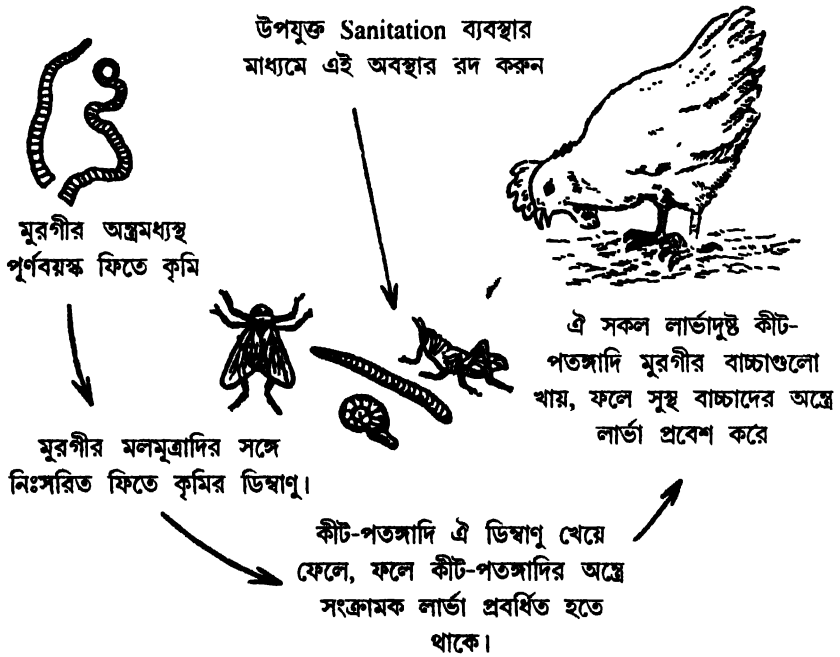
ফিতা কৃমির জীবন-চক্র

(১)

R/-
Dicestal...15gm. Aqua dist. water.....4 liters
(Mft. sol.)

জলের সঙ্গে মিশিয়ে উল্লিখিত ওষুধটি গুলে নিয়ে ১ দিন মাত্র খাওয়াতে হবে।

অথবা,

Di-chlorofine....250 mg.
(each bird weighing about 1 kg.)

প্রায় ১ কেজি ওজনযুক্ত প্রতিটি রোগগ্রস্ত মুরগীকে ২৫০ মিলিগ্রাম উল্লিখিত ওষুধটি ১ দিন অথবা ২ দিন খাওয়াতে হবে।

অথবা

R/-
Ol. lespentine...2 drops
Ol. olive ...½ sp.
(Mft. haust)

½ চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ২ ফোঁটা পরিমাণ তার্পিন তেল মিশিয়ে প্রতিটি রোগগ্রস্ত মুরগীকে একবার মাত্র খাওয়ালে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।

**বিশেষ নির্দেশ ঃ** তবে তার্পিন তেল খাওয়াবার আগের দিন মুরগীকে জোলাপ দিতে হবে (½ চামচ Mag. Sulph. পরিমাণমতো জলে মিশিয়ে নিয়ে); এবং তার্পিন তেল খাওয়াবার ৪ ঘণ্টা পরে মুরগীকে পুনরায় জোলাপ খাওয়াতে হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

মাঝে মাঝে Insecticide স্প্রে করে মশা-মাছি ও কীট-পতঙ্গাদি বিনষ্ট করুন। এবং পূর্বে উল্লিখিত parasite প্রতিষেধক নির্দেশাদি পালন করুন।

## (গ) গলার কৃমি (Gape Worms)

আক্রান্ত মুরগীর কণ্ঠনালী এবং ফুসফুসে (Trachea and lungs) এই কৃমি বাস করে এই কৃমি-কীটের ডিম্বাণু মলের সঙ্গে মাটিতে পড়ে, ঐ ডিম্বাণু কেঁচো খেয়ে ফেলে, কেঁচোর পেটের অভ্যন্তরে ঐ ডিম্বাণু লার্ভায় রূপান্তরিত হয়—সুস্থ মুরগী বা বাচ্চা মুরগী ঐ কেঁচো খেলে, গেপ কৃমি মুরগী বা বাচ্চা মুরগীর কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করে এবং প্রবর্ধিত হয়। এই কৃমির আকার y অক্ষরের মতো। অবশ্য কেঁচোর মাধ্যম ব্যতীতও সুস্থ মুরগী দোষযুক্ত খাদ্য ও পানীয় খাওয়ায় গেপ কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** হাঁচতে থাকে, শ্বাস টানতে কষ্ট হয়, নিউমোনিয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়, মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলে বাচ্চা মুরগী দম বন্ধ হয়েও মারা যেতে পারে। অনেক সংখ্যক মুরগীর বাচ্চা রোগগ্রস্ত হলে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেতে পারে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

R/-
Barium antimonyl tart.....0.5 mg.
Aqua dist. water .... 4 liters
(Mft. sol.)

৪ লিটার পরিমাণ জলে উল্লিখিত ওষুধটি মিশ্রিত করে ২।৩ দিন খাওয়াতে হবে।

### প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

মুরগীদের ঘরে আবদ্ধ রেখে পালন করুন। তারের তৈরি খাঁচার মধ্যে পালন করলে এই ধরনের কৃমি রোগ হয় না। যদি মুরগীদের বাইরে বিচরণ করতে দেন তবে বিচরণ ক্ষেত্রটি বালুকাময় হওয়া বাঞ্ছনীয়। পূর্বে উল্লিখিত parasite প্রতিষেধক নির্দেশটি পালন করুন।

## (ঘ) আন্ত্রিক বিবরের কৃমি (Capillaria or Hair Worms)

এই ধরনের কৃমি-কীটসমূহ অন্ত্রের মধ্যে গর্ত করে সেই গর্তের মধ্যে বাস করে। আকারে চুলের মতো সরু, ½ ইঞ্চি লম্বা। রোগগ্রস্ত মুরগীর বিষ্ঠার মাধ্যমে এই কৃমি-কীটের ডিম্বাণু বাইরে নির্গত হয়, এবং দীর্ঘদিন বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। দূষিত খাদ্য তথা পানীয়ের মাধ্যমে (বিশেষ করে পুরানো ভূমিশয্যা বা litter ব্যবহার করা হলে) এই কীটাণু সুস্থ মুরগীর দেহে প্রবেশ করতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** এই রোগ হলে মুরগী ক্রমশ কৃশ (emaciation) হতে থাকে। এ ছাড়া মুরগীর উদরাময়, দুর্বলতা ও রক্তাল্পতা দেখা যায়।

### চিকিৎসার-ব্যবস্থা

R/-
Carbon tetrachloride...0.5 gm.
Aqua dist. water... 1 liter.
(Mft. sol.)

এক লিটার জলে উল্লিখিত পরিমাণ ওষুধটি গুলে নিয়ে খাওয়াতে হবে। ১ দিন বা ২ দিন খাওয়ালেই কৃমি বিনষ্ট হবে।

## (ঙ) আন্ত্রিকনালীর কৃমি (Cecal Worms)

এই কৃমি-কীটসমূহ আক্রান্ত মুরগীর অন্ত্রের ভাঁজের মধ্যে অবস্থান করে। গোলকৃমির ন্যায় এই কৃমি ½ থেকে ¾ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। আক্রান্ত মুরগীর মলের সঙ্গে এই কৃমি-কীটের ডিম্বাণু নির্গত হয়, কেঁচো সেই ডিম্বাণু খায়, ফলে কেঁচোর দেহমধ্যে ডিম্বাণু লার্ভায় পরিণত হয়। সুস্থ মুরগী ঐ কেঁচো খাওয়ার ফলে আক্রান্ত হয়।

**লক্ষণ ঃ** Ceca প্রবর্ধিত এবং প্রদাহিত হয়। টার্কীর ক্ষেত্রে এই কৃমি Blackhead সূচিত করে।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

(১) R/-
Phenothiazine .....0.5 gm.
(per 0.45 kg. of mash)

প্রতি ৪৫০ গ্রাম মেশ খাদ্যের সঙ্গে উল্লিখিত ঔষধটি ১ দিন খাওয়ালেই কৃমি বিনষ্ট হয়।

অথবা,

(২) R/-
Pulv Aniseed 2 gm.
Pulv. Cincona 2 gm.
Pulv. Coriander 2 gm.
Pulv. Ajwan 4 gm.
Pulv. Chiretta 4 gm.
Ferriet ammon citritis 1 gm.

উল্লিখিত চূর্ণাদি একত্রে মিশিয়ে ১ কিলোগ্রাম মেশ খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে ১ দিন বা ২ দিন খাওয়ালে কৃমি-কীট বিনষ্ট হবে।

## বাহ্যিক প্যারাসাইটের দ্বারা সংঘটিত রোগ এবং প্রতিকার

### (ক) উকুন (Lice)

সাতপ্রকার উকুন বা Lice বিদ্যমান। উকুনসমূহ মাথায়, ডানায়, পালকের গোড়ায়, এবং গায়েব ছালে বাস করে এবং রক্ত শোষণ করে।

**লক্ষণ** ঃ এই রোগ হলে মুরগী বিরক্তি বোধ করে, ঠোঁট দিয়ে বারবার পালক খোঁটে। ওজন হ্রাস পায়। বিশেষভাবে আক্রান্ত হলে ডিম উৎপাদন হ্রাস পায় এবং স্বাভাবিক রোগ-প্রতিষেধক শক্তি কমে যায়। হাবভাব অস্বাভাবিক হয়, বারবার পালক খোঁটার ফলে পালকসমূহ কুঞ্চিত দৃষ্ট হয়।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

(১)

R/-
Sodium Fluoride....50 gm.
Ash (wood) ........100 gm.
(Pulv. one : Dust the affected parts of the birds)

উল্লিখিত পরিমাণ ছাইয়ের সঙ্গে ৫০ গ্রাম পরিমাণ সোডিয়াম ফ্লুরাইড মিশিয়ে Puff-এর সাহায্যে আক্রান্ত মুরগীর মাথা, পালকের গোড়া, লেজ ও মলদ্বারের চারপাশে আস্তে আস্তে বুলিয়ে ঝেড়ে ফেলুন। ওষুধটি যাতে মুরগীর চোখে বা মুখের ভেতরে না যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখুন।

দিনে ১ বার করে ৩ দিন এই মিশ্রিত পাউডারটি লাগালেই উকুন বিনষ্ট হবে।
অথবা,

R/-
Gammexane (1%)....10%
Ash .....90%
(Pulv. one : Dust the affected parts of the birds.)

ন্যাকড়ার সাহায্যে উল্লিখিত মিশ্রণটি মুরগীর গায়ের উকুন-উপদ্রুত অঞ্চলে এবং মলদ্বারের চারপাশে দিনে ১ বার করে ৩ দিন লাগালেই গায়ের উকুন সমূহ বিনষ্ট হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

(১) **Spray house and equipments with :**

Malathion concentrate (50%) ...1%
Water .... 49%

শতকরা ৫০ ম্যালাথিয়ন কনসেনট্রেট—১ ভাগের সঙ্গে ৪৯ ভাগ জল মিশিয়ে মুরগীর ঘরে এবং সাজসরঞ্জামে এবং ভূমিশয্যায় spray করুন। তবে এই ওষুধটি spray করার পূর্বে মুরগীদের এবং জলপাত্র তথা খাদ্যপাত্রাদি ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

(২) **Use nicotine-sulfate roost paint:**

Roosts সমূহ নিকোটিন সালফেট রুস্ট পেইণ্টের দ্বারা রং করুন।
Nicotine sulf....4%
Lindane sol. 1/4%

৪% নিকোটিন সালফেটের সঙ্গে ১/৪ পারসেণ্ট লিনডেন সলিউশান মিশিয়ে roost সমূহ paint করলে roosts-এর উকুন বিনষ্ট হবে।
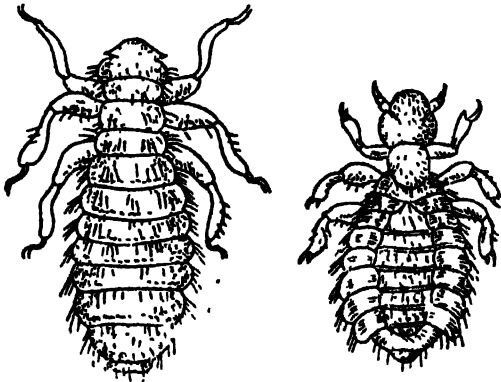
মাথার ও গায়ের উকুন (lice) বড় করে দেখানো হয়েছে

(৩) সূক্ষ্ম জালের দ্বারা মুরগীর ঘরের জানালাসমূহ ঘিরে দিন।

## (খ) লাল মাইট বা রুস্ট মাইট
## (Red Mite or Roost Mite)

অতি ক্ষুদ্র ছারপোকা জাতীয় এই কীটাণুসমূহ দিনের বেলা nest বা roost-এর অন্ধকারস্থানে বা কাঠের ফাটলে বা দেওয়ালের ফাটলে লুকিয়ে থাকে। রাত্রিবেলা বেরিয়ে এসে মুরগীর গায়ের রক্ত খায়। এই ধরনের mite-এর স্বাভাবিক রং ফ্যাকাসে, কিন্তু রক্ত পানের পর এরা লালবর্ণ ধারণ করে। মাইটগুলো যেখানে লুকিয়ে থাকে—সেই লুকনো জায়গার আশেপাশে কালো-সাদা ছোট ছোট ফুটকির ন্যায় দেখা যায়। ঐ ফুটকিসমূহ হচ্ছে—লাল মাইটের মল বিশেষ। অতএব ঐ ফুটকিসমূহ দেখে লাল মাইটেব দিনের বেলার আস্তানা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

**লক্ষণ :** আক্রান্ত মুরগী বিরক্ত বোধ করে, বক্ত হ্রাস পাওয়ার ফলে রক্তাল্পতা সৃষ্টি হয়, ঝিমোয়, ওজন হ্রাস পায় এবং ডিম উৎপাদন কমে যায়।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

R/-
Gammexane. .5%
Ash.. .....95%
(Pu/v one · Dust the affected parts of the birds before sunset)

আক্রান্ত মুরগীদের সূর্যাস্তেব কিছু আগে উল্লিখিত মিশ্রণটি গায়ে মাখাবেন। ২ দিন গাযে মাখালেই চলবে এবং নিম্নলিখিত প্রতিষেধক-ব্যবস্থা গ্রহণ করলে লাল মাইট অবশ্যই ধ্বংস কবা সম্ভব হবে। যেহেতু লাল মাইট সমূহ দিনের বেলা
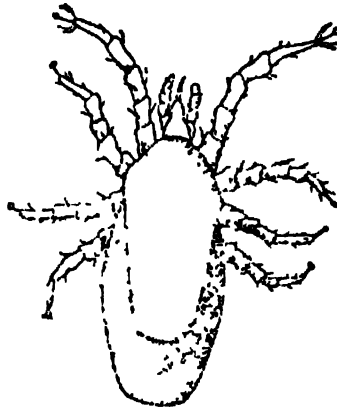
লাল মাইট বা রুস্ট মাইট
দিনেব. বেলা এই মাইটগুলো roosts এবং মুবগীব ঘরের ফাটলে বা গর্তে বা অন্ধকার স্থানে লুকিযে থাকে।

nest বা roosts-এর অন্ধকারস্থানে বা ফাটলে বাস করে, বা ঘরের দেওয়ালের ফাটলে বাস করে। সেই কারণে লাল মাইট নিবারণের জন্য প্রতিষেধক-ব্যবস্থার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা বাঞ্ছনীয়।

### প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

(১) **Paint the roosts with :**

Nicotine Sulphate (4%) ... 1 oz.
(per 10 ft. of roost space)

তুলি দ্বারা বা ব্রাশ দ্বারা roost-এ নিকোটিন সালফেট লাগান। রবার রাব্রের ড্রপারের সাহায্যে roost-এর nest -এর ফাটলে নিকোটিন সালফেট প্রবেশ করান সপ্তাহে ১ বার, কেবলমাত্র ২ বার লাগান।

(২) **Paint the roosts with carbolineum :**

পিচকারীর সাহায্যে দাঁড়ে (roosts) carbolineum spray করুন বা তুলির সাহায্যে paint করুন। সপ্তাহে ১ বার করে, কেবলমাত্র ২ বাব লাগালেই চলবে।

## (গ) ধূসর মাইট বা পালকের মাইট
## (Gray Mite or Feather Mite)

এই মাইট পোকা সর্বদা মুরগীব দেহের সঙ্গেই থাকে। Vent-এব নিম্নস্থ পালকের গোড়ায়, লেজের চারপাশের পালকের গোড়ায এবং ঘাড়ের পালকের গোড়ায় এই ধরনের মাইট অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। চড়ুই পাখির দ্বাবা এই ধরনেব Mite মুরগীর পালে সঞ্চারিত হতে পারে।
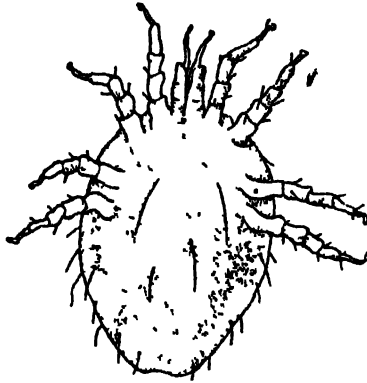
ধূসব মাইট বা পালকের মাইট

**লক্ষণ ঃ** আক্রান্ত মুরগী বিরক্তি বোধ করে। রক্ত হ্রাস পায়। চামড়ার ওপর মামড়ি পড়ে। ডিম উৎপাদন হ্রাস পায় এবং শারীরিক অবস্থাব অবনতি ঘটে।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

(১) R/-

Lindane emulsion (20%) ...1 quart.
Water ...1 gallon
(Mft. emulsion for external use only)
(Spray the affected birds or dip in momentarily).

পিচকারীর সাহায্যে উল্লিখিত জলমিশ্রিত emulsion-টি আক্রান্ত মুরগীর গায়ের মাইট-অধ্যুষিত অঞ্চলে স্প্রে করুন অথবা এক মুহূর্তের জন্য আক্রান্ত মুরগীটির দেহ ঐ emulsion-এ ডুবিয়ে নিন। সপ্তাহে ১ বার করে, কেবলমাত্র ৩ বার স্প্রে করলে বা emulsion মিশ্রিত জলে ডুবিয়ে নিলে উপকার পাওয়া যাবে।

(২)

R/-
Sodium fluoride ..... 10 gm.
Ash ..... 90 gm.
(Dust the affected parts of the birds once in a week)

উল্লিখিত মিশ্রণটি আক্রান্ত মুরগীর লেজের গোড়ায়, ঘাড়ে এবং vent-এর চারপাশে এবং শরীরের মাইট-অধ্যুষিত অঞ্চলে সপ্তাহে ১ বার করে লাগান, ৩ বার লাগালেই উপকার পাওয়া যাবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

(১) **Spray roosts, nests and walls of the house with :**

Sulphenone dusts ...10%
Lindane emulsion ...10%
Motor oil
or ...80%
Kerosine oil
(Mist one : for external spraying)

মোটর অয়েল বা কেরোসিন তেল মিশ্রিত উল্লিখিত insecticides মুরগীর ঘরের দেওয়ালে, nest এবং roosts সমূহে অন্ততঃ মাসে ১ বার করে স্প্রে করতে হবে।

(২) মুরগীর ঘরে যাতে চড়ুই পাখি না ঢুকতে পারে—সেইজন্য জানালা এবং ventilatorসমূহ তার দিয়ে ঘিরতে হবে।

## (ঘ) পালক ধ্বংসকারী মাইট
## (Depluming Mite)

এই মাইটসমূহ মুরগীর পালকের গোড়ায় বাসা করে।

**লক্ষণ ঃ** আক্রান্ত মুরগী বিরক্তি বোধ করে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নিজেই পালক ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে তুলে ফেলে। পালক অস্বাভাবিকভাবে উঠে যাওয়ার ফলে মুরগীকে কুৎসিত দেখায়।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

R/-
Flowers of sulphur....20%
Petrolatum .......80%
(Mist one : apply to the affected parts.)

মুরগীর দেহের পালক-বিধ্বংসী মাইট-অধ্যুষিত অঞ্চলে উল্লিখিত মিশ্রণটি সপ্তাহে ২ বার করে লাগাতে হবে। কেবলমাত্র ৪ বার লাগালেই বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে।

অথবা,

R/-
Sulphur .... 5 gm.
Vaseline ... 30 gm.
(Mft. Ointment : For external use only)

গন্ধক ও ভেসলিন দ্বারা মলম প্রস্তুত করে মুরগীর গায়ের পালকের গোড়ায় তুলি দিয়ে কেবলমাত্র ২ বার (৩ দিন অন্তর) লাগালেই চলবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

(১) উত্তম sanitation-ব্যবস্থা এবং nests সমূহ নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

**(২) Use D. D. T. with lindane as spray.**

ঘরের দেওয়াল, roosts এবং nestsসমূহ উল্লিখিত insecticide দ্বারা spray করুন। অন্তত ২ বার, mite-এর উপদ্রব হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত।

## (ঙ) স্কেলি লেগ মাইট
## (Scaly Leg Mite)

এই ধরনের মাইট পোকা মুরগীর পায়ে বাসা বাঁধে এবং পায়ের ছালকে মাছের আঁশের মতো আঁশে রূপান্তরিত করে। এই অবস্থাকে আঁশ পা বা Scaly Leg আখ্যা হয়ে থাকে।
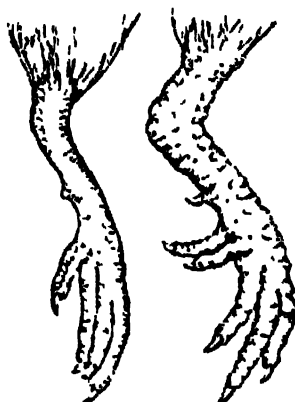
সুস্থ পা আঁশযুক্ত পা

**লক্ষণ ঃ** আঁশের মতো মামড়ি পড়ে পা ঢেকে যায়। মামড়ি পড়ার কারণ—মাইট পোকা পায়ে বাসা বাঁধায়—উত্তেজনা জনিত কারণে রস পড়ে—ঐ রস

বিশুদ্ধ হবার পর মামড়িতে পরিণত হয়। পা ফুলে যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে খঞ্জভাব (lameness) সূচিত হয়।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

(১)

R/-
Motor oit ......50%
Kerosene oil .... 50%
(Mft sol : Dip the shanks of the
affected birds momentarily.)

মোটর অয়েল এবং কেরোসিন একত্রে একটা গামলায় মিশিয়ে—আক্রান্ত মুরগীর পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য ডুবিয়ে তুলতে হবে। এভাবে ২ দিন অন্তর অন্তর ৩ বার ডোবাতে হবে।

অথবা,

(২)

R/-
Oil Kerosene .... ..10%
Oil Linseed (Raw) 20%
(Mft. sol. : Dip the shanks of the
affected birds—T.D.S.)

কেরোসিন তেল ১ ভাগ, কাঁচা তিসির তেল ২ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করে—১ দিনেই (৩ ঘণ্টা অন্তর) ৩ বার আক্রান্ত মুরগীর পা (হাঁটু থেকে পায়ের পাতা) কিছুক্ষণের জন্য ডুবিয়ে রাখতে হবে।

## প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

এই ধরনের রোগযুক্ত মুরগীকে পাল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। পালের সকল সুস্থ মুরগীর পা কেরোসিন বা মোটর অয়েলে মুহূর্তের জন্য ডুবিয়ে তুলে নিতে হবে। আক্রান্ত মুরগীকে পৃথক রেখে চিকিৎসা করতে হবে—যদি ওষুধ প্রয়োগেও mite পোকা ধ্বংস করা সম্ভব না হয় তবে আক্রান্ত মুরগীটিকে হত্যা করাই সঙ্গত হবে। তবে আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে কেরোসিন মিশ্রিত জলে পা ডুবিয়ে রাখলে সচরাচর এই পোকা বিনষ্ট হয়ে থাকে। অবস্থা গুরুতর হলে ওষুধের দ্বারা কোন কাজ হয় না।

## (চ) এঁটুলে পোকা
## (Ticks (Argus persicus)

এই পোকা দেখতে ক্ষুদ্র বাদামের মতো রং কালো বা তামাটে। আকারে উকুন অপেক্ষা কিছু বড়। এরা ছারপোকার মতো দিনের বেলা ঘরের দেওয়ালের ফাটলে,

Roost বা nests-এর তক্তার ফাঁকে লুকিয়ে থাকে রাতের বেলা বেরিয়ে মুরগীদের রক্ত চুষে খায়। এই পোকা কিছু না খেয়েও ২।৩ বছর বেঁচে থাকতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এই পোকার উপদ্রব নেই বললেই চলে। উত্তর প্রদেশে, মধ্য প্রদেশে এই পোকার উপদ্রব গ্রীষ্মকালে হয়।

**লক্ষণ ঃ** মুরগীর গায়ে এই ধরনের পোকা লাগলে মুরগী পালক খুঁটতে থাকে এবং সর্বদা অস্বস্তি বোধ করে। এই পোকার কারণে রক্তহীনতা এবং টিক্ জ্বর (Tick Fever, Spirochetosis) সূচিত হয়ে থাকে।

## চিকিৎসা-ব্যবস্থা

(১)

R/-
Gammexane (5%) powder

অথবা,

Flowers of Sulphur Dust
(Dust all the affected and unaffected parts of the birds thrice in a week.)

সপ্তাহে ৩ বার করে রোগগ্রস্ত এবং দলের সুস্থ মুরগীর শরীরে এই পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে গা পরিষ্কার করুন।

(২) পুরানো ভূমি-শয্যা (old litters) পুড়িয়ে ফেলুন।

(৩) Roosts এবং nests সমুহ কার্বোলিনিয়াম দ্বারা পেইন্ট করুন।

(৪) ঘরের চারপাশের দেওয়ালে insecticide স্প্রে করুন।
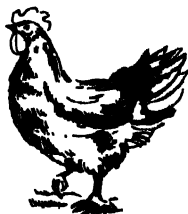
## পোলট্রি ফার্মের মূলধন সমস্যা ও ব্যাঙ্ক-ঋণ

প্রবল ইচ্ছা, কর্মশক্তি এবং পোলট্রি ফার্ম পরিচালন জনিত কার্যকরী অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে অনেকের পক্ষেই পোলট্রি ফার্ম স্থাপন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

তবে আশার কথা এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়্যারি অ্যাণ্ড পোলট্রি ডেভালপমেন্ট কর্পোরেশন গঠন করেছেন ঐ কর্পোরেশন থেকে বর্তমানে পোলট্রি ফার্মের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা কবা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন জেলায় জেলায় সরকার কর্তৃক Intensive Poultry Development Projects গঠিত হওয়ায় পোলট্রি ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সাহায্য বর্তমানে লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে।

### ব্যাঙ্ক-ঋণ

ভারত সরকারের পরামর্শক্রমে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকেও পোলট্রি ফার্মের প্রতিষ্ঠা তথা সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপকভাবে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ব্যাঙ্ক-সমূহের ঋণদানের নিয়ম ও সর্ত না জানা থাকায় অনেকের পক্ষে সেই সুযোগ লওয়া সম্ভবপর হয় না।

### (ক) ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা

(১) প্রস্তাবিত কারবারটি লাভজনক হওয়া চাই, আঞ্চলিক Project অফিসারের এসম্পর্কে যথোপযুক্ত সুপারিশ থাকা দরকার।

(২) পোলট্রি ফার্মকে ৫ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করার সর্তে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে ৫ বছরের ৫টি বার্ষিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণকে প্রস্তাবিত বা বর্তমান পোলট্রি ফার্মের বিবরণ, প্রয়োজনীয় মূলধন তথা ৫ বছরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হবে।

(৩) ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যে টাকা ঋণ গ্রহণ করবেন, সেই টাকার অঙ্ক ৩০০০ টাকার বেশি হওয়া দরকার। চালাঘর বা ঘর তৈরি, সরঞ্জাম কেনা, মুরগীর বাচ্চা কেনা, স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধন জনিত খাতে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পাওয়া যাবে।

১ দিনের বাচ্চা কিনে ৬ মাস পালন করে সেই বাচ্চাদের ডিমপাড়ার উপযোগী করে তোলার বাবদও ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পাওয়া যাবে। তাছাড়া পরিচালনার জন্য কার্যকরী মূলধনও ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

পোলট্রির জন্য ব্যাঙ্ক খুব কম সুদে টাকা ধার দিয়ে থাকে। শতকরা সুদের হার ৫ টাকা মাত্র। প্রস্তাবিত বা বর্তমানে পোলট্রি ফার্মের জন্য (স্থায়ী ও চলতি) বা সম্প্রসারণের জন্য মোট কত দরকার তা বিবেচনার পর ব্যাঙ্ক তখন ঋণ মঞ্জুর করে থাকে।

(৪) বাড়ি বা জমি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক পোলট্রি ফার্মের জন্য টাকা ধার দিয়ে থাকে। যে টাকা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নেওয়া হবে ভূ-সম্পত্তি মূল্য তার দ্বিগুণ হওয়া আবশ্যক। এবং সেই ভূ-সম্পত্তি দায়মুক্ত হওয়া আবশ্যক। ভূ-সম্পত্তির যথার্থ মূল্যায়ন যোগ্য ভ্যালুয়ারকে দিয়ে করাতে হবে। তাছাড়া ভূ-সম্পত্তি দায়মুক্ত কিনা এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের (Searching) খরচও ঋণ-গ্রহীতাকেই বহন করতে হবে।

তবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পোলট্রি ফার্মের জন্য ঋণ নেওয়ার সুবিধা এই যে— বার্ষিক সুদের হার কম, অন্যস্থান থেকে অনুরূপ টাকা ঋণ নিতে হলে বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা অথবা ততোধিক হারে সুদ দিতে হবে।

## ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণদানের ব্যাপারে আরোপিত সর্তসমূহ

(১) প্রস্তাবিত পোলট্রি ফার্মের পরিকল্পনা আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হবে। উদ্যোগটি যে লাভজনক হবে সেই সম্পর্কে আঞ্চলিক Project Officer বা অপর কোন সরকারী বিশেষজ্ঞের সার্টিফিকেট থাকা প্রয়োজন। সম্প্রসারণের ব্যাপারে ঋণ গ্রহণ করতে হলেও সম্প্রসারণটি কিরূপ লাভজনক হবে তার হিসাব দাখিল করতে হবে। এবং এই ক্ষেত্রেও সরকারী বিশেষজ্ঞের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে।

(২) প্রস্তাবিত বা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যযুক্ত পোলট্রি ফার্মটি ঋণদাতা ব্যাঙ্কের কোন-না-কোন শাখার নিকটবর্তী হওয়া আবশ্যক।

(৩) পোলট্রি ফার্মের Progressive Report ৬ মাস অন্তর ঋণদাতা ব্যাঙ্কের নিকট পাঠানো বাধ্যতামূলক।

(৪) আগুন বা চুল্লির জন্য পোলট্রি ফার্মটি ইনসিওর করা বাধ্যতামূলক। ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়ামও ঋণগ্রহীতাকে দিতে হবে।

ঋণদাতা ব্যাঙ্ক ঋণপ্রার্থী বা প্রার্থীদের নিকট সচরাচর নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ জানতে চায়।

(ক) প্রার্থীর আর্থিক অবস্থা এবং ইনকাম-ট্যাক্স এসেসমেন্ট ও ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট; সমিতি হলে পূর্বের ৩ বছরের অডিট রিপোর্ট; নূতন সমিতি হলে— সমিতিটি রেজিস্ট্রীকৃত কিনা এবং শেয়ারের বিবরণ।

(খ) প্রার্থী বা প্রার্থীদের পোলট্রি পরিচালন সম্বন্ধে কার্যকরী অভিজ্ঞতা আছে কিনা, অথবা নিযুক্ত কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা আছে কিনা।

(গ) পোলট্রি ফার্মের পরিকল্পনা অনুসারে মোট প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ এবং প্রার্থিত ঋণের পরিমাণ; সম্প্রসারণ জনিত মোট ব্যয় এবং প্রার্থিত ঋণের পরিমাণ এবং চালু ফার্মের আয়-ব্যয়ের হিসাব; এসেটের টাকার অঙ্কের পরিমাণ।

(ঘ) স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি যা ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা হবে তা দায়মুক্ত কিনা।

(ঙ) ডিম, মুরগী এবং মাংস বিক্রয়ের সুবিধা আছে কিনা।

## পোলট্রি ফার্মের বিভিন্ন ঘর এবং সরঞ্জামের হিসাব

**১। এক বা একাধিক চালা ঘর ঃ**

প্রতি বর্গ ফুট জমি প্রতি চালা নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ঃ ৪ টাকা।

**২। অন্যান্য সরঞ্জাম ঃ**

**(ক) ৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য ঃ**

খাদ্যপাত্র—প্রতিটি খাদ্যপাত্রের আনুমানিক দাম ঃ ১.৫০ টাকা।

জলপাত্র (Water Founts) ঃ প্রতি ১০টি বাচ্চার জন্য ১টি করে জল পাত্র ঃ প্রতিটি জলপাত্রের আনুমানিক দাম ঃ ৩.৫০ টাকা।

**(খ) বয়স্ক মুরগীদের জন্য খাদ্যপাত্র ঃ**

প্রতি ১০০টি মুরগীর জন্য ৬ ফুট মাপের ৬টি খাদ্যপাত্র ঃ

প্রতিটি খাদ্যপাত্রের আনুমানিক দাম ঃ ৫.০০ টাকা।

জলের পাত্র প্রতিটির আনুমানিক দাম ঃ ৪.০০ টাকা।

**(গ) ব্রুডার যন্ত্র ঃ**

বয়স্ক বাচ্চাদের অতিরিক্ত তাপ সঞ্চারের বাক্স। প্রতি ১০০টি বাচ্চার জন্য ২টি বাক্স প্রয়োজন। প্রতিটি বাক্সের আনুমানিক দাম ঃ ৫০.০০ টাকা।

(ঘ) ১ দিনের বাচ্চা কিনে পালন করলে ইনকিউবেটার যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পোলট্রি ফার্মে যদি ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা উৎপাদন করা হয়, তবে ইনকিউবেটার যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

১টি বড় ইনকিউবেটার যন্ত্রের আনুমানিক দাম ঃ ২,৫০০ টাকা।

**(ঙ) ডিম পাড়ার নেস্ট ঃ** প্রতি ৫টি মুরগীর জন্য ১টি করে ডিমপাড়ার নেস্ট প্রয়োজন। ৬ ফুট লম্বা বাক্সের ভেতরে পাশাপাশি পার্টিশান দিয়ে Nest তৈরি করা চলে। এবং তাতে ব্যয় সামান্য হয়। কিন্তু প্রতি rollway type বা community তৈরি করতে হলে প্রতি Nest বাবদ আনুমানিক ব্যয় ঃ ৫০.০০ টাকা।

(চ) ভূমি শয্যা (litter) জনিত আনুমানিক ব্যয় প্রতি ঘরের জন্য ঃ ১০.০০ টাকা।

(ছ) অন্যান্য সরঞ্জাম বাবদ আনুমানিক মোট ব্যয় ৫০.০০০ টাকা।

**বি. দ্র.** — উপরোক্ত যে হিসাবটি দেওয়া হলো, বর্তমান বাজার অনুপাতে তা যথেষ্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

# পোলট্রি ফার্মের আয়-ব্যয়

## আয়

**(ক) ডিম বিক্রয় ঃ**

ভালো জাতের প্রতিটি মুরগী ডিমপাড়া বছরে গড়ে ১৯০টি দিম দিয়ে থাকে। অতএব ঐরূপ ভালো জাতের ১০০টি ডিমপাড়া মুরগী বছরে গড়ে ১৯,০০০টি ডিম দেবে।

১৯,০০০টি ডিম পাওয়া গেলে ৮ হাজার ডিম খাওয়ার ডিম হিসাবে, ২ হাজার ডিম হ্যাচিংয়ের ডিম হিসাবে বিক্রয় করা যায়। আর বাদবাকী ৯,০০০টি ডিম ইনকিউবেটারে বসানো যায়।

(১) প্রতিটি খাওয়ার ডিমের বর্তমান দাম ঃ ৩৫ পয়সা,

বর্ষাকালে ঃ ৪৫ পয়সা

গড় দাম ঃ ৪০ পয়সা

(২) বাচ্চা উৎপাদনে অর্থাৎ প্রতিটি হ্যাচিংয়ের ডিমের মূল্য ঃ ৮০ পয়সা।

(খ) তিনমাস বয়স্ক মদ্দা বাচ্চা (Broilers) বিক্রয় জনিত আয়। ইনকিউবেটারে ৯০০টি ডিম বসালে মৃত্যু, ছাঁটাই ইত্যাদি বাদ দিয়ে অন্তত ৫০০০ বাচ্চা থাকবে। তন্মধ্যে ২৫০০ মদ্দা বাচ্চা অবশ্যই পাওয়া যাবে।

প্রতিটি ৩ মাস বয়স্ক মদ্দা বাচ্চা বিক্রি করে দাম পাওয়া যাবে ঃ ৫.০০ টাকা।

**(গ) ডিম পাড়ার সম্ভাবনাযুক্ত তরুণ মুরগী ঃ**

**বিক্রয় ঃ** ৫।৬ মাস বয়স্ক তরুণ মুরগী কিছুদিনের মধ্যেই ডিম দিতে শুরু করে। অতএব চাহিদা বেশি থাকায় প্রতিটি ডিমপাড়া তরুণ মুরগীর দাম ঃ ১৫ থেকে ২০ টাকা।

## ব্যয়

**(ক) মোরগ-মুরগীর খাদ্য-জনিত ব্যয় ঃ**

১। ১টি পূর্ণবয়স্ক ডিমপাড়া মুরগীর জন্য দিনে ১১০ গ্রাম এবং বছরে প্রায় ৪০ কেজি খাদ্য প্রয়োজন। প্রতিটি কেজি খাদ্যের দাম ৮০ পয়সা। বয়স্ক প্রতি মুরগী পিছু বছরে খাদ্যজনিত মোট ব্যয় ঃ ৩২ টাকা।

২। বাচ্চাদের প্রথম ৩ মাসের খাদ্য-জনিত ব্যয় ঃ প্রথম ৩ মাসে একটি বাচ্চার জন্য খাদ্য লাগে প্রায় ৪ কেজি। মেশ খাদ্যের দাম অপেক্ষাকৃত বেশি। অতএব প্রতিটি বাচ্চার জন্য প্রথম ৩ মাসে খাদ্য-জনিত ব্যয়—(৪×৯০ প.) = ৩.৬০ টাকা

৩। তরুণ মুরগীদের খাদ্য-জনিত ব্যয়। জন্মের ৩ মাস পরেই পুরুষ বাচ্চাদের পৃথক করে বিক্রি করে ফেলা হয়। কিন্তু তরুণ মুরগীদের ডিমপাড়া পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য আরও ২ মাস (৪র্থ ও ৫ম মাস) খাদ্য খাইয়ে পুষতে হয়। প্রতিটি তরুণ মুরগীর জন্য ২ মাসে খাদ্য লাগে ঃ ৫ কে. জি.। ৮০ প. কেজি হিসাবে মুরগী পিছু ২ মাসের জন্য খাদ্যজনিত মোট ব্যয় ঃ ৪.০০ টাকা।

**খাদ্য-জনিত ব্যয় লাঘব ঃ**

পাইকারি দরে খাদ্য উপাদানগুলো নিজেই কিনে নিয়ে মেশখাদ্য তৈরি করলে খরচ কম পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন ব্রান্ডের তৈরি মেশ খাদ্য কিনতে হলে—প্রতি কেজি-র দাম ঃ .৯০ পয়সা লাগবে।

সরকারি পোলট্রি ফার্ম থেকে বাচ্চা তথা বয়স্ক মুরগীর খাদ্য কম দামে পাওয়া যায় বটে—তবে সরকারি পোলট্রি ফার্ম ব্যক্তিগত ভিত্তিতে গড়ে তোলা পোলট্রি ফার্মের কাছাকাছি হওয়া চাই। সে ধরনের সুবিধা অনেক পোলট্রি ফার্মেরই নেই।

| আয় | ব্যয় |
|---|---|
| (ঘ) **১৮ মাস বয়স্ক মুরগী বিক্রয় ঃ** প্রথম ডিমপাড়া বছর উত্তীর্ণ হলে অর্থাৎ ১৮ মাস বয়স হলেই মুরগীগুলো বেচে দেওয়া উচিত। কারণ দ্বিতীয় ডিমপাড়া বছরে মুরগীরা অপেক্ষাকৃত কম ডিম দেয় কিন্তু খায় বেশি। ঐ সকল মুরগী থেকেও ডিম পাওয়া যায় বলে—ঐ সকল মুরগী থেকেও ভালো দাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রতিটি মুরগীর দাম ১০.০০ কিন্তু বাজারে মাংস হিসাবে বিক্রি করলে ৫-৭ টাকার বেশি দাম পাওয়া যাবে না।<br>(ঙ) মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন ও প্রবর্ধন। ফার্মে ভালো জাতের মোরগ-মুরগী থাকলে প্রতি ১০০টি মুরগী থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই ৫০০০টি উৎকৃষ্ট ডিমপাড়া মুরগী পাওয়া সম্ভব।<br>(চ) **পোলট্রি ফার্মে সার বিক্রয় ঃ** মাংসল জাতের প্রতিটি ১০০টি মোরগ-মুরগীর নিঃসারিত মল-মূত্রের সার বিক্রি করে বছরে ৭০ টাকা পাওয়া যাবে।<br>আর প্রতি ১০০টি ডিমপাড়া মুরগীর মলমূত্র-জনিত সার বিক্রি করে বছরে (প্রতিমাসে ৯০০ কেজি সার) ১৯০ টাকা পাওয়া যাবে। প্রতি কেজি সারের আনুমানিক বাজার দর ৪.০০ টাকা। | বাজার থেকে বিভিন্ন উপাদানাদি কিনে নিজেরাই মেশ তৈরি করে নিলে প্রতি কেজি মেশের জন্য ৮০ পয়সা ব্যয় হয়।<br>অবশ্য পোলট্রি ফার্ম সংলগ্ন ২।৩ বিঘা নিজস্ব বাড়তি জমি থাকলে—চীনাবাদাম, ভুট্টা প্রভৃতি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়, ফলে খাদ্য জনিত ব্যয় কিছু লাঘব হতে পারে<br>(খ) **ইলেকট্রিক খরচ ঃ** পোলট্রি ফার্মে প্রতি মাসে ১৫ টাকা খরচ হয়, কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা হলে, ইনকিউবেটারের জন্য প্রতি মাসে অতিরিক্ত ৩ টাকা প্রয়োজন হবে।<br>(গ) **কর্মচারীদের বেতন ঃ** ১০০টি মুরগীর দেখাশোনার জন্য কোন কর্মচারীর প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করার ব্যবস্থা থাকলে, কর্মচারীর প্রয়োজন। একজন কর্মচারীর জন্য প্রতিমাসে ১৫০ টাকা প্রয়োজন। ফার্ম বড় হলে একাধিক কর্মচারী রাখতে হবে।<br>(ঘ) **জমি ও বাড়িভাড়া ঃ** শহরতলি অঞ্চলে ভাড়া করা জমি ও বাড়ির জন্য প্রতি মাসে ২০০ টাকা ব্যয় হবে।<br>(ঙ) **বিবিধ খরচ ঃ**<br>(১) ওষুধপত্র — ১৫ টাকা<br>(২) স্টেশনারী — ১০ টাকা<br>(৩) যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ — ২০ টাকা<br>(৪) প্যাকিং খরচ — ৩০ টাকা<br>(৫) অন্যান্য খরচ — ১০ টাকা।<br>*** প্রথম ৫ বছরের জন্য পোলট্রি ফার্মের** কোন আয়কর লাগে না। |

**বি. দ্র. ঃ** উপরোক্ত আয়-ব্যয় হিসাবে যে টাকার হিসাব দেওয়া আছে, বর্তমান বাজার অনুযায়ী তাহা যথেষ্টই বৃদ্ধি পাইবে।

## পোলট্রি ফার্মের লাভ-লোকসান

পোলট্রি ফার্মের আয়-ব্যয়ের হিসাব শেষে যদি উদ্বৃত্ত টাকা থাকে সেই উদ্বৃত্ত টাকাকেই লাভ আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়, কারণ ঐ উদ্বৃত্ত টাকা থেকে ক্ষয়-জনিত ক্ষতি (depreciation) এবং সুদের টাকা বাদ দিতে হবে।

**(ক) ক্ষয়-জনিত ক্ষতি (Depreciation) ঃ**

(১) ঘর বাবদ ঘর তৈরির খরচের বার্ষিক ক্ষয়-জনিত ক্ষতি— ৫%

(২) সরঞ্জাম বাবদ মোট ব্যয়ের বার্ষিক ক্ষয়-জনিত ক্ষতি— ৫%

(৩) ইনকিউবেটারের মোট দামের বার্ষিক ক্ষয়-জনিত ক্ষতি— ৫%

* ঘর, সরঞ্জাম এবং ইনকিউবেটারের প্রথম বার্ষিক ক্ষয়জনিত ক্ষতির অঙ্ক বাদ দেওয়ার পর দ্বিতীয় বছরের ঐগুলির দাম নতুন করে ধরতে হবে। অথবা ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ থেকে টাকাও ধরা যাবে।

(খ) যদি ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ধার নিয়ে ফার্ম চালান হয়, তবে উদ্বৃত্ত টাকা থেকে সুদের টাকা বাদ দিতে হবে।

### নেট লাভ

সুদ এবং ক্ষয়-জনিত ক্ষতির টাকা বাদ দেওয়ার পরেই নেট লাভ কত হলো জানা যাবে। নেট লাভ থেকে ধারের টাকার কিস্তি শোধ করতে হলেও—ঐ টাকাকে নেট লাভের পর্যায়ভুক্ত করতে হবে।

# আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে একটি পোলট্রি ফার্মের পরিকল্পনা

## স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital)

| | | | টাকা |
|---|---|---|---|
| [ক] | গৃহনির্মাণ জনিত ব্যয় ঃ<br>[প্রতি বর্গফুট ৪ টাকা হিসাবে] | | |
| ১। | অফিস, এগস্টোর ও খাদ্য গুদামের চালা ঘর<br>৫০ ফুট × ১৮ ফুট (৯০০ বর্গ ফুট) | | ৩,৬০০ |
| ২। | লিটার যুক্ত চালা ঘর ৫টি ৫০ ফুট×১৬ (৮০০ বর্গ ফুট) | | ১৬,০০০ |
| ৩। | ব্রুডারের চালাঘর ১টি ৫০ ফুট×১৬ (৮০০ বর্গ ফুট) | | ৩,২০০ |
| | | | ২২,৮০০ |
| [খ] | সরঞ্জাম-জনিত ব্যয় ঃ | | |
| ১। | ব্রুডার— | টাকা | |
| | ৫০ টাকা হিসাবে ২০টি | ১,০০০ | |
| ২। | খাদ্য পাত্র— | | |
| | বাচ্চাদের ১.৫০ টাকা হিসাবে ১০০টি | ১৫০ | |
| | বড় মুরগীর ৫.০০ টাকা হিসাবে ১০০টি | ৫০০ | |
| ৩। | জলের পাত্র— | | |
| | বাচ্চাদের /ওয়াটার ফাউন্টস ৩.৫০ টাকা হিসাবে ১০০টি | ৩৫০ | |
| | বড় মুরগীর জন্য ৪.০০ টাকা হিসাবে ১০০টি | ৪০০ | |
| [গ] | ডিম পাড়ার নেস্ট | ৫০০ | |
| [ঘ] | Roost বাবদ ব্যয় | ১০০ | |
| | | | ২,০০০ |
| [ঙ] | বড় ইনকিউবেটার | | ২,৫০০ |
| [চ] | নগদ মজুত | | ২,৭০০ |
| | | মোট টাকা | ৩০,০০০ |

## কার্যকরী মূলধন (Working Capital)

[১ দিনের বাচ্চাগুলোকে ডিম উৎপাদন পর্যায়ে উন্নীত করতে ৬ মাস পর্যন্ত পালন জনিত ব্যয়]

| | টাকা |
|---|---|
| [ক ] ১ দিন বয়স্ক বাচ্চার মূল্য ২৫০টি বাচ্চা ২.০০ টাকা হিসাবে | ৫০০ |
| [খ] **খাদ্যজনিত ব্যয় ঃ** | |
| ১ দিন থেকে ৩ মাস পর্যন্ত ২৫০টি বাচ্চার গড়ে ৪ কেজি হিসাবে ১০০০ কেজি, ৮০ পয়সা কেজি দরে | ৮০০ |
| [গ] ৩ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত [মদ্দা বাচ্চাদের বিক্রয় করার পর ] ১০০টি মাদী বাচ্চার ৮ কেজি হিসাবে ৮০০ কেজি, ৮০ পয়সা কেজি দরে | ৬৪০ |
| [ঘ] কর্মচারীর বেতন মাসিক ১.৫০ টাকা হিসাবে ৬ মাসের | ৯০০ |
| [ঙ] ভাড়া মাসে ২০০ টাকা হিসাবে ৬ মাসের | ১,২০০ |
| [চ ] **অন্যান্য খরচ ঃ** টাকা | |
| ইলেকট্রিক ৯০ | |
| ওষুধ প্রভৃতি ৯০ | |
| অন্যান্য ১২০ | ৩০০ |
| মোট টাকা | ৪,৩৪০ |

১ দিন বয়স্ক বাচ্চা কিনে পালন সুরু করলে প্রথম ৩ মাসে কোন আয় হয় না, পরে ৩ মাস বয়সের প্রায় ১৩০টি মদ্দা বাচ্চা ৫ টাকা হিসাবে বিক্রয় করে ৬৫০ টাকা পাওয়া যাবে। সুতরাং ৬ মাস পর্যন্ত বাচ্চা পালনের ৪,৩৪০ টাকা থেকে ৬৫০ টাকা বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী মূলধন লাগে প্রায় ৩,৬৯০ টাকা।

## পোলট্রি ফার্মের ১ বছরের আয়-ব্যয়

| ব্যয় | টাকা | আয় | টাকা |
|---|---|---|---|
| [ক] খাদ্যজনিত ব্যয় ঃ | | [ক] ডিম বিক্রয় | |
| (৮০ পয়সা কেজি হিসাবে) | | ১। খাওয়ার ডিম ৮০০০ | ৩,২০০ |
| ১। ডিমপাড়া মুরগীর খাদ্য | | .৪০ পয়সা হিঃ | |
| ১২০টি মুরগীর ৪০ কেজি হিঃ | | ২। ২০০০ বাচ্চা ফোটানোর | |
| ৪,৮০০ কেজির মূল্য | ৩,৮৪০ | ডিম .৮০ পয়সা হিঃ | ১,৬০০ |
| ২। বাচ্চাদের খাদ্য | | [খ] ফার্মে উৎপন্ন বাচ্চা | |
| প্রথম ৩ মাস— | | মোরগ বিক্রয় ২৫০০ | |
| (ফার্মে উৎপন্ন) | | ৫ টাকা হিঃ | ১২,৫০০ |
| ৫০০০ বাচ্চার ৪ কেজি হিঃ | | [গ] ৫ মাস বয়স্ক তরুণ | |
| ২০,০০০ কেজি | ১৬,০০০ | মুরগী বিক্রয় ২,২৫০ | |
| ৩ মাস থেকে ৫ মাস— | | ১৫ টাকা হিঃ | ৩৩,৭৫০ |
| ২৫০০০ মাদী বাচ্চার ৫ কেজি | | [ঘ] ১৮ মাস বয়স্ক মুরগী | |
| হিঃ ১২,৫০০ কেজি | ১০,০০০ | বিক্রয় ১২০টি | |
| [খ] ভাড়া ১ বছরের | ২,৪০০ | ১০ টাকা হিঃ | ১,২০০ |
| [গ] বেতন ১ বছরের | | [ঙ] পোলট্রির সার বিক্রয় | ৩০০ |
| (৩ জনের) | ৭,২০০ | মোট টাকা | ৫২,৫৫০ |
| [ঘ] অন্যান্য খাতে ব্যয় ঃ | | | |
| ইলেকট্রিক | ২৫০ | | |
| ওষুধ | ১৬০ | | |
| বিজ্ঞাপন | ৩৫০ | | |
| বিবিধ | ৩৫০ | | |
| মোট টাকা | ৪০,৫৫০ | | |
| উদ্বৃত্ত টাকা | ১২,০০০ | | |

* প্রতি বছর আয় এবং ব্যয়ের হেরফের ঘটে, কিন্তু আয়-ব্যয়ে বার্ষিক হিসাবের এই নমুনাটি পরবর্তী বছরের আয়-ব্যয়ের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রত্যেক বছরের উদ্বৃত্ত টাকা থেকে ক্ষয়-ক্ষতি তথা সুদের টাকা বাদ দিয়ে লাভ বা লোকসান নির্ণয় করতে হবে।

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | এই পরিকল্পনা বাবদ ৩০,০০০ টাকা ধার লওয়া হয়েছিল। অতএব ৫% হারে বার্ষিক মোট দেয় সুদ— (১৮ মাসে) | ২,২৫০ |
| (খ) | প্রথম বছরে ক্ষয়-জনিত ক্ষতির হিসাব ঘরবাবদ | ২২,৮০০ |
| | টাকার ওপর ৫% | ১,১৪০ |
| (গ) | সরঞ্জাম ২,০০০ টাকার ওপর ৫% | ১০০ |
| (ঘ) | ইনকিউবেটার ২৫০০ টাকার ওপর ৫% | ১২৫ |
| | | ২,৩৬৫ |

## পোলট্রি ফার্মের লাভ-লোকসানের হিসাব

### (১ থেকে ৫ বছর)

[প্রথম ডিমপাড়া বছর এবং বাচ্চা পালনে ৬ মাস ধরে নিয়ে মূলতঃ ১৮ মাসের ব্যয়ের হিসাব। ১ দিন বয়স্ক বাচ্চাকে ডিমপাড়ার উপযুক্ত করে তুলতে ৬ মাস যাবৎ খাদ্য ও পালন জনিত অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব]

| ব্যয় | টাকা | আয় | টাকা |
|---|---|---|---|
| খাদ্য প্রভৃতি | ৪০,৫৫০ | বিক্রয় | ৫২,৫৫০ |
| সুদ ৩০,০০০ টাকার ১৮ মাসের | ২,২৫০ | | |
| ক্ষয়-জনিত ক্ষতি | ২,৩৬৫ | | |
| | ৪৫,১৬৫ | | |
| বাচ্চা পালন জনিত ৬ মাসের ব্যয় | ৩,৪৯০ | | |
| | ৪৮,৬৫৫ | | |
| নেট লাভ | ৩,৯০০ | | |
| মোট টাকা | ৫২,৫৫০ | মোট টাকা | ৫২,৫৫০ |

সার্বিক ব্যয় মেটানোর পর যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে—তন্মধ্যে ক্ষয়-জনিত ক্ষতি বাবদ বাদ দেওয়া টাকাও হাতে থাকে।

নেট লাভ ৩,৯০০ + ক্ষয়-জনিত ক্ষতিবাবদ ২,৩৬৫ টাকা = ৬,২৬৫ টাকা হাতে থাকবে। ভবিষ্যতের জন্য ক্ষয়-জনিত ক্ষতির ২,৩৬৫ টাকা জমালে ভালো হয়। লাভের ৩,৯০০ টাকা থেকে ঋণ শোধের দরুন প্রথম কিস্তির ২০০০ টাকা পরিশোধ করা সঙ্গত।

প্রথম বছরে উৎপাদিত বাচ্চাদের মধ্য থেকে ১২০টি উত্তম মুরগী রেখে দিলে পরের বছর আর নতুন বাচ্চা কিনে ৬ মাস অপেক্ষা করার প্রয়োজন হবে না।

## ডিমপাড়ার দ্বিতীয় বছরের আয়-ব্যয়

| ব্যয় | টাকা | আয় | টাকা |
|---|---|---|---|
| খাদ্য প্রভৃতি ব্যয় | ৪০,৫৫০ | বিক্রয় | ৫২,৫৫০ |
| সুদ (২৮০০০ টাকার) | ১,৪০০ | | |
| ক্ষয়-জনিত ক্ষতি | ১,১৪৭ | | |
| | ৪৩,০৯৭ | | |
| নেট লাভ | ৯,৪৫৩ | | |
| মোট লাভ | ৫২,৫৫০ | মোট টাকা | ৫২,৫৫০ |

উদ্বৃত্ত হাতে থাকবে নেট লাভ ৯,৪৫৩ + ক্ষয়-জনিত ক্ষতি ১,১৪৭ = ১০,৬০০ টাকা। এর থেকে দ্বিতীয় কিস্তির ঋণশোধ বাবদ ৫০০০ টাকা দেওয়া হলেও ৫,৬০০ টাকা থাকবে। সেক্ষেত্রে মাসিক উপার্জন হবে প্রায় ৪৬৬ টাকা।

## ডিম পাড়ার তৃতীয় বছরের আয়-ব্যয়

| ব্যয় | টাকা | আয় | টাকা |
|---|---|---|---|
| খাদ্য প্রভৃতি | ৪০,৫৫০ | বিক্রয় | ৫২,৫৫০ |
| সুদ (২৩০০০ টাকার) | ১,১৫০ | | |
| ক্ষয়-জনিত ক্ষতি | ১,০০০ | | |
| | ৪২,৭০০ | | |
| নেট লাভ | ৯৮৫০ | | |
| মোট টাকা | ৫২,৫৫০ | | ৫২,৫৫০ |

এই লাভের টাকার সঙ্গে ক্ষতি-জনিত ক্ষতি টাকা ৯,৮৫০ + ১০০০ = ১০,৮৫০ টাকা হাতে থাকবে। এই টাকা থেকে অনায়াসে ঋণ শোধের কিস্তিবাবদ ৬০০০ টাকা মিটিয়ে দিলে ৪,৮৫০ টাকা হাতে থাকবে।

## ডিমপাড়ার চতুর্থ বছরের আয়-ব্যয়

| ব্যয় | টাকা | আয় | টাকা |
|---|---|---|---|
| খাদ্য প্রভৃতি | ৪০,৫৫০ | বিক্রয় | ৫২,৫৫০ |
| সুদ (১৭,০০০ টাকা) | ৮৫০ | | |
| ক্ষয়-জনিত ক্ষতি | ৯০০ | | |
| | ৪২,৩০০ | | |
| নেট লাভ | ১০,২৫০ | | |
| মোট টাকা | ৫২,৫৫০ | মোট টাকা | ৫২,৫৫০ |

নেট টাকা তথা ক্ষয়ক্ষতি বাবদ টাকা হাতে থাকায় ঐ টাকা থেকে অনায়াসে ঋণ শোধ বাবদ ৭০০০ টাকা পরিশোধ করা সম্ভব।

## ডিমপাড়ার পঞ্চম বছরের আয়-ব্যয়

| ব্যয় | টাকা | আয় | টাকা |
|---|---|---|---|
| খাদ্য প্রভৃতি | ৪০,৫৫০ | বিক্রয় | ৫২,৫৫০ |
| সুদ (১০,০০০ টাকার ৬ মাসের) | ২৫০ | | |
| ক্ষয়-জনিত ক্ষতি | ৭৫০ | | |
| | ৪১,৫৫০ | | |
| নেট লাভ | ১১,০০০ | | |
| মোট টাকা | ৫২,৫৫০ | মোট টাকা | ৫২,৫৫০ |

যেহেতু হাতে ক্ষয়-জনিত ক্ষতি বাবদ কেটে নেওয়া বেশ কিছু টাকা রয়েছে, সেই কারণে নেট লাভ থেকে অনায়াসে বাদ বাকি ১০,০০০ টাকা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে।

ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর ষষ্ঠ বছর থেকেই নেট লাভের টাকাই উপার্জন হিসাবে ধরা যাবে।

## ডিমপাড়ার ষষ্ঠ বছরের আয়-ব্যয়

| ব্যয় | টাকা | আয় | টাকা |
|---|---|---|---|
| খাদ্য প্রভৃতি | ৪০,৫৫০ | বিক্রয় | ৫২,৫৫০ |
| ক্ষয়-জনিত ক্ষতি | ৭০০ | | |
| | ৪১,২৫০ | | |
| নেট লাভ | ১১,৩০০ | | |
| মোট টাকা | ৫২,৫৫০ | মোট টাকা | ৫২,৫৫০ |

এই নেট লাভ ১১,৩০০ টাকাকে ১২ দিয়ে ভাগ করলে মাসিক আয় নির্ধারিত হবে। ধার নিয়ে এভাবে পোলট্রি ব্যবসা সুরু করলেও ষষ্ঠ বছর থেকে প্রতি মাসে ৯৪১ টাকা উপার্জন করা সম্ভব হবে।

# হাঁস

## পূর্ব প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষ মূলত কৃষি প্রধান দেশ হলেও বহু প্রাচীনকাল থেকেই কৃষির পাশাপাশি পশু এবং পাখি পালন দেশের মানুষ করে আসছে। পাখি বলতে সখ করে খাঁচায় আবদ্ধ অবস্থায় রঙবাহারী গান-গাওয়া পাখি নয়, হাঁস এবং মুরগি (এরাও পাখির পর্যায়ে পড়ে) মাংস সহ ডিমের জন্য গৃহস্থ বাড়িতে পালিত হয়ে আসছে। ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। কাজেই আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও মুরগি পালন সীমাবদ্ধ ছিল মুসলমান পরিবারের মধ্যে। তবে একেবারে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাও কিছু সংখ্যায় মুরগি পালন করতো। কিন্তু তার সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। তবে বর্তমানে সেই অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন হিন্দুদের মধ্যে শতকরা আশি ভাগ মানুষের মনে ধর্মকে কেন্দ্র করে কোন রকম গোঁড়ামি নেই।

হাঁসের ক্ষেত্রে ধর্মের কুসংস্কার একেবারেই নেই বললেই চলে। সুতরাং প্রায় সব ধর্মের মানুষের মধ্যে হাঁসের ডিম এবং মাংসের প্রচলন রয়েছে। তবে এটাও ঠিক কথা, মুরগির মাংসের চাহিদা বর্তমানে যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই তুলনায় হাঁসের মাংসের চাহিদা নেই। কিন্তু ডিমের ক্ষেত্রে মুরগির থেকে হাঁসের বাজার অনেক ভাল। কেবল ভাল বললেই সঠিক বলা হবে না, হাঁসের ডিম মুরগির ডিমের থেকে দ্বিগুণ বেশি দামেতে বিক্রি হচ্ছে। তার একমাত্র কারণ হল ডিমের আকার বড়, খেতে সুস্বাদু এবং মুরগির ডিমের থেকে পুষ্টিমূল্য কিছুটা বেশি। সুস্বাদু ডিম কেবল দেশী পাতিহাঁসের ক্ষেত্রে নয়, খামারে উন্নত জাতের (অবশ্যই ভারতীয় হাঁস) যেসব শ্রেণীর হাঁস পালন করা হচ্ছে সেই ডিমও সমান সুস্বাদু।

আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারে পাঁচ-দশটা দেশী পাতিহাঁস অবশ্যই পালন করা হয়, কিন্তু তারা উপযুক্ত খাদ্য পায় না। গৃহস্থের ফেলে দেওয়া শাক-পাতা, ভাতের পাতে উচ্ছিষ্ট এবং সামান্য চালের কুঁড়ো খেয়েই ওরা বেঁচে থাকে এবং সারা বছরে ৫০ থেকে ৬০টি ডিম পাড়ে। সারাদিন মাঠে-ঘাটে এবং পুকুর-ডোবাতে চরে রোজকার খাদ্যের মোট চাহিদার শতকরা ৯৫ ভাগ মিটিয়ে ফেলে। কারণ গ্রামে আবদ্ধ জলাশয়ের অভাব নেই। সেখানে প্রচুর পরিমাণে শামুক, গেঁড়ি এবং গুগলি হাঁসেরা সংগ্রহ করতে পারে। এমনকি দুর্বল চারা মাছ ঠোঁটের কাছে এলে সেটাও ধরে খেয়ে ফেলে। এইভাবে অযত্নে পালিত গৃহস্থ যা ডিম পায় সেটা সম্পূর্ণ বিনা পয়সায়। সুতরাং এটাই তার লাভ।

যে সমস্ত পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি তাদের সংসারে ডিমের চাহিদা মেটাতে সংখ্যায় বেশি ডিম লাগবে। সেক্ষেত্রেও ভাল উন্নত জাতের হাঁস কেউ পালন করে

না। দেশী পাতিহাঁসের সংখ্যা বাড়িয়ে চাহিদা পূরণ করে নেয়। অথচ দেশী হাঁসকে সংকরায়ণ পদ্ধতির মাধ্যমে (দেশী স্ত্রী হাঁসের সঙ্গে পুরুষ খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের দৈহিক মিলন ঘটিয়ে যে ডিম পাওয়া যাবে তার বাচ্চা) দেশী পাতিহাঁসের থেকে আকারে বড় এবং চারগুণ বেশি সংখ্যায় ডিম পাওয়া যাবে। অথচ উন্নত হাঁসের খাদ্য বাবদ বেশি খরচ মোটেই হবে না। একটি হাঁসের জন্য (অবশ্যই পূর্ণবয়স্ক) মাত্র ২০ গ্রাম খাদ্য লাগবে। বাকি শতকরা আশি ভাগ খাদ্য ওরা সারাদিনে পুকুর-ডোবা সহ মাঠে-ঘাটে সংগ্রহ করে নেবে।

এসব তথ্য বর্তমানে গ্রামবাসীদের আজ আর অজানা নেই। সকলেই প্রায় জানে। তবুও সাবেকি প্রথা থেকে কেউ আর সরে আসতে চাইছে না। কাজেই হাঁস পালনের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিল একমাত্র উৎসাহের অভাবে তার কোন রকম উন্নতি ঘটেনি। অথচ ভারতের অন্যান্য রাজ্য এ ব্যাপারে অনেক এগিয়ে গেছে।

দেশী হাঁসকে সংকরায়ণ করার ক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা বা অসুবিধা রয়েছে। সেটা যদি কারুর পক্ষে অসুবিধাজনক ব্যাপার বলে মনে হয় তবে ভারতীয় শ্রেণীভুক্ত উন্নত জাতের হাঁস অবশ্যই পালন করা যায়। সেখানে কোন রকম অসুবিধে নেই। দেশী হাঁস যেভাবে সম্পূর্ণ ছাড়া অবস্থায় পালিত হয় ঠিক সেইভাবেই উন্নত শ্রেণীর হাঁসকে পালন করা যাবে। অথচ সেই হাঁসের কাছ থেকে সংখ্যায় আরও বেশি ডিম এবং আকারে বড় যেমন হবে তেমনি মাংস হিসাবে তিন বছর বাদে বিক্রি করলে কোন রকম লোকসান নেই। কারণ তিন বছরে উন্নত শ্রেণীর হাঁস খুব কম করে ৩০০টির বেশি ডিম পাড়বে। আর তিন বছরে ডিমের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৯০০টি। দীর্ঘ তিন বছর এই হারে ডিম পাড়লেও মাংস ছিবড়ে হবে না, নরম তুলতুলে সহ সুস্বাদু হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে চেতনা বোধ আজও রাজ্যের মানুষের মনে জাগেনি।

## হাঁসের খামারে কোন ঝুঁকি নেই

কথাটা শতকরা শতভাগ সত্যি। হয়তো এটাও ঠিক বলা হল না। একশো দশ ভাগ খাঁটি। তার এক মাত্র কারণ হচ্ছে সবটাই লাভ। কোথাও কোনভাবেই লোকসান হবার সামান্যতমও সুযোগ নেই। এমনকি পালনকারী অর্থাৎ খামারীর চরম অবহেলা হলেও হাঁস সহসা মরে না। আধপেটা খেয়ে, এমনকি কয়েকদিন না খেয়ে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও বেঁচে থাকে। দেহের ওজনের বৃদ্ধি ঘটে, আবার ডিমও পাড়ে। তবে ডিমের আকার ছোট হয়। শরীর কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ডিম পাড়ার হারটা কমে যায়। যদি সারাদিন চরতে পায় এবং গৃহস্থের সামান্য এঁটো কাটা এবং উচ্ছিষ্ট পায় তাতেই ওরা ডিম পাড়ে। সব শ্রেণীর হাঁসের মধ্যেই এই বিশেষ গুণটা রয়েছে। অর্থাৎ দেশী পাতিহাঁস সহ ভারতীয় উন্নত শ্রেণীর হাঁসও এইভাবে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লড়াই করে বেঁচে থাকতে পারে। এটা যেকোন পশু-পাখি পালনকারী খামারীর কাছে বিরাট ভরসার কথা। অথচ অন্যান্য

পশু-পাখি পালনের ক্ষেত্রে এই রকম অবস্থা হলে খামারীর চরম ক্ষতি সহ্য করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকতো না। হাঁস পালন করার ক্ষেত্রে এটা হল একটা দিক।

হাঁস পালনে কোন ঝুঁকি নেই, তার দ্বিতীয় কারণ বা দিক হচ্ছে, ওরা যতদিন বেঁচে থাকে বিশেষ কোন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না। উন্নত বা সংকর জাতের হাঁসের কেবল তিন-চার রকম রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। সেক্ষেত্রে সময় থাকতে আগাম টিকা দেবার ব্যবস্থা করলে খামারী রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে। খামারে যদি রোগ-ব্যাধির আক্রমণ ঘটে তবে সেটা কোনভাবেই মারাত্মক আকার ধারণ করে না।

অথচ মুরগি পালন করার ক্ষেত্রে চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত। তার কারণ খামারীকে ডিম পাড়া মুরগি সহ ব্রয়লার মুরগি পালন করলে জন্মের পরের দিন থেকে প্রায় পনেরটি মারাত্মক রোগের টিকা দিতে হয়। তার জন্য প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যায়। এইভাবে টাকা দিয়েও খামারী রেহাই পায় না। হঠাৎ খামারে রোগ-ব্যাধির আক্রমণ ঘটে। চিকিৎসার সামান্য দেরি হলে খামারের সব মুরগির মৃত্যু হয়। যদিওবা বাঁচে ডিম পাড়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং এই ধরনের মুরগি পালন করে কেউ লাভবান হতে পারে না। কিন্তু হাঁস পালনে সেই ঝুঁকি নেই।

আবার ডিম পাড়ার বিষয়ে যদি তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে একটা উন্নত জাতের স্ত্রী মুরগি ডিম পাড়ে তার বয়স ছয় মাস পূর্ণ হলে। অথচ স্ত্রী হাঁস ডিম পাড়তে থাকে মাত্র সাড়ে চার মাস বয়স থেকে। সুতরাং সেই সময় থেকেই খামারীর আয় শুরু হয়। মুরগি আবদ্ধ অবস্থায় থাকায় খায় হাঁসের থেকে বেশি পরিমাণে এবং খাদ্যের দামটাও বেশি। হাঁসকে যদি সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয় তবে খাদ্য বাবদ খামারীর খরচ হয় মুরগির তুলনায় প্রায় অর্ধেক। তাছাড়া হাঁসের খাদ্যের দামটাও যথেষ্ট কম।

মুরগির বাসস্থানের জন্য প্রথমদিকে খামারীকে যথেষ্ট বেশি অর্থ খরচ করতে হয়। বৈদ্যুতিক আলো একান্ত প্রয়োজন। আবার ১০০টি ডিমপাড়া মুরগি পালন করা হলে তার জন্য একজন শ্রমিক অবশ্যই দরকার। কারণ সকাল থেকে সারাদিন মুরগির পরিচর্যা করতে হয়।

হাঁসের বাসস্থানের ক্ষেত্রে মুরগির মতো তেমন ব্যবস্থা না নিলেও চলে। খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল, এমনকি দর্মা দিয়ে যদি দেওয়াল করা হয় তাতেও হাঁস ভালভাবে পালন করা চলে। বৈদ্যুতিক বাতির কোন দরকার পড়ে না। কেবল শিয়াল, কুকুর, সাপ, বেজি রাতে যাতে হাঁসের ঘরে ঢুকতে না পারে সেই রকম ব্যবস্থা করলেই চলবে। কারণ এই শ্রেণীর জীবজন্তু ওদের বাসস্থানে প্রবেশ করলে হাঁসেরা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। আর ভয় পেলেই ওরা ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয়। বেশ কয়েকদিন ধরেই ওদের এই অবস্থা চলতে থাকে।

আর বেশি সংখ্যাতে হাঁস পালন করলেও পালনকারী সামান্য কয়েকটা কাজ নিজেই করে নিতে পারে। কাজের মধ্যে থাকে সকালে বাসস্থানের মেঝে থেকে মল-মূত্র ভালভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া, পরিমাণ মতো খাদ্য এবং পরিষ্কার জল

দিলেই সারা দিনের মতো কাজ মিটে যাবে। তার কারণ, এরপর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ওরা চরবে। আর সন্ধ্যেবেলায় একবার খাদ্য ও জল দেওয়া ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় কাজ নেই। মুরগির মতো স্ত্রী হাঁস সারাদিন ডিম পাড়ে না। যা কিছু ডিম দেবার সকালের মধ্যেই ডিম দিয়ে ফেলে। কেবল ডিমগুলো সংগ্রহ করে তার মধ্যে যদি ওদের মল লেগে থাকে তবে সেটা মুছে পরিষ্কার করে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যেতে হবে। আবার ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলার প্রয়োজন থাকলে উর্বর ডিম বাছাই করে আলাদাভাবে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হবে।

যেসব হাঁসকে (উন্নত জাতের) সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয় তারা পুকুর-ডোবায় চরতে যায় না। বাসস্থানের সামনে সামান্য ঘেরা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কাজেই দুপুরে ওদের সামান্য খাদ্য দিতে হয়। এরপর আর কোন কাজ নেই, সুতরাং কোন ঝুঁকি বা ঝামেলা নেই। আবার পরিশ্রম করতে হয় খুবই সামান্য।

মূলধন কম নিয়ে কোন পশু বা পাখি পালন করা যায় না। যদিও করা হয় সেটা লাভজনক ব্যবসাতে দাঁড় করাতে পালনকারীকে দীর্ঘ চার থেকে পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়। সেটা অনেকের পক্ষেই সহ্য করাটা সম্ভব হয় না। কিন্তু হাঁসের ক্ষেত্রে সেটাও সম্ভব এবং আট থেকে দশটি হাঁস নিয়ে খামার শুরু করলে মাত্র এক বছরের মধ্যে খুব কম করে ১৫০টি হাঁসের খামারের মালিক হওয়া সম্ভব হয়। সেই সঙ্গে ডিম বিক্রি করে কিছু টাকা হাতে আসে। আরও এক বছর একটু কষ্ট করলে খামারে তখন হাঁসের সংখ্যা ৫০০-তে দাঁড়ায়। আর প্রতিদিন ডিম বিক্রি করে ষাট থেকে আশি টাকা রোজগার হয়। যদি খামারে হাঁসের সংখ্যা আর বাড়ানো না হয় তবে প্রতিদিন ডিম পাওয়া যাবে ৩৫০টি করে। এর আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮০০ টাকা। এই টাকাটা সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়েছে। ডিমের কারবার হয় সবটাই নগদে। ধার বাকি খুবই কম। যেটুকু বাকি থাকে সেটা তিন দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। অন্য কোনও ব্যবসায় আর্থিক আদান-প্রদান এত তাড়াতাড়ি হয় না। এব্যাপারেও খামারীকে কোন রকম ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না। সুতরাং এব্যাপারেও কোন রকম লোকসান হবার আশঙ্কা নেই।

যে খামারে হাঁসের ডিম ফুটিয়ে (কৃত্রিম উপায়ে অথবা যন্ত্রের সাহায্যে) বাচ্চা তোলা হচ্ছে সেখানে ওদের পালন করা হলে বাচ্চার মৃত্যুর হারটা খুবই কম হয়। সাধারণভাবে দেখা গেছে, শতকরা পাঁচটি বাচ্চা মারা যায়। মৃত্যুর এই হারটা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। অথচ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পালন করা হলেও মুরগির ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ ভাগ বাচ্চা মারা যায়। যদি ঠিক মতো পরিচর্যা না হয় তবে মৃত্যুর হার আরও বেড়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে হাঁস পালনে কোন দিক থেকেই পালনকারীর লোকসান হবার সুযোগ নেই।

## হাঁসের জাত ও শ্রেণী বিভাগ

ভারতে হাঁস পালনের একেবারে প্রাথমিক তথ্য এবং পালন করলে লাভ ছাড়া আর্থিক ক্ষতির কোন আশঙ্কা থাকে না, সেটা জানার পর হাঁসের জাত ও বিভিন্ন শ্রেণীটা জেনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় এবং বিদেশী হাঁস মিলিয়ে প্রায় ৫০

রকমের জাত রয়েছে যাদের খামারে লাভজনক ভাবে পালন করা যায়। তবে অত রকমের হাঁসের কথা পালনকারীর জানবার কোন প্রয়োজন নেই। এখানে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে যে সমস্ত উন্নত জাতের হাঁস পালন করলে খামারী সব থেকে বেশি লাভবান হতে পারবে সেই সব শ্রেণীর হাঁস সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

হাঁস পালন সম্পর্কে অনেকের মনে একটা মিথ্যে ধারণা রয়েছে যে, একমাত্র দেশী পাতিহাঁস ছাড়া আর কোন শ্রেণীর হাঁস পালন করা খুব একটা লাভজনক নয়। কারণ ওদের রোগ-বালাই মোটেই হয় না। খায় খুবই কম। আর সারাদিন পুকুর-ডোবাতে চরে পেট ভরিয়ে ফেলে। কথাটা হয়তো ঠিক। কিন্তু ডিম পাওয়া যায় খুবই কম।

আবার এক শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস, জল ছাড়া হাঁস বাঁচে না। এটাও মোটে ঠিক তথ্য নয়। একমাত্র দেশী পাতিহাঁসের জন্য আবদ্ধ জলাশয়ের প্রয়োজন। কিন্তু উন্নত জাতের হাঁসের জন্য কোন পুকুর-ডোবা অর্থাৎ আবদ্ধ জলাশয়ের প্রয়োজন হয় না। ওরা খোলা মাঠে কয়েক ঘণ্টা সারাদিনের মধ্যে ঘুরতে পারলে ভালভাবে বেঁচে থাকে এবং সারা বছরে সর্বোচ্চ হারে খুব কম করে ৩০০টির বেশি ডিম দিতে পারে। সেক্ষেত্রে খাদ্য বাবদ দেশী পাতিহাঁসের থেকে ওদের সামান্য বেশি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সেটা এমন কিছু খরচসাপেক্ষ ব্যাপার নয়। আবার ভারতের যেকোন রাজ্যে (মাত্র কয়েকটা রাজ্য ছাড়া) উন্নত শ্রেণীর হাঁস পালন করা সম্ভব। কারণ ওরা ভারতের আবহাওয়া সম্পূর্ণ মানিয়ে নিতে পারে। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, খামারে দেশী পাতিহাঁস পালন করতে নিষেধ করা হলেও যতগুলো উন্নত জাতের হাঁস রয়েছে সবই দেশী পাতিহাঁসের শ্রেণীভুক্ত। কাজেই এদের প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া যায় না।

মোটামুটিভাবে পাতিহাঁসকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন—(১) ব্যবহারিক, (২) দ্বৈত এবং (৩) আলংকারিক। যদিও হাঁসের এইভাবে তিনটি শ্রেণী ভাগ করা হয়, কিন্তু এটাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ভাগ বলা যাবে না। কারণ প্রতিটি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি এবং কিছু ক্ষেত্রে হিসাবে গরমিল দেখা যায়। তবুও বিষয়টা মেনে চলা হয়। কারণ কাজের দিক থেকে কিছুটা সুবিধে হয়। **ব্যবহারিক** শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে সেই সব হাঁস যারা সারা বছরে খুব কম করে ৩০০টি এবং সব থেকে বেশি ৩২০টি ডিম পাড়তে পারে। এরপর **দ্বৈত** শ্রেণীভুক্ত হাঁস তাদের বলা হয় যারা কেবলমাত্র সুস্বাদু এবং নরম মাংস উৎপাদনের জন্য সব থেকে উপযুক্ত। এই শ্রেণীর হাঁস সারা বছরে প্রায় ২০০টি ডিম দিতে সক্ষম। সেই কারণে এরা দ্বৈত শ্রেণীভুক্ত হাঁস। ভারতীয় নয়। এশীয় এবং ইউরোপের কিছু দেশে এরা পালিত হয়। তবে এরা ভারতে এসে খারাপ ফল দেয় না। মাংস এবং ডিম দুটোই খামারীকে দিতে সক্ষম হয়। তৃতীয় ভাগ বা শ্রেণীর হাঁসকে **আলংকারিক** বলা হয়। এদের খামারে কেউ পালন করে না। কারণ মাংস উৎপাদন এবং ডিম পাড়া কোনটাতেই এরা পটু নয়। সুতরাং ওদের পালন করে খামারীর কোন লাভ

নেই। তবে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যারা সখ করে আলংকারিক শ্রেণীর হাঁস পালন করে থাকে। কারণ এদের দেহের গঠন চমৎকার। সেই কারণে প্রদর্শনীতে এদের রাখা হয়। যে তিন শ্রেণীর হাঁসের কথা বলা হল সবই কিন্তু দেশী পাতিহাঁস থেকে তৈরি বা সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই ওদের ব্যাপারে কিছু জেনে রাখা দরকার। উন্নত জাতের হাঁস পালনের খামার করলেও কিছু স্ত্রী দেশী পাতিহাঁস খামারে রাখাটা খুবই প্রয়োজন কারণ ওরা ডিমে ভালো তা দিতে পারে। কারণ সব পালনকারী তার খামারে হাঁসের সংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্য প্রথম দিকে ডিম ফোটাতে (কৃত্রিম উপায়ে যন্ত্রের সাহায্যে) ইনকিউবেটার ব্যবহার করা সম্ভব নাও হতে পারে। তার পরিবর্তে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে দেশী পাতিহাঁসকে কাজে লাগাতে পারা যাবে। সুতরাং বড় আকারের খামার করতে হলে এই জাতের কয়েকটা স্ত্রী পাতিহাঁসেরও প্রয়োজন রয়েছে।

## দেশী পাতিহাঁস

এই শ্রেণীর হাঁসকে সাধারণ দেশী হাঁস বলা হয়। সাধারণ বলার অর্থ হল, ডিম পাড়া এবং মাংস উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত শ্রেণীর হাঁসের থেকে সব থেকে
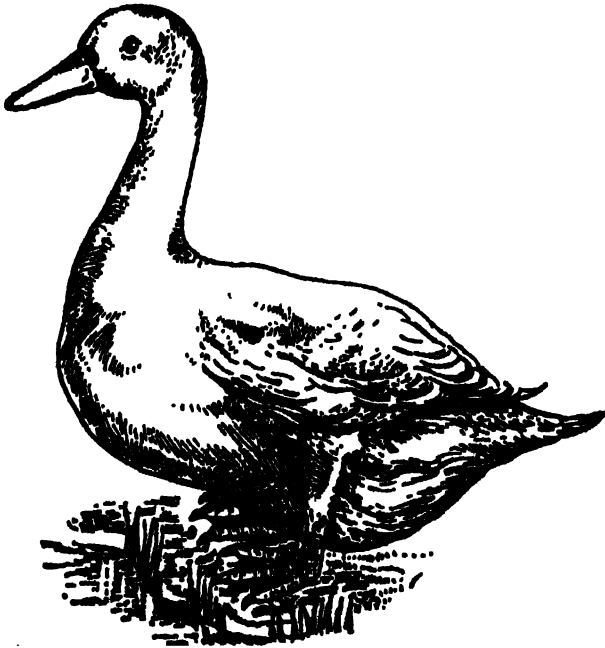
দেশী হাঁস

নিম্নে এদের স্থান। তবে খায় খুবই কম এবং বাচ্চা তুলতে তা দেবার জন্য ব্যবহার করা চলে। একটি মাত্র কাজেতেই সাধারণ দেশী হাঁস খুবই পটু। এছাড়াও বাচ্চাদের উপযুক্ত পরিচর্যা করে।

পূর্বাঞ্চলের প্রায় সব কটি রাজ্যে এদের পালিত হতে দেখা যায়। রাজ্যগুলো হচ্ছে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং ওড়িশা। পাতিহাঁস যেমন গরম সহ্য করতে পারে তেমনি ঠাণ্ডা সহ্য করবার ক্ষমতাও রয়েছে। তবে পূর্বাঞ্চলের যেসব রাজ্যে প্রায় বারো মাসই ঠাণ্ডা সেখানে ওরা অসুবিধে বোধ করে।

জন্মের পর থেকেই হাঁসের সারা দেহে পালকের রঙটা হাল্কা তামাটে হয়। তবে পালকগুলোর আগার দিকে রঙটা সামান্য কালচে দেখায়। ঠোঁটের রঙ সম্পূর্ণ হলদে। পূর্ণবয়স্ক হাঁসের সারা শরীরে পালক যখন ভালোভাবে গজায় তখন মাথা ও গায়ের পালকের রঙ গাঢ় নীল এবং ময়ূরের গলার মতো দেখায়। উভয় পায়ের রঙও হলদে। তবে গোড়ালি থেকে পায়ের যতটা অংশ ঢাকা না থাকে সেখানে সরু জালের মতো দাগ দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে দেহের পালক বিক্ষিপ্তভাবে সাদাও হয়। তবে এই ধরনের রঙের পাতিহাঁস খুবই কম নজরে পড়ে।

পরিণত স্ত্রী পাতিহাঁস প্রথম যখন ডিম পাড়তে শুরু করে তখন বছরে (প্রথম বছর) ৭০ থেকে ৮০টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। দ্বিতীয় বছরে সেটা ৬৫টি হয়। তৃতীয় বছবে ৫০ থেকে ৫৫টি ডিম পাওয়া যায়। একটি ডিমের ওজনও বেশি নয় ৫৫ থেকে ৫৭ গ্রামের মতো। আর পূর্ণবয়স্ক একটা হাঁসের ওজন ২ কেজির বেশি হয না। সুতবাং বোঝা যাচ্ছে এদের পালন করে খামারীর কোন লাভ হয় না। যেমন ডিমও দিতে পারে না তেমনি মাংস উৎপাদনের ক্ষমতাও নেই। তবে দেশী হাঁসের ডিম খুবই সুস্বাদু।

## দেশী হাঁসের উপশ্রেণী

দেশী হাঁসের মধ্যে বহু উপশ্রেণী রয়েছে। তবে তাদের মধ্যে কয়েকটা উপশ্রেণীভুক্ত হাঁস সারা বছরে গড়ে বেশি ডিম পাড়ে এবং বিভিন্ন রাজ্যে অধিক

শিলেট মেটে

সংখ্যায় পালিত হয়। উপশ্রেণীভুক্ত একটি হাঁস পরিচিত **শিলেট মেটে** নাম এবং অপরটির নাম **নাগেশ্বরী**। নাম যাই হোক, এরা দেশী সাধারণ হাঁসেরই সমগোত্রীয়।

**শিলেট মেটে ঃ** পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শিলেট মেটে উপশ্রেণীভুক্ত হাঁস খুব বেশি সংখ্যায় পালন করা হয়। তবে জলাশয় ছাড়া এদের পালন করা চলে না। সেই কারণে গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারে এরা ঠাঁই করে নিয়েছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ডাঙ্গায় এবং পুকুরে চরে নিজের খাদ্যের চাহিদার প্রায় আশি ভাগ সংগ্রহ করে নেয়। সেই কারণে পালনকারীকে ওদের খাওয়াতে খুবই সামান্য অর্থ খরচ করতে হয়। গৃহস্থের ফেলে দেওয়া পাতের ভাত-তরকারি, সামান্য চালের কুঁড়ো এবং এক মুঠো চালের খুদ সিদ্ধ রোজ সকালে এবং সন্ধ্যায় খেতে দিলে ওদের আর কিছু প্রয়োজন হয় না। হিসেব করে দেখা গেছে, একটি দেশী হাঁসকে দু' বেলা মিলিয়ে ৬০ থেকে ৭০ গ্রাম খাদ্য দিলেই যথেষ্ট। এর থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্য দিলেও হাঁস যদিও খেয়ে নেবে, তবে সেটা দেবার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

দেহের গঠন দেশী হাঁসের মতো। গায়ের পালকের রঙ তামাটে। তবে পালকের আগার দিকের রঙটা কিছুটা কালো। ওপর এবং নিচের ঠোঁট হলদে। পরিণত বয়সে দেহে ভালোভাবে পালক গজালে হাঁসের ঘাড় ও মাথার পালকের রঙ নীল দেখায়। কিছু ক্ষেত্রে শিলেট মেটে হাঁসের দেহের সব জায়গায় পালকের রঙ দুধের মতো সাদা হয়। তবে এরা সংখ্যায় খুবই কম।

স্ত্রী হাঁস সারা বছরে ৯০ থেকে ১৫০টির বেশি ডিম পাড়ে। ডিমের আকার যেমন ছোট তেমনি ওজনেও হালকা। একটি ডিমের ওজন ৫৬ থেকে ৫৮ গ্রামের বেশি হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী হাঁসের দেহের ওজন দেড় কেজি থেকে এক কেজি আটশো গ্রামের কাছাকাছি হতে পারে।

**নাগেশ্বরী ঃ** বাংলাদেশ সহ অসমের কয়েকটি জেলায় নাগেশ্বরী উপশ্রেণীভুক্ত হাঁস পালন করা হয়। এই শ্রেণীর হাঁসও সাধারণ দেশী হাঁসের প্রায় সমগোত্রীয় বলা চলে। স্বভাব, দেহের গঠন সবই শিলেট মেটের মতো।
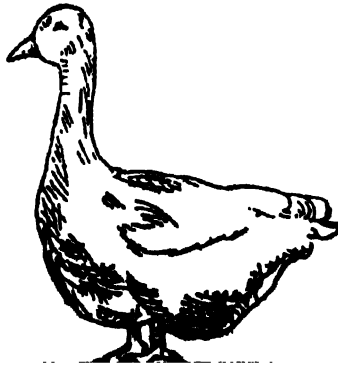
নাগেশ্বরী

পার্থক্য কেবলমাত্র পালকের রঙে। নাগেশ্বরী হাঁসের পিঠের তথা দেহের অধিকাংশ জায়গায় পালকের রঙ কালো। কিন্তু বুক, গলার পালকগুলো সাদা হয়।

তবে কিছুক্ষেত্রে গলার পালকের রঙ কালো হতে পারে। তবে পেটের পালক এই উপশ্রেণীভুক্ত হাঁসের সাদা ছাড়া আর কোন রঙ দেখা যায় না।

স্ত্রী হাঁস সারা বছরে গড়ে ৮০ থেকে ১৬০টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। ডিমের আকার শিলেট মেটের মতো ছোট হয় এবং ওজনও কম। একটি ডিমের ওজন ৫৫ গ্রাম থেকে ৫৮ গ্রামের মধ্যে থাকে। পুরুষ এবং স্ত্রী হাঁসের ওজন দু' কেজির কাছাকাছি হয়।

## খামারে পালনের উপযোগী হাঁস

এর আগে দেশী পাতিহাঁস এবং উপশ্রেণীভুক্ত হাঁসের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তবে ঐসব হাঁস ছোট, মাঝারি এবং বড় আকারের খামারে পালন করে কোন খামারী লাভবান হতে পারে না। কারণ ছোট আকারের এবং সারা বছরে এতই কম সংখ্যাতে ডিম পাড়ে যে ওদের খাবার খরচটাই ওঠে না। আবার মাংস হিসাবে বিক্রি করলে সেটাও লাভজনক না হওয়ায় খামার বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া পালনকারীর সামনে অন্য কোন পথ থাকে না বললেই চলে। সুতরাং গ্রামের গৃহস্থ পরিবারের ডিমের চাহিদা মেটাতে দশ থেকে বারোটা হাঁস সখ করে পালন করা চলে। সামান্য কুঁড়ো এবং গৃহস্থের পাতের ভাত-তরকারি খেয়ে দেশী পাতিহাঁস বড় হয়, বেঁচে থাকে এবং ডিম পাড়ে। কাজেই এইভাবে হাঁস পালনে গৃহস্থের কোন খরচই হয় না।

তবে খামার পদ্ধতিতে হাঁস পালন করতে হলে দুটি বিষয় অবশ্যই দেখতে হবে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে যাবার আগে আমাদের দেখতে হবে খামারে পালনের পক্ষে উপযোগী উন্নত শ্রেণীর হাঁসের জাত কত রকমের রয়েছে। বর্তমানে সংকর জাত সহ প্রায় ৬০ রকমের উন্নত শ্রেণীর হাঁস সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে পালন করা হচ্ছে। এসব হাঁসগুলিকে আবার কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। তবে এই বিরাট সংখ্যার হাঁস সম্পর্কে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদের দেশের আবহাওয়া তাদের পালনের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। এমন হাঁস খামারে পালন করতে হবে যাদের কাছ থেকে সারা বছরে গড়ে ৩০০ থেকে ৩১৫টি ডিম পাওয়া যাবে। কাজেই কয়েকটা সংকর জাত সহ বিদেশী উন্নত জাতের হাঁস যারা আমাদের দেশের আবহাওয়াতে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে তাদের বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

খামারে হাঁস পালন করা হয় মোট তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে। বিষয়গুলো হচ্ছে— (১) ব্যবহারিক, (২) দ্বৈত এবং (৩) আলংকারিক। যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হলো সেগুলো যে সম্পূর্ণভাবে সত্য সেটা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় পার্থক্য ঘটে। তবে এই নীতি অনুসারে খামারের কাজ শুরু করলে মোটামুটি ভাবে সফলতা অর্জন করা যায়।

উপশ্রেণীভুক্ত হাঁসের মধ্যে নাগেশ্বরী এবং ভারতীয় রানার সহ খাঁকি ক্যাম্পবেল ব্যবহারিক শ্রেণীর হাঁসের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এরা ভালো সংখ্যায় সারা বছর ধরে ডিম পাড়ে। আবার দ্বৈত শ্রেণীভুক্ত যেসব জাতের হাঁসকে ধরা হয় তার

মধ্যে রয়েছে মাসকোভি, পিকিং, রুয়ে এবং এলিসবেরি। প্রত্যেকটি শ্রেণীর হাঁস ভারী জাতের। কাজেই খামারে পালন করা হয় কেবল মাংসের জন্য। আলংকারিক শ্রেণীর হাঁস পালন করা হয় প্রদর্শনীতে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য।

## ব্যবহারিক শ্রেণীর হাঁস

খামারে পালনের পক্ষে খুবই উপযোগী। এই শ্রেণীর হাঁস সারা বছর ধরে ভালো সংখ্যাতে ডিম পাড়ে। ডিমের আকার যেমন বড় হয় তেমনি ওজনেও বেশ ভারী। প্রতিপালন করার দিক থেকে বিচার করলে খুব একটা বেশি খরচও হয় না। কাজেই এই শ্রেণীর হাঁস পালন করা লাভজনক।

**ইন্ডিয়ান রানার ঃ** রানার হাঁসের মৌলিকতা নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। পূর্ব ভারতে বিভিন্ন উপশ্রেণীভুক্ত দেশী পাতিহাঁসের মিলনের ফলে এই সংকর জাতের হাঁস ইন্ডিয়ান রানার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারণা বা অনুমান বহু ভারতীয় জীব-বিজ্ঞানীর। আবার একদল জীববিজ্ঞানী এই মতোবাদ মোটেই বিশ্বাস করেন না।

রানার হাঁস (পুং) রানার হাঁস (স্ত্রী)

তাঁদের মতে নামটা ভারতীয় রানার হাঁস হলেও ওদের জন্মস্থান বিদেশে। ফ্রান্সের বিভিন্ন শ্রেণীর হাঁসের সঙ্গে মিলনের ফলে সংকর জাতের সৃষ্টি হয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, বর্তমানে ফ্রান্সে অথবা ইউরোপের কোন দেশেই রানার হাঁস পালিত হয় না। তবে ব্রিটেনে মাত্র কয়েকজন খামারী ভারতীয় রানার হাঁস পালন করে। জানা গেছে সেই হাঁসও পালনের উদ্দেশ্যে ভারত থেকে আমদানি করা

হয়েছে। হাঁসের নাম ইন্ডিয়ান রানার, কাজেই ওরা বিদেশী না হয়ে স্বদেশের হাঁস হিসাবে মেনে নেওয়াই ভালো। তাছাড়া খামারীর কাছে রানার হাঁস পালন যখন লাভজনক তখন কোন্ দেশেতে জন্ম সেটা জেনে কি লাভ হবে? যদি উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় ওদের খামারে পালন করা যায় তবে পালনকারীর সাফল্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না।

ইন্ডিয়ান রানার দেশী পাতিহাঁসের মধ্যে উপশ্রেণীভুক্ত হাঁস হলেও ডিম দেবার ক্ষমতা খুবই বেশি। সেই কারণে এই হাঁসকে সংকর শ্রেণীর উন্নত জাতের মুরগি লেগহর্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ছোট, মাঝারি অথবা বড় যে কোন ধরনের খামারের পক্ষে ভারতীয় রানার হাঁস খুবই উপযোগী। অন্যান্য হাঁসের মতো গোলগাল চেহারা নয়, সরু লম্বা ফালির মতো এবং ভারতের বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়াতে নিজেকে খুব ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারে। সংখ্যায় বেশি এবং বড় আকারের ডিম দেবার ক্ষমতা থাকায় ভারতবর্ষ সহ এশিযার আরও দুটো দেশ চীন এবং মালয়েশিয়াতে রানার হাঁসের চাহিদা খামারীদের কাছে খুব বেশি। ডিমের জন্য রানার হাঁস পালন করা হলেও এর আরও দুটো জাত রয়েছে। তারাও ভালো সংখ্যায় ডিম পাড়ে এবং মাংস হিসাবেও ব্যবহার কবা চলে। কারণ মাংস খুবই সুস্বাদু।

সঠিক নিয়মে খামার পরিচালনা করলে একটি ভারতীয় রানার হাঁসের কাছ থেকে সারা বছরে ২২০টি ডিম অবশ্যই পাওয়া যাবে। সব রানার হাঁস এই সংখ্যাতে ডিম পাড়বে সেটা যে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য সেকথা বলা হচ্ছে না। শতকরা দশ ভাগ কম বা বেশি অবশ্যই হতে পারে। এ ব্যাপারে আসল সত্য হলো, হাঁস অথবা মুরগির ডিম উৎপাদনেব ক্ষেত্রে এমন একটা ব্যাপার যা খামারের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং ওদের মৌলিক গুণাগুণের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। একটা হাঁস যার শ্রেণী বা গোত্র জানা সম্ভব হয়নি কিন্তু উপযুক্ত অর্থাৎ সঠিক ব্যবস্থাপনায় যদি পালন করা হয় তবে যেকোন উন্নত শ্রেণীর হাঁসকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যবস্থাপনায় পালন করা হলে তার থেকে বেশি ডিম অবশ্যই পাওয়া যাবে। আবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনায় পালিত হাঁসটির রক্তের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিম পাড়ার প্রবণতা যদি থাকে তবে ডিম পাড়ার সংখ্যা আরও বাড়বে। যে খামারী নির্দিষ্ট খরচের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রার থেকে বেশি ডিম পায়, তার লাভের অঙ্ক নিশ্চয় বাড়বে। কাজেই উন্নত মানের যেমন হাঁস পালন করতে হবে তেমনি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে। তার ফলস্বরূপ হাঁস বেশি সংখ্যাতে ডিম পাড়বে এবং যে পরিমাণ অর্থ খামারে বিনিয়োগ করা হয়েছে তার স্বাভাবিক লাভের থেকেও অতিরিক্ত মুনাফা করা সম্ভব হবে। বিষয়টা কাগজ-কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটা বিজ্ঞানভিত্তিক সত্য। মুরগি পালনের মতো হাঁসের ক্ষেত্রেও বেসরকারি খামার রয়েছে। সেখানে গিয়ে একটু খোঁজ-খবর নিলেই বিষয়টা আরও ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে। কোন খামারী হাঁস পালন করে একবারও লোকসানের মুখ দেখেনি।

যেকোন শ্রেণী বা জাতের হাঁসের সঙ্গে প্রত্যেকের চেহারার একটা মিল থাকে। আকারে কোন শ্রেণীর হাঁস বড় আবার কোন শ্রেণীর হাঁস সেই তুলনায় খুবই ছোট। কোন জাতের হাঁসের গলাটা অস্বাভাবিক লম্বা। তবে জাত এবং শ্রেণী আলাদা হলেও হাঁস হিসাবে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ চেহারা বা শরীরের গঠন প্রণালী প্রায় একই ধরনের।

**ইন্ডিয়ান রানার** হাঁসের দেহের গঠন যেকোন শ্রেণী বা জাতের হাঁসের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ওদের দূর থেকে দেখলেও চিনতে পারা যায়। পা থেকে দেহের সবটাই, এমনকি মাথা পর্যন্ত প্রায় সোজা। ঘাড়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পা দুটো থাকে। একটা বড় আকারের বোতলকে যেমন দেখায় রানার হাঁসকেও ঠিক সেই রকম দেখতে মনে হয়। গলাটাও সরু। ঠোঁট কিছুটা লম্বা ধরনের। উভয় চোখের দৃষ্টি ওপরের দিকে। নিজের বিপদের আশঙ্কায় যদি ছুটে পালায় তাহলে মনে হবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুটছে। আবার চলার সময় মনে হবে হাঁস কিছুটা সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রানার হাঁসের দৌড় এবং ধীর গতিতে চলাফেরা করা দেখে পাশ্চাত্য দেশের মানুষ একে পেঙ্গুইন হাঁস বলেন।

সব শ্রেণীর হাঁস ধীরে ধীরে চলার সময় অথবা শত্রু তাড়া করলে ভয়ে ছুটে পালাবার ক্ষেত্রে কিছুটা হেলেদুলে চলে। ভারতীয় রানার হাঁস মোটেই ঐভাবে চলে না। মানুষের মতো সোজা অবস্থায় চলন ওদের জন্মগত স্বভাব। রানার হাঁসের বাচ্চা যদি অন্য শ্রেণীর হাঁসের সঙ্গে পালিত হয় তাহলেও ওরা সোজা অবস্থায় হাঁটবে অথবা ছুটবে।

যেসব রানার হাঁস ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে পালন করা হয় তাদের দেহের সব জায়গার পালকের রঙ দুধের মতো সাদা হয়। ঠোঁটের পর থেকে পায়ের গাঁট অবধি পালকে ঢাকা থাকে। আর পালক থাকে খুবই ঘন অবস্থায়। মাথার খুলি থেকে পায়ের পাতার ঠিক ওপর অবধি মাপটা হয় ২৬ থেকে ৩০ ইঞ্চির মধ্যে। পুরুষ রানার হাঁসের দেহের ওজন স্ত্রী হাঁসের থেকে কিছুটা বেশি। উত্তম পরিচর্যার মাধ্যমে যদি পালন করা হয় তবে একটা রানার পুরুষ হাঁসেব ওজন আড়াই কেজি পর্যন্ত হতে পারে। অপরদিকে স্ত্রী হাঁসের ওজন দু' কেজির কাছাকাছি হয়।

ইন্ডিয়ান রানার হাঁস পরিণত হবার আগে ওদের স্ত্রী এবং পুরুষ চেনবার সহজ উপায় হচ্ছে ওদের গলার আওয়াজ বা স্বর। স্ত্রী হাঁস ডাকবার সময় 'কোয়াক—কোয়াক' শব্দ করে। আর পুরুষ হাঁস হলে 'হিস্—হিস্' শব্দ বের হয় ওদের ডাকবার সময়। তবে পুরুষ রানার হাঁস ডাকবার সময় খুব নিচু গলায় ডাকে। হাঁসের স্ত্রী এবং পুরুষ এইভাবে চেনবার পদ্ধতিকে বলা হয় যৌনতা অনুসারে পৃথকীকরণ। এর ইংরেজি নাম সেক্সচুয়াল সেপারেশন। আবার পুরুষ হাঁসকে ইংরেজিতে ড্রেক এবং স্ত্রী হাঁসকে ডাক (Duck) বলা হয়।

খামারে রানার হাঁস পালন করা সব থেকে লাভজনক। তার প্রধান কারণ হলো, এরা খুব তাড়াতাড়ি পরিণত হয়। অর্থাৎ দ্রুত উৎপাদনকারী হাঁস হিসাবে পৃথিবীর

প্রায় দেশেই সুনাম অর্জন করেছে। মাত্র আড়াই থেকে তিন মাস খামারে পালন করলে ওরা পরিণত হয়। তারজন্য পুরুষ রানার হাঁসের আড়াই থেকে পৌনে তিন মাস বয়স হলেই প্রজননের উপযুক্ত পূর্ণ শক্তি লাভ করে। স্ত্রী রানার হাঁসও একই ক্ষমতার অধিকারী হয় পুরুষের মতো কম বয়সে। এইভাবে এত কম বয়সে স্ত্রী হাঁসের ডিম পাড়া এবং পুরুষের প্রজননের কাজ শুরু করা হলেও উভয়ের স্বাস্থ্যের কোন রকম ক্ষতি হয় না। সুতরাং সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে রানার হাঁস পালন করা খামারীর কাছে খুবই লাভজনক।

গ্রামে-গঞ্জে যারা দেশী হাঁস নিজের প্রয়োজনে সামান্য সংখ্যাতে পালন করে তাদের হাঁস পালন পদ্ধতি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। তারা যদি উন্নত মানের হাঁস পালন করে বেশি সংখ্যায় এবং বড় আকারে ডিম পাবার উদ্দেশ্যে সেই সব হাঁসও পালিত হয় সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ভাবে। শুধু তাই নয় দেশী অনুন্নত পুরুষ হাঁসের সঙ্গে উন্নত জাতের স্ত্রী হাঁসের দৈহিক মিলনের ফলে উন্নত জাতের স্ত্রী হাঁসের গুণাবলী ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি গ্রামের অজ্ঞ খামারীরা বিশ্বাস করে মুরগির সঙ্গে হাঁসের বাচ্চাদের পালন করলে তারা বেশ শক্তিশালী হয় এবং বেশি সংখ্যাতে ডিম পাড়তে থাকে। এসবই না জানার ফল। কারণ এর কোন বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। যে সব দেশী মুরগি তাদের বাচ্চাদের উভয় ডানার নিচে রেখে ঠাণ্ডা এবং অতিরিক্ত গরমের হাত থেকে রক্ষা করে, ফলে মুরগির বাচ্চারা আরাম বোধ করে এবং মৃত্যুর হার কমে যায়। হাঁসের বাচ্চার জন্য যত্ন বা পরিচর্যার প্রয়োজন। তবে মুরগির বাচ্চার মতো দীর্ঘ দিন ধরে নয়। মাত্র তিন থেকে পাঁচ দিন শীতের দু' মাস সামান্য তাপের মধ্যে রাখতে হয়। তারজন্য দেশী মুরগির প্রয়োজন নেই, ব্রুডার বাক্স অথবা ব্রুডার হাউস (বেশি সংখ্যাতে বাচ্চা থাকলে) ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্রুডার বাক্সকে লালন-পালন যন্ত্র বলা হয়। আর ব্রুডার হাউস হচ্ছে তাপ ঘর। কেরোসিনের বাতি, হ্যাজাক অথবা বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করা হয় উত্তাপের জন্য। কাজেই এর জন্য দেশী মুরগির কোন প্রয়োজন হয় না।

ইন্ডিয়ান রানার বেশি সংখ্যাতে যেমন ডিম পাড়ে তেমনি পাওয়া যায় প্রচুর উর্বর ডিম। বড় আকারের খামার হলে উর্বর ডিম থেকে বাচ্চা তোলা তখন সমস্যার ব্যাপার হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে ডিমে তা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার স্ত্রী হাঁস পাওয়া যায় না। তাছাড়া রানার হাঁস বেশি ডিম দেবার জন্য তারা সহসা তা দিতে বসতে চায় না। কাজেই দেশী পাতিহাঁসের সাহায্য নিতে হয়। কারণ এরা ডিমে তা দিতে অভ্যস্ত। কেবল রানার হাঁসের উর্বর ডিম নয়, মাংসের জন্য পালিত মাসকোভি হাঁসের ডিমও বাচ্চা ফোটাবার জন্য দেশী স্ত্রী পাতিহাঁসকে ব্যবহার করা চলে।

বাচ্চা ফোটাবার কাজে দেশী পাতিহাঁস ব্যবহার করা হলে খুবই সাবধানতার সঙ্গে কাজটি করা উচিত। কারণ যে পাতিহাঁস ডিমে তা দিতে বসবে তার পাডা

ডিমকে সরিয়ে তার পরিবর্তে উন্নত জাতের হাঁসের ডিম বসাতে হয়। ডিম পালটে দেবার সময় হাঁস যদি কোন ভাবে বুঝতে পারে তবে ডিমে তা দিতে বসবে না। যদিও বা বসে তবে যে কোন সময়ে ঠুকরে ভেঙে দিতে পারে। সুতরাং ডিম পালটাবার সময় ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার করে তবেই কাজটি করতে হবে।

যে ঘরে হাঁস ডিমে তা দেবে সেই ঘরে কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে ঢুকতে দেওয়া চলবে না। কারণ হাঁস ভয় পাবে এবং ডিমে তা না দিয়ে উঠে পড়বে। হাঁসেদের প্রতিদিন যে ব্যক্তি পরিচর্যা করছে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তারও ঐ ঘরে যাওয়া উচিত নয়। কারণ এতে হাঁস বিরক্ত বোধ করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। এব্যাপারে সার কথা হলো, ডিমে তা দেবার ঘরটি থাকবে অন্ধকার। কেবল প্রতিদিনের পরিচিত পরিচর্যাকারী বিশেষ প্রয়োজনে ঘরে ঢুকবে এবং তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বাইরে চলে আসবে। ডিমে তা দেবার সময় নির্জনতা হাঁস খুবই পছন্দ করে।

ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার পর কয়েক ঘণ্টা বাদেই ওরা ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারে। তবে জন্মের পর দু'দিন পর্যন্ত বাচ্চারা কোন অবস্থাতেই বড় জলাশয় অথবা ছোট আকারের চৌবাচ্চার (যার পাড়টা জমি থেকে তিন-চার ইঞ্চি উঁচু) কাছে না যায়। পিপাসা মেটাতে যে সামান্য পরিমাণে জল ওরা পান করবে সেই জলপাত্র এতটাই গভীর যেন না হয় যার মধ্যে বাচ্চার ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকে। তবে পাত্র থেকে জল পান করতে বাচ্চাদের যাতে কোন রকম অসুবিধে না হয় সেই ধরনের জলপাত্র রাখতে হবে। সব শ্রেণীর হাঁসের বাচ্চার জন্য এই নিয়মটা অবশ্যই পালন করা দরকার।

বড় অথবা মাঝারি আকারের খামার হলে প্রতিদিন গড়ে ৪০ থেকে ৬০টি উর্বর ডিম পাওয়া যাবে। খামারে হাঁসের সংখ্যা বাড়ানো অথবা বাচ্চা বিক্রি করার প্রয়োজন থাকলে (বাচ্চা বিক্রি করলে খামারে অতিরিক্ত আয় হবে) তখন ডিম ফোটাবার জন্য ইনকিউবেটার খামারে রাখতে হবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে একসঙ্গে বহু সংখ্যায় হাঁসের বাচ্চা পাওয়া সম্ভব। এই যন্ত্র বিদ্যুৎ-শক্তি সহ কেরোসিন ইত্যাদির মাধ্যমে চালানো যায়। কাজেই গ্রামাঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎশক্তি নেই সেখানে কেরোসিন তেলের সাহায্যে ইনকিউবেটার চালাতে পারা যাবে। এব্যাপারে পরে অবশ্যই আলোচনা করা হবে।

তুচ্ছ কারণে ভয় পাওয়া, হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া এবং সব বিষয়ে কৌতূহল প্রায় সব শ্রেণীর হাঁসের স্বভাব বলতে পারা যায়। কাজেই রাতে থাকবার জন্য বাসস্থান বা ঘর এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে কোন কারণে তারা ভয় না পায়। রাতে ওদের ঘরে কোন অচেনা লোকজন যেন প্রবেশ না করে। এমনকি যে লোক হাঁসগুলিকে প্রতিদিন পরিচর্যা করছে তার হঠাৎ অন্য ধরনের পোশাক পরে ওদের সামনে আসাটা ঠিক নয়। দিনের বেলা কোন অচেনা মানুষ যদি রঙিন পোশাক পরে হাঁসের কাছে আসে তবে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। স্ত্রী হাঁস ডিম পাড়া

পর্যন্ত সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দিতে পারে। হাঁস এতই নিরীহ প্রাণী যে চরম শত্রুকে পর্যন্ত আঘাত করতে ভয় পায়। সামান্য বিপদ বুঝলেই সেখান থেকে যে কোন ভাবে পালায়। বারোমাস যে ব্যক্তি ওদের পরিচর্যা করছে একমাত্র তাকেই নিরাপদ ভাবে এবং তার গলার আওয়াজের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়।

রাতে ঘরের মধ্যে যখন ঘুমিয়ে থাকে অথবা বিশ্রাম করে সেই সময় কোন কারণে ভয় পেলে সকলে মিলে ডাকতে থাকে। পরিচর্যাকারী যদি ওদের উদ্দেশে কিছু বলে তখন পরিচিত মানুষের গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারে ভয়ের কিছু নেই। তখন চিৎকার বন্ধ করে এবং শান্ত হয়ে যায়। অনেক সময় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে শিয়াল, কুকুর, বিড়াল হাঁসের ঘবের দরজার সামনে ঘোরাফেরা করে অথবা থাবা দিয়ে ধাক্কা দেয়। এসব ঘটনা ঘটলে হাঁস ভীষণ ভয় পায়। এতটাই ভয় পায় যে কিছু সময়ের জন্য ওদেব নার্ভগুলো পর্যন্ত অকেজো হয়ে যায়। এই রকম অবস্থায় একমাত্র পরিচর্যাকারী মুখে কিছুটা জোবে 'কোযাক' শব্দ করে জানিয়ে দেয ভয পাবার কিছু নেই। এরপব হাঁসেরা শান্ত হয়। এই সব কারণের জন্য পরিচর্যাকাবীকে বিশেষ কবে রাতের দিকে সতর্ক থাকতে হয়। অন্ধকার রাতে হাঁসগুলির মন থেকে ভয় দূর করার ভালো পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে।

খামারে হাঁসগুলিব পরিচালনা কবা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে ধরা হয়। কাবণ এটা ঠিক মতো করা না হলে হাঁসের নিয়মিত ডিম পাড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় আবার মন্দ পবিচালনার জন্য হাঁস চিরকালেব মতো অক্ষম হয়ে যায। এরকম ঘটনা ঘটলে খামাবীর চরম লোকসান।

কোন প্রয়োজনে হাঁসকে যদি ওপবে তুলতে হয তবে কোন ক্ষেত্রেই ওদের পাখনা ধরে তোলা উচিত নয়। ওদের তুলতে হলে ঘাড়টা ধবে তবেই তুলতে হয়। আবার দূরে কোথাও নিয়ে যেতে হলে হাঁসকে ডান হাতের ওপব বসাতে হবে। তারপর হাঁসের গলাটা বগলের নিচে দিয়ে বাইবে বেব কবা অবস্থায় থাকবে। এইভাবে হাঁসকে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া (একটি মাত্র হাঁসকে) উভয়ের কাছে অর্থাৎ বাহক এবং হাঁসের পক্ষে সুবিধাজনক। অবশ্য সংখ্যাতে বেশি হাঁস হলে তখন ঝুড়ি করে এবং ওপরে জাল দিয়ে ঢেকে মাথায় করে নিযে যাওয়া যায়।

**খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস :** এই শ্রেণীব হাঁসটিও ব্যবহারিক শ্রেণীর হাঁস। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খামারীরা খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস প্রতিপালন করে থাকে। ডিম পাড়ার ক্ষেত্রে সব শ্রেণীর হাঁসের থেকে এদের স্থান শীর্ষে। সেই কারণে ডিম উৎপাদনের জন্য পালিত-বিভিন্ন জাতের হাঁসের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশে খামারীদের মধ্যে খাঁকি ক্যাম্পবেল খুবই জনপ্রিয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর হাঁসটিকে ভারতের পাখি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তবে এটা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে খাঁকি ক্যাম্পবেল ইংলণ্ডের হাঁস এবং এই সংকর জাতটি তৈরি করা হয়েছে। আজ থেকে প্রায় শতাধিক বছর আগে এক ইংরেজ মহিলা তাঁর দেশের হাঁসের সঙ্গে ভারতের কয়েকটি হাঁসের জাতের মধ্যে

দৈহিক মিলন ঘটিয়ে এই বিশেষ সংকর জাতের হাঁস সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে ভদ্রমহিলার নাম অনুসারে হাঁসের নাম দেওয়া হয় খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস। হাঁসের দেহের অধিকাংশ পালকের রঙ খাঁকি হবার ফলে প্রথমে খাঁকি শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

সারা দেহে খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের পালকগুলো সুন্দরভাবে সাজানো থাকার ফলে ওদের দেখতে ভালো লাগে। দেহের সব জায়গায় পালকের রঙ খাঁকি হলেও গলার পালকের রঙ খাঁকি নয়। কালচে ধরনের এবং সবুজ আভাযুক্ত। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে পালক একই রকম হয়ে থাকে। আবার কিছু ক্ষেত্রে পায়ের ওপর থেকে মলদ্বার পর্যন্ত পালকগুলো বাদামী আভাযুক্ত এবং তাম্র বর্ণ।
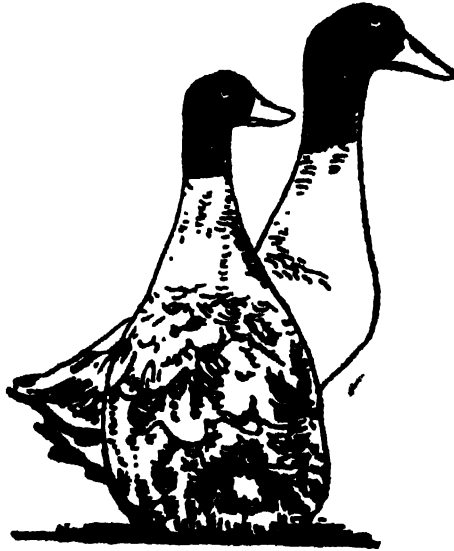
খাঁকি ক্যাম্পবেল স্ত্রী হাঁস

সাধারণভাবে একটি হাঁসের দেহে তিন রকম রঙের পালক দেখতে পাওয়া যায়। স্ত্রী হাঁসের পালকের রঙের ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম রয়েছে। পুরুষ হাঁসের ক্ষেত্রে দেহের সব জায়গায় পালকের রঙ খুবই উজ্জ্বল। আর স্ত্রী খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসেব কোমরের পালকের রঙ হবে হালকা। দেহের বাকি অংশের পালকের রঙ অবশ্য উজ্জ্বল দেখাবে।

যদিও এই শ্রেণীর হাঁসের নাম খাঁকি ক্যাম্পবেল, আসলে প্রকৃত উন্নত জাতের পালকের রঙ খাঁকি নয়। কাজেই আগে স্ত্রী এবং পুরুষ হাঁসের দেহের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটা আসল সংকর জাতের খাঁকি ক্যাম্পবেল নয়। জাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি থাকায় হাঁস নিম্ন মানের হওয়ায় পালকের রঙ ঐরকম হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে ভারতের খামারীরা না জানার ফলে নিম্ন মানের ক্যাম্পবেল হাঁস পালন করে।

যেগুলো উন্নতমানের খাঁকি ক্যাম্পবেল অর্থাৎ সঠিক নিয়ম অনুসারে সংকর জাত সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের দেহের পালকের রঙ সম্পূর্ণ সাদা। স্ত্রী এবং পুরুষের চোখেব রঙ হলুদ। সেই কারণে ওদের বলা হয সাদা ক্যাম্পবেল। উন্নত মানের হাঁস, সেই কারণে খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের থেকে সারা বছরে অনেক বেশি সংখ্যাতে ডিম পাড়ে। মাংসের জন্য পুরুষ হাঁস পালন করা হলে তাদের ওজনও বেশি হয়ে থাকে। তাছাড়া মাংস সুস্বাদু এবং পরিণত হলেও ছিবড়ে হয় না। ভারতের গ্রামাঞ্চলে যে সামান্য সংখ্যক খামারী ক্যাম্পবেল হাঁস পালন করে তারা সবই নিম্ন মানের খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসকেই উন্নত জাত হিসাবে ধরে নেয়। খামারীদের এ বিষয়ে অজ্ঞতা এবং ঠিকমতো প্রচার না হবার জন্য অজ্ঞ খামারীরা একই খরচ এবং পরিশ্রম করে সর্বাধিক উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হয়।

উন্নত ক্যাম্পবেল হাঁসেব বৈশিষ্ট্য হলো, ওরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে একটি পুরুষ হাঁসের দেহের ওজন সোয়া দু' কেজি থেকে আড়াই কেজি পর্যন্ত হয়। আবার একই বয়সে স্ত্রী হাঁসের ওজন সামান্য কম হয়ে থাকে। তবে দু' কেজিব কম নয়, বরঞ্চ কিছু বেশি হয।
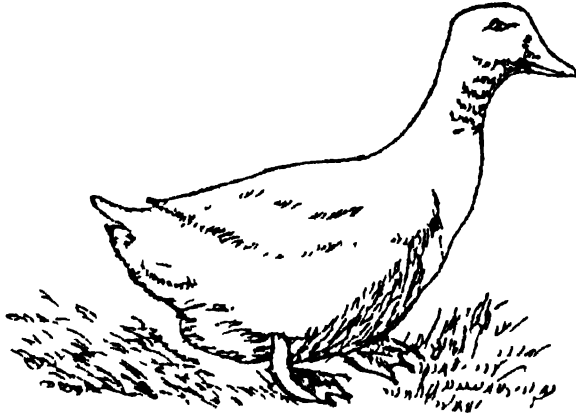
সাদা ক্যাম্পবেল হাঁস

খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস সারা বছরে উপযুক্ত পরিচর্যায় ২২০টি ডিম পাড়ে। উন্নত সাদা ক্যাম্পবেল হাঁস সারা বছরে ৩০০টি ডিম অবশ্যই পাড়বে। যদি উত্তমভাবে লালন-পালন করা হয় তাহলে আরও ২৫টি ডিম বেশি পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন শ্রেণীর দেশী পাতিহাঁস এবং ভারতীয় রানার উভয়ের ডিমের আকার যেমন ছোট তেমনি একটি ডিমের ওজন ৫৬ গ্রাম থেকে ৫৮ গ্রামের বেশি হয় না। তাছাড়া ওরা ডিম পাড়তে শুরু কবে ছ' মাস বয়স হলে। স্ত্রী ক্যাম্পবেল হাঁস সাড়ে চার মাস বয়স হলেই ডিম পাড়তে শুরু করে। আবার ডিম যেমন পুষ্টিকর তেমনি সুস্বাদু। ডিম আকারেও বড় এবং একটি ডিমের ওজন খুব কম করে ৭৫

গ্রাম এবং বেশি হলে ৮০ গ্রামও হয়ে থাকে। আকারে বড়, ওজনে ভারী এবং খেতেও ভালো লাগে। ফলে বাজারে অন্য হাঁসের ডিমের থেকে বেশি দামেতে বিক্রি হয়। ক্যাম্পবেল হাঁস গড়ে বেশি সংখ্যাতে ডিম পাড়লেও কোন স্ত্রী হাঁস দশ বছর আবার কিছু ক্ষেত্রে বারো বছর অবধি ডিম পাড়তে থাকে। তবে স্ত্রী হাঁস সাড়ে চার মাস বয়স থেকে ডিম পাড়তে শুরু করে চার বছর অবধি উত্তম পরিচর্যায় সারা বছরে ৩০০ থেকে ৩২০টি পর্যন্ত ডিম পেড়ে যায়। এরপর ডিম পাড়ার সংখ্যা কমতে থাকে। তবে কোন ক্ষেত্রেই দেশী পাতিহাঁসের থেকে ডিম পাড়ার হার কমে না। একেবারে বৃদ্ধ বয়সেও বছরে ১৫০টি ডিম দিতে থাকে। সাধারণভাবে দেখা গেছে ক্যাম্পবেল হাঁস পাঁচ বছর পর্যন্ত বছরে ৩২০টি করে ডিম দেবার পর ধীরে ধীরে কমতে থাকে। তখন বছরে ২০০টি করে ডিম পাড়ে। খামারীর উচিত সেই হাঁসকে আর পালন না করে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কেই মাংসের জন্য বাজারে বিক্রি করে দেওয়া। অনেকে ডিমের জন্যও কিনতে পারে, ফলে দামটা বেশি পাওয়া যায়। আর মাংসের জন্য কিনলেও ঠকবার কোন আশঙ্কা নেই। কারণ ক্যাম্পবেল হাঁসের ৬ বছর বয়স হলেও স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের মাংস নরম থাকে এবং মাংস ছিবড়ে হয় না। তাছাড়া মাংসের স্বাদও ভাল থাকে।

ক্যাম্পবেল হাঁসের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় কথা হলো, যে কোন আবহাওয়াতে ওদের পালন করা যায়। যদিও দেশী পাতিহাঁস সহ ভারতীয় রানার হাঁসের খুবই কষ্টসহিষ্ণু হিসাবে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে এবং ঠাণ্ডা ও গরম আবহাওয়াতে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। ক্যাম্পবেল হাঁসের ক্ষমতা উল্লেখ করা হাঁসের থেকেও বহুগুণ বেশি থাকায় পৃথিবীর সব দেশেই খামারীরা আগ্রহ সহকারে পালন করে থাকে।

সাধারণভাবে আমরা সবাই জানি, জলাশয় ছাড়া হাঁস পালন করা সম্ভব নয়। একমাত্র ক্যাম্পবেল হাঁসকে জলাশয় ছাড়াও পালন করা চলে। এভাবে পালন করার জন্য কোন ক্ষতি হয় না। হাঁস স্বাভাবিকভাবে বড় হতে থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। স্ত্রী হাঁস উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় সারা বছরে ৩২০টি করে ডিম পাড়ে পাঁচ বছর ধরে।

কেবল জল ছাড়া পালন নয়, ডিম পাড়া মুরগিকে যেভাবে ডিপ লিটার পদ্ধতিতে পালন করা হয় ঠিক সেইভাবে ক্যাম্পবেল হাঁসকেও পালন করা চলে। কেবল পানীয় জলটা বেশি পরিমাণে লাগে। কারণ ওরা একটু একটু করে খায় এবং একবার করে গলাটা জলে ডুবিয়ে সামান্য জল পান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খাঁকি ক্যাম্পবেল স্ত্রী হাঁস মাত্র সাড়ে চার মাস বয়স হলেই ডিম পাড়তে শুরু করে। সব শ্রেণীর হাঁসের থেকে সারা বছরে বেশি সংখ্যাতে ডিম পাড়ে। ডিমের আকার বড় এবং ওজনও বেশি। পাঁচ বছর বাদে বিক্রি করলে মাংস নরম থাকে এবং ছিবড়ে হয় না। দেশী পাতিহাঁস এবং ভারতীয় রানার থেকে দেহের ওজন বেশি হয় এবং জলাশয় ছাড়া পালন করা চলে। একমাত্র ক্যাম্পবেল হাঁস

ছাড়া আর কোন শ্রেণীর হাঁস পালন করলে খামারী এত রকমের সুবিধা পাবে না। যে শ্রেণীর হাঁসের মধ্যে এতগুলো গুণ রয়েছে তাদের খামারে পালনের আগ্রহ পৃথিবীর সব দেশেই খামারীদের মধ্যে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

চরম গরম ও ঠাণ্ডা, এমনকি সারা বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি সেই ধরনের আবহাওয়াতে ক্যাম্পবেল হাঁস যেমন মানিয়ে নিতে পারে তেমনি অন্যান্য শ্রেণীর হাঁসের থেকে বেশ কয়েকটি ক্ষতিকারক রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা ওদের শরীরে রয়েছে। আবার এই শ্রেণীর স্ত্রী হাঁসের শরীরে একটি বিশেষ গুণ হলো, পুরুষ খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের সঙ্গে দৈহিক মিলন ছাড়াও নির্দিষ্ট হারে ডিম পাড়তে পারে। অথচ অন্যান্য শ্রেণীর হাঁসের ক্ষেত্রে সেটা মোটেই সম্ভব হয় না। তবে পুরুষ হাঁসের সঙ্গে মিলন ছাড়াই যে ডিম পাওয়া যায় সেই ডিম উর্বর নয়। ফলে তার থেকে বাচ্চা পাওয়া যায় না। তবে ডিমের পুষ্টিমূল্য যেমন বজায় থাকে তেমনি স্বাদের কোন তারতম্য ঘটে না। এমন কি ডিমের আকার এবং ওজন একই থাকে।

খামাবে হাঁস পালন করলে আরও একটি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। অবশ্য এটা কেবল ক্যাম্পবেল হাঁসের ক্ষেত্রে নয়, যে কোন জাত বা শ্রেণীর হাঁস পালনের ক্ষেত্রে খামাবী এই সুবিধা ভোগ করে। মুবগি পালন করা হলে ওরা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ডিম পাড়ে। সেই কারণে ডিম সংগ্রহ করবার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। কারণ বহু মুরগির অভ্যাস আছে ডিম পাড়বার পর পনের থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে কোন রকম খাদ্যদ্রব্য না পেলে নিজের অথবা অপরের পাড়া ডিম ঠুকরে খেয়ে ফেলে। বড় খামার হলে এইভাবে রোজ আট থেকে দশটি ডিম নষ্ট হয়। তা হলে সারা বছরে আড়াই থেকে তিন হাজার ডিম লোকসান হয়। অপরদিকে সব শ্রেণীর হাঁস ভোর থেকে সকাল ন'টার মধ্যে ডিম পাড়ে। সুতরাং উল্লেখ করা সময় পার হবার পর ডিম সংগ্রহ করবার জন্য নজব রাখার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

হাঁসের ডিমের পুষ্টিমূল্য মুরগির ডিমের থেকে অনেক বেশি। এমনকি হাঁসের ডিম যদি অনুর্বর হয় তাতেও ডিমের পুষ্টিমূল্য সামান্য পরিমাণেও কমে না। মুরগি এবং হাঁস, উভয় ডিমের পুষ্টিমূল্যের একটা তালিকা দেওয়া হচ্ছে। সেটা দেখলেই বিষয়টা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারা যাবে।

### তালিকা

| বিভিন্ন উপাদান | মুরগির মাংস | হাঁসের মাংস |
|---|---|---|
| জল | ৬৫ ভাগ | ৫৪ ভাগ |
| প্রোটিন | ২০ ভাগ | ১৪ ভাগ |
| ফ্যাট (চর্বি) | ১২ ভাগ | ৩০ ভাগ |
| খনিজ পদার্থ | ১ ভাগ | ৩ ভাগ |
| শক্তি (কিলো ক্যালরি) প্রতি ১০০ গ্রামে | ১৫৫ ভাগ | ৩৫০ ভাগ |

তালিকাটি দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারা যাচ্ছে উপাদান হিসাবে একমাত্র প্রোটিন হাঁসের মাংস থেকে মুরগির মাংসে বেশি রয়েছে। যারা মাংস খায় না অথচ উভয় পাখির ডিম খেয়ে থাকে তারাও হাঁসের ডিম থেকে মুরগির ডিম অপেক্ষা অনেক বেশি পুষ্টিমূল্য পেয়ে থাকে। অবশ্য দুটো মূল্যবান উপাদান হাঁসের ডিমে মুরগির থেকে বেশি পরিমাণে রয়েছে। আগে মাংসের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ভাগের কথা উল্লেখ করা আছে। প্রকৃতপক্ষে শতকরা হিসাবে ধরতে হবে। হাঁসের ডিমে প্রোটিনের পরিমাণ হল শতকরা হিসাবে ১৩ ভাগের কিছু বেশি। অথচ মুরগির ডিম থেকে পাওয়া যায় ১২ ভাগ। আবার হাঁসের ডিমে চর্বি বা ফ্যাটের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১৫ ভাগ। আর মুরগির ডিমেতে রয়েছে ১১ ভাগ। আর উভয়ের ডিমে খনিজ পদার্থের পরিমাণ ১ ভাগ করে। শক্তি অর্থাৎ ক্যালরি-র মাত্রা হাঁসের ডিমে ২০০ ভাগ। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে মুরগির ডিমে শক্তি মাত্রার পরিমাণ হাঁসের তুলনায় অনেক কম। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাত্র ১৬৫ ভাগ। শর্করা জাতীয় উপাদান হাঁসের ডিমেতে পাওয়া যায় ৫০০ মিলিগ্রাম। আর মুরগির ডিমেতে রয়েছে ৯৫০ মিলিগ্রাম। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোন খাদ্যে শর্করা জাতীয় উপাদান বেশি মাত্রায় থাকলে বিশেষ কয়েকটি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া ক্ষতিকর।

ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে যে তথ্য এখানে দেওয়া হলো সেটা পুষ্টিবিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখে তবেই এই তথ্য দিয়েছেন। কোন্ জাত বা শ্রেণীর (হাঁস অথবা মুরগি) ডিম নেওয়া হল সেটা কোন প্রশ্ন নয়। এমনকি ডিমের আকৃতি এবং ওজন সেটাও দেখা হয় না। যে কোন জাত বা শ্রেণীর হাঁস অথবা মুরগির ডিম হতে পারে। পরীক্ষা করা হবে হাঁস অথবা মুরগি যে কোন একটি পাখির ডিম। পরিমাণ হবে ১০০ গ্রাম এবং ডিমের ওপরের খোলা ছাড়ানো থাকবে। তারপর হিসাবে করে দেখা হবে ১০০ গ্রাম ডিমে কোন্ উপাদান কতটা পরিমাণে রয়েছে।

## রাজহাঁস (Geese)

ভারতবর্ষে যে ধরনের রাজহাঁস সচরাচর পরিলক্ষিত হয়—তাদের অধিকাংশের রং-ই সাদা। তবে তামাটে (brown) রংযুক্ত (বিশেষ করে পিঠের অংশ) রাজহাঁসও ভারতের কোন কোন অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। ভারতীয় রাজহাঁসেরা কোন-না-কোনভাবে চীনদেশীয় রাজহাঁসের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত।

কিন্তু সাদা জাতের রাজহাঁস এবং তামাটে (brown) রংয়ের রাজহাঁসের সংমিশ্রণে যদি বর্ণ সঙ্কর হাঁস সৃষ্টি করা হয়—তবে তাদের বংশধরগণ মিশ্র রংযুক্ত হবে না—হয় সাদা হবে, নতুবা তামাটে (brown)—তাদের পেট সাদা রংযুক্ত কিন্তু ডানা, পিঠ এবং মাথার রং তামাটে বর্ণের হবে। বুক হবে হালকা তামাটে বা বাদামী রংয়ের, কিন্তু গলা সাদা হবে।

আর সাদা রংযুক্ত রাজহাঁসদের শরীরের সকল অংশই (পেট এবং পা ব্যতীত) ধব্‌ধবে সাদা হবে।

## দেশী ও বিদেশী প্রধান প্রধান শ্রেণীর রাজহাঁসের নামের তালিকা

১। ইংলিশ হোয়াইট (English White)

২। এমডেন (Emden)

৩। হোয়াইট চাইনিজ (White Chinese)

৪। রোমান টাউলাউস (Roman Toulouse)

৫। ইংলিশ গ্রে (English Grey)

৬। ভারতীয় রাজহাঁস (Indian Goose)

৭। ফার্ন চাইনিজ (Farn Chinese)

এমডেন (Emden) জাতের বাজহাঁস হচ্ছে ওজনে সবচেযে বেশি ভারি, আর ভাবতীয় রাজহাঁস হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ওজনে হালকা।

মাংসের প্রয়োজনেই সচরাচব রাজহাঁস প্রতিপালন করা হয়ে থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী-জাতীয় রাজহাঁসের গড় ওজন যথাক্রমে ৩-৫ কিলোগ্রাম এবং ৩ কিলোগ্রাম হযে থাকে। আর পিওরব্রেড (Purebred) রাজহাঁসের গড় ওজন ১২ সপ্তাহ বয়সে ৪ কিলোগ্রাম এবং ২৪ সপ্তাহ বয়ঃক্রম কালে পিওরব্রেড রাজহাঁসের ওজন ৬ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। যে সব রাজহাঁস পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস খেয়ে থাকে—সেই সকল রাজহাঁসের মাংস খেতে সুস্বাদু।

স্ত্রী-জাতীয় বাজহাঁস শীতকালে অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে জানুযারি পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ১০ থেকে ২০টি ডিম দেয়। স্ত্রী-রাজহাঁসেরা সচরাচর ১ দিন অন্তর অন্তর সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে ডিম পাড়ে। রাজহাঁসের প্রতিটি ডিমের গড় ওজন প্রায় ১২৮ গ্রাম।

## রাজহাঁস পালন ও পরিচর্যা ব্যবস্থা

রাজহাঁসের কযেক সপ্তাহ বয়স হলেই—তারা নিজেরাই ঘাস, শামুক ও পোকামাকড় (insects) সংগ্রহ করে খেতে পারে। যে সকল স্থানে জলাশয় এবং প্রচুর পরিমাণে ঘাস রয়েছে—সেক্ষেত্রে তারা তাদের খাদ্য নিজেরাই—পেটভরে খেতে পারে—অন্য প্রকার খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হয় না। লনের ঘাস তারাই খেয়ে খেয়ে ছাঁটাই (clipped close) করে ফেলতে পারে। ঘাসই হচ্ছে রাজহাঁসের প্রধান খাদ্য।

কিন্তু দৈহিক বিশেষ পুষ্টির জন্য এদের শস্যের দানা (grain feed) খাদ্য হিসাবে দেওয়া চলতে পারে। এদের ম্যাশ (mash) খাদ্য আর্দ্র বা জলে ভিজিয়ে দেওয়া আবশ্যক। সবুজ শাক-সবজি, ভুসি, ঝিনুকের গুঁড়ো ইত্যাদি খাদ্যতালিকায় রাখা সঙ্গত। ৯ খেকে ১২ মাস বয়স্ক অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই রাজহাঁস বিক্রি করা সঙ্গত।

পিওরব্রেড এমডেন (Purebred Emden) বা টাওলাউস পুরুষ জাতীয় রাজহাঁসের সঙ্গে স্ত্রী-জাতীয় ভারতীয় রাজহাঁসের উত্তম জাতের বর্ণ-সংকর রাজহাঁস সৃষ্টি করা সম্ভব। আবার ঐ বর্ণ-সংকর রাজহংসীদের সঙ্গে পিওরব্রেড (বর্ণ-সঙ্কর নয়) এরূপ রাজহংসের (পুং) ব্রীড করে উত্তম জাতের রাজহাঁস সৃষ্টি করা সম্ভব।

ছটি স্ত্রী জাতীয় রাজহাঁসের জন্য একটি পুরুষ রাজহাঁস প্রয়োজন। ছোট জাতের রাজহাঁসের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বের করতে ৩০ থেকে ৩৫ দিন সময় আবশ্যক। একটি স্ত্রী-জাতীয় রাজহাঁস একসঙ্গে ১৫টি ডিমে তা দিতে পারে।

দশটি রাজহাঁসের জন্য ৯ বর্গ মিটার floor-space প্রয়োজন।

রাজহাঁসেরা সচরাচর কোন রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। অতএব ঐ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন হয় না। একটি স্বাস্থ্যবান রাজহাঁসের স্বাভাবিক গাত্রতাপ ৪২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (১০৭·৬ ডিগ্রী ফারেনহিট)। শ্বাসকার্য (Respiration) মিনিটে ২০ থেকে ২৫ বার। বক্ষ স্পন্দন (heart beat) প্রতি মিনিটে ১১০ বাব।

## হাঁসের জাত অনুসারে পালন

হাঁসের প্রজাতি অনুসারে যদি তাদের পালন করা না হয় তবে পালনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ এমন কিছু হাঁস রয়েছে যাদের খামারে ভালো পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে পালন করা হলেও সারা দিনে খুব কম করে জলেতে ঘুরে ঘুরে সাঁতার কাটার জন্য দশ ঘন্টা ছেড়ে দিতে হবে। আবার এমন জাতেরও হাঁস রয়েছে যাদের মাঠে ঘুরতে দিলে ভালো থাকবে। তাদের জন্য কোন রকম পুকুর-ডোবা বা অন্য ধরনের জলাশয়ের প্রয়োজন হয় না। ভারতে পালিত এমন জাতেরও হাঁস রয়েছে যাদের ঘরেতে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা দরকার। এদের জলে সাঁতার কাটতে দিলে ডিম পাড়ার হার কমে যাবে। এবার দেখা যাক কোন্ জাতের হাঁসকে কিভাবে পালন করা হলে তাদের কাছ থেকে ডিম এবং মাংস উভয় উৎপাদনের হার পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকবে।

**জলাশয়ে পালন ঃ** ছোট আকারের ডোবা, বিভিন্ন ধরনের পুকুর, চওড়া খাল, বিল, ঝিল সহ ছোট আকারের নদী যার জলে খুবই সামান্য স্রোত তেমন জলাশয় খামারের কাছাকাছি থাকলে তবেই দেশী পাতিহাঁস (সব শ্রেণীর) পালন করা সম্ভব হয়। দেশী হাঁসের জন্য জলাশয় কেন প্রয়োজন হয় তার কারণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সব শ্রেণীর দেশী পাতিহাঁস জলেতে সাঁতার কাটতে যদি না পায় তবে প্রজনন ক্রিয়া এবং ডিম পাড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এছাড়া সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত জলে সাঁতার না কাটলে ওরা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। সারাদিন জলে থাকার ফলে ওদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ নিজেরাই সংগ্রহ করে নিতে পারে। ছোট আকারের মাছ সহ মাছের বাচ্চা, গেঁড়ি, গুগলি, শামুক ইত্যাদি খায়। যার ফলে শরীরের প্রোটিন

জাতীয় উপাদানের অভাব ভালোভাবে মিটে যায়। সেই কারণে পালনকারীকে ওদের খাদ্যের জন্য বিশেষ কিছু খরচ করতে হয় না। সকালে খামার থেকে হাঁস যখন জলাশয়ে চরতে যায় সেই সময় সামান্য পরিমাণে খাদ্য ওদের দেওয়া দরকার। আর দ্বিতীয়বার খাবার দেবার সময় হলে যখন হাঁস জলাশয় থেকে সন্ধ্যের সময় খামারে ফিরে আসে। সেই সময়েও প্রতিটি হাঁসের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় খুবই কম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেশী পাতিহাঁসের জন্য খামারীকে খাদ্য বাবদ খুবই কম অর্থ খরচ করতে হয়।

যে নির্দিষ্ট জলাশয়ে সারাদিন হাঁস চরবে এবং সাঁতার কাটবে তার জল যেন বেশি দূষিত না হয়। কারণ বেশি দূষিত জলাশয়ে হাঁস চরলে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে।

কি ধরনের জলাশয় এবং তার আকার অনুসারে হাঁসের সংখ্যা ঠিক করতে হবে। বড় আকারের পুকুর বা ঝিল হলে ৫০০টি হাঁস যদি সেই জলে চরে তবে বিশেষ কোন অসুবিধে হয় না। কারণ সব হাঁস একসঙ্গে জলে সাঁতার কাটে না। সব সময় একদল হাঁস ডাঙ্গায় বিশ্রাম করে। এব্যাপারে মোটামুটি একটা হিসেব হলো, যদি ছোট আকারের ডোবা হয় যার মাপটা হলো ৭ থেকে ৮ কাঠার মধ্যে তবে সেই জলাশয়ে ৫০টি দেশী পাতিহাঁস খুব উত্তমভাবে চরতে পারে। সুতরাং জলাশয়ের আকার দেখে খামারে প্রতিপালনের জন্য দেশী পাতিহাঁসের সংখ্যা ঠিক করতে হয়। দেশী পাতিহাঁসের জন্য জলাশয় সম্পর্কে এত কথা বলা হলেও কোন খামারী এককভাবে খামারে দেশী পাতিহাঁস পালন করে না। কারণ খামারে ওদের পালন করে কোন খামারী মোটেই লাভবান হয় না। গৃহস্থ পরিবারে গোটাকতক দেশী পাতিহাঁস পালন করলে সংসারে ডিমের চাহিদা একরকম বিনা খরচে মিটে যায়। প্রকৃত পক্ষে গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ গৃহস্থ পরিবারে দশ থেকে পনেরটি দেশী পাতিহাঁস পালন করা হয়।

**মাঠে ঘেরা জায়গায় পালন ঃ** খামার ঘরে সারারাত হাঁস থাকবে। তারপর বেলা আটটা অথবা দশটার পর ওদের খেতে দিয়ে ঘেরা মাঠে ছেড়ে দিতে হবে। উক্ত সময় পর্যন্ত খামার ঘরে রাখার কারণ হল, হাঁস ঐ সময় অবধি ডিম পাড়ার কাজ শেষ করে। এরপর রাত আটটা পর্যন্ত ডিম পাড়া বন্ধ থাকে। ঘেরা মাঠ খামার ঘর থেকে খুব বেশি দূরে থাকা উচিত নয়। তার কারণ হচ্ছে, মাঠে সামান্য ঘাস এবং পোকা-মাকড় ওরা খাবে। সেটা খুবই সামান্য পরিমাণে। ওদের আরও দু'বার খাবার দেওয়া দরকার। খামারে বেশি সংখ্যাতে হাঁস পালন করা হয়। খুব কম হলেও ২৫০টি এবং যারা বড় ধরনের খামার করে সেখানে ১০০০ হাঁস পালন করা হয়। সুতরাং ওদের খাদ্যের পরিমাণও বেশি হবে। হাঁসের বিচরণ ক্ষেত্র যদি বেশি দূরে হয় তবে পরিচর্যাকারীর পক্ষে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। সুতরাং খামারের কাছে বিচরণ ক্ষেত্র হলে সব দিক থেকেই সুবিধা হয়।

মাঠে ঘেরা জায়গায় একমাত্র দেশী পাতিহাঁস ছাড়া অধিকাংশ জাতের হাঁস পালন করা চলবে। এমন কি কয়েকটি বিদেশী হাঁসও পালম করা সম্ভব। ছোট এবং

বড় আকারের খামারে মোট দু' রকম উদ্দেশ্যে হাঁস পালন করা হয়। এক শ্রেণীর হাঁস কেবল ডিম পাড়ে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যেসব জাতের হাঁস পালন করা হয় তাদের মাংস হিসাবে বিক্রির জন্য। এই ধরনের ঘেরা জায়গায় দেশী পাতিহাঁসের উন্নত জাত রানার, খাঁকি ও সাদা ক্যাম্পবেল, দেশী সংকর জাতের হাঁস যারা কেবল ডিম পাড়বে এবং মাংসের জন্য বিদেশী মাসকৌভী, পিকিং এবং রুয়ে ইত্যাদি জাতের হাঁস পালন করা সম্ভব। বাচ্চা অবস্থা থেকে এই ধরনের ঘেরা মাঠে ঐসব শ্রেণীর হাঁস ভালোভাবে বেড়ে ওঠে এবং পরিণত বয়স হলে নির্দিষ্ট হারে ডিম পাড়ে।

যে নির্দিষ্ট মাঠে হাঁস ঘুরে বেড়াবে সেটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিতে পারলে ভালো হয়। পাঁচিলের উচ্চতা হবে পাঁচ ফুট। পাঁচিলের উচ্চতা এর থেকে কম হলে কুকুর, শিয়াল ইত্যাদি ভেতরে ঢুকে হাঁস খেয়ে ফেলবে। তবে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট খরচের ব্যাপার। কাজেই বাঁশের খুঁটি পুঁতে এবং তারের জাল দিয়ে ঘিরে দিলে কুকুর এবং শিয়ালে বিশেষ ক্ষতি করতে পারবে না।

যদি ৫ থেকে ৭ দিনের বাচ্চা বয়সের হাঁস পালন করা হয় তাহলে নাইলনের জাল দিয়ে ওপরটা অবশ্যই ঘিরতে হবে। তার কারণ হলো কাক, চিল এবং বিড়াল বাচ্চা হাঁসকে মেরে ফেলবে। পরে অবশ্য জাল দিয়ে ওপরটা ঘেরবার প্রয়োজন নেই। তার কারণ বড় হাঁসের সঙ্গে কিছু বাচ্চা হাঁস থাকলে তারাই বাচ্চাদের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে।

একটা বড় জায়গার মধ্যে ৫০০ অথবা ১০০০ হাঁসকে চরতে দেওয়া উচিত নয়। বড় জায়গার মধ্যে ভাগ করে ৫০টি করে হাঁসকে পৃথক অবস্থায় চরতে দেওয়া দরকার। হিসাব করে দেখা গেছে, ৫০টি হাঁসকে খোলা জায়গায় চরবার জন্য ৫৫০ বর্গ ফুট জায়গা দেওয়া দরকার। মাঝখানে জাল দিয়ে ঘিরে জায়গা ভাগ করে হাঁসকে চরতে দিতে হবে। ওদের বিচরণ করবার জন্য জায়গার যে হিসাব দেওয়া হলো সেটা পূর্ণবয়স্ক হাঁসের জন্য। অবশ্য রাজহাঁস পালন করলে জায়গার যে হিসাব দেওয়া হলো সেটা দ্বিগুণ করতে হবে। সেই জায়গায় কেবল মাত্র ৫০টি রাজহাঁস চরবে অর্থাৎ বিচরণ করবে।

যে কোন জাতের হাঁস মাঠে বিচরণ করলেও কিছু সময়ের জন্য তার জলে সাঁতার কাটা প্রয়োজন। সেই কারণে বিচরণ ক্ষেত্রে পাকা চৌবাচ্চা থাকা দরকার। হাঁস জলে কেবল সাঁতার কাটে না। মাঝে-মাঝে গলা ডুবিয়ে এবং ডানা ভিজিয়ে স্নান করে। চৌবাচ্চা খুব বেশি গভীর হবে না। মাত্র তিনফুট গভীর হলেই কাজ মিটে যাবে। আর পাড়টা মাটি থেকে ৬ ইঞ্চি উঁচু করা দরকার। গোলাকার অথবা লম্বা ধরনের চৌবাচ্চা করা যেতে পারে। চৌবাচ্চার মাপটা হবে ৩ ফুট চওড়া এবং ১০ ফুট লম্বা। একসঙ্গে ৭টি হাঁস সাঁতার কাটতে পারবে। মোট ১০০টি হাঁসের জন্য এই ধরনের একটি করে চৌবাচ্চার প্রয়োজন। প্রতি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট দিনে চৌবাচ্চার জল ফেলে নতুন জল ভরা দরকার। বর্ষাকালে ১৫ দিন অন্তর জল

পালটাতে পারা যায়। এই কাজটি সব সময় বিকেলে করা উচিত। কারণ হাঁসেরা খামারে ফিরে যাবে এবং নোংরা জল ফেলে নতুন জল ভরতে কোন অসুবিধে হবে না। যে কটা চৌবাচ্চা থাকবে এইভাবে নির্দিষ্ট দিনে পরপর জল পালটে দিতে হবে।

**ঘরের মধ্যে পালন ঃ** এক্ষেত্রে হাঁসকে মোটেই বাইরে ছাড়া হবে না। উন্নত সংকর জাতের বিদেশী মুরগি যাদের ডিমের উদ্দেশ্যে পালন করা হয় এবং মাংসের জন্য ব্রয়লার মুরগি ওদের যেভাবে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয় ঠিক একই পদ্ধতিতে হাঁসকেও পালন করা চলে। ভারতে অন্যান্য উন্নত জাতের হাঁসকে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করতে দেখা যায় না, অর্থাৎ কেউ করে না। তবে খাঁকি এবং সাদা ক্যাম্পবেল হাঁসকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ঘরের মধ্যে পালন করা চলে। সারা দিনে এক ঘণ্টার জন্যেও চরতে পায় না। ছোট চৌবাচ্চাতেও সাঁতার কাটার কোন সুযোগ নেই। কাজেই সারা দিন ও রাত একটা ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকা। কিন্তু এভাবে পালিত হয়েও ক্যাম্পবেল হাঁসের স্বাস্থ্যের কোন রকম ক্ষতি হয় না। আবার স্ত্রী হাঁসেরা সাড়ে চার মাস বয়স হলে ডিম পাড়তে শুরু করে। অধিক উৎপাদনশীল হাঁস হিসাবে ডিম পাড়ার হারও কমে না।

যে কোন জাত বা শ্রেণী, এমনকি বিদেশী হাঁস হলেও পানীয় জলটুকু ছাড়াও অন্য কাজে (হাঁসের নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে) সামান্য কিছু বেশি জল ওদের প্রয়োজন হয়। আবদ্ধ অবস্থায় হাঁস পালন করলে তাকে পানীয় জলের থেকে একটু বেশি পরিমাণে জল সেই কারণে দেওয়া দরকার। তার জন্য একটা বড় আকারের জলের পাত্র, যার মধ্যে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ জল ধরবে সেই ধরনের পাত্রে জল রাখতে হবে। অনেকে মেঝেতে গর্ত করে. গরু-মোষকে যে মাটির ডাবাতে জাব খেতে দেওয়া হয় সেই ডাবা মেঝেতে পুঁতে হাঁসের ঘরে রাখা হয়। ডাবাকে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে মেঝে থেকে দু' ইঞ্চি ওপরে থাকে। এতে মেঝে শুকনো থাকবে।

হাঁসেদের যখনই খাদ্য দেওয়া হবে খাদ্যের পাত্র যেন জলের পাত্রের কাছে থাকে। কারণ সব জাতের হাঁসের স্বভাব হলো কিছুটা খাদ্য খেয়ে ঠোঁট জলে ডুবিয়ে নেওয়া। অনেক সময় ওরা আবার চোখ অবধি ডুবিয়ে দেয়। এইভাবে জলে ঠোঁট, চোখ এমনকি গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে পরিষ্কার করা ওদের জন্মগত স্বভাব।

যে ক'টা জলের পাত্র থাকবে সবগুলো একটি সারিতে রাখতে হবে। জলের পাত্র থেকে ৬ ইঞ্চি দূরে মেঝের ঢাল বরাবর ঘরের দেওয়ালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত একটা পাকা নর্দমা অবশ্যই করা দরকার। নর্দমা পাঁচ ইঞ্চি চওড়া এবং তিন ইঞ্চি গভীর হওয়া চাই। এই নর্দমা বা নালার মাধ্যমে জলপাত্রের ময়লা জল ফেলে দিয়ে আবার পরিষ্কার জল ভরতে হবে।

আবদ্ধ অবস্থায় ক্যাম্পবেল হাঁস পালন করলে তার জন্য কতটা জায়গার দরকার এটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ক্যাম্পবেল খুব বড় আকারের হাঁস নয়। সুতরাং ওদের জন্য খুব বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় না। লম্বা ও চওড়াতে

দেড় হাত করে জায়গা একটি হাঁসের পক্ষে যথেষ্ট বলে ধরা হয়। সুতরাং ঘরের মাপ অনুসারে হাঁসের সংখ্যা ঠিক করতে হবে।

এইভাবে ছোট জায়গায় এবং জলাশয় অথবা মাঠে চরতে না দিয়ে পালন করলে স্বাস্থ্য মোটেই খারাপ হয় না। এমনকি নির্দিষ্ট হারে ডিম পাড়ার সংখ্যাও কমে না। জীববিজ্ঞানীদের মতে ক্যাম্পবেল হাঁসকে যদি জলাশয়ে সাঁতার কাটতে দেওয়া হয় তার জন্য ওদের শরীরের শক্তি কিছুটা ক্ষয় হয়। এই ধরনের শক্তি ক্ষয় ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামান্য ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। যার জন্য ডিমের সংখ্যা কমে যাবার আশঙ্কা থাকে। মনে রাখতে হবে ক্যাম্পবেল হাঁস অধিক সংখ্যায় ডিম উৎপাদনকারী হিসাবে খামারে পালন করা হচ্ছে। তার শরীরের সমস্ত শক্তি যাতে অন্য কোন কাজে খরচ না হয় সেটাই খামারীর কাছে একান্ত কাম্য। তবে এটাও ঠিক কথা, যে কোন প্রাণীকে এক জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে আবদ্ধ করে রাখলে তার খারাপ প্রতিক্রিয়া কিছু থাকবেই। সেই কারণে খোলা জায়গায় সারা দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছাড়া অবস্থায় থাকলে যেটুকু ওবা চলাফেরা করে সেটা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে খুবই সহায়ক হয়।

## ক্যাম্পবেল হাঁসের থাকবার ঘর

খামারীর আর্থিক অবস্থা বুঝে হাঁসের থাকবার ঘর তৈরি করতে হবে। যে বাসস্থানের কথা বলা হচ্ছে সেটা কেবলমাত্র সাদা এবং খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের জন্য। কারণ যেসব হাঁস সারাদিন পুকুর-ডোবার্তে চরবে বা সাঁতার কাটবে অথবা সারাদিন বাইরে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুরে বেড়াবে তাদের জন্য তেমন ভালো ঘরের প্রয়োজন হয় না। কারণ হাঁস সেই ঘরে থাকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। ভোর হলেই হাঁস পুকুরে অথবা মাঠে চরতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ক্যাম্পবেল হাঁসের ক্ষেত্রে পাকা, সুরক্ষিত এবং আরামে যাতে ওরা থাকতে পারে সেইভাবে বাসস্থান করা দরকার। কারণ ঘরের বাইরে থাকবে সারা দিন-রাতের মধ্যে মাত্র দু' থেকে তিন ঘণ্টা। আর বাকি সময়টা কাটবে তার বাসস্থানে।

হাঁসের সংখ্যা বুঝে ঘরের আকার হবে। তবে খামার প্রথায় হাঁস পালন করা হলে ছোট, মাঝারি এবং বড় তিন রকমের খামার ঘর বা হাঁসের বাসস্থান তৈরি করা হয়। যেহেতু ক্যাম্পবেল জাতের হাঁসকে প্রায় আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হচ্ছে সেই কারণে প্রতিটি হাঁসের জন্য পৌনে তিন বর্গফুট হিসাবে জায়গা দেওয়া দরকার। খামার ঘর পরিষ্কার সহ মেঝের জল ভালোভাবে যাতে শুকিয়ে যায় তার জন্য তিন ঘণ্টা হাঁসের বাসস্থান খালি করে ওদের বাইরে রাখতে হবে। সেই সময়টা ওরা খামার ঘর সংলগ্ন ঘেরা জায়গাতে মুক্ত পরিবেশে থাকবে। এইভাবে রোজ কয়েক ঘণ্টা বাইরে থাকলে ওদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

ক্যাম্পবেল হাঁসের জন্য বাসস্থানের মেঝে এবং দেওয়াল অবশ্যই পাকা করা দরকার। আর ঘরের ছাদ পাকা না করলেও কোন ক্ষতি হয় না। তবে পাকা মেঝে

এবং দেওয়ালের জন্য খামারীকে একটা মোটা অংশের টাকা খরচ করতে হয়। অপরদিকে ছাদ হবে টালি, টিন অথবা খড়ের। গ্রামাঞ্চলে যদি বাঁশের সুবিধে থাকে তবে জমি থেকে এক ফুট উঁচু করে তারপর বাঁশের সাহায্যে দেওয়াল করা যেতে পারে। দেওয়ালের বাঁশ যেন পাঁচ ফুটের বেশি উঁচু করা না হয়। যাতে আলো এবং বাতাস ভালোভাবে ওদের বাসস্থানে প্রবেশ করতে পারে তার জন্য দু' ফুট উঁচু করে তারের জাল দিয়ে ঘিরে শেষে টালি, টিন অথবা খড়ের ছাদ করতে পারা যায়। আবদ্ধ অবস্থায় হাঁস পালন করা হচ্ছে; কাজেই ওদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রচুর আলো এবং বাতাস দুটোই একান্ত প্রয়োজন।

খামার ঘর করবার জন্য জায়গার অবস্থান কি রকম হবে সেটা আগে থাকতে বলা শক্ত ব্যাপার। তবে জায়গার সুবিধা থাকলে ঘরটা পূর্ব এবং পশ্চিমে লম্বাভাবে করতে পারলে উত্তম হয়। এইভাবে খামার ঘর করার একমাত্র কারণ হলো, সকাল এবং বিকেল দু' বেলাই যাতে ভেতরে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে। ঘরের দরজা টিনের পাতে তৈরি করা যেতে পারে। তবে দরজা যেন মজবুত হয়। আর বাইরে থেকে বন্ধ করে দেবার পর যেন শিয়াল অথবা কুকুর দরজা ঠেলে ফাক করে ভেতরে যেন ঢুকতে না পারে। এমনকি বড় আকারের ইঁদুর অথবা বিড়াল কোন ভাবেই যেন দরজা ফাঁক করে ভেতরে প্রবেশ করবার সুযোগ না পায়। এসব ছাড়াও বাচ্চা হাঁসের আরও শত্রু রয়েছে। সাপ, বেজি ইত্যাদি ওরা কামড়ে দিতে পারে। যদি কিছু নাও করে কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করলে বড় হাঁসগুলো ভয় পাবে এবং ডিম পাড়া বন্ধ করে দিতে পারে।

এর আগে জমি থেকে এক ফুট উঁচু করে তারপর চার দেওয়াল বাঁশ দিয়ে ঘেরা অথবা ইঁট দিয়ে পাকা দেওয়াল করার কথা বলা হয়েছে। তবে ঘরে ঢোকা অথবা বাইরে বের হবার সময় হাঁসের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য একটা ধাপ বা সিঁড়ি বেশ চওড়া করে অবশ্যই করা দরকার। নতুবা বাচ্চা সহ বড় হাঁসগুলির ঘরে ঢুকতে অথবা বাইরে বের হতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারে। আর মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঘরের উচ্চতা সাত ফুট রাখলেও কোন ক্ষতি হয় না।

ওদের বাসস্থান সম্পর্কে আরও একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। ঘর তৈরি করার ক্ষেত্রে যতই কম দামের উপকরণ ব্যবহার করা হোক না কেন মেঝেটা অবশ্যই পাকা করা দরকার। তার কারণ ভিজে এবং স্যাঁতসেঁতে মেঝে ওদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

পাকা এবং স্যাঁতসেঁতে মেঝের কথা বিশেষভাবে বলার উদ্দেশ্য হলো, প্রশ্ন হতে পারে যদিও হাঁস সারা দিনের মধ্যে দশ থেকে এগার ঘণ্টা জলে সাঁতার কাটে এমনকি খাবার সময় পর্যন্ত ঘাড় এবং গলা অবধি জলে ডুবিয়ে নেয় তাদের পক্ষে ভিজে মেঝে কি ক্ষতি করবে? কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে হাঁস জলে সাঁতার কেটে মাঝে মাঝেই জলাশয়ের ওপরে উঠে বিশ্রাম করে।

তখন ওরা উভয় ডানা নেড়ে পালক থেকে সব জল ঝেড়ে ফেলে দেয়। এছাড়াও বাইরে হাঁস চরলে রোদ ও বাতাসে যে সামান্য জল লেগে থাকে সেটা শুকিয়ে যায়। সুতরাং জলে থাকলেও এবং বৃষ্টিতে ভিজে গেলেও ওদের শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। অপরদিকে ঘরের মেঝে যদি ভিজে থাকে এবং স্যাঁতসেঁতে হয় তাহলে ওরা যখন বসে বিশ্রাম করে অথবা ঘুমিয়ে থাকে তখন মেঝের জল বুকে ও পেটে লেগে ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কা থাকে। এব্যাপারে মনে রাখতে হবে ক্যাম্পবেল হাঁস আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হচ্ছে। বাইরে ওরা মুক্ত অবস্থায় থাকে মাত্র তিন থেকে চার ঘণ্টা। তাতেই ওদের ঠাণ্ডা লেগে শরীর খারাপ করে। কাজেই আবদ্ধ অবস্থায় পালন করলে বাসস্থানের মেঝে যতটা সম্ভব শুকনো রাখা উচিত। কেবল মেঝে শুকনো নয়, ঘরের দেওয়াল, হাঁসের খাবার এবং জলপানের পাত্র ইত্যাদি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নতুবা বিভিন্ন রোগের আক্রমণ ঘটার আশঙ্কা থাকবে।

সাদা ও খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর হাঁস যদি আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা না হয় এবং সারাদিন যদি তারা জলাশয়ে অথবা মাঠে ঘেরা জায়গাতে চরে তবে মাটির কাঁচা মেঝে হলে বিশেষ ক্ষতি হবে না। তার কারণ হাঁস কেবল রাতটুকু ঘরে থাকবে। তারপর চরতে বের হলে ওদের মল ও মূত্র পরিষ্কার করে দিলে দশ-বারো ঘণ্টায় ভালোভাবে মাটির মেঝে শুকিয়ে যাবে।

## ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় ক্যাম্পবেল হাঁসের খাদ্য

কেবল হাঁস নয়, যে কোন গৃহপালিত পশু অথবা পাখিকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হলে তাকে পুষ্টিগুণে ভরা সঠিক পরিমাণ অনুসারে খাদ্য দেওয়া দরকার। নতুবা তার স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে এবং যে উদ্দেশ্যে পালন করা হচ্ছে সেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই সঠিক মানের এবং ওদের চাহিদা অনুসারে খাদ্য অবশ্যই দেওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে একটা কথা খামারীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, হাঁস বাইরে থেকে এক গ্রামও খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছে না। খামারী খাদ্য হিসাবে যা কিছু খেতে দেবে তারই ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং সাদা অথবা খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের খাদ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য ক্যাম্পবেল হাঁসকে অন্যভাবে পালন করলে তখন সামান্য খাদ্য দিলেই যথেষ্ট।

যে সব দেশী পাতিহাঁস এমনকি ভারতীয় রানার, যাদের সারাদিন জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তারা ঐ সময়ের মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলে। কারণ পুকুর, ডোবা সহ অন্যান্য জলাশয়ে চরবার সময় যেসব জলজ উদ্ভিদ জন্মায় সেগুলো সহ কিছুটা উদ্ভিদকণাও ওরা খায়। তবে সব শ্রেণীর জলজ উদ্ভিদ ওরা খায় না, বিশেষ কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের কচি পাতা ওদের প্রিয় খাদ্য। সেই কারণে ওরা কচি ঘাসের ডগা

খুবই আনন্দ সহকারে খায়। এছাড়াও প্রোটিন খাদ্য হিসাবে গেঁড়ি, গুগলি, দুর্বল শ্রেণীর চারা মাছ যদি সুযোগ পায় খেয়ে ফেলে। ছোট-খাট জলজ পোকাও মুখের সামনে পেলে তাকেও বাদ দেয় না। আবদ্ধ অবস্থায় পালন করলে ওদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তার মধ্যে মেশানো থাকে শুকনো মাছের গুঁড়ো। এটা ওদের শরীরে প্রাণিজ প্রোটিনের অভাব মেটায়। পুকুর বা অন্য জলাশয় থেকে টাটকা প্রাণিজ প্রোটিন পাওয়া আর বিভিন্ন শ্রেণীর শুকনো মাছের গুঁড়ো মেশানো ফিসমিল এই দুয়ের মধ্যে খাদ্যগুণের বিচার করলে ফিসমিলের কোন স্থান নেই।

ভারতীয় রানার, ক্রশ ব্রিড হাঁস এদের পুকুরে দেশী হাঁসের সঙ্গে চরতে দেওয়া হয় না। তার কারণ দেশী পুরুষ হাঁসের সঙ্গে দৈহিক মিলন ঘটে হাঁসের জাত নষ্ট হয়ে যায়। তার জন্য খোলা মাঠের কিছুটা অংশ চারপাশ মজবুতভাবে ঘিরে সেখানে ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে মাঠে যারা চরে তারাও নানা ধরনের পোকা-মাকড়, কেঁচো এবং কচি ঘাসের ডগা খেয়ে মোট খাদ্যের চাহিদার ৫০ ভাগ সংগ্রহ করে। পোকা-মাকড়, কেঁচো ইত্যাদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। এসব স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে সহায়ক।

আবদ্ধ অবস্থায় সাদা এবং খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস পালন করলে খামারীকে দিতে হবে সুষম খাদ্য। কারণ ওরা বাইরে থেকে কোন খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছে না। গৃহপালিত পশু; যেমন—গরু এবং মোষকে সুষম খাদ্য বাজার থেকে কিনে খাওয়াতে হয় তেমনি হাঁস এবং মুরগির জন্য বাজারে সুষম খাদ্য বিক্রি হয়। সেই খাদ্য কিনে এনে হাঁসকে খাওয়ানো চলে। তবে এটাও ঠিক কথা, নামকরা প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি দাম দিয়ে সুষম খাদ্য কিনলেও তার গুণগত মান সব থেকে উৎকৃষ্ট সেকথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। সুতরাং এব্যাপারে সব থেকে ভালো উপায় বা পথ হলো, আর্থিক ক্ষমতা বুঝে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কিনে এনে সুষম খাদ্য বাড়িতে তৈরি করে নেওয়া। এতে খাদ্যের মানটাও উন্নত হয় এবং দামটাও কম পড়ে।

গ্রামাঞ্চলে হাঁসের ফার্ম করলে প্রাণিজ প্রোটিন খাদ্য হিসাবে শুকনো মাছের গুঁড়ো কেনার কোন প্রয়োজন নেই। গ্রামে পুকুর এবং ডোবার অভাব নেই। গুগলি, গেঁড়ি, শামুক, কেঁচো বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। নিজের সময় না থাকলে সামান্য অর্থের বিনিময়ে রোজ খামারে পৌঁছে দেবে এমন লোকের অভাব হবে না। এমন কি মফঃস্বল শহর এলাকায় হাঁসের খামার হলে সেখানে সকালের বাজারে অনেকের কাছে টাটকা শামুক, গেঁড়ি ও গুগলি পাওয়া যায়। বিক্রি হয় খুবই কম দামে। কাজেই আবদ্ধ অবস্থায় হাঁসকে পালন করলে চিন্তা-ভাবনার কোন কারণ থাকে না। কম দামে উন্নত মানের খাদ্য হাঁসকে সহজেই দিতে পারা যায়। খাদ্যের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে গেঁড়ি, গুগলি ইত্যাদি থেঁতো করে মিশিয়ে রোজই খেতে দিতে পারা যাবে।

## হাঁসের খাদ্য উপাদান

দানাশস্য জাত বহু উপাদান রয়েছে যাদের মধ্যে সবগুলো হাঁসকে খাওয়াতে পারা যায়। তবে প্রতিটি দানা জাতীয় শস্যের দাম এক নয়। কোন শস্যের দামটা খুব বেশি। আবার কোন শস্যের দাম যথেষ্ট কম। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, যে ফসল একটা নির্দিষ্ট মরসুমে পাকে এবং সংগ্রহ করা হয় তার আমদানি বাজারে বেশি থাকায় চাহিদা কমে। তখন সস্তায় বিক্রি হয়। সেই সময় ঐ দানা জাতীয় শস্য ব্যবহার করা উচিত। আর দিতে হয় ভিটামিন। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং কোন অসুবিধের প্রশ্ন থাকে না। এবার আসা যাক বিভিন্ন উপাদানের প্রসঙ্গে।

**দানাশস্য জাতীয় উপাদান :** সব শ্রেণীর হাঁসের জন্য (দেশী পাতিহাঁস ছাড়া) দানা জাতীয় বেশ কয়েকটি খাদ্যশস্য ব্যবহার করা হয়। ঐসব দানাশস্য হচ্ছে গমের গুঁড়ো, ভুট্টা গুঁড়ো, জোয়ার গুঁড়ো এবং মাইলো গুঁড়ো। এদের মধ্যে যে কোন একটি খাদ্যশস্যকে হাঁসের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তবে এসব উৎকৃষ্ট শ্রেণী সহ বাছাই করা সেরা দানাশস্য কিনবার কোন প্রয়োজন নেই। দানা পচা না হলে হাঁসকে খাওয়ানো চলবে। দানা গোটা থাকলে বাড়িতে গুঁড়ো করে নিতে হবে।

**শস্যের উপজাত অংশ :** উপজাত অংশ বা দ্রব্য সংগ্রহ করা হয় দানা জাতীয় খাদ্যশস্য থেকে। এর মধ্যে রয়েছে গমের ভুসি, ডালের খোসা, চালের কুঁড়ো এবং চালের একেবারে ছোট অংশ অর্থাৎ খুদ। হাঁসের জন্য সুষম খাদ্যে এসবই মূল্যবান উপাদান। যে কোন একটি ওদের খাদ্যে মেশানো হয়।

**তৈলবীজের উপজাত দ্রব্য :** এর মধ্যে রয়েছে সয়াবিন খইল, সরযের খইল, বাদাম খইল এবং তিল খইল। যে কোন একটি তৈল বীজের উপজাত মেশানো দরকার। তবে খইল খুব উত্তমভাবে গুঁড়ো করে তবেই ওদের খাদ্যে মেশানো উচিত।

**মাছের গুঁড়ো (প্রাণিজ প্রোটিন) :** শামুক, গুগলি, গেঁড়ি ইত্যাদি না পাওয়া গেলে অথবা সংগ্রহ করা যদি সম্ভব না হয় তখন বাজার থেকে শুকনো মাছের গুঁড়ো অবশ্যই কিনতে হবে। মাছের গুঁড়ো কেবল হাঁসের জন্য নয় মুরগির খাদ্যেও মেশাতে হয়। কাজেই মাছের গুঁড়োর অভাব বাজারে হয় না। হাঁসের ক্ষেত্রে এর থেকে ভালো বিকল্প প্রাণিজ প্রোটিন খাদ্য কম দামে এমনকি বিনামূল্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু মুরগির ক্ষেত্রে কোন বিকল্প প্রাণিজ প্রোটিন মাছের গুঁড়ো ছাড়া কম দামে পাওয়া যায় না।

**খনিজ পদার্থের মিশ্রণ :** কয়েকটা খনিজ পদার্থ একসঙ্গে মিশিয়ে খনিজ মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণে ঝিনুকের গুঁড়ো থাকবেই। এটা বিনা পয়সায় সংগ্রহ করা যায়। তবে বাকিগুলো মিশ্রিত অবস্থায় অবশ্যই বাজার থেকে কেনা দরকার।

**ভিটামিন :** ব্রয়লার এবং ডিম-পাড়া মুরগিদের যেমন খাদ্যের সঙ্গে কয়েকটা ভিটামিন মিশিয়ে দিতে হয় ঠিক তদ্রূপ হাঁসের খাদ্যেও ঐ রকম ভিটামিন দেওয়া

দরকার। মোটামুটিভাবে তিনটি ভিটামিন দেওয়া হয়। পরিমাণেও খুব কম লাগে। সাধারণভাবে ভিটামিন-এ, বি$_2$ এবং ডি$_3$ এই তিন রকমের ভিটামিন মেশালে কাজ মিটে যাবে।

## বয়স অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ

সুষম খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করতে হয় হাঁসের বয়স অনুসারে। সেই কারণে ওদের জন্মের পর থেকে তিনটি ভাগে ভাগ করে সেই অনুসারে কম, মাঝাবি এবং বেশি পরিমাণে সুষম খাদ্য দেওয়া দরকার। অর্থাৎ ওদের জন্ম থেকে বৃদ্ধ বয়স অবধি সময়টা ভাগ করে খাদ্য দেবার নিয়ম। এটা সব শ্রেণীর উন্নত এবং বিশেষ করে যাদের জলাশয়ে না চরতে দিয়ে প্রায় আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয়। এটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত এবং হাঁসের শরীর রক্ষা সহ দেহের যাবতীয় অভাব যেমন মিটে যায় তেমনি মাংস অথবা ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ে পাবার জন্য খামারীর কোন অসুবিধে হয় না। এতগুলো সুবিধে ছাড়াও পালনকারীর সামান্য পরিমাণেও খাদ্যের অপচয় হয় না। সুষম খাদ্য দেবার ব্যাপারে হাঁসের বয়স অনুসারে যে তিনটি বিভাগের কথা বলা হলো তার মধ্যে প্রথমটি ধরা হয় ওদের জন্মের পর থেকে চার সপ্তাহ বয়স অবধি। এই সময়ে যে খাদ্য দেওয়া হবে অবশ্যই কম পরিমাণে এবং বলা হয়, **বাচ্চা হাঁসের প্রাথমিক** খাদ্য। দ্বিতীয় বিভাগে খাদ্যের পরিমাণ অনেকটা বাড়ানো হয়। তখন ওদের দেহের দ্রুত হারে বৃদ্ধি ঘটতে থাকে অর্থাৎ বাড়ন্ত বয়স। এই সময়ে যে খাদ্য দেওয়া হয় তার নাম **মধ্য পর্যায়ের** খাদ্য। হাঁসকে এই খাদ্য দেওয়া শুরু হয় জন্মের পর চার সপ্তাহ বয়স পার হবার পর থেকে আট সপ্তাহ পর্যন্ত। তৃতীয় পর্যায়ে খাদ্য দেওয়া শুরু হয় নয় সপ্তাহ থেকে। এই সময় থেকে কুড়ি সপ্তাহ হলে স্ত্রী হাঁস ডিম পাড়তে শুরু করে। যত দিন পর্যন্ত স্ত্রী হাঁস ডিম পাড়ার হার না কমায় সেই সময় পর্যন্ত একই পরিমাণে খাদ্য দিয়ে যেতে হবে। সাধারণভাবে একটি উন্নত জাতের স্ত্রী হাঁস দু' বছর অবধি দ্রুত হারে ডিম পেড়ে থাকে। তারপর থেকে বয়স যত বেড়ে যায় ডিম পাড়ার হার কমে। এই সময়ে যে খাদ্য দেওয়া হয় সেটা **হাঁসের পরিণত বয়সের খাদ্য** হিসাবে পরিচিত।

বয়স অনুসারে কতটা পরিমাণে খাদ্য পালনকারীকে দিতে হবে সেটা জানবার আগে হাঁসের জাত বা শ্রেণী জানা দরকার। কারণ দেশী পাতিহাঁস খামারে কেউ পালন করে না। কাজেই খামারে পালন করা হবে খাঁকি ক্যাম্পবেল অথবা ভারতীয় রানার হাঁস। উভয় শ্রেণীর হাঁস অবশ্যই জলাশয়ে চরবে না। তারা খামারে প্রায় আবদ্ধ অবস্থায় পালিত হবে। সুতরাং উভয় শ্রেণীর হাঁসের জন্য একটা তালিকা দেওয়া হচ্ছে। এই তালিকায় হাঁসের বয়স অনুসারে সুষম খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান কতটা পরিমাণে মিশিয়ে তৈরি করলে শরীরের প্রয়োজনীয় চাহিদা ভালোভাবে মিটবে তা জানা যাবে এবং সেই সঙ্গে ডিম পাড়ার সঠিক হার বজায় থাকবে।

## আবদ্ধ অবস্থায় পালিত বয়স অনুসারে খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের (একটি হাঁসের) এক সপ্তাহের খাদ্য

| হাঁসের বয়স সপ্তাহ হিসাবে | একটি হাঁসের এক সপ্তাহের খাদ্য (কেজি হিসাবে) |
|---|---|
| ১ সপ্তাহ পর্যন্ত | ১১০ থেকে ১১৫ গ্রাম |
| ২ সপ্তাহ অবধি | ২৫০ থেকে ২৫৫ গ্রাম |
| ৩ সপ্তাহ শুরুতে | ৪২৫ থেকে ৪৫০ গ্রাম |
| ৪ সপ্তাহ যাবৎ | ৬২০ থেকে ৬৪০ গ্রাম |
| **জন্ম থেকে এক মাস পর্যন্ত** | **প্রাথমিক খাদ্য** |
| ৫ সপ্তাহ পর্যন্ত | ৭২০ থেকে ৭৩০ গ্রাম |
| ৬ সপ্তাহ অবধি | ৭৭০ থেকে ৭৮০ গ্রাম |
| ৭ সপ্তাহ শুরুতে | ৭৮৫ থেকে ৭৯০ গ্রাম |
| ৮ সপ্তাহ যাবৎ | ৭৯০ থেকে ৭৯৫ গ্রাম |
| **জন্ম থেকে দু' মাস পর্যন্ত** | **মধ্য পর্যায়ের খাদ্য** |
| ৯ সপ্তাহ পর্যন্ত | ৬৯০ থেকে ৭০০ গ্রাম |
| ১০ সপ্তাহ অবধি | ৭৩০ থেকে ৭৪০ গ্রাম |
| ১১ সপ্তাহ শুরুতে | ৭৬০ থেকে ৭৬৫ গ্রাম |
| ১২ সপ্তাহ যাবৎ | ৭৬০ থেকে ৭৬৫ গ্রাম |
| ১৩ সপ্তাহ পর্যন্ত | ৬০০ থেকে ৬১০ গ্রাম |
| ১৪ সপ্তাহ অবধি | ৬১০ " " |
| ১৫ সপ্তাহ শুরুতে | ৬৩০ " ৬৪০ গ্রাম |
| ১৬ সপ্তাহ যাবৎ | ৭১০ " ৭১৫ গ্রাম |
| ১৭ সপ্তাহ পর্যন্ত | ৬১৫ " ৬২০ গ্রাম |
| ১৮ সপ্তাহ অবধি | ৬৬০ " ৬৬৫ গ্রাম |
| ১৯ সপ্তাহ শুরুতে | ৬৬৫ " ৬৭৫ গ্রাম |
| ২০ সপ্তাহ যাবৎ | ৭৪৫ " ৭৫০ গ্রাম |
| **জন্ম থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত** | **পরিণত বয়সের খাদ্য** |

খাঁকি ক্যাম্পবেল সহ উন্নত জাতের হাঁস পাঁচ মাস বয়স হলেই ডিম পাড়তে শুরু করবে। যদি দেখা যায় সব থেকে উচ্চ হারে ডিম পাড়ছে তা হলে হাঁসকে কিছুটা বেশি পরিমাণে খাদ্য অবশ্য দিতে হবে। সেক্ষেত্রে একটি হাঁসকে সপ্তাহে ৯০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি খাদ্য দেওয়া দরকার। দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ হবে ১২৫ গ্রাম থেকে ১৫০ গ্রাম।

একটি হাঁস ডিম পাড়তে শুরু করলে সব থেকে উচ্চ হার বজায় থাকে দু' বছর পর্যন্ত। তারপর ডিম পাড়ার হার কমতে শুরু করে। খামার প্রথায় হাঁস পালন

করলে কোন খামারী কম হারে ডিম পাড়া হাঁস পালন করে না। কারণ সেই হাঁস খামারে রাখা খুব একটা লাভজনক হয় না, বরঞ্চ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। সুতরাং ঐ ধরনের হাঁস বাজারে বিক্রি করে তার পরিবর্তে পাঁচ মাস বয়সের হাঁস পালন করা হয়।

খাদ্যের যে তালিকা দেওয়া হলো সেটা সম্পূর্ণ তালিকা নয়। হাঁসের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাদ্যে কিছু পরিমাণে ভিটামিন অবশ্যই মেশানো দরকার। এটা মেশানো হয় শতকরা হিসাবে। যদি ১০০ কেজি খাদ্য বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে তৈরি করা হয় তবে ভিটামিন এ. বি, ডি (বাজারে পাওয়া যায় রেডিমিক্স অথবা ভিটাব্লেন্ড নামে) ৩৫ গ্রাম, নিয়াসিন ৫ গ্রাম এবং কোলিন ক্লোরাইড ৩৫ গ্রাম। বিভিন্ন উপাদান মেশানো খাদ্য ১০০ কেজির পরিবর্তে ৫০ কেজি নিতে পারা যায়। সেক্ষেত্রে সব ভিটামিন অর্ধেক পরিমাণে দিতে হবে। কারণ ভিটামিন মেশানো খাদ্য বেশি দিন রেখে দিলে খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এক সপ্তাহে যতটা পরিমাণে খাদ্য লাগবে সেই পরিমাণ খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন মেশানো উচিত। ভিটামিন নিজে তৈরি করা যাবে না। সবই ওষুধের দোকান থেকে কিনে আনতে হবে। অবশ্য যারা গৃহপালিত পশু-পাখির মিশ্র সুষম খাদ্য বিক্রি করে তাদের কাছে কিনতে পাওয়া যায়। ঐসব বিক্রেতাদের কাছে না কিনে ওষুধের দোকান থেকে কেনাটা নিরাপদ এবং ভালো জিনিস পাওয়া যায়। আগেই ভিটামিনগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সুবিধার জন্য তালিকা আকারে আবার দেওয়া হচ্ছে।

### তালিকা (ভিটামিন)

| নাম | পরিমাণ (শতকরা হিসাবে) |
|---|---|
| ভিটাব্লেন্ড | ৩৫ গ্রাম |
| নিয়াসিন | ৫ গ্রাম |
| কোলিন ক্লোরাইড | ৩৫ গ্রাম |
| | মোট ৭৫ গ্রাম |

## খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের প্রজনন

খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস বিশেষ করে স্ত্রী হাঁসের শরীরে একটা বিশেষ গুণ রয়েছে। ওরা পুরুষ হাঁসের সঙ্গে দৈহিকভাবে মিলিত না হলেও ডিম পাড়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধে হয় না। তবে ঐ শ্রেণীর ডিম থেকে বাচ্চা পাওয়া যাবে না। কারণ যে সব ডিম পুরুষ এবং স্ত্রী হাঁসের মধ্যে দৈহিক মিলনের পর পাওয়া যায় তার থেকে বাচ্চা পাওয়া যায়। সেইজন্য ঐ শ্রেণীর ডিম হচ্ছে উর্বর ডিম। আর স্ত্রী ও পুরুষ হাঁসের দৈহিক মিলন ছাড়াই যে ডিম পাওয়া যায় তার থেকে বাচ্চা পাওয়া যায় না বলেই সেটা অনুর্বর ডিম হিসাবে পরিচিত। তবে আমাদের খাদ্য হিসাবে সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং উর্বর ডিমে যে সব পুষ্টিমূল্য রয়েছে অনুর্বর ডিমে একই পুষ্টিমূল্য পাওয়া যায়। কোন রকম পুষ্টির ঘাটতি থাকে না।

বড় অথবা মাঝারি খামারে খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস পালন করলে কিছু ঐ শ্রেণীর পুরুষ হাঁস খামারে রাখা দরকার। কারণ হাঁসের সংখ্যা বাড়াতে হবে। একটি স্ত্রী হাঁস ডিম পাড়তে শুরু করলে দু' বছর অবধি সব থেকে বেশি হারে ডিম পাড়ে। তারপর ডিমের সংখ্যা কমতে থাকে। অথচ খামারীকে কম হারে ডিম পেলেও নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য দিতে হয়। কাজেই সেই রকম হাঁস খামারে বেশি সংখ্যায় থাকলে লাভের পরিমাণ কমে যাবে। সুতরাং ডিম পাড়ার হার কমলেই বিক্রি করা দরকার। তখন খামারে উর্বর ডিম ফুটিয়ে যে বাচ্চা হাঁস পাঁচ মাস পালন করা হয়েছে তারা সব থেকে বেশি হারে ডিম দিতে থাকবে। ফলে খামারে ডিমের উৎপাদনের হার কমবে না। সেই কারণে কিছু সংখ্যায় পুরুষ হাঁস পালন করা দরকার। এছাড়াও দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী হাঁসের দৈহিক মিলন হলে ডিমের উৎপাদনের হারটা প্রাকৃতিক কারণে সামান্য বেড়ে যায়। তবে প্রয়োজনের বেশি পুরুষ হাঁস পালন করলে খামারের লোকসান বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং স্ত্রী হাঁসের সংখ্যা অনুপাতে হিসাব করে পুরুষ হাঁস খামারে পালন করা উচিত। আবার পুরুষ হাঁসের বয়স আড়াই থেকে তিন বছর হলে মাংসের জন্য সেটা বাজারে বিক্রি করা দরকার। আর প্রজননের জন্য যে সব পুরুষ হাঁস ব্যবহার করা হবে তাদের বয়স খুব কম করে এক বছর হওয়া দরকার। যদি লোভের বশে এর থেকে কম বয়সের হাঁসকে প্রজননের কাজে ব্যবহার করা হয় তবে সেই পুরুষ হাঁস খুব তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন আড়াই বছর ধরে যে পুরুষ হাঁসকে প্রজননের কাজে ব্যবহার করা চলতো তার পরিবর্তে মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই সেই হাঁস প্রজননের কাজে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাবে।

বেশি সংখ্যায় এবং উর্বর ডিম পাবার জন্য একটি খামারে কতগুলো পুরুষ হাঁস পালন করা হবে সেটা খামারীর কাছে একটা বড় প্রশ্ন। সাধারণভাবে ১০টি খাঁকি ক্যাম্পবেল স্ত্রী হাঁসের জন্য মোট দু'টি ঐ শ্রেণীর পুরুষ হাঁস পালন করা দরকার। সুতরাং, খামারে স্ত্রী হাঁসের সংখ্যা গুণে পুরুষ খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস পালন করার কোন সমস্যা হবে না।

ডিমের জন্য যে স্ত্রী খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসকে পালন করা হচ্ছে তার বয়স ছয় মাস হওয়া দরকার। অবশ্য সাড়ে চার মাস বয়স হলেই স্ত্রী হাঁস ডিম পাড়তে শুরু করে। তবে খামারে উৎকৃষ্ট উর্বর ডিম পাবার জন্য (কারণ ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলা হবে) বয়স ছয় মাস না হলে পুরুষ হাঁসের সঙ্গে মিলন ঘটানো উচিত নয়। পুরুষ হাঁসের ক্ষেত্রে ওরা পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয় এক বছর বয়স হলে, তেমনি স্ত্রী হাঁসের বয়স ছয় মাস হলে পূর্ণতা লাভ করে।

**ডিম-পাড়া হাঁসের লক্ষণ ঃ** উন্নত মান এবং ভালো জাতের হাঁস হলেও সব থেকে বেশি হারে ডিম পাবার জন্য স্ত্রী হাঁসের শরীরে কিছু লক্ষণ থাকে। এই লক্ষণ অবশ্যই বিজ্ঞানভিত্তিক। সেই লক্ষণগুলো মিলিয়ে যদি ডিম পাড়ার জন্য পালিত হাঁস বাছাই করা হয় এবং খামারী সঠিক পরিচর্যা এবং উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য দিলে সারা বছরে তার কাছ থেকে সর্বোচ্চ হারে ডিম অবশ্যই পাওয়া যাবে।

মোট তিনটি লক্ষণ রয়েছে। বয়স সাড়ে তিন মাস হলেই একটু ভালোভাবে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে। এর থেকে স্ত্রী হাঁসের বয়স কম হলে সব লক্ষণ অনেক সময় স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় না।

(ক) যে হাঁস সারা বছরে সব থেকে বেশি হারে ডিম পাড়বে তার দেহের আকৃতি হবে মাঝারি। গলা অবশ্যই সরু হবে আর সব কিছু মিলিয়ে দেহ সুন্দর দেখাবে।

(খ) গলা সরু হলেও কাঁধ যথেষ্ট চওড়া হবে। বুকেতে মাংস যেন কম না থাকে।

(গ) দুটো পায়ের মাঝখানে ভালো ফাঁক থাকা দরকার। এছাড়াও মলদ্বারের উভয় পাশে পাছার হাড়ের মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁক রয়েছে কিনা সেটাও দেখে নিতে হবে।

স্ত্রী খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের শরীরে যদি এই তিনটি লক্ষণ যথাযথ ভাবে মিলে যায় তবে সেই হাঁসকে ডিম পাড়ার কাজে নির্ভয়ে খামারে প্রতিপালন করা যাবে।

**স্ত্রী খাঁকি ক্যাম্পবেল স্ত্রী ও পুরুষ হাঁস চেনা ঃ** ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার পর ওদের লিঙ্গ দেখে স্ত্রী ও পুরুষ হাঁসকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তবে এবিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কিন্তু খামার শুরু করে প্রথম মুখে অনেকের পক্ষেই এক থেকে দু'দিনেব বাচ্চাকে লিঙ্গ পরীক্ষা করে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না। তবে ওরা বড় হলে দেড় মাস বাদে অবশ্যই স্ত্রী ও পুরুষ হাঁস চেনা সহজ হবে। হাঁসের দেহের গঠন, গলার আওয়াজ বা ডাক, পালকেব রঙ ইত্যাদি দেখে সহজেই চেনা যায়।

| দেহের বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ | স্ত্রী হাঁস | পুরুষ হাঁস |
|---|---|---|
| দেহের পালকের রঙ | পালকেব রঙ হালকা খাঁকি। অন্য কোন বঙ দেহের কোথাও পালকে থাকে না। | পালকের রঙ গাঢ় খাঁকি হয়। এছাড়াও মাথা এবং লেজের কাছে পালকের রঙে কিছুটা সবুজের আভা থাকে। |
| লেজের পালক | কোনরকম কোঁকড়ানো থাকে না। | পিছন দিকের পালকগুলো অধিকাংশ কোঁকড়ানো থাকে। |
| গলার স্বর | প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ এবং স্পষ্ট বোঝা যায়। | গলার স্বর অস্পষ্ট এবং কর্কশ। ফ্যাস ফ্যাস শব্দ বলে মনে হবে। |
| বাচ্চা হাঁসের লিঙ্গ পরীক্ষা | কোন রকম লিঙ্গ দেখা যাবে না। | লেজের দিকটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতের একটি আঙ্গুলের সাহায্যে মলদ্বার সামান্য টিপলেই যে ফাঁক হবে তার ভেতর ছোট্ট লিঙ্গ দেখা যাবে। |

**খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের ডিম ফোটানো ঃ** দেশী সব শ্রেণীর স্ত্রী হাঁস ডিমে 'তা' দেয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় অসুবিধে হচ্ছে স্ত্রী হাঁস মোটেই ডিমে 'তা' দিতে চায় না। এই অসুবিধের জন্য দেশী হাঁস আথবা দেশী কুরকী মুরগির সাহায্যে ডিম ফোটাতে হয়। একটি দেশী হাঁস এবং কুরকী মুরগি এক সঙ্গে সাত থেকে দশটি ডিমে 'তা' দিতে পারে। ডিমে ২৮ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত 'তা' দেবার পর বাচ্চা ফুটে বের হয়।

বড় খামার হলে এইভাবে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তুলতে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় খামারীকে। কাবণ ডিমের সংখ্যা বেশি হয় এবং 'তা' দেবার হাঁস অথবা কুবকী দেশী মুরগি সময়ে পাওয়া যায় না। যদিও কোনভাবে সন্ধান পাওয়া যায় প্রয়োজনেব তুলনায় সংখ্যা কম হয়। এছাড়াও খামারীর সময়ের অপচয় হয়। সেই কারণে বিশেষ করে ব্যবসার জন্য কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোটাবার ব্যবস্থা খামারীকে কবতে হয়। এই কাজের জন্য যে যন্ত্রের প্রয়োজন হয় তার নাম ইনকিউবেটার। মুরগির ফার্মে এই যন্ত্রের সাহায্যে ডিম ফোটানো হয়। হাঁসের ডিমের ক্ষেত্রে যন্ত্রের সাহায্যে ডিম ফোটাতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। হাঁসেব ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হতে ইনকিউবেটারে সময় লাগে মোট ২৮ দিন। যন্ত্রের মাধ্যমে ডিম ফোটানোর সব থেকে বড় সুবিধে হচ্ছে ডিম ফেটে যাবার বা নষ্ট হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। অপরদিকে দেশী হাঁস অথবা কুরকী মুরগির সাহায্যে ডিম ফোটানো হলে শতকরা দশ থেকে পনের ভাগ ডিম ফেটে যায় অথবা কুরকী দেশী মুরগি বা হাঁস ডিম ঠুকরে খেয়ে ফেলে। এই ধরনের স্বভাব অবশ্য সব দেশী কুরকী মুরগি অথবা হাঁসের হয় না। তবে এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। ডিম বেশি নষ্ট হওয়ার অর্থ হলো খামারীর লোকসান।

**ইনকিউবেটারে ডিম ফোটাবার নিয়ম ঃ** সাধারণভাবে দেখা গেছে, ইনকিউবেটারে ডিম ফোটাবার জন্য যে তাপমাত্রার প্রয়োজন সেটা সাধাবণত ৩৭°—৩৭·৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হলেই কাজ মিটে যাবে। আর বাতাসে আর্দ্রতা থাকবে ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ। সুতরাং ইনকিউবেটার যন্ত্রের মধ্যে সঠিকভাবে বাতাস চলাচল করা দরকার।

যে সমস্ত ডিম বাচ্চা ফোটাবার জন্য যন্ত্রের মধ্যে রাখা হয়েছে সেগুলো একভাবে রাখা ঠিক নয়। সারা দিন-রাতের মধ্যে চার থেকে পাঁচ বার ঘুরিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ডিমের যে অংশ পাত্রের নিচে রয়েছে সেটা ঘুরিয়ে ওপর দিকে আনা দরকার। এইভাবে প্রত্যেকটি ডিমকে ঘোরাতে হবে। আগেই বলা হয়েছে, যন্ত্রের মধ্যে রেখে দেওয়া ডিম থেকে বাচ্চা বের হতে সময় লাগে ২৮ দিন। যেদিন ডিম যন্ত্রের মধ্যে রাখা হয়েছে সেই দিন থেকে সারা দিনে ৪ থেকে ৫ বার ২৫ দিন পর্যন্ত ঐভাবে ডিম ঘোরানো দরকার। এরপর ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত ডিমকে আর ঘোরাব্বার প্রয়োজন নেই।

ডিম ফোটাবার কাজে আর্দ্রতা (বাতাসে জলীয় কণার পরিমাণ শতকরা হিসাবে) বজায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সেই কারণে ডিমের ওপর সামান্য গরম জল (এমন পরিমাণে জল গরম হবে যার মধ্যে আঙুল ডোবালে মৃদু গরম বোধ হবে) ছিটানো দরকার। এই কাজটি করা হবে দ্বিতীয় সপ্তাহে দু' বার, তৃতীয় সপ্তাহে মোট তিন বার এবং এক দিন অন্তর।

যন্ত্রের মধ্যে ডিম রাখার পর পঞ্চম দিন থেকে দিনের মধ্যে একবার আধ ঘণ্টার জন্য ডিমগুলোকে ঠাণ্ডা করা দরকার। তবে খুব বেশি ঠাণ্ডা হবে না। মেশিনের মধ্যে তাপমাত্রা ছিল ৩৭° থেকে ৩৭.৫° সেন্টিগ্রেড আর ঠাণ্ডা করা হবে ৩২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত। মেশিনের মধ্যে ডিমেব ওপর সামান্য গরম জল ছিটালে ডিমের তাপমাত্রা কমে ৩২° সেন্টিগ্রেড হবে। এর পরিবর্তে ইনকিউবেটারে ট্রের মধ্যে রাখা ডিমগুলোকে আধ ঘণ্টার জন্য বাইরে বের করে আনলে তাপমাত্রা নিজের থেকেই কমে যাবে। সেক্ষেত্রে সামান্য গরম জল ছিটাবার কোন প্রয়োজন নেই। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে তাকে ৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখতে হবে। সেই দিন গ্লুকোজ জল অথবা ইলেকট্রাল পাউডার মেশানো জল পান করতে দিতে হবে।

**বাচ্চা তোলার জন্য ডিম বাছাই ঃ** ডিম ফোটাবার জন্য উত্তম আকৃতির ডিম নির্বাচন করা দরকার। কারণ ডিমের আকারের ওপর বাচ্চার আকৃতি নির্ভব করে। বাচ্চা তোলার জন্য যে ডিম বাছাই করা হচ্ছে তাদের আকার একই রকম হওযা দরকার। খুব ছোট অথবা বেশ বড় আকারের ডিম নির্বাচন করা উচিত নয়। খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের প্রতিটি ডিমের গড় ওজন হবে ৭০ গ্রাম এবং ডিমের মধ্যে অ্যালবুমেন (সাদা অংশ) এবং হলদে কুসুমের হাব ২ঃ১ থাকবে। অর্থাৎ কুসুম যে পরিমাণে থাকবে তার দ্বিগুণ পরিমাণ হবে সাদা অংশ। ডিমের কুসুম অবশ্যই ক্যারোটিনযুক্ত হবে। এই জিনিসটি থাকলে কুসুমের রঙটা হলদে হয়। কারণ ক্যারোটিনযুক্ত কুসুমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" থাকায় বাচ্চা পাওয়া যাবে সবল এবং শক্তিশালী। ডিমের খোলার ওপর কোন রকম দাগ থাকবে না।

**খোলার রঙ ঃ** সাধারণভাবে খোলার রঙটা হবে সাদা। তবে গ্রাম অঞ্চলে বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, দেশী পাতিহাঁস অথবা উন্নত জাতের হাঁসকে ধান খাওয়াবার ফলে ডিমের খোলার রঙটা কিছুটা ফিকে নীলচে হয়। সেটা অবশ্য কোন দোষের নয়। এই রঙের (খোলার) ডিমও বাচ্চা ফোটাবার জন্য নির্ভয়ে নির্বাচন করা চলে। তবে এই শ্রেণীর ডিমের ওপর অন্য কোন রঙ থাকবে না। অবশ্য খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের ক্ষেত্রে এই ধরনের খোলার রঙটা না হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ ওরা সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালিত হয়। যদিওবা কয়েক ঘণ্টার জন্য ছাড়া থাকে তার জন্য ঘেরা জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়।

কিছু ক্ষেত্রে খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের ডিমের খোলার রঙ সামান্য লালচে হয়। এই ধরনের খোলার রঙ কোন দোষের নয়। বাচ্চা ফোটাবার কাজে নির্বাচন করা যায়।

**খোলার গঠন প্রণালী :** মুরগির ডিমের থেকে সব শ্রেণীর এবং বিভিন্ন জাতের হাঁসের ডিমের খোলা যথেষ্ট মোটা অর্থাৎ পুরু হয়ে থাকে। কাজেই ডিমের খোলা যদি পাতলা বলে মনে হয় তবে ডিম অবশ্যই বাচ্চা ফোটাবার কাজের জন্য বাতিল করতে হবে। হাঁসের ডিমের খোলা পাতলা হবার কারণ **ক্যালসিয়াম** এবং **ভিটামিন** "ডি" এই দুটো জিনিসের অভাব। কাজেই নির্বাচিত ডিমের খোলা হবে বেশ পুরু এবং সুগঠিত। এছাড়াও খোলা হবে বেশ সমতল এবং যাকে আমরা বলে থাকি চৌরস। কোন কারণেই উঁচু-নিচু অথবা এবড়ো-খেবড়ো খোলাযুক্ত ডিমকে নির্বাচন করা উচিত হবে না। এই শ্রেণীর ডিম থেকে বাচ্চা পাওয়া যায় না, যদিওবা ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় তবে সেই বাচ্চা ভীষণ দুর্বল হয়।

**খোলা ফাটা এবং দাগযুক্ত :** খোলার ওপরে চুলের থেকেও সরু ফাটা (খুব সরু ফাটা অনেক সময় খালি চোখে দেখা যায় না) এবং খোলার ওপর কোন দাগ থাকলে সেটা বাতিল করতে হবে। এই ধরনের সরু খোলা ফাটা ডিম পরীক্ষা করবার জন্য উজ্জ্বল আলোতে দেখা দরকার। এছাড়াও ডিমের খোলার ওপর আঙুলের নখের সাহায্যে খুব আস্তে টোকা মারলে যদি ঢপ ঢপ শব্দ হয় তাহলে অবশ্যই ধরে নিতে হবে ডিমের খোলা ফাটা। অপর দিকে ডিমের কোথাও যদি ফাটা না থাকে তবে আঙুলের নখের সাহায্যে টোকা মারলে খুব আস্তে হলেও টং টং শব্দ হবে।

**কাঁপা বায়ুগহ্বর :** যে কোন শ্রেণীর হাঁস অথবা মুরগির ডিমকে যদি বেশি ঝাঁকানো যায় তবে ভেতরের বায়ু গহ্বর কাঁপতে থাকে এর জন্য ডিম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ধরনের ডিম থেকে বাচ্চা পাওয়া গেলেও সেটা ভালো হয় না। সেই কারণে যে সব ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো হবে তাদের বেশি নাড়াচাড়া করা অথবা ঝাঁকানো উচিত নয়।

**ডিমের খোলার ওপর ময়লা :** ডিমের খোলার ওপর অনেক সময় হাঁসের মল-মূত্র লেগে থাকে। এছাড়াও ছোট খড়ের কুচি লেগে থাকতে পারে। ময়লা পরিষ্কার করবার জন্য কোন সময়েই জলের মধ্যে ডিমকে ডুবিয়ে ধোয়া অথবা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে মোছা উচিত নয়। এইভাবে ময়লা পরিষ্কার করলে খোলার ওপরে ছিদ্রগুলো খুলে যায়। হাঁস বা মুরগি যখন ডিম পাড়ে তখন ডিমের খোলার ওপর পাতলা স্বচ্ছ আঠার মতো এক ধরনের পদার্থ মাখানো থাকে। ডিম পাড়ার পর আট থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে বাতাসের সংস্পর্শে এসে শুকিয়ে যায় এবং খোলার ওপর গর্ত ভরাট অবস্থায় থাকে। এতে ডিম ভালো থাকে। কাজেই খোলা থেকে ময়লা পরিষ্কার করতে হবে হালকা চাপে ছুরির সাহায্যে চেঁছে। অবশ্য বেশি ময়লা থাকলে সেই ডিমকে বাচ্চা তোলার কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**বাচ্চা তোলার ডিম কত দিন ভালো থাকে :** পশ্চিমবঙ্গে শীত থাকে মাত্র দু' মাস। বাকি দশ মাস গরম। স্বাভাবিক তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামে না। এই তাপমাত্রা সন্ধ্যে থেকে পরের দিন বেলা ৮টা পর্যন্ত থাকে। তারপর

তাপমাত্রা বাড়ে এবং ৩০° সেলসিয়াসে পৌঁছায়। কাজেই শীতের সময় হাঁস ডিম পাড়ার পর ৭ দিন পর্যন্ত রাখা যায় এবং সেটা বাচ্চা তোলার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। অপরদিকে গরমকালে ডিম পাড়ার পর তিন দিন অবধি ভালো থাকে। এর বেশি দেরি হলে ডিম নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই সেই ডিমকে বাচ্চা তোলার কাজে ব্যবহার না করাই ভালো।

স্ত্রী হাঁস ডিম পাড়ার পর কোন ঠাণ্ডা এবং সামান্য স্যাঁতসেঁতে ঘরেতে রেখে দিতে হবে। ঘরের তাপমাত্রা ৫৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট হলে সব থেকে ভালো হয়। এছাড়াও ডিম রাখতে হবে সূচাল দিকটা নিচের দিকে করে। কারণ ঐদিকট ওপর দিকে রাখলে ডিমেব ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে। জীববিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সকালের দিকে পাড়া ডিম অপেক্ষা বিকেলে পাড়া ডিম থেকে বাচ্চা একদিকে যেমন সবল হয় তেমনি অপরদিকে বাচ্চা তাড়াতাড়ি ডিম ফুটে বের হয়। কি কাবণে এটা হয় সে বিষয়ে তাঁরা কিছু জানাননি। এব্যাপারে খামারী কৃত্রিম অথবা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

**ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলার উপযুক্ত সময় :** বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে যন্ত্রের মাধ্যমে (ইনকিউবেটার) সারা বছর ধরে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলার কোন বিশেষ অসুবিধে হয় না। তবে যেখানে ডিম ফোটানো হচ্ছে সেই জায়গার আবহাওয়ার ওপব লক্ষ্য রেখে ডিম ফোটালে বাচ্চা মানুষ করতে খামারীর কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ সুবিধে হয়। বাচ্চা মরে কম সংখ্যায় এবং বিশেষ যত্নের জন্য একদিকে যেমন অর্থ খরচ কমে তেমনি অপরদিকে পরিশ্রম কম করতে হয়। কারণ দেখা গেছে, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং অতিরিক্ত বর্ষা হলে বাচ্চার মৃত্যুর হার শতকরা ৬০ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে যায়। এইভাবে বাচ্চা হাঁসের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়া খামারীর কাছে আর্থিক লোকসান। মাঝারি গরম এবং শুকনো আবহাওয়া থাকলে বাচ্চারা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং মৃত্যুর হারও কমে। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল এবং জুন এই চারমাস এবং অক্টোবর, নভেম্বর দু' মাস—মোট ৬ মাস ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলার পক্ষে আদর্শ সময় হিসাবে ধরা হয়। তবে বড় খামারে বারো মাসই ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলা হলে বিভিন্ন বয়সের বাচ্চা পাওয়া সম্ভব হয় এবং ডিমের উৎপাদনের হার সারা বছর ধরে বজায় থাকে।

**ডিম পরীক্ষা করা :** হাঁসের ডিমের খোলা মোটা আর মুরগির ডিমের খোলা সেই তুলনায় কিছুটা পাতলা। তবে উভয়ের ডিমের খোলা ভেদ করে ভেতরের অবস্থা দেখা যায়। কারণ এর মধ্য দিয়ে আলো ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। ঐ আলোতে ভেতরের সব কিছু পরিষ্কার দেখা না গেলেও ভ্রূণ থাকলে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। আলোর সাহায্যে ডিম পরীক্ষা করার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় ক্যান্ডলিং (CANDLING)। যে যন্ত্রে আলো বসিয়ে পরীক্ষা করা হয় তার নাম এগ্ টেস্টার (EGG TESTER)। যন্ত্রটি এমন কিছু জটিল ব্যাপার নয়। একটা চার

চৌকা টিনের অথবা পিজবোর্ডের বাক্সে বৈদ্যুতিক বাতি (৬০ শক্তির) রাখতে হবে। বাক্সের ওপরে মাঝখান বরাবর এমনভাবে গর্ত করা হবে যাতে ডিমের অর্ধেকটা বাক্সের ভেতরের দিকে চলে যায় এবং বাকি অর্ধেক অংশ ওপরে থাকে। তবে বাক্সের ওপরে গর্ত এমনভাবে করতে হবে যাতে গর্ত দিয়ে গলে ডিম বাক্সের মধ্যে পড়ে না যায়। যদি বাক্সের ভেতরে বৈদ্যুতিক বাতি রাখার সুবিধে না থাকে অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তি না পাওয়া গেলে ভেতরে টর্চ জেলে ডিম পরীক্ষা করা যায়।

ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাবার জন্য ইনকিউবেটার (কৃত্রিম উপায়ে) অথবা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে (কোরক হাঁসের বা মুরগির সাহায্যে তা দিয়ে) যে ডিম আলোতে পরীক্ষা করা হচ্ছে তার ভেতরে কি দেখা যাবে? ভালো ডিম হলে ভেতরটা স্বচ্ছ দেখাবে এবং মাঝখানে হলদে-কুসুম কিছুটা অস্পষ্ট ছায়ার মতো মনে হবে। টাটকা পাড়া অথবা একদিন আগে যে ডিম স্ত্রী হাঁস পেড়েছে সেই ডিমের ক্ষেত্রে ভেতরের অবস্থা এই রকম হবে। বাচ্চা তোলার জন্য এই রকম ডিম অবশ্যই নির্বাচন করা যাবে এবং তার থেকে বাচ্চা পাবার আশা শতকরা ৯০টি ডিমের ক্ষেত্রে খামারী আশা করতে পারে।

**যন্ত্রে (ইনকিউবেটারে) ডিম রাখার পরীক্ষা ঃ** ইনকিউবেটারে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাবার জন্য রাখার পর ডিম অনুর্বর অথবা তার মধ্যে ভ্রূণ জীবিত বা মৃত সেটা অবশ্যই পরীক্ষা করে জানতে হবে। তার জন্য ডিম রাখার পর **সাত দিনের** মাথায় **প্রথম বার** পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ডিমকে এগ্ টেস্টার বাক্সের ওপরে ফুটোতে রাখলে ভেতরে ভ্রূণ দেখা যায়। ঠিক মাঝখানে কুসুমের মধ্যে সর্ষের দানার মতো কালো একটা বিন্দু দেখতে পাওয়া যাবে। এটাই ডিমের ভ্রূণ। যদি ভ্রূণ জীবিত থাকে তাহলে ঐ কালো বিন্দু থেকে সরু চুলের আকারে রক্তের নালীগুলো মাকড়সার জালের মতো চারদিকে ছড়িয়ে থাকে। চার থেকে পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করলে ভ্রূণ সামান্য নড়ছে সেটাও আলোর মধ্যে ধরলে দেখা যাবে। এইসব মিলে গেলে বুঝতে হবে ডিমটা উর্বর এবং তার থেকে বাচ্চা ফুটে বের হবে। ডিম যদি অনুর্বর হয় তবে ভেতরে সবকিছু আবছা দেখাবে। ভ্রূণ যদিও দেখা যায় মাকড়সার জালের মতো রক্ত নালী চোখে পড়বে না এবং ত্রিশ সেকেণ্ড পর্যন্ত আলোতে রাখলেও ভ্রূণ এক চুলও নড়বে না। এই রকম অনুর্বর ডিম ইনকিউবেটারের মধ্যে রেখে কোন লাভ নেই। ডিমকে বাইরে বের করে সেটা খাবার জন্য ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম দফায় পরীক্ষার পর ডিমকে **দ্বিতীয়বার** পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই কাজটি করা হবে ইনকিউবেটারে ডিম বসাবার পর **১৪ দিনের** মাথায়। দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে ডিমটি থেকে বাচ্চা পাওয়া যাবে। এই সময় যে ডিমে বাচ্চা রয়েছে তার বায়ু-গহ্বর (AIR SPACE) ছাড়া বাকি সব অংশ কালো দেখাবে। যে ডিম ১৪ দিনের মাথায় ভেতরটা আলোর সাহায্যে দেখলে স্বচ্ছ দেখাবে ইনকিউবেটার থেকে ঐ ডিমকে বাইরে বের করে দিতে হবে। এই ডিম সিদ্ধ অথবা কাঁচা খাওয়া চলবে না।

সর্ব শেষ এবং তৃতীয়বার পরীক্ষা করে ডিমকে দেখে নিতে পারা যায়। অবশ্যই এটা না করলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবু সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হবার জন্য ডিমকে ইনকিউবেটারে রাখার দিন থেকে ১৯-২০ এই দু' দিনের মধ্যে **যে কোন একদিন** পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারা যায়।

যে কোন একটা পাত্রে স্টিলের বড় বাটি, ছোট স্টিলের গামলা, পলিথিনের পাত্র অথবা চিনামাটির পাত্রে ১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইট গরম জলে (থার্মোমিটারের সাহায্যে জলের উষ্ণতা পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে। কারণ জলের কম বা বেশি উষ্ণতায় ফলাফল সঠিক হয় না।) ডিমকে রাখলে এক মিনিট বাদে ডিম ঘুরতে থাকবে। এই পরীক্ষায় সঠিকভাবে বুঝতে পারা যাবে ডিম থেকে বাচ্চা পাওয়া যাবে। যদি গরম জলে ডিম না ঘোরে তবে বুঝতে হবে ডিমের মধ্যে বাচ্চা মরে গেছে। সেই ডিম গরম জলে স্থির হয়ে থাকবে।

যে ডিম গরম জলে ঘুরেছে তাকে জল থেকে তুলে সাবধানে পরিষ্কার ফালি কাপড় দিয়ে মুছে আবার ইনকিউবেটারে রেখে দিতে হবে। গরম জলের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখার জন্য **ডিমকে এক মিনিটের বেশি সময় ধরে রাখা চলবে না।** এরপর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে ইনকিউবেটার থেকে বের করে তাকে নার্শারী ট্রের মধ্যে রেখে দিলে (রাখতে হবে ২৪ ঘণ্টা থেকে ৩৬ ঘণ্টা) বাচ্চারা সুস্থ থাকে। যন্ত্রে ডিম বসাবার পর ২১ দিনের মাথায় নার্শাবী ট্রে ঠিক করে রাখা উচিত। নবজাতক হাঁসের বাচ্চাদের এইভাবে নাশরী ট্রেতে রাখার উদ্দেশ্য হলো যাতে ঐ সময়ের মধ্যে ওদের দেহের পালকগুলো উত্তমরূপে শুকিয়ে যায়। এরপর ব্রুডার ঘরে ওদের রাখা দরকার।

**কম সংখ্যায় বাচ্চা উৎপাদন ও ভ্রূণের মৃত্যুর কারণ ঃ** ইনকিউবেটারের সাহায্যে যদি বেশি সংখ্যাতে হাঁসের বাচ্চা তোলা না হয় তবে খামারীর আর্থিক ক্ষতি বেড়ে যাবে। অনুর্বর ডিম এবং ভ্রূণের মৃত্যু যতটা সম্ভব কমানো দরকার। অর্থাৎ ইনকিউবেটারের মাধ্যমে যাতে বেশি সংখ্যাতে ডিম ফোটানো যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা বাচ্চা তোলার খরচ বেড়ে যাবে।

বিভিন্ন কারণে ডিম থেকে অল্প সংখ্যাতে বাচ্চা উৎপন্ন হয় এবং ইনকিউবেটারের ভেতরেও খামারীর ত্রুটিতে উর্বর ডিমের ভ্রূণ মরে গিয়ে বাচ্চা উৎপাদনের হার কমিয়ে দেয়। সাধারণভাবে দেখা গেছে হাঁস ডিম পাড়া শুরু করলে দেড় বছর পর্যন্ত সেই ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদনের হার বেশি হয়। এরপর হাঁসের বয়স বাড়লে সেই ডিমের বাচ্চা উৎপাদনের হার কমতে থাকে। এছাড়াও রোগে আক্রান্ত হাঁস সুস্থ হবার পর ডিম পাড়তে শুরু করলে এবং উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ না করার ফলে (অর্থাৎ রোগে আক্রান্ত হবার পর সুস্থ হলেও শরীর দুর্বল থাকে এবং পূর্ণমাত্রায় খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না।) ডিম ঠিক মতো পুষ্ট হয় না। সেই শ্রেণীর ডিমের বাচ্চা উৎপাদনের হার অবশ্যই কম হবে। আবার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় পুরুষ হাঁসের (যেমন বাবা বা ছেলে) সঙ্গে স্ত্রী হাঁসের দৈহিক মিলন

ঘটালে সেই ডিমের বাচ্চা উৎপাদনের হার কমে। কিছু ক্ষেত্রে খাদ্যে পরিমাণ মতো ক্যালসিয়াম এবং সবুজ খাদ্যসহ আমিষ জাতীয় উপাদান কম থাকলে ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদনের হার কমতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যের আলো হাঁস না পেলে উর্বর ডিম পাওয়া যায় না।

আগে যে সব কারণের কথা বলা হয়েছে সেগুলো স্বাভাবিক ঘটনা। তবে ইনকিউবেটারে উর্বর ডিম বসাবার পর খামারীর অজ্ঞতা অথবা পরিচর্যার ক্ষেত্রে ত্রুটির জন্য ডিমের বাচ্চা উৎপাদনের হার কমে যায় এবং ডিমের ভেতর বাচ্চা জন্মালেও সেটা মরে যায় অর্থাৎ ভ্রূণ নষ্ট হয়।

কম সংখ্যাতে বাচ্চা উৎপাদনের (কৃত্রিম উপায়ে) ক্ষেত্রে আরও কিছু কারণ রয়েছে। সে সব যাতে না ঘটে তারজন্য খামারীকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। নতুবা হাঁসের উর্বর ডিম ইনকিউবেটারে বসালেও ডিম নষ্ট হয় অর্থাৎ তার থেকে বাচ্চা পাওয়া যায় না। যে বিষয়গুলোর ওপর খামারীকে নজর দিতে হবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। অবশ্য খামাব শুরু করার প্রথম মুখে সামান্য অসুবিধা দেখা দিতে পারে, তবে কয়েক বার বাচ্চা তোলার পর আর ভুল হবার আশঙ্কা থাকে না।

**ডিম বসাবার আগে ইনকিউবেটারের প্রস্তুতি ঃ** নির্বাচিত উর্বর ডিম ইনকিউবেটারে বসাবার আগে তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যন্ত্রটি চালিয়ে দেখা দরকার। যেদিন ডিম বসানো হবে তার দু' দিন আগে কাজটি করতে হবে। যদি আগে থাকতে পরীক্ষা করে না দেখা হয় তবে ডিম বসিয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ঠিক করবার সময় প্রয়োজনীয় তাপের অভাবে ডিমের ভ্রূণের বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে বাচ্চা উৎপাদনের হার কমে যাবার আশঙ্কা থাকে। আবার জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আগে থাকতে কিনে হাতের কাছে মজুত রাখা দরকার। কারণ ডিম ইনকিউবেটারে বসাবার পর হঠাৎ কোন যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে গেলে সেটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি পালটে আবার চালু করতে পারা যায় সেই কারণে এই ব্যবস্থা করা দরকার। হাতের কাছে যেসব যন্ত্রাংশ রাখতে হয় তার মধ্যে রয়েছে মাকারি টিউব, মাইক্রো সুইচ, থার্মোমিটার, বাতি, ক্যাপসুল ইত্যাদি। এসবের প্রয়োজন হবেই সেকথা বলা হচ্ছে না। তবে যন্ত্র যেকোন সময়েই খারাপ হতে পারে, সেই কারণে অতিরিক্ত সাবধানতা হিসাবে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া।

**বাচ্চা তোলার জন্য ডিমের মেয়াদ ঃ** হাঁস ডিম পাড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা পাবার জন্য ইনকিউবেটারে বসাতে হয়, সেটা কোন খামারীর পক্ষে সম্ভব হয় না। ডিমকে কয়েকদিন রেখে দিতে হয়। কারণ ইনকিউবেটারে যে সংখ্যায় ডিম বসানো হবে সেটা সংগ্রহ করতে খামারীর তিন থেকে চার দিন সময় লাগে। সুতরাং কত দিন আগের পাড়া ডিম বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করার উপযুক্ত থাকে তা জানতে হবে। সাধারণভাবে দেখা গেছে, ডিমকে ৫৫ ডিগ্রি থেকে ৬০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে রাখলে সাত দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। এব্যাপারে সব

থেকে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এক সপ্তাহ আগে পাড়া ডিম থেকে সর্বোচ্চ হারে বাচ্চা পাওয়া যায়। যদি কোন কারণে আট দিন আগে পাড়া ডিম বসানো হয় তবে প্রতিদিনের জন্য শতকরা হিসাবে দশভাগ হারে বাচ্চা উৎপাদন কমে যায়। সেই কারণে সর্বোচ্চ হারে বাচ্চা পাবার জন্য কেবল এক সপ্তাহ আগে পাড়া ডিম ব্যবহার করা উচিত।

**ইনকিউবেটারে ডিম ঘোরাবার সঠিক পদ্ধতি ঃ** ডিমকে কোন্ দিন থেকে সারা দিনে কয়বার ঘোরাতে হবে সে বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে। তবে প্রতিদিন একই সময় কাজটি করতে হবে। ডিমকে ঘোরাবার সময় খুবই ধীরে ধীরে এবং সামান্য ওপরে তুলে আস্তে আস্তে করা দরকার। বিশেষ করে ডিম যন্ত্রে বসাবার পর সাত দিন পর্যন্ত এইভাবে ঘোরাতে হবে। নতুবা ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। আর ডিম বসানো থাকবে ৪৫ ডিগ্রি সমকোণ অবস্থায়।

**বিকলাঙ্গ অথবা খোঁড়া শাবক ঃ** ধরা যাক, বিকৃত দেহ আকার অথবা খোঁড়া শাবক জন্মাল। অথচ ইনকিউবেটারে বসানো হয়েছিল উর্বর ডিম এবং পালনীয় কর্তব্য পালনে খামারীর কোনরকম অবহেলা ছিল না। এই ধরনের ঘটনা ঘটে ইনকিউবেটারের মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় তাপমাত্রার অভাব থাকে। সেই কারণে যন্ত্রের ভেতরে ব্যবহৃত থার্মোমিটার উত্তম শ্রেণীর থাকা দরকার। কম দামের থার্মোমিটার ব্যবহার করলে ঠিকমতো তাপামাত্রা বুঝতে পারা যায় না। নিকৃষ্ট থার্মোমিটারের জন্য প্রকৃত তাপমাত্রার থেকে যদি মাত্র ২° ফারেনহাইট কম বা বেশি হয় তাহলে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় না। কম তাপমাত্রায় ডিম পচে যায়, আবার বেশি হলে বিকলাঙ্গ শাবক উৎপন্ন হয়।

অনেক সময় ইনকিউবেটারের মধ্যে ট্রেতে ভুলভাবে ডিমকে বসানো হয়। এই ত্রুটির জন্য ডিমেব ভেতরে বাচ্চার গঠন সঠিকভাবে হয় না। বিকৃত গঠনের বাচ্চা জন্মায়। এই রকম বাচ্চা খামারে পালন করে কোন লাভ নেই। ফলে তাকে মেরে ফেলতে হয়। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা উৎপাদন করতে হলে প্রথম দিকে কয়েকবার অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে কাজ করা দরকার।

## বাচ্চা হাঁসের যত্ন ও পরিচর্যা

**তাপঘর অথবা ব্রুডিং ব্যবস্থা ঃ** দেশী পাতিহাঁস জন্মের পর থেকে তার বাচ্চাদের অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পালন করে। সেই কারণে তাদের ব্রুডিং হাউস অর্থাৎ তাপ ঘরে রাখার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খাঁকি ক্যাম্পবেল, ভারতীয় রানার, সংকর জাতের ভারতীয় হাঁস বাচ্চা পালন করতে চায় না। সেই কারণে খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের বাচ্চার যত্ন ও পরিচর্যা জন্মের পর থেকেই করা দরকার। ইনকিউবেটার থেকে বাচ্চা বের করার পর তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সব থেকে বেশি যত্নের প্রয়োজন হয়। যদি খামারী এবিষয়ে সামান্য অবহেলা করে তবে বাচ্চার মৃত্যুর হার অনেক বেড়ে যায়।

সাধারণভাবে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা তোলা হলে তাদের তাপ ঘরে রাখার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এই তিন মাস ইনকিউবেটার থেকে বাচ্চা বের করে তারের জালের খাঁচাতে রাখতে পারা যায়। মেঝেটাও তারের জালের হবে। যদি তারের জালের খাঁচা কেনার অসুবিধে থাকে তা হলে খানিকটা জায়গা এক হাত উঁচু করে চারদিক ঘিরে পাকা মেঝের ওপর হাঁসের বাচ্চাদের রাখা যায়। তবে মেঝেতে শুকনো কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে একটা কথা খামারীর অবশ্যই মনে রাখা দরকার, কাঠের গুঁড়ো যেমন শুকনো হবে তেমনি পাকা মেঝে সব সময় শুকনো থাকবে। মেঝে এবং কাঠের গুঁড়ো এই দুটোর মধ্যে একটা যদি ভিজে থাকে তাহলে হাঁসের বাচ্চা রোগে আক্রান্ত হবে। ওদের জন্য ঘেরা জায়গায় এক কোণায় রাখা পানীয় জলের পাত্র কোন কারণে যদি উলটে যায় অথবা জলের ছিটা লেগে কাঠের গুঁড়ো ভিজে যায় তবে সেই জায়গার কাঠের গুঁড়ো ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর ঐ জায়গায় শুকনো কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

যে সব হাঁসের বাচ্চা কৃত্রিম উপায়ে অন্যান্য মাসে জন্মাচ্ছে তাদের ব্রুডিং হাউসে নির্দিষ্ট উষ্ণতার মধ্যে রাখতে হবে সারা দিন-রাত ধরে। জন্মের পর থেকেই তিন সপ্তাহ পর্যন্ত এর কোন পরিবর্তন করা চলবে না। কারণ ওরা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার মধ্যে না থাকলে অকালে মারা যাবে। যদিও বেঁচে থাকে তাহলে রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে নির্দিষ্ট মাত্রায় উত্তাপ প্রয়োগ করে বাচ্চাকে লালন-পালন করার ব্যবস্থাকে ব্রুডিং বলে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নতুন পরিবেশে বাচ্চারা যাতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যে যন্ত্রের মাধ্যমে বাচ্চাদের কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপ দেওয়া হয় তাকে ব্রুডার যন্ত্র বলে। এই সময়ে যে নির্দিষ্ট মাত্রায় বাচ্চাদের তাপ দেওয়া হয় তাকে বলা হয় ব্রুডিং টেম্পারেচার। এই যে নির্দিষ্ট তাপামাত্রায় হাঁসের বাচ্চাদের রাখা হয় তার ফলে ওদের পেটের মধ্যে যে কুসুম থাকে সেটা শরীরের মধ্যে মিশে যেতে সাহায্য করে। এই কাজটি ছাড়াও নির্দিষ্ট মাত্রায় উষ্ণতার জন্য ওদের শরীরের হজমশক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে এবং দেহে তাড়াতাড়ি পালক গজাবার পক্ষে সহায়ক হয়। মোটামুটিভাবে প্রোটিনে ভরা এই কুসুম হাঁসের বাচ্চার শরীরের মধ্যে শোষিত হতে তিন দিন সময় লাগে। সেই কারণে ইনকিউবেটার থেকে বাচ্চাদের বের করে আনার পর ওদের তিন দিন একমাত্র পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানীয় জল ছাড়া আর কোন খাদ্য দেবার প্রয়োজন হয় না। তবে বর্তমানে নবজাতক বাচ্চাদের প্রথম দিন গ্লুকোজ অথবা ইলেকট্রাল পাউডার মেশান জল পান করতে দেওয়া হয়। এছাড়া আর কোন খাদ্য বাচ্চাদের দেবার প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয় দিন থেকে গুঁড়ো করা খাদ্য ওদের দেওয়া দরকার। খাদ্যের মধ্যে থাকে শরীরে শক্তি উৎপাদনকারী ভুট্টা, সুজি, গম এবং চালের খুদ। এইসব খাদ্য কার্বোহাইড্রেট শ্রেণীভুক্ত। তবে দু' দিন বয়সের বাচ্চাকে কোন সময়েই

শুকনো গুঁড়ো করা খাদ্য দিতে নেই। সামান্য জল দিয়ে ভিজিয়ে নরম করে (কিছুটা পাতলা হবে) ওদের খাওয়াতে হবে। বয়স চার দিন হলে তখন সাধারণ খাবার সামান্য জলে ভিজিয়ে খেতে দেওয়া যাবে। অবশ্য খাদ্যের পরিমাণ হবে বাচ্চার বয়স অনুসারে।

এরপর বাচ্চার বয়স আরও বাড়লে এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলেও কোন সময়েই শুকনো খাবার খেতে দেওয়া চলবে না। খেতে দেবার আগে খাদ্যকে সামান্য জলে ভিজিয়ে অর্থাৎ জল দিয়ে মেখে খেতে দেওয়া উচিত। ওদের খাদ্য কোন সময়েই সারা রাত জলে ভিজিয়ে রেখে তার পরের দিন খেতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ বেশি সময় ধরে ওদের খাবার জলে ভেজানো হলে ছত্রাক জন্মায়। ঐ ধরনের খাবার হাঁস খেলে ওরা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের বাচ্চার যত্নের প্রসঙ্গে মূল নিয়মনীতিগুলো প্রত্যেক খামারীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মোট তিন সপ্তাহ পর্যন্ত ওদের অত্যন্ত যত্নের প্রয়োজন হয়। তারপর থেকে ওরা নিজেদেব নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। সুতরাং ওদের পরিচর্যা এবং যত্নের প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলোর প্রতি খামারীকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

(ক) বাচ্চাদের বিশেষ করে শীত এবং বর্ষার সময় ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। তার জন্য ব্রুডিং হাউস (ঘর) বা ব্রুডার যন্ত্রের ভেতর প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে।

(খ) খামারের মধ্যে অথবা ব্রুডার যন্ত্রের সংলগ্ন (যে খোলা জায়গায় বাচ্চারা ঘুরে বেড়াবে) চত্বরের মধ্যে ইঁদুর, ছুঁচো, আরশোলা, বিভিন্ন ধরনের পিঁপড়ে এবং বেড়াল যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা দরকাব। কারণ ওদেব দৌরাত্ম্যে বাচ্চা মারা যাবার আশঙ্কা থাকে।

(গ) বাচ্চাদের থাকার জায়গা ওদের বয়স অনুপাতে অবশ্যই দিতে হবে। কারণ জন্মের পর থেকে ২১ দিন পর্যন্ত ওরা ব্রুডিং হাউস অথবা ব্রুডার যন্ত্রের মধ্যে থাকবে। প্রতিদিন ওদের দেহের বৃদ্ধি ঘটবে। সুতরাং হিসাব করে ঐ সময় পর্যন্ত যতটা জায়গার প্রয়োজন হবে সেটা ঠিক করে ওদের রাখতে হবে। ব্রুডিং হাউস এবং ব্রুডার যন্ত্র এই কাজে ব্যবহার করা হলে বাচ্চারা মেঝেতেই থাকবে। সুতরাং ২১ দিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি হাঁসের বাচ্চার জন্য কতটা জায়গা লাগবে তার একটা হিসাব এখানে দেওয়া হচ্ছে। এতে কাজের সুবিধে হবে।

এখানে হাঁসের থাকার জায়গার যে হিসেব দেওয়া হচ্ছে ক্রমান্বয়ে হাঁস যখন পূর্ণবয়স্ক হবে তখন অবধি প্রতিটি হাঁসের জন্য খামারীকে কতটা জায়গা দিতে হয় সেই মাপটাও থাকছে। কারণ খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস পালন করা হচ্ছে মেঝেতে এবং ওরা যখন ব্রুডার হাউস অথবা ব্রুডার যন্ত্রের মধ্যে থাকছে তখনও মেঝেতে রাখা হচ্ছে।

| হাঁসের বয়স—সপ্তাহ হিসাবে | প্রয়োজনীয় জায়গা বর্গমিটার হিসাবে |
|---|---|
| ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত | ০.০৬৮ |
| ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ অবধি | ০.১১৩ |
| ৬ থেকে ১০ সপ্তাহ | ০.২০০ |
| ১০ থেকে ১৬ সপ্তাহের জন্য | ০.২৫০ |
| ১৭ থেকে হাঁস যত দিন খামারে থাকবে | ১.৬০০ |

(ঘ) বাচ্চারা ব্রুডার হাউস অথবা ব্রুডার যন্ত্রের মধ্যে থাকার সময় ওদের জন্য পানীয় জলের পাত্র এবং তার মধ্যে কতটা জল রাখতে হবে সেটাও একটা নির্দিষ্ট মাপের মধ্যে থাকবে। কারণ জলের পাত্র বেশি বড় হলে এবং তার মধ্যে পরিমাণে বেশি জল রাখলে বাচ্চা হাঁসের জলে ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকবে।

সুতরাং জন্মের দিন থেকে হাঁস যতদিন পর্যন্ত খামারে পালিত হবে সপ্তাহ অনুসারে জলের পাত্রের মাপ কি রকম হবে তার হিসাব দেওয়া হচ্ছে। সেই পাত্রের সামান্য জায়গা খালি রেখে তার মধ্যে পানীয় জল ভরে হাঁসকে দিলে বাচ্চার ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকবে না। আবার বয়স বাড়লে হাঁস যেমন বেশি পরিমাণে জলপান করবে তেমনি জল দিয়ে মাখা খাদ্য গ্রহণ করার সময় খাবার জলের পাত্রে মাঝে মাঝে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ভিজিয়ে নেবে। এটা সব শ্রেণী ও জাতের হাঁসের স্বভাব বলতে পারা যায়। সুতরাং ওদের জন্য পানীয় জলের পাত্রের আকার যেমন বড় হবে তেমনি তার মধ্যে পানীয় জলের পরিমাণও বেশি থাকবে। এখানে পানীয় জলের পাত্রের যে মাপটা দেওয়া হচ্ছে সেটা বাচ্চার জন্মের পর থেকে সপ্তাহ হিসাবে আড়াই মাস অর্থাৎ ১০ সপ্তাহ পর্যন্ত। পরবর্তীকালে যে ধরনের পাত্র ব্যবহার করতে হবে সেটাও বলে দেওয়া হবে।

| বয়স (সপ্তাহ হিসাবে) | জলের পাত্র (সেন্টিমিটার হিসাবে) |
|---|---|
| ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত বয়স | ১.২ |
| ৩ থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত | ১.৮ |
| ৬ থেকে ৯ সপ্তাহ অবধি | ২.০ |
| ১০ সপ্তাহ বয়স শেষ হলে | ৫.০ |

এরপর প্রশ্ন থাকে জলের পাত্রের গভীরতা কতটা থাকবে। কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে জলের পাত্রের গভীরতা বেশি থাকলে বাচ্চা হাঁস জলপান করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত জলের মধ্যে ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকবে। বিশেষ করে যে বাচ্চার জন্মের পর থেকে এক সপ্তাহ বয়স হয়েছে। সুতরাং জলের পাত্রের গভীরতা থাকবে ৫.০ থেকে ৭.৫ সেমি পর্যন্ত। এরপর অর্থাৎ বাচ্চার বয়স ১০ সপ্তাহ পার হলে তখন জলের পাত্রের গভীরতা বাড়িয়ে ১৫ সেমি অথবা তারও বেশি করতে পারা যায়। কারণ তখন হাঁস কিছুটা করে নিজেরাই খাবার খেয়ে ঘাড় পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে নেবে।

(ঙ) বাচ্চা হাঁসের খাবারের পাত্র ওদের বয়স অনুপাতে হওয়া দরকার। কারণ পাত্রের মাপ বড় হলে ওদের খাবার খেতে অসুবিধে হবে। আবার খুব ছোট পাত্রে খাবার দেওয়া হলে সব বাচ্চা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে না। এই দুটো কারণের মধ্যে যে কোন একটা বিষয়ে ত্রুটি থাকলে খাদ্যের অপচয় হবে এবং বাচ্চার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে। সুতরাং বাচ্চাদের খাবারের পাত্রের মাপটা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

| হাঁসের বয়স (সপ্তাহ) | খাবারের পাত্র (সে. মি.) |
|---|---|
| ০-৩ সপ্তাহ | ১.৪ |
| ৩-৬ সপ্তাহ | ২.০ |
| ৬-৯ সপ্তাহ | ৩.৫-৪.০ |
| ১০ সপ্তাহ এবং তার বেশি | ১০.০ |

বাচ্চার বয়স ১০ সপ্তাহ অর্থাৎ আড়াই মাস পূর্ণ হলে তখন ওদের খাবার পাত্র বড় দেওয়া দরকার। এই কাজের জন্য মাটিব পোড়া গামলা অর্থাৎ ডাবা (গরুকে জাব খেতে দেওয়া হয়) মেঝেতে গর্ত কবে বসাতে হবে। মেঝে থেকে গামলার উচ্চতা থাকবে পাঁচ ইঞ্চি। বাকিটা নিচের দিকে বসানো হবে। এর বেশি উঁচু হলে হাঁসের খাদ্য গ্রহণ করতে অসুবিধে হতে পারে।

(চ) ব্রুডাব হাউস অথবা ব্রুডার যন্ত্রে শীতকাল হলে বাচ্চাদের ২১ দিনের পরিবর্তে ২৮ দিন পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন হতে পারে।

## বাচ্চা হাঁসের যত্ন ও খাদ্য

খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের বাচ্চার ১ দিন থেকে ২১ দিন বয়স পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি যত্নের প্রয়োজন। উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার অভাবে এই বয়সের বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশি হবার আশঙ্কা থাকে।

এই সময় হাঁসের বাচ্চাকে তারের জালের মেঝেতে অথবা মাটি বা সিমেন্টের মেঝেতে কাঠের গুঁড়ো বিছিয়ে তার ওপর রাখা যায়। কাঠের গুঁড়োর ওপর বাচ্চা রাখলে মেঝেকে সব সময় শুকনো রাখতে হবে। এবং তার জন্য গুঁড়োগুলোকে প্রতিদিনই একবার করে উলটে-পালটে দিতে হবে।

বাচ্চার অবস্থা অনুযায়ী ২১ দিন থেকে ১ মাস পর বাচ্চাদের সাধারণ মেঝেতে বা পুকুরে ছাড়া যেতে পারে।

এই ২১ দিন থেকে ১ মাস পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চাদের তাপ দিয়ে রাখতে হয়, একে ব্রুডিং বলে। প্রথম সপ্তাহে ঘরের তাপমাত্রা ৩০° সেন্টিগ্রেড হওয়া প্রয়োজন। এরপর প্রতি সপ্তাহে ৩° সেন্টিগ্রেড করে তাপমাত্রা কমিয়ে ২·৪° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত নামিয়ে আনতে হবে। গরমের সময় এমনিতেই বায়ুর তাপমাত্রা বেশি থাকে বলে চিন্তার কিছু নেই; তবে শীতকালে প্রয়োজনীয় তাপ না দিলে ঠাণ্ডায় বাচ্চার মৃত্যুও ঘটতে পারে। ইলেকট্রিক বাল্বের সাহায্যে এই তাপ দেওয়া

হয়। গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে কেরোসিন ল্যাম্পের সাহায্যেও এই তাপ দেওয়া যেতে পারে।

নবজাত বাচ্চাকে প্রথম ২৪ ঘণ্টা কিছু খেতে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে কেউ কেউ এই সময় গ্লুকোজ জল বা ইলেকট্রাল পাউডার মিশ্রিত জল খেতে দিয়ে থাকেন। প্রথম ২-৩ দিন খাদ্যকে জলের সাথে মিশিয়ে নরম ও পাতলা করে খাওয়াতে হয়। এরপর সাধারণ খাবার অল্প জলে ভিজিয়ে খেতে দেওয়া যেতে পারে। খাবারের পরিমাণ হবে বয়স অনুযায়ী।

হাঁসকে খেতে দেওয়ার সময় খাবার তখনই জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেওয়া উচিত। কখনোই সারা রাত খাবার ভিজিয়ে রেখে দেওয়া উচিত নয়; তাহলে খাবারে ছত্রাক জন্মায় যা হাঁসের শরীরে প্রবেশ করে ভয়াবহ রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

হাঁসের বাচ্চার যত্ন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলিও মনে রাখা দরকার।

(১) বাচ্চাকে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতে ঘরের তাপমাত্রা যেন ঠিক থাকে।

(২) এই সময় ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে অনেক বাচ্চা মারা যেতে পারে, তাই হাঁস খামারে যেন ইঁদুরের উৎপাত না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৩) প্রতিটি বাচ্চার জন্য বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত জায়গা দিতে হবে। এক সঙ্গে গাদাগাদি করে বাচ্চা রাখা চলবে না।

(৪) জলের পাত্রে জলের গভীরতা হবে ৫·০—৭·৫ সেমি। এর থেকে বেশি হলে জলের মধ্যে বাচ্চা ডুবে যেতে পারে।

(৫) এই সময় দিনরাত হাঁসের বাচ্চার ঘরে আলো থাকা দরকার।

## ক্যাম্পবেল হাঁসের খাদ্য

| খাদ্যের উপাদান (কেজি/১০০ কেজিতে) | স্টার্টার হাঁস (০-৩ সপ্তাহ) | গ্রোয়ার হাঁস (৪-২০ সপ্তাহ) | লেয়ার হাঁস (২০ সপ্তাহের বেশি) |
|---|---|---|---|
| ভুট্টা ভাঙা | ৬১.৫০ | ৬১.০০ | ৬৭.০০ |
| সয়াবিন মিল (খোলা ছাড়ানো ও তাপ দিয়ে পরিশোধিত) | ২৬.০০ | ১৬.০০ | ১৯.০০ |
| মাছের গুঁড়ো (ফিস মিল) | ৮.০০ | ৮.০০ | ৬.০০ |
| লুসার্ন পাতা গুঁড়ো | ২.০০ | ২.৫০ | ২.৫০ |
| শামুক-গুগলির খোলা ভাঙা (শেল গ্রিট) | — | — | ৩.০০ |
| খনিজ পদার্থের মিশ্রণ | ২.৫০ | ২.৫০ | ২.৫০ |
| ভিটামিন * | * | * | * |

* প্রতি ১০০ কেজি খাদ্যে ৩৫ গ্রাম রোভিমিক্স বা ভিটাব্লেন্ড, ৫ গ্রাম নিয়াসিন এবং ৩৫ গ্রাম কোলিন ক্লোরাইড মেশাতে হবে।

## হাঁসের খাদ্যের পরিমাণ

ছোট পুকুর বা ডোবা সহ খোলা জায়গায় হাঁস পালন করলে খাবারের দরকার হয় খুব কম, হাঁসপিছু দিনে ৫০-৬০ গ্রাম হলেই চলে। তবে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করলে হাঁসপিছু বেশি খাদ্যের দরকার হয়। ৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত হাঁসপিছু ৪-৫ কেজি এবং ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ১২-১৩ কেজি. সুষম খাদ্যের প্রয়োজন হয়। পূর্ণ বয়সে ডিম পাড়া অবস্থায় প্রতিটি হাঁস ১২৫-১৫০ গ্রাম খাবার খায় অর্থাৎ একটি ডিম পাড়া হাঁসের জন্য বছরে গড়ে ৫০ কেজি সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। জন্ম থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সে খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস কতটা খাবার খায় সেটা দেওয়া হলো।

## হাঁসকে সারাদিনে খাবার দেওয়া

হাঁসকে নির্দিষ্ট পাত্রে খাবার দিতে হয়। জল মিশিয়ে খাদ্য বা ম্যাশ নরম করে দিলে হাঁস তা সহজে খেতে পারে। হাঁস খাবার মুখে নিয়েই জলে মুখ দেয়, তাই খাবার পাত্রের কাছে সব সময় জলের পাত্র রাখতে হবে।

খোলা জায়গায় হাঁস পালনের ক্ষেত্রে সকালে একবার এবং বিকালে হাঁসকে ঘরে তোলার সময় আর একবার মোট দু'বার অল্প করে খাবার দিলেই হবে।

সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় হাঁস পালনের ক্ষেত্রে মোট প্রয়োজনীয় খাদ্যকে ভাগ করে দিনে তিনবার খেতে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, জলের পাত্রে যেন সবসময় পরিষ্কার পানীয় জল থাকে।

**খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের সাপ্তাহিক খাদ্য খাওয়ার হিসাব**

| বয়স (সপ্তাহে) | হাঁসপিছু সাপ্তাহিক | পরিমাণ গড় (কেজি) |
|---|---|---|
| ১ | ০.১১৫ | |
| ২ | ০.২৫৫ | |
| ৩ | ০.৪২৫ | |
| ৪ | ০.৬২০ | |
| মোট | ১.৪১৫ | ১.৪১৫ |
| ৫ | ০.৭২০ | |
| ৬ | ০.৭৭০ | |
| ৭ | ০.৭৮৫ | |
| ৮ | ০.৭৯০ | |
| মোট | ৩.০৬৫ | ৪.৪৮০ |

## সুষম খাদ্য তালিকা

| উপাদান (কেজি./ ১০০ কেজিতে) | হাঁসের বয়স (০—২ সপ্তাহ) | | | হাঁসের বয়স (০—২ সপ্তাহ) | | | হাঁসের বয়স (৯—২০ সপ্তাহ) | | | ডিম পাড়া ও প্রজননক্ষম | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ৩ |
| ভুট্টা ভাঙা | ৩২.০০ | ৪৩.১০ | ৩২.২৪ | ৩১.৭০ | ৪৫.০০ | ৩০.৩২ | ৩৩.৬৯ | – | ৬২.০০ | ৩১.৮৯ | ৪৭.০০ | ৩৫.৮২ |
| জোয়াব ভাঙা | ১১.০০ | – | ১৫.০০ | ১৭.০০ | – | ২৫.০০ | – | ৪৪.৭০ | – | – | ১০.৪৪ | – |
| রাই | ১৬.১০ | ২০.০০ | ২০.০০ | ১৭.০০ | ২০.০০ | ২০.০০ | ৪০.০০ | ৪০.০০ | – | ৩৫.০০ | – | ৩০.০০ |
| চালের কুঁড়ো (রাইস ব্রান) | – | – | – | – | – | – | – | – | ১০.০০ | – | ১৮.০০ | – |
| গমের ভুসি | – | ৫.০০ | – | – | ৯.০০ | – | ১০.০০ | – | ৯.৬০ | – | – | ৫.০০ |
| সালসীড মিল (তেল নিষ্কাসিত অবস্থায়) | ৫.০০ | – | – | ৫.০০ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| বাদাম খইল (৪০% প্রোটিন) | ১১.০০ | – | ১০.০০ | ৯.০০ | – | ৬.০০ | – | ৮.০০ | – | – | ১১.০০ | – |
| সূর্যমুখী খইল (৩৭% প্রোটিন) | ১১.০০ | ৭.০০ | – | ৯.০০ | ৫ ০০ | – | ৫.০০ | – | – | ১১.৫০ | ১১.০০ | – |
| সরিষার খইল (৪০% প্রোটিন) | – | ৭.০০ | – | – | ৫.০০ | – | ৫.০০ | – | – | ১১.৫০ | – | – |

## সুষম খাদ্য তালিকা

| উপাদান (কেজি./ ১০০ কেজিতে | হাঁসের বয়স (০—২ সপ্তাহ) | | | হাঁসের বয়স (০—২ সপ্তাহ) | | | (৯—২০ সপ্তাহ) | | | ডিম পাড়া ও প্রজননক্ষম | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ৩ |
| ভুট্টা গ্লুটেন মিল (৫০% প্রোটিন) | — | ৭.০০ | — | — | ৫.০০ | — | — | — | — | — | — | ৮.০০ |
| তিলের খইল (৪০% প্রোটিন) | — | — | ১০.০০ | — | — | ৬.০০ | — | — | ৯.০০ | — | — | ৮.০০ |
| মাছের গুঁড়ো (৪৩% প্রোটিন) | ১২.০০ | ১০.০০ | ৭.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ৬.০০ | ৫.০০ | ৬.০০ | ৮.০০ | ৪.০০ | — | ৮.০০ |
| মাংসের গুঁড়ো (৫৬% প্রোটিন) | — | — | ৫.০০ | — | — | ৬.০০ | — | — | — | — | ৬.০০ | — |
| হাড় গুঁড়া | .৭০ | .৫০ | .৪০ | .৯০ | .৬০ | .৫০ | .৭০ | ১.০০ | ১ ০০ | .৭৫ | ১.৩০ | .৭৫ |
| লবণ | ৯.২৪ | .২৫ | —• | .২৪ | ২৪ | | .২০ | .১৯ | .২৯ | .২৯ | .০৫ | .২২ |
| চুনাপাথর | — | — | .২০ | — | — | — | .২০ | — | — | ৫ ০০ | ৫.১০ | ৪.১০ |
| কোলিন ক্লোরাইড | .০৫ | .০২ | .০৫ | .০৫ | .০৫ | .০৭ | — | — | — | — | — | — |
| ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের মিশ্রণ | .১১ | .১১ | .১১ | ১১ | .১১ | .১১ | .১১ | .১১ | ১১ | .১১ | .১১ | .১১ |
| | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |

| বয়স (সপ্তাহে) | হাঁসপিছু সাপ্তাহিক | পরিমাণ গড় (কেজি) |
|---|---|---|
| ৯ | ০.৬৯০ | |
| ১০ | ০.৭৩০ | |
| ১১ | ০.৭৫৫ | |
| ১২ | ০.৭৫৫ | |
| মোট | ২.৯৩০ | ৭.৪১০ |
| ১৩ | ০.৫৯৫ | |
| ১৪ | ০.৬০৫ | |
| ১৫ | ০.৬৩০ | |
| ১৬ | ০.৭০৫ | |
| মোট | ২.৫৩৫ | ৯.৯৪৫ |
| ১৭ | ০.৬১৫ | |
| ১৮ | ০.৬৫৫ | |
| ১৯ | ০.৬৬৫ | |
| ২০ | ০.৭৪৫ | |
| মোট | ২.৬৮০ | ১২.৬২৫ |

মনে রাখতে হবে ২০ সপ্তাহের পর ডিম পাড়ার হারের ওপর নির্ভর করে হাঁসপিছু দৈনিক ১২৫-১৫০ গ্রাম খাবার দরকার।

## হাঁসের পালক

মুরগি অপেক্ষা হাঁসের পালকের চাহিদা বেশি এবং দামও বেশি। লবণ জল তথা হাইড্রোক্লোরিক মিশ্রিত জলে—পালকগুলো উত্তমরূপে ধুয়ে নিয়ে মুছে রেখে দিতে হবে। নানাবিধ সাজসজ্জার ব্যাপারে হাঁসের পালকের প্রয়োজন হয়। অতএব হাঁসের পালক বিক্রি করেও আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া যায়।

## হাঁসের বিষ্ঠা

জমির সার হিসাবে হাঁসের বিষ্ঠা-সার উত্তম বিবেচিত হয়ে থাকে।

## হাঁসের ডিমের গ্রেডিং

স্বাভাবিক অনুর্বর টাটকা ডিম টর্চের আলোয় বা বৈদ্যুতিক বাল্‌বের আলোয় পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে—ডিমটা যেন লালচে-হলদে। আরও ভালো করে নিরীক্ষণ করলে ডিমের স্থূল অংশ বায়ুকোষ এবং অভ্যন্তভাগের কুসুম অস্পষ্ট পরিলক্ষিত হবে।

আগমার্কের মান অনুযায়ী ডিমের সাদা অংশ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক। কুসুম হবে অস্বচ্ছ। বায়ুকোষ $\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চির বেশি হবে না। বায়ুকোষ অর্থাৎ অভ্যন্তরভাগের ফাঁকা অংশ।

পরীক্ষান্তে ডিমের গ্রেডিং করা হয়ে থাকে। ওজন অনুযায়ী ডিমকে নিম্নলিখিত চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকেঃ

(১) বিশেষ শ্রেণী বা স্পেশাল (Special grade) :

[ বিশেষ শ্রেণীর হাঁসের ডিমের ওজন ২$\frac{1}{4}$ আউন্স হওয়া আবশ্যক ]

শিলেট মেটে, নাগেশ্বরী, ইন্ডিয়ান বানার প্রভৃতি হাঁসেব ডিমেব ওজন ৫৬ গ্রাম হয়ে থাকে, কিন্তু খাকী ক্যাম্পবেল জাতের হাঁসের ডিমেব ওজন ৭০ গ্রাম হয়ে থাকে।

(২) এ শ্রেণী বা A grade

(৩) বি শ্রেণী বা B grade

(৪) সি শ্রেণী বা C grade

হাঁসেব ডিমেব ওজন ১$\frac{3}{4}$ আউন্সেব কম হলে বাতিল বলে গণ্য হয়ে থাকে।

## ক্যান্ডলিং (Candling)

আগে মোমবাতির সাহায্যে উর্বব বা অনুর্বব ডিম বা ডিমেব অভ্যন্তর ভাগ পবীক্ষা কবা হতো বলে—আলোব সাহায্যে ডিম পবীক্ষা কবাব অপর নাম ক্যান্ডলিং (Candlıng)।
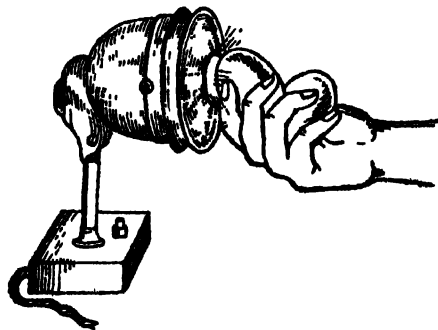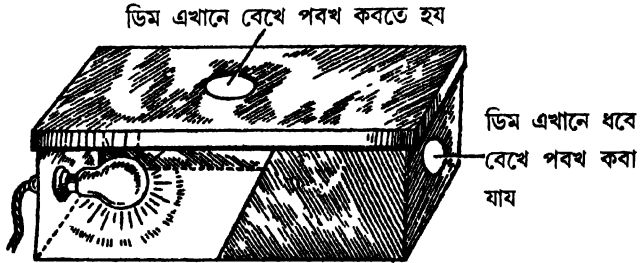
বৈদ্যুতিক বাল্বেব সাহায্যে ডিম পরীক্ষা

তবে বর্তমান কালে টর্চের আলোয় অথবা বৈদ্যুতিক বাল্‌বের সাহায্যে এই ধরনেব পরীক্ষা-কার্য আরো সহজেই করা সম্ভব।

আলোর সাহায্যে ডিমটি পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে—ডিমটি উর্বর বা অনুর্বর, ডিমে ভ্রূণ রয়েছে অথবা নেই, ডিমের বায়ুকোষ কতটা গভীর, অভ্যন্তর ভাগের কুসুম স্বচ্ছ অথবা অস্বচ্ছ।

## ডিম বাছাই ও পরিষ্কার করণ

ডিমগুলো কিছুক্ষণ জলে ডুবিয়ে রাখার পর—উত্তমরূপে ব্রাশের সাহায্যে ধুয়ে এবং মুছে নিতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পোলট্রির সুনাম রক্ষার সহায়ক।

## প্যাকিং ও আগ মার্ক ছাপ

ডিমের মান পরীক্ষা করার পরই রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে আগ মার্ক ছাপ দেওয়া হয়। আগ মার্কের মান অনুযায়ী ডিমের অভ্যন্তরভাগের সাদা অংশ পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ হবে। কুসুম হবে অস্বচ্ছ এবং বায়ুকোষ ৩/৮ ইঞ্চির বেশি হবে না। আলোয় পরীক্ষা করলেই এই সব জানা যাবে।

পরীক্ষার পর আগ মার্কের নির্ধারিত মান এবং ওজন অনুযায়ী গ্রেডেশান (gradation) বা শ্রেণী বিভাগ করা হয়ে থাকে।

| গ্রেডের নাম | হাঁসের ডিমের ওজন |
|---|---|
| বিশেষ শ্রেণী (Special) | ২৩/৪ আউন্স |
| এ শ্রেণী (A grade) | ২১/২ ” |
| বি শ্রেণী (B grade) | ২ ” |
| সি শ্রেণী (C grade) | ১৩/৪ ” |

বড় বড় পোলট্রি ফার্মে গ্রেডিং মেশিন রয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে সচরাচর ঝুড়িতেই খড়-বিচালির সাহায্যে ডিম প্যাক করা হয়ে থাকে।

বড় বড় বা উন্নত ধরনের পোলট্রি ফার্মে Egg-crate-এর মাধ্যমে ডিম প্যাক করা হয়ে থাকে। Egg-crate-এর মাধ্যমে ডিম প্যাক করা হলে—ডিম ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। Egg-crate-এ গর্ত করা থাকে—প্রতিটি গর্তে একটি করে ডিম বসাতে হয়। ডিমের সরু প্রান্তটি নিচের দিকে রেখে বসাতে হয়।

## ডিম সংরক্ষণ ব্যবস্থা

ঠাণ্ডা জায়গায় অথবা Mechanical Cooler-এ ডিম সংরক্ষণ করাই উত্তম ব্যবস্থা। তাপমাত্রা হবে ১০° থেকে ১৫° সেন্টিগ্রেড আর বাতাস হবে আর্দ্র—এমন স্থানেই ডিম সংরক্ষণ করা সঙ্গত।

## গ্রামাঞ্চলে ডিম সংরক্ষণ ব্যবস্থা

একটি মাটির হাঁড়িতে ধানের তুষ রেখে—ডিমগুলো সেই তুষে স্থাপন করা হয়। তারপর হাঁড়ির অর্ধেক ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা স্থানের মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। কিন্তু এভাবেও ডিমগুলো খুব বেশিদিন ভালো রাখা যায় না। গ্রীষ্মকালে এভাবে ডিম সংরক্ষণ করে রাখা নিরাপদ নয়।
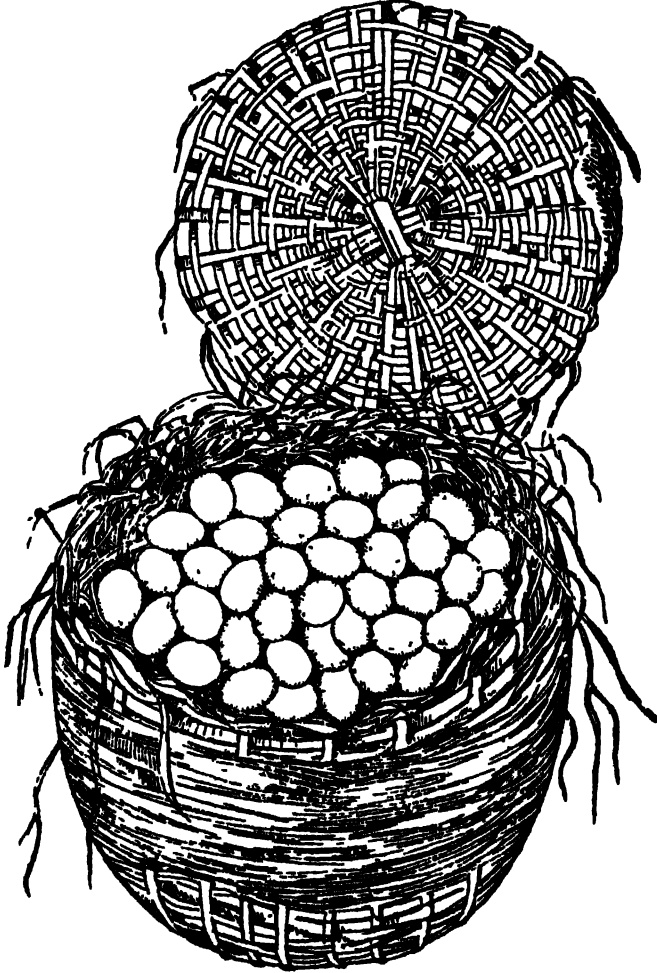
ঝুড়িতে ডিম প্যাক করা হচ্ছে

## ঠাণ্ডায় ডিম সংরক্ষণ

Mechanical Cooler অথবা Cold Storage-এ ডিম সংরক্ষণ করা সম্ভব। আর্দ্রতা ৮০ ভাগ। তাপমাত্রা ১০° থেকে ১৫° সেন্টিগ্রেড। Cold Storage অথবা

Mechanical Cooler-এর মাধ্যমে ডিম দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব। তবে হাঁসেরা ডিম পাড়ার পরে যত শীঘ্র সম্ভব Mechanical Cooler অথবা Cold Storage-এ ডিম সংরক্ষণ করতে হবে।

## উর্বর ডিমের ভ্রূণ নষ্ট করা

অনুর্বর ডিমের অভ্যন্তরে ভ্রূণ থাকে না, তাই অনুর্বর ডিম দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হয়।

তাপযুক্ত ঘরে উর্বর ডিম কিছুদিন রাখলেই নষ্ট হয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

তাই ১৪০° ফারেনহাইট উত্তাপযুক্ত উষ্ণ জলে উর্বর ডিম আধঘণ্টা কাল ডুবিয়ে রাখলে ভ্রূণ নষ্ট হয় অথচ অ্যালবিউমেন জমে না।

তৎপরে চুনমিশ্রিত জলে ঐ ডিম ডুবিয়ে রাখলে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় অথচ ডিম নষ্ট হয় না।

## তেল মাখিয়ে রাখা

সরষের তেল বা বাদাম তেলে ডিমগুলো আধঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে তুষভর্তি হাঁড়িতে ঘরের ঠাণ্ডা জায়গায় রাখলে বেশ কিছুদিন ডিমগুলো ভালো থাকবে।

## চুন-জলে বা সিলিকেট মিশ্রিত জলে ডিম ডুবিয়ে রেখে সংরক্ষণ করা

**চুন জল ঃ** উষ্ণ জলের সঙ্গে কিছু ঠাণ্ডা জল ও লবণ মিশিয়ে তারপর চুন জল (Quick lime) মেশাতে হবে তারপর এক ঘণ্টা পরে ঐ চুন জলের তলানি বাদ দিয়ে চুন মিশ্রিত জল অন্য একটি মাটির গামলায় রেখে ডিমগুলো ডুবিয়ে রাখতে হবে (আড়াই কেজি জলে প্রায় দু'কেজি চুন মিশিয়ে তলানি বাদ দিতে হবে।)

**সিলিকেট-জল ঃ** ৯ ভাগ উষ্ণ জলের সঙ্গে ১ ভাগ সোডি-সিলিকেট (Sodi-Silicate) মেশাতে হবে তারপর ডিমগুলো ঐ জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। ডিমগুলো যেন পুরোপুরি জলে ডুবে থাকে। এভাবে হাঁসের ডিম দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব।

## হাঁসের ডিমের মান বজায় রাখার উপায়

ডিম সংগ্রহ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিক্রির ব্যবস্থা করা সবচেয়ে উত্তম। টাট্‌কা ডিম সকলেরই পছন্দ। বিশেষ করে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ডিম বিক্রয়ের ব্যবস্থা যদি সত্বর না করা যায়, এবং ডিম সংরক্ষণের ব্যবস্থা যদি যথোপযুক্ত না হয় তবে ডিম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এবং পোলট্রির বদনাম হতে পারে। ডিমের মান বজায় রাখার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য ঃ

১। ডিম পাড়ার পর—হাঁসের ঘর থেকে ডিমগুলো যত শীঘ্র সম্ভব সংগ্রহ করতে হবে।

২। তারপর ডিমগুলোকে ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র স্থানে স্থানান্তর করতে হবে।

৩। ডিম প্যাক করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। Egg-crate (এগ্-ক্রেট)-এর মাধ্যমে প্যাক করার সময় ডিমের সরু প্রান্তটি নিচের দিকে রাখতে হবে।

৫। আর যদি ডিম সংরক্ষণ করতে হয় তবে Mechanical Cooler বা অন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ডিম সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাপমাত্রা ১০° থেকে ১৫° সেন্টিগ্রেড হওয়া আবশ্যক এবং সংরক্ষিত স্থানের বায়ু আর্দ্র হওয়া প্রয়োজন।

৬। অস্বাভাবিক, ছোট তথা নোংরা লাগা ডিমগুলো পৃথক জায়গায় রাখতে হবে। নোংরা ডিমগুলো পরিষ্কার করার পর বিক্রির জন্য প্যাক করতে হবে অথবা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। অনুর্বর ডিম বেশি সংখ্যক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনবোধে পুরুষ জাতীয় হাঁসদের পৃথক স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। ডিম পাড়া হাঁসদের যথোপযুক্ত খাদ্য খাওয়াতে হবে।

৯। ডিম পাড়া হাঁসের ঘরের মেঝের খড়-বিচালি মাঝে মাঝে পাল্টে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

## মুরগীর ডিম ও দুধের সঙ্গে হাঁসের ডিমের তুলনা

**প্রোটিন**—দুধে সবচেয়ে বেশি। তাবপরেই হাঁসেব ডিমের স্থান। হাঁসের ডিমের পরে মুবগির ডিম।

**চর্বি (Fat)**—তিনেই সমান।

**ক্যালসিয়াম**—দুধে বেশী। তাবপরে হাঁসেব ডিমে। তারপরে মুরগির ডিমে।

**ফসফরাস**—দুধে কিছু বেশি। তারপরে মুরগির ডিমে। তারপরে হাঁসের ডিমে।

**আয়রন**—দুধে অনেক বেশি। তারপরে হাঁসের ডিমে। তারপরে মুরগির ডিমে।

**ভিটামিন এ**—হাঁস এবং মুরগির ডিমে সমান, দুধে কম।

**ভিটামিন বি**—দুধে অনেক বেশি। তারপরেই হাঁসের ও মুরগির ডিমের অবস্থান।

**ভিটামিন সি**—দুধে অনেক বেশি। তারপরে মুরগির ডিমে। তারপরে হাঁসের ডিমে।

**ভিটামিন ডি**—মুরগি ও হাঁসের ডিমে সমান, দুধে কম।

## আদর্শ খাদ্য হিসাবে হাঁসের ডিমের স্থান

দুধের পরেই আদর্শ খাদ্য হিসাবে হাঁস ও মুরগির ডিমের স্থান। বিশেষ করে শীতকালে ডিমের পোচ বা হাফ-বয়েল শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য বিশেষ দরকারী।

## মাংসের জন্য হাঁস পালন

আমাদের দেশে ডিমের প্রয়োজনেই অধিকাংশ ব্যক্তি হাঁস পালন করে থাকেন। দেশী হাঁসের মাংস খেতে সুস্বাদু হলেও বেশি মাংসের জন্য হাঁস পালন করতে হলে নিম্নলিখিত মাংসল শ্রেণীর হাঁস পালনই অধিক লাভজনক।

১। আইলস্‌বেরী (Ailesberry) জাতের হাঁস;

২। পিকীন (Pekin) জাতের হাঁস;

৩। মাসকোভী (Muscovy) জাতের হাঁস;

৪। রুয়েন (Rouen) জাতের হাঁস।

তবে আইলস্‌বেরী এবং পিকীন জাতের হাঁসের মাংসই অধিক সুস্বাদু বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

## হাঁসকে চিহ্নিতকরণ

নানা কারণে হাঁসদের চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এক পুকুরে বা দীঘিতে বহুসংখ্যক হাঁস বিচরণ করে থাকে—সেরূপ ক্ষেত্রে হাঁসের মালিকরা হাঁসকে চিহ্নিত করে থাকেন।

আবার পোলট্রিতে স্ত্রী হাঁসদের ডিম পাড়ার রেকর্ড রাখার জন্যও ডিম পাড়া স্ত্রী হাঁসদেরও অনেক সময় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত কারণে হাঁসদের পায়ে নম্বরযুক্ত আংটি পরানো হয়।

তাছাড়া পায়ের আঙুল বা পর্দার ওপরও চিহ্ন দেওয়া যায়।

হাঁসের পা চিহ্নিতকরণ

১, ২, ৩ । পায়ের ধার চিহ্নিতকরণ;

৪। পায়ের নখের ওপর চিহ্ন দেওয়া;

৫। দুটো নখের মাঝে চিহ্ন দেওয়া।

## ব্যবসা হিসাবে হাঁস পালনের বিভিন্ন দিক

১। যাদের বাড়ি গ্রামাঞ্চলে এবং নিকটে জলাশয় রয়েছে তাদের পক্ষে হাঁস পালন করে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব।

২। মুরগি অপেক্ষা হাঁস-পোষার ঝামেলা তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

৩। হাঁসেরা জলাশয়ে বিচরণ করে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যের অধিকাংশই তারা নিজেরা সংগ্রহ করে খেয়ে থাকে। অতএব খাদ্য পিছু ব্যয় কম।

৪। হাঁসেরা সচরাচর কোন রোগ-ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় না অতএব পরিচালনা সংক্রান্ত বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন হয় না।

৫। হাঁসের ডিমের চাহিদা বেশি, হাঁসের ডিমের দামও বেশি।

৬। হাঁস এবং হাঁসের বাচ্চারা মুরগি অপেক্ষা অনেক বেশি কষ্টসহিষ্ণু। হাঁসের আবাসস্থল নির্মাণের ব্যয় মুরগির তুলনায় অনেক কম।

৭। প্রয়োজন বোধে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেও ব্যাপকভাবে হাঁস পালন করে লাভবান হওয়া সম্ভব।

৮। হাঁসের বিষ্ঠাও জমির সার হিসাবে উৎকৃষ্ট সার।

## হাঁসকে ঘরে তোলার সময় এবং ঘর থেকে বাইরে বের করে দেবার সময়

স্ত্রী হাঁসেরা রাতে ও সকালে ডিম পেড়ে থাকে।

সূর্যাস্তের এক অথবা দেড় ঘণ্টা আগে হাঁসের ঘরের কাছে নিয়মিতো খাবার রাখলে, খাবারের লোভে তারা জলাশয় থেকে নিজেরাই ঘরে ফিরে আসবে। খাদ্য খাওয়ানোর পর তাদের ঘরে তুলতে হবে।

যেহেতু স্ত্রী হাঁসেরা রাতে ও সকালে ডিম পাড়ে অতএব সকাল ৯টা পর্যন্ত হাঁসদের ঘরে আটকে রাখা বাঞ্ছনীয়। সকাল ৯টার পর তাদের খাবার খাইয়ে জলাশয়ে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। সকাল ৯টা পর্যন্ত যদি ঘরে আটকে রাখা সম্ভব না হয় তবে তারের বেড়া দিয়ে একটি সীমিতো জায়গায় সকাল ৯টা পর্যন্ত আটকে রাখা উচিত নতুবা এখানে সেখানে ডিম পাড়লে ডিম সংগ্রহ করা মুশকিল হবে অথবা অন্য কোন লোক সেই ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে।

## হাঁসের রোগ-ব্যাধি

যে সমস্ত দেশী পাতিহাঁস গ্রাম এবং শহরে আজও পালন করা হয় তাদের সাধারণভাবে কোন রোগ-ব্যাধিতে বিশেষ আক্রান্ত হতে দেখা যায় না। গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থ বাড়িতে পরিবারের ডিমের চাহিদা মেটাবার জন্য ঐ শ্রেণীর হাঁস পালন করা হয়। একটি স্ত্রী হাঁস যৌবন বয়সে সারা বছরে ৭০ থেকে ৭৫টি ডিম পাড়ে। সারাদিন পুকুর ডোবায় চরে। আবার সন্ধ্যের মুখে নিজের ঘরে ফিরে আসে।

পালনকারী সকালে এবং সন্ধ্যে বেলায় ফেলে দেওয়া শাক-পাতা, পাতের ভাত এবং খুদ-কুঁড়ো যা থাকে তাই ওদের খেতে দেয়। ঐ সামান্য খাদ্য ওদের পক্ষে যথেষ্ট বলে ধরা হয়। তার কারণ, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি চরে শামুক, গেঁড়ি, গুগলি, জলজ পোকা এবং উদ্ভিদ ইত্যাদি খেয়ে খাদ্যের যা চাহিদা তার শতকরা ৯০ ভাগ নিজেরাই সংগ্রহ করে। সেই কারণে একটি স্ত্রী হাঁস সারা সপ্তাহে একটি অথবা দুটি ডিম পাড়ে সেটাই গৃহস্থের লাভ। কাজেই একটি পরিবারে ১৫টি দেশী পাতিহাঁস থাকলে সারা সপ্তাহে যে ১৫ থেকে ২০টি ডিম পাওয়া গেল সেটাই গৃহস্থ প্রায় বিনা পয়সায় পায়। কারণ রোগ-ব্যাধির জন্য কোন ওষুধ কিনতে হচ্ছে না। রোগ প্রতিরোধের জন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে টাকা দেবার প্রয়োজন নেই। ওদের খাওয়াতে একটি পয়সাও লাগে না। সুতরাং অন্য কোন জাতের বা শ্রেণীর হাঁস পালন করে সাধারণ গৃহস্থ পরিবার কোন রকম ঝুঁকি নিতে চায় না। কারণ হাঁসপালন তার কাছে ব্যবসা নয়। সখ করে বাড়িতে রাখা এবং টাটকা ডিম ওদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে নেওয়া।

কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হাঁস পালন করলে দেশী পাতিহাঁস পালন মোটেই লাভজনক নয়। ডিম তো বটেই এমনকি মাংসের জন্য পালন করা হলে সেটাও খামারীর কাছে লোকসানের ব্যাপার। সেই কারণে প্রকৃত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে খামার করে বেশি সংখ্যাতে হাঁস পালন করতে হলে উন্নত জাতের ভারতীয় হাঁস সহ বিদেশী হাঁস কেবল মাংসের জন্য সংকর জাতের হাঁসও সব থেকে বেশি সংখ্যায় ডিমের উৎপাদনের জন্য পালন করতে হবে। দেশ স্বাধীন হবার পর ব্রয়লার মুরগি পালন শুরু হয়। এটা কেবল মাংসের জন্য। আবার বেশি ডিমের জন্য এর সঙ্গে শুরু হয় বিদেশী সহ সংকর জাতের মুরগি পালন। কিন্তু প্রথম দিকে মুরগি পালন বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। তবে, সত্তর দশকের পর থেকে এই ব্যবসায় খামারীদের মনে যথেষ্ট আগ্রহ বেড়ে যায়। বর্তমানে এই ব্যবসায় বহু যুবক লিপ্ত রয়েছে। তবে আশি দশকের শেষ থেকে বহু বেকার যুবক হাঁস পালন ব্যবসায় এগিয়ে এসেছে। আগে মানুষের মনে একটা মিথ্যে ধারণা ছিল, কাছাকাছি কোন জলাশয় না থাকলে হাঁস পালন করা যায় না। এটা কেবলমাত্র দেশী পাতিহাঁসের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য বলা যেতে পারে। কিন্তু স্বদেশের রানার, খাঁকি ক্যাম্পবেল, সংকর জাতের দেশী উন্নত জাত সহ বিদেশী হাঁসের জন্য কোন জলাশয়ের প্রয়োজন হয় না। খামারের সামনে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুরে বেড়াবার জন্য একটু জায়গা ঘিরে দিলেই ওরা ভালো থাকে। তবে ঘেরা জায়গায় একটা মাঝারি ধরনের পাকা চৌবাচ্চা রাখতে হবে। চৌবাচ্চার মাপটা হবে আট ফুট চওড়া এবং দশ ফুট লম্বা। আর সাত দিন অন্তর চৌবাচ্চার জল ফেলে নতুন পরিষ্কার জল ভরে দেওয়া দরকার। তাহলেই ওদের পালন করতে বিশেষ কোন অসুবিধে হবে না।

ভারতের উন্নত জাত সহ বিদেশী হাঁস পালন করলে এই সব সুবিধে যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি অসুবিধের দিক হলো, ওরা বেশ কয়েকটি রোগে আক্রান্ত

হয়। তবে ডিম পাড়া এবং ব্রয়লার মুরগির মতো শতাধিক রোগে আক্রান্ত মোটেই হয় না। কয়েকটা সীমিতো সংখ্যক রোগে ওদের মাঝে মাঝে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সেই কারণে কয়েকটা বিশেষ ধরনের রোগে আগাম প্রতিরোধ হিসাবে টিকা দিলে খামারী রোগ আক্রমণ সম্পর্কে অবশ্যই চিন্তার হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আর যে কয়েকটা রোগে হাঁস আক্রান্ত হয়ে থাকে সে ব্যাপারে সময়মতো চিকিৎসা করলে ওরা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে। শরীরও এমন কিছু দুর্বল হয় না। ফলে ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন কোন বড় ধরনের ক্ষতি খামারীকে সহ্য করতে হয় না তেমনি যাদের মাংসের জন্য পালন করা হচ্ছে তারাও সঠিক সময়ে পরিমাণ মতো মাংস দিতে পারে।

এবার দেশী উন্নত জাতের হাঁস সহ বিদেশী যাদের ডিম এবং মাংসের জন্য পালন করা হয় তাদের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। কেবল রোগ নয়, আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে টিকা, রোগের লক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের কথাও উল্লেখ থাকবে।

## ডাক প্লেগ (Duck Plague)

### হাঁসের প্লেগ রোগ

**রোগের কারণ ঃ** আমরা সাধারণভাবে যে মারাত্মক রোগ প্লেগের সঙ্গে পরিচিত হাঁসের ক্ষেত্রে রোগের নাম একই থাকলেও সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। অবশ্য মানুষের মতো এক শ্রেণীর ভাইরাস হাঁসের দেহ আক্রমণ করে। একটি ক্ষেত্রে উভয়ের ব্যাপারে খুবই মিল রয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে এটি যেমন সংক্রামক ব্যাধি হিসাবে পরিচিত ঠিক তেমনি হাঁসের মধ্যেও রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যদি কোন ভাবে বুঝতে পারা যায় খামারের কোন হাঁস প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছে তাহলে আক্রান্ত হাঁসকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দলের অন্যান্য হাঁসের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। এব্যাপারে সামান্য সময়ের জন্য অবহেলা করলে খামারের সব হাঁস রোগে আক্রান্ত হবে এবং বিলম্বে চিকিৎসার জন্য কোন হাঁসকেই বাঁচানো যাবে না। এ ব্যাপারে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, অন্য কোন গৃহপালিত পশু বা পাখি এই রোগে আক্রান্ত হয় না। আর বাচ্চা হাঁসদের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা খুবই কম থাকে।

**রোগের লক্ষণ ঃ** যদিও রোগটির নাম প্লেগ কিন্তু কলেরার সঙ্গে বেশ কয়েকটা লক্ষণ মিলে যায়। ফলে প্রথম মুখে খামারী লক্ষণ মিলিয়ে প্রকৃত রোগটি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়।

আক্রান্ত হাঁস ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। মোটেই হাঁটাচলা করতে চায় না। এমনকি কোন অচেনা ব্যক্তি তাড়া দিলেও সেই জায়গায় বসে থাকে। রোগের একেবারে প্রথম মুখে যখন খামারের অন্যান্য হাঁস জলাশয়ে অথবা ফাঁকা জায়গায় (উন্নত

দেশী অথবা বিদেশী সংকর হাঁস) চরতে যায় তখন আক্রান্ত হাঁস দলের সঙ্গে গেলেও চুপটি করে বসে ঝিমোতে থাকে। পালনকারীকে তখনই বুঝতে হবে হাঁসটি অসুস্থ। তখন প্রথম কাজ হবে হাঁসটিকে খামার ঘরের বাইরে আলাদা জায়গায় রেখে দেওয়া।

হাঁস আলাদা ঘরে থাকার ফলে বারবার পাতলা ফিকে হলদে এবং হালকা সবুজ মল ত্যাগ করবে। কলেরা রোগের সঙ্গে এব্যাপারে একটি মাত্র পার্থক্য হলো, মলে সামান্য পরিমাণে রক্ত থাকে। অপরদিকে কলেরা রোগের ক্ষেত্রে মলের সঙ্গে রক্ত মোটেই থাকে না। তবে জলের পাত্র মুখের কাছে না থাকলে কিছুটা দূরে গিয়েও জলপান করবে না। মুখের সামনে খাদ্য পাত্র রাখলেও সামান্য পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ না করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যদি চিকিৎসা শুরু করা না হয় তবে দু' দিনের মধ্যে হাঁসটি মারা যাবে। একেবারে শেষ অবস্থায় পা দুটো মুড়ে বুকে ভর দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়বে। তখন উভয় দিকের পাখনা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে আর পালকগুলো কিছুটা খাড়া হয়ে যায়।

হাঁস প্লেগে আক্রান্ত হলে তার বিশেষ লক্ষণ হলো, দুটি নাকের ফুটো এবং উভয় চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকবে। চোখের কোণায় পুঁজের মতো পিচুটি জমবে এবং পরিমাণে বেশি হলে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়বে। কিছু ক্ষেত্রে চোখের রঙ গোলাপী হতে পারে। হাঁস একমাত্র প্লেগ রোগে আক্রান্ত না হলে নাক ও চোখ থেকে জল পড়া এবং চোখের কোণায় পিচুটি জমে না। তখন হাঁসের শেষ অবস্থা এবং সু-চিকিৎসা করলেও বাঁচে না। সেই সময় হাঁস চোখ বুঁজে থাকে। দু' দিনের পরিবর্তে আরও একদিন অর্থাৎ তিন দিনের মধ্যে মরে যায়।

**রোগ প্রতিরোধ ঃ** ঠিক মতো রোগ নির্ণয় করে সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা বহু খামারীর পক্ষে সম্ভব হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ওষুধ দিতে প্রায় দেড় দিন দেরি হয়। তখন রোগের প্রবল অবস্থা। কাজেই শতকরা আশি ভাগ হাঁসের মৃত্যু ঘটে। সুতরাং আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা রোগ দমনের সব থেকে কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে ধরা হয়। কারণ এই রোগের কোন ওষুধ বিভিন্ন শ্রেণীর চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে আজও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। আর প্লেগ রোগটি মারাত্মক ছোঁয়াচে ধরনের। কারণ দেখা গেছে, পাঁচ থেকে সাত মাইল দূরে কোন হাঁসের খামারে প্লেগ রোগ দেখা দিলে এই সীমানার মধ্যে যতগুলো খামার থাকবে সেখানে পালিত হাঁসেরা যে কোন সময়ে আক্রান্ত হতে পারে। আবার খামারে একটি অথবা দুটি হাঁস আক্রান্ত হলে তাদের অন্য ঘরে সরিয়ে না দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অন্য হাঁসেরা রোগে আক্রান্ত হয়। সুতরাং প্রতিটি হাঁসকে সময় মতো টিকা দেওয়া রোগ প্রতিরোধের সব থেকে নিরাপদ ব্যবস্থা।

**টিকার নাম ঃ ডাক প্লেগ ভ্যাকসিন (Duck Plague Vaccine)**

**টিকা দেবার মাত্রা ঃ** ওষুধের দোকানে কাচের শিশিতে ২০০ মাত্রার টিকা থাকে। হাঁসের দেহে প্রয়োগ করবার আগে টিকার মধ্যে ১০০ মিলিলিটার বিশুদ্ধ জল মিশিয়ে নিতে হয়। একটি হাঁসকে চামড়ার নিচে **আধ মিলিলিটার** ইনজেকশানের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হয়।

টিকাতে জল মিশিয়ে গুলে নেবার পর সেইদিন খামারে যতগুলো হাঁসকে পর পর মাত্রা অনুসারে টিকা দেওয়া যাবে তাতে কোন বাধা নেই। পরের দিন বাকি হাঁসেদের টিকা দিতে হলে জলে গুলে রাখা টিকা দেওয়া চলবে না। সেই টিকা ফেলে দিয়ে নতুন টিকা আবার জলে গুলে প্রয়োগ করতে হবে। কারণ জলে গুলে রাখা টিকা পরের দিন প্রয়োগ করলে কোন কাজ হয় না।

**টিকা প্রয়োগের নিয়ম ঃ** হাঁসের বাচ্চার বয়স জন্মের পর থেকে ১৫ দিন হলেই প্রথম বার টিকা দেওয়া দরকার। দ্বিতীয় দফায় টিকা দিতে হবে জন্মের পর থেকে বয়স দশ সপ্তাহ অর্থাৎ আড়াই মাস বয়স হলে। তৃতীয় বার দিতে হয় জন্মের পর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে।

তিন বার এই ভাবে টিকা দেওয়াকে প্রাথমিক পর্যায়ের টিকা বলা হয়। এরপর বছরে দু' বার করে অর্থাৎ ছ' মাস অন্তর নিয়ম করে টিকা দিয়ে যেতে হবে। সাধারণভাবে খামারে ডিমের জন্য যে সব হাঁস পালন করা হয় তাদের রাখা হয় দুই থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত। কাজেই রোগ প্রতিরোধের জন্য ঐ সময় অবধি টিকা দেওয়া উচিত।

**অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ঃ**

হাঁস প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলে প্রকৃতপক্ষে কোন ওষুধ নেই। কাজেই চিকিৎসা করে কোন বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না। তবে হাঁস প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবার পর যদি পালনকারী চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারে তবে ওষুধ প্রয়োগ করে কিছু ক্ষেত্রে হাঁসের জীবন রক্ষা পায়।

**ওষুধ ঃ** সালফোনামাইড জাতীয় ওষুধ—COSUMIX PLUS (কসুমিক্স প্লাস) —এটা তৈরি করে CIBA (সিবা) কোম্পানি।

**খাওয়ানোর নিয়ম ঃ** প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম ওষুধ গুলে পরপর পাঁচ দিন খাওয়াতে হবে। রোগ যদি মারাত্মক আকার ধারণ করে তবে জলের পরিমাণ একই রেখে ওষুধ এক গ্রামের পরিবর্তে দু' গ্রাম মেশানো দরকার।

হাঁস যদি নিজের থেকে জলপান না করে তবে এক ঘণ্টা অন্তর ছোট চায়ের চামচের তিন চামচ করে সারাদিন খাওয়াতে হবে। সে ক্ষেত্রে একজন লোক হাঁসের দুটো ঠোঁট ফাঁক করে ধরবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ওষুধ হাঁসের গলায় ঢেলে দেবে। ওষুধে কাজ হলে পরের দিন হাঁস নিজের থেকেই ওষুধ মেশানো জল পান করবে। প্রথম দিনের ওষুধ মেশানো জল দ্বিতীয় দিন সকালে ফেলে দিয়ে জলের পাত্রে

নতুন করে ওষুধ দেওয়া উচিত। পথ্য হিসাবে দ্বিতীয় দিন থেকে সামান্য ভাত, গমের ভুসি এবং চালের কুঁড়ো সামান্য জল মেখে হাঁসকে খেতে দিতে পারা যাবে।

**হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা :** অ্যালোপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পশু পাখিদের চিকিৎসার জন্য যেমন কোন ওষুধ নেই, একই অবস্থা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেও। শরীরের কিছু কষ্টকর উপসর্গের যাতে উপশম হয় তার জন্য কয়েকটি কার্যকর ওষুধ হাঁসের ওপর প্রয়োগ করা হয়। ঠিকমতো লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ দেওয়া হলে হাঁস প্রাণে বেঁচে যায়।

**ওষুধ :** মোট তিনটি ওষুধ খুবই কার্যকর। (ক) **অ্যাকোনাইট র‍্যাডিক্স** ১x, (খ) **আর্সেনিক** ৩০-২০০ এবং (গ) **ভেরেট্রাম** ৩x ব্যবহার করা যায় এবং রোগের লক্ষণ অনুসারে প্রয়োগ করা দরকার।

প্রথমে ভেরেট্রাম ৩x প্রয়োগ করে যদি দেখা যায় বিশেষ ফল পাওয়া গেল না তখন আর্সেনিক অবস্থা বুঝে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যাবে।

**আর্সেনিক** দিতে হয় যখন দেখা যায় হাঁস খুবই জলের মতো মল ত্যাগ করছে, শরীর এতটাই দুর্বল যে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। এছাড়াও পা গুটিয়ে বুকে ভর দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে চুপচাপ অর্ধমৃত অবস্থায় থাকবে।

**খাওয়ানোর নিয়ম :** আর্সেনিক ২০০ শক্তি মাত্রা প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর দিতে হবে।

তৃতীয় ওষুধ **অ্যাকোনাইট র‍্যাডিক্স** হাঁসের পাতলা মলের রঙ ফিকে সবুজ এবং (রক্ত থাকতে পারে), শরীর খুবই দুর্বল, পা দুটো মুড়ে চোখ বুঁজে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে থাকবে।

**খাওয়ানোর নিয়ম :** এক ঘণ্টা অন্তর অ্যাকোনাইট র‍্যাডিক্স ৩x প্রয়োগ করা দরকার।

ওষুধে কাজ হতে শুরু করলে তখন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে দিতে হবে। সাধারণভাবে তিন থেকে চার ঘণ্টা অন্তর সারা দিনে ওষুধ দেওয়া দরকার। ওষুধ পানীয় জলের সঙ্গে মিশিয়ে (দু'-চামচ) খাওয়াতে হয়।

## ডাক কলেরা
## (Duck Cholera)

এক শ্রেণীর জীবাণুর আক্রমণে মানুষ যেমন কলেরা রোগে আক্রান্ত হয় হাঁসও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বারবার তরল মল ত্যাগ, বমি হওয়া এবং শরীর এতটাই দুর্বল হয় যে একটু দূরে গিয়ে জলপানও করতে পারে না। বারবার তরল মল ত্যাগ এবং বমি করার ফলে পিপাসা থাকে প্রবল।

**রোগের কারণ :** হাঁসের ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া এই রোগটির মূল কারণ। পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা PASTURELLA AVISIDA (প্যাস্টুরেলা অ্যাভিসিডা) নামে হাঁসের কলেরা সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে চিহ্নিত করেছেন।

রোগটি খুবই সংক্রামক। খামারে কোন হাঁস কলেরা রোগে আক্রান্ত হলে অন্যান্য সুস্থ হাঁসেদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ণবয়স্ক হাঁসের থেকে বাচ্চা হাঁসেদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ণবয়স্ক হাঁসের থেকে বাচ্চা হাঁসেরা, বিশেষ করে এক মাস বয়স হলে কলেরা রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা বেশি থাকে। কাজেই যে খামারে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা হাঁস প্রতিপালন করা হচ্ছে সেই খামারীর রোগটির বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

**রোগের লক্ষণ ঃ** আগের রোগটি অর্থাৎ প্লেগের সঙ্গে কলেরার উপসর্গে খুবই মিল রয়েছে। ফিকে সবুজ অথবা হলুদ রঙের বারবার পাতলা মল ত্যাগ করতে থাকে। প্রবল জল পিপাসা থাকলেও জলের পাত্র কাছে না থাকলে উঠে গিয়ে পাত্র থেকে জলপান করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। কোন রকম চিকিৎসা করা না হলে দু' থেকে তিন দিনের মধ্যে হাঁস মরে যায়। রোগের একেবারে শেষ পর্যায়ে হাঁসের উভয় পায়ের সন্ধি বা গাঁট বেশ ফুলে ওঠে। তখন ওষুধ দিলেও কোন ফল হয় না। এব্যাপারে আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, প্লেগ এবং কলেরা রোগের যাবতীয় উপসর্গ এবং লক্ষণ প্রায় একই রকম। তবে প্লেগ রোগে হাঁস আক্রান্ত হলে পাতলা মলের সঙ্গে সামান্য রক্ত মেশানো থাকে। সেটা রোগের প্রথম অথবা মধ্য অবস্থাতেও হতে পারে। আর কলেরার ক্ষেত্রে মলের সঙ্গে রক্ত মোটেই থাকে না।

**রোগ প্রতিরোধ ঃ** কলেরা রোগের প্রতিরোধ বাচ্চা হাঁসের জন্মের পর দু' মাস বয়স হলেই অবশ্যই করা দরকার। কারণ এই বয়সে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিলে বড় হলে কলেরা রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা মোটেই থাকবে না। দেশী পাতিহাঁসের ক্ষেত্রে কলেরা রোগের আক্রমণ খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু উন্নত জাতের দেশী খাঁকি ক্যাম্পবেল, ভারতীয় রানার এবং বিদেশী সংকর হাঁস পালন করলে তারাই কয়েকটি রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। খামারে এই সব শ্রেণীর হাঁসই পালন করা হয়। কারণ স্ত্রী হাঁস সারা বছরে খুবই উচ্চ হারে ডিম পাড়ে এবং মাংসের জন্য পালন করলে খামারীর লোকসান হওয়ার কোন আশঙ্কাই থাকে না। ঐ সব হাঁসের দেহে মেদ বৃদ্ধি ঘটে দ্রুত। কাজেই ওদের রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

**টিকার নাম ঃ ডাক কলেরা ভ্যাকসিন (Duck Cholera Vaccine)**

***টিকা প্রয়োগের নিয়ম ঃ*** জন্মের পর থেকে হাঁসের বাচ্চার বয়স দু' মাস পূর্ণ হলে তখন টিকা দিতে হবে। বাচ্চার বয়স দু' মাস পূর্ণ না হওয়া অবধি টিকা দেওয়া পারা যায় না।

দ্বিতীয় দফায় দিতে হবে প্রথম বার টিকা দেবার পর এক থেকে দু' মাসের মধ্যে। এরপর প্রতি ছয় মাস অন্তর নিয়মিত হাঁসকে টিকা দিয়ে যেতে হবে। ওষুধে দোকান থেকে টিকা কিনে নিতে পারা যায়। তবে গ্রামাঞ্চলে খামারের কাছাকাছি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র থাকলে সেখানে বিনামুল্যে টিকা পাওয়া যায়। তবে টিকা নিজে প্রয়োগ না করে পশু চিকিৎসকের মাধ্যমে দেওয়া উচিত।

**অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ঃ** আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা কোন কারণে খামারীর পক্ষে করা সম্ভব না হলে তখন আক্রান্ত হাঁসের রোগের প্রতিকারের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। সময় মতো চিকিৎসা শুরু করলে রোগের প্রতিকার করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে সালফোনামাইড অথবা অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ সু-নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

**ওষুধ ঃ** সালফোনামাইড জাতীয় ওষুধ; যথা—ব্যাকট্রিসল পাউডার (Bactrisol Powder) অথবা কসুমিক্স প্লাস (Cosumix Plus) এদের মধ্যে যে·কোন একটি ওষুধ ১ লিটার খাবার জলেতে ১ গ্রাম পরিমাণ ওষুধ ভালোভাবে গুলে পর পর ৫ দিন খাওয়াতে হবে। রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় একই ওষুধ দ্বিগুণ মাত্রায় দেওয়া দরকার। তবে জলের পরিমাণ (এক লিটার) একই থাকবে। সারাদিনে কলেরা রোগে আক্রান্ত হাঁস ওষুধ মেশানো জল যতটা পারবে পান করবে। পরের দিন সকালে ওষুধ মেশানো জল ফেলে দিয়ে আবার পরিমাণ মতো জলে ওষুধ মিশিয়ে হাঁসকে পান করতে দিতে হবে।

অ্যান্টিবায়োটিক শ্রেণীর ওষুধ যথা ভেনডক্সভেট (Vendox–Vet) এবং টেট্রাসাইক্লিন-হাইড্রোক্লোরাইড পাউডার (Tetracycline Hydrochloride-Powder) এই দুটি ওষুধের মধ্যে প্রথমটি ১ লিটার জলে ১ গ্রাম পরিমাণে গুলে খাওয়াতে হবে। এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে আধ গ্রাম অর্থাৎ ৫০০ মিলিগ্রাম পরিমাণ ওষুধ ১ লিটার জলে গুলে হাঁসকে পান করতে দিতে হবে।

দ্বিতীয় ওষুধটি ১ লিটার পানীয় জলে গুলে হাঁসকে খাওয়াতে হয়। ওষুধের পরিমাণ হবে ৫ গ্রাম। হাঁসের রোগ সেরে যাবার পর আর এক দিন ওষুধ মেশানো জল পান করার জন্য দিতে হবে।

দুটি ওষুধের মধ্যে যে কোন একটি প্রয়োগ করা উচিত। ওষুধ মেশানো জল হাঁস যদি নিজের থেকে পান করে এবং সারা দিন ও রাতে পরিমাণটা যদি ১৫০ মিলিলিটার হয় তবে সেটা রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, হাঁসের শরীর ভীষণ দুর্বল হওয়ার জন্য পিপাসায় জল পান করার ক্ষমতা থাকে না। সেক্ষেত্রে প্রতি দু' ঘণ্টা অন্তর বড় চামচের চার চামচ ওষুধ মেশানো জল জোর করে হাঁসের গলায় ঢেলে দিতে হবে। সারা দিনে এইভাবে ছয় থেকে সাত বার ওষুধ মেশানো জল খাইয়ে দেবার প্রয়োজন হয়।

**হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ঃ** হাঁসের কলেরা রোগ নিরাময়ে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যদি লক্ষণ মিলিয়ে সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যায় তবে খুবই তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, পশু ও পাখিরা কথা বলতে পারে না। রোগের উপসর্গ এবং আচরণ দেখে ওষুধ ঠিক করতে হয়।

**ওষুধ ঃ** মলের রঙ সবুজ অথবা হলদে এবং ফেনা থাকলে **ইপিকাক** ভালো কাজ দেয়। ওষুধের ২০০ শক্তি এক মাত্রা করে আধ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে। যদি বমির ভাব থাকে, সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে।

হাঁস যদি স্থির হয়ে বসে থাকে অর্থাৎ পেটে কোন যন্ত্রণা থাকবে না, মলের রঙ হবে সবুজ এবং শ্লেষ্মা মেশানো থাকবে, এছাড়াও মলদ্বার ফাঁক হয়ে থাকলে দ্বিতীয় ওষুধ হিসাবে ফসফরাস প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। ওষুধের ২০০ শক্তি একমাত্রা করে ৩০ মিনিট অন্তর দেওয়া দরকার।

অনেক সময় হাঁস জলের মতো বমি করে। মলের রঙ হলদে অথবা সবুজ। মল বের হবার সময় যদি যথেষ্ট বেগ থাকে সেক্ষেত্রে গ্রাটিওয়া ২০০ শক্তি একমাত্রা করে ৩০ মিনিট অন্তর দেওয়া দরকার।

## হ্যাপাটাইটিস
## (Hepatitis)

এই রোগে হাঁস আক্রান্ত হতে পারে। বেশি বয়সের হাঁসকেও এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু তার সংখ্যা খুবই কম। যদি দু' সপ্তাহ বয়সের হাঁস হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হয় তবে এক থেকে দু' ঘণ্টার মধ্যে তার মৃত্যু ঘটে।

**রোগের কারণ ঃ** এক ধরনের ভাইরাস রোগটির প্রধান কারণ। ভাইরাস যে কোন ভাবেই হোক হাঁসের শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে যকৃতে আক্রমণ চালায়। ধীরে ধীরে যকৃৎ তার কার্যকর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সেই কারণে রোগটিকে যকৃৎ বৃদ্ধি রোগ বলা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে অনেকটা ন্যাবা অথবা কামলা রোগের মত। তবে হাঁসের হেপাটাইটিস আর মানুষের কামলা রোগ এক নয়। এই রোগে আক্রান্ত মৃত হাঁসের পেট চেরা হলে দেখা যাবে যকৃতের আকার স্বাভাবিক অবস্থার থেকে অনেকটা বড় হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে দেহের ভেতরে রক্ত ক্ষরণের চিহ্ন থাকে। তবে সেটা কোন লক্ষণ হিসাবে ধরা হয় না।

**রোগের লক্ষণ ঃ** রোগের প্রথম অবস্থায় বাচ্চা অথবা বয়স্ক হাঁস কোন রকম খাদ্য গ্রহণ করা একেবারেই বন্ধ করে দেয়। ভালোভাবে চলাফেরা করার ক্ষমতা থাকে না। যদি কষ্ট করে হাঁটে তবে দেহ যে কোনো একদিকে হেলে পড়ে। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় সব জাতের হাঁস হাঁটার সময় শরীরের উভয় দিক প্রায় সমান ভাবে হেলতে-দুলতে থাকে।

পূর্ণবয়স্ক হাঁস এইভাবে এক থেকে দু' দিন বেঁচে থাকলেও রোগের শেষ পর্যায়ে মাথা পিছন দিকে হেলে পড়ে। শেষে মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং পা দুটো থেকে থেকে ছুঁড়তে থাকে। অনেকটা খিঁচুনির মতো মনে হয়। এই রকম অবস্থায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা বেঁচে থাকে। বাচ্চা হাঁসের ক্ষেত্রে পালনকারী রোগ ধরার কোন রকম সময় পায় না। কারণ দু' ঘণ্টার মধ্যে হাঁস মরে যায়।

**রোগ প্রতিরোধ ঃ** রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আগে থাকতে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় বা পথ নেই। কারণ হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হাঁসকে সুস্থ করবার ওষুধ প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে আজও আবিষ্কার করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাং সঠিক সময়ে টিকা দেওয়াই হচ্ছে হাঁসকে হেপাটাইটিস রোগের হাত থেকে মুক্ত রাখার একমাত্র উপায়।

**টিকার নাম ঃ ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস ভ্যাকসিন (Duck Virus Hepatitis Vaccine)**

**টিকা প্রয়োগের নিয়ম ঃ** জন্মের পর দ্বিতীয় দিনে হাঁসের বাচ্চাকে টিকা দিতে হবে। টিকা নিজে দেওয়া উচিত নয়। পশু চিকিৎসকের মাধ্যমে কাজটি করানো দরকার।

যদি কোন কারণে এক দিনের বাচ্চা হাঁসকে টিকা দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে স্ত্রী হাঁসকে ডিম পাড়ার আগে টিকা দিলে তার ডিম থেকে যেসব বাচ্চা হাঁস পাওয়া যাবে তাদের শরীরের হেপাটাইটিস রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে। সেক্ষেত্রে স্ত্রী হাঁসের ডিম পাড়বার আগে যখন বয়স হবে ৩ মাস তখন একবার এবং ৪ মাস বয়স হলে দ্বিতীয় বার টিকা দেওয়া দরকার।

**অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ঃ** আগেই বলা হয়েছে এই রোগের চিকিৎসার জন্য কোন ওষুধ নেই বললেই চলে। তবে খামারে হাঁসেরা যদি হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হয় তখন মৃত্যুর হার কিছুটা যাতে কমে তার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। একটা ইনজেকশান দেওয়া হয় তার নাম হচ্ছে HYPER IMMUNE SERUM (হাইপার ইমিউন সেরাম)। প্রতিটি রোগে আক্রান্ত হাঁসকে ৩.৫ মিলি পরিমাণ সেরাম ইনজেকশান দিতে হবে। এই কাজটিও পশু চিকিৎসকের মাধ্যমে করানো দরকার।

**হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ঃ বাচ্চা হাঁসের জন্য**—হাঁসের বাচ্চাদের বিশেষ করে এক অথবা দু' দিন বয়সের হাঁস যদি হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হয় তবে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

**ওষুধ ঃ ক্যামোমিলা** ২০০ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে প্রতি দু' ঘণ্টা অন্তর।

**কার্ডুয়াস θ** এই ওষুধটিও খুবই কার্যকর। বিশেষ করে বাচ্চা হাঁসের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে একটা অথবা দুটো লক্ষণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু প্রকাশ পায় না। পরে রোগের লক্ষণ ভালোভাবে প্রকাশ পেলে তখন খুবই দেরী হয়ে যায় এবং ওষুধ প্রয়োগ করা হলেও বাচ্চা হাঁসকে বাঁচানো যায় না। এই রকম ক্ষেত্রে অর্থাৎ লক্ষণ ঠিকমতো পাওয়া না গেলে **কার্ডুয়াস θ** চায়ের চামচের তিন থেকে চার চামচ সামান্য পানীয় জলের সঙ্গে মিশিয়ে সারা দিনে চার বার প্রয়োগ করতে হবে।

**চায়না ২০০—১০০০ শক্তি ঃ** রোগের প্রবল অবস্থা। দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি, অস্থির ভাব এবং শুয়ে উভয় পা খিঁচুনির লক্ষণ। রোগের অবস্থা বুঝে **চায়না ২০০ থেকে ১০০০** শক্তি পর্যন্ত সারা দিনে চার বার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

## বয়স্ক হাঁসের জন্য

হাঁসের বয়স চার মাস হলে তাকে বয়স্ক হাঁস বলা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে হেপাটাইটিসের লক্ষণ ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়। প্রথম দিকে অর্থাৎ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় **চেলিডোনিয়াম θ** প্রয়োগ করে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

এর পরবর্তী পর্যায়ে সালফার অথবা লাইকোপোডিয়াম ২০০-১০০০ শক্তি সারা দিনে তিন বার করে দিলে রোগ সম্পূর্ণ ভাবে আরোগ্য লাভ করে। কতটা শক্তি (ওষুধের) ব্যবহার করা উচিত সেটা হাঁসের শরীরের অবস্থা এবং রোগের তীব্রতা বুঝে ঠিক করতে হবে।

এই রোগের আরও একটি কার্যকর ওষুধ হচ্ছে ব্রায়োনিয়া। যদি দেখা যায় যে হাঁসের যকৃৎ বড় হবার ফলে বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছে এবং যকৃতের জায়গায় ঘাড় বেঁকিয়ে চাপা দিতে চায় সেক্ষেত্রে সারাদিনে ব্রায়োনিয়া ২০০-১০০০ শক্তি তিন থেকে চার বার দিতে হবে।

## হাঁসের রক্ত আমাশয়
## (Duck Blood Dysentry)

বাচ্চা হাঁস সহ পূর্ণবয়স্ক হাঁসও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হওয়া খুবই চিন্তার কারণ। রোগে আক্রান্ত বাচ্চা হাঁসের মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি। সময় মতো চিকিৎসা করেও বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। যদিও আমরা রক্ত আমাশয় বলি কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগটি কক্সিডিওসিস (Coccidiosis) নামে পরিচিত।

**রোগের কারণ ঃ** এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র জীবাণু রোগটিব মূল কারণ। জীবাণুগুলো পরান্নভোজী প্রোটোজোয়া (Protozoa) ঘটিত। এদের জীবনচক্রের মোট দুটো অবস্থা। চক্রের প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়স্থল হচ্ছে পুরুষ অথবা স্ত্রী হাঁসের অন্ত্র। এরপর দ্বিতীয় পর্বে এরা আশ্রয় নেয় মাটিতে। খাদ্য অথবা পানীয় জলের মাধ্যমে এরা অন্ত্রে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। এদের আক্রমণে হাঁসের অন্ত্রে ঘায়ের সৃষ্টি হয়। তখন মলের সঙ্গে রক্ত বের হয়।

**রোগের লক্ষণ ঃ** খুবই দ্রুত বিস্তার লাভ করে রক্ত আমাশয় রোগটি। কাবণ খামারে কোন হাঁস এই রোগে আক্রান্ত হলে তার মল থেকে জীবাণু খাদ্য অথবা পানীয় জলের মাধ্যমে অন্য হাঁসের অন্ত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। কাজেই আক্রান্ত হাঁসকে অন্য ঘরে সরিয়ে দেওয়া দরকার। তবে জন্মের পব থেকে দু' সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চাদের এই রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা খুবই কম। আবার আট সপ্তাহ বয়স হলে হাঁসেদের রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হতে খুবই কম দেখা যায়।

বাচ্চা সহ বড় হাঁসেরা মোটেই খেতে চায় না। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি সকালে দলের অন্যান্য হাঁসের সঙ্গে জলাশয়ে অথবা ফাঁকা মাঠে চরবার জন্য যেতে চায় না। পালনকারীর তাড়া খেয়ে যদিও বা যায় তবে জলাশয়ে অথবা ফাঁকা মাঠে গিয়ে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকে।

হাঁস বারবার জলের মতো পাতলা মল ত্যাগ করে। প্রথম দিকে অল্প পরিমাণে রক্ত মেশানো মল ত্যাগ করে। এক-দু' দিন পর মলে রক্তের পরিমাণ বাড়তে থাকে। বারবার মল ত্যাগ করবার ফলে মলদ্বারের চারপাশে সব পালক ভিজে

যায়। দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ঠাণ্ডার মরসুমে বেশি শীত করার ফলে রোদে উভয় দিকের পাখা ঝুলিয়ে দিয়ে উত্তাপ গ্রহণ করে।

এই রোগে বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশি হলেও বড় হাঁসের মৃত্যুর আশঙ্কা নেই বললেই চলে। এমনকি চিকিৎসা ব্যবস্থা দেরিতে হলেও সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করা হলে কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। এমনকি যেসব স্ত্রী হাঁস খামারে ডিম পাড়ছে কয়েকদিন ডিম পাড়া বন্ধ করলেও সুস্থ হবার পরেই ডিম পাড়তে শুরু করে। সব থেকে আনন্দদায়ক খবর হলো, ডিম পাড়ার হার মোটেই কমে না। তবে রোগ চিহ্নিত করা হলেই সঙ্গে সঙ্গে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

**রোগ প্রতিরোধ ঃ** হাঁসের খামারের মেঝে প্রতিদিন সকালে উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হয়। কেবল মেঝে নয়, ওদের খাবার ও পানীয় জলের পাত্র পর্যন্ত পরিষ্কার করা দরকার। বাচ্চা হাঁস যেখানে থাকবে (কারণ ওরা মাঠে ঘুরতে বা জলাশয়ে সাঁতার কাটতে যায় না) সেখানে সারাদিন মেঝে ও খাবার সব পাত্র দু' বার পরিষ্কার করতে হবে। কোন বাচ্চা হাঁসকে অসুস্থ দেখলেই তাকে খামার ঘর থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখা দরকার। এতে রোগ বিস্তারের আশঙ্কা অনেক কমে যায়। এছাড়াও আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে টিকা দিতে হবে।

**টিকার নাম ঃ এম্বাজিন প্রিমিক্স (Embazin Premix)**

**টিকা প্রয়োগের নিয়ম ঃ** এক কেজি খাদ্যের সঙ্গে ০.৫ গ্রাম ওষুধ ভালভাবে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। হাঁসের বাচ্চার বয়স জন্মের পর দশদিন বয়স হলে তবেই টিকার ওষুধ দেওয়া উচিত।

অথবা

দ্বিতীয় ওষুধ হিসাবে Cordinal (কর্ডিন্যাল) প্রয়োগ করা চলে। খাওয়াতে হবে এক লিটার পানীয় জলে ১ গ্রাম ওষুধ মিশিয়ে দু' থেকে তিন দিন। এই টিকাও বাচ্চার জন্মের দশ দিন বয়স হলেই প্রয়োগ করা দরকার।

টিকা কোন সময়েই নিজে দেওয়া উচিত নয়। কারণ মাত্রা কম বা বেশি হতে পারে। দুটোই ক্ষতিকারক। যদি বেশি মাত্রায় টিকার ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তবে রোগ প্রতিরোধের পরিবর্তে রোগের আক্রমণ ঘটার আশঙ্কা থাকে। আবার কম পরিমাণে টিকার ওষুধ যদি দেওয়া হয় তাহলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বা শক্তি হাঁসের শরীরে সৃষ্টি হবে না।

**অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ঃ** একটি অথবা দু'টি হাঁস কক্সিডিওসিস অর্থাৎ রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলেই প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রথম প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত হাঁসকে খামার ঘরের বাইরে অন্য কোন ঘরে রাখতে হবে। নতুবা খামারের সুস্থ হাঁসেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে, তখন খামারীর পক্ষে প্রতিকার করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তবে খামারে বেশি সংখ্যাতে হাঁস পালন করা হলে রোগ আক্রমণের শুরুতে মোটেই বুঝতে পারা যায় না। কারণ

দেড় শত বা তারও বেশি সংখ্যার হাঁসের মধ্যে একটি অথবা দুটি অসুস্থ হাঁসকে রোগে আক্রান্ত হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চিহ্নিত করা বহু খামারীর পক্ষেই সম্ভব হয় না। ফলে রোগ যখন প্রবল আকার ধারণ করে এবং বেশ কিছু সংখ্যক হাঁস রোগে আক্রান্ত হয়, তখন খামারী বুঝতে পারে। অবশ্য বয়স্ক হাঁসেদের চিকিৎসা দেরীতে শুরু হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। সামান্য কয়েক দিনের মধ্যে হাঁস সুস্থ হয়ে যায়। এমনকি ডিম পাড়ার হারও কমে না। এমনকি যেসব হাঁস মাংসের জন্য পালন করা হচ্ছে তাদের শরীরেরও বিশেষ ক্ষতি হয় না বললেই চলে।

**ওষুধ ঃ সালমেট সলিউশন** (Sulment sol.) ঃ চার লিটার পরিষ্কার পানীয় জলে ৩০ মিলিলিটার ওষুধ মিশিয়ে সেটা বাচ্চা হাঁসকে পান করতে দিতে হবে। এইভাবে মোট সাত দিন ওষুধ মেশানো জল বাচ্চারা পান করবে।

অথবা

বাইফুরান দ্রবণীয় বড়ি (Bifuran sol. Tablet).

**খাওয়াবার নিয়ম ঃ** একটি ট্যাবলেট পরিষ্কার এক লিটার পানীয় জলে ভালোভাবে গুলে রেখে দিতে হবে। সেই জল হাঁস সারা দিনে পান করবে। এক সপ্তাহ এইভাবে ওষুধ খাওয়ানো দরকার। পরের দিন সকালে পানীয় জলের পাত্র উত্তমরূপে পরিষ্কার করে নতুন ভাবে পরিমাণ মতো ওষুধ জলে মেশাতে হবে।

**হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ঃ** রক্ত আমাশয় রোগে বাচ্চা সহ বয়স্ক হাঁসের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন রকম পার্থক্য নেই। যে ওষুধে বাচ্চা হাঁসের উপকার হবে একই ওষুধ বয়স্ক হাঁসকেও প্রয়োগ করা চলবে। কেবল ওষুধের শক্তিমাত্রার পরিবর্তন ঘটানো হয়।

**ওষুধ ঃ** রক্ত আমাশয় রোগে **মার্কুরিয়াস** এ‸টি কার্যকর ওষুধ। মলের সঙ্গে রক্ত এবং আম মেশানো থাকলে এবং হাঁসের মুখ দিয়ে সব সময় যদি লালা ঝরে তবেই ওষুধটি প্রয়োগ করা দরকার। ওষুধের ২০০ থেকে ১০০০ শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।

যে সব পশু বা পাখি খুবই শান্ত স্বভাবের তাদের ক্ষেত্রে রক্ত আমাশয় রোগে **পালসেটিলা** প্রয়োগে খুবই ভালো ফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে সাদা শ্লেষ্মাযুক্ত মল, সামান্য রক্ত থাকলে এবং রাতে রোগের বৃদ্ধি ঘটলে প্রয়োগ করা দরকার। ওষুধের ২০০ থেকে ১০০০ শক্তি তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়।

আরও একটি বিশেষ উপকারী ওষুধ হচ্ছে **মার্ককর**। তবে এটি প্রয়োগ করবার আগে রোগের লক্ষণ সম্পর্কে একটু বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করা দরকার। মলের সঙ্গে যদি রক্তের পরিমাণ বেশি থাকে এবং আমের অংশ কম থাকে, তবেই **মার্ককর** প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়। অপর দিকে মলে যদি রক্তের পরিমাণ কম থাকে এবং আমের অংশ বেশি রয়েছে বলে মনে হয় তখন **মার্কসল** প্রয়োগ করতে হবে। এমনকি আমাশয়ের জন্য পেটে যন্ত্রণা হলে (হাঁস যদি যন্ত্রণার জন্য মাঝে

মাঝে পেটে লাথি মারে) সেটাও ভালো হয়ে যাবে। ওষুধের শক্তি মাত্রা হবে ২০০ থেকে ১০০০ এবং দু' ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে।

## লিম্বার নেক (Limber Neck)

### হাঁসের বিষক্রিয়া

যেহেতু এটি সংক্রামক ব্যাধি নয় সেই কারণে খামারে পালিত অন্যান্য হাঁসের মধ্যে রোগটি বিস্তারের কোন আশঙ্কা নেই। এমনকি এই রোগে হাঁসের মৃত্যুর ঘটনা নেই বললেই চলে। এটা শরীরে বিষক্রিয়ার ব্যাপার। তবে কোন কারণে তীব্র বিষক্রিয়া হলে তখন হাঁসের মাংসপেশীর পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। ফলে হাঁস চিকিৎসার জন্য বেঁচে গেলেও ডিম পাড়ার ক্ষেত্রে মোটেই লাভজনক হয় না। এমনকি মাংস হিসাবে বাজারে বিক্রি করাও সম্ভব না হওয়ায় খামারে না রেখে মেরে ফেলা উচিত।

**রোগের কারণ :** রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে খাদ্য। ভারতীয় রানার সহ খাঁকি ক্যাম্পবেল, সংকর জাতের দেশী উন্নত মানের হাঁস এবং বিদেশী হাঁস খামাবে পালন করা হলে তাদের মিশ্র খাদ্য বাজার থেকে কিনে অবশ্যই দিতে হয়। ঐ খাদ্যে সমুদ্রের নানা শ্রেণীর (আমাদের খাদ্যের উপযুক্ত নয়) মাছ থাকে। সেই মাছ শুকিয়ে এবং গুঁড়ো করে খাদ্যে মেশানো থাকে। সেই মাছ উত্তমরূপে শুকনো না থাকলে সেটা পচে যায়। ফলে হাঁসের শরীরে বিষক্রিয়ার কাজ করে।

যদি হাঁসের মিশ্র খাদ্য বাড়িতে তৈরি করা হয় তবে মাছের কারণে একই ঘটনা ঘটতে পারে। তবে মেশিনে ভালোভাবে মাছ শুকনো করা হলে এই ধরনের ঘটনা ঘটার আশঙ্কা মোটেই থাকে না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, হাঁস পুকুরে অথবা মাঠে চরবার সময় কোন পচা কীট-পতঙ্গের মাংস খেয়ে ফেললে তার মাধ্যমেও হাঁসের শরীরে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। এই ধরনের মাংস খুবই কম পরিমাণে খাবার জন্য বিষক্রিয়ার প্রভাব খুব একটা তীব্র হয় না। সামান্য অসুস্থ হলেও ওষুধ ছাড়াই সামলে ওঠে অথবা সুস্থ হয়ে যায়।

**রোগের লক্ষণ :** বিষক্রিয়ার জন্য যদি মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত হয় তবে ঘাড়ের পেশীও বাদ পড়ে না। সেক্ষেত্রে হাঁস ঘাড় ঘোরাতে এমনকি নাড়তেও পারে না। সেই কারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা রোগটির নাম দিয়েছেন 'লিম্বার নেক'। এর কয়েক ঘণ্টা বাদে উভয় পাখনা ও পায়ের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত দেখা যায়। মোটেই খেতে পারে না। দুটো চোখ বন্ধ করে মেঝেতে শুয়ে পড়ে এবং ঘাড়টা একদিকে হেলে থাকে। একদিন এইভাবে থাকার পর পাখনা থেকে একটা দুটো করে পালক খসতে থাকে। এটা হাঁসের শেষ অবস্থা। এই রকম অবস্থায় হাঁস খুবই কম বাঁচে। যদিওবা বাঁচে তাকে খামারে পালন করা উচিত নয়।

**রোগ প্রতিরোধ ঃ** বাজার থেকে কেনা মিশ্র গুঁড়ো খাদ্য পূর্ণবয়স্ক অথবা বাচ্চা হাঁসকে খেতে না দেওয়াই ভাল। কারণ ঐ মিশ্র খাদ্যে মাছের গুঁড়ো মেশানো থাকে। এছাড়াও যেসব দানা জাতীয় গুঁড়ো খাদ্যশস্য থাকে সেগুলো পচা হতে পারে। তার মধ্যে হাঁসের পক্ষে ক্ষতিকর জীবাণু জন্মাবার আশঙ্কা খুব বেশি। খাদ্য ব্যবসায়ীরা বেশি খাদ্যের লোভে এই ধরনের হীন কাজ করে। কাজেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে বাইরের কেনা খাদ্য হাঁসকে খেতে না দেওয়াই ভালো। কাজেই প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হিসাবে খাদ্যের সব উপাদান **বাজার থেকে কিনে এনে** খাদ্য তৈরি করে ওদের খেতে দেওয়া দরকার।

**অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ঃ** বিষক্রিয়া হাঁসের শরীরে প্রকাশ পেলেই প্রতিকার করা দরকার। তার কারণ হাঁস দুর্বল হলে কয়েকদিন তাদের ডিম পাড়া বন্ধ হয়ে যাবে। এটা খামারীর কাছে লোকসানের ব্যাপার।

**ওষুধ ঃ এপসম সল্ট (Epsom Salt)**

**খাওয়াবার নিয়ম ঃ** গমের ভুষি অথবা ম্যাশ মাখানো খাদ্য সামান্য জল দিয়ে ভিজিয়ে তার সঙ্গে ছোট চায়ের চামচেব এক চামচ **এপসম সল্ট** মিশিযে অসুস্থ হাঁসকে খেতে দিতে হবে। ঐ খাদ্য সারাদিনে যতটা হাঁস খাবে সেটাই যথেষ্ট। পরের দিন হাঁস সুস্থ হয়ে যাবে।

খামারে পালিত অধিকাংশ হাঁস যদি বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় তাহলে আশি থেকে একশো হাঁসের জন্য ম্যাশ খাদ্য অথবা সামান্য জলে ভেজানো ৪৫০ গ্রাম গমের ভুসিতে মেশাতে হবে এপসম সল্ট। মাত্র এক দিন খেলেই বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে।

কোন কারণে যদি এপসম সল্ট সংগ্রহ করা যদি সম্ভব না হয় তবে কেবল গমের ভুসিতে সামান্য জল দিয়ে ভিজিয়ে হাঁসকে খাওয়ানো দবকার। একদিন খাওয়ালেই হাঁস সুস্থ হয়ে যাবে। এটাও বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে একটা চিকিৎসা হিসাবে ধরা হয়ে থাকে।

**হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ঃ নাক্সভমিকা** ৩০ শক্তি তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে। এছাড়াও **চায়না** ২০০-১০০০ শক্তি মাত্রা সারা দিনে চারবার দেওয়া দরকার।

## হাঁসের রোগ প্রতিরোধের উপায়

খামারীকে একটি কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, রোগ চিকিৎসার চাইতে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা হাঁস পালন সহ সমস্ত প্রাণী পালনের ক্ষেত্রেই লাভজনক ব্যবস্থা। রোগ প্রতিরোধে সহায়ক কয়েকটি উপায় বা করণীয় নিম্নে জানানো হলো।

(১) পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে সুস্থ ও সবল হাঁস-বাচ্চা বা ডাকলিং (Duckling) কিনতে হবে।

(২) সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় হাঁস পালন করলে হাঁসপিছু নির্দিষ্ট জায়গা একান্ত দরকার। কম জায়গায় গাদাগাদি করে একসঙ্গে বেশি হাঁস কোন অবস্থাতেই রাখা উচিত নয়।

(৩) হাঁসের ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভাল বায়ু চলাচল ব্যবস্থা না থাকলে ঘরে অ্যামোনিয়া গ্যাস সহ বিভিন্ন দূষিত পদার্থ জমে যায়। ফলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্নজনিত কারণে হাঁসের স্বাস্থ্যহানি হতে থাকে, উৎপাদনও ব্যাহত হয়।

(৪) ঘরের মেঝে যতটা সম্ভব শুকনো রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ভিজে বা স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে কক্সিডিওসিস ও কৃমিরোগের সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে।

(৫) হাঁসের ঘর ও খামারের চারপাশ যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। খামারে ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র; যেমন—খাবারের পাত্র, জলের পাত্র ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট (Potassium permanganate) দ্রবণে খাবার ও জলের পাত্র ধুয়ে নিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

(৬) হাঁসের নির্দিষ্ট শারীরিক অবস্থার (যেমন—বাচ্চা অবস্থার, বাড়ন্ত অবস্থার ও ডিম পাড়া অবস্থার) জন্য নির্ধারিত ও উপযুক্ত পরিমাণের সুষম খাবার খাওয়াতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৭) ছত্রাক জনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য হাঁসকে আগাম ভিজিয়ে রাখা বা বহুদিনের পুরানো ভেজা খাবার খাওয়ানো চলবে না। হাঁসের খাবারকে উত্তমরূপে শুকনো অবস্থায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাদাম খোল, গম, ভুট্টা, সয়াবিন, চালের গুঁড়ো ইত্যাদিতে ছত্রাকের সংক্রমণ বেশি হয়।

(৮) হাঁসের ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণুনাশক ওষুধ এবং কক্সিডিওসিস রোগ প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টিকক্সিডিয়াল বা কক্সিডিয়া নাশক ওষুধ জল বা খাবারের সঙ্গে নিয়মিত খাওয়াতে হবে।

জীবাণু নাশক কিছু ওষুধের নাম জেনে রাখা ভালো। যেমন—ভেনডক্সভেট, টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড পাউডার ইত্যাদি।

কক্সিডিয়া নাশক ওষুধ বাজারে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। যেমন—কোড্রিনাল (Codrinal, Hoechst), অ্যাম্প্রোলিয়াম পাউডার (Amprolium soluble powder, Merind), ই. এস. বি৩ ($Esb_3$, Cadila) ইত্যাদি। যে কোন একটি ওষুধ তৃতীয় ও পঞ্চম সপ্তাহে এবং ডিম পাড়ার কিছুদিন আগে প্রতিবার নির্দিষ্ট মাত্রানুযায়ী পরপর তিন দিন খাওয়ালে এই রোগ হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে।

(৯) কৃমি রোগ দমনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রানুযায়ী নিয়মিতো কৃমি নাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে। লিভামিজল হাসড্রোক্লোরাইড (Levamisole HCl, Ciba), পাইপারাজিন হেক্সাহাইড্রেট (Piperazine hexahydrate, Ventri), প্যানাকুর পাউডার (Panacur powder, Hoechst) প্রভৃতির যেকোন একটি কৃমি নাশক ওষুধ

হাঁসকে খাওয়ানো যেতে পারে। দু'মাস অন্তর একবার করে নির্দিষ্ট মাত্রানুযায়ী এই ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে। দু'মাস অন্তর একবার করে নির্দিষ্ট মাত্রানুযায়ী এই ওষুধ খাওয়ালে হাঁসকে কৃমির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা যায় ও ডিম উৎপাদন অব্যাহত থাকে।

(১০) বিভিন্ন ভয়াবহ সংক্রামক রোগ; যেমন—ডাক প্লেগ, ডাক কলেরা, ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য হাঁসের নির্দিষ্ট বয়স অনুযায়ী নিয়মিত টিকা দেওয়া খুবই জরুরী।

(১১) নিয়মে প্রতিপালন সত্ত্বেও যদি হাঁসের খামারে সংক্রামক রোগ দেখা দেয়, তাহলে রোগাক্রান্ত হাঁসকে আপাত সুস্থ হাঁসদের কাছ থেকে আলাদা জায়গায় রাখতে হবে। অবিলম্বে স্থানীয় প্রাণিচিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে সংক্রমণের কারণ জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

# হাঁসের বিশেষ বিশেষ রোগ

## হাঁসের প্লেগ (Duck Plague)

মুরগীর এই প্লেগ হয় না, কিন্তু হাঁসের হয়। সচরাচর বয়স্ক হাঁসেরাই এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে মানুষের প্লেগ রোগ থেকে এই রোগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হাঁসের প্লেগ রোগ মানুষের মধ্যে বিস্তারিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

**কারণ ঃ** এক প্রকার ভাইরাস জনিত কারণে এই রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে।

**লক্ষণ ঃ** প্রথম পর্যায়ে হাঁসের নাক দিয়ে জল পড়তে থাকে। চোখের পাতা ফুলে ওঠে, চোখ রক্তাভ হয় এবং রক্তাভ চোখ থেকে পুঁজ মিশ্রিত স্রাব নির্গত হয়। মাথা ফুলে যায়। মাথা ফুলে যাওয়াই এই রোগের অন্যতম লক্ষণ। এই সঙ্গে উদরাময় সূচিত হয়, মলের রং সবুজে হয়। ডানা ও পায়ের পক্ষাঘাত ঘটে, ২।৩ দিনের মধ্যেই আক্রান্ত হাঁসটি মারা যায়।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

এই রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে তেমন কোন ওষুধ নেই। রোগ লক্ষণ যুক্ত হাঁসটিকে দল থেকে সরিয়ে এনে হত্যা করে ফেলতে হবে। মৃতদেহটিকে আগুনে পোড়াতে হবে অথবা গভীরভাবে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। এবং হাঁসের ঘরটি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন করতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে একটু দূরে হাঁসের জন্য আলাদা ঘর নির্মাণ করতে হবে। সুস্থ হাঁসদের সকলকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়াতে হবে।

### প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

Duck Plague Vaccine গুঁড়ো আকারে পাওয়া যায়। প্রতি শিশিতে ২০০ মাত্রা থাকে। ব্যবহারের পূর্বে ১০০ মিলিলিটার পরিস্রুত জলের (Aqua dist. water) সঙ্গে প্রথমে Vaccine গুলে নিতে হবে।

প্রতিটি হাঁসের জন্য—

R/-
Duck Plague Vaccine....$\frac{1}{2}$c.c
(s/c inj.)

প্রতিটি হাঁসকে ১ বার মাত্র অর্ধ সি.সি. মাত্রায় চর্মনিম্নে inject করতে হবে। রোগক্রান্ত হাঁসটিকে পৃথক স্থানে সরিয়ে ফেলে, হাঁসের ঘরটি পুড়িয়ে ফেলে নতুন ঘর তৈরি করতে হবে।

## হাঁসের ভাইরাস হেপাটাইটিস রোগ (Virus Hepatitis)

এই রোগকে লীভারজনিত প্রদাহও আখ্যা দেওয়া চলতে পারে। সচরাচর হাঁসের বাচ্চারাই এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

**কারণ ঃ** এক প্রকার ভাইরাসের কারণেই এই রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। রোগগ্রস্ত পাখির মলদ্বারা দূষিত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের ফলেই সুস্থ বাচ্চা হাঁসেরা এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

**লক্ষণ ঃ** পক্ষাঘাতজনিত লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। রোগক্রান্ত বাচ্চা চলতে চলতে মাটিতে পড়ে খেঁচুনি সুরু হয়। পা দুটো ওপরের দিকে ছুঁড়তে থাকে এবং মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ে।

### চিকিৎসা-ব্যবস্থা

এই রোগের প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে পরবর্তী পর্যায়ে নিরাময় করা কঠিন।

R/-
(1) Epsom salts ....3 sp.
Aqua dist. water....1liter

পরিস্রুত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে ৩ চামচ এপসম সল্ট ১ বার মাত্র খাওয়াতে হবে।

(2) Duck virus antiserum ...$\frac{1}{2}$ c.c.
Aqua dist. water........ $\frac{1}{2}$ c.c.
(I/M inj.)

পেশী মধ্যে ৮ দিন অন্তর অন্তর মোট ৪ বার inject করতে হবে।

### প্রতিষেধক-ব্যবস্থা

দূষিত খাদ্য খাওয়ানো থেকে বিরত রাখতে হবে। রোগযুক্ত হাঁসটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গায় রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। হাঁসের ঘরটি সম্পূর্ণরূপে বিশোধন এবং litter-এর পরিবর্তন করা আবশ্যক। খাদ্য ও পানীয় পাত্রাদিরও বিশোধন করতে হবে।
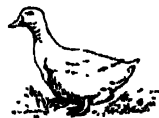
# পক্ষী পালন ও চিকিৎসা

পক্ষী পালনের মধ্যে গৃহপালিত পক্ষীর কথাই বেশি আলোচনা করা হচ্ছে। বাড়িতে তোতা, ময়না, টিয়াপাখি, কাকাতুয়া, চন্দনা, মুনিয়া, পায়রা ইত্যাদি নানা ধরনের পাখি পোষা হয়। তাদের পালনের বিধি, খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে এবার আলোচনা করা হচ্ছে।

## ময়না

ময়না এমন একটি পাখি যারা শেখালে নানা ধরণের মানুষের কথা হুবহু অনুকরণ করতে পারে। এজন্য এই পাখিগুলি সাধারণ লোকেরা পুষে থাকেন।

ময়নার গায়ের রং অনেকটা শালিকের মতো খয়েরী। এদের মাথায় হলদে রংয়ের দুটি বড় বড় কান থাকে। যা সাধারণতঃ অন্য কোন পাখির দেখা যায় না।

ময়না সাধারণত গর্তে বাস করে। সেখান থেকে এদেব ধরে এনে বাজারে বিক্রি করা হয়। খুব অল্প বয়সে এদেব বুলি শেখালে এবা হুবহু মানুযেব মতো কথা বলতে পারে।

তবে দীর্ঘদিন যে কথা নিয়মিত ভাবে শোনে ঠিক সেটুকুই বলার ক্ষমতা থাকে।

ময়না পাকা ফল, মরিচ, পাকা টম্যাটো, ছাতু, ছোলা ইত্যাদি খায়। একটি ময়না সাধারণত ৯।১০ বছর পর্যন্তও বেঁচে থাকতে দেখা গেছে।

### উদরাময়

এই রোগ একপ্রকার বীজাণু থেকে উৎপন্ন হয়। এটি অত্যন্ত সংক্রামক ও মারাত্মক বোগ। একটি খাঁচায় ৩।৪টি ময়না থাকলে একটির উদরাময় হলে বাকিগুলিও এই রোগে আক্রান্ত হতে পাবে।

সাধারণত অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও দূষিত জল খেয়ে এই রোগ হয়। এই রোগে প্রায় শতকরা ৮০টি পাখির মৃত্যু হয়।

এমনকি যেস্থানে এই বোগ উপস্থিত হয়, সে জায়গায় প্রায় সমস্ত পাখিই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

তাই এ রোগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সাবধান হওয়া উচিত। কেন না এটি ভয়ানক সংক্রামক রোগ। এই রোগের বীজাণুসমূহ পীড়িত পাখির মলের সাথে বিশেষভাবে সংযোজিত হয়ে থাকে। সুতরাং এই রোগ হওয়া মাত্র অসুস্থ পাখিকে অন্যান্য সুস্থ নীরোগ পাখিগুলি থেকে পৃথকভাবে রাখা বিশেষ আবশ্যক।

এই রোগ হলে বাঁচার আশা খুবই কম এবং দু-এক ঘন্টা হতে দু'তিন দিনের মধ্যে পীড়িত পাখির মৃত্যু হয়।

**লক্ষণ ঃ** এই রোগ হলে পাখিগুলি হঠাৎ বারে বারে চুনের মতো সাদা কিংবা ঈষৎ সবুজ রংয়ের পাতলা পায়খানা করে, কিছুই খায় না। বিমর্ষভাবে চোখ বুজে থাকে, অত্যন্ত পিপাসা হয়। ডানা ঝুলে পড়ে, গায়ের 'পালকগুলি স্ফীত ও মাথা

নিচু করে স্তব্ধভাবে পা গুটিয়ে বসে থাকে। পায়ের সন্ধিস্থানে অত্যন্ত বেদনা হওয়ার জন্য দাঁড়াতে বা চলতে পারে না। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়।

## চিকিৎসা

১। পীড়িত পাখিকে ৪।৫ ফোঁটা পরিষ্কার চুনের জল খাওয়ালে উপকার হয়।

২। ঘোল কিংবা দই অথবা ছানার জল খেতে দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়।

৩। লেবুর রস জল ও সামান্য লবণের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৪। কার্বলিক এসিড অবস্থা বিশেষে ১ থেকে ৩ ফোঁটা জলের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে বেশ উপকার হয়।

৫। খুব সামান্য পরিমাণে পারমেঙ্গানেট অব্ পটাস পরিষ্কার জলের সাথে মিশিয়ে সেই জল খেতে দিলে উপকার হয়।

## সর্দি

ঠাণ্ডা লাগলে, বৃষ্টিতে ভিজলে, প্রবল হিমে কিংবা প্রবল বায়ুতে থাকলে এই রোগ হয়।

**লক্ষণ ঃ** সর্দি হলে পাখি অনবরত হাঁচতে থাকে। সমস্ত গায়ের পালকগুলি ফুলে ওঠে, আহারে প্রবৃত্তি থাকে না, নাক দিয়ে আঠার মতো একরকম স্রাব বের হয়।

## চিকিৎসা

১। এক ভাগ সরিষার তেল অর্ধেক আদার রস ও রসুনের রস একসাথে মিশিয়ে ৫ ফোঁটা করে প্রত্যহ ২/৩ বার খাওয়ালে উপকার হয়। সামান্য পিঁয়াজের রস খাওয়ালেও উপকার হয়ে থাকে।

২। দুই ভাগ জল একভাগ ব্রাণ্ডি ও আধ গ্রেণ কুইনাইন একসাথে মিশিয়ে প্রত্যহ ২ বার করে খাওয়ালে উপকার হয়।

# তোতাপাখি

নানা রংয়ের নানা আকারের তোতাপাখি দেখা যায়। সাধারণত এদের রং খুব উজ্জ্বল সবুজ, নীল, হলদে, এছাড়া লাল রংয়ের তোতাও দেখতে পাওয়া যায়। একজাতের তোতার মাথায় ঝুঁটি আছে।

তোতার ঠোঁট বড় ও বেশ বাঁকা এবং জিহ্বাও মোটা ও শক্ত। জিহ্বার সাহায্যে এরা আঙুলের কাজও অনেকটা করতে পারে।

তোতা দলবদ্ধ হয়ে গাছের কোটরে বাস করে, এরা প্রায় সারাক্ষণ কিচির মিচির করে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া চালায়, কিন্তু কোন শত্রু এসে পড়লে সকলে মিলে তাকে আক্রমণ করে। তোতার আওয়াজ খুব কর্কশ এবং কান ঝালাপালা করে তোলে।

এরা খুব দ্রুত উড়তে পারে এবং উড়বার সময় পৎ পৎ শব্দ হয়। খাদ্যের সন্ধানে এরা বহু দূরে উড়ে যায়।

তোতা সাধারণত ফল, বাদাম, শস্য ইত্যাদি খাদ্য খায়। এরা বহু বছর বাঁচে। আবার কিছু কিছু তোতা পাখি পঞ্চাশ ষাট বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

এরা কথা শিখতে পারে বলে লোকে শখ করে তোতা পাখি পোষে। তোতা পাখি সব সময় খাঁচায় বন্ধ করে রাখতে হয়। ছাড়া অবস্থায় ঘরের সমস্ত জিনিস নষ্ট করে ফেলে। তোতা পাখি খুব দক্ষতার সাথে তার দুই পা ও ঠোঁট ব্যবহার করতে পারে এবং একই সঙ্গে তার দুই তিন অঙ্গকে বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারে। এজন্য তোতাকে তিন হাতওয়ালা পাখি বলা হয়। তোতাকে অনেকে শখ করে পোষে এবং কথা শেখায়।

## যকৃৎ প্রদাহ

এই রোগ হলে পাখি অত্যন্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ক্ষুধা কমে যায়। অত্যন্ত পিপাসা ও মুখ হলদে রংয়ের হয়।

## চিকিৎসা

১। লেবুর রস সহ জল কিংবা দই খাওয়ালে এবং প্রত্যহ রোদে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখলে উপকার হয়।

২। দৈনিক খাওয়ার সাথে এক আনা এপ্সমসল্ট্ খাওয়ালে উপকার হয়।

## ক্রিমি

১। হুঁকোর জলের সাথে কাগজী লেবুর পাতা বেটে খাওয়ালে ক্রিমি নষ্ট হয়।

২। এক আনা পরিমাণ তামাকপাতা অল্প গরম জলে ভিজিয়ে সেই জল খাওয়াবেন। তদনন্তর এক আনা এপ্সমসল্ট জল সহ পান করালে পায়খানার সাথে ক্রিমি সমূহ বের হয়ে যায়।

## ঝিল্লিক প্রদাহ

এটি একপ্রকার সংক্রামক ও মারাত্মক রোগ। এই পীড়া একপ্রকার জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই রোগ হলে আরোগ্য লাভের আশা খুব কম এবং শতকরা প্রায় ৮০টি পাখি মারা যায়। দলের মধ্যে কোন একটি পাখির এই রোগ হলে তাকে দল থেকে সবিযে অন্য স্থানে রাখতে হবে। নচেৎ অন্যান্য পাখিগুলিও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

**লক্ষণ ঃ** সাধারণত এই রোগ হলে পাখির নাক, মুখ, ঠোঁট ও চক্ষুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে একপ্রকার ময়লা পর্দা পড়ে এবং ঐ পর্দার নিচে একরকম দুর্গন্ধময় হলুদবর্ণ ও পনিরবৎ পদার্থ সংলগ্ন থাকে। এই রোগ মুখে হলে পাখি কিছু খেতে পারে না, কারণ গিলে খেতে কষ্ট বোধ হয়। পীড়িত পাখি ক্রমশ রুগ্ন ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

## চিকিৎসা

১। দৈনিক আনারসের রস ও ঘোল খাওয়ালে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

২। সামান্য পরিমাণ পারম্যাঙ্গানেট অব্ পটাস জলে গুলে তার দ্বারা আক্রান্ত জায়গাগুলি প্রত্যহ সাবধানে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলে উপকার হয়।

## পাকস্থলী রোধ

সময়ে সময়ে পাখিরা অত্যধিক পরিমাণ শক্ত ও মোটা শস্যদানা খায়; সে সকল জিনিস গলার কাছে প্রথম পাকস্থলীতে গিয়ে ক্রমশঃ জমে কঠিন হয়ে আটকিয়ে যায়। এবং পাকস্থলীর কার্যকরী ক্ষমতা অল্পাধিক রোধ করে ফেলে। সুতরাং পাখিরা সে সময়ে ঐ সকল পীড়াদায়ক দ্রব্য উদগিরণ করতে অথবা ঐ সকল জিনিস প্রথম পাকস্থলী থেকে দ্বিতীয় বা প্রধান পাকস্থলীতে নামাতে সমর্থ না হয়ে অত্যন্ত কষ্ট পেতে থাকে।

### চিকিৎসা

১। সামান্য গরম জলে লবণ মিশিয়ে সেই জল মুখের ভেতর ধীরে ধীরে ঢেলে দেবেন এবং কিছু জল মুখ দিয়ে প্রথম পাকস্থলীতে গেলে পাখির পা দুটি ধরে মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ধরে রাখবেন। এরকম করলে পাখি সমস্ত জিনিস বমি করে তবে সুস্থ বোধ করে।

২। **অস্ত্রোপচার চিকিৎসা ঃ** উপরোক্ত ওষুধে কাজ না হলে পাখিটার প্রথম পাকস্থলীর উপরের পালকগুলি তুলে বাইরের চামড়া একখানি ধারালো ছুরি দিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে দেড় ইঞ্চি চিরে দেবেন। বাইরের চামড়া চিরে দিলে প্রথম পাকস্থলী দেখা যাবে। তখন পাকস্থলী এক ইঞ্চি লম্বা চিরে সমস্ত ভুক্ত জিনিস বের করে ফেলতে হবে এবং সামান্য জলে পারম্যাঙ্গানেট অব্ পটাস গুলে সেই জল দিয়ে পাকস্থলী উত্তমরূপে ধুয়ে দিয়ে কাটা জায়গায় দুটি রেশমী সুতো দিয়ে পর পর সেলাই করে দেবেন।

৩। কিঞ্চিৎ অলিভ অয়েল মুখের ভেতর দিয়ে প্রথম পাকস্থলীতে ঢেলে দেবেন। এবং প্রথম পাকস্থলীর কাছে হাত দিয়ে ধরে পাখিটিকে ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলে সমস্ত দ্রব্য মুখ দিয়ে বের হয়ে যাবে।

### শুশ্রূষা

অস্ত্র চিকিৎসার পর ২৪ ঘণ্টা পাখিকে কিছু খেতে দেবেন না। তারপর কিছুদিন কেবল তরল জিনিস খেতে দেবেন।

## টিয়াপাখি

টিয়াপাখির গায়ের রং সবুজ এবং ঠোঁটটি তার লাল এবং বাঁকানো। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়।

এরা সাধারণত ক্ষেতের ধান, পাকা ফল ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। টিয়াপাখির জিভ বেশ মোটা ও শক্ত, মাথায় একটা ঝুঁটি থাকে।

জংলী অবস্থায় এরা একত্রে থাকতে ভালবাসে। কোন শত্রু সামনে পড়লে একত্রে তাকে আক্রমণ করে।

এরা দীর্ঘদিন বাঁচে। ১৫।২০ বছর পর্যন্ত এক একটা টিয়াপাখিকে বেঁচে থাকতে দেখা যায়।

পোষা অবস্থায় ভালোভাবে শেখালে এরা কথা বলতে পারে। ছোট টিয়াপাখিকে খাঁচায় রাখা হয়। বড় হলে এদের পায়ে শিকল দিয়ে রাখে।

টিয়াপাখি পোষা বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি অতি সাধারণ শখ। তাই এদের সাধারণ কয়েকটি রোগ ও চিকিৎসা দেওয়া হলো।

## বদহজম ও উদরাময়

প্রচুর দূষিত খাদ্য খেলে অনেক সময় টিয়াপাখির এ রোগ হতে পারে। এ রোগ হলে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়। পায়খানায় দুর্গন্ধ দেখা দেয়। এই রোগ খুব সংক্রামক। এক খাঁচায় একাধিক টিয়াপাখি থাকলে তাদের একটি এই রোগে আক্রান্ত হলে বাকিগুলিরও এই রোগ হতে পারে। বেশি পরিমাণে ছাতু ছোলা ইত্যাদি খেলে এবং ফলমূল না খেলে অনেক সময় টিয়াপাখির এ রোগ হয়। শতকরা প্রায় ৩০।৪০ ভাগ টিয়াপাখি এই বোগে মারা যায়।

## চিকিৎসা

১। পীড়িত পাখিকে ৬।৭ ফোঁটা চুনের জল খাওয়ালে উপকার হয়।

২। ঘোল কিংবা দই অথবা ছানার জল খেতে দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়।

৩। লেবুর রস, জল ও সামান্য লবণেব সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে বিশেষ উপকার হয়।

৪। কার্বলিক এসিড অবস্থা বিশেষে ১ থেকে ৩ ফোঁটা জলের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে বেশ উপকার হয়।

৫। দৈনিক অর্ধ গ্রেন কুইনাইন পীড়িত পাখিকে খাওয়ানো উচিত। খুব সামান্য পরিমাণে পারম্যাঙ্গানেট অব পটাস্‌ পরিষ্কার জলের সাথে খাওয়ালেও উপকার হয়।

## গায়ে পোকা লাগা

টিয়াপাখির গায়ে যাতে পোকা না লাগে এজন্য এদের যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। বৃষ্টির জলে এদের ভিজতে দেওয়া উচিত নয়। প্রাতঃকালে শিশিরসিক্ত ও ভিজা জমিতে অথবা ঠাণ্ডায় ও হিমে এদের বিচরণ করতে দেওয়া উচিত নয়। ঠাণ্ডা এদের মোটেই সহ্য হয় না। অধিক গরমের সময় রোদে থাকা ও ঠাণ্ডা লাগানো শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। এতে পাখিদের শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে। এদের হজম শক্তি বড় কম, এজন্য পেটের অসুখ বড় বেশি হয় এবং একবার আক্রান্ত হলে সহজে আরোগ্য হয় না। পেটের অসুখে এক চা-চামচ এপসম্‌ সল্ট খাইয়ে দেখা উচিত। অথবা আধ চামচ জলে ২ ফোঁটা ক্লোরোডাইন মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত।

## ব্লাকহেড

টিয়াপাখিদের এটি অতি মারাত্মক ব্যাধি। এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। পাখিরা একবার আক্রান্ত হলে আর বাঁচে না। পাখিদের যকৃৎ ও পাকাশয়ে এই রোগ আক্রমিত হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখলে বোঝা যায় যে, অতি ক্ষুদ্র জীবাণু পাখির যকৃতের জায়গা অধিকার করে তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। পাখির মাথা কালচে ও নীল রং ধারণ করলে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে বুঝতে হবে।

এই রোগের প্রথম অবস্থায় পাখির পেটের অসুখ ও পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। দুর্বল, নিস্তেজ ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং হঠাৎ মারা যায়। পায়খানার সাথে এই রোগের জীবাণু বের হয় এবং তা যে কোন উপায়ে অন্যের শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এইরূপে ঝাঁকের সমস্ত পাখি এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ দেখা মাত্র রোগাক্রান্ত পাখিটিকে দল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। মৃত পাখিকে শীগগিরই পুড়িয়ে ফেলা এবং সমস্ত ঘর বাড়িতে বীজাণুনাশক ওষুধ ছড়িয়ে দেওয়া কর্তব্য। অথবা ফিনাইল এবং কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে সমস্ত ঘর উত্তমরূপে ধুয়ে দেওয়া দরকার। অন্যান্য রোগে অন্যান্য পাখিদের মতো চিকিৎসা করা দরকার।

## মাথা ফোলা

অল্প পরিসর স্থানে পাখির সংখ্যা বেশি হলে এ ধরনের রোগ হয়। পীড়িত পাখিকে আলাদা করে ভালো পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হয় ও সুঁচ ফুটিয়ে জল বের করে দিতে হয়।

## উকুন

পাখিদের পালকের গোড়ায় উকুন হয়। এতে পাইরিথিয়ামের গুঁড়ো ব্যবহার করতে হবে।

## টিক

মাথায় টিক জন্মে। এটি বড় বিরক্তিকর উপদ্রব। মাথায় তেল বা চর্বি মাখিয়ে দিলে উপদ্রব নিবারিত হয়।

## সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগা

অনেক সময় টিয়াপাখির ঠাণ্ডা লেগে সর্দি ও শরীর খারাপ হতে পারে। এতে পাখি নির্জীব হয়ে পড়ে ও তার নাক দিয়ে মাঝে মাঝে জল ঝরে। একটু বেশি সর্দি লাগলে পাখি প্রায় অর্ধমৃত হতে পারে। এমন কি বয়স বেশি হলে পাখি মারা যায়।

## চিকিৎসা

১। সরষের তেল, আদার রস, রসুন রস, তুলসী পাতার রস—প্রতিটি ২ ফোঁটা করে মিশিয়ে দিনে ২।৩ বার খাওয়াতে হবে। তা ছাড়া খাঁচায় পাখিকে ঢেকে রাখতে হয় যাতে ঠাণ্ডা আর বেশি না লাগে।

## চন্দনা

চন্দনা পাখির আকার টিয়াপাখির চেয়ে কিছুটা বড়। এরা দেখতে অনেকটা টিয়া পাখির মতো—তবে সারা দেহেব কোন কোন অংশে লাল লাল দাগ থাকে। চন্দনার মাথায় ঝুঁটি থাকে।

এরা পোষ মানলে বেশ ভালোই পোষ মানে। এরা দাঁড়েব উপর চুপ করে বসে থাকে। এদের আয়ু টিয়ার চেয়ে অনেক বেশি হয়।

চন্দনা পাখি চমৎকার কথা বলতে পাবে। মানুষেব কথাব মতো প্রায় কথা বলে এবা।

চন্দনা পাখি ছোলা, লঙ্কা, কলা, পেয়ারা ফল প্রভৃতি খেয়ে থাকে। এরা টিয়ার চেয়ে অনেক বেশি খায়।

### মৃগী রোগ

এই রোগে আক্রান্ত হলে পাখির ঘাড় মোচড়ানো দেখা যায়। অর্থাৎ ঘাড় তুলে সোজা করে রাখতে পারে না; ঘাড় বেঁকে মাটিব দিকে নিচু হয়ে ঝুলে পড়ে বলে একে বলে Limbur neck. অর্থাৎ বাংলায় যাকে ঘাড় বাঁকা রোগ বলা হয়ে থাকে। এই রোগাক্রান্ত পাখিকে দল থেকে আলাদা রাখা উচিত এবং খাদ্য কম করে দেওয়া দরকার। সাধারণত এই রোগে চন্দনা পাখি খেতে পারে না। দুধ বা তরল খাদ্য আস্তে আস্তে সাবধানে খাওয়াতে হয়।

ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়াম ২ ড্রাম, ১ পাইন্ট পরিষ্কার পানীয় জলের সাথে মিশিয়ে পান করালে উপকার হয়।

### ফোড়া

পাখির শরীরে রক্ত খারাপ হয়ে গেলে, গায়ে কোনরকম আঘাত লাগলে, উঁচু-নিচু জমিতে অধিক দৌড়াদৌড়ি বা লাফালাফি-করলে, এদের গায়ের জায়গায় জায়গায় উঁচু ঢেলার মতো ফুলা ফুলা দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় আইওডিন দিলে তা সেরে যায়। তাছাড়া কোন কোন সময় এগুলি ফোড়ার আকারে দেখা দেয় ও পূঁজ হয়। ফুটন্ত গরম জলে বোরিক অ্যাসিড (পাউডার) দিয়ে সেই জল তুলার দ্বারা কম্প্রেস দিলে ৩।৪ দিনের মধ্যে ফোড়া ফেটে যায়। ফোড়া থেকে পূঁজ বের করে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিয়ে ক্ষত স্থান ধুয়ে মুছে কার্বলেটেড ভেসলিন

লাগিয়ে দিতে হয়। বোরিক কম্প্রেসের দ্বারা না সারলে অথবা পুঁজ বসে গেলে অপারেশনের দরকার হয়। এই রোগ শরীরের ভেতরের দিকে হলে চিকিৎসা করা কষ্টকর। পায়ে হলে কার্বলেটেড ভেসলিন দিয়ে চিকিৎসা করা দরকার।

## ব্রঙ্কাইটিস

এই রোগগ্রস্ত পাখির স্ফূর্তি থাকে না। নিঝুমভাবে সব সময় বসে থাকে। খাওয়াতে কোন রুচি থাকে না। কাশলে সাঁই সাঁই শব্দ হয়। কাশতে কষ্ট হয়। জ্বর ভাব থাকে। এরকম লক্ষণ দেখা গেলে পাখিকে শুকনো গরম জায়গায় রাখা দরকার। যেন কোনরূপে ঠাণ্ডা না লাগে। বুকে আইওডেক্স মালিশ করা দরকার। ইপিকাকুয়ান্হা এর ৮ ফোঁটা চায়ের চামচের এক চামচ গ্লিসারিনের সাথে মিশিয়ে দিনে তিনবার খাওয়ানো যেতে পারে। টিনচার একোনাইট-এর ১ ফোঁটা করে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর গরম জলের সাথে খাওয়ানো দরকার।

## ব্ল্যাকহেড

সাধারণত চন্দনা অপেক্ষা হাঁস মুরগির এ সমস্ত রোগ হয়। এটি ভীষণ সংক্রামক রোগ। এ রোগ হলে পাখির ক্ষুধা থাকে না। দিন দিন শুকিয়ে যেতে থাকে। হলদে রংয়ের সবুজ রংয়ের পাতলা মল ত্যাগ করে। মাথার ঝুঁটি নীলাভ কালো রংয়ের হয়ে যায় এবং ৮।১০ দিনের মধ্যে পাখিটি মারা যায়। এই রোগ হলে কিছুতেই দলের অন্য পাখির সাথে মিশতে দেওয়া উচিত নয়। রোগাক্রান্ত পাখিকে অপর পাখির সাথে রাখা উচিত নয়। এবং একই ঘরের মধ্যে রাখাও যুক্তিসঙ্গত নয়।

ময়লা বা দূষিত জল খাওয়ালে, অস্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকলে, পচা অখাদ্য বা বেশি পরিমাণে নতুন শস্য খেলে এই রোগ হয়। এক প্রকারের অতি ক্ষুদ্র জীবাণু পেটের অন্ত্র ও যকৃতের মধ্যে আশ্রয় নেয় ও তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। এবং যকৃত ও অন্ত্র খারাপ করে ফেলে। এই রোগ চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করা সহজ নয়। সুতরাং রোগগ্রস্ত পাখিকে মেরে পুড়িয়ে ফেলাই যুক্তিসঙ্গত এবং যাতে অন্য পাখির মধ্যে এই রোগের বিস্তার লাভ না করে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

## সর্দি

হঠাৎ কোন রকম ঠাণ্ডা লাগলে পাখিরা সাধারণত সর্দিতে আক্রান্ত হয়। প্রধানত বর্ষা ও শীতকালে সর্দি হলে এরা হাঁচতে থাকে। চুপ করে বসে থাকতে চায়, চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে এবং সময়ে সময়ে চোখ মুড়িয়ে যায় ও জ্বরে কষ্ট পায়।

## চিকিৎসা

এই রোগ মারাত্মক নয় বলে প্রতিপালকেরা এর দিকে বিশেষ নজর দেন না, কিন্তু এই সর্দি থেকে নানাকরম কঠিন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগ হয়েছে

জানতে পারলেই পাখিদের পানীয় জলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা উচিত। রোগাক্রান্ত পাখির মুখ ও নাক আইজল ইত্যাদি মিশানো জলে ডুবিয়ে দিলে ভালো হয়। মুখের ভেতর কফ হয়েছে বুঝলে লবণ মিশানো জলে তুলো ভিজিয়ে তার দ্বারা মুখ পরিষ্কার করতে হবে। নাকের ভেতর পটাস দানা দিলেও সর্দি কমে যায়।

সিকি গ্রেন কুইনাইন সামান্য চিনির বা মিছরির জলে মিশিয়ে খাওয়ালে উপকার হয়।

## খেঁচুনি

বাচ্চা অবস্থায় এক প্রকার অঙ্গগ্রহ্ বা খেঁচুনি রোগ হয়। অত্যন্ত দুর্বল হলে ও ডিম প্রসবকালে পাখিদের সময়ে সময়ে এ রোগ হতে দেখা যায়। সাধারণত ভিজে বা স্যাঁতসেতে জায়গায় থাকলে বাচ্চাদের এ প্রকারের খেঁচুনি হয় বা খিল ধরে থাকে।

## কেঙ্কার

এটি ডিপথিরিয়া জাতের ছোঁয়াচে রোগ। পাখির জিহ্বায় ও মুখের মধ্যে এক রকম ঘা হয়। ধাড়ী অপেক্ষা বাচ্চাদের এই রোগ বেশি হয়। আগের থেকে সাবধান না হলে মুখ ঘায়ে ভরে যায়। এবং দলের অন্য পাখিদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে। এই রোগগ্রস্ত পাখিরা কিছুই খেতে চায় না।

কোন পাখির এ রোগ হয়েছে জানতে পারা মাত্র তাকে পৃথক করে রাখতে হবে। খাওয়ার জলে সামান্য পরিমাণে পারম্যাঙ্গানেট অফ্ পটাস মিশিয়ে দিতে হবে। মুখের ঘা বোরিক এসিড অথবা হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিয়ে ধুয়ে ঘায়ে বোরিক এসিড পাউডার অথবা গ্লিসারিন লাগিয়ে দিতে হয়। এই রোগ সাধারণত ধাতু পরিবর্তনের সময় হতে দেখা যায় অর্থাৎ শীতের পর বসন্তের আগমনের সময় এই রোগের আবির্ভাব হয়।

## ক্লোসাইটিস

সাধারণত মাদী পাখিদের মলদ্বারের মুখে ঘা হয়, এবং তা পচে এই ব্যাধির সৃষ্টি। এই রোগগ্রস্ত পাখির পায়খানা হতে ও জোড়ের পুরুষ পাখির দ্বারা এই রোগ অন্য মাদী পাখিতে সংক্রামিত হয়। পারম্যাঙ্গানেট অফ্ পটাস্ ও হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিয়ে ঘায়ের জায়গা ধুয়ে পরিষ্কার করে কার্বলেটেড ভেসলিন অথবা আয়ডোফর্ম পাউডার লাগিয়ে দিতে হয়।

## মাথা সংক্রান্ত পীড়া

মাথায় আঘাত লাগলে অথবা দুপুরের প্রখর রোদে ঘুরে বেড়ালে এরা মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এজন্য এদের সুবিধার জন্য বাড়িতে আম, জাম, পেয়ারা ইত্যাদি গাছ লাগালে সুবিধা হয়। মাঝে মাঝে গাছের ডালে পাখিদের খাঁচা ঝুলিয়ে রাখা যায়।

কোন পাখিকে ঘুরে পড়তে দেখলে এরকম ছায়াযুক্ত জায়গায় বা শীতল জায়গায় অথবা কোন নির্জন অন্ধকার ঘরে এনে আস্তে আস্তে মাথায় ঠাণ্ডা জলের

ঝাপটা দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একদিন জলের সাথে এপসম্ সল্ট খাওয়ালে উপকার হয়। এক ছটাক জলে সিকি চামচ এপসম্ সল্ট মিশিয়ে দিতে হয়।

## পান বসন্ত

এটি অতি ভীষণ সংক্রামক রোগ। সাধারণত গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। পাশের গ্রামে বসন্ত হলেও অন্য পাখিদের দ্বারা অথবা বাতাসে ধুলোর সাথে এর বীজাণু উড়ে আসতে পারে। মশা ও চিমড়ে মাছির দ্বারাও এ রোগ বাহিত হয় ও বিস্তার লাভ করে। সময়ে সময়ে পাখিরা মারামারি করে ঠকরিয়ে যে ঘা হয়, তা থেকেও এ রোগ হতে পারে। এজন্য খুব সাবধানে পাখিদের রাখতে হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত জায়গায় পাখিদের এ রোগ হতে দেখা যায়। আক্রান্ত পাখিগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। স্থানান্তরিত করবার আগে Carbolised vaseline -এর দ্বারা অথবা সাবান জলের দ্বারা মামড়িগুলি তুলে ফেলা প্রয়োজন ও Iodine লাগিয়ে দিতে হয়। বড় পাখির চেয়ে বাচ্চাদের পক্ষে এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর। পাখির মুখ, মাথা প্রভৃতি সমস্ত জায়গায় ধূসর বা হরিদ্রাভ ছোট ছোট গুটি হয়। এবং ব্যবস্থা না নিলে তাড়াতাড়ি অন্য পাখিরাও সংক্রামিত হয়ে পড়ে। বসন্ত রোগ দেখা দিলে সর্ব প্রথমে আহার ও খাওয়ার জলের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। পানীয় জলে পারম্যাঙ্গানেট অফ্ পটাস মিশিয়ে দিতে হয়। এ সময় কোন উত্তেজক খাদ্য খেতে দেওয়া উচিত নয়। খাওয়ার জিনিসের সাথে সামান্য গন্ধকের গুঁড়ো ব্যবহার করা যেতে পারে। অসুস্থ পাখিদের ঘোল খাওয়ালে বিশেষ উপকার হয়। ৪ আউন্স কপার সালফেট অ্যাসিড নিয়ে মাটির পাত্রে (ধাতু পাত্রে মেশানো নিষেধ) একসাথে মিশিয়ে রোগগ্রস্ত পাখিকে খেতে দেওয়া উচিত। তুঁতের জলে গুটিগুলি ধুয়ে আইওডিন বা কার্বলেটেড ভেসলিন লাগিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। কোন পাখি এ রোগে মারা গেলে তার ঘর ও অন্য জিনিসপত্র কার্বলিক এসিড বা ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। Pox Vaccine ব্যবহার করা যেতে পারে; Imperial Vaterinary Research Institution-এ পাওয়া যায়। এই ওষুধ মাত্র যেগুলি অনাক্রান্ত পাখি শুধু তাদেরই দিতে হয়। টিকা দেওয়ার পর ১৪ দিন পর্যন্ত পাখিগুলিকে সাবধানে রাখা প্রয়োজন।

বোরিক কমপ্রেস্ দিয়ে তারপর বোরিক মলম দিলেও ভালো হয়। এটি অতি মারাত্মক রোগ না হলেও অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ রীতিমতো যত্ন ও ওষুধ না দিলে চোখ খারাপ হতে পারে। এই রোগ বাচ্চা পাখিদের মুখের দ্বারা জল ও ফল খেতে না পারায় অধিকাংশ মারা যায়।

## পেটের অসুখ

সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সময়ে আহারের গোলমালে অতিরিক্ত খেলে, খাদ্যদ্রব্য হজম করতে না পারলে, পেট গরম হলে, এ রোগ হয়। সাধারণতঃ পেটের অসুখে পাখিকে ঘোল খাওয়ালে উপকার হয়। এ সময়ে এদের আহারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এ সময়ে এদের ১ ড্রাম মেডিসিনাল ক্রিয়োসোট ও ৩

আউন্স অলিভ অয়েল একসাথে মিশিয়ে খাওয়ার জিনিসের সাথে খাওয়ালে অনেক উপকার হয়।

## পায়রা

পায়রার আদি জন্মস্থান যে কোথায় এবং কোথা থেকে প্রথম আমদানি হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস এখনও জানা যায় নি।
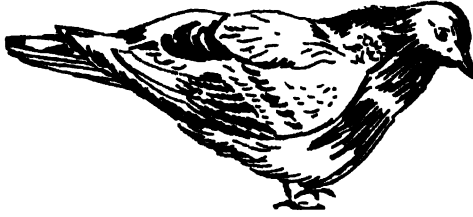
তবে মুসলমান রাজত্বের সময় সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল থেকে পায়রার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মুসলমান বাদশাহের সময়ে দিল্লি, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের পায়রা উৎপাদকগণ আকার, গঠন ও বর্ণগত পার্থক্য অনুসারে সামঞ্জস্য রেখে অতি নিপুণতার সাথে জোড় মিলিয়ে বিভিন্ন জাতীয় পায়রার সৃষ্টি করেছিলেন। আজকাল উপযুক্ত পালন এবং যত্নের অভাবে এবং এ বিষয়ে আগ্রহ না থাকায় অনেক সৌখিন জাতীয় পায়রা এ দেশ থেকে লোপ পেয়েছে। আকার, গঠন ও বর্ণ ভেদে নানা প্রকারের পায়রা দেখতে পাওয়া যায়।

### বিভিন্ন জাতের পায়রা

সৌখিন জাতীয় পায়রার সম্বন্ধে কিছু বলা এ বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। কেবল যে সকল পায়রা পোলট্রির উপযোগী অর্থাৎ যাদের মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হতে পারে সে সমস্ত পায়রার বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা হবে।

পায়রা যে সকল সময় সখের জন্য প্রতিপালিত হয় তা নয়। খাওয়ার জন্যও এটি পালিত হয়ে থাকে। খাওয়ার জন্য পায়রার পালন রোমানদের সময় থেকেই প্রচলিত হয়েছে বলে জানা যায়। আজকাল পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা অপেক্ষা আমেরিকায় মাংসের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক পায়রা পালিত হয়ে থাকে। ফরাসী দেশেও খাওয়ার জন্য পায়রা পালনের যথেষ্ট প্রচলন ও সুবন্দোবস্ত আছে।

পায়রার মাংস খুবই সুস্বাদু। এ দেশে মাংসের জন্য পায়রা পালনের প্রচলন নাই। সখের জন্যই সর্বাধিক পালিত হয়।

কিন্তু এদেশেও এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা পায়রার মাংস খান। তবে সাহেবরা এর বিশেষ পক্ষপাতী। বড় জাতীয় মাংসল অথবা সৌখিন পায়রা পালন করে কোলকাতা অথবা বিদেশে চালান দিলে ব্যবসার দিক দিয়ে লাভজনক হয়।

যে সব পায়রা বেশ বড়, মাংসল, পালক কম এবং অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় সেইসব পায়রার মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হতে পারে।

যে সকল পায়রা মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাদের লেজ প্রায়ই খর্বাকৃতি হয়। সাধারণত দেশী গোলা, এন্টওয়ার্প গ্রস, সুইম মন্ডেন প্রভৃতি জাতীয় পাখি এই কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

## পায়রার গৃহনির্মাণ

পায়রার ঘর বা খোপ কাঠের হলে ভালো হয়। পাকা ঘরের মধ্যে কাঠের খোপ তৈরী করে প্রতি খোপে এক জোড়া পাখি (নর ও নারী) রাখা যেতে পারে। খোপগুলির উচ্চতা পাখি থেকে একটু বড় এবং পরিসর এরূপভাবে তৈরি করা দরকার, যাতে দুটি পাখির ঘুরতে ফিরতে কষ্ট না হয়।

প্রতি খোপের গোড়ায় একটি দরজা ও মাঝে দুটি সদর দরজা দক্ষিণ দিকে থাকলে ভালো হয়। পায়রার ঘর খোলার, খড়ের, টিনের অথবা পাকা করে নির্মাণ করা যেতে পারে। পায়রার ঘরের চাল বা ছাদ টিনের হলে গ্রীষ্মের সময় ঘর তেতে ওঠে এবং পায়রাগুলি খুব কষ্ট পায়। সুতরাং টিনের করতে হলে চাল খুব উঁচু করে তৈরি করা দরকার এবং ঘরের আশে পাশে বড় জাতীয় গাছ লাগাতে হয়। এ প্রণালী উত্তাপ থেকে অনেক রক্ষা করে। পাকা ঘরের মধ্যে দুটি পায়রার থাকার ও আয়তন অনুযায়ী এক একটি খোপ তৈরি করে মাঝখানে দ্বার সমান ফাঁক রেখে লোহার জাল দিয়ে প্রত্যেক খোপটি স্বতন্ত্র করে দেওয়া যায়।

পাকা ঘরের উচ্চতা অনুযায়ী ৪।৫ থাক পর্যন্ত এইভাবে খোপ করে পায়রার ঘর তৈরি করা যেতে পারে। প্রত্যেক ঘরে এক একটি বেতের ঝুড়ি পায়রা থাকার জন্য তার দিয়ে বেঁধে দিতে হয়।

পায়রার ঘরের সামনের সমান্তরাল জায়গা বা সমান মাপের জায়গা সর্বতোভাবে তারের জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া আবশ্যক। পায়রার ঘরের দরজাগুলি এর সামনাসামনি থাকবে। এই জায়গায় পায়রার খাবার দেওয়া হবে। এবং এরা ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াবে। পায়রার ঘরের খোপ ও মেঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। ঘরের মধ্যে যাতে উপযুক্ত আলো ও বাতাস খেলতে পারে এবং সর্বদা শুকনো ও খটখটে থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। পায়রার মল ফেলে না দিয়ে এক জায়গায় জমিয়ে গাছের গোড়ায় সার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এটি গাছের পক্ষে উপযোগী। পায়রার ঘরের মধ্যে খানিকটা সৈন্ধব লবণ এবং উঠানের এককোণে পুরানো ভাঙ্গা বাড়ির চূর্ণ, চুন বালি বা রাবিস জড় করে রাখা দরকার। পায়রা সময় সময় এগুলি খেয়ে থাকে। এটি পায়রার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

## আহার

দিনে ২ বার অর্থাৎ সকালে ৮টার সময় ও বিকালে অর্থাৎ সন্ধ্যের আগে এদের খাবার দেওয়া দরকার। ধান, ছোট জাতীয় মটর, ছোলা, কাঁওন, বজরা, গম, ভুট্টা,

সরিসা, চাল ইত্যাদি পায়রার খাদ্য। ভুট্টা, গম, বজরা, ছোলা প্রভৃতি বেশি খাওয়ানো অনিষ্টকর। বর্ষাকালে পায়রা কুরীজ করে অর্থাৎ পালক ত্যাগ করে। এ সময়ে এদের গায়ে অত্যন্ত বেদনা যায়। সেজন্য সাবধানে খাওয়াতে হয়। এই সময় একবার বিকেলে এদের খেতে দিতে হবে। ছোট জাতীয় পায়রাকে মটর, ছোলা ইত্যাদি খাওয়ালে এরা শীগগির মোটা ও পুষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু পায়রাদের সৌন্দর্য ও বিশিষ্টতা তাদের ঠোঁটের উপর নির্ভর করে। তাদেব মোটা দানা যুক্ত খাদ্য খাওয়ালে তার ব্যতিক্রম ঘটবে অর্থাৎ ঠোঁট বড় হয়ে তার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যাবে। মধ্যে মধ্যে মুলোপাতা, লেটুস শাক প্রভৃতি কুচিয়ে দিলে এরা আগ্রহ সহকারে ছিঁড়ে খেয়ে থাকে। দিনে ২ বার পরিষ্কার জল পান করবার জন্য দেওয়া উচিত। মাটির গামলায় করে জল দেওয়াই প্রশস্ত। এদের আহারের পাত্রাদি সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। পায়রাদের স্নানের জন্য ৩।৪ ইঞ্চি গভীর কোন প্রশস্ত মাটির গামলা জলপূর্ণ করে রেখে দিতে হয়। এতে পায়রা নিজের ইচ্ছামতো স্নান করতে পারে।

## পরিচর্যা ও জনননীতি

মাংসের জন্য দেশী মাদী গোলা পায়রার সাথে বড় জাতীয় পুরুষ পায়রার জোড় মেলালে তার বাচ্চা বেশ ভালো হবে। সাধারণত ছয় মাস বয়সের পাখিদের জোড় দেওয়া যেতে পারে। এবং ৪।৫ বছরের পায়রার বাচ্চা নিতে পারা যায়।

এরা প্রায় ১৫।২০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। মাদীগুলি একসাথে দুটি করে ডিম পাড়ে। পায়রারা ভালো তা দেয়; এদের পুরুষ ও মাদী উভয়েই ডিমে বসে। মাদীপাখি বাইরে থাকলে পুরুষ পাখি ডিমে তা দেয়। ১৬।১৮ দিনে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চা অবস্থায় ধাড়ী পায়রারা খাবার মুখে করে এদের খাওয়াতে থাকে। এ সময়ে বাচ্চাকে একটু সাবধানে ও গরমে রাখতে হয় এবং যাতে বেশি রোদ বা ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

## পায়রার শত্রু বা রোগ

ইঁদুর পায়রার পরম শত্রু। সুবিধা পেলেই এরা বাচ্চা পায়রাকে মেরে ফেলে। এজন্য পায়রার ঘরে যাতে ইঁদুর ঢুকতে না পারে সে সম্বন্ধে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এছাড়া বিড়াল, কুকুর, সাপ এবং অন্যান্য অনেক পাখিও এর পরম শত্রু। পায়রার গায়ে উকুনের মতো একরকম পোকা জন্মায়। সাধারণত ময়লা জায়গায় থাকলে এরকম পোকা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত স্যাঁতসেতে জায়গায় বা ঠাণ্ডায় থাকলে সর্দি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সমস্ত কারণে এদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং সাবধান মতো রাখা দরকার।

কোন কোন সময় পায়রার ডানায় অথবা গায়ের অন্যান্য জায়গায় এক রকম ব্যথা হয়। ঐ জায়গায় আইওডিন লাগালে উপকার হয়।

ঠাণ্ডা লাগলে মুখের মধ্যে ঘা হয়ে থাকে। ঐ জায়গায় সোহাগার খৈ অথবা হলুদ লাগিয়ে দিলে উপকার হয়।

কখনও কখনও পাখির চোখে জল পড়তে দেখা যায়। সাধারণত কোভিয়াল জাতীয় পায়রার চোখে এ রোগ হতে দেখা যায়। গরম জলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে পিচকারী করে চোখ ধুয়ে ও চোখের কোণে কার্বলেটেড ভেসলিন লাগিয়ে দিতে হয়। পেঁয়াজ বা রসুনের কোয়া খাওয়ালে উপকার হয়।

পায়রার পায়ে বা কোথাও চোট লাগলে বা মচকালে তার্পিন ও কর্পূরের তেল ঐ জায়গায় মালিশ করলে উপকার হয়।

এ ছাড়া পায়রাদের বসন্ত, যক্ষ্মা, পেটের অসুখ জাতীয় নানা প্রকার রোগ হতে দেখা যায়। সে সব ক্ষেত্রে পশুপাখির ডাক্তারের নির্দেশমতো চিকিৎসা করানো দরকার।

## কোকিল

কোকিল আমাদের সকলের পরিচিত পাখি। ফাল্গুন মাস থেকে অবিরত কোকিলের ডাক শোনা যায়। এদের ডাক অতি মধুর। এবং এদের ডাক শুনলে সহজেই মন উতলা হয়ে ওঠে।

চৈত্র বৈশাখ মাসে লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাখিদের মধ্যে বাসা বাঁধার ধূম পড়ে গেছে। সব পাখিরা যখন এ কাজে ব্যস্ত, তখন কোকিল গাছের ডালে বসে একমনে গান করে যায়। পৃথিবীর অন্য কোন দিকে যেন তার খেয়াল নেই। কোকিলকে কখনও বাসা বাঁধতে দেখা যায় না।

কোকিল দেখতে অবিকল কাকের মতো কালো। কিন্তু কাকের মতো কোকিলের কণ্ঠস্বর কর্কশ নয়। কোকিল তার সুমিষ্ট স্বরের জন্য সকলের নিকট প্রিয়। স্ত্রী কোকিলের রং অনেকটা ধূসর। কাক কোকিলের মধ্যে সব সময়ই ঝগড়া হয়। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো কাকই কোকিলের বাচ্চাকে পালন করে। কি করে তা সম্ভব বলছি।

ডিম পাড়ার সময় হলে স্ত্রী কোকিল কাকের বাসার আশেপাশে লুকিয়ে থাকে। আর পুরুষ কোকিল বাসার কাছে এসে গান জুড়ে দেয়। তখন কাক বাসা ফেলে কোকিলকে তাড়া করে। কোকিল এখন এইত চায়। সে কুক কুক শব্দ করতে করতে এদিক-ওদিক উড়ে চলে আর কাকও তার পিছে পিছে ছুটে চলে। এভাবে পুরুষ কোকিল কাককে বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ত রাখে। এই সময়ের মধ্যে স্ত্রী কোকিল কাকের বাসায় ঢুকে ডিম পেড়ে আসে। প্রয়োজন হলে কাকের ২।১টি ডিম ফেলে দিয়ে নিজের ডিমের জায়গা করে নেয়। কাক নিজের ডিম মনে করে তাতে তা দিয়ে যায়।

তারপর যখন বাচ্চা ফোটে তখন তার যত্ন নেয়। সে যে কোকিলের বাচ্চা পালন করছে তা সে মোটেই বুঝতে পারে না।

বাচ্চাগুলো একটু বড় হলেই তখন চিনতে পারে এবং ঠুকরিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ততদিনে বাচ্চা উড়তে শিখে যায়। তারা তখন পালিয়ে যায় এবং নিজেদের খাবার যোগাড় করে নেয়। কোকিল সাধারণত পোকা-মাকড় ইত্যাদি খেয়েই বেঁচে থাকে। পাকা বটফল এদের প্রধান খাদ্য।

## দূষিত উদরাময়

এই রোগ এক রকম বীজাণু থেকে উৎপন্ন হয়। এটি অত্যন্ত সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধি। গৃহপালিত কোকিল পাখিদের মধ্যে এই রোগ প্রায়ই দেখা যায়।

সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও দূষিত জল খেয়ে পাখিদের এই রোগ হয়ে থাকে। এই রোগে প্রায় শতকরা ৮০টি পাখির মৃত্যু হয়ে থাকে। এমন কি যে সকল পাখিদের মধ্যে এই রোগ হয়, সে সকল স্থানে যদি অন্যান্য সুস্থ পাখি থাকে তবে তাদেরও এই মারাত্মক ব্যাধি হতে পারে। কেননা এটি খুবই মারাত্মক রোগ। এই রোগের বীজাণুসমূহ পাখির মলের সাথে বিশেষভাবে সংযোজিত থাকে। এই সমস্ত রোগ একবাব হলে নিরাময়ের আশা খুবই কম থাকে। এমনকি ২।৩ দিনের মধ্যে পাখির মৃত্যুও হতে পারে।

### রোগের লক্ষণ

এই বোগে আক্রান্ত হলে পাখি হঠাৎ বার বার পাতলা পায়খানা করে। পাখি যা খায় মলেব সাথেও ঠিক তাই পড়ে। খাদ্য দ্রব্য হজম করতে পারে না। খাওয়ার সে রকম স্পৃহা থাকে না, পেটে অস্বস্তি বোধ করে। অত্যন্ত পিপাসা হয়। পাখি সব সময় বিমর্ষভাবে চোখ বুজে থাকে। ডানা ঝুলে পড়ে, গায়ের পালকগুলি স্ফীত হয় ও মাথা নিচু করে স্তব্ধভাবে পা গুটিয়ে বসে থাকে। পাযেব সন্ধিস্থানে অত্যন্ত বেদনা হওয়ার দরুণ দাঁড়াতে বা চলতে পারে না এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়।

### চিকিৎসা

১। এক ফোঁটা ক্লোবোডাইন (Chlorodyne) জলে গুলে পাখিকে খাওয়ালে উপকাব হয।

২। লেবুর রস, বীট লবণ জলে গুলে খাওযালে উপকাব হয।

৩। ৫।৬ ফোঁটা চুনের জল খাওযানো যেতে পারে।

৪। কার্বলিক অ্যাসিড অবস্থা ভেদে ২ থেকে ৫ ফোঁটা জলে গুলে খাওয়ালে উপকার হয়।

৫। খুব সামান্য পটাস পারম্যাঙ্গানেট জলে গুলে সেই জল কয়েক ফোঁটা করে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

পাখিকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত কিছু না খাওয়ানো উচিত।

**সাবধানতা :** যখন একটা পাখির এ অবস্থা হয় তখন উক্ত পাখিকে দলের অন্যান্য পাখি থেকে দূরে থাকতে দেওয়াই উচিত। এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়মিত খাওয়াতে হবে। আর কার্বলিক অ্যাসিড বা ফিনাইল জলে গুলে তাই দিয়ে পীড়িত পাখির বাসস্থান ও খাদ্য রাখার জায়গা ধুয়ে দেওয়া উচিত।

### সর্দি

ঠাণ্ডা লাগলে, বৃষ্টিতে ভিজলে ভেজা জায়গায় কিংবা প্রবল শীতে থাকলে পাখিদের এ রোগ হয়।

## রোগের লক্ষণ

সর্দি হলে পাখি অনবরত হাঁচতে থাকে। সমস্ত গায়ের পালক স্ফীত হয়ে থাকে। খাওয়াতে কোন রুচি থাকে না। চোখ ও নাক থেকে অনবরত এক রকম আঠার মতো স্রাব বের হয়।

## চিকিৎসা

পাখির দেহে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে নজর দিতে হবে।

| | |
|---|---|
| সরষের তেল | ৪ ফোঁটা |
| আদার রস | ২ ফোঁটা |
| রসুন রস | ২ ফোঁটা |

এগুলি একত্রে মিশিয়ে নিয়ে অর্ধেক করে ২বার খাওয়ালে সর্দি রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

## সন্ন্যাস

এটি অতি মারাত্মক রোগ। অত্যন্ত গরম, খুব রোদ লাগা, মাথায় আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে মাথায় রক্তাধিক্য বশতঃ পাখিরা হঠাৎ মারা যায়। অথবা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে।

## চিকিৎসা

১। এই রোগ দেখা দেওয়া মাত্র মাথায় বরফ কিংবা ঠাণ্ডা জল দিলে বিশেষ উপকার হয়।

২। সামান্য এপ্‌সম সল্ট জলে মিশিয়ে পান করালে বিশেষ উপকার হয়।

৩। এক গ্রেন পটাশ ব্রোমাইড জলে গুলে পান করালে উপকার হয়ে থাকে।

## যক্ষ্মা

এই রোগটি সব পাখিরই হতে পারে; সেজন্য এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হচ্ছে।

এই রোগ বীজাণু থেকে উৎপত্তি হয়। এ রোগ মানুষ থেকে পশুপক্ষীদের এবং পশুপক্ষী থেকে মানুষদের আক্রমণ করতে পারে। যে সকল পাখি রোদে ও মুক্ত বায়ুতে ইচ্ছামতো বিচরণ করতে পারে না, তাদের মধ্যেই এ রোগ দেখা যায় এবং অস্বাস্থ্যকর জায়গায় অনেক পাখির একসাথে বাস করার জন্য এই রোগ হতে দেখা যায়।

## রোগের লক্ষণ

এই রোগ অতি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়। প্রথম অবস্থায় এর লক্ষণগুলি প্রায়ই অপ্রকাশিত বা লুক্কায়িত থাকে। যখন রোগ পরিপক্ক হয় তখন পাখিদের অসুস্থতার চিহ্নগুলি দেখা যায়; যথা—মুখ বিবর্ণ হয়, মাংস ক্ষয় হয়। অত্যন্ত দুর্বল ও শীর্ণ হয়। শরীরের ওজন কমে যায়। গায়ের পালকগুলি স্ফীত করে বিমর্ষভাবে বসে থাকে। সামান্য সর্দি ও খাদ্যে অরুচি হয়, কখনও কখনও পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে।

### চিকিৎসা

এই রোগ বেশি দিনের হলে চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। যাতে পাখির দেহের ওজন না কমে, বলক্ষয় না হয়, সে রকম চেষ্টাই করা উচিত। একটি পাখির এই রোগ হয়েছে জানতে পারলে তাকে তৎক্ষণাৎ দল থেকে পৃথক করা উচিত। একটি পাখির এই রোগ হলে সে যদি অন্যান্য পাখিদের মধ্যে থাকে তবে অন্যান্য পাখিদেরও এই রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

এই রোগগ্রস্ত পাখির খাওয়ার সাথে কিছু কিছু কডলিভার অয়েল, মাখন দুধ ও টাটকা শাক-সবজি ও ফল খেতে দিলে এবং রোদ ও মুক্ত বায়ুতে রাখলে বিশেষ উপকার হয়। ফিনাইল কিংবা কার্বলিক অ্যাসিড জলে গুলে তাই দিয়ে অসুস্থ পাখির বাসা ধুয়ে দেওয়া উচিত।

## কাকাতুয়া

কাকাতুযার গায়ের রং ধবধবে সাদা। মাথায এদের মস্ত বড় ঝুঁটি থাকে। এরা ৩০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

কাকাতুয়া দাঁড়ে পোষা হয়। এরা বিভিন্ন জাতের হয়। দেশী, অস্ট্রেলিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের কাকাতুয়া দেখা যায়। বিলিতি কাকাতুয়া আকারে বড়।

কাকাতুয়া সুন্দর কথা বলতে পারে।

এবা চাল, ছোলা, ডালভাজা, কলা ইত্যাদি খুব খেতে ভালোবাসে।

### আমাশয়

অপরিষ্কার ভিজে ও স্যাঁতসেতে জায়গায় থাকা দূষিত বা পচা খাদ্য খাওয়া, অপরিষ্কার ময়লা জল পান করা, খাদ্যবস্তু হজম না হওয়া ইত্যাদি নানা কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। বাচ্চা পাখিদের সময়ে সময়ে আমের সাথে রক্তও বের হয়।

### চিকিৎসা

| | |
|---|---|
| অলিভ অয়েল | ১ আউন্স |
| ইউক্যালিপটাস অয়েল | ১ ড্রাম |
| ক্রিয়োজোট | ১ ড্রাম |

উপরের ওষুধগুলি একসাথে মিশিয়ে বয়স্ক পাখিদের চায়ের চামচের ১ চামচ এবং বাচ্চা পাখিদের ½ চামচ পরিমাণে প্রতি দশটি পাখির খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

### পেটের অসুখ

সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সময়ে খাওয়ার গোলমালে, অতিরিক্ত খেলে, অখাদ্য খেলে, খাদ্যবস্তু হজম করতে না পারলে, একঘরের মধ্যে অধিকসংখ্যক পাখি ঠাসাঠাসি করে রাখলে পেট গরমে এ রোগ হতে পারে।

### চিকিৎসা

সাধারণ পেটের অসুখে পাখিকে ঘোল খাওয়ালে উপকার হয়। এ সময়ে এদের খাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এক ড্রাম মেডিসিনাল ক্রিয়োজোট ও তিন আউন্স অলিভ অয়েল একসাথে খাওয়ালে উপকার হয়।

### উঁকুন ও আঁটুলি

এই দুটি বড় সাংঘাতিক রোগ। এই রোগ হলে পাখিদের বাঁচানো মুস্কিল হয়ে পড়ে।

উকুন নানা জাতের আছে। আঁটুলিও সাংঘাতিক রোগ। এ রোগ হলে পাখিদের গা থেকে এদের তাড়ানো প্রায় অসম্ভব। একমাত্র কেরোসিন তেলের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে লাগালে বা কিটিংকস্ পাউডার ও সোডিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে চান করালে উপকার হয়ে থাকে।

### বাত

এদের প্রায়ই বাত রোগ হয়ে থাকে। এই রোগ হলে এরা চলাফেরা করতে পারে না। এই সময়ে এদের একটু সাবধানে রেখে শুশ্রুষা করতে হয়।

বাত রোগে বাতযুক্তস্থানে তার্পিন তেল মালিশ করলে দ্রুত আরোগ্যলাভ করে।

এ ছাড়া অন্যান্য রোগে চন্দনার মতো চিকিৎসা। এ বিষয়ে আগে বলা হয়েছে।

## মুনিয়া ও চুনিয়া

এরা দুই জাতের ছোট ছোট পাখি। এরা সরু চাল বা এক ধবনের ছোট ছোট দানা খায়।

এরা নানা রংয়ের হয়। হলদে, লাল, কালো, খয়েরি ইত্যাদি নানা রংয়ের মিশ্রণে এরা হয়ে থাকে।

এরা পোষ মানে, কিন্তু কোন মানুষের স্বর অনুকরণ করতে পারে না।

### রোগ ও চিকিৎসা

এদের রোগ ও চিকিৎসা অনেকটা ময়না পাখির মতো। শুধু এদের বিষয়ে কিছুটা নতুনত্ব হচ্ছে—এদের রোগ হলে ওষুধের পরিমাণ অনেকটা কম দিতে হবে।

এদের রোগ হলে ধরা খুবই মুস্কিল। তাই রোগ সামান্য প্রকাশ হতে না হতেই এরা মারা যায়। তাই এদের প্রতিপালন ও চিকিৎসা খুব সাবধানে করা উচিত।

মুনিয়া ও চুনিয়া খাঁচার ভিতরেই অনেক সময় ডিম পাড়ে। এক একটি বড় খাঁচায় ৮।১০টি পর্যন্ত পাখি পোষা যায়।

## গিনি ফাউল

এটি বিদেশী পাখি হলেও আজকাল আমাদের দেশেও অনেকেই এই পাখি

পালন করেন। এই পাখিটির আদি জন্মস্থান হলো আফ্রিকা। দেখতে অনেকটা মুরগির মতো ও নানা রংয়ের হয়।

## আহার

এরা ঘুরে ঘুরে পোকা-মাকড়ই খেয়ে থাকে। তবে এদের আবদ্ধ পরিবেশে রাখলে ধান, যব, ছোলা, গম প্রভৃতি খেতে দিতে হয়। ক্ষেত চাষিদের পক্ষে এই পাখি খুব উপকারী বলা যায়; কারণ তাঁরা ক্ষেতে যা শাক-সবজি চাষ করেন, যদি সেই শাক-সবজিতে পোকার আক্রমণ ঘটে সেখানে এই পাখিকে ছেড়ে দিলে সমস্ত পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলে, ফলে ক্ষেতের সবজি নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

## জনন নীতি

গিনি ফাউল ডিম দেয় কিন্তু হাঁস-মুরগির মতো তা দিতে পারে না। এজন্য মুরগির বা হাঁসের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এবা ডিম লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, এটা এদের বিষম দোষ। ডিম দেওয়ার সময় এদের বাসস্থানে শুকনো ঘাস বা খড় বিছিয়ে দিতে হবে। ডিম ফুটতে প্রায় ২৬।২৭ দিনের মতো সময় লাগে। বাচ্চা হবার ২দিন পর বাচ্চাদের খেতে দিতে হয়। এ বিষয় মুরগির বাচ্ছা পালন বিধি অনুযায়ীই হবে। গিনি ফাউলের মাংস খুব সুস্বাদু। দেড় বছর বয়সের গিনি ফাউলের ডিম থেকে বাচ্চা তোলা উচিত।

এদের বিশেষ রোগ-ব্যাধি হয় না। যদি এরা কোন সময় কোন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তাহলে এদের বাঁচানো খুবই শক্ত। মুরগির চিকিৎসা অনুরূপেই এদের চিকিৎসা হবে।

# মৌমাছি পালন

যদিও প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে মৌমাছি পালন হয়ে আসছে। তবে সেটা ঠিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে হতো না। আমাদের শাস্ত্রে মধু একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিভিন্ন যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদিতে মধু একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু; তাছাড়া মধুর খাদ্যগত প্রাণশক্তি যে কত বেশি তা সেকালেও সাধারণ মানুষের কাছে অজানা ছিল না।

মোমাছিদের মৌচাকের একটি অংশ

আজকাল মৌমাছি পালন একটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধর্তিতে হচ্ছে বলে এ বিষয়ে বিশদ জ্ঞানলাভ করা বাঞ্ছনীয়।

মৌপালন করতে হলে মৌমাছিদের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ভালোভাবে জ্ঞাত হতে হবে। প্রথমে যদি তাদের সম্বন্ধে ভালো করে জানতে পারি, তাহলেই ঘরোয়া পরিবেশে অতি সহজেই মৌপালন করা সম্ভব।

**মৌমাছির জাতি বিভাগ ঃ** মৌমাছি সাধারণতঃ পাঁচ রকমের হয়ে থাকে; যথা—(১) এপিস্ ডোরসাটা (২) এপিস্ ইন্ডিকা (৩) এপিস্ ফ্লোরেয়া (৪) ম্যালিফেরার (৫) টিরগোনা। এদের মধ্যে এপিস্ ধরনের মৌমাছিই প্রকৃত মধুদায়ক মৌমাছি।

বিভিন্ন জাতির মৌমাছির আকার, প্রকৃতি, মৌ-উৎপাদন, মৌচাকের আয়তন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

মৌ পালকের পক্ষে তাই বিভিন্ন শ্রেণীর মৌমাছিদের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় মৌপালকেরা সাধারণত এপিস্ ইন্ডিকা জাতীয় মৌমাছি পালন করে থাকে। এটিকে এক শ্রেণীর পার্বত্য দেশে পাওয়া যায়। আর এক শ্রেণী সমতল ভূভাগে (Plains) পাওয়া যায়। নানা পার্বত্য দেশে বা নানা সমতল প্রদেশে এপিস্ ইন্ডিকা বিভিন্ন জাতের হয়ে থাকে। কিন্তু এদের সঠিক শ্রেণী বিভাগ হয় নি।

যে অঞ্চলে যে রানী মৌমাছি পূর্ব বছরে সব থেকে বেশি মধু দিয়েছে সেই অঞ্চল থেকে মধু ও রানী মৌমাছি যোগাড় করা উচিত।

যদিও মধু সংগ্রহই মৌমাছি পালনের মূল উদ্দেশ্য তা সত্ত্বেও মৌচাক থেকে যে মোম পাওয়া যায় মৌপালনে তারও একটা বিশেষ দান আছে। এপিস্ ইন্ডিকা জাতীয় মৌমাছি ম্যালিফেরার চেয়ে মধু কিছুটা কম দিলেও মোম উৎপাদন করে বেশি। তা ছাড়া তাদের পালন করতে ঝামেলা অনেক কম হয়। তাই ভারতীয় মৌপালকেরা এদের এত বেশি পছন্দ করে।

**শ্রেণী বিভাগ ঃ** প্রত্যেক জাতীয় মৌমাছিব মধ্যে আবাব তিনটি শ্রেণী আছে।

বানী মৌমাছি

পুরুষ মৌমাছি

শ্রমিক বা কর্মী মৌমাছি

(১) বানী মৌমাছি অর্থাৎ মৌচাকের কেন্দ্র।
(২) শ্রমিক মৌমাছি—যাবা মৌ সঞ্চয় কবে।
(৩) পুরুষ-মৌমাছি—যাবা বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য কবে।

## রানী মৌমাছি

মৌচাকের অবস্থা বুঝে বানী মৌমাছিবা পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ ডিম পেড়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গ ডিম থেকে জন্ম হয স্ত্রীব, এবং অপূর্ণাঙ্গ থেকে জন্মে পুরুষ।

পুরুষ মৌমাছিবাই বংশ বৃদ্ধিতে সহাযতা কবে এবং স্ত্রী মৌমাছিবাই শ্রমিক মৌমাছিতে পরিণত হয।

বিভিন্ন ধরনের প্রকোষ্ঠে তাদেব জন্ম হয়। পুরুষদেব প্রকোষ্ঠের আকার শ্রমিকদের থেকে বড় হয়। কিন্তু বানীই হল স্ত্রী মৌমাছিদের ঝাঁকের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি। এদের আকৃতি বেশ বড় ধরনের হয। ছয়টি কোষযুক্ত একটি প্রকোষ্ঠে জন্ম নেয। মৌচাকেব নিম্নদিকে প্রকোষ্ঠটি থাকে এবং নিচের দিকে খোলা থাকে। লার্ভা (Larva) অবস্থায় রানী মৌমাছি বিশেষ ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য বেশি পরিমাণে খেয়ে থাকে। সেই কারণেই এরা তখন আকারে বেশ বড় ও হৃষ্টপুষ্ট হয়।

মৌচাকে রানীর একমাত্র কাজ হলো ডিম পাড়া। রানীর জীবনে মাত্র একবার প্রজনন ঘটে থাকে যদিও সারা জীবন ধরে সে নিয়মিতভাবে পর পর ডিম পাড়ে। মৌমাছি হবার চতুর্থ থেকে দশম দিনের মধ্যে রানীর প্রজনন ঘটে থাকে—রানী দিনে তিনশো থেকে এগারশো ডিম পাড়ে। যখন সে ডিম পাড়ে, তখন কতকগুলি

শ্রমিক মৌমাছি এগুলি দেখাশোনা করে থাকে এবং তার খাওয়া ইত্যাদির দিকে বিশেষ যত্ন নেয়। রানী কিন্তু দল ছাড়া একা চাক ছেড়ে বাইরে বের হয় না।

রানীর জীবন আড়াই থেকে তিন বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যখন তার ডিম পাড়ার ক্ষমতা কমে আসে তখন শ্রমিকেরা তাকে মেরে ফেলে। একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে বায়ুবিহীন অবস্থায় রেখে রানীকে মেরে ফেলা হয় এবং তারপর তার দেহ বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হয়। মৌমাছিরা কখনও দংশন করে রানীকে মারে না। রানীর মৃত্যুর পর নতুন ডিম থেকে প্রস্ফুটিত পূর্ণাঙ্গ নতুন রানীর জন্ম হয়। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মে এটিই ঘটে, তবু কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি পালন করতে হলে প্রত্যেক বছরে নতুন রানী মৌমাছির জন্ম দেওয়া ভালো।

## শ্রমিক মৌমাছি

শ্রমিকেরা হলো অপূর্ণাঙ্গ স্ত্রী মৌমাছি। তাদের জীবনে কখনও সঙ্গম ঘটে না বা তারা ডিম পাড়ে না। অবশ্য কোন কারণে রানীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে পূর্ণাঙ্গ একটি শ্রমিক থেকে অনেক সময় নতুন রানী নির্বাচিত করা হয়। পুরুষ মৌমাছির সঙ্গে এই নতুন শ্রমিক রানী মৌমাছির মিলনের পর তারা ডিম পেড়ে থাকে। এই ধরনের শ্রমিক রানী মৌমাছিকে কিন্তু দীর্ঘদিন স্থায়ী পদে রাখা হয় না। কিছুদিন রানীর পদ অধিকার করার পর নতুন রানীর জন্ম হলে এই সাময়িক নতুন রানীকে অবসর দেওয়া হয়। সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এরা এই পদে অধিষ্ঠিত থাকে। শ্রমিক মৌমাছিরা সাধারণত চার পাঁচ মাস বাঁচে। এরা একনাগাড়ে প্রায় দুই মাইল পর্যন্ত উড়তে পারে। একটি চাকে সাধারণত পাঁচ থেকে পঞ্চাশ হাজার মৌমাছি থাকতে পারে। সাধারণত ছয় থেকে সাত হাজার মৌমাছির ওজন আধ কেজি মতো হয়। চাকের অবস্থা আর মৌমাছিদের বয়স অনুপাতে তাদের মধ্যে কাজের বিভাগ হয়ে থাকে।

সাধারণত কিশোর মৌমাছিরা চাক পরিষ্কার করা, বেশি দিনের লার্ভাদের খাওয়ানো এবং এই ধরনের হালকা কাজ করে। তারা আর একটু বড় হলে তাদের গ্রন্থিগুলি সতেজ হয় এবং তা থেকে নিঃসৃত রস লার্ভাদের খাওয়ায়। এই মৌমাছি লার্ভাদের সেবা করে বলে এদের সেবিকা মৌমাছি বলা হয়।

জন্মের পর প্রথম পনেরো কুড়ি দিন মৌমাছিরা বিশেষ বাইরে বের হয় না। তারা চাকের ভেতরের কাজকর্ম করে। বাইরে উড়ে মধু সংগ্রহের ক্ষমতা তাদের থাকে না। যদি নেহাৎ প্রয়োজন পড়ে মৌচাকে মৌমাছির সংখ্যা কম থাকে তবে এই বাচ্চা মৌমাছিরা মৌচাকের কাছাকাছি দূরত্বে উড়ে যায় এবং জল বয়ে আনা, পরাগ সংগ্রহ করা প্রভৃতি কাজ করে।

সাধারণ অবস্থায় জন্মের কুড়ি দিন পর থেকে শ্রমিক মৌমাছিগুলি ফুলের পরাগ সংগ্রহ করে এনে মৌচাকে জমা করে। এই পরাগ থেকেই মধু তৈরি হয়। এই মধু মৌচাকের বন্ধ করা কোষে জমা করা হয়। এই মধু খেয়েই ছোট ছোট মৌমাছিগুলি বেড়ে ওঠে।

শ্রমিক মৌমাছিদের গ্রন্থি থেকে এক ধরনের রস নিঃসৃত হয়। এই রস থেকেই মোম তৈরি হয়; আর এই মোম দিয়েই মৌচাক গঠিত হয়।

## পুরুষ মৌমাছি

একটি মৌচাকে দুশো থেকে চারশো করে পুরুষ মৌমাছি থাকে। সাধারণত রানীর প্রথম জীবনে ডিম্ব উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যে প্রজনন প্রয়োজন তাই এদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন মৌচাকে খাদ্য কম পড়ে এবং এদের আর প্রয়োজন থাকে না। তখন এদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এদের খাদ্যাভাবেই মৃত্যু ঘটে।

পুরুষ মৌমাছির সঙ্গে রানীর প্রজনন ঘটে উড়ন্ত অবস্থায়। সঙ্গমের সময় পুরুষ মৌমাছিটির পেট ফেটে তার মৃত্যু হয়।

## মধুর খাদ্যগত গুণ

মৌমাছিরা ফুল থেকে যে পরাগ বা রেণু সংগ্রহ করে সেটা হচ্ছে অনেকটা জলে গলা এক ধরনের শর্করা জাতীয় পদার্থ। এবং তার সঙ্গে খুব সামান্য লবণ জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। মৌমাছি তাদেব শরীরের এক বিশেষ রসের সাহায্যে এত কিছু পরিবর্তন ঘটায় এবং তা মৌচাকে জমা হয়।

মৌচাকে সঞ্চিত হওয়ার পর সেটা আরো কিছু পরিবর্তিত হয়ে মধুতে পরিণত হয়। উৎকৃষ্ট মধু থেকে সুন্দর গন্ধ বেরোয়। এর স্বাদ মিষ্ট, রং চকচকে ও স্বচ্ছ হয়।

উৎকৃষ্ট মধুর মধ্যে কি কি বস্তু পাওয়া যায় তার তালিকা দেওয়া হলো—

| বস্তু | শতকরা অংশ |
|---|---|
| জলীয় অংশ | ১৯.১০ |
| সুক্রোজ (এক ধরনের চিনি) | ০.৮৫ |
| পরিবর্তিত শর্করা জাতীয় অংশ | ৭৯.৯১ |
| ডেক্সট্রিন | সামান্য |
| এলবুমিন | ১.১৮ |
| সালফেট | সামান্য |
| ক্লোরাইড | .০৮ |
| অম্ল জাতীয় অংশ | .০.২৩ |

শরীরের গঠন এবং তেজ ও শক্তির বৃদ্ধির জন্য মধু একটি উত্তম খাদ্য। শিশু এবং বৃদ্ধ বয়সের লোকদের পক্ষে এটি তেজবর্ধক ও শক্তিবর্ধক খাদ্য। এক পাউন্ড মধুতে প্রায় ১৬ শত ক্যালরি খাদ্যপ্রাণ থাকে। মধু অত্যন্ত সহজেই হজম করা যায় এবং এটি প্রত্যক্ষভাবে রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরের শক্তি যোগায়।

মোম যদিও একটি অপ্রত্যক্ষ উৎপাদিত বস্তু তবুও'এর যথেষ্ট মূল্য আছে। বড় বড় অনেক শিল্পে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। বিভিন্ন কসমেটিক ও পালিশের

কাজেও মোম প্রয়োজন হয়। সাধারণত ১৪৫° থকে ১৫০° ডিগ্রি উত্তাপে মোম গলে যায়।

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন মৌপালন কেন্দ্রে খবর নিয়ে জানা গেছে যে প্রতি মৌচাকে গড়ে ৪ থেকে ৫ পাউণ্ড করে মধু উৎপাদন হয়। উত্তর ভারতের বিভিন্ন মৌচাকের মধু উৎপাদন অনেক বেশি। এখানে গড়ে মৌচাক পিছু ১২ থেকে ১৫ পাউণ্ড মধু উৎপন্ন হয়।

কোন কোন মৌপালকের মতে ভালোভাবে পরিশ্রম করলে প্রতি মৌচাকে বছরে ৩০ থেকে ৪০ পাউণ্ড মধু উৎপন্ন করা যেতে পারে। বাংলা, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের কোন কোন মৌচাকে বছরে ৫০ থেকে ৭০ পাউণ্ড পর্যন্ত মধু পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।

এখানে একটা মজার কথা বলা হচ্ছে—তা হলো, একটি চাকে ১ পাউণ্ড মধু উৎপন্ন করতে মৌমাছিদের অন্তত পঁচিশ হাজার বার বাইরে থেকে পরাগ এনে সংগ্রহ করতে হয়।

## মধু সঞ্চয়ের কেন্দ্র

যে সমস্ত গাছ মধু সঞ্চয়ের পক্ষে উপযোগী তারা উদ্যানের পালিত গাছ অথবা বুনো জংলা গাছও হতে পারে। কি কি গাছ থেকে মধু সঞ্চয় করা যায় তার বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

১। **ফলের গাছ ঃ** সব জাতের লেবু, সরবতী লেবু, বাতাবী লেবু, কমলালেবু, আপেল, পেয়ারা, জাম, আম, সবেদা, তেঁতুল, খেজুর, কলা, নারকেল, লিচু, আতা, আনারস প্রভৃতি ফল গাছ থেকে মধু উৎপন্ন হয়।

২। **চিরস্থায়ী বৃক্ষ ঃ** শাল, তমাল, দেবদারু, শিমূল, শিশু, অশোক, নিম, অর্জুন, আমলকী, ঢাক, তুন, ইউক্যালিপটাস, চন্দন, চেরি প্রভৃতি বিভিন্ন চিরস্থায়ী বৃক্ষ থেকে মধু উৎপন্ন হতে পারে।

৩। **ঝোপ ও জংলা গাছ ঃ** বিভিন্ন ধরনের বুনো জংলা গাছ।

৪। **বিভিন্ন শস্যের গাছ ঃ** বিভিন্ন জাতের শস্যের গাছ থেকেও মধু উৎপন্ন হয়। যেমন— ধান, পাট, যব, গম, তিসি, অড়হড়, ছোলা, মটর, বাদাম, মুগ, কলাই, সরষে, আদা প্রভৃতি।

৫। **শাকসবজির গাছ ঃ** যেমন মুলো, গাজর, শালগম, বীট, কপি, ঢ্যাড়স, শশা, লেটুস, পালং, ওলকপি, পটল, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি।

৬। **বিভিন্ন ফুলের গাছ ঃ** গোলাপ, যুঁই, চামেলি, সূর্যমুখি, রজনীগন্ধা, বেল, টগর, কলকে, জবা, চাঁপা, পদ্ম, শাপলা, ডালিয়া, করবী, অপরাজিতা, দোলন চাঁপা, কলাবতী প্রভৃতি।

বিভিন্ন গাছ কিংবা বিভিন্ন ফুল ফলের পরাগের পরিমাণ সবদেশে সমান হয় না। এটি নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের মৃত্তিকার উপর। এক এক দেশের মৌচাকের

মধুর পরিমাণ এক এক রকম হয়—এর কারণই হলো বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকা বিভিন্ন প্রকৃতির।

## কৃত্রিম মৌচাক

বৈজ্ঞানিক উপায়ে মধু চাষের জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে কৃত্রিম মৌচাক। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে মৌচাক তৈরি করতে হয়। সকল মৌচাকের একটি সাধারণ গঠন প্রণালী আছে। মৌচাকের মধ্যে মৌমাছিরা মোম বিহীন যে ফাঁকটুকু রাখে তার উপর ভিত্তি করেই আধুনিক কালে ফ্রেমের ওপর নকল মৌচাক সৃষ্টি করা হয়। এক একটি ফাঁকের আয়তন $\frac{৩}{১৬}$" থেকে $\frac{১}{৪}$" ইঞ্চি।

সাধারণত যে মৌচাকগুলি ব্যবহার করা হয় তাদের ওপরের দিক খোলা থাকে ও চাকের গর্তগুলি সোজা নিচের দিকে নেমে যায়। এক্ষেত্রে একটি দেওয়াল যুক্ত মৌচাক বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ এগুলিব ব্যবহার করা খুব সুবিধাজনক। দুটি দেওয়াল যুক্ত মৌচাক অত্যন্ত দামী, ভারি ও নাড়া চাড়া করতে অসুবিধা জনক বলে বেশি ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু শীত প্রধান দেশে এগুলি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাব কারণ হলো সেখানে অতিবিক্ত ঠাণ্ডার জন্যে দুই দেওয়াল যুক্ত চাক ছাড়া মৌমাছিদের রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

কোন কোন পার্বত্য অঞ্চলে মৌপালকেরা দালানের গায়ে সংযুক্ত বিশেষ ধরনের কৃত্রিম মৌচাক ব্যবহার করে থাকে কিন্তু কতকগুলি কারণে এগুলি ব্যবহার করা অসুবিধা জনক বলে এগুলি বেশি পবিমাণে ব্যবহৃত হয় না।

দশটি ফ্রেমযুক্ত সাধারণ মৌচাকগুলি আজকাল বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। মৌচাকে ডিম পাড়ার কক্ষটিব আয়তন কতটা হওয়া উচিত সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

সাধারণত বিভিন্ন দেশের অবস্থা অনুযায়ী মৌচাকের আকারে, ফ্রেমের সংখ্যা ইত্যাদি বিশেষ ধবনের হবে থাকে।

ডিম পাড়ার কক্ষও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার হয়। রানীর ডিম পাড়বার ক্ষমতা ও দেশের অবস্থা অনুযায়ী কক্ষটিব আয়তন বিভিন্ন প্রকার হয়। এটি বেশি ছোট হলে সেই চাকের ঠিকমতো বৃদ্ধি হয় না, আবার বেশি বড় হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়।

### মৌচাকের সাধারণ মাপ

| বিভিন্ন দেশ | ফ্রেমের সংখ্যা | আয়তন | ডিম্বকক্ষের আয়তন |
|---|---|---|---|
| দক্ষিণ ও মধ্য ভারত এবং সমতোল ভূমি | ৭টি | ৮$\frac{১}{২}$"×৫$\frac{৩}{৪}$" | ৬৬৪ বর্গ ইঞ্চি |
| কুমায়ুন পর্বত ও যুক্তপ্রদেশ | ৮টি | ১২"×৭" | ১৩৪৪ বর্গ ইঞ্চি |
| কাশ্মীর ও পাঞ্জাব | ১১টি | ১৭"×৯" | ২৪৪৪ বর্গ ইঞ্চি |
| ভারতের অন্যত্র | ১১টি | ১৪"×৮$\frac{১}{২}$" | ২৩৪০ বর্গ ইঞ্চি |

## মৌচাক প্রতিপালন

মৌপালনের বিধি-নিয়মগুলি সাধারণত এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের হয়। সেটা নির্ভর করে স্থানীয় জলবায়ু ও সেই পালকদের উপরে। যেমন কোনও অঞ্চলে প্রচুর ফুল থাকলেও আবহাওয়া হয়ত খুব ঠাণ্ডা—সেখানে ঠাণ্ডার জন্যে মৌমাছিদের মধু সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। আবার কোনও অঞ্চলে হয়ত ঠাণ্ডা কম—সেখানে ফুল অপেক্ষাকৃত কম হলেও মধু সঞ্চয়ে অসুবিধা হয় না।

আবহাওয়ার বিভিন্নতার জন্য মৌপালনে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া এবং ফুলের সংখ্যাও বিভিন্ন। তাই মৌপালনের সাধারণ নিয়ম কানুনগুলিও এদেশে বিভিন্ন। মৌপালনের সাধারণ নিয়ম কানুনগুলি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। কিন্তু মৌমাছিদের প্রকৃতি সব জায়গাতেই এক। সেইজন্য কয়েকটি সাধারণ নিয়মের কথা বলা হলো।

১। যখন কোন জায়গায় বেশি ভালো ফুল ফোটে তখন চাকে বেশি মৌমাছি রাখতে হয়। আর যতদিন ঐ ফুলের সংখ্যা বেশি থাকে ততদিন মৌমাছির সংখ্যা যেন মোটামুটি একই রকম থাকে।

২। নির্দিষ্ট স্থানে কখন কি রকম আবহাওয়ার প্রবাহ চলে সে বিষয়ে ভালোভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৩। নানা প্রকার ফুল এবং তার মধ্যে কোন্ কোন্‌টি মৌমাছি খাদ্যের সাহায্য করে, সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা উচিত।

৪। কোন্ স্থানে কোন্ ধরনের ফ্রেমে মৌপালন ভালো হবে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়; তবে অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে সাহায্য করে।

## অতিরিক্ত মৌমাছি জমায়েত ও প্রতিক্রিয়া

সাধারণ ভাবে মৌমাছিরা একটি ভালো চাক দেখলেই সেখানে দলবদ্ধভাবে জমায়েত হয়। বিশেষ করে যে অঞ্চলে কাছাকাছি প্রচুর ফুল-ফল গাছ রয়েছে, সেখানে মৌমাছিরা জমায়েত হতে বাধ্য। সাধারণত একদল মৌমাছির ওজন হয় দেড় থেকে তিন পাউণ্ড। দলবদ্ধভাবে মৌমাছিদের থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একই স্থানে অতিরিক্ত পরিমাণে মৌমাছি জমলে তা ক্ষতিকারকও হয়। এর ফলে চাকে বেশি মধু জমতে পারে না। আবার মৌমাছিরা প্রচুর পরিমাণে চাক থেকে উড়ে চলে গেলে তাতেও মধু সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যায়।

এর কারণ হলো শ্রমিক মৌমাছি সংখ্যায় কম থাকলে চাকে মধু কম জমতে বাধ্য। সেইজন্যেই মৌমাছিদের উড়ে যাওয়া বন্ধ করা উচিত। এর একমাত্র উপায় হলো শক্তিশালী রানীকে চাকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখা এবং ডিম পাড়ার কক্ষটিকে বড় এবং ভালো করা।

চাক থেকে মৌমাছিদের উড়ে যাওয়া বন্ধ করতে হলে যা করা উচিত তা হলো—

১। মৌমাছিদের উপযুক্ত পরিমাণ স্থান সংকুলান করতে হবে। বিশেষ করে যখন ফুল ফোটে, তখন এটি করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ মধু সঞ্চয়ের জায়গা যেমন বেশি দরকার হয়, তেমনি ডিম পাড়ারও বেশি জায়গার প্রয়োজন।

২। চাকগুলিকে রৌদ্র থেকে রক্ষা করতে হবে। সাধারণত গাছের ছায়ায় বা ছাদের নিচে চাকগুলি রাখা উচিত।

৩। প্রতি বছর নতুন রানীকে চাকে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

৪। রানীর একদিকেব দুটি ডানাই অন্ততঃ তিনভাগের একভাগ ক রে কেটে দিতে হবে। তা হলে কর্মীদেব নিয়ে রানী পালিয়ে যেতে পারবে না।

৫। প্রচুর খোলা বাতাসের প্রবাহ যেন চাককে স্পর্শ করে।

৬। যে সময় সাধারণত মৌমাছিরা উড়ে চলে যায়, তখন সপ্তাহে একবার করে চাকটি পরীক্ষা করতে হবে এবং নতুন রানী জন্মালে তাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

## চাকে ডাকাতি ও তার প্রতিরোধ

কখনও কখনও মৌমাছিবা কোন একটি চাকে হানা দিয়ে জোর কবে তাদের মধু সঞ্চয়টি কেড়ে নিয়ে যায়। কোন একটি চাকে একবাব অন্য একদল মৌমাছি হানা দিলে যদি তারা সফলকাম হয়, তবে বাব বাব তাবা এসে চাকে হানা দিয়ে মধু চুরি করে নিয়ে যাবে।

সাধারণত একদল মৌমাছি কোন একটি চাকে হানা দিলে চাকের মৌমাছিবা তাদের বাধা দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা কবে। দুই দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। যদি বাইরের দল হেরে যায়, তবে তারা আব কোনদিন সেই চাকে হানা দেয় না। কিন্তু তারা একবার ডাকাতি করতে সক্ষম হলে বার বার তারা এসে সেই চাকে হানা দেবে।

## ডাকাতি বন্ধ করার উপায়

ডাকাতি বন্ধ করার উপায় হলো—চাকে প্রবেশের পথ খুব ছোট করা। যদি প্রত্যেকটি কক্ষে প্রবেশের পথ দিয়ে মাত্র একটি করে মৌমাছি ঢুকতে পারে তাহলে ডাকাতি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। যখন একদল মৌমাছি চাক আক্রমণ করে, তখন চাকের শক্তিশালী মৌমাছিরা পথটি রক্ষা করে। তার ফলে বহিরাগত মৌমাছিগুলি চাকের মধ্যে ঢুকতে পারে না। এটা অনেকটা দুর্গের মতো কাজ করে।

## রানী মৌমাছি চাকে আছে কি নেই

রানী মৌমাছি চাকে আছে কি নেই এটা জানার উপায় হলো, নতুন কতকগুলি ডিম ও লার্ভা একটি চাকে রেখে দিতে হবে। যদি ঐ চাকে রানী মৌমাছি না থাকে তাহলে দেখা যাবে তাতে রানীর কক্ষ তৈরি হচ্ছে। আর যদি রানী চাকে থাকে তাহলে কক্ষ তৈরি হবে না।

## নতুন রানীকে চাকে প্রবেশ করানো

যে চাকে রানী নেই সেই চাকটির ধারে ছোট একটি কক্ষে নতুন রানীকে রেখে চাকটির মুখ চিনি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। পরে শ্রমিক মৌমাছিরা এসে ঐ চিনি খেয়ে নিয়ে রানীকে বের করে এনে সঠিক জায়গায় রেখে দেবে।

## মৌমাছিদের শত্রু ও প্রতিকার

মৌমাছিদের প্রধান শত্রু হলো এক ধরনের উইপোকা। এদের মধ্যে মেয়ে জাতের উইপোকারা শত শত ডিম পাড়ে। তা থেকে অজস্র উইপোকা জন্মায়। এরা চাক কেটে ধ্বংস করে ফেলে। এদের কবলে বহু মৌমাছি প্রাণ হারায়।

এদের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো চাককে শক্তিশালী করে রাখতে হবে।

মৌমাছিদের অপর শত্রু হলো বোলতা। এরা কাছাকাছি চাক বাঁধলে তা পুড়িয়ে দিলে মৌমাছিরা রক্ষা পায়। এছাড়া পাখিরা, কিছু কিছু কীট পতঙ্গও মৌমাছিদের ক্ষতি করে। এক ধরনের ভালুক সম্পূর্ণ চাকটি খেয়ে নেবার চেষ্টা করে। অবশ্য এসবের জন্য সাবধান হয়ে গেলে মৌমাছিদের রক্ষা করা যায়।

## আহার

মৌচাকে যখন মধু কমে যায় এবং ফুলও ঠিক মতো ফোটে না তখন মৌমাছিদের বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। মৌমাছিদের প্রধান এবং বিকল্প খাদ্য হলো চিনির জল। এছাড়া শুধু জলও এদের প্রধান খাদ্য বলা যায়।

এক ভাগ জলে দুই ভাগ চিনি দিয়ে চিনির জল তৈরি কবতে হয়। আবার কখন কখনও অবস্থানুযায়ী সমান সমান জল ও চিনি দিয়েও এটি তৈরি হয়।

গ্রীষ্মে এবং বসন্তকালে এদের খাবার জল দিতেই হবে। অল্প ঢালু চওড়া ধরনের একটি পাত্রে জল ছড়িয়ে রাখতে হবে। জলের পরিমাণ খুবই সামান্য হবে নচেৎ মৌমাছিদের জলে ডুবে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে। এই জলে তাদেব স্নান ও খাওয়া দুটো কাজই হবে।

## রোগ-পীড়া

আমাশয়, উদরাময়, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ, বমন ইত্যাদি রোগ মৌমাছিদের হয়ে থাকে।

## প্রতিকার ব্যবস্থা

আমাশয় ও উদরাময় রোগটা সাধারণত শীতকালেই বেশি হয়ে থাকে। তবে এ রোগ সামান্য যত্ন নিলেই ঠিক হয়ে যায়।

পক্ষাঘাত রোগটি নিরাময়ের কোন আশা থাকে না। তবে বাচ্চা বা ডিমগুলির এ রোগ হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে পুরনো রানীর বদলে নতুন রানীকে চাকে বহাল করতে হবে।

অজীর্ণ ও বমন রোগটা তেমন মারাত্মক কিছু নয়, এ রোগ আপনা হতেই সেরে যায়।

# মাশরুম

## মাশরুমের পরিচয়

নতুন করে মাশরুমের পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ গ্রাম থেকে শহরের সব মানুষ ভালোভাবেই মাশরুমকে চেনে। তবে গ্রামের বহু মানুষের কাছে মাশরুম কথাটা নতুন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাঙের ছাতা নামটি খুবই পরিচিত। বর্ষার সময় পুরনো খড়ের গাদায় নিজের থেকেই জন্মায়। সেই কারণে অনেকে পোয়াল ছাতুও বলে। আসলে এটা ছাতা বা ছত্রাক। বাসি খাবার, কাটা কুমড়ো, আলু কেটে কয়েকদিন ফেলে রাখা হলে অথবা ভিজে চামড়ার জুতো কয়েকদিন রোদ না পেলে তার ওপর সরু জালের মতো ছাতা পড়ে। এটাই ছত্রাক আর ইংরেজিতে মাশরুম বলা হয়। বর্ষাকালে ছত্রাক বেশি জন্মায়।

এটা সবজির পর্যায়ে পড়ে। তবে কোথাও সবুজ অংশ নেই। কোন ডালপালা গজায় না। কোন কিছু পচে গেলে তার ওপর ছত্রাক জন্মায়। পোয়াল ছাতুর ক্ষেত্রে এটাই হয়ে থাকে।

আবার বনে, জঙ্গলে গাছের মোটা ডাল পড়ে থাকলে এবং ওপরের ছালটা জলে পচে গেলে তার ওপর ছত্রাক জন্মে থাকে। বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন ঝিনুক ছাতু বা মাশরুম। বর্ষার পর এই ছত্রাক জন্মায়।

শীতের মরসুমে অন্য এক শ্রেণীর মাশরুম জন্মায়, তাকে বলা হয় বোতাম ছাতু। পশ্চিম বাংলায় এটা নিজের থেকে জন্মায় না। তবে যেখানে বারোমাস ঠাণ্ডা সেখানে নিজের থেকেই জন্মায়। আমাদের রাজ্যেও বোতাম ছাতুর চাষ করা চলে। তবে এই মাশরুম খুবই সুখী। ভালোভাবে যদি পরিচর্যা করা না হয়, তাহলে উৎকৃষ্ট ফলন পাওয়া যায় না। মানুষ এই তিন রকমের মাশরুম নির্ভয়ে খেতে পারে।

এখানে তিন শ্রেণীর মাশরুমের কথা বলা হয়েছে। তবে সারা পৃথিবী জুড়ে আজ অবধি বিজ্ঞানীরা প্রায় ৬০ লাখ মাশরুম খুঁজে পেয়েছেন এব তাদের পরিচয় ও শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাদের সবই প্রায় বন্য অবস্থায় পাওয়া গেছে। মানুষের খাদ্য হিসাবে মোটেই নিরাপদ নয়। এমনকি মানুষ যদি খায় তবে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

## মাশরুমের পুষ্টিগুণ

দশ বছর আগেও মাশরুম ছিল গ্রামের একেবারে গরিব মানুষের খাদ্য। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের বারবার সব শ্রেণীর মানুষের কাছে আবেদন জানানোর ফলে ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যের মানুষ এর পুষ্টিমূল্য বুঝতে পেরেছে। পুরোপুরি নিরামিষ, পুষ্টিগুণে ভরা এবং যেকোন সবজির থেকে আমাদের শরীরে বেশি প্রোটিন দিতে পারে। এটা ভাবতে অবাক লাগে, ডিম এবং মাংসের থেকে মাশরুমে বেশি পরিমাণে প্রোটিন থাকে। এছাড়াও রয়েছে কয়েকটা মূল্যবান ভিটামিন যা আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই প্রয়োজন।

যেসব রোগী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত এবং মাছ, মাংস, ডিম, ঘি এবং মাখন খাওয়া যাদের চলে না তারাও মাশরুমের নানা রকম তরকারি রান্না করে খেতে পারে।

এমনকি বহুমূত্র রোগী—যাদের সামান্য পরিমাণে ডিম, মাছ ও মাংস খেতে হয় তারাও টাট্‌কা অথবা শুকনো মাশরুমের তরকারি করে নির্ভয়ে খেতে পারে। এটা ছানার থেকে কম পুষ্টিকর নয়। বর্তমানে অনেকেই এর গুণাগুণ বুঝতে পেরেছে। ফলে চাহিদা বাড়ছে। মাংস, মাছ এবং ডিমের দাম বাড়ছে। সাধারণ মানুষ কম দামে কম মাশরুম খেয়ে শরীরের পুষ্টির চাহিদা মেটাচ্ছে। এমনকি ভারত থেকে বিদেশেও মাশরুম চালান যাচ্ছে।

## চাষের জায়গা

এর চাষ করতে গাছতলার জমিতে, বারান্দায়, উঠানে এবং ঘরের ভেতরেও জায়গা থাকলে কোন অসুবিধে হয় না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে পারা যায়। যদি জায়গা কম থাকে তবে দু' হাত অন্তর তিনটে মাচা করে প্রতিটি মাচায় মাশরুমের চাষ করা চলবে। আবার নাইলনের জালতি ব্যাগেতে চাষ করলে জায়গা আরও কম লাগে। তবে যেখানেই চাষ করা হোক না কেন ওপরে একটা ছাউনি থাকা দরকার। ছাউনি এমন হওয়া দরকার যাতে বৃষ্টির জল না পড়ে এবং মাশরুমে জলের ছিটা না লাগে। দরকার বুঝলে এবং জোরে হাওয়া বইলে চারপাশ পাতলা পলিথিনের চাদর দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। অনেকে চারপাশ বাঁশের তৈরি দরমা দিয়ে ঘিরে দেয়। ঘেরাটা এমনভাবে থাকে যাতে দরকার পড়লে দরমা উপরে তুলে দিলে বাতাস এবং আলো পাবার কোন অসুবিধে হয় না।

## মাশরুমের শ্রেণী ও চাষের সময়

এর আগে তিনটি জাতের মাশরুমের কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে পোয়াল ছাতু। এদের চাষ করবার সময় বর্ষাকাল। দ্বিতীয়টি হলো ঝিনুক মাশরুম। চাষ শুরু করবার সময় বর্ষার পর। এই সময় ফলন বেশি হয়। তবে সারা বছর ধরেই চাষ করা চলে। বর্ষা শুরু হলে চাষ না করাই ভালো। এবং শীতের দু' মাস ফলন কম হয়। শেষেরটির নাম বড় সাদা বোতাম মাশরুম। কেবল শীতের মরসুমে চাষ করা চলে। খরচ এবং পরিশ্রম বেশি। ফলন কম হলেও বাজারে সব থেকে বেশি দামে বিক্রি হয়। বাকি দুটো মাশরুম চাষে খরচ খুব একটা বেশি পড়ে না।

মাশরুমের চাষ বর্তমানে এতটাই লাভজনক যে যদি কাঁচা টাট্‌কা অবস্থায় বাজারে নিয়ে যাবার অসুবিধে থাকে তবে শুকনো করে বিক্রি করা চলে। অবশ্য এর জন্য খরচ সামান্য বেশি হয়। সুবিধে একটাই, নষ্ট মোটেই হয় না।

এই তিন শ্রেণীর বা জাতের মাশরুম ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আরও বহু জাতের মাশরুমের চাষ করা হচ্ছে। তারা মোটেই বিষাক্ত নয়। নির্ভয়ে খাওয়া চলে। তবে আমাদের মতো গরমের দেশে পোয়াল, ঝিনুক এবং বোতাম ছাতু খাবার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুতরাং অন্য জাতের মাশরুম চাষ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আবার এমনও দেখা গেছে, মাটি, জলবায়ু ও আবহাওয়াতে যে জাতের মাশরুম বিষাক্ত হয় না, সেটা অন্য আবহাওয়াতে চাষ করলে বিষাক্ত হয়ে যায়। কাজেই খাদ্য নিয়ে কোন রকম ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।

# পোয়াল ছাতু (মাশরুম)

**পোয়াল ছাতুর বিবরণ ঃ** গ্রাম বাংলার মানুষ ধানের খড়কে বলে পোয়াল। আর বর্ষার সময় নিজের থেকে পুবানো খড়ের চালে অথবা খড়ের গাদায় এই মাশরুমকে জন্মাতে দেখা যায়। সেই কারণে এই মাশরুমকে পোয়াল ছাতু নামে ডাকা হয়। শহরেও সকলে চেনে পোয়াল ছাতু হিসাবে। কারণ ঐ নামেতেই বিক্রি হয়ে থাকে।

বর্তমানে পোয়াল ছাতুকে খড়েব বদলে গমের শুকনো খড়, শুকনো কচুরিপানা এবং তুলোর ফেলে দেওয়া অংশে চাষ করা হচ্ছে। এইভাবে চাষের পদ্ধতি পালটে দেওয়া হলেও ফলন কম হয় না। তবে খেতে স্বাদেব পার্থক্য হয়। সেই কাবণে ব্যবসার ভিত্তিতে চাষ কবতে হলে খড়ের ওপব চাষ করাই সর্ব উৎকৃষ্ট। যারা প্রকৃত পদ্ধতি না মেনে চাষ কবে অর্থাৎ বাড়িতে প্রয়োজন মেটাবার জন্য, তারা

খড়েব গাদায পোযাল ছাতু। অবশ্য এই খড়কেও
আগে চাষেব উপযোগী কবে নেওযা হয।

পুরানো খড়ের গাদায় ভবা বর্ষায় সামান্য বেসন ছড়িয়ে দেয়। বিনা পরিশ্রমে ও বিনা খরচে পোয়াল ছাতু জন্মায়। তবে প্রকৃত চাষ করতে হলে বীজ ছড়িয়ে এবং কয়েকটা নিয়ম মেনে চাষ করলে ফলন অনেক বেশি হয় এবং মাশরুমেব মানও উন্নত হয়ে থাকে। খেতেও অপূর্ব লাগে।

**চাষের নিয়ম ঃ** খড় ছাড়াও আরও দুটো উপাদানে পোয়াল ছাতুর চাষ করা হয়। তাদের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মাশরুম পাওয়া যায় না। সেই কাবণে ধানের খড়ে যেভাবে চাষ করতে হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ধানের খড়ের অভাব মোটেই নেই। আর এখানকার মানুষ ধানের খড়ে চাষ করা মাশরুম খেতেও ভালোবাসে।

খড়ের আঁটির ডগার দিকটা আট আঙ্গুল কেটে বাদ দিতে হবে। এরপর আঁটিগুলোকে একদিন পুকুরের জলে ভিজিয়ে তুলে নেবার পর ভালোভাবে জল ঝরিয়ে নেওয়া দরকার। খড়ের আঁটিগুলোকে ডগার দিকটা নিচের দিকে করে ঝুলিয়ে রাখতে হয় চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা।

ভিজে আঁটিগুলোকে কয়েকটা স্তরে সাজাতে হবে। সরাসরি মেঝেতে না সাজিয়ে বারান্দায় ইট বিছিয়ে এক হাত উঁচু করে বাঁশের বাতা এক বিঘাত অন্তর

বসানো দরকার। জিনিসটা হবে খড়ের পালুই করা হলে যেভাবে তলাটা তৈরি করা হয়, ঠিক সেইভাবে মাশরুম চাষের জন্য ইট ও বাঁশের তৈরি জায়গা লম্বাতে ৬ হাত ও চওড়াতে চার হাত অবধি করা যেতে পারে।

**খড় যেভাবে সাজাতে হয় ঃ** ভেজা খড়ের আঁটি খুলে আধ বিঘাত উঁচু করে (তিন ইঞ্চির একটু বেশি উঁচু) লম্বাভাবে বিছিয়ে দিতে হবে। এর ওপর একইভাবে পুরু করে আবার খড় বিছিয়ে দেওয়া দরকার। তবে প্রথম বার খড়ের গোড়া যে দিকে ছিল এবার তার বিপরীত দিকে গোড়া থাকবে। মাশরুমের বীজ বপনের জন্য এই দুটো স্তর নিয়ে একটা স্তর ধরা হয়। একটা স্তর (দুটো মিলিয়ে) উঁচু হবে এক বিঘাত বা তার থেকে সামান্য কিছু বেশি। **এইভাবে তিনটি স্তর হবে।** মনে রাখতে হবে, একটি স্তর মানে দু' বার খড় বিছিয়ে দেওয়া। সাধারণভাবে তিনটি স্তরে ভালো পোয়াল ছাতু পাওয়া যায়।

**মাশরুমের বীজ বপন ঃ** একটা স্তরের খড় সাজিয়ে বেসন (মটর গুঁড়ো) অথবা ছোলার গুঁড়ো এক মুঠো চার দিকে (খড়ের কিনারা থেকে তিন আঙ্গুল দূরে) ভালোভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। ফলন বেশি হারে পাবার জন্য সামান্য পরিমাণে রাসায়নিক সার দিতে পারা যায়। সারের মধ্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট ৫০০ গ্রাম এবং ১০০ গ্রাম সুপার ফসফেট, এই দুটো উত্তমরূপে মিশিয়ে সমান তিনটি ভাগে ভাগ করে একভাগ বেসন গুঁড়োর ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে। একটা স্তরে বীজ লাগে ১২৫ থেকে ১৩০ গ্রাম।

**পরিচর্যা ঃ** বীজ ছড়াবার কাজ শেষ হলে খড়ের স্তর কালো পাতলা পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এটা করা হয় ভেতরে যাতে বেশি তাপ হয় এবং বাতাস যাতে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে।

পোয়াল ছাতু বর্ষার মরসুমে চাষ করা হয়। কাজেই ঐসময় বাতাসে জলীয় কণা খুবই বেশি থাকে। সুতরাং জল দেবার খুব একটা দরকার পড়ে না। তবে খড় বেশি শুকিয়ে গেলে তখন পিচকারির সাহায্যে হালকা ভাবে জল দিতে হয়। নতুবা বীজ শুকিয়ে যাবে। জল ছিটিয়ে আবার খড়ের স্তর আগের মতো ঢেকে রাখা দরকার।

বীজ বপন করবার সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে খড়ের স্তরে চার পাশে আলপিনের মাথার মতো মাশরুম চারা বের হবে। এবার আর ঢাকা দেবার প্রয়োজন নেই। পনের দিনের মধ্যে পোয়াল ছাতুকে পুরোপুরি খোলা ছাতার মতো দেখাবে। এরপর আরও পাঁচ থেকে ছয় দিনের মধ্যে পোয়াল ছাতু তোলার উপযোগী হয়ে উঠবে।

**মাশরুম সংগ্রহ করা ঃ** বীজ যেদিন বপন করা হলো তার পর থেকে দিন গণনা করে পোয়াল ছাতু খড়ের গাদা থেকে তোলা হবে সেটা সঠিক নিয়ম নয়। অবশ্য হিসাব রাখলে কাজের সুবিধে হয়। এব্যাপারে প্রকৃত নিয়ম হচ্ছে, যখন পোয়াল ছাতুর মাথার কিনারায় ফাটল দেখা দেবে তখনই তুলে ফেলতে হবে। এরপর একদিন বেশি দেরি করলে মাশরুম খাওয়া যাবে না।

পোয়াল ছাতুর ব্যাপারে আরও একটা অসুবিধে হলো, খড়ের গাদা থেকে তোলার পর টাট্‌কা অবস্থায় খেয়ে ফেলতে হবে। কারণ এটা ভালো অবস্থায় থাকে

মাত্র ছয় ঘণ্টা। এমনকি ফ্রিজেও রেখে দেওয়া যায় না। তবে শুকিয়ে গুঁড়ো করে বাতাসশূন্য কোন প্যাকেটের মধ্যে রাখলে দীর্ঘদিন ভালো থাকে।
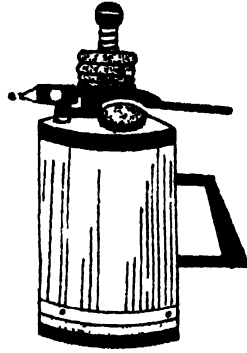
মাশরুমে জল ছেটোবার হস্ত চালিত মেশিন।

## অন্য পদ্ধতিতে পোয়াল ছাতুর চাষ

ভাঙা খাটিয়া অর্থাৎ ব্যবহার করা হয় না এবং মাঝারি নাইলন দড়ি দিয়ে ফাঁক ফাঁক করে বোনা অথবা একই ভাবে বাঁশের কাঠামো করে পোয়াল ছাতুর চাষ করা চলে। এতে খরচ কম পড়ে। তাছাড়া কয়েক বছর ধরে চাষ করা যায়।

**চাষের নিয়ম ঃ** এর আগে যে ভাবে চাষ করার কথা বলা হয়েছে সেই ভাবেই চাষ করতে হবে। তবে তিনটির বদলে চারটি স্তরে খাটিয়া অথবা বাঁশের কাঠামোতে করা চলে। কাজেই একটি স্তরে বেশি ফলন পাওয়া যাচ্ছে। শুরু থেকে শেষ অবধি একই নিয়ম পালন করা দরকার।

বাড়ির বারান্দায়, উঠানে বড় গাছের নিচে অথবা বাড়ির বাইরে নিজের সীমানাতে গাছের তলায় চাষ করা যাবে। তবে বেশি বৃষ্টি হলে তখন পলিথিন চাদর খাটিয়ে দিতে হয়। কারণ ছোট চারা, এমনকি বড় পোয়াল ছাতুর ডাঁটা ভেঙে যেতে পারে। এটা চাষীর কাছে খুবই লোকসানের বিষয়।

**পোয়াল ছাতুর বিক্রির বাজার ঃ** বাজারে বিক্রির জন্য পোয়াল ছাতু দুপুর, বিকেল অথবা সন্ধেবেলায় তুলতে নেই। কারণ তখন তোলা হলে বিক্রির বাজার পাওয়া যাবে না। আর সন্ধেবেলায় বাজার বসলেও লোক কম আসে। সুতরাং বিক্রি না হলে সবই লোকসান।

## সাদা বোতাম ছাতু (মাশরুম)

সব থেকে মূল্যবান মাশরুম। জাত হিসাবে সব শ্রেণীর মাশরুমের থেকে সেরা। এর চাহিদা যেমন বেশি তেমনি চড়া দামে বিক্রি হয়। দেখতে অনেকটা বোতামের মতো এবং প্রায় গোলাকার। তবে আকারে বোতামের থেকে প্রায় বারো গুণ বড়। সাধারণ মানুষের কাছে এর পরিচয় সাদা বড় ছাতু হিসাবে। আসল নাম বড় সাদা বোতাম মাশরুম।

একমাত্র শীতের মরসুম ছাড়া এর চাষ করা সম্ভব নয়। কাজেই পশ্চিমবাংলায় পৌষ এবং মাঘ, এই দু' মাস বোতাম ছাতু চাষের পক্ষে উপযোগী। আবার

সাদা বোতাম ছাতু (মাশরুম)। বাঁদিকে অঙ্কুর থেকে কিছুটা বড হয়েছে।
ডান পাশে তোলবার উপযুক্ত মাশরুম।

যে সব রাজ্যে বারোমাস ঠাণ্ডা বরফ পড়ে শীতের দু' মাস আর গরমের সময় দেড় মাস চাষ না করাই ভালো। কারণ ঐ সাড়ে তিন মাস ফলন খুবই কম হয়।

**চাষের নিয়ম ঃ** এই শ্রেণীর মাশরুম খড়ের গাদা অথবা মাটিতে চাষ করা চলবে না। এর চাষের প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে পচা জৈব পদার্থ। কিছু উপাদান ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে এটা তৈরি করে নিতে হয়। আর মাটি তৈরি করতে সময় লাগে এক মাস। যেসব উপাদানের প্রয়োজন হবে তাদের নাম এবং পরিমাণ সহ একটা তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

## মাটি তৈরি

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| ধানের শুকনো খড় (এক বিঘাত আকারে কাটা) | ৮০০ কেজি |
| গমের ভুসি | ৬০ কেজি |
| তুলো বীজের গুঁড়ো | ১২ কেজি |
| অ্যামোনিয়াম সালফেট | ১৮ কেজি |
| সুপার ফসফেট | ১৮ কেজি |
| ইউরিয়া | ৮ কেজি |
| ক্যালসিয়াম কার্বনেট | ২০ কেজি |
| জিপসাম | ২৪ কেজি |
| | ৯৬০ কেজি |

খোলা এবং ফাঁকা জায়গায় এর চাষ করা চলবে না। এমনকি ঘরের লাগোয়া বারান্দা এবং ওপরে ছাউনি থাকলেও সেখানেও সাদা বড় বোতাম ছাতুর চাষ করা

উচিত নয়। একমাত্র মাঝারি আকারের ঘর এবং পাকা মেঝে হলে তবেই সাদা বোতাম ছাতুর চাষ করা চলবে। আর ঘরটা এমন হবে যাতে প্রচুর আলো এবং বাতাস ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

প্রথমে মেঝেতে কাটা খড় কিছুটা পুরু করে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর খড়ের ওপর জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া দরকার। ভেজা অবস্থায় খড় থাকবে দু' দিন। এর পরের (দু' দিন বাদে) কাজ ভেজা খড়ের ওপর জিপসাম ও তুলা বীজ বাদ দিয়ে বাকি জিনিসগুলো পর পর ছড়াতে হবে। সব উপাদান ছড়ানো হয়ে গেলে
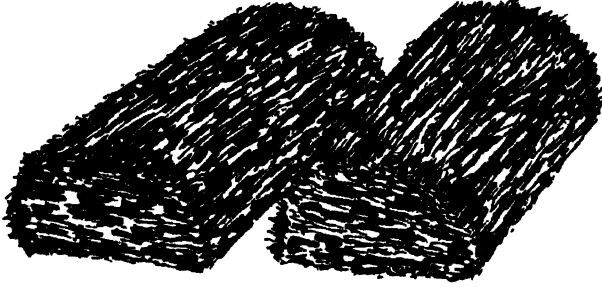
কাটা খড় এবং সার মিশিয়ে সাদা বোতাম ছাতুর মিডিয়াম অর্থাৎ মাধ্যম তৈরি করতে এইভাবে স্তূপ করা হয়।

ভালোভাবে মাখা দরকার। এবার হাত তিনেক উঁচু করে একটা স্তূপ করতে হবে। এই কাজটা একটা চায়ের পেটিতে করলে ভালো হয়। পেটিতে মাখা খড় ভরে ভালোভাবে চাপ দিয়ে যতটা সম্ভব বসাতে হবে। যতগুলো স্তূপ হবে সব ক্ষেত্রেই ঐভাবে বসাতে হবে। তারপর পেটিকে উলটে দিয়ে তার ভেতর থেকে সাবধানে স্তূপ বের করে মেঝেতে রাখতে হবে।

কয়েক দিন যাবার পর স্তূপকে ভেঙে নাড়া-চাড়া সহ ভালোভাবে ওলট-পালট করতে হবে। এইভাবে মোট ছ' বার ওলট-পালট করতে হয়। কতদিন অন্তর করতে হবে তার একটা তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

| | |
|---|---|
| কাটা খড় স্তূপ করা | প্রথম দিন। |
| প্রথম দফায় ওলট-পালট করা | ৫ দিন বাদে। |
| দ্বিতীয় দফায় ওলট-পালট কবা | ১০ দিন বাদে। |
| তৃতীয় দফায় ওলট-পালট করা | ১৪ দিন বাদে। |

ঐদিন উল্লেখ করা জিপসাম সবটা মেশাতে হবে

| | |
|---|---|
| চতুর্থ দফায় ওলট-পালট করা | ১৮ দিন বাদে। |
| পঞ্চম দফায় ওলট-পালট করা | ২২ দিন বাদে। |

এর আগে (চতুর্থ দফায়) তুলোবীজ গুঁড়ো সবটা মেশাতে হবে।

| | |
|---|---|
| শেষ বার ওলট-পালট করা | ২৬ দিন বাদে। |

কাজটা শেষ করেই ৫ লিটার জলে মেলাথিয়ান ৪০ লিটার জলে গুলে ভালভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এই কাজটি করা ছাড়াও যতবার চাষের জন্য বিশেষভাবে তৈরি মাটিকে ওলট-পালট করা হচ্ছে প্রতিবার হালকাভাবে জল ছিটিয়ে দেওয়া দরকার।

মাটি চাষ করবার উপযুক্ত হয়েছে কিনা সেটা বোঝবার জন্য কয়েকটা নিয়ম রয়েছে। সেগুলো পরীক্ষা করে দেখলেই সহজেই বুঝতে পারা যাবে। মাটির রঙটা গাঢ় বাদামী হবে। নাকের কাছে ধরলে কোন ঝাঁঝালো গন্ধ বের হবে না। হাতের মুঠোর মধ্যে কিছুটা পরিমাণ মাটি খানিকটা জোরে চাপ দিলে ঢেলা পাকিয়ে যাবে।

**বীজ তৈরি ও বপন ঃ** এই মাশরুমের বীজ তৈরি করা একটু কঠিন কাজ। সেই কারণে নিজে তৈরি না করাই ভালো। তাছাড়া বড় আকারে চাষ না করলে বীজ তৈরির খরচ যা পড়বে সেটা চাষের মাধ্যমে ফেরত পাওয়া যাবে না। তবে পশ্চিমবাংলার মধ্যে কোন জেলাতে চাষ করা হলে নদীয়া জেলার কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রয়োজন অনুসাবে বীজ সংগ্রহ করা ভালো।

বীজ বপন করতে হবে জৈব পদার্থে ভরা তৈরি করে নেওয়া মাটিতে। তবে পাকা মেঝেতে তৈরি করা মাটি ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর সাদা বোতাম মাশরুম চাষ করা চলবে না। সুতরাং মাশরুমের বীজ বপন করতে হবে তিন রকম পদ্ধতিতে। (১) কাঠের অথবা পলিথিনের তৈরি বড় ট্রেতে মাটি ভরে দুটো স্তরের মধ্যে বীজ বপন করা যেতে পারে। (২) মাটির একেবারে ওপরের স্তরে বপন। (৩) ট্রের মাটির মধ্যে গর্ত করে বীজ বপন। কাঠ অথবা পলিথিনের ট্রের মাপ হবে লম্বাতে **তিন ফুট** এবং চওড়া থাকবে **চার ফুট**। এর থেকে বেশি বড় হলে ব্যবহার করতে অসুবিধে হবে এবং ভেঙে যাবার আশঙ্কা থাকবে।

**প্রথমটিতে** ট্রের মধ্যে অর্ধেকটা মাটি ভরতে হবে। এরপর সব জায়গায় মাটির ওপর মাশরুমের বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। শেষে মাটি দিয়ে ট্রে ভরাট করা হবে। তারপর পুবানো খববের কাগজ চাপা হিসাবে দেওয়া দরকাব।

**দ্বিতীয়ভাবে** বীজ বপন করার সময় ট্রের কানা থেকে মাত্র দু' আঙুল খালি রেখে ট্রেতে মাটি ভরাট করতে হবে। এবার মাটিকে সমান করে তার ওপর *মাশরুমের বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে মাটি দিয়ে হালকাভাবে চাপা দিতে হয়। এর পরের কাজ পুরনো* ***খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা দেওয়া।*** *যদি বাতাসে কাগজ উড়ে* যাবার আশঙ্কা থাকে তবে চার কোণায় চারটে ৫০ গ্রাম ওজনের পাথর চাপা দেওয়া যেতে পারে। তবে পাথর সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে এবং ভালোভাবে ধুয়ে তবেই চাপা দিতে হবে। কয়েক ঘণ্টা বাদে খবরের কাগজ মাটি থেকে জল শুষে নিলে সেটা মাটির ওপর আটকে যাবে। **এবার অবশ্যই পাথর তুলে ফেলা দরকার।** নতুবা ঐ জায়গায় বীজ নষ্ট হয়ে যাবে।

**শেষ অর্থাৎ তৃতীয় পদ্ধতিতে** ট্রের মধ্যে মাটি যতটা ধরবে সেই পরিমাণে মাটি ভরা দরকার। তবে কোন সময়েই হাত দিয়ে চেপে মাটি ভরা চলবে না। হালকাভাবে মাটিকে ট্রেতে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। এরপর হাতের আঙুল অথবা

কাঠির সাহায্যে আধ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে বীজ পুঁতে মাটি ছড়িয়ে ভরাট করতে হবে। শেষে পুরানো খবরের কাগজ চাপা দেওয়া দরকার।
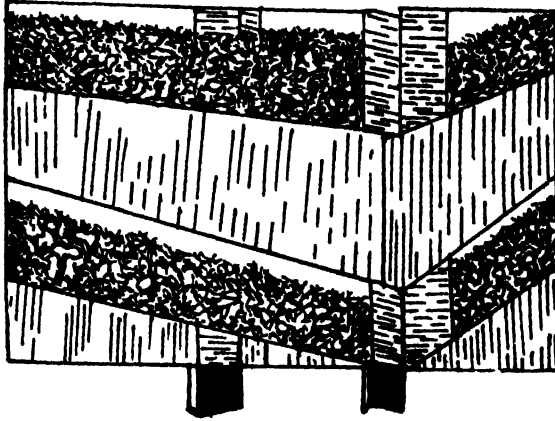
কাঠেব ট্রেতে মাশরুম বীজ বপনেব পব ব্যাকে সাজিযে বাখা হযেছে। সাদা বোতাম মাশরুমেব অঙ্কুব দেখা যাচ্ছে।

মোট তিন রকম নিয়মে মাশরুমের বীজ বপন করবার কথা বলা হচ্ছে। তার মধ্যে প্রথম পদ্ধতিতে বীজ বপন করলে ফলন যেমন ভাল হয় তেমনি উৎপাদন হবে বেশি পরিমাণে।

মাশরুমের চারা যে পর্যন্ত না বের হচ্ছে সেই সময় অবধি ট্রের ওপর থেকে খবরের কাগজ সরানো চলবে না। যদিও সাদা বোতাম ছাতুর চাষ শীতকালে করা হচ্ছে এবং আবহাওয়া বেশ শুকনো থাকে তবু ট্রের মাটিতে জল সহসা কেউ দেয় না। তবে মাটি জলের অভাবে বেশি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেলে কাগজের ওপরে হালকাভাবে জলের ছিটা দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, জলের পরিমাণ সামান্য বেশি হলেই মাশরুমের বীজ পচে নষ্ট হয়ে যাবে।

সাদা বোতাম মাশরুমেব চারা বের হতে সময় লাগে বীজ বপনের সময় থেকে ১৫ দিন। আর চারা বের হলেই ট্রের ওপর থেকে চাপা দেওয়া খবরের কাগজ সরিয়ে দিতে হবে। চারা মাশরুম দেখতে অনেকটা আলপিনের মতো। একটা আলপিনকে উলটো করে মাটিতে পুঁতে দিলে যেমন দেখায় অনেকটা সেইরকম মনে হয়। চারা মাশরুম খুবই তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। মাত্র দশ দিনের মধ্যে তুলে খাওয়া চলে।

## সাদা ঝিনুক ছাতু (মাশরুম)

**মাশরুমের জাত :** ঝিনুক মাশরুমকে এক বিশেষ জাত বা শ্রেণীর মাশরুম বলা হয়। এর চাষ করা যায় বারো মাস। তবে যেসব অঞ্চলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবার গরম বেশি সেখানে ঝিনুক মাশরুমের ফলন কম। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এই

মাশরুম চাষের পক্ষে আদর্শ স্থান হিসাবে ধরা হয়। তবে শীত ও গরমের সময় দু' মাস করে মোট চার মাস ফলন কিছুটা কম পাওয়া যায়।

ঝিনুক মাশরুমের একটা বিশেষ গুণ হচ্ছে পোয়াল বা সাদা বোতাম ছাতুর মতো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না। মাশরুম তুলে ঘরেতে দু' দিন রেখে দেওয়া যায় এবং তার জন্য খাদ্যগুণ নষ্ট হয় না।

ঝিনুক মাশরুম।

**চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঃ** প্রথম প্রয়োজন ঝিনুক মাশরুমের বীজ। এরপর লাগবে সরু আমন ধানের শুকনো খড়। যদি মাচায় চাষ করা হয় তবে মাচার সংখ্যা অনুসারে বাঁশের বাতা। আবার ব্যাগেও চাষ করা চলে। তার জন্য কিনতে হবে সরু নাইলন দড়িতে বোনা ব্যাগ। কালো মাঝারি মোটা পলিথিনের
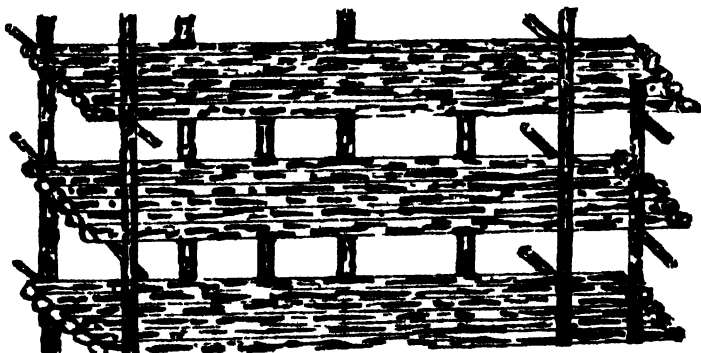
এই ধরনের বাঁশের মাচায় কম জায়গায়
ঝিনুক ছাতুর চাষ করা হয়।

চাদর। খড় কাটবার বঁটি। জল ছিটাবার জন্য পিচকারি। এর দাম কম পড়বে। তবে খরচ বেশি হলেও হাতে পরিচালিত জল ছিটাবার মেশিন কিনলে ভালো কাজ পাওয়া যাবে এবং টিকবে বেশি দিন। এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ফসলের পোকা মারতে ওষুধ ছিটানো হয়।

**খড়কে চাষের উপযোগী করে নেওয়া ঃ** খড়ের রঙটা যাতে সোনালী হয় সে বিষয়ে দেখে নির্বাচন করতে হবে। এরপর এক ইঞ্চি লম্বা করা বঁটির সাহায্যে খড়কে কাটা দরকার। যে কোন পাত্রে কাটা খড়কে ভেজাতে হবে দশ ঘন্টা। জলের পাত্র থেকে ভেজা খড়কে তুলে বাঁশের অথবা বেতের ঝুড়িতে রেখে খড় থেকে অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে নিতে হবে। জল সেই পরিমাণে খড় থেকে ঝরে যাবে যখন হাতের মুঠোতে কিছুটা খড় রেখে একটু জোরে টিপলে আঙুলের ফাঁকে জল দেখা দেবে কিন্তু জলের ফোঁটা মাটিতে পড়বে না।

**ঝিনুক মাশরুম চাষের জায়গা ঃ** কিছুটা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ এবং ছায়াতে এর চাষ করতে হবে। আবার বৃষ্টির জলের ছিটা যাতে না লাগে তারও ব্যবস্থা থাকবে। সুতবাং বারান্দায় চাষ না করে স্যাঁতসেঁতে ঘরেতে করাই নিরাপদ। যদি মাচায় চাষ করা হয়, তাহলে মাচার মাপটা হবে ৫ হাত লম্বা এবং ৪ হাত চওড়া। এই মাচা চারটি থাকে বা স্তরে সাজানো থাকবে। প্রথম যে থাক বা স্তর হবে সেটা ঘরের মেঝে থেকে ২ হাত উঁচুতে থাকবে।

কাটা ভিজে খড লাগবে ২০ কেজি এবং শুকনো কাটা খড তার অর্ধেক অর্থাৎ ১০ কেজি। মাশরুম বীজের প্রয়োজন হবে ১ কেজি। এই যে হিসাব দেওয়া হলো সেটা একটা থাক বা স্তরের মাচার জন্য। মাচা তৈরি করতে হবে বাঁশের খুঁটি ও বাঁশের বাতার সাহায্যে। এর পরের কাজ শুকনো ও ভিজে কাটা খড় উভয়কে এক সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

**বীজ বপন করবার নিয়ম ঃ** প্রথমে কাটা খডকে সমান চারটি ভাগে ভাগ করা দরকার। একেবারে নিচের থাক বা স্তর থেকে কাজ শুরু করতে হবে। চার ভাগে ভাগ করা খড় থেকে এক ভাগ খড মাচাতে সমানভাবে পুরু করে চারদিকে বিছিয়ে দিতে হবে। কাজটি শেষ করেই মাশরুম বীজ ২০০ গ্রাম বিছিয়ে দেওয়া খড়ের ওপর ছিটানো দরকার। বীজ খড়ের ওপর সব জায়গায় সমানভাবে যাতে ছড়ানো হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। এবার বীজের ওপর একভাগ খড় এবং পরে বীজ ২০০ গ্রাম একইভাবে ছড়ানো দরকার। তৃতীয় স্তরে এক ভাগ কাটা খড় ছড়িয়ে আগের মতোই মাশরুম বীজ ৪০০ গ্রাম সব জায়গায় সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। একেবারে শেষ স্তরে বাকি একভাগ কাটা খড় সমান ভাবে বিছিয়ে দিয়ে মাচার থাকটি বা স্তরটি পাতলা কালো পলিথিন চাদর দিয়ে (ওপর-নিচ এবং উভয় পাশ) ভালোভাবে ঢেকে নাইলন দড়ির সাহায্যে হালকা ভাবে চাপ সহ বেঁধে দিতে হবে। এইভাবে পলিথিন চাদর চাপা দিয়ে বেঁধে দেবার কারণ হলো যাতে বাতাস ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। অবশ্য বাতাস ভেতরে সামান্য প্রবেশ করতে পারলেও সেটা মাশরুম চাষের পক্ষে কোন ক্ষতি করতে পারে না। এখানে একটা কথা বলা দরকার, একটি থাকে মাচার জন্য বীজ নিতে বলা হয়েছিল ১ কেজি। আর বপনের সময় দেখা গেল দু' দফায় ২০০ গ্রাম করে ৪০০ গ্রাম এবং তৃতীয় বার ৪০০ গ্রাম বীজ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে মোট ৮০০ গ্রাম বীজ লাগছে। এতে খরচ কিছুটা বাঁচবে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় ফলন অনেক কম হবে।

কিন্তু ২০০ গ্রামের পরিবর্তে দু' দফায় ৩০০ গ্রাম করে মোট ৬০০ গ্রাম বীজ ছড়ালে ১ কেজি বীজের সবটাই খরচ হবে।

এই প্রথমটি অর্থাৎ একেবারে নিচের মাচায় বীজ বপন করার কাজ শেষ হলে বাকি তিনটি মাচায় একইভাবে মাশরুম বীজ বপন করতে হবে। তবে প্রত্যেকটি থাকের বা স্তরের মাচাকে কালো পাতলা পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢাকা দিয়ে হালকা চাপে নাইলনের দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া দরকার।

ঢাকা দেওয়া **অবস্থায় মোট ১৫ দিন** থাকবে। এরপর বাঁধন খুলে পলিথিনের চাদর তুলে দিলে দেখা যাবে মাচার কুচো খড় আলগার বদলে জমাট বা চাপ হয়ে শক্ত হয়েছে। খড়ের ওপরে প্রায় সব জায়গায় সাদা জালিকাতে ঢেকে গেছে। মনে হবে সরু সাদা সুতো দিয়ে এলোমেলো ভাবে জাল বুনে রেখে দিয়েছে।

**ঢাকা খোলার পর পরিচর্যা :** খুব একটা ঝামেলার ব্যাপার নয়। মাশরুম না তুলে নেওয়া পর্যন্ত রোজ সকাল, দুপুর এবং বিকেলে পিচকারি অথবা হাতে চালিত যন্ত্রের সাহায্যে খুবই হালকা ভাবে জল ছিটিয়ে মাচার খডকে ভিজিয়ে দিতে হবে। জল এমন পরিমাণে দেওয়া দরকার যাতে কেবল খড় ভেজে অথচ জল গড়িয়ে নিচে মেঝেতে পড়বে না।

ঢাকা খুলে দেবার পর ঝিনুক মাশরুম তুলে খাবার উপযোগী হয় দশ দিনের মধ্যে। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে সাত থেকে আট দিনের মাথায় মাশরুম তুলে খাওয়া চলতে পারে। এব্যাপারে একটা বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে, মাশরুমেব ডাঁটি শক্ত থাকা অবস্থায় যেন তুলে ফেলা হয়।

**একই মাচায় চারবার ফলন সংগ্রহ :** একমাত্র ঝিনুক মাশরুমেব ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয়। প্রথম দফায় সমস্ত মাশরুম তুলে নেবার পব আবার প্রতিটি মাচাতে হালকাভাবে জল ছিটিয়ে দিতে হবে। ঠিক আগের মতো কালো পলিথিনের পাতলা চাদর (যেটা আগে ব্যবহার করা হয়েছিল) জড়িয়ে সামান্য চাপ দিয়ে বেঁধে দেওয়া দরকার। এবাব ১৫ দিনের পরিবর্তে **মাত্র সাতদিন** রেখে বাঁধন খুলে ঢাকা খুলে ফেলতে হবে। আগের মতো সারা দিনে তিনবার কবে জল ছিটিয়ে গেলে সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় মাশরুম পাওয়া যাবে। একইভাবে তৃতীয় এবং চতুর্থবার ফলন পাওয়া সম্ভব। তবে প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বার ফলন কিছুটা কম হবে। তৃতীযবার আরও কমে যাবে। শেষবারে মাশরুম পাওয়া যাবে খুবই সামান্য পরিমাণে। সেই কারণে মাশরুম চাষিরা বিশেষ করে যারা বড় আকারে চাষ করে তারা শেষবার ফলন না নিয়ে তৃতীয়বার মাশরুম তুলে ফেলাব পর খড় মাচা থেকে ফেলে দিয়ে নতুন করে বীজ বপন করে।

**মাশরুম কয়েক দিন রাখার উপায় :** ঝিনুক মাশরুমের বিশেষ গুণ হলো, টাট্‌কা মাশরুম তুলে সাধারণভাবে ঘরে রেখে দিলে দু' দিন অবধি ঠিক থাকে। দু' দিনের মধ্যে খেতে কোন বাধা নেই এবং খাদ্যগুণ সবই বজায় থাকে। আবার বাড়িতে রেফ্রিজারেটর থাকলে তার মধ্যে যদি রাখা হয় তবে ঠাণ্ডায় ঝিনুক মাশরুম **পাঁচ দিন অবধি** ভালো থাকে।

# নাইলন জালের ব্যাগে চাষ

বাঁশের মাচাতে যেমন ঝিনুক মাশরুমের চাষ করা যায় তেমনি নাইলন জালের ব্যাগেও চাষ করলে ফলন কোন অংশে কম হয় না। এইভাবে চাষ করাও সহজ। গোটাকতক বাঁশে ব্যাগগুলো পর পর ঝুলিয়ে রাখলে জায়গা বুঝে ১০০টি ব্যাগে চাষ শুরু করা যায়।

যদি ঢাকা লম্বা বারান্দা থাকে তাহলে ব্যাগের সংখ্যা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এইভাবে চাষ করার আরও একটা সুবিধে হচ্ছে, জমি থেকে অনেকটা উঁচুতে থাকে বলে পিঁপড়ে, ইঁদুর, বিড়াল সহ অন্যান্য প্রাণী মাশরুমের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

**চাষের প্রয়োজনীয় জিনিস ঃ** নাইলন জালতি ব্যাগের কথা আগেই বলা হয়েছে। এর মাপটা হবে দেড় থেকে দু' ফুট লম্বা আর চওড়াতে থাকবে এক ফুট তিন ইঞ্চি। তবে দেড় ফুট লম্বা এবং এক ফুট চওড়া ব্যাগেও ভালোভাবে চাষ করা

নাইলন জালের থলির মধ্যে ঝিনুক খুম্বুর চাষ।

যাবে। এছাড়াও লাগবে কয়েকটা বেতের অথবা বাঁশের ঝুড়ি, সরু আমন ধানের খড়, পাতলা বড় সাদা পলিথিনের ব্যাগ, জল ছিটাবার পিচকারি অথবা হাতে পরিচালিত জল ছিটাবার যন্ত্র এবং কয়েকটি রাসায়নিক সার।

**খড়কে উপযোগী করা ঃ** সরু সোনালী রঙের খড়কে প্রথমে এক থেকে দেড় ইঞ্চি আকারে কেটে নিতে হবে। এবার কাটা খড়কে কোন মাটির গামলা অথবা

পাকা চৌবাচ্চায় পরিষ্কার জলে পুরো একদিন ভিজিয়ে রাখা দরকার। পরের দিন কাটা খড়কে জল থেকে তুলে ঝুড়ির মধ্যে রাখতে হবে। এতে বাড়তি জল খড় থেকে ঝরে যাবে। কাটা খড় চাষের উপযোগী হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তার জন্য একমুঠো খড়কে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে একটু জোরে চাপ দিলে যদি দেখা যায় আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল ফোঁটার আকারে নিচে পড়ছে তাহলে বুঝতে হবে আরও কয়েক ঘণ্টা খড় ঝুড়িতে থাকবে। অপরদিকে জল কেবল আঙুলের ফাঁকে দেখা গেলে সেই খড় চাষের উপযোগী বলে ধরা হবে।

এর পরের কাজ ভিজে কাটা খড়ে কয়েকটা রাসায়নিক সার মেশানো। এতে ফলন যেমন বেশি পাওয়া যায় তেমনি মাশরুমের মানও উন্নত হয়। সারের পরিমাণটা হবে মোট কাটা খড়ের অর্ধেক। সাবগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউরিয়া ৬৫ গ্রাম, সুপার ফসফেট ১৬৫ গ্রাম এবং সালফেট অফ পটাশ ৬০ গ্রাম। তবে শেষের সারটির পরিবর্তে মিউরিয়েট অফ পটাশ একই পরিমাণে মেশাতে পারা যাবে। তবে অনেকে পরিমাণ ৬০ গ্রামেব পরিবর্তে ৬৫ গ্রাম মিশিয়ে থাকেন।

নাইলন ব্যাগের যে মাপ দেওয়া হয়েছে সেই মাপেব তিনটি ব্যাগের জন্য ২ কেজি কাটা শুকনো আমন ধানের খড় দরকার। কাটা খড়কে একদিন জলে ভেজালে সেটা আকাবে তিনগুণ বেড়ে যায়। আব সারেব যে হিসাব দেওয়া হয়েছে সেটা মোট ভিজে খড়ের অর্ধেক অংশে মেশাতে হবে।

**বীজ বপন ঃ** জালতি নাইলন ব্যাগের মধ্যে সার মাখানো কাটা ভিজে খড বেশ চাপ প্রয়োগ করে ভরতে হবে। যখন দেখা যাবে ব্যাগের অর্ধেকটা ভরে গেছে তখন তার ওপর সার না মাখানো কাটা খড় তিন আঙুল পুরু করে বিছিয়ে দেওয়া দরকার। খড়ের ওপর হাতের তালু দিয়ে চাপ দিতে হবে। তার কারণটা হচ্ছে যাতে খড়ের ভেতর থেকে যতটা সম্ভব বাতাস বের হয়ে যায়। এবার খড়ের ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে ৫০ গ্রাম ঝিনুক মাশরুমের বীজ। যতটা সম্ভব চারদিকে সমানভাবে বীজ ছড়ানো দরকার। কাজটা শেষ হলেই সার না মাখানো কাটা খড় বীজের ওপর এক ইঞ্চি পুরু করে ছড়িয়ে দিতে হবে। এটা হলো প্রথম স্তরে বীজ বপন। একই ভাবে আরও তিনটি স্তরে বীজ বপন করা হবে। ফলে নাইলন জালতি ব্যাগে মোট চারটি স্তরে বীজ বপন করা চলবে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, নাইলন জালতি ব্যাগে প্রথম স্তরে সার মেশানো কাটা খড় নাইলন ব্যাগের অর্ধেকটা ভরতি করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তর থেকে চতুর্থ স্তর অবধি সার মেশানো কাটা খড় প্রথম স্তরে যা দেওয়া হয়েছিল তার চারভাগের এক করে দিতে হবে। বাকি সব কাজ একই থাকবে। এবার জালতি ব্যাগের মুখটা নাইলন দড়ি দিয়ে বেশ শক্ত ভাবে বেঁধে মেঝে থেকে চার ফুট ওপরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। কাজটি নাইলন ব্যাগের হাতলে দড়ি গলিয়ে অথবা লম্বা সরু আকারের বাঁশের সাহায্যে তৈরি করা যাবে।

**ব্যাগকে ঢেকে রাখা ঃ** ঝুলিয়ে রাখা নাইলন ব্যাগকে একটা সামান্য বড় আকারের পাতলা পলিথিন ব্যাগের ভেতরে ভরতে হবে। নাইলন জালতি ব্যাগের

কোন অংশ যেন পলিথিন ব্যাগের বাইরে না থাকে। তারপর পলিথিন ব্যাগের মুখটা সরু নাইলন দড়ি দিয়ে বাঁধা দরকার। ব্যাগের ভেতরে যাতে অল্প বাতাস
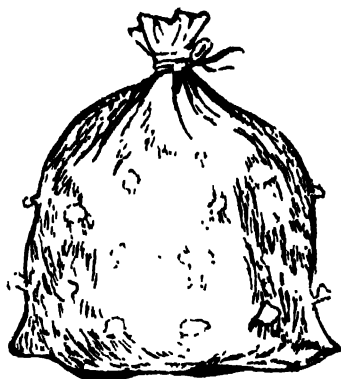
পলি ব্যাগের বিভিন্ন ফুটো ভেদ করে মাশরুম চারা বের করা হয়েছে।

প্রবেশ করতে পারে এবং জালতি নাইলন ব্যাগের মধ্যে কাটা খড়ে যাতে হাওয়া লাগে তার জন্য কিছু ফুটো করে দেওয়া উচিত।

একটি ফুটোর সঙ্গে অপরটির ব্যবধান থাকবে তিন ইঞ্চি। ব্যাগের ওপর দিকে যদি তিন অথবা চারটি ফুটো হয় তবে তার নিচে যে ফুটোগুলো হবে, ওপরের ফুটোর সঙ্গে দূরত্ব থাকবে চার ইঞ্চি। আবার একই রকম ফুটো করতে হবে তিন ইঞ্চি অন্তর। ফুটোর মাপটা হবে যাতে হাতের একটা কড়ে আঙুল ভালোভাবে ঢুকে যায়। নাইলন জালতি ব্যাগ পলিথিন ব্যাগের ভেতর ভরবার আগে ফুটোগুলো করে নেওয়া দরকার। এতে কাজের সুবিধে হয়। এক্ষেত্রেও ব্যাগের মুখটা বন্ধ করতে হবে।

**পরবর্তী পরিচর্যা ঃ** নাইলন জালতি ব্যাগ পলিথিন ব্যাগের সাহায্যে যেদিন ঢাকা দেওয়া হলো তার পরের দিন থেকে রোজ একবার করে জালতি ব্যাগে জল ছিটাতে হবে। যদি সকালের দিকে জল ছিটানো হয় তবে পরের দিন সকালের দিকেই জল ছিটাতে হবে। সকালে যদি অসুবিধে থাকে তবে রোজ বিকেলে জল ছিটাতে পারা যায়। এর জন্য ফুটো করা পলিথিন ব্যাগ খুলতে হবে এবং জল ছিটাবার কাজ শেষ হলেই আবার জালতি ব্যাগ পলিথিন ব্যাগে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে। এইভাবে পনের দিন জল ছিটাবার পর দেখা যাবে আলপিনের মাথার মতো একটা ছোট দানার মতো ডাঁটি সমেত বহু মাশরুমের চারা খড়ের চার পাশে বের হয়েছে। তখন পলিথিনের ব্যাগ্ খুলে দিতে হবে। এই ব্যাগগুলো ভালোভাবে ধুয়ে তারপর রোদে শুকিয়ে তুলে রাখা দরকার। কারণ পরবর্তীকালে মাশরুম সংগ্রহ করে যখন আরও তিন দফায় ফলন নেওয়া হবে সেই সময় ঢাকা দিতে কাজে লাগবে।

ব্যাগ খুলে দেবার পর ঝিনুক মাশরুম বড় হয়ে তোলার উপযোগী হতে সময় লাগে আট থেকে দশ দিন। তবে মাশরুম না তুলে ফেলা অবধি রোজ তিন বার

করে (সকাল, দুপুর এবং বিকেলে) হালকা ভাবে নাইলন জালতি ব্যাগে জল ছিটাতে হবে।

ঝিনুক ছাতু তোলবার সময় দুটো হাতের সাহায্যে বোঁটা বা ডাঁটিতে সামান্য চাপ দিয়ে তুলতে হয়।

প্রথমবার সব মাশরুম তুলে ফেলার পর দ্বিতীয়বার ফলন নেবার জন্য জালতি নাইলন ব্যাগে হালকাভাবে জল ছিটিয়ে ফুটো করা পলিথিন ব্যাগে ভরে মুখটা বেঁধে দিতে হবে। এইভাবে সাতদিন থাকবে এবং রোজ একবার করে হালকাভাবে জল ছিটানো দরকার। এরপর পলিথিন ব্যাগ খুলে দিয়ে রোজ সকাল, দুপুর ও বিকেলে তিনবার করে হালকা ভাবে জল ছিটাতে হবে। এবারেও সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার মাশরুমের ফলন পাওয়া যাবে।

আরও দু' বার অর্থাৎ তৃতীয়, চতুর্থ দফায় একই ভাবে ঝিনুক মাশরুম নাইলন ব্যাগ থেকে তোলা সম্ভব হবে। তবে প্রথম বারের তুলনায় প্রতি দফায় ফলন কমতে থাকবে। শেষবার অর্থাৎ চারবারের মাথায় ফলন খুবই কম হবে।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ, সঠিক পরিচর্যা এবং প্রকৃতি সহায় থাকলে যেমন প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা সহ বাতাসে আর্দ্রতা পাওয়া গেলে তিনটি ব্যাগ থেকে মোট চার দফায় দেড় থেকে দু' কেজি টাট্‌কা ঝিনুক মাশরুম পাওয়া যাবে। এবার খড়ের মণ্ড ফেলে নতুন করে চাষ দরকার। অবশ্য নাইলন জালতি ব্যাগের খড় ফেলে না দিয়ে জমিতে ব্যবহার করলে অতি উত্তম জৈব সার হিসাবে কাজ করবে। বড় আকারে চাষ করলে তখন মণ্ডের পরিমাণ অনেক বেশি হবে। কাজেই সার হিসাবে বিক্রি করে আলাদাভাবে রোজগার করা যাবে।

**খাবার উপযোগী ঝিনুক মাশরুম সংগ্রহ ঃ** প্রায় তিন রকমের আকৃতি হয়ে থাকে ঝিনুক মাশরুমের। তবে অধিকাংশ মাশরুমের আকার অনেকটা ছাতার মতো। আবার কয়েকটা শ্রেণী রয়েছে যাদের মাথার দিকটা কিছুটা গোল ধরনের। কিছু শ্রেণীর ঝিনুক মাশরুম রয়েছে যার মাথার আকৃতি সাপের ফণার মতো। সব শ্রেণীর মাশরুম যখন চারা অবস্থায় থাকে তখন কিন্তু মাথার গড়ন আলপিনের মতো দেখায়।

মাশরুমকে তুলতে হবে যখন ডাঁটি এবং মাথা কিছুটা শক্ত থাকবে। এছাড়াও মাথা যখন সাপের ফণার মতো ছড়িয়ে যাবে ঠিক তখন মাশরুমকে তুলে ফেলার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে ধরা হয়।

সাধারণভাবে সকাল অথবা বিকেলের দিকে মাশরুম তোলার নিয়ম। তবে কাছাকাছি সকালের দিকে বাজার থাকলে সেই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। মাশরুমকে তোলবার নিয়মটা হলো, খড়ের ঠিক ওপরেই ডাঁটিটা দুই হাতের আঙুলের সাহায্যে ধরে যে কোন একদিকে সামান্য মোচড় দিলেই মাশরুম খুব সহজেই উঠে আসবে।

## নিজের প্রয়োজনে মাশরুম বীজ তৈরি

বাড়িতে খাবার অথবা ব্যবসার জন্য বড় আকারের চাষ করা হলে যে কোন পরিমাণে মাশরুমের বীজ উচিত মূল্যে এবং সঠিক মানের কিনতে পাওয়া যাবে। কিন্তু তার জন্য সময় লাগবে ও পয়সা খরচ করে বীজ কিনে আনতে হবে। অনেক সময় চাষের উপযোগী না থাকায় কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হয়। ফলে সময় নষ্ট এবং দ্বিতীয় বার অর্থ খরচ করে বীজ নিয়ে আসতে চাষ সময় মতো করতে পারা যায় না। চাষের ক্ষেত্রে দেরি মানেই ফলন কম পাওয়া।

আজকাল খুবই কম খরচে এবং সহজ উপায়ে মাশরুমের বীজ বাড়িতেই তৈরি করে নেওয়া যায়। বীজ হাতের কাছে তৈরি থাকলে চাষ সময়ে করতে পারা যায় এবং বাকি বীজ বিক্রি করে খরচ সহ কিছু টাকা লাভও হয়। বীজ সঠিক মানের হলে ধীরে ধীরে প্রচার হতে থাকে এবং কাছাকাছি অন্যান্য মাশরুম চাষিরা বীজ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

**দানাশস্য জাত মাশরুম বীজ :** বীজ তৈরি করবার আগে প্রথমেই জানা দরকার মাশরুম বীজ কাকে বলে। এটা হচ্ছে এক শ্রেণীর ছত্রাক যার মধ্যে কোন সবুজ অংশ পাওয়া যায় না। তবে মাশরুমকে বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ শ্রেণীর মধ্যে রেখেছেন। তবে উদ্ভিদ মাত্রেই তার মধ্যে ক্লোরোফিল অর্থাৎ সবুজ অংশ থাকে। মাশরুম বা ছত্রাক সবুজ ছাড়াই উদ্ভিদ। ছত্রাক বা চলতি বাংলায় ছাতা। আর ছোট আকারের ছাতা বীজ। সেটা বড় হলে তাকে বীজ না বলে পরিণত মাশরুম বা ছত্রাক খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি। সেই কারণে এর আলাদা কোন বীজ নেই।

এর বীজ উচ্চচাপযুক্ত গরম বাষ্পের সাহায্যে দানাশস্যকে পরিশোধন করে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়। পাওয়া যায় পলিপ্রপলিন প্যাকেটে দানা শস্যের সঙ্গে মেশানো অবস্থায়। দানা শস্যের মাধ্যমে তৈরি বীজের ব্যবহার খুবই বেশি। উচ্চচাপযুক্ত গরম বাষ্পে পরিশোধন করা গম, বাজরা, ধান, জোয়ার ইত্যাদি দানা জাতীয় খাদ্যশস্য বীজ তৈরি করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

(ক) যে কোন একটা দানাশস্যকে পরিষ্কার করে (কাঠি, বালি সহ অন্যান্য ময়লা) জল দিয়ে ধুতে হবে।

(খ) এরপর কোন পরিষ্কার পাত্রে দানাগুলোকে গরম জলে ৩০ মিনিট ফোটানো বিশেষ দরকার।

(গ) নির্দিষ্ট সময় অবধি ফোটাবার পর দানাশস্য থেকে সব জলটা ফেলে দিতে হয়।

(ঘ) দানাশস্য যদি ২০০ গ্রাম নেওয়া হয় তবে তার মধ্যে ১·৩ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ০·৩ গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিতে হবে। যদি

২০০ গ্রামের পরিবর্তে ৪০০ গ্রাম দানাশস্য নেওয়া হয় তবে রসায়ন দুটিও দ্বিগুণ মেশানো দরকার।

(ঙ) রাসায়নিক মেশানো দানাশস্যকে ৫০০ মিলিলিটার মাপের দুধের অথবা স্যালাইনের খালি বোতলে ভরে ফেলতে হবে। এছাড়াও ১০ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি বা ৮ ইঞ্চি × ৫ ইঞ্চি অথবা ৯ ইঞ্চি×৬ ইঞ্চি আকারের পলিপ্রপলিন প্যাকেটেও দানাশস্য ভরতে পারা যায়। বোতল বা প্যাকেটের মুখটা বন্ধ করতে হবে তুলোর ছিপির সাহায্যে।

(চ) এবার বোতল বা প্যাকেটকে ১৫ পাউণ্ড চাপযুক্ত গরম বাষ্পে এক ঘণ্টা পরিশোধন করার পর একদিন বা ২৪ ঘণ্টা বাদে আবার একবার একইভাবে পরিশোধন করা দরকাব।

(ছ) এর পরের কাজ বোতল বা প্যাকেট একেবারে ঠাণ্ডা হলে মাশরুম ছত্রাকের জালিকার একটা টুকরো বোতল বা প্যাকেটের মধ্যে বাখা দানাশস্যের সঙ্গে যোগ করতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে জালিকার টুকরো দানাশস্যের ওপর রেখে মাত্র কয়েকটা শস্যদানাকে ওপবে চাপা দিতে হবে।

(জ) পরে যাতে চিনতে সুবিধে হয় তার জন্য ছত্রাকের জাত বা শ্রেণী অনুসাবে চিহ্ন দিয়ে রাখা উচিত। অনেকে কাগজে মাশরুমের জাত বা শ্রেণী লিখে আঠা দিয়ে আটকে রেখে দেয়। এইভাবে রাখাটাই সব থেকে ভালো। কারণ কোন রকম ভুল হবার আশঙ্কা মোটেই থাকে না।

(ঝ) বীজ বপন করবার উপযোগী হতে ১৫ থেকে ২০ দিন সময় লাগে। যদি একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা যায় তবে দুই থেকে তিন মাস অবধি বীজ ব্যবহারের উপযোগী থাকে।

## বীজ তৈরির দরকারি জিনিসপত্র

জিনিসপত্র বলতে খুবই কম খরচে একটা ছোট আকারের রসায়নাগার করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে খরচ পড়লেও নিজের চাহিদা এবং অপর চাষীকে মাশরুমের বীজ বিক্রি করে এক থেকে দু' বছরের মধ্যেই টাকা উঠে আসবে।

মাশরুম বীজ তৈরি করবাব সময় স্টিলের তৈবি ছুরি ব্যবহার করা হয়।

দরকারি জিনিসগুলোর মধ্যে রয়েছে রেফ্রিজারেটর, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক আলো, টেবিল, চেয়ার, প্রেসার কুকার, কেরোসিন স্টোভ, রড সমেত সূঁচ, চিমটা, তারের খাঁচা, থার্মোমিটার, ওজনদাঁড়ি, কাঁচি, চালুনি, কাচের সিরিঞ্জ (২০ মিলিলিটার), কাচের টুকরো, গ্লাস, কাচের চোঙ, (৫০০-১০০ মিলিলিটার মাপের), কালচার টিউব (১৫ সেমি × ১০ সেমি), কাচের বীকার (২৫০ থেকে ১০০০ মিলিলিটার), স্পিরিট জার, পিপেট (সূচী নল), খালি স্যালাইন বোতল,

স্পিরিট ল্যাম্প, নন-অ্যাবজরমেন্ট তুলো, ওয়াশ বোতল, অগার, ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোন-ডি, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম সালফেট, মেথিলেটেড স্পিরিট, মারকিউরিক ক্লোরাইড, অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল (২৫০ মিলিগ্রাম), পলিপ্রপলিন
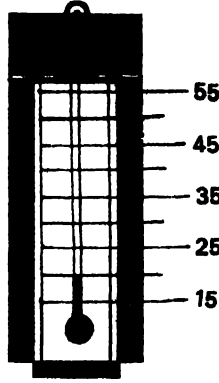
পোয়াল ছাতু ছাড়া ঝিনুক এবং সাদা মাশরুম চাষের ঘরের দেওয়ালে সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার ঝুলিয়ে বাখা দরকার। এতে ঘরের তাপমাত্রা জানা যায়।

প্যাকেট (৪০-৫০ গেজ), প্লাস্টিক মগ, লোহার বালতি, গার্ডার, ছুরি, ওয়াশিং পাউডার, ফিনাইল, ডেটল, মেটাল রিং, কটন রোপ, ঢাকনা সহ সস্প্যান, ঢাকনা
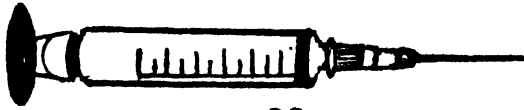
কাচের সিরিঞ্জ।

সহ ডেকচি, হাতা, ছানতা, কালো পলিথিন কাগজ, কেরোসিন তেল, গম, আলু, দেশলাই, পুরানো খবরের কাগজ, গামছা, ফানেল. মোমবাতি, নাইলন দড়ি, জালতি নাইলন ব্যাগ, খড়, খড় কাটা বঁটি, বাঁশের ঝুড়ি, খালি বস্তা, স্টিলের চামচ।

**রসায়নাগারের বিবরণ ঃ** একটা পাকা ঘরের প্রয়োজন। ঘরের মেঝেটাও পাকা হবে। রসায়নাগারের একটা দিকে পর্দা অথবা প্লাইউড দিয়ে আরও একটা ঘর করা দরকার। সেই ঘরের মাপটা হবে ১০ ফুট × ৫ ফুট। ঘরের ভেতরে আসার দরজার বিপরীত দিকে দুটো দরজা থাকবে। ঘরে রাখতে হবে একটা কাঠের টেবিল ও চেয়ার। তবে টেবিলের ওপরটা সাদা কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা দরকার।

**প্লাগ তৈরি কৌশল ঃ** ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের মিডিয়ামজাত কালচার ও স্পন (বীজ) জন্মানোর জন্য কাচের ছোট নল বা টেস্ট টিউব, পলিপ্রপলিন প্যাকেট অথবা বোতলের মুখটা আটকাবার জন্য যে ছিপি অথবা কর্ক ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে প্লাগ। এটা তৈরি করতে যে তুলো ব্যবহার করা হয় সেটা সাধারণ তুলো নয়। এই তুলোকে বলা হয় নন-অ্যাবজরমেন্ট তুলো। প্লাগ সাধারণভাবে চার রকমের হয়ে থাকে। তাদের নামগুলো পরপর বলা হচ্ছে। **(ক) কালচার টিউব প্লাগ, (খ) রিং প্লাগ, (গ) ইনজেক্ট প্লাগ** এবং **(ঘ) বোতল প্লাগ।**

কালচার টিউব ও ইনজেক্ট প্লাগ তৈরি করতে হলে মোটামুটি ভাবে ৩৫-৪০ মিলিগ্রাম তুলো নিয়ে খুব আলতোভাবে চাপ দিয়ে পাকিয়ে সমানভাগে ভাগ করে কালচার টিউবের মুখে লাগানো হয়। একই তুলো ইনজেক্ট করবার জন্য পলিপ্রপলিন প্যাকেট লাগিয়ে সুতো অথবা রবারের গার্ডার দিয়ে মুখটা বেঁধে দেওয়া হয়।

যদি রিং অথবা বোতলের প্লাগ তৈরি করা হয় তবে একই নিয়মে করতে হবে। তবে এই দুটো ক্ষেত্রে তুলো পরিমাণে বেশি লাগবে। কারণ এর আকারটা একটু বড় হয়। সাধারণভাবে কালচাব টিউবের মুখের ব্যাস ৩/৪ ইঞ্চি এবং রিং ও বোতলের মুখের ব্যাস ১ ইঞ্চি হয়ে থাকে।

মিডিয়াম বা মাধ্যম হচ্ছে যার ওপর নির্ভর করে প্রায় সব শ্রেণীর উদ্ভিদ বেঁচে থাকে। অধিকাংশ মাশরুম বা ছত্রাককে বেঁচে থাকার জন্য এই ধরনের মিডিয়াম বা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। মাশরুম বেঁচে থাকার জন্য এবং বড় হবার জন্য মাধ্যম অথবা মিডিয়ামকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। মোট চার প্রকারের মিডিয়াম বা মাধ্যম হতে পারে। তৈরি করবার নিয়মও আলাদা।

(ক) পি ডি এ মিডিয়াম অথবা মাধ্যম
(খ) তরল ,, ,, ,,
(গ) দানাশস্যজাত ,, ,, ,,
(ঘ) খড়জাত ,, ,, ,,

**মিডিয়াম তৈরি করবার নিয়ম** : প্রথমে আলোচনা করা হচ্ছে পি ডি এ **মিডিয়াম**। এর জন্য দরকার খোসা ছাড়ানো আলু, ডেক্সটোজ অথবা গ্লুকোন-ডি, অগার এবং অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল। এটা ওষুধের দোকানে পাওয়া যায় ক্লোরোমাইসেটিন নামে, আর এর শক্তি মাত্রা হবে ২৫০ মিলিগ্রাম।

যদি ১০০০ মিলিলিটার অর্থাৎ ১ লিটার পি ডি এ মিডিয়াম বা মাধ্যমেব প্রয়োজন হয় তবে ২০০—২৫০ গ্রাম আলুসিদ্ধ এমন পরিমাণ জলে করতে হবে
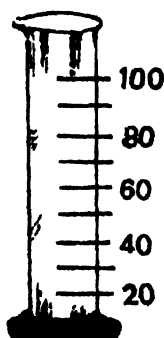
তরল পদার্থ মাপার জন্য কাচেব চোং
অথবা মেজারিং সিলিণ্ডার।

যাতে আলু সিদ্ধ হবার পর জল ১ লিটার পরিমাণে থাকে। এর পরের কাজ আলুসিদ্ধ জলকে কাচের মেজারিং চোঙে মেপে নিতে হবে। তারপর সরু জালের

সাহায্যে ছাঁকনিতে ছেঁকে অগার মিশিয়ে কাচের বড় অথবা স্টিলের চামচ দিয়ে যাতে মিশে যায় সেই ভাবে নাড়া দরকার।

আলুসিদ্ধ জলকে দশ থেকে পনের মিনিট রেখে দিতে হবে যাতে একটু ঠাণ্ডা হয়। এবার গ্লুকোন-ডি এবং অ্যান্টিবায়োটিক ২৫০ মিলিগ্রাম মিশিয়ে পিপেট (সূচী নল) দিয়ে কালচার টিউবের মধ্যে ৫-৬ মিলিলিটার দিয়ে তুলোর তৈরি প্লাগের সাহায্যে টিউবের মুখটা বন্ধ করা দরকার।

**এরপর তরল মিডিয়াম অথবা মাধ্যম তৈরি** করবার ক্ষেত্রে এইটুকু বলা চলে, আগের মিডিয়াম পি ডি এ তৈরি করতে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তাদের সাহায্যে এবং যেভাবে তৈরি করা হয়েছে এটিও সেইভাবে করা হবে। কেবল বাদ যাবে কালচার টিউবের পরিবর্তে কোনিক্যাল ফ্লাস্ক বা স্যালাইনের বোতল এবং
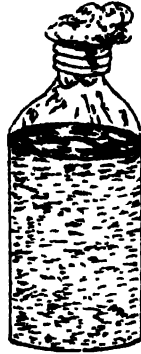
মাশরুমের মিডিয়াম বোতলে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

অগার বাদ দিতে হবে। এছাড়া গ্লুকোন-ডি এবং অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল মেশানো আলু-সিদ্ধ জল ব্যবহার করতে হবে।

কোনিক্যাল ফ্লাস্কে ৭০-৮০ মিলিলিটার ঢেলে' এবং স্যালাইন বোতল হলে ৩০০ মিলিলিটার রেখে তুলোর তৈরি প্লাগ দিয়ে মুখ আটকে দেওয়া দরকার।

দুটো মিডিয়াম তৈরি করবার কৌশল জানার পর এবার **দানাশস্যজাত মিডিয়াম বা মাধ্যম** তৈরি করার বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। পরিমাণ মতো গম ও জল একটা ডেকচিতে রেখে সিদ্ধ করতে হবে। গমটা এমনভাবে সিদ্ধ করা দরকার যাতে গলে অথবা ফেটে না যায়। এবার ছানতা করে গমকে তুলে জল ঝরিয়ে পরিষ্কার খবরের কাগজের ওপর ছড়িয়ে কিছুটা শুকিয়ে নিতে হয়। প্রতি ২০০ গ্রাম পরিমাণ গমে ১·৩ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ০·৩ গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট মিশিয়ে পলিপ্রপলিন প্যাকেটের মধ্যে ভরা দরকার। এরপর টিনের তৈরি রিং লাগিয়ে তুলোর তৈরি প্লাগ দিয়ে আটকাতে হবে।

এছাড়াও ৫০০ মিলিলিটার খালি দুধের বোতলে গম ভরতে পারা যাবে এবং মুখটা তুলোর প্লাগ দিয়ে আটকানো দরকার। কেবলমাত্র নিডল পদ্ধতির জন্য এটা করা হয়ে থাকে। তবে সিরিঞ্জ পদ্ধতির ক্ষেত্রে পলিপ্রপলিন প্যাকেটে নির্দিষ্ট

পরিমাণে তুলো দিয়ে তৈরি প্লাগ লাগিয়ে সুতো অথবা গার্ডার দিয়ে প্যাকেটের মুখটা বাঁধা দরকার।

এই দুটো পদ্ধতি ছাড়াও স্যালাইন বোতলে সিদ্ধ গম বেখে কর্কের সাহায্যে মুখটা আটকে দিতে হবে। এইভাবেও দানাশস্যজাত মিডিয়াম বা মাধ্যম তৈরি করা যায়।

**পরিশোধন করা ঃ** কয়েক ধরনের ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করবার জন্য কয়েকটা জিনিস পরিশোধন করা দরকার। বিশেষ করে খালি কালচার টিউব এবং বোতল। প্রথমে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুতে হবে। এরপর শুকনো করে কাগজ জড়িয়ে কোন পাত্রের মধ্যে রেখে প্রেসারকুকারে একটা সিটির পর আঁচ থেকে নামিয়ে ১৫ মিনিট রাখলেই পবিশোধন করার কাজ শেষ হবে।

**পি ডি এ এবং তরল মাধ্যম পরিশোধন ঃ** বোতল এবং কালচার টিউব পরিশোধন করার নিয়ম অনুসারে পি ডি এ সহ তরল মাধ্যমকে একইভাবে পরিশোধিত করতে হবে। কেবল পি ডি এ মিডিয়াম পরিশোধিত করবার পর তরল অবস্থায় তুলে নিয়ে কালচাব টিউবের যেদিকে তুলোর প্লাগ লাগানো থাকে, সেই দিক পাতলা দণ্ডের ওপর রেখে স্ল্যান্ট তৈরি কবা হয।

**দানাশস্য মিডিয়াম পরিশোধন ঃ** এক্ষেত্রেও পদ্ধতি এক। কেবল পার্থক্য সময়ের। বোতল অথবা পলিপ্রপলিন প্যাকেট ১৫ পাউণ্ড অথবা ১২১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড চাপ যুক্ত বাষ্পে ১ ঘণ্টা পরিশোধিত কবতে হবে। এবপব ২৪ ঘণ্টা বা ১ দিন বাদে দ্বিতীয়বার এক ঘণ্টা পরিশোধন করা দবকার। দু' দফায় পবিশোধিন করা হয়, তার কারণ একবারে অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না। সুতরাং দু' বার পরিশোধন করলে ব্যাকটেরিয়ার কোন আশঙ্কা থাকে না বললেই চলে। কাজেই এটা নিরাপদ ব্যবস্থা।

**ইনোকুলেশন ঘর পরিশোধন ব্যবস্থা ঃ** ইনোকুলেশন ঘবে রাখা ব্যবহাব কবাব বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পরিশোধন করা দরকার। এব জন্য দশ শতাংশ মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়ে সব যন্ত্রপাতি পরিশোধিত করে নিতে হবে।

**ইনোকুলেশন পদ্ধতি ঃ** যে পদ্ধতিতে ইনোকুলেশন ঘরের যন্ত্রপাতি পরিষ্কাব পরিচ্ছন্ন করে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে সূচ অথবা সিরিঞ্জেব সাহায্যে এক কালচাব টিউব বা বোতল থেকে আলাদা মিডিয়াম টিউব বা বোতলে স্থানান্তবিত করবাব পদ্ধতিকে ইনোকুলেশন বলা হয়।

এব আগে বীজ তৈবির তিনটি শ্রেণীর মিডিয়ামের বিষযে আলোচনা করা হয়েছে। এবার খড়জাত মিডিয়াম বা মাধ্যমেব ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসাবে করা হয়, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় আমন ধানের খড় সহজেই পাওয়া যায় বলে খড়ের মিডিয়াম মাশরুম চাষিরা ব্যবহার করে। অবশ্য গমের খড়কেও এই কাজে ব্যবহার করা যায় এবং কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অসুবিধে হয় না। এমনকি মিডিয়ামের গুণাগুণও সঠিক মাত্রায় বজায় থাকে।

আমন ধানের নতুন খড় ব্যবহার করা সব থেকে উত্তম। খড়ের রঙটা হবে সোনালী এবং সরু। প্রথমে খড়কাটা মেশিন অথবা বঁটির সাহায্যে এক ইঞ্চি মাপে কাটতে হবে। তবে খড়ের গোড়ার দিকে ৬ ইঞ্চি এবং ডগার দিকে চার ইঞ্চি

আগেই কেটে বাদ দেওয়া দরকার। কারণ গোড়ার খড় বেশ মোটা থাকে এবং ডগার অংশ ধানের শীষ থাকায় সরু এবং খুবই শক্ত হয়।

ছোট করে সমান মাপে কাটা খড়কে পরিষ্কার জলে বালতি, টিন, মাটির গামলা অথবা পাকা চৌবাচ্চায় খুব কম করে দশ থেকে বারো ঘণ্টা ভেজাতে হবে। এরপর জলটা ফেলে দিয়ে ভিজে খড়কে বাঁশের ঝুড়িতে রেখে দিতে হয়। ঘণ্টা তিনেক বাদে ঝুড়ি থেকে খড় মেঝেতে রেখে ভালোভাবে ওলট-পালট করে আবার ঝুড়িতে রাখা দরকার।

এবার দু' ঘণ্টা বাদে পরীক্ষা করে দেখতে হবে খড় থেকে বাড়তি জল ঝরল কিনা। যদি মনে হয় খড় কাজের উপযোগী হয়েছে তখন কিছুটা খড় হাতের তালুতে রেখে বেশ জোরে চাপ দিলে ভাঁজ করা আঙুলের ফাঁকে কেবল জল দেখা যাবে। জল যদি গড়িয়ে মাটিতে না পড়ে তবেই সেই খড়কে মিডিয়াম বা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা চলবে।

## মাশরুম রোগ-পোকার আক্রমণ

মানুষ সহ গাছপালার যেমন রোগ ও ব্যাধি হয় তেমনি মাশরুমের ক্ষতি করে কয়েক শ্রেণীর পোকা-মাকড়। এছাড়াও রোগ ও ব্যাধির আক্রমণ ঘটে। কারণ মাশরুম নিজে ছত্রাক হলেও পোকা এবং মাকড়ে নানা ধরনের রোগের জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি বহন করে মাশরুমে রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। প্রথমে **কীট ও পতঙ্গের** কথা বলা হচ্ছে এবং পরে **রোগের** বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

**পোকা-মাকড়—মাইটস্ ঃ** যে ঘরেতে মাশরুম চাষ করা হচ্ছে সেখানে ওদের দেখতে পাওয়া যায়। পোকাগুলো মাশরুমের ওপরে টুপি বা ক্যাপে এবং ডাঁটি বা
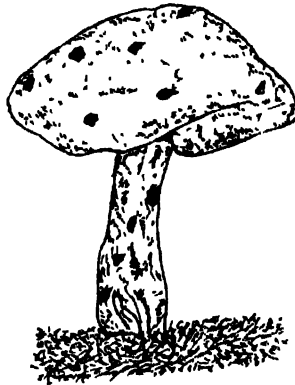
মাইটসের আক্রমণে মাশরুমের বিভিন্ন জায়গায় ছিদ্র ও ফুটো হয়েছে।

বোঁটাতে ফুটো করে দেয়। আবার নিচের শেকড় জাতীয় পদার্থ মাইসেলিয়াম খেয়ে ফেলে। সব থেকে ভালো উপায় বা **প্রতিকার হচ্ছে চাষের ঘরে পোকা ঢোকা বন্ধ করে দেওয়া।** এই কাজ করতে হলে কম দামে নাইলন জাল জানলাতে লাগালে

আলো প্রবেশ যেমন করতে পারে তেমনি বাতাস চলাচলের ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। অবশ্য ঘরের দরজার পাল্লা খোলা রাখা চলবে না।

**পোকা-মাকড়—নেমোটেড ঃ** মিডিয়াম তৈরি করবার দোষে নেমোটেড মাশরুমকে আক্রমণ করে। কারণ এরা জন্মায় মিডিয়াম বা মাধ্যমে। নেমোটেডের দুটো শ্রেণী রয়েছে। একটা দেখতে পেরেকের মতো এবং অন্যটি কৃমি জাতীয়।

প্রথমটি মাশরুমের নিচে শেকড়ে ফুটো করে দেয়। এর ফলে মাশরুমের নিচের গঠন ঠিকমতো আকারের হয় না। শেষে মাশরুমের অন্য অংশ খেতে শুরু করে। তখন মাশরুমের রঙ সাদা থেকে হালকা বাদামী হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নেমোটেড এই ধরনের ক্ষতি করে।

**পোকা-মাকড়—সীসিড ঃ** এক শ্রেণীর মাছি এবং খুবই কম দেখা যায়। খুবই ছোট আকারের। দেহের রঙ কমলা তবে ওপরে কালো আভা থাকে। ওদের আক্রমণ বোঝা যায় মাশরুমেব ওপরে ছোট আকারের লার্ভা দেখে। কমলা, সাদা, ফিকে গোলাপী আবার হলদে আভাযুক্ত লার্ভাও দেখা যায়।

আসল কথা হলো, ওদের রঙটা খুব তাড়াতাড়ি পালটে যায়। মাছি প্রথমে মাশরুমের তলাতে আক্রমণ চালায় এবং শেকড় খেয়ে ফেলে। শেষে ডাঁটি ফুটো করে একেবারে মাশরুমের ওপরে পৌঁছায়।

**পোকা-মাকড়—স্প্রিং টেল ঃ** এতই ছোট আকারের পোকা যে খোলা চোখে দেখা যায় না। এদের একটা শক্ত শুঁড় থাকে। বুকে হেঁটে চলে। ওরা কয়েক ইঞ্চি লাফাতে পারে বলে নামটা স্প্রিং টেল হয়েছে। এরা ঝাঁক বা দল বেঁধে থাকে। প্রথমে মাশরুমের শেকড়ে আক্রমণ চালায় এবং পরে বোঁটার ক্ষতি করে। যখন সংখ্যায় বেশি হয় তখন ওপরের ছাতার অংশ খেতে শুরু করে।

**পোকা-মাকড়—সাইয্যারিডস ঃ** এদের মাছিও বলা যেতে পারে। দেহের গঠন নলাকার। সামনের দিকে লম্বা শুঁড় থাকে। দেহের বঙ বেশ কালো। মাছিরা মাশরুমের বিশেষ কোন ক্ষতি না কবলেও ওদের লার্ভা খুবই ক্ষতিকর।

মাছিগুলো মিডিয়াম বা মাধ্যমে ডিম পাড়ে। মাশরুমের গোড়াতে মাধ্যমে বসবাস করে। এরপর বোঁটায় গর্ত করে শেষে ওপবে অভিযান চালায। কিছু ক্ষেত্রে মাছিগুলো মাশরুমের মাথা বা টুপিতে ডিম পাড়ে। এরপর ডিম থেকে লার্ভা বের হয়ে তারা ওপরে ফুটো করে শেষে বোঁটায় সুড়ঙ্গ করে নিচে চলে আসে।

লার্ভারা দেখতে কালো। লম্বায় ৬ থেকে ৭ সেন্টিমিটার অবধি বড় হয়। কাজেই দেখলে সহজেই চেনা যায়।

**পোকা-মাকড়—ফোরিড ঃ** এরাও ক্ষতিকারক মাছি। কারণ পাখনা রয়েছে। বর্ষার পর এবং বসন্তকালে মাশরুমের ওপর আক্রমণ করে। অন্যান্য ক্ষতিকর পোকা ও মাছির মাথার রঙটা কালো হয়। তবে ফোরিড মাছির মাথার রঙ কালো হয় না। কাজেই সহজে চেনা যায়। এরা মাশরুমের গোড়ায় বাস করে এবং শেকড়ের খুবই ক্ষতি করে। তবে যা কিছু করে সবই ভোরের দিকে। এটা ওদের স্বভাব বলা চলে।

## পোকা-মাকড় দমনের আগাম ব্যবস্থা

(ক) এর আগে প্রাথমিক ভাবে মাশরুম চাষের ঘরে জানলা ও দরজাতে সরু

জাল লাগাবার কথা বলা হয়েছে। এটা অনেকটা নিরাপদ। তবে অনেকের পক্ষে প্রথম দিকে জাল লাগাবার খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। সেই কারণে অন্য ব্যবস্থা নিতে হয়।

(খ) মিডিয়াম বা মাধ্যমে তৈরি করবার সময় এক কুইন্ট্যাল খড়ে গুঁড়ো আকারে লিনডেন (০·৬৫ শতাংশ) মোট আশি গ্রাম মেশাতে হবে।

(গ) যদি মাশরুম চাষ মাচা অথবা কাঠের ট্রেতে করা হয় তাহলে বীজ বপন করবার পর দু' দিন বাদে ৭ মিলিলিটার ম্যালাথিয়ান (৫০ শতাংশ—ই. সি.) ১০ লিটার পরিষ্কার জলে মিশিয়ে ট্রের ওপর খড়েতে চারদিকে পিচকারির সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হবে। ফলন তোলা অবধি একবার ছিটালেই দ্বিতীয় বার আর ছিটাতে হবে না। আবার নতুন বীজ বপন করে তখন ঐ নিয়মে ওষুধ ছিটাতে হয়।

(ঘ) কৃমি শ্রেণীর পোকা অর্থাৎ নেমোটেড যাতে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য ৪০ মিলিলিটার নিমাগন পরিষ্কার ১০ লিটার জলে মিশিয়ে খড়ের মিডিয়ামকে উলটে-পালটে দেবার সময় ছিটাতে হবে। এটা আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা।
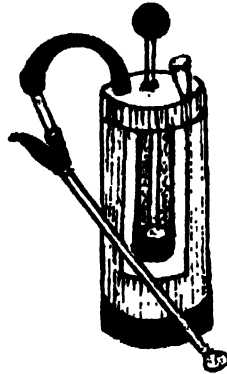
কীটনাশক রসায়ন ছিটাবার হস্তচালিত মেশিন।

কোন কারণে এই ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে তখন পোকার আক্রমণ (নেমোটেড) প্রতিরোধ করতে প্রতিকার হিসাবে চাষের ট্রেতে ওষুধ ছিটালে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়। ওষুধ হিসাবে ২ গ্রাম ফিউরাডান (৩-জি) দানাদার ওষুধটি প্রতি বর্গমিটার এলাকায় ছড়াতে হবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ওষুধটি না পেলে কার্বো-ফিউরান ব্যবহার করা যাবে। ওষুধের পরিমাণ এবং প্রয়োগ করবার নিয়ম সবই আগেরটির মতো।

(ঙ) স্প্রিং টেল শ্রেণীর পোকা প্রতিরোধ করতে হলে ৫ মিলিমিটার নুভান (১০০—ই. সি.) পরিষ্কার ১০ লিটার জলে গুলে মাশরুম চাষের ট্রের ওপর মিডিয়ামে ছিটাতে হবে। এটা করতে হবে বীজ বপন করবার পর চারা বের হবার দু' দিন পরে। দ্বিতীয়বার ওষুধ ছিটাতে হবে মাশরুম তোলার দু' দিন আগে। এবার ওষুধের পরিমাণ হবে ২ মিলিলিটার নুভান ১০ লিটার জলে গুলে ছিটানো দরকার। আগে যেভাবে ওষুধ ছিটানো হয়েছে এক্ষেত্রে তার কোন পরিবর্তন হবে না।

## বিচিত্র গঠনের মাশরুম

বিভিন্ন শ্রেণী অনুসারে মাশরুম নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি লাভ করে। তবে বিশেষ কিছু কারণে মাশরুমের আকৃতি পালটে যায়। কোন রোগের জীবাণু বা

মাশরুমের লম্বা ডাঁটি অর্থাৎ বোঁটা অস্বাভাবিক লম্বা হয়েছে।

ভাইরাসের আক্রমণের জন্য এসব হয় না। সুতরাং বিচিত্র গঠনের মাশরুম কোন রোগ নয়। তবে এই ধরনের মাশরুম বিক্রি হয় না, কাজেই চাষির ক্ষতি হয়।

**গোলাপী মোরগঝুঁটি মাশরুম ঃ** মাশরুমের ক্যাপ বা মাথার গঠন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। মাথার ঝুলে থাকা অংশ বেড়ে যায়। সাধারণ অবস্থায় মাথার রঙ সাদা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ফিকে গোলাপী দেখায়। যখন মাশরুমের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয় তখন অনেকটা মোরগের মাথার ঝুঁটির মত দেখায়।

কয়েকটা কারণের জন্য এরকম হতে পারে। কেরোসিন অথবা ডিজেলের বাতি জ্বালালে তার ধোঁয়াতে এমন হতে পারে অথবা প্রায়ই কীটনাশক ওষুধ ছিটালে মাশরুমের গঠন স্বাভাবিক হয় না। আবার কোন মেশিন চালালে তার তেল যদি মাশরুমের ওপর অথবা মাধ্যমে পড়ে তার জন্য মাশরুমের মাথার গঠন মোরগ ঝুঁটির মতো হতে পারে। সব থেকে বেশি ক্ষতি হয় কেরোসিনের স্টোভ মাশরুম চাষের ঘরে জ্বালালে অথবা নেভালে। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রচুর ধোঁয়া বের হয়। সুতরাং যদি কোন কারণে কেরোসিনের স্টোভ ঐ ঘরে ব্যবহার করতে হয় তবে মাশরুম চাষের ঘরের বাইরে জ্বালাতে ও নেভাতে হবে।

**মাশরুমের লম্বা বোঁটা ঃ** সাদা বোতাম মাশরুমের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় বোঁটা স্বাভাবিক অবস্থার থেকে অনেকটা বেশি লম্বা হয়ে গেছে। আবার মাশরুমের মাথাটা আকারে ছোট হয়েছে। এটা কোন রোগ নয়, চাষের নিয়ম সঠিকভাবে পালন না করার জন্য মাশরুমের গঠন এই রকম হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, মাশরুম চাষের ঘরে যেমন ভালোভাবে আলো প্রবেশ করবে তেমনি বাতাস চলাচলের ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। যদি এই দুটো বিষয়ের মধ্যে কোন একটির অভাব ঘটে তবে মাশরুমের বোঁটা লম্বা হয়ে যায়।

**মাশরুমের মাথায় আঁশ ও ফেটে যাওয়া :** পাঁক বা কাদা মাটি গরমের সময় ফেটে গেলে যেমন দেখায় মাশরুমের মাথাও সেইরকম দেখায়। এছাড়াও
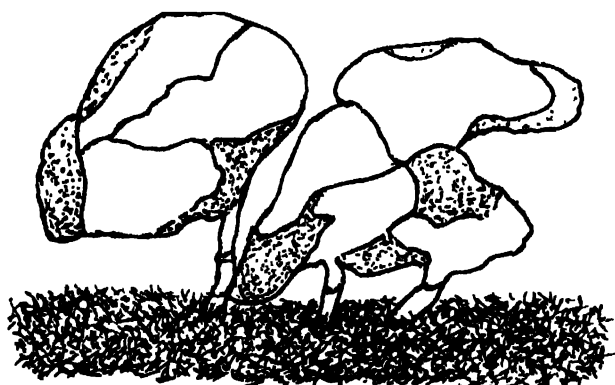
অস্বাভাবিক মাশরুম। আঁশে ঢাকা এবং বিভিন্ন জায়গায় ফেটে যাওয়া এটাও মাশরুমের রোগ।

মাশরুমের মাথা স্বাভাবিক অবস্থায় মসৃণ ও চক্‌চকে থাকে। এক্ষেত্রে খসখসে ভাব এবং মনে হয় পাতলা আঁশের মতো কিছু দিয়ে ঢাকা রয়েছে।

এই ধরনের বিকৃত মাশরুমের গঠন কোন রোগের আক্রমণের জন্য হয় না। যে মাধ্যম বা মিডিয়ামের ওপর মাশরুমের বীজ বপন করা হয়েছে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় জলের অভাব ঘটলে এটা হতে পারে। এছাড়াও মাশরুম চাষের ঘরে যদি বেশি ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করে অথবা বাতাসে জলীয় কণার পরিমাণ কমে গেলে আর্দ্রতার অভাবে ফেটে যায়।

**মাথার নিচেটা খোলা অবস্থায় মাশরুম :** সঠিক সময়ের আগেই মাশরুমের মাথাটা খুলে বা উন্মুক্ত হয়ে যায়। এটাও মাশরুমেব রোগ নয়। ঘরের তাপমাত্রা বেশি হলে এই ধরনের ঘটনা ঘটে।

আরও একটা কারণ রয়েছে। অনেক সময় মাশরুম চাষের ঘরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেশি পরিমাণে জমে যায়। কোন কারণে ঐ গ্যাস বাইরে বের হতে পারে না। ফলে গ্যাস বেশি ঘনীভূত হয়, তখন চাষের ঘরে তাপমাত্রা বাড়ে। এটাও অসময়ে মাশরুমের মাথার নিচেটা খুলে যাবার কারণ।

## মাশরুমের রোগ ও প্রতিকার

পোয়াল ছাতু এবং ঝিনুক মাশরুমের বিশেষ একটা রোগ-ব্যাধির আক্রমণ ঘটে না। তবে সাদা বড় বোতাম ছাতুর ক্ষেত্রে দেখা যায়, বেশ কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়। রোগের আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে এবং রোগ প্রতিরোধ করবার ওষুধও রয়েছে। কিন্তু গোড়াতেই রোগ ধরতে না পারলে পরে বাড়াবাড়ি অবস্থায় ওষুধ দিয়েও কোন ফল হয় না।

রোগের বিষয় বলবার আগে রোগ প্রতিবোধ করবার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেই বিষয়ে আগে আলোচনা করা হচ্ছে। তাবপর রোগ এবং প্রতিকারেব সম্পর্কে বলা হবে।
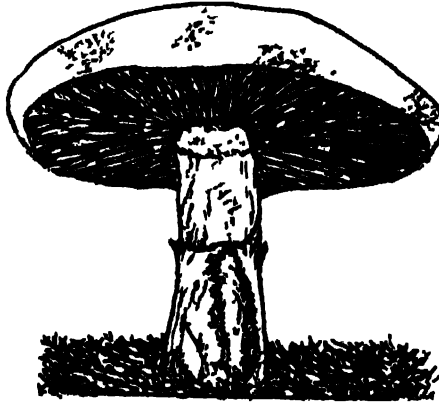
মাশরুমেব মাথা জালিকাতে ভবে গেছে।

## রোগ প্রতিরোধের অগ্রিম ব্যবস্থা

রোগ প্রতিবোধেব জন্য যেসব ব্যবস্থাব কথা এখানে বলা হচ্ছে সবই প্রথমে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশেব বিজ্ঞানীরা সুপারিশ করেছিলেন। বর্তমানে ভারতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরাও বিষয়গুলোব ব্যাপাবে একমত হয়েছেন।

(১) প্রথমবার ফলন (মোট তিন থেকে চার বার) তুলে নেবাব পর নতুন ভাবে মাশরুমের বীজ বপন কববার আগে কাঠের অথবা নাইলন ট্রে ৭০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বারো ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।

(২) ট্রে সহ অন্যান্য উপকবণ—৪ শতাংশ পেন্টাক্লোরোফিটেন, ০·৫ থেকে ১ ভাগ কাপড় কাচা সোডা এবং জল ১০০ মিলিলিটার—এই তিনটি জিনিস মিশিয়ে তার সাহায্যে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

(৩) মাশরুম চাষের ঘরের চার দেওয়াল, দরজা ও জানলার পাল্লা এবং ঘরের মেঝে ৪ শতাংশ ফরম্যাল ডিহাইড দ্রবণের সাহায্যে ধুয়ে ফেলা দরকার।

(৪) চাষের ঘরে প্রবেশ করবার আগে হাত এবং পা জীবাণুনাশক সাবান দিয়ে ধুয়ে তবেই ঘরেতে প্রবেশ করতে হবে। এইভাবে সাবধান হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো যাতে বাইরে থেকে মাশরুমের কোন ক্ষতিকারক জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া চাষের ঘরেতে প্রবেশ করে কোন রোগ ছড়াতে না পারে।

## রোগের প্রতিকার

**বাদামী ছত্রাক রোগ ঃ** মাশরুমের বীজ থেকে মিডিয়াম বা মাধ্যমের ওপর যখন ছোট আকারের অঙ্কুর বের হয় সেই সময় এই রোগটি দেখা দেয়। ছোট

আকারের মেঘের মতো অঙ্কুরের পাশে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় থাকে। প্রথমে রঙ সাদা দেখায় পরে ধীরে ধীরে পালটে বাদামী হয়। এই ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে খুব তাড়াতাড়ি। মাশরুমের ফলন ভীষণভাবে কমে যায়। আর কোন রোগ নেই যার আক্রমণে মাশরুমের ফলন এতটা কমে যায়।

রোগের মূল কারণ হচ্ছে মিডিয়াম বা মাধ্যম। এর মধ্যে জলীয় অংশ বেশি থাকলে অথবা বীজ বপন করবার সময় তাপমাত্রা বেশি হলে (২৮° থেকে ৩২° সেন্টিগ্রেড) রোগটি বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ পায়:

**প্রতিরোধ হিসাবে** মিডিয়াম বা মাধ্যম তৈরি করবার সময় সঠিক নিয়মে জল মেশাতে হবে। আর বীজ বপনের পর যেন প্রয়োজনের বেশি জল ছিটানো না হয়। অঙ্কুর বের না হওয়া অবধি মাশরুম চাষের ঘরের তাপমাত্রা যেন বেড়ে না যায় সে বিষয়ে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। এর পরেও রোগটি দেখা দিলে তখন রোগ দমনের জন্য দুই শতাংশ ফরমালিন ছিটালে বাদামী ছত্রাক রোগ দমন করা যাবে।

**সাদা তুলোর মতো জালিকা রোগ ঃ** ইংরেজিতে একে বলা হয় সফট্ মিলডিউ অথবা কব ওয়েভ। মিডিয়ামের ওপর সাদা তুলোর মতো জালিকাতে ভরে যায়। অবশ্য জালিকা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। অঙ্কুর কিছুটা বড় হবার পর রোগটির আক্রমণ শুরু হয়। প্রথম দিকে জালিকার রঙটা সাদা থাকলেও পরে সেটা ফিকে গোলাপী আকার ধারণ করে। প্রথমে মিডিয়াম বা মাধ্যমে রোগটি দেখা দিলেও কয়েক দিন যাবার পর মাশরুম আক্রান্ত হয়। মাশরুমের যে জায়গায় আক্রান্ত হয় সেখানে ছুরির ডগা দিয়ে সামান্য খোঁচা দিলেই দেখা যাবে ভেতরটা একেবারে পচে গেছে।

রোগটি বেশি সংক্রামিত হয় জল, মাটি, বাতাস এবং মাধ্যম বেশি ভিজে থাকলে। বাতাসে যদি জলীয় অংশ বেশি থাকে তার জন্য মাশরুম সফট্ মিলডিউ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে মাশরুম তুলে নেবার পর মিডিয়ামের নিচে যে অংশ থাকে তার জন্যও রোগটি দেখা দিতে পারে।

**প্রতিরোধ** হিসাবে প্রথমে দেখতে হবে চাষের ঘরেতে যাতে ভালোভাবে বাতাস চলাচল করে। আর বাতাসে জলীয় অংশ বেশি থাকলে তারও প্রতিকার করতে হবে। এরপর ওষুধ হিসাবে ০.২ শতাংশ ডাইথেন-জেড-৭৮ প্রয়োগ করা দরকার। এরপর দ্বিতীয় ওষুধ হিসাবে পি সি এন বি (পেন্টা ক্লোরো নাইট্রো-বেনজিন) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

যদি ওষুধে তেমন কোন সুফল না পাওয়া যায় তখন আক্রান্ত মাশরুমের ট্রে চাষের ঘর থেকে সরিয়ে সব কিছু মাটির নিচে পুঁতে দেওয়া উচিত। এতে অন্য ট্রেতে চাষ করা মাশরুম রোগের হাত থেকে রেহাই পাবে।

**সাদা ছত্রাক রোগ ঃ** এই রোগটির সঙ্গে বাদামী ছত্রাক রোগের যথেষ্ট মিল রয়েছে। রোগ আক্রমণের পর কয়েক দিন বাদেই যে জায়গায় রোগের আক্রমণ ঘটেছে সেই জায়গাটি বাদামী রঙের পরিবর্তে হালকা গোলাপী আভা ফুটে ওঠে। ঠিকভাবে মিডিয়াম তৈরি করা যদি না হয় তবে রোগটি মিডিয়াম বা মাধ্যমের

ওপর প্রায় সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে মাশরুমের ফলন ভীষণ ভাবে কমে যায়।

মিডিয়াম তৈরি করার সময় জল বেশি থাকলে অথবা বীজ বপনের পর চাষের ঘরে বাতাস চলাচল ঠিক মতো না করলে রোগ তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়।

রোগ **প্রতিরোধ** করতে হলে মিডিয়ামে জলের পরিমাণ যেন সঠিকভাবে দেওয়া হয়। ঘরে বাতাস চলাচলের কোন বাধা থাকলে সেটা দূর করতে হবে। আর ওষুধ হিসাবে ২ শতাংশ ফর্মালিন পিচকারির সাহায্যে সব জায়গায় ছিটালে রোগের প্রকোপ কমবে।

**কালচে সবুজ ছত্রাক রোগ ঃ** রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের রঙটা জলপাই ধরনের। সেই কারণে ইংরেজিতে বলা অলিভ গ্রিন মিলডিউ। বীজ বপন করবার কয়েক দিন বাদে এই রোগ দেখা দেবার আশঙ্কা থাকে।

ক্ষতিকারক ছত্রাকের রঙটা প্রথম দিকে সাদা থাকে। কয়েক দিন যাবার পর পালটে জলপাই রঙ হয়। রোগের কারণ সেই একই রকম। মিডিয়াম যদি ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত না হয় এবং জলের ভাগ বেশি থাকে তবেই রোগটির প্রাদুর্ভাব ঘটে। এছাড়াও বাতাস চলাচলের অভাবও একটি কারণ বলে ধরা হয়।

রোগের **প্রতিকারের** জন্য ০·২ শতাংশ থিরাম এবং ক্যাপটান একই পরিমাণে ছিটাতে হবে। যদি কোন কারণে ওষুধ দুটো না পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় ওষুধ হিসাবে ০·০৫ শতাংশ বেনলেট প্রয়োগে একই কাজ পাওয়া যাবে। তবে মিডিয়াম ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত সহ সঠিক মাপ অনুসারে জল মেশালে রোগের কোন আশঙ্কাই থাকবে না।

**কালো মাথা মাশরুম ঃ** রোগটা বুঝতে পারা যায় যখন লম্বা বোঁটা সমেত পাতলা মাথা যুক্ত ছোট আকারের মাশরুম মিডিয়াম বা মাধ্যমের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক দিন যাবার পর মাশরুমের মাথা কালো হয়ে গলে পড়ে।

এর একমাত্র কারণ হলো মিডিয়ামে গ্যাসের সৃষ্টি হওয়া। এর নাম অ্যামোনিয়া গ্যাস। মিডিয়াম তৈরি হবার পর ভালোভাবে পরীক্ষা না করে বীজ বপন করা হলে মাশরুম চারা অবস্থায় কালো মাথা রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের কোন **প্রতিকার** নেই। সব কিছু বাইরে ফেলে দিতে হবে এবং নতুন করে মাশরুম বীজ বপন করা দরকার। তবে মাচা অথবা ট্রে চাষ শুরু করবার আগে ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করা দরকার।